বেনজির ভুট্টো

ডটার অব দ্য ইস্ট

আত্মজীবনী

বেনজির ভুট্টো

ডটার অব দ্য ইস্ট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ডটার অব দ্য ইস্ট

আত্মজীবনী

বেনজির ভুট্টো

www.pathagar.com

সকল প্রকার স্বত্ব সংরক্ষিত। এই গ্রন্থ, গ্রন্থের কোনো অংশ, প্রচ্ছদ, ছবি, অনুবাদ মুদ্রণ, পুনর্মুদ্রণ, ইলেকট্রনিক, মেকানিক্যাল, ফটোকপি অথবা অন্য যেকোনও মাধ্যমে প্রকাশকের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করা যাবে না।

অনুবাদ

মহসীন হাবিব, রাগিবুল রেজা, মোহাম্মদ নাদিম,
অনন্ত মাহফুজ, সাজেদুল আলম খান, রাজিব হাসান,
মোহাম্মদ সাঈদ, ইমাম গাজ্জালী, মোশাররফ হোসেন,
শামসুর রহমান, মোহাম্মদ গোলাম সরোয়ার।

গ্রন্থস্বত্ব : ১৯৮৮, ২০০৭ বেনজির ভুট্টো

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৮, হ্যামিশ হ্যামিল্টন, গ্রেট ব্রিটেন
বর্তমান সংস্করণ : ২০০৭, সায়মন অ্যান্ড শুস্টার, ইউ.কে.
বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশ : ২০০৮, চারদিক, বাংলাদেশ

প্রকাশক
চারদিক
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১১০৬৯, ৯৫৬৪৭৯৯

মুদ্রণ
ইমপ্রেসন প্রিন্টিং হাউস
২২ আলমগঞ্জ লেন, ঢাকা ১২০৪
ফোন : ৭৪১০৯৩৬

ISBN 984 802 058 6

মূল্য : ৪৪০.০০ টাকা

www.pathagar.com

বিলাওয়াল, বাখতওয়ার ও আসিফা
এবং পাকিস্তানের সকল শিশুদের প্রতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূ চি প ত্র

নতুন সংস্করণের ভূমিকা ৯
১ যেভাবে আমার বাবাকে হত্যা করা হলো ২১

বন্দি জীবনের দিনগুলো

২ নিজ গৃহে বন্দি ৩৭
৩ আল-মুর্তাজা'র স্মৃতি : গণতন্ত্রের প্রথম স্বাদ ৫৬
৪ আল-মুর্তাজা'র স্মৃতি : অক্সফোর্ডে যাওয়ার স্বপ্নপূরণ ৭৫
৫ আল-মুর্তাজা'র স্মৃতি : জিয়াউল হকের চরম বিশ্বাসঘাতকতা ৯৭
৬ আল-মুর্তাজা'র স্মৃতি : বাবাকে হত্যার সাজানো বিচার ১১৮
৭ আল মুর্তাজা কারাগার থেকে মুক্তি : মার্শাল ল'র প্রতি গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ ১৫৯
৮ সুক্কুর কারাগারে নিঃসঙ্গ বন্দি জীবন ১৭০
৯ করাচি সেন্ট্রাল জেলের সেই সেলে যেখানে মা ছিলেন ২০০
১০ সাব জেলে একাকী আরো দুই বছর ২২০

স্বৈরাচার মোকাবেলায়

১১ নির্বাসনের বছরগুলো ২৪৭
১২ আমার ভাইয়ের মৃত্যু ২৭৩
১৩ লাহোরে ফিরে আসা এবং আগস্ট ১৯৮৬ গণহত্যা ২৯৭
১৪ পিত্রালয়ে বিয়ে ৩৩৫
১৫ গণতন্ত্রের জন্য নতুন স্বপ্ন ৩৫০
১৬ জনগণের জয় ৩৫৭
১৭ প্রধানমন্ত্রী এবং তারপর ৩৭৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

এই জীবন আমি পছন্দ করিনি– এটাই আমাকে পছন্দ করেছিল। পাকিস্তানে জন্ম, আমার জীবন এই দেশের বিক্ষুব্ধতা, করুণ পরিণতি আর এর বিজয়ের কথা প্রতিফলিত আমার জীবনে।

আবারো পাকিস্তান আন্তর্জাতিক দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে। ইসলামের নামে সন্ত্রাসীরা পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। গণতান্ত্রিক শক্তি বিশ্বাস করে স্বাধীনতার নীতি-আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সন্ত্রাস নির্মূল করা যায়। সামরিক একনায়কত্ব প্রতারণা আর চক্রান্তের বিপজ্জনক খেলা শুরু করেছে। ক্ষমতা হারাবার ভয়ে সামরিক একনায়ক আধুনিকায়নকে দূরে ঠেলে রেখেছে। এই সুযোগে বেড়ে উঠছে সন্ত্রাসবাদ।

পাকিস্তান কোনো সাধারণ দেশ নয়। আর আমার জীবনও সাধারণ কোনো জীবন নয়। আমার পিতা আর দুই ভাইকে খুন করা হয়েছে। আমার মা, স্বামী এবং আমাকে জেলে পুরা হয়েছে। আমি দীর্ঘ সময় নির্বাসনে কাটিয়েছি। এত সমস্যা আর কষ্টের পরও আমি নিজেকে আর্শীর্বাদপুষ্ট মনে করি। মনে করি কারণ মুসলিম বিশ্বে প্রথম নির্বাচিত নারী প্রধানমন্ত্রী হয়ে প্রচলিত ধারার বাধা ভাঙতে সমর্থ হয়েছি। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, একজন মুসলিম নারী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হতে পারেন, একটি দেশ চালাতে পারেন এবং নেতা হিসেবে পুরুষ ও নারীর কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারেন। আমাকে সম্মানিত করার জন্য আমি পাকিস্তানের জনগণের কাছে কৃতজ্ঞ।

যখন আধুনিকতাবাদী এবং চরমপন্থিদের মধ্যে বিতর্ক চলমান ঠিক তখন মুসলিম বিশ্বে নারীগণ বিরাট এক সাফল্য অর্জন করল যখন ১৯৮৮ সালের ২ ডিসেম্বর আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলাম।

পৃথিবীতে খুব কম মানুষই সামাজিক পরিবর্তন বা কোনো রাষ্ট্রে আধুনিক যুগের সূচনা করবার সুযোগ পায় যে দেশে কেবল মৌলিক অবকাঠামো বিদ্যমান। খুব কম মানুষই নারীদের ভূমিকার গতানুগতিকতা ভাঙবার এবং লাখ মানুষের ভিতর আশার সঞ্চার করবার সুযোগ পায় যে সকল মানুষের পূর্বে কোনো আশা ছিল না।

প্রকৃত অর্থে এই জীবন আমি পছন্দ করিনি তবে এই জীবন এমন এক জীবন যাতে সুযোগ আছে, দায়িত্ব আছে, আছে পূর্ণতা। অনুমান করি, ভবিষ্যৎও চ্যালেঞ্জপূর্ণ যা আমার

www.pathagar.com

দেশ পাকিস্তানের জন্য এবং আমার নিজের জন্যও আমাকে মোকাবেলা করতে হবে।

বিশ বছর আগে, জীবনের নানাবিধ পরিবর্তনের আলোকে- পিতার হত্যাকাণ্ড, আমার কারাবরণ, পিতার রাজনৈতিক মশাল জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্ব- আমি ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, ভালোবাসা, বিয়ে বা সন্তান ধারণের কোনো আশা দেখছিলাম না। ইংল্যান্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথের মতো আমিও ভেবেছিলাম আমার বিয়ে করা হবে না। রানী এলিজাবেথও জেল খেটেছেন এবং অবিবাহিত ছিলেন। অবশ্য আমি ব্যক্তিগতভাবে এইসব ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা পরিহার করতাম। বৈরি অবস্থার মধ্যেও আমি বিবাহিত জীবনে সুখী। আমার স্বামীর জন্য আমি গর্ব করি। তিনি বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ উনিশ বছর সাহস আর আনুগত্য নিয়ে আমার পাশে আছেন। এই সময়ে হয় তিনি প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে না হয় জেলখানায় কাটিয়েছেন। আর আমি মনে করি, শারীরিক দূরত্ব বাড়লেও বা আমাদের দুজনকে একে অন্যের শত্রুতে পরিণত করার চেষ্টার পরও আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে।

না, আমি যা ভেবেছি তা জীবন নয়, কিন্তু আমি ভাবি না নারীর দ্বারা ইতিহাসের পরিবর্তন অসম্ভব।

আমি আমার সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যের জন্য গর্ব করি। আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রকৃত ইসলাম যা শান্তি আর বহুত্ববাদের অধিকারী– এর সঙ্গে সন্ত্রাসীদের দ্বারা লুট হওয়া আমার ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে এক প্রকার বাধ্যবাধকতা অনুভব করি। আমি জানি আমি সে রকম একটা কিছুর প্রতীক যাকে তথাকথিত 'জিহাদী' তালিবান বা আল-কায়েদা অনেক ভয় পায়। আমি একজন নারী রাজনীতিক নেত্রী যে পাকিস্তানে আধুনিকতা, যোগাযোগ, শিক্ষা এবং টেকনোলজি আনার চেষ্টা করছে। আমি বিশ্বাস করি গণতান্ত্রিক পাকিস্তান সারা বিশ্বের এক বিলিয়নের বেশি মুসলমানের বুকে আশার সঞ্চার করবে যারা অবশ্যই অতীত আর ভবিষ্যতের শক্তির মধ্যে থেকে একটা পছন্দ করে নেবে।

যে রাজনৈতিক যুদ্ধ আমি করেছি তার একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যগুলো স্বাধীনতা আর সামাজিক ন্যায় বিচার কেন্দ্রিক। এই মূল্যবোধগুলোর জন্য যুদ্ধ আবশ্যক। কিন্তু আমি জানি, আমার জীবন অধিকতর বিপদসংকুল কারণ আমি একজন নারী। প্রকৃত অর্থে বর্তমান সমাজে কাজটা সহজ নয়, যেখানেই আমরা বাস করি না কেন। আমরা যে পুরুষের সমকক্ষ তা প্রমাণ করার জন্য এখনো আমদের অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। আমাদের আরও বেশি সময় কাজ করতে হবে, অনেক ত্যাগ করতে হবে। এবং আমাদের নিজেদেরকে নিজের পরিবারের অনৈতিক এমনকি ভয়াবহ আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে। দুঃখজনক যে এখনো অনেকে বিশ্বাস করে নারীর জীবন পুরুষরা নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের ওপর নারীরাই চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।

যাইহোক, তাদের দ্বৈত অবস্থানের বিরুদ্ধে নয় আমাদের প্রস্তুত হতে হবে পুরুষদের অতিক্রম করার জন্য সচেতন হতে হবে। এই কাজটি করার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে এমনকি তা যদি পুরুষের চেয়ে দ্বিগুণ সময় ও শ্রম দাবি করে।

আমার মায়ের কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন গর্ভধারণ একটি জৈব প্রক্রিয়া এবং তা কোনোভাবেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করেনা। এর আকাঙ্ক্ষার কাছাকাছি যেতে আমি গর্ভধারণকালীন সময় যাবতীয় শারীরিক এবং মানসিক সীমাবদ্ধতা

www.pathagar.com

অতিক্রম করার চেষ্টা করেছি। আমি খুব ভালভাবেই অবহিত ছিলাম যে, পারিবারিক একটি বিষয় কি করে সেনা সদর দপ্তর থেকে পত্রিকার সম্পাদকীয় টেবিলে রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় হয়ে যায়। অবহিত ছিলাম বলেই আমি আমার গর্ভধারণের সব খবর গোপন রেখেছিলাম। আমি ভাগ্যবান যে, ড. ফ্রেডি সেন্টা'র মতো একজন ডাক্তারের চিকিৎসা সহায়তা পেয়েছিলাম। তিনি তার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা গোপন রাখতেন।

আমার চমৎকার তিনটি সন্তান আছে– বিলাওয়াল, বখতয়ার এবং আসিফা। তারা আমার আনন্দ আর অহঙ্কার। আমি যখন ১৯৮৮ সালে আমার প্রথম সন্তান বিলাওয়ালের অপেক্ষায় তখন তৎকালীন সামরিক স্বৈরশাসক সংসদ ভেঙে দেয় এবং সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেন। তিনি এবং তার শীর্ষ সামরিক লোকজন ভেবেছিলেন একজন গর্ভবতী নারী নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে ব্যর্থ হবেন। তাদের ধারণা ভুল ছিল। আমি তা পেরেছিলাম এবং করেছিলাম। ১৯৮৮ সালের ২১ সেপ্টেম্বর বিলাওয়ালের জন্মের অল্প কিছুদিন পরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আমি জিতে চলেছি। বিলাওয়ালের জন্ম আমার জীবনে অন্যতম সুখময় ঘটনা। একজন মুসলিম নারী দেশের মানুষের মন ও হৃদয় জয় করতে পারবে না এই ধারণা ভুল প্রমাণ করে নির্বাচনে জয়ী হওয়াটা ছিল আরেকটি আনন্দময় ঘটনা।

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবার অল্প কিছুদিন পর, আমার মা আরেকটি সন্তান নেবার তাড়া দিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন পরিবার গড়ে তোলা এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করার প্রতিকুলতা অনুভব করার আগেই একজন মা'কে সন্তান নিয়ে নেয়া উচিত। আমি তার উপদেশ রেখেছিলাম।

আমার দ্বিতীয় গর্ভধারণ তখনো গোপন। তখন সামরিক লোকজন আমাকে পাকিস্তানের সর্বচ্চ পর্বত-চূড়া সিয়াচেনে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো একটা সামরিক ধারণা দেয়ার জন্য। পাকিস্তান ও ভারত ১৯৮৭ সালে এই সিয়াচেন নিয়ে প্রায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল (আবারও ১৯৯৯ সালে), আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম এই ভেবে যে, উঁচু ওই পাহাড়ের বরফাচ্ছাদিত চূড়ায় অক্সিজেনের অভাব আমার অনাগত সন্তানকে আক্রান্ত করতে পারে। ডাক্তার আমাকে বললেন যে, আমি যেতে পারি। তিনি বললেন, অক্সিজেনের অভাব প্রথমে মাকে আক্রান্ত করবে। তখন তাকে অক্সিজেন মাস্ক পরিয়ে দিলেই হবে। শিশুর কিছু হবে না। ডাক্তারের নিশ্চয়তার পরও অনেক ভয় নিয়ে আমি সেখানে গেলাম। সিয়াচেনের পর্বতচূড়ায় প্রধানমন্ত্রীকে সাথে পাওয়া সাধারণ সৈন্যদের জন্য মনোবল উদ্দীপনা। অসম্ভব সুন্দর একটা জায়গা। আমাদের চারপাশে বরফের পাহাড় যা আকাশের নীলে যেন গলাগলি করে আছে। পৃথিবীর কোলাহলমুক্ত বরফাচ্ছাদিত পাহাড়চূড়া স্বর্গীয় নিরবতার নতুন অর্থ বহন করছিল। খাদের ওপারে ভারতীয় সেনা ছাউনি দেখা যাচ্ছিল। তারা প্রমাণ করছিল শান্তির দেখা পাওয়া যেন সুদূর পরাহত।

একদিন বিরোধীদলের এক নেতা জেনে গেলেন আমি গর্ভবতী। শুরু হলো ঝামেলা। তারা প্রেসিডেন্ট এবং সামরিক অফিসারদের সঙ্গে দেখা করলেন আমাকে সরিয়ে দেয়ার জন্য। তাদের যুক্তি ছিলো পাকিস্তান সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে মাতৃত্ব ছুটি দেবার বিধান নেই। তারা বলল সন্তান প্রসবকালীন সময়ে আমি অক্ষম হয়ে পড়ব এবং সরকারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যাবে। বিষয়টি ছিল তাদের কাছে অসাংবিধানিক। তারা প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে দিয়ে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা সামরিক সমর্থিত সরকারকে বোঝালো।

আমি বিরোধীদের দাবির প্রতিবাদ জানালাম এই বলে যে, কর্মজীবী নারীদের জন্য

www.pathagar.com

মাতৃত্বকালীন ছুটির বিধান আছে। (আমার পিতা মাতৃত্ব ছুটির আইন পাস করেন।) আমি বললাম প্রধানমন্ত্রীর জন্য অপ্রকাশ্যভাবে আইনটি প্রযোজ্য যদিও সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে এরকম কিছু স্পষ্ট বলা নেই। আমার সরকারের অন্য সদস্যগণ আমার পাশে দাঁড়ালেন। তারা বললেন, একজন পুরুষ অসুস্থ হলে যেরকম বিষয়টি নিয়ে কোনো জটিলতা তৈরি হয় না, একজন নারী নেত্রীর জন্যও তা হওয়া উচিত নয়।

পাত্তা না দিয়ে বিরোধীরা প্রেসিডেন্টের ওপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য ধর্মঘট শুরু করলেন সরকার উৎখাতের জন্য। আমাকে আমার নিজের পরিকল্পনা তৈরি করতে হলো। বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন রাজনীতিতে সময়জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ। আমি ডাক্তারের সাথে কথা বললাম। ডাক্তার বললেন যে আমার সন্তান পূর্ণতা পেয়েছে। তখন আমি বিরোধীদের ধর্মঘটের প্রাক্কালে সিজার করে সন্তান জন্ম দিলাম।

আমি অন্যদের বুঝিয়ে দিলাম গর্ভকালীন সময় কোনোভাবেই কাজকর্মের ক্ষতি করে না। এরকম অবস্থার পরও আমি অত্যন্ত পরিশ্রম করলাম, আগের চেয়ে অধিকতর পরিশ্রম। বলা যায় একজন পুরুষ প্রধানমন্ত্রীর চেয়েও বেশি।

অবশেষে রাজধানীতে মন্ত্রিপরিষদের সভা আহ্বান করলাম এবং পরে করাচির উদ্দেশে রাজধানী ছাড়লাম। ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠে এক বন্ধুর গাড়িতে করে হাসপাতালে চলে গেলাম।

গাড়িটা ছোট। আমার অফিসিয়াল কাজকর্মের জন্য ব্যবহৃত কালো মার্সিডিজ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কর্তব্যরত পুলিশ দ্বিতীয়বার আর গাড়িটির দিকে তাকাল না। তারা আমার বাড়িতে প্রবেশ করতে যাওয়া গাড়ির দিকেই মনোযোগ দিচ্ছিল যেগুলো বের হচ্ছিল সেগুলোর চেয়ে বেশি।

মি. সেন্টা যে হাসপাতালে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, সেখানে যাওয়ার পথে আমার বুক ধরফর করছিল। আমি গাড়ি থেকে নামার পর হাসপাতাল কর্মীদের চোখেমুখে অবাক হবার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করলাম। আমি জানতাম এই খবর মোবাইল ফোন আর পেজারের মাধ্যমে পৌঁছে যাবে সবার কাছে (আমার সরকারই দ. এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম মোবাইল ফোন ব্যবহার শুরু করে।) আমি দ্রুত অপারেশন থিয়েটারের দিকে চলে গেলাম। আমি জানি আমার স্বামী এবং মা হাসপাতালের পথে কারণ বিষয়টি নিয়ে আমরা আগে কথা বলেছিলাম। অপারেশন থিয়েটার থেকে আমাকে ব্যক্তিগত কক্ষে নিয়ে যাওয়ার সময় যখন এনেসথেসিয়া কাটিয়ে উঠছিলাম তখন আমার স্বামীর কণ্ঠ শুনতে পেলাম, 'মেয়ে হয়েছে'। মায়ের মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। মেয়ের নাম রাখলাম 'বখতয়ার' যার অর্থ সৌভাগ্য আনয়নকারী এবং মেয়েটি সৌভাগ্যই নিয়ে এসছিল। বিরোধীদের ধর্মঘট ভেস্তে গিয়েছিল।

পৃথিবীর সব জায়গা থেকে শুভেচ্ছা পেতে থাকলাম। সরকার প্রধান থেকে সাধারণ মানুষ আনন্দের ভাগ নিয়ে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। বিশেষ করে যুব নারীদের কাছ থেকে। তাদের জন্য এই ঘটনা উল্লেখযোগ্য ছিল কারণ এতে প্রমাণিত হয়েছিল একজন নারী নেতৃত্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে থেকে অনেক বিপত্তির মধ্যে কাজ করতে পারেন এবং সন্তানও নিতে পারেন। পরদিন অফিসে চলে এলাম সরকারি কাগজপত্র পড়লাম ও নথিপত্র সই করলাম। পরে জেনেছিলাম, আমিই একমাত্র সরকার প্রধান যে সরকারি দায়িত্ব পালনকালে সন্তান জন্ম দিয়েছি। আমি জানি, ভবিষ্যতের কোনো নারী প্রধানমন্ত্রীর জন্য এই রেকর্ড ভাঙা খুব সামান্য ব্যাপার হবে না।

www.pathagar.com

বখতয়ারের জন্ম হলো ১৯৯০ সালে। সাত মাস পর আগস্টের ৬ তারিখে অগণতান্ত্রিকভাবে প্রেসিডেন্ট আমার সরকার উৎখাত করে। আর তখন সারা বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ইরাকের কুয়েত আক্রমণের ওপর। আমার স্বামীকে বন্দি করা হয়। মা আমাকে উপদেশ দিলেন আমি যেন আমার সন্তানদের বিদেশে পাঠিয়ে দেই। সন্তানদের কাছ ছাড়া করতে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিল– বিলাওয়ালের বয়স দুই বছর পূর্ণ হবে ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে, আর বখতয়ারের এখনো এক বছর হয়নি। শ্বশুরবাড়ির লোকজন যতটা দ্রুত পারা যায় লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। আমি একা থেকে গেলাম। দুঃস্বপ্নের মধ্যে দেখতে পেলাম আমার সন্তানরা কাঁদছে। টেলিফোনে আমার বোন আমাকে ভীত না হওয়ার জন্য বলল।

আমার সরকার উৎখাতের পর বন্দরনগরী করাচিতে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ল। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেড়ে গেল। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, বাড়ির বাইরে বা অফিস আদালতে সাধারণ নিরপরাধ লোকজন নিধন হতে লাগল। আমি জানি, লন্ডনে থাকা আমার সন্তানদের জন্য নিরাপদ। তারপরও রাতের পর রাত আমি ঘুমুতে পারছিলাম না, ওইসব দুঃস্বপ্নের জন্য।

আমি এবং মা তখন থাকছিলাম রাজধানী শহর ইসলামাবাদে। সংসদ চলাকালে ১৯৯০ সালের সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী আমার স্বামীও গৃহবন্দি আমাদের বাড়িতে। মা আর স্বামীর কাছে বললাম আমার সন্তানরা আমার থেকে দূরে থাকছে– এটা আমার জন্য কতটা কষ্টদায়ক। মনে হলো আমি তাদের নির্বাসিত করেছি। ভয়ও পেলাম কারণ এই ঘটনা তাদের মানসিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

১৯৯১ সালের দিকে বিলাওয়াল লন্ডনের কুইন্সগেট এলাকার একটা প্রাক-কিন্ডার গার্টেন স্কুলে যাওয়া শুরু করল। বখতয়ারের বয়স তখনও মাত্র এক বছর। নিজেকে যুক্তি দিয়ে বুঝালাম আমি তাকে আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে পারতাম। তখন আমি লন্ডনে চলে গেলাম। আমার বোন সনমের ফ্ল্যাটে যেতে আর অপেক্ষা সইছিল না। দরজায় নক করার সময় আমার মেয়ের কান্না শুনতে পেলাম, সেই একই কান্না, যে কান্না আমি দুঃস্বপ্নের ভিতর শুনতাম। আমি তাকে কোলে তুলে নিলাম, ছেলেকে কাছে ডাকলাম। বোনকে বললাম, 'বখতয়ারকে পাকিস্তানে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' আমার বোন বলল– 'আমি তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য বলছি না, এই মেয়ে গত এক মাস কান্না থামায়নি।'

কথায় প্রকাশ না করলেও আমার সন্তানরা বুঝিয়ে দিল কি করতে হবে। যতদিন বেঁচে থাকব সেই দৃশ্য আমি ভুলব না– শাদা শার্ট, নিল স্ট্রাইপ পাজামা, সাদা মোজা আর কালো জুতা পায়ে বারান্দার দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিলাওয়াল। তাকে রেখে বখতয়ারকে নিয়ে আমি যখন ফিরে আসছিলাম তখন সে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল আমার দিকে, তার চোখে এক পৃথিবী কষ্ট। কোনো মা'ই তার দুই বছরের সন্তানকে ফেলে আসতে পারে না। কোনো সন্তান চায় না মা এক সন্তানকে রেখে আরেকজনকে নিয়ে চলে যাবে।

বখতয়ারকে নিয়ে আমি হিথরো বিমানবন্দরে চলে এলাম। আমার কোলে নিশ্চুপ থাকল সে। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের বিমানে উঠে আমার সিটে বসলাম। নয় ঘণ্টার ভ্রমণে বখতয়ার একবারও কাঁদেনি। আমার কাঁধে মাথা রেখে সে ঘুমিয়েছে। পাকিস্তানের কিংবদন্তি গায়িকা ম্যাডাম নূরজাহানও একই বিমানে ছিলেন। আমার পিছনে বসে অবাক হয়ে তিনি তাকিয়েছিলেন বখতয়ারের দিকে যে তার মাকে একটুও বিরক্ত করছিল না। 'বিমানে এরূপ নিশ্চুপ থাকা শিশু আমি আমার জীবনে দেখিনি', তিনি বললেন।

আমার শ্বশুর শাশুড়ি সিদ্ধান্ত নিলেন তারা আমার বোনের সঙ্গে বিলাওয়ালকে

www.pathagar.com

দেখাশোনা করার জন্য লন্ডনে থাকবেন। আমি স্বস্তি পেলাম এই ভেবে যে সে তার পরিবারকে কাছে পাবে। হাইড পার্কে ঘুরে হাঁস আর কাঠবিড়ালিদের খাবার দিতে দিতে তার মনোযোগ ভিন্ন দিকে মোড় নিতে শুরু করেছিল।

১৯৯০-এ পাকিস্তান পিপলস পার্টির সরকার উৎখাতের পর নির্বাচনী প্রচারণা, সন্তানদের থেকে বিচ্ছিন্নতা, আমার দল আর পরিবারের বিরুদ্ধে চিরুনি অভিযান সব মিলিয়ে আমার শরীর ভেঙে পড়েছিল। ১৯৯২ সালের বসন্তে বুঝতে পারলাম আমি আরেকটি সন্তানের জন্য অপেক্ষা করছি। চার সন্তানের একজন হিসেবে আমি অনুভব করলাম আমাদের পরিবার বাড়বে।

সময়টা অনিশ্চয়তার। করাচিতে সামরিক অভিযানের আদেশ দেয়া হলো। মোহাজির কওমি মুভমেন্ট (এমকিউএম) নামের একটি গোষ্ঠী বোমা ফাটিয়ে রক্তপাত ঘটালো। নাওয়াজ সরকার বিষয়টিকে দেখল পাকিস্তান ভেঙে জিন্নাপুর নামে নতুন একটি রাষ্ট্র গঠনের ষড়যন্ত্র হিসেবে। সামরিক অভিযান শুরু হলে আর্মিরা এই নতুন রাষ্ট্রের ম্যাপ প্রকাশ করল। ধর্মঘট আর রক্তপাতের ফলে অতিষ্ঠ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এই ভেবে যে এমকিউএম-এর নতুন রাষ্ট্র কোনোদিন বাস্তবায়িত হবে না।

আর্মিরা যখন ট্যাংক ও বুলডোজার দিয়ে এমকিউএম-এর বিভিন্ন রাস্তার মুখে তৈরি করা গেট ভেঙে ফেলল, তখন পাকিস্তানে নতুন করে সমস্যা তৈরি হলো। এইসব স্থাপনায় এমকিউএম তাদের বিরোধী লোকজন বন্দি করে রাখত। সৌদি আরবের প্রশাসন নীতি দ্বারা প্রভাবিত হলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি পাকিস্তানকে একটি তাত্ত্বিক রাষ্ট্রে পরিবর্তিত করতে চাইলেন এবং রাষ্ট্রের কারণিক বিধি শক্তিশালী করার জন্য সংসদে বিল পাস করলেন। সিনেটে আমার দল এর বিরোধীতা করেছিল। কিন্তু ঘড়ির কাটা ঠিকই চলছিল। ১৯৯৪ সাল নাগাদ প্রধানমন্ত্রীকে সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে হবে। তিনি তখন পাকিস্তানকে 'ইসলামিকরণ' করবেন। পাকিস্তানকে তাত্ত্বিক রাষ্ট্রে পরিণত করার পরিকল্পনা দেশের অধিকাংশ মানুষ দ্বারা বাধাগ্রস্ত হলো। তারা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম জিন্নাহের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির পক্ষে একত্রিত হলেন। যাইহোক, সেনাবাহিনী সমর্থিত প্রধানমন্ত্রী নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে সমর্থ হলেন।

সাধারণ মানুষের ওপর অর্থনৈতিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতার গ্রাস নেমে এলো। পিপিপি বৈদ্যুতিক লোডশেডিং দূর করেছিল। এই সরকার তা আবার ফিরিয়ে আনল। দুর্নীতির কেলেঙ্কারি সংবাদপত্রের শিরোনাম হতে লাগল। ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর বোমা বিস্ফোরণ দুই দেশের সম্পর্ক খারাপ করে দিল। এই আক্রমণের জন্য নতুন দিল্লি দায়ী করল ইসলামাবাদকে। ১৯৯৩ সালে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে প্রথমবারের মতো আঘাত হানা হলো। তখন পাকিস্তান সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত হবার দ্বারপ্রান্তে।

বিরোধীদলগুলো পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স (পিডিবি) গঠন করল এবং ১৯৯২ সালের নভেম্বরের ১৮ তারিখ রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করল।

আমি এতটাই চিকন ছিলাম যে, কেউ ভাবতেই পারেনি আমার পেটে সন্তান। ওজন কমে যাবার পরেও, অথবা সম্ভবত কমে যাবার কারণেই, আমি সুস্বাস্থ্যবতী এবং উদ্দমী হলো। প্রতিবাদের ডাক আমাকে পুনরুজ্জীবিত করল। সারাদেশের জনগণ একে সমর্থন

www.pathagar.com

জানাল। পাকিস্তানের চারদিক থেকে লোকজন মিছিল করে রাওয়ালপিণ্ডির দিকে রওনা দেয়ার প্রতীক্ষায়, গণমানুষের শাসন ব্যবস্থার দাবি তুলে ধরে। গঠনতন্ত্র পুনরুদ্ধার রাষ্ট্রের ইসলামিকরণ বন্ধ ও রুটি-রুজির অধিকারের দাবি করে।

প্রতিবাদ সভার প্রাক্কালে আমরা জানতে পারলাম সরকার সভা বন্ধ করার জন্য জঘন্য শক্তি প্রয়োগ করবে। 'তার মানে তারা টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করবে'। আমি আমার রাজনৈতিক উপদেষ্টা নাহিদ খানকে বললাম, আমি আমার সন্তানের ব্যাপারে উদ্বিগ্নএ নাহিদ বেরিয়ে গেলেন চশমা জোগাড় করার জন্য। কেউ একজন আর্মিরা ব্যবহার করে এরকম মুখোশের কথা বলেছিল। কিন্তু পরদিন তা আর পাওয়া গেল না। সুতরাং আমরা ভেজা তোয়ালে নিলাম আমাদের সঙ্গে। রাতারাতি আমার বাড়ির বাইরে ভিড় জমে গেল। পরদিন সকালে জেগে দেখলাম বাড়ির চারপাশে কাটাতারের বেড়া। দলের নেতাদের নিয়ে সামনের গেট পার হতে গেলে আমাদের লাঠিপেটা করা হলো। আমাকে রক্ষা করতে গিয়ে দলের সদস্যরা মার খেতে লাগল, অন্যরা কাটাতারের বেড়া টপকাতে চাইল।

আমাদের একটা দল কাঁটাতারের বেড়া ডিঙ্গাতে সক্ষম হলো। একটা গাড়ি পাওয়া গেল। গাড়িতে করে আমরা ইসলামাবাদ থেকে রাওয়ালপিন্ডির দিকে রওনা দিলাম। পথে আমাদের খোঁজে নামা পুলিশের গাড়ি সামনে পড়েছিল এবং আমরা পরিচিতি লুকানোর জন্য মাথা নিচু করেছিলাম। আমাদের একটা গাড়ি হারাতে হয়েছিল কারণ তা কাঁটাতারের বেড়ায় আটকে গিয়েছিল। বেরিক্যাড দেয়া রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার সংখ্যা কম ছিল। আমরা একটা গাড়িকে ঃ২সারা করলাম। গাড়িটা ছিল আমাদের একজন সহানুভূতিশীলের। সে আমাদের জিপটা ব্যবহার করার জন্য দেয়। সৌভাগ্যক্রমে পিএমএল (কাশিম গ্রুপ)-এর নেতা মালিক কাশিম, এয়ার ভাইস মার্শাল আজগর খান, বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী খুরশিদ কাশুরি, আমার রাজনৈতিক উপদেষ্টা নাহিদ খান, তার স্বামী সিনেটর সাফদার আব্বাসী এবং আমার নিরাপত্তা কর্মকর্তা (যিনি ২০০৪ সালে আততায়ীর হাতে নিহত হন) মনোয়ার সোহরাওয়ার্দী জিপে আমাদের দেখতে পান।

কাঁটাতারের বেড়া কেবল ইসলামাদেরই আশপাশে ছিল। যখন আমরা রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রবেশ করলাম জনগণ আনন্দে চিৎকার করে উঠল। স্লোগান দিয়ে তারা আমাদের গাড়ির চারপাশে ভিড় করতে লাগল। আমরা তাদের নিয়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে যেখানে আমাদের সভা হওয়ার কথা সেই লিয়াকতবাগ পার্কের দিকে রওনা হলাম।

পরে পুলিশ আমাকে বলেছিল, তাদের কাছে যখন খবর পৌঁছল যে আমি রাওয়ালপিণ্ডিতে পৌঁছে গেছি, তারা তা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর তারা এতো বেশি টেলিফোন পেয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত বিষয়টি খুঁজে দেখতে নেমে গিয়েছিল। তারা এর সত্যতা খুঁজে পেল। এরপর রাওয়ালপিণ্ডির রাস্তায় পাগলের মতো খোঁজাখুঁজি শুরু হলো। আমাদের একমাত্র জিপের চারদিক থেকে টিয়ার শেল আসতে লাগল। পুলিশের সাইরেন বাজতে লাগল। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের গাড়ি তাড়া করা অনেকটাই জেমস বন্ড ছবির মতো– অথবা বলা যায়, বলিউডি ছবির দৃশ্যের মতো।

লোকজনের ভীড় পুলিশ আর আমাদের জিপের মধ্যে চলে আসতে লাগল। পুলিশ টিয়ার শেল ছুঁড়তে লাগল, তাদের নিনজার মতো পোশাক ছেড়ে বেরিয়ে এসে বেয়নেট চার্জ করতে লাগল লোকজনকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য। টিয়ার শেলের ধোঁয়া চারপাশ ছেয়ে ফেললে আমরা দিক পরিবর্তন করে অন্য রাস্তায় চলে এলাম। আকাশ বাতাস পূর্ণ করে

www.pathagar.com

স্লোগান দিয়ে জনতা আমাদের স্বাগত জানাল। আরও বেশি পুলিশ আনা হলো, সব রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হলো। এখন পুলিশ সরাসরি আমাদের গাড়ির কাঁচ লক্ষ্য করে আমাদের দিকে টিয়ারশেল ছোঁড়া শুরু করলো। গাড়ির কাঁচ ভেঙে গেল। আমাদের গাড়ির চালক অনেক করেছে। অবশেষে সে গাড়ি থামিয়ে লাফিয়ে নেমে ধোঁয়ার মধ্যে হারিয়ে গেল। পুলিশ আমাদের গাড়ি ঘিরে ফেলল এবং আমাদের এ্যারেস্ট করল। পরে আমরা মুক্তি পেয়েছিলাম কিন্তু ওই দিনের কর্মসূচি সরকারকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

যদিও দুটো ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র নেই, টিয়ারগ্যাস খাওয়ার পর আমার গলব্লাডারে ব্যথা হতে লাগল। আমি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিলাম কিন্তু ব্যথা কখনো কখনো চরম আকার ধারণ করতে লাগল। অপারেশন করে যদি ব্যথা কমাতে যাই তবে আমার পেটের সন্তানকে হারাতে হবে। আমি এই রিস্ক নিতে চাইলাম না। ব্যাথা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে অসহনীয় হলে আমি লন্ডনে উড়ে গেলাম। সেখানে ডাক্তার আমাকে বলল, যত দ্রুত সম্ভব আমি যেন গলব্লাডার অপসারণের জন্য 'কী-হোল' সার্জারি করে সঙ্গে সঙ্গে সিজার করি। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পোর্টল্যান্ড হাসপাতালে ছোট্ট শিশু আসিফা জন্ম নিলো। ছোট্ট শিশুটিকে আমি কোলে তুলে নিলাম।

যদিও আমি তখনো জানি না আসিফা জন্ম নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি থেমে যাবে। ১৯৯৩ সালের ২৪ অক্টোবর পিপিপি পুনর্নির্বাচিত হলো। পাকিস্তানের পুনরাবৃত্তির রাজনীতিতে আমার দ্বিতীয় সরকারকে অগণতান্ত্রিকভাবে উৎখাত করা হয়েছিল ১৯৯৬ সালে এবং আমার স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, যখন সে ২০০৪ সালের নভেম্বরে মুক্তি পেল, তখন আমি সন্তান ধারণের বয়স পেরিয়ে গেছি।

আমরা যখন আসিফার জন্ম উদযাপন করছিলাম, তখন আমি খুব একটা জানতে পারিনি যে আমার মা ধীরে ধীরে আলজাইমার রোগে আক্রান্ত হচ্ছিলেন। এই রোগের সঙ্গে তার যুদ্ধ চলছিল অনেকদিন থেকে, সেই ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে যখন আমরা লাহোরে ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। তখন জেনারেল জিয়ার পুলিশ আমাদের ওপর বেয়নেট চার্জ করেছিল। মা'কে নির্দয়ভাবে পিটানো হয়েছিল এবং তিনি মাথায় চরম আঘাত পেয়েছিলেন। এরপরে তাকে আগের মতো পাওয়া যায়নি। কিন্তু এখনকার অবনতি নাটকীয়ভাবে এলো এবং আমাদের হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলো।

আমি দেখেছি আমার চমৎকার সুন্দরী মাকে, যিনি অসম্ভব প্রাণবন্ত মায়াবী একজন মানুষ তিনি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছিলেন। এই শক্ত সামর্থ মহিলা, যিনি সামরিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং যিনি ছিলেন নারী অধিকারের একজন অগ্রদূত, তিনি এখন আর কাউকে চিনতে পারেন না এবং কথাও বলতে পারেন না। তিনি আমাকে বলতে পারেন না তিনি খুব ক্ষুধার্থ বা তার খুব ব্যথা হচ্ছে। আমার সেই দৃঢ়চেতা মা এখন কতটা অসহায়- এসব দেখে আমার খুব কষ্ট হতে লাগল। তবে আমি ধন্য যে তার মতো একজন মানুষ আমার জীবনে পেয়েছি। তার উপস্থিতিই আমাকে শক্তি যোগায়। আমাদের পরিবারে, আমাদের প্রাপ্ত শান্তিতে, ভালবাসায় যা আমাদের বেঁধে রেখেছে, সেইসব উত্থান-পতনে যা আমরা মোকাবেলা করেছি এবং আমাদের আনন্দ বেদনায় তিনিই জীবন্ত যোগসূত্র।

আসিফের দীর্ঘ বন্দিত্ব আমাদের পরিবারের জন্য ছিল বেদনাদায়ক। শৈশবের গঠনমূলক সময়ে আমার সন্তানদের তাদের বাবাকে কাছে পাওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করা

www.pathagar.com

যায় না। এই ক্ষতি কিছুতেই পোষানো যায় না। কিন্তু এটি আমাদের সমাজে প্রচলিত লিঙ্গবাদের আরেকটি উদাহরণ। কোনো প্রকার দোষ ছাড়াই কোনো নারীকে আট বছর জেলে আটকে রাখা হলে স্বামীর রাজনৈতিক জীবনের জন্য কোনো ক্ষতি বয়ে আনবে? সম্ভবত নয়। কিন্তু এরকম কিছু একটা আমাদের মেনে নিতে হয়। মুক্তির পর আসিফের বড় ধরনের হার্ট অ্যাটাক হয় যা তাকে প্রায় মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিল।

বাইরে থেকে পাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই, যে সমস্যা এখন পাকিস্তানে বিরাজিত, তা যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি। আমি নিশ্চিত যে, পশ্চিমারা যদি পাকিস্তানে সামরিক শাসকদের উস্কায় বা সমর্থন যোগায় বা জনতার স্বাধীনতাকে অবদমিত করে রাখে তাহলে ইসলামের নামে তালেবান বা আল-কায়েদার উত্তরসুরি- কোনো প্রজন্ম জঙ্গী গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটবে যারা পশ্চিমাদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে যাবে। শুধু যে পাকিস্তানিরাই উদার গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধান চায় তাই নয়, সারা বিশ্বের মানুষ যারা সভ্যতার দ্বন্দ্ব পরিহার করতে চায়, তারাও তাই চায়।

যদিও লন্ডনে বসে আমি লিখছি, আমি অবশ্যই স্বীকার করি যে, আমার জীবন যতটা কঠিন ততটাই মজার। আমি এক বাক্স থেকে আরেক বাক্সে বাস করি, ইসলাম, গণতন্ত্র বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে, ব্যবসায়ীদের সংগঠন, নারী সংগঠন এবং বিদেশ নীতি নির্ধারকদের সামনে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াই। আমি হাউস অব কমন্স ও কংগ্রেসে যাতায়াত করি। আমি পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান। আমি নিউইয়র্কে চিকিৎসাধীন আমার স্বামীকে দেখতে যাই। দুবাইয়ে পরীক্ষার জন্য আমার সন্তানদের প্রস্তুত করি। আমি পাকিস্তানের ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধীদলগুলোর জোটের নেতৃত্ব দেই, পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য শুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য। ২০০৭ সালের নির্বাচনের সংগ্রামে। সব কিছু মিলিয়ে মনে হতে পারে অনেক কিছু। কিন্তু এই আমার প্রকৃতি, আমি তা গ্রহণ করে নিয়েছি। এই আত্মজীবনী প্রকাশিত হবার পর, এই বইয়ের শেষ অধ্যায় 'প্রাইম মিনিস্টার এন্ড বিয়ন্ড'-এ এইসব ঘটনাবলি বর্ণিত হতে পারে।

আমি সম্মানিত এবং আশীর্বাদপুষ্ট। আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে, আমি আমার মাতৃভূমিতে ফিরে যাব এবং আবার নির্বাচনের যুদ্ধ ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের শক্তিগুলোর নেতৃত্ব দেবো- স্বৈরশাসকদের, জেনারেল এবং উগ্রবাদীদের কুক্ষিগত ক্ষমতার বিরুদ্ধে। এই আমার নিয়তি। এবং যেহেতু একদা জন এফ কেনেডি বলেছিলেন, 'আমি ওই দায়িত্ব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারব না, আমি তাকে স্বাগত জানাই।'

বেনজির ভুট্টো

লন্ডন

এপ্রিল, ২০০৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ডটার
অব দ্য
ইস্ট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১

যেভাবে আমার বাবাকে হত্যা করা হলো

১৯৭৯ সালের ৪ এপ্রিল। রাওয়ালপিন্ডি সেন্ট্রাল জেলে খুব ভোরে ওরা আমার বাবাকে হত্যা করে। সিহালার এক পরিত্যক্ত পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আটক অবস্থায় আমার বাবার মৃত্যুর মুহূর্তগুলো অনুভব করছিলাম। ঘুমের ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও মা আর আমি উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে রাতটি তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে পার করলাম। হঠাৎ রাত ২টায় বিছানায় সোজা হয়ে বসলাম। আমার কণ্ঠে 'না' চিৎকার আটকে গেল। আবার চেষ্টা করলাম 'না' চিৎকার করতে। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না, নিঃশ্বাস নিতে চাইওনি। বাবা! বাবা! আমার ঠাণ্ডা লাগছে। খুব ঠাণ্ডা লাগছে অনেক গরমের মধ্যেও। আমার শরীর কাঁপছে। মা ও আমি, কেউ কারো সঙ্গে কোনো কথা নেই। একে অপরকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা কারো জানা নেই। ফাঁকা পুলিশ কোয়ার্টারে মা আর আমি পাশাপাশি বসে সময়টা কোনোরকমে পার করলাম। সকালে আমরা বাবার লাশ পিতৃপুরুষের পারিবারিক গোরস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছি। এক সময় ফাঁকা পুলিশ কোয়ার্টারে কেউ আসার শব্দ পেলাম। মা বললেন, তুমি যাও আমি ইদ্দত পালন করছি, আমি এখন বাইরের কারো সঙ্গে কথা বলতে পারবো না। মা তখনই বিধবাদের পালনীয় চার মাসের ইদ্দত শুরু করেছেন এবং এর প্রথম দশ দিন তিনি বাইরের কারো সঙ্গে কথা বলবেন না।

আমি হেঁটে গেলাম সিমেন্টের ফাঁটা মেঝের কক্ষে। যেটা মনে হলো আমাদের বসার কক্ষ। এক বিশ্রি পঁচা গন্ধ চারদিকে।

আমার সামনে দাঁড়ানো ভীত-কম্পমান জুনিয়র জেলারকে বললাম, 'আমরা প্রধানমন্ত্রীর সাথে যেতে প্রস্তুত।'

সে বললো, ইতিমধ্যে তাকে কবর দেয়ার জন্য তারা নিয়ে গেছে।

মনে হলো যেন সে আমাকে প্রচণ্ড এক আঘাত করল। জানতে চাইলাম 'অর্থাৎ... তার পরিবারকে ছাড়াই? এমনকি তোমার সামরিক শাসক অপরাধীরাও জানে, আমাদের পরিবারের নিয়ম হল মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যাওয়া, মৃতের জন্য দোয়া করা, মাটি দেয়ার পূর্বে তার মুখটা একবার দেখা।' আমরা জেল কর্মকর্তাকে অনুরোধ করলাম.....।

www.pathagar.com

সে আবার বললো, 'তাকে নিয়ে গেছে।'

'নিয়ে গেছে কোথায়?'

জেলার নীরব।

শেষে সে উত্তর দিল, 'খুব শান্তি'। 'যা উনি রেখে গিয়েছেন সেসব আমি নিয়ে এসেছি।'

তিনি একটা একটা করে বাবার ব্যবহারের জিনিসপত্রগুলো আমাদের দিচ্ছিলেন– বাবার কুর্তা, লম্বা শার্ট ও ঢোলা পাজামা– বুক স্তব্ধ হয়ে আসলো। এগুলো বাবা তার জীবনের শেষ দিনগুলোতে ব্যবহার করেছেন, স্পর্শ করেছেন। রাজনৈতিক বন্দি হলেও জিয়াউল হকের আদালতে তার শাস্তি ঘোষণার পর জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে কয়েদীর পোশাক পরাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাবা সে পোশাক পরতে অস্বীকৃতি জানান। বরং বাবা তার নিজের পোশাক পরতেন। এই তো বাবার টিফিন বাক্স, মৃত্যুর দশ দিন আগ থেকে তিনি এটা আর ব্যবহার করেননি, প্রয়োজন হয়নি, এই দশদিন তিনি অনশন করেছিলেন। রোল করা বিছানা, বাবা এতে শুতেন। লোহার খাটে শুয়ে খাটের তারে তার পিঠে ঘা হয়ে গিয়েছিল, তখন তাকে এই রোল করা বিছানাটা ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়। এইতো তার পানি খাওয়ার কাপ।

এবার কোনোরকমে জেলারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তার আংটি কোথায়?'

'তার কোনো আংটি ছিল?' জেলার উত্তর দেয়। মাছের চোখের মতো তার চোখ দুটো ছোট হয়ে এলো। পিট পিট করতে করতে জেলার তার ব্যাগ ও তার পকেটে লোক দেখানো খোঁজা শুরু করলো। অবশেষে আংটিটি বের করে দিল। শেষের দিকে বাবার সরু হয়ে যাওয়া আঙুল থেকে আংটিটি খুলে পড়ে যেত।

'শান্তি'। খুবই শান্তিতে সবকিছু হয়েছে।' জেলার বিড় বিড় করতে থাকে। বুঝলাম জেলার বাবার শেষ সময়ের কথা বলছে। শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি– ফাঁসি শান্তিদায়ক হয় কিভাবে?

বশির ও ইব্রাহীম, আমাদের পরিবারের কাজের লোক, আমাদের সঙ্গেই জেলে আছে, কারণ কর্তৃপক্ষ আমাদের খাবার সরবরাহ করতো না, ওরাই আমাদের বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসতো। বশিরের মুখ সাদা হয়ে গেল বাবার কাপড়-চোপড় দেখে। '*হায় আল্লাহ! হায় আল্লাহ!* ওরা সাহেবকে মেরে ফেলেছে! ওরা তাঁকে হত্যা করেছে! সে চিৎকার করে উঠল। তাকে থামানোর আগেই সে একটা পেট্রোলের পাত্র থেকে তার গায়ে পেট্রোল ঢেলে দিল, আগুন ধরিয়ে দেয়ার জন্য। মা দৌড়ে এসে তাকে থামালেন।

আমি দাঁড়িয়ে টলছি, যা ঘটেছে–অবলীলায় যে নির্দয় নৃশংসতা সম্পন্ন হয়েছে– তা বিশ্বাস করতে পারছি না, বিশ্বাস করতেও চাচ্ছি না। পাকিস্তানের প্রথম জনগণের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো আর নেই। যে দেশে আর্মির জেনারেলদের দাপট, যারা ১৯৪৭ সাল থেকে পাকিস্তান শাসন করেছে, সেখানে বাবা প্রথম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেখানে মানুষ শতবর্ষ ধরে গোত্রীয় প্রধান ও ভূস্বামীদের দয়ায় বসবাস করছে সেখানে তিনি পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন, জনগণের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। যেখানে মানুষকে আর্মি জেনারেলদের শাসন অবসান করতে আন্দোলন ও রক্ত দিতে হয়েছে বার বার। আর সে রাষ্ট্রে তিনি সংসদীয় সরকার পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা ও প্রতি পাঁচ বছরে নির্বাচন নিশ্চিত করেছেন।

www.pathagar.com

কি করে সম্ভব! জয় ভুট্টো। ভুট্টো দীর্ঘজীবী হোক! ধ্বণিতে জনতা, জীবনের উল্লাসে মেতে উঠলো– এই প্রথম একজন রাজনৈতিক নেতাকে তাদের কাছে পেয়ে। যখন তিনি পাকিস্তানের অবহেলিত ও দূর-দুরান্তের গ্রামগুলো পরিদর্শন করতেন, যখন তার পাকিস্তান পিপলস পার্টি নির্বাচিত হলো, আধুনিকায়ন কর্মসূচি শুরু করলেন– সামন্তবাদীদের কুক্ষিগত ভূমি দরিদ্রদের বিতরণ, লাখ লাখ শিক্ষা বঞ্চিত মানুষকে শিক্ষিত করা, দেশের বড় বড় শিল্প কারখানা জাতীয়করণ, ন্যূনতম বেতন নিশ্চিতকরণ, চাকরির নিশ্চয়তা এবং নারী ও সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য নিষিদ্ধ করা। তার ছয় বছরের সরকার, অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি দেশকে এক আলোর পথে নিলো।

জিয়াউল হক। বাবার বিশ্বস্ত সেনা কর্মকর্তা হওয়ার কথা যার, সে মধ্যরাতে তার সৈনিকদের পাঠালো বাবাকে ক্ষমতাচ্যুত এবং জোর করে দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করতে। সামরিক শাসক জিয়াউল হক তার সকল অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক শাসন থাকা সত্ত্বেও হাজার চেষ্টা করেও আমার বাবার অনুগামীদের ধ্বংস এবং মৃত্যুকক্ষে একাকিত্বের মধ্যেও বাবার মনোবল ভেঙে দিতে ব্যর্থ হয়। জিয়াউল হক, উদ্ধত জেনারেল, আমার বাবাকে হত্যা করেছে। জিয়াউল হক নয় বছর পাকিস্তানকে শাসন করেছে নির্মমভাবে।

বাবার সবকিছু নিয়ে ছোট পোটলাটি ধরে সোজা হয়ে জুনিয়র জেলারের সামনে দাঁড়ালাম। এখনও বাবার পোশাক থেকে তার ব্যবহৃত সুগন্ধি শালিমারের সুবাস পাচ্ছি। রেডক্লিফে কেথলিন কেনেডির কথা মনে করে বাবার কুর্তা বুকে চেপে ধরলাম। সে তাঁর বাবার মৃত্যুর অনেক পরেও তার বাবার ব্যবহৃত পানি নিরোধক গরম জ্যাকেট পরেছে। আমাদের দু'পরিবারকে সবসময়ই রাজনৈতিক পরিভাষায় এক করে দেখা হয়েছে। আর এখন আমাদের মধ্যে একটা ভয়ানক আত্মিক বন্ধন গড়ে উঠলো। সেই রাতে এবং আরো অনেক রাতে বাবার শার্ট বালিশের নিচে রেখে ঘুমিয়েছি বাবাকে অনুভব করার জন্য। এখন সম্পূর্ণ একা মনে হয় আমাকে। আমার জীবনটা ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। দু'বছর ধরে আমি কিছুই করতে পারিনি শুধুমাত্র জিয়ার সামরিক শাসনের আনিত বানোয়াট অভিযোগের বিরুদ্ধে আমাকে সংগ্রাম করে যেতে হয়েছে। সামরিক অভ্যুত্থানের পর জেনারেল জিয়ার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক নির্বাচনের জন্য আমাকে পাকিস্তান পিপলস পার্টিতে কাজ করতে হয়েছে। পরে অবশ্য আমাদের আসন্ন বিজয়ের আশঙ্কায় জিয়া নির্বাচন বাতিল করে। সামরিক শাসক আমাকে ছয়বার বন্দি করেছে, আমাকে করাচি ও লাহোরে যেতে বারবার বাধা প্রদান করেছে। মা'কেও বাধা দেয়া হয়েছে একইভাবে। পিপিপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন হওয়ায় মা'কে আটবার বন্দি করা হয়েছে। রাওয়ালপিন্ডিতে বন্দি থাকার ছয় মাস আগে আমাদের ছয় সপ্তাহ বন্দি থাকতে হয়েছে। এরপরও গতকাল পর্যন্তও বিশ্বাস করতে পারিনি জেনারেল জিয়া বাবাকে সত্যি সত্যিই হত্যা করবে।

লন্ডনে রাজনৈতিক নির্বাসনে থেকে বাবার মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে লড়াইরত আমার ভাইদের এই সংবাদটি কে পৌঁছে দেবে? বাবাকে যে ফাঁসি দেয়া হয়েছে? কে একথাটা বলবে? আমার বোন সনমকে, যে হার্ভার্ডে শেষ বর্ষে আছে? আমি সনমের ব্যাপারে বিশেষ করে চিন্তিত ছিলাম। সে কখনোই রাজনীতিতে ছিল না তবুও তাকে এই করুণ পরিণতি ভোগ করতে হচ্ছে। এখন সে একা, আমার প্রত্যাশ্যা সে কোনো বোকামি করবে না। মনে হচ্ছে আমার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এই যন্ত্রণা কিভাবে সহ্য করব?

সকল চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা পারলাম না বাবাকে বাঁচিয়ে রাখতে। আমার খুব একা লাগছে। খুবই একা লাগছে। তোমার সাহায্য ছাড়া আমি কি করব বাবা? তার ফাঁসির সেলে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তার রাজনীতি সম্পর্কে উপদেশ দরকার, যদিও হার্ভার্ড ও অক্সফোর্ড থেকে রাজনীতি বিজ্ঞানে ডিগ্রি নিয়েছি, আমি তো রাজনীতিবিদ নই। কিন্তু তিনি কিইবা বলতে পারতেন? অসহায় হয়ে শুধুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে ছিলেন।

গত পরশুও আমি শেষবারের মতো বাবাকে দেখেছি। সাক্ষাতের সেই কষ্ট অসহনীয়। কেউ তাকে জানায়নি যে, পরদিন সকালে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। এমনকি বিশ্ব নেতৃবৃন্দকেও না। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ যারা সামরিক শাসকের কাছে এ বিষয়ে স্পষ্টতা প্রত্যাশা করেছিলেন– তাদের মধ্যে জিমি কার্টার, মার্গারেট থেচার, লিওনিড ব্রেজনেভ, পোপ জন পল দ্বিতীয়, ইন্দিরা গান্ধী এবং আরো অনেকে, সারা মুসলিম বিশ্ব থেকে, সৌদি আরব, ইউনাইটেড আরব আমিরাত, সিরিয়া। জিয়া সরকারের কোনো কাপুরুষই বাবার মৃত্যুদণ্ডের তারিখ ঘোষণা করেনি, কারণ তারা ভয়ে ছিল যে প্রধানমন্ত্রীর হত্যায় জনগণ উত্তেজিত হয়ে পড়বে। শুধু আমি আর মা জানতাম। আর তা ছিল ঘটনাক্রম আর কিছুটা ছিল আমাদের অনুমান।

২রা এপ্রিল খুব সকালে শুয়ে আছি। মা আমার কক্ষে ঢুকে আমাকে পিংকি বলে ডাকলেন, পিংকি আমার পরিবারের ডাক নাম, কিন্তু এমন সুরে যে, আমার শরীর তক্ষুণি শক্ত হয়ে গেল। 'বাইরে সামরিক অফিসাররা অপেক্ষা করছেন। তারা বললেন, আমাদের দু'জনের আজকেই আমার বাবাকে দেখতে যাওয়া উচিত। এটা বলার অর্থ কি? আমি ঠিকই বুঝেছিলাম এর অর্থ। আমার মাও। কিন্তু আমরা কেউই এর অর্থটাকে মেনে নিতে পারছি না। আজ অবশ্য মা'র দেখা করার দিনও। তার সপ্তাহে একবার দেখা করার অনুমতি ছিল। আর আমার দেখা করার কথা এই সপ্তাহের শেষের দিকে। ওরা চাচ্ছে আমরা দু'জনেই এক সঙ্গে দেখা করি, তার মানে এটা শেষ দেখা। জিয়া বাবাকে হত্যা করতে যাচ্ছে।

আমার মন উত্তাল হয়ে উঠল। সংবাদটা বাইরে পাঠাতে হবে, শেষ আহ্বান করতে হবে আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ ও পাকিস্তানের জনগণের কাছে। সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। 'ওদের বলো, আমি অসুস্থ', ত্বড়িৎ মা'কে বললাম। বলো যদি এটা শেষ সাক্ষাৎ হয় তবে অবশ্যই আসব, কিন্তু যদি তা না হয় তবে কাল যাব।' মা যখন প্রহরীদের সাথে কথা বলতে গেলেন তখন তাড়াতাড়ি আগে লেখা চিঠিটা খুলে নতুন আরেকটা লিখে ফেললাম। আমার মনে হয় তারা শেষ দেখারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। বাইরের এক বন্ধুকে হিজিবিজি করে লিখে বার্তা পাঠালাম এই প্রত্যাশায় যে, সে দলের নেতৃবৃন্দকে সতর্ক করে দেবে এবং তারা বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক ও নেতৃবৃন্দকে জানাবে এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবে। জনগণই আমাদের শেষ ভরসা।

এটা এক্ষুণি ইয়াসমিনকে দিয়ে এসো, আমাদের বিশ্বস্ত কাজের লোক ইব্রাহিমকে বললাম। বেশি ঝুঁকি নিচ্ছি জেনেও ইব্রাহিমকে দিয়েই পাঠালাম। আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বা কিছু পয়সা-কড়ির বিনিময়ে যাদের দিয়ে কাজ করানো যায়। ওই সকল সরকারি নিরাপত্তারক্ষীর জন্য অপেক্ষা করার সময় নেই। ইব্রাহিমকে হয়তো গেটে আটকে দেয়া হতে পারে। তাকে তন্ন তন্ন করে সার্চ করতে পারে। বিপদ খুব বেশি, বাধাও অনেক। 'যাও, ইব্রাহীম, যাও! তাকে বললাম। প্রহরীদের বলো যে, আমার জন্য ওষুধ আনতে যাচ্ছ!' এবং সে দৌড়ে গেল।

www.pathagar.com

জানালা দিয়ে দেখলাম, সেনা কর্মকর্তারা কথা বলছে, তারা খবরটা পৌঁছে দিচ্ছে ওয়ারলেসের মাধ্যমে যে আমি অসুস্থ। এবং উত্তর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। ঘোরের মধ্যেই ইব্রাহিম পৌঁছে গেছে গেটের কাছে। 'তাড়াতাড়ি বেনজির সাহিবার জন্য ওষুধ আনতে হবে! খুব তাড়াতাড়ি!' যে প্রহরী আমার অসুস্থতার কথা ওয়ারল্যাস করেছিল তাকে সে বলল। আশ্চর্য, তারা তাকে যেতে দিল, পাঁচ মিনিট পরেই মা কক্ষে ঢুকলেন। আমার হাত-পা কাঁপছে। আমার কোনো ধারণাই নেই খবরটা নিরাপদে পৌঁছবে কিনা।

জানালার বাইরে ওয়ারলেস সেট বেজে উঠল। যেহেতু আপনার মেয়ে অসুস্থ, আপনারা কাল দেখা করতে পারেন, কর্তৃপক্ষ মা'কে বলল। আমরা আরো চব্বিশ ঘণ্টা সময় পেলাম বাবার জীবনের। ইব্রাহিম বের হয়ে যাওয়ার পর যখন গেট বন্ধ করে দেয়া হলো, আমরা বুঝলাম ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

লড়াই। আমাদের লড়াই করতে হবে। কিন্তু কিভাবে? বাবা মৃত্যুমুখে, আমরা চার দেয়ালের মধ্যে। খুবই শক্তিহীন মনে হলো নিজেকে। খবরটা কি পৌঁছবে? জনগণ কি গুলি আর বেয়নেটকে উপেক্ষা করে জেগে উঠবে, সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের পর থেকে তারা যা সহ্য করে আসছে? কে তাদের নেতৃত্ব দেবে? পাকিস্তান পিপলস পার্টির অনেক নেতাই এখন জেলে। আমাদের হাজার হাজার সমর্থক– পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম নারীসহ জেলে বন্দি। বাবার নাম উচ্চারণ করার জন্য কত লোকের ওপর টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হয়েছে এবং নির্মমভাবে প্রহার করা হয়েছে তার হিসেব নেই। তাদের অর্ধউলঙ্গ করে পিটিয়ে শরীর ক্ষত করে দেয়া হয়েছে। জনতা কি কর্ণপাত করবে এই শেষ আহ্বানে? তারা শুনবে কি?

সকাল ৮-১৫-এ আমি আর মা রেডিওতে বিবিসি এশিয়া বার্তা শুনছি। শরীরের সকল পেশী শক্ত হয়ে গেল। আশা নিয়ে বসে আছি, যে বার্তাটি কারাগার থেকে পাঠিয়েছি সে বার্তাটি কখন বিবিসি থেকে বলবে, আগামী ৩রা এপ্রিল বাবার সঙ্গে আমাদের শেষ সাক্ষাত। সংবাদটা পৌঁছে গেছে। অপেক্ষা করছি বিবিসি'র পরবর্তী ঘোষণার জন্য, জনগণের প্রতি আমাদের আহ্বান সম্পর্কে কিছু বলে কিনা বা জনগণ এই বিষয়ে কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে। না সেরকম কিছুই বলা হলো না। বরং বিবিসি থেকে বলা হলো, এই খবরের বিষয়ে কারা কর্তৃপক্ষ থেকে কোনো সমর্থন পাওয়া যায়নি। 'তিনি ভীত' বাবার প্রাক্তন মন্ত্রী পরিষদের একজন বলেছেন বলে উদ্ধৃত করা হলো মাত্র বিবিসিতে। মা আর আমি কারো দিকে তাকাতে পারছি না। আমাদের শেষ আশাও উবে গেল।

একটা দ্রুতগতির জিপ এলো। মানুষ এখন নিরাপত্তা বাহিনীর ভয়ে ভীত, তারা জানে না তাদের প্রধানমন্ত্রীর ভাগ্যে কি আছে। কারাগারের গেট হঠাৎ খুলে গিয়ে আবার বন্ধ হয়ে গেল। সিহালা জেল ত্যাগ করার সময় এবং আবার রাওয়ালপিন্ডির কারাগারে ঢোকার সময় মহিলা মেট্রন আমাদের ভালভাবে সার্চ করলো।

'দু'জনে একসাথে এখানে?' বাবা কারা কক্ষ থেকে বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন। মা কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

'এই কি শেষ দেখা?' তিনি জিজ্ঞেস করেন। মা উত্তর দিতে পারছে না। অবশেষে

www.pathagar.com

আমি বললাম, 'আমার তাই মনে হয়'। তিনি আমাদের কাছাকাছি দাঁড়ানো জেল কর্তৃপক্ষের একজনকে ডাকলেন। তারা কখনই আমাদের একলা বাবার পাশে রেখে চলে যেত না।

'এটাই কি শেষ দেখা?' বাবা জানতে চান তার কাছে। উত্তর আসে 'হ্যাঁ'। মনে হলো জেল সুপারিন্টেডেন্ট কথাটা বলতে লজ্জা পেলেন।

'দিন ধার্য করা হয়েছে?'

'আগামীকাল ভোরবেলায়', সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলল।

'ক'টার সময়?

'ভোর পাঁচটায়, কারা নিয়ম অনুযায়ী।'

'কখন তথ্যটা পেয়েছেন?'

'গতরাতে'। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে বলে।

বাবা তার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

'আমার পরিবারের সাথে কতটা সময় পাব?'

'আধা ঘন্টা'।

কারা নিয়ম অনুযায়ী আমরা একঘন্টা পেতে পারি, বাবা বললেন।

'আধাঘন্টা' সুপারিন্টেন্ডেন্ট আবার বলে। এরকমই আমাকে আদেশ করা হয়েছে।

'আমার গোসলের ও শেভের ব্যবস্থা করুন', বাবা তাকে বললেন।

'পৃথিবীটা সুন্দর, আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বিদায় নিতে চাই।'

আধাঘন্টা। মাত্র আধা ঘন্টা সময় পাব এমন এক ব্যক্তিকে বিদায় জানাতে যাকে আমি সকলের চেয়ে বেশি ভালবাসি। আমার বুকের কষ্টটা পাপবোধ মনে হয়। আমি কাঁদব না। আমি ভেঙে পড়ব না। বাবার মৃত্যুকে জটিল করে তুলব না।

তার কক্ষে একমাত্র আসবাব মাটিতে পাতা তোষকের উপর তিনি বসে আছেন। তারা তার ব্যবহারের টেবিল, চেয়ার সরিয়ে নিয়ে গেছে। তার বিছানাটাও।

আমি যে সকল ম্যাগাজিন ও বই তার জন্য এর আগে এনেছিলাম সেগুলো আমার হাতে ফেরত দিয়ে তিনি বলেন, 'এগুলো ধর। আমি চাইনা আমার জিনিসপত্র এরা স্পর্শ করুক।'

তার উকিল যে চুরুটগুলো তাকে দিয়েছিলেন ওগুলো আমাকে ফেরত দিয়ে বললেন, 'আজ রাতের জন্যে একটা রাখব।' তিনি তার প্রিয় সুগন্ধী শালিমারের বোতল রেখে দিলেন।

তিনি তাঁর আংটি আমাকে দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মা ওটা তার কাছে রেখে দিতে বলেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে, এখন রাখছি। আমি এটা এদের কাছে রেখে যাব। কিন্তু আমি চাই এটা বেনজিরের হোক।

কারা কর্তৃপক্ষ যেন শুনতে না পায় সেজন্য বাবার কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে আমাদের উদ্যোগের কথা সংক্ষেপে তাকে আমি বলি, তিনি সন্তুষ্ট হলেন। আমি রাজনীতি পুরোপুরি আয়ত্ব করেছি তার অভিব্যক্তিতে সে কথাই বললো। ডেথ সেলের আলো ছিল ক্ষীণ। পরিষ্কার দেখা যায় না। এর আগে প্রত্যেক সাক্ষাতে ওরা আমাদের তার সেলের ভেতরে পাশাপাশি বসে কথা বলতে দিয়েছে। কিন্তু আজকের পরিবেশ ভিন্ন আমি আর মা তার সেলের দরজার চৌকাঠে সেঁটে দাঁড়িয়ে তার সাথে কথা বলছি।

'অন্য ছেলেমেয়েদের আমার ভালবাসা দিও'। তিনি মা'কে বললেন। মীর, সানী ও

www.pathagar.com

শাহকে বলো আমি একজন আদর্শ পিতা হতে চেষ্টা করেছি আর আমি ওদের বিদায় জানাচ্ছি। মা মাথা নাড়েন কথা বলতে পারেন নি।

'আমার জন্য তোমরা অনেক কষ্ট ভোগ করেছ, বাবা বলেন। যেহেতু ওরা আজ রাতে আমাকে হত্যা করতে যাচ্ছে, আমি তোমাদের মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি। যদি তোমরা চাও, তবে পাকিস্তান ত্যাগ করতে পার যেহেতু সংবিধান ভেঙে পাকিস্তানে সামরিক শাসন আরোপ করা হয়েছে। যদি মানসিক শান্তি ও জীবনে বাঁচতে চাও তবে ইউরোপে যেও। আমি অনুমতি দিচ্ছি, যাও।'

আমাদের হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। 'না, না' মা বলে ওঠেন, 'আমরা যাব না। কখনো যাব না। জেনারেলদের ভাবা উচিত নয় তারা জয়লাভ করেছে। আবার নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করেছে জিয়া, যদিও, কে জানে সে পারবে কিনা? আমরা চলে গেলে তোমার দলকে নেতৃত্ব দেয়ার কেউ থাকবে না।'

'আর পিংকি, তুমি?' বাবা জানতে চান। আমি বলি, 'কখনই যাব না'। বাবা হাসেন। 'আমি খুব খুশি। তুমি তো জানো, আমি তোমাকে কতটা ভালবাসি। কতটা তোমাকে ভালবেসেছি। আমার রত্ন তুমি। তুমি সর্বদাই তাই।'

সময় শেষ, সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলেন। সময় শেষ।

আমি চৌকাঠ আঁকড়ে ধরি। দরজা খুলে দাও, তাকে বলি। আমি বাবাকে বিদায় জানাবো। সুপারিন্টেন্ডেন্ট অনুমতি দেয় না। দয়া করে খুলুন। অনুরোধ করি। আমার বাবা পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। আমি তার মেয়ে। এটাই আমাদের শেষ দেখা। বাবাকে আমি জড়িয়ে ধরবো।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট অস্বীকৃতি জানায়। আমি লোহার গরাদের মধ্য দিয়ে তাকে স্পর্শের চেষ্টা করি। বাবা অনেক শুকিয়ে গেছে, ম্যালেরিয়া, আমাশয়, আনাহারে ভুগেছে। কিন্তু নিজেকে দৃঢ় রেখে আমার হাত স্পর্শ করেন।

'আমি আজ রাতেই মুক্তি পাবো।' তিনি বলেন, তার মুখে রক্তিমাভা। 'বাবা ও মা'র কাছে ফিরে যাচ্ছি। লারকানার মাটির গন্ধ ও বাতাসের অংশ হতে আমার পূর্ব পুরুষের ভিটায় ফিরে যাচ্ছি। এখানে আমার জন্য সঙ্গীত রচিত হবে। আমি লৌকিক উপাখ্যানের অংশ হবো। তিনি একটু থেমে আবার বলেন, 'কিন্তু লারকানা অনেক উষ্ণ।'

আমি ছাউনি তৈরি করে দেব। আমি কোনো রকমে বলি।

কারা কর্তৃপক্ষ যেতে বলে। বিদায় বাবা, আমি বাবাকে বলি, যখন মা লোহার গারদের মধ্য দিয়ে বাবাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করছিলেন। মা পিছু পিছু এগোন। আমরা দু'জনে নোংরা আঙিনা দিয়ে হাঁটছি। আমি পেছনে তাকাতে চাই কিন্তু পারি না। আমি জানি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। আমাদের আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত। আমি যেন তাকে ডাকতে শুনি।

কোনো রকমে আমার পা'গুলোকে নাড়াতে চেষ্টা করছি। পা অনুভব করতে পারছি না। একেবারে পাথর হয়ে গেছি। কিন্তু তারপরও নড়তে চেষ্টা করছি। কারা কর্তৃপক্ষ কারা ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সৈন্য তাবুতে জেলের আঙিনা পূর্ণ। আমি যেন ঘুমের ঘোরে হেঁটে যাচ্ছি, শুধুই মাথাটা একটু ঠিক আছে। ঘোরের মধ্যে হলেও আমাকে মাথা ঠিক রাখতে হবে। ওরা সবাই আমাদের দেখছে।

তালাবদ্ধ জেল-গেটের ভিতরেই গাড়ি অপেক্ষা করছে যাতে বাইরের জনতা আমাদের

www.pathagar.com

দেখতে না পায়। আমার শরীর খুব ভারি হয়ে গেছে, উঠতে কষ্ট হচ্ছে। গতি বাড়িয়ে গেটের মধ্যে দিয়ে গাড়ি বাইরে চলে গেল। জনতা দেখতে পেয়ে আমাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী তাদের পেছনে হটিয়ে দেয়। হঠাৎ আমার বন্ধু ইয়াসমিনকে জনতার মধ্যে দেখতে পেলাম, বাবাকে খাবার দেয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। ইয়াসমিন, ওরা বাবাকে আজ রাতে হত্যা করতে যাচ্ছে! আমি জানালা দিয়ে চিৎকার করে বলি। সে কি শুনতে পেয়েছে আমার কথা? আমি কি আদৌ কোনো শব্দ করতে পেরেছি?

৫টা বেজে ৬টা হল। প্রতিটা নিঃশ্বাস আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে বাবার শেষ নিঃশ্বাস। 'আল্লাহ, দৈবিক কিছু ঘটিয়ে দাও, আমি ও মা প্রার্থনা করছি। কোনো কিছু হোক! এমনকি আমার সাথে আনা আমার পোষা বিড়াল চুন-চুনও চিন্তিত। এটাও ওর বাচ্চাদের ফেলে এসেছে। পরে ওর বাচ্চাগুলোকে কোথাও খুঁজে পাইনি। এখনও আমরা আশায় আছি। সুপ্রিমকোর্ট সুপারিশ করেছে যে, বাবার মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবনে শিথিল করার। অধিকন্তু, পাকিস্তানের আইন অনুসারে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের তারিখ এক সপ্তাহ আগে জানাতে হবে। অথচ এরকম কোনো ঘোষণা হয়নি।

পিপিপি নেতৃবৃন্দ যারা বাইরে আছেন তারা খবর পাঠিয়েছেন যে, জিয়া সৌদি আরব, ইউনাইটেড আরব আমিরাত এবং অন্য আরো অনেক রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, সে বাবার মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করবে। কিন্তু জিয়ার প্রতিশ্রুতি প্রতারণায় পূর্ণ এবং সে একজন আইন অমান্যকারী। বাবার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করার পর আমরা তার জীবন নিয়ে শঙ্কিত হলে, সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও লিবিয়ার প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমাদের। তারা কি বিবিসি থেকে আমার বার্তা পেয়েছেন? তাদের আসার কি সময় আছে এখনো?

একজন চীনা কূটনৈতিক প্রতিনিধি ইসলামাবাদে এসেছেন। চীনের সাথে বন্ধুত্বের অগ্রদূত আমার বাবা। তারা কি বাবার পক্ষে জিয়াকে প্রভাবিত করবেন দণ্ড না দিতে?

মা আর আমি সিহালার উষ্ণতায় স্থির হয়ে আছি, কথা বলতে পারছি না। জিয়া জানিয়ে দিয়েছেন যে, সে আমার বাবা অথবা আমাদের থেকে তার জীবন ভিক্ষা চেয়ে অনুকম্পার জন্য আবেদন করলে তিনি তা গ্রাহ্য করবেন। বাবা কোনো ধরনের অনুকম্পা বা জীবন ভিক্ষা চাইতে আমাদের নিষেধ করেছিলেন।

মৃত্যুর সামনে এরকম মুহূর্তগুলো কিভাবে কাটে? আমি আর মা শুধুই বসে আছি। বসে থাকার শক্তি শেষ হয়ে গেলে আমরা বিছানায় বালিশের উপর পড়ে গেলাম। ভাবতে থাকি ওরা বাবাকে মেরে ফেলবে। ওরা ঠিক বাবাকে মেরেই ফেলবে। বাবা এখন একা, কেমন বোধ করছেন যখন পাশে কেউ নেই? তিনি কোনো বই সাথে রাখেননি। তিনি সাথে কিছুই রাখেননি শুধু সেই চুরুটটি ছাড়া। আমি মুখ না খোলা পর্যন্ত আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। প্রহরীরা বাইরে কথা বলছে, হাসছে– আমি চাইনি যে ওরা আমার চিৎকার শুনে মজা পাক। 'আমি সহ্য করতে পারছি না, মা আমি আর পারছি না।'

অবশেষে ১-৩০টায় আমি নিস্তেজ হয়ে পড়লাম। মা আমাকে ঘুমের ওষুধ ভেলিয়াম এনে দিলেন। 'ঘুমানোর চেষ্টা করো', তিনি বলেন।

www.pathagar.com

আধা ঘণ্টা পরে ঘুমের মধ্যে বাবার ফাঁসির রজ্জু আমার ঘাড়ে অনুভব করে বিছানায় উঠে বসলাম।

সে রাতে আকাশ অশ্রু বিসর্জন করেছে। লারকানায় আমাদের দেশের বাড়িতে প্রবলভাবে বর্ষিত হয় শিলাবৃষ্টি। পূর্ব পুরুষের গারহি খোদা বকশ-এর ভুট্টো গ্রামের পাশে আমাদের পরিবারের গোরস্থানে, সামরিক নিরাপত্তা বাহিনীর শোরগোলে মানুষ জেগে উঠল। মা আর আমি যখন তীব্র যন্ত্রণায় রাত অতিক্রম করছি, তখন বাবার মৃতদেহ গারহিতে সমাহিত করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সামরিক শাসকের অগ্রবর্তী দল নজর মোহাম্মদকে নিয়ে দাফনের ব্যবস্থা করল। সে আমাদের জমি দেখাশোনা করত এবং তার পরিবার আমাদের সাথে আছে বহু বছর ধরে।

নজর মোহাম্মদ :

৪ঠা এপ্রিল রাত ৩টায় আমি ঘুমিয়ে আছি আমার বাড়িতে। গ্রামের প্রান্ত থেকে পঞ্চাশ থেকে ষাটটি সামরিক যানের তীব্র আলোয় জেগে উঠি। প্রথমে আমার মনে হল ভুট্টোর ফাঁসির পর যে কাজগুলো ওদের করতে হবে সেগুলো ওরা অনুশীলন করছে, তারা এরকম অনুশীলন দু'দিন আগেও করেছে, এই বলে যে এগুলো সাধারণ সামরিক কর্মকাণ্ড। আমার মতো গ্রামের অন্যরাও জেগে ওঠে। লোকজন সন্ত্রস্ত হয় বিশেষ করে পুলিশ যখন ভুট্টো পরিবারের গোরস্থানে ঢুকে কবরস্থান পর্যবেক্ষণ করে। পুলিশ আমাকে এত সকালে উঠতে বলায়, সকল গ্রামবাসী– বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও পুরুষ– বেরিয়ে আসল গৃহ থেকে। তখনই তারা ধারণা করেছিল হয় ভুট্টো সাহেবের ফাঁসি হয়েছে না হয় শিগগিরই দেয়া হবে। তাদের মধ্যে ছিল বিলাপ, কান্না ও হতাশা।

সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তারা এখানে স্থাপিত তাদের অস্থায়ী প্রধান কার্যালয়ে আমাকে ডেকে বলল, 'আমরা ভুট্টো সাহেবকে সমাহিত করব, জায়গা দেখান কোথায় হবে।' আমার কান্না পাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন? তার দরকার নেই। আমরাই তার শেষ কাজটা করব। ভুট্টো সাহেব আমাদেরই একজন।'

আমি কবর খুঁড়ার জন্য, সীমা নির্দেশের জন্য না-পোড়া ইট, কবরের উপরে দেয়ার জন্য কাঠের তক্তা সংগ্রহ করতে ও দোয়া-দুরুদ পড়ার জন্য লোকজন ডাকার অনুমতি চাইলাম। তারা আমাকে সাহায্য করার জন্য আটজন লোকের অনুমতি দেয়।

সামরিক বাহিনী ও পুলিশ শুধুমাত্র পুরো গ্রামকেই ঘিরে রাখেনি, গ্রামের ভেতরে ছোট ছোট রাস্তাও বন্ধ করে দিয়েছে। কেউ গ্রাম থেকে বাইরে যেতে পারবে না, কেউ ঢুকতে পারবে না। আমরা এখন বাইরের দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

সকাল ৮টায় সেখানে এম্বুলেন্স এলো এবং দুটো হেলিকপ্টার অবতরণ করল। আমি দেখলাম হেলিকপ্টার থেকে লাশ এম্বুলেন্সে স্থানান্তর করে গোরস্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 'বাড়িটি খালি করতে হবে', গোরস্থানের দক্ষিণ কোণে যে বাড়িতে গোরস্থানের খাদেম তার স্ত্রী সন্তান নিয়ে থাকেন সেই দিকে নির্দেশ করে কর্নেল আমাকে বললেন। আমি

www.pathagar.com

বাধা দিলাম, এটা পেশ ইমাম ও তার পরিবারের বাড়ি, কিন্তু কর্নেল জোর করল। পরে বিশজন সেনা তাদের অস্ত্র গোরস্থানের দিকে তাক করে বাড়ির ছাদে অবস্থান গ্রহণ করল।

নিকট আত্মীয়-স্বজনকে মৃতের মুখটা শেষবারের মত দেখতে দেওয়া উচিত, আমি বললাম। গোরস্থানের কাছেই থাকেন ভুট্টো সাহেবের চাচাতো ভাই। ভুট্টো সাহেবের প্রথম স্ত্রী থাকেন নাদেরো গ্রামের নিকটে। অনেক অনুরোধের পর কর্তৃপক্ষ ভুট্টো সাহেবের প্রথম স্ত্রীকে আনার অনুমতি দিলেন। তিনি আসার পরে প্রাচীর ঘেরা বাড়িটিতে নেয়ার জন্য আমরা কফিন খুলে লাশকে আমার বাড়ি থেকে নিয়ে আসা একটা দড়ির খাটিয়ায় উঠালাম। ইমাম পরিবারটি খুবই পর্দার মধ্যে থাকে এবং মহিলারা পর পুরুষের সামনে যায় না। বাইরের কোনো পুরুষের অনুমতি নেই বাড়ির ভেতরে যাওয়ার। কিন্তু সেনারা শালিনতার তোয়াক্কা না করে জোর করে বাড়িতে ঢুকে পড়ল। আধাঘণ্টা পর যখন লাশ সেখানে আনা হল, আমি কর্নেলের কাছে জানতে চাইলাম ধর্মীয় নিয়ম-রীতি করা হয়েছে কিনা। সে শপথ করে বলল, হয়েছে। আমি পরীক্ষা করলাম কাফন পরানো হয়েছে কিনা। পরানো হয়েছে।

শরীরের কিছু অংশ দেখে খুব উদ্বিগ্ন ও ব্যাথিত হলাম। আমি নিশ্চিত নই যে, তারা ধর্ম অনুযায়ী দাফন করতে দেবে কিনা। তার মুখ যেন মুক্তোর যতো। মুক্তোর মতো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। তাকে ষোল বছরের বালকের ন্যায় লাগছে। তার গায়ে আগের রং নেই, তার চোখ ও জিহ্বা অন্য ফাঁসিতে মরার মতো বের হয়ে আসেনি। মনেই হয়নি জিয়া তাকে ফাঁসি দিয়েছে। প্রথা অনুযায়ী আমি ভুট্টো সাহেবের মুখ পশ্চিমে কাবার দিকে করলাম। তার মাথা পাশে হেলে পড়ে যায়নি। অর্থাৎ তার ঘাড় ভেঙে যায়নি। ছাপ দেওয়ার মতো কিছু লাল ও কালো ফুটকি ছিল তার গলায়।

কর্নেল রেগে গেলেন। গ্রামের ১৪০০ থেকে ১৫০০ লোক কফিনের কাছে এসে মৃতের মুখের রক্তিমাভা দেখছে। তাদের বিলাপ হৃদয়বিদারক। যদি তারা না যায় তবে ব্যাটন চার্জ করা হবে কর্নেল হুমকি দিলেন।

তিনি বললেন, আমাদের বাবাকে এখনই সমাহিত করতে হবে। প্রয়োজন হলে আমরা তা লাঠির মাধ্যমে করব।

'সকলেই বিলাপ করছে এবং বেদনায় ভারাক্রান্ত,' আমি তাকে বললাম। বন্দুকের মুখে, মৃতের জন্য শেষ প্রার্থনা ও বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আমরা মৃতদেহকে কবরে নামালাম। কোরানের আয়াত আর দোয়া-দুরুদ পড়ার আওয়াজ মহিলাদের কান্নার সাথে মিশে এককার হয়ে গেল।

সিহালায় কিছুই খেতে পারছি না, এমনকি পান করতেও পারছি না। আমি এক চুমুক পানি খাব, কিন্তু আমাকে থু থু করে ফেলে দিতে হয়। আমার গলা দিয়ে কিছুই যায় না। ঘুমোতে পরি না। চোখ বন্ধ করি তো বারবার একই স্বপ্ন দেখি। জেলা কারাগারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। গেট খোলা। দেখতে পেলাম একটা ছায়া আমার দিকে আসছে। বাবা! ছায়ার দিকে দৌড়ে গেলাম। 'তুমি এসেছ! এসেছে বাবা! ভেবেছি ওরা তোমাকে হত্যা করেছে! কিন্তু তুমি জীবিত!' তার সামনে যেতেই জেগে উঠি আর বুঝতে পারি বাবা নেই।

'তোকে খেতে হবে, পিংকি! অবশ্যই খেতে হবে,' মা আমার জন্য স্যুপ এনে বললেন। আমাদের নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে তোকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। যদি তোর বাবার

www.pathagar.com

আদর্শের জন্য লড়ে যেতে চাস, তোর বাবার মতো হতে চাস, তাহলে তোকে খেতে হবে। অবশ্যই। আমি অল্পই খেয়েছিলাম।

আমাদেরকে পাঠানো লিখিত একটা স্বান্ত্বনা বার্তা পড়ার চেষ্টা করছি। এপ্রিলের ৫ তারিখে লাহোর থেকে এক পারিবারিক বন্ধু লিখেছে। প্রিয় চাচী ও বেনজির, দুঃখ ও কষ্ট জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। যা ঘটেছে তার জন্য পুরো জাতি দায়ি। আমরা সবাই অপরাধী... প্রত্যেক পাকিস্তানি ব্যথিত, বিমর্ষ ও নিরাপত্তাহীন। আমাদের সবাই দোষী ও পাপী।'

একই দিনে রাওয়ালপিন্ডির লিয়াকত বাগ মাঠে দশ হাজার জনতা জড়ো হয়েছিল। এখানেই দেড় বছর আগে প্রথম নির্বাচনী প্রচারণায় বাবার মুক্তির জন্য ব্যাপক জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। পিপিপি'র এই আশ্চর্যজনক জনপ্রিয়তা দেখে জিয়া নির্বাচন বাতিল করে ও বাবাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। আর এখন বাবার জানাজা ও শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে পুলিশ জনতাকে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে মারছে। জনতা ইট, পাথর নিক্ষেপ করে দৌড়ে যাচ্ছে। পুলিশ তাদের বেটন দিয়ে তাড়া করছে গ্রেফতার করছে। ইয়াসমিন তার দু'বোন ও মা'কে নিয়ে জানাজায় যোগ দেয়। আমিনা পিরাচা, যে বাবার সুপ্রিম কোর্টের মামলায় উকিলকে সাহায্য করেছে, তার দু'বোন, ভাগ্নে ও তার সত্তুর বছরের আয়াও যোগ দেয়। আরো অনেককেসহ এই দশ মহিলাকে গ্রেফতার করে দু'সপ্তাহ আটক করে রাখা হয়েছিল।

বাবার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নানা গুজবও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। লোকে বলাবলি করছে যে জল্লাদ বাবার ফাঁশি দিয়েছে সে পাগল হয়ে গেছে। যে বিমান চালক গারহিতে বাবার লাশ বহন করে নিয়ে যায় সে তা জানার পর এত ক্ষিপ্ত হয় যে অন্য বিমান চালককে বিমানটি ফিরিয়ে আনতে হয়েছে। পত্রিকাগুলোও এমন সব সংবাদে পূর্ণ ছিল। বাবাকে প্রহার করেই মৃতপ্রায় করা হয়েছে, শুধু সামান্য প্রাণ নিয়ে তাকে স্ট্রেচারে করে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আরেকটি খবর ছিল যে বাবা তার ডেথ সেলেই শারিরীক নির্যাতনে মারা যান। সামরিক কর্মকর্তারা বাবাকে জোর করেছিল স্বীকারোক্তি দেয়ার জন্য যে, তিনি সামরিক অভ্যূত্থানকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং জিয়াকে আহ্বান করেছেন দেশের দায়িত্ব নেয়ার জন্য। সামরিক সরকারের বৈধতার জন্য এটা তাদের প্রয়োজন ছিল এবং বাবা তা অস্বীকার করেন।

এই সময় বাকবিতণ্ডায় এক কর্মকর্তা বাবাকে জোরে ধাক্কা মারে। বাবা পড়ে গিয়ে দেয়ালে মাথা লেগে জ্ঞান হারান। তিনি আর চেতনা ফিরে পাননি। জ্ঞান ফেরানোর জন্য ডাক্তার ডাকা হয় এবং বক্ষ ম্যসেজ ও গলা অপারেশন করার জন্য যে দাগ হয় সেটা নজর মোহাম্মদ দেখেছেন। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

গল্পটা বিশ্বাস করেছি। কেন বাবার শরীরে ফাঁসির কোনো চিহ্ন দেখা যায়নি? কেনইবা আমি বাবার ফাঁসির তিন ঘন্টা আগে রাত ২টায় জেগে উঠেছিলাম? অপর এক রাজনৈতিক বন্দি জেনারেল বাবরও বলেছেন তিনি রাত ২টায় প্রচণ্ড চিৎকারের শব্দে জেগে ওঠেন। সারা বিশ্বে আরো বন্ধু ও সমর্থক জেগে উঠেছে, যেন বাবার আত্মা তাদের সকলকেই ছুঁয়ে যাচ্ছে যারা তাকে ভালবাসতেন।

গুজব চলতে থাকল।

তার মৃতদেহ কবর থেকে উঠিয়ে ময়নাতদন্ত করাও, বাবার চাচাত ভাই ও পিপলস পার্টির নেতা মুমতাজ ভুট্টো সিহালায় সমবেদনা জানিয়ে আমাকে বলেন, ময়নাতদন্ত করলে

www.pathagar.com

আমরা রাজনৈতিক সুবিধা পেতেও পারি। রাজনৈতিক সুবিধা? বাবা মৃত! তার মৃতদেহ কবর থেকে উঠালেই তাকে জীবিত করা যাবে না।

মুমতাজ চাচাকে বললাম, ওরা বাবাকে ফাঁসি দেয়ার আগেই তাকে তার ডেথসেলেই বেঁচে থাকতে দেয়নি। এখন সে মুক্ত। তাকে শান্তিতে থাকতে দিন।

বুঝতে পারছ না এর একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। মুমতাজ চাচা অনড়।

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বলি, ইতিহাস তার জীবনের মূল্যায়ন করবে। তাকে কবর থেকে উঠাব না। তার বিশ্রাম দরকার।

আমার মা'র ভাগ্নি ফাখরী ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু সামীয়া ওয়াহিদকে আমাদের সাথে সিহালায় থাকার জন্য অনুমতি দেয়া হল। তারা আমাদের দেখে আশ্বস্ত হল যে দুঃখের মধ্যেও আমরা ভেঙে পড়িনি। সামীয়া বলল, শুনেছি তুমি খুব শোকে কাতর হয়ে গেছ আর আত্মহত্যা করতে চাচ্ছ। সামরিক সরকারের আরো এক গুজব।

ফাখরী খুব আবেগের সঙ্গে মা'কে জড়িয়ে ধরল, ফারসী ভাষায় তার সমবেদনা জানাল। 'নূসরাত খালা, ইচ্ছে হয় মরে যাই। আমি যদি এই দিনটা না দেখতাম!' সে কেঁদে উঠল, লোকজন বলছে জিয়ার ফাঁসি হওয়া উচিত।

ফাখরী আমাকে জড়িয়ে ধরল। সেই প্রথম এক বছর আগে আমাকে বাবার মৃত্যুদণ্ডের খবর পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে করাচির বাড়িতে যেখানে আমরা বন্দি ছিলাম, সেখানে এসে জানিয়েছিল। শোয়ার ঘরে বসে আছি হঠাৎ সে সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ কক্ষে ঢুকে শোকে চিৎকার শুরু করল ও মেঝেতে মাথা আছড়াতে লাগল। আধাঘন্টার মধ্যে সেনা কর্তৃপক্ষ ফাখরীর বন্দি আদেশ নিয়ে আসল। তার শরীরে কোনো রাজনীতির গন্ধ নেই। যে শুধু মাহ-জংগ ও ব্রিজ খেলে জীবনটা পার করে দিয়েছে। তাকেও আমার সঙ্গে বন্দি করে রাখা হয়েছে। স্বামী সন্তানদের কাছে ফিরে যেতে দেয়া হয়নি।

এখন আমরা দু'জনে কাঁদছি। শত শত মানুষ কারখানা শ্রমিক, ট্যাক্সি ড্রাইভার, পথচারী করাচিতে আমাদের বাগানে মৃত্যুর তৃতীয় দিনে কুলখানিতে জমায়েত হয়েছে, সে বলল। প্রতিরাতে বাস ভর্তি মহিলা কোরান বুকে চেপে বাবার জন্য প্রার্থনা করতে আসে।

সেনাবাহিনী জাতির গর্ব, এখন শুধুই পরিহাসের বিষয়, ফাখরী বলল। করাচি থেকে বিমানে সে এবং সামীয়া কোনো এক সেনা কর্মকর্তার পাশে বসে আসতে অসম্মতি জানায়। তারা খুনি বলে চিৎকার করে ওঠে। অন্য যাত্রীরা যারা নিজেরা শোকাভিভূত তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করছে। কেউ কোনো শব্দ উচ্চারণ করেনি। সবার চোখেই অশ্রু।

কুলখানিতে বাবার কবর দেখতে যাওয়ার আবেদন করলাম, ৭-ই এপ্রিল সকাল ৭টায় আমাদের প্রস্তুত হওয়ার জন্য পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হল। শোকের জন্য কালো কাপড় পরতে পারিনি কারাগারে যা ছিল তা পরেই চলে গেলাম। 'তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!' বিমান বন্দরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে গাড়িতে উঠার সময় এক সেনা কর্মকর্তা এই বলে তাড়া দিচ্ছে। তারা সর্বদাই আমাদের তাড়া দিচ্ছে এই ভয়ে যে, জনতা আমাদের দেখে অভিবাদন জানাবে এবং মিছিল করবে আমাদের সমবেদনা জানিয়ে।

এরকম বলা যায় না যে সকল সেনা কর্মকর্তা অমানুষ হয়ে গিয়েছিল। বিমান বন্দরে সেনা পরিবহন বিমানের ক্রু'রা সম্মান প্রদর্শন করে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মাথা অবনত। মা

www.pathagar.com

গাড়ি থেকে নামলে তারা তাকে স্যালুট জানায়। এই ছিল একজন বিধবার উপযুক্ত সম্মান। বাবা ভারতের কারাগার থেকে নব্বই হাজার সেনাকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছিল। কেউ ভুলে যায়নি এই ঘটনাটি। স্বল্প ভ্রমণে ওরা আমাদের চা, কফি, স্যান্ডউইচ খেতে দিয়েছে। দেখেছি তাদের মুখে বেদনার চিহ্ন।

গারহি খোদা বকশ এর কাছে মহেঞ্জোদারো বিমানবন্দরে বিমান অবতরণ করেনি, করেছে এক ঘন্টা দূরের পথ জেকোবাবাদে। স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষ বিমান ঘাটি থেকে গ্রামের দিকে সোজা রাস্তা ধরে যায়নি যেটা বাবা নির্মাণ করেছেন। তার বদলে গাড়ি কাঁচা রাস্তা ধরে গিয়েছে। ড্রাইভার এমনভাবে যাচ্ছে যাতে জালঘেরা জানালা দিয়ে আমাদের না দেখা যায়। ঘাম আর ধুলোর আস্তরে ঢেকে গেছে আমাদের শরীর। পরিশেষে গোরস্থানে এসে পৌঁছালাম।

কবরস্থানের সরু পথে ঢুকতেই এক সেনা কর্মকর্তা আমাদের পিছু পিছু অগ্রসর হচ্ছিলেন, আমি থামালাম।

না, তোমরা ঢুকতে পারবে না, কেউ না। বললাম আমি। 'আমাদের গোরস্থান। তোমরা কেউ না।'

'আপনাকে আমাদের দৃষ্টির বাইরে যেতে দেয়ার নির্দেশ নেই।' সে বলল।

বললাম, 'তোমরা ভেতর এসে এর পবিত্রতা নষ্ট করতে পার না। তোমরা বাবাকে হত্যা করেছ। তাকে এখানে পাঠিয়েছ। আমরা তার জন্য মোনাজাত করলে একাই করব।'

'সর্বদাই আপনার পাশে থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' বলল সে।

'তাহলে আমরা কবর দেখতে ঢুকব না। আমাদের ফেরত নিয়ে চলুন।' গাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে মা বললেন। অবশেষে সে ফিরে গেলে, জুতা খুলে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা গোরস্থানে ঢুকলাম।

মনে হল, 'কত শান্তির! কত চেনা!' ভুট্টোর পূর্ব পুরুষগণ ধ্যানে শুয়ে আছে– আমার দাদা জুনাগড় প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্যার শাহ নেওয়াজ খান ভুট্টো, তিনি ভারত ভাগের পূর্বে বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে তার কাজের জন্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নাইট উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তার স্ত্রী লেডি খুরশিদ; আমার চাচা, সিকান্দার ভুট্টো এবং তার ভাই সুপুরুষ ইমদাদ আলী, কথিত আছে করাচির প্রধান শপিং এরিয়া এলফিন স্টোন স্ট্রিটে তিনি যখন তার ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে বের হতেন তখন ইংরেজ যুবতীরা তাকে দেখার জন্য দৌড়ে বের হয়ে আসত। আরো অনেক আত্মীয়-স্বজন এখানে শুয়ে আছে, এই মাটিতে যেখানে আমাদের জন্ম এবং আমরা যেখানে ফিরে যাব মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

১৯৬৯ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পাকিস্তান ত্যাগ করার আগে বাবা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। পূর্ব পুরুষের কবরের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'তুমি আমেরিকায় যাচ্ছ, অনেক কিছু দেখবে যাতে চমৎকৃত হবে, অনেক জায়গায় যাবে যার নাম শুনোনি। কিন্তু মনে রেখ, যাই হোক, তুমি এখানে ফিরে আসবে। তোমার স্থান এখানে। তোমার অস্তিত্ব এখানেই। লারকানার ধুলো, কাদা, উষ্ণতা তোমার স্মৃতিতে। এখানেই তোমাকে সমাহিত করা হবে।'

জলে ভরা চোখ নিয়ে বাবার কবরের দিকে তাকিয়ে আছি। এমনকি জানি না কোথায় তাকে মাটি দেয়া হয়েছে। আমি দেখে চিহ্নিত করতে পারছি না বাবার কবর। ফুলের স্তূপ পাপড়িতে ভরা মাটি। মা আর আমি কবরের পায়ের কাছে বসলাম। বিশ্বাস করতে পারছি

www.pathagar.com

না বাবা এই মাটির নিচে। বাবার পা কল্পনা করে আমি উপুর হয়ে মাটির একাংশ চুমু খেলাম।

'যদি আমি তোমার কষ্টের কোনো কারণ হয়ে থাকি তাহলে ক্ষমা করো, বাবা' ফিসফিস করে বললাম।

একা, খুব একা লাগছে। অন্য সকল ছেলেমেয়েদের মত আমিও বাবার ভক্ত ছিলাম। এখন বাবাকে হারিয়ে একটা শূন্যতা অনুভব করছি যা পূরণ হবার নয়। কিন্তু কাঁদিনি, কারণ মুসলমান হিসেবে এটা বিশ্বাস করতাম যে, অশ্রু মৃত্যু আত্মাকে পৃথিবীতে টেনে আনে, যেতে দেয় না।

বাবা মুক্তি পেয়েছেন এবং শান্তির জন্য যথেষ্ট মূল্যও দিয়েছেন। তার কষ্টের অবসান হয়েছে। 'প্রশংসা তার প্রতি যিনি সবকিছুর নিয়ন্ত্রক' কোরান শরীফের সুরা ইয়াসীন থেকে পড়লাম আলহামদুলিল্লাহে ইল্লাযী ওয়া আল্লাহু আলী কুল্লি সাইয়েন কাদির। 'তার কাছে তোমরা সকলেই ফিরে যাবে।' বাবার আত্মা বেহেশতে আল্লাহর সাথে আছে।

ওরা আমাদের ভিন্ন আরো এক খারাপ রাস্তা দিয়ে বিমানবন্দরে ফিরিয়ে নিয়ে আসল। ওই সেনা সদস্যরা আবারো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিহালায় জেল গেটে আমাদের আগের মতই সার্চ করা হলো, আমাদের বন্দি কক্ষগুলোও ওই একই আছে। কিন্তু এক ধরনের শান্তি ও নিশ্চয়তা বোধ করলাম।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা কর। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর। শত্রুকে পরাভূত কর। বাবা গল্পে আমাদের বলতেন, 'শুভ সব সময়ই অশুভের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে।'

'তুমি কোনো সুযোগ গ্রহণ করবে না ছেঁড়ে দেবে, তুমি খেয়ালি হবে না চিন্তাশীল হবে, তুমি কি সাহসী হবে না ভিরু হবে, এসবই তোমার ব্যাপার।' তিনি সবসময়ই আমাদের প্রভাবিত করছেন। 'তোমার ভাগ্যে কি আছে সেটাও তুমি নির্ধারণ কর।'

এখন দুঃস্বপ্ন পাকিস্তানকে ঘিরে ধরেছে। বাবার দায়িত্ব এখন আমার উপর। এটা মনে হচ্ছে বাবার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার সময় থেকে। মনে হচ্ছে বাবার আত্মার শক্তি ও প্রত্যয় আমার মধ্যে প্রবেশ করছে। সেই মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করলাম পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত আমি থামব না। যে আশার আলো তিনি জ্বালিয়েছেন আমি তা জাগ্রত রাখব। তিনিই পাকিস্তানের প্রথম নেতা যিনি সাধারণ মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন, কোনো সামরিক ও অভিজাত শ্রেণীর জন্য নয়। আমাদের সেই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

বাবার কুলখানি শেষে মা আর আমাকে সিহালায় ফিরিয়ে আনার সময়, ৭০ ক্লিফটনে আমাদের বাগানে বাবার আত্মার মাগফেরাত করে মোনাজাত করতে আসা শত শত লোককে উদ্দেশ্য করে সেনারা টিয়ার গ্যাস ছুঁড়েছে। টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ার তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে, আঙিনার উপরে পবিত্র কোরান বুকে চেপে ধরে জনতা ছুটোছুটি করছিল, তাদের দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

www.pathagar.com

বন্দি জীবনের দিনগুলো

www.pathagar.com

www.pathagar.com

২

নিজ গৃহে বন্দি

বাবার মৃত্যুর সাত সপ্তাহ পরে ১৯৭৯ সালের মে মাসের শেষের দিকে মা আর আমাকে মুক্তি দেয়া হলো। আমরা করাচির ৭০ ক্লিফটনে আমাদের বাড়িতে ফিরে আসি।

সবই ঠিক আছে আবার কিছুই ঠিক নেই। ৭০ ক্লিফটন বাড়ির গেটের কাছে নেমপ্লেটে খচিত 'জুলফিকার আলী ভুট্টো, বার-এট-ল'। এর উপরে অন্য তামার প্লেটে লেখা দাদার নাম, স্যার শাহ নেওয়াজ ভুট্টো। ১৯৫৩ সালে আমার জন্মের পরই দাদী এই দু'তলা বিশাল বাংলো নির্মাণ করান। আরব সাগরের কোয়ার্টার মাইল দূরে শীতল বাতাসে আমার ভাই, বোন ও আমি বেড়ে উঠেছি। কেউ কি পরিবারটির এই করুণ পরিণতি কখনো কল্পনা করতে পেরেছে?

প্রতিদিন শত শত শোকার্ত মানুষ আমাদের নারকেল, খেঁজুর, আম ও করাচি থেকে আনা লাল হলুদ ফুলের বাগানে জড়ো হতো। আরো শত শত গেটের বাইরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত তাদের নেতার পরিবারকে সমবেদনা জানাতে। মা তখনও ইদ্দতে ছিলেন এবং দর্শনার্থীদের সাথে দেখা করতে পারছেন না। আমাকে পাঠাতেন তাদের সাথে কথা বলতে।

দুঃস্বপ্ন আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। বাবাকে ফাঁসি দেয়ার দুদিন আগে দ্বিতীয়বারের মতো আমাদের ৭০ ক্লিফটন বাড়িতে তল্লাশি করা হয়েছে– বাড়ির ছাদ ও বাগান তল্লাশি করা হয়েছে। মায়ের সিন্দুক খোলা হয়েছে, দেরাজে বাবার কাপড়-চোপড়ও তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। নাগরিক আইনের ইঙ্গিত দিয়ে আমাদের বাড়ির এক কর্মচারী জিজ্ঞেস করে 'আপনার তল্লাশি অভিযানের অনুমতি আছে?' যে সেনা কর্মকর্তা পুলিশের সঙ্গে এসেছিল সে বলে, 'আমি অভিযান দলের সঙ্গে আছি। আমার অনুমোদনের দরকার নেই। ১০ ঘন্টা অভিযান চালিয়ে বাড়িটা উল্টোপাল্টা করে ফেলেছে। বেডরুম থেকে আমার ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও দুটো কালো ব্রিফকেস নিয়ে গেছে। যার মধ্যে ছিল ব্যাংকের কাগজপত্র বাতিল চেক। আমার সংগৃহীত সামরিক শাসকের বাবার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ খণ্ডনের প্রমাণপত্র।

www.pathagar.com

'এখানে গোপন দেরাজ ও সুড়ঙ্গ আছে। এগুলো আমাদের দেখাও।' সেনা কর্মকর্তা বাড়ির কর্মচারীদের আদেশ করে। তারপর ওদের পেটাতে শুরু করে যখন তারা বলে কোনো গোপন দেরাজ বা সুড়ঙ্গ নেই। তল্লাশি চলার সময় বাড়ির কাজের লোকদের অভ্যর্থনা কক্ষে নিয়ে বেঁধে রাখা হয়। সকালে গোয়ালা দুধ দিতে আসলে তাকেও ওদের সাথে বেঁধে রাখা হয়। পত্রিকা হকারের ভাগ্যে একই ঘটনা ঘটে। সেনা কর্মকর্তা ক্রমেই উদ্ধত আচরণ করে। এক সেনা কর্মকর্তা আমাদের এক স্টাফকে বলে, 'এই কাগজে সই কর।' সে অস্বীকৃতি জানায়। কর্মকর্তা ভয় দেখিয়ে বলে, 'দেখেছ তো তোমার সাহেবের কি হয়েছে। সই না করলে তোমার ভাগ্যেও তাই ঘটবে। লোকটা ভয় পেয়ে সই করে।'

অভিযান ব্যর্থ হলে একটা ট্রাক গেট দিয়ে অগ্রসর হল। সৈন্যরা ট্রাক থেকে লাল কাপড়ে মোড়া দলিলপত্র নামাল। পরে তা প্রেসে নিয়ে গেল বাবার বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ ছাপাতে। অনেকেই মনে করল বাবার বিরুদ্ধে নতুন মামলা সাজানো হচ্ছে যেহেতু সুপ্রিমকোর্ট বাবার মৃত্যুদণ্ডকে যাবৎজীবন দণ্ডে হ্রাস করার নির্দেশ দিয়েছে। তল্লাশি অভিযান দল বিকেলে বাড়ি ত্যাগ করার সময় আমাদের ব্যক্তিগত সম্পদ যেমন বাবার সংগৃহীত প্রাচীন মানচিত্রসহ 'প্রমাণপত্র' নিয়ে যায়।

৭০ ক্লিফটনের বাড়িতে লারকানায় বাবার কবরে জেয়ারত করতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। প্রশাসন আমার পরিকল্পনা জেনে ফ্লাইট বাতিল করে। আমাকে ট্রেনে যেতে হয়। প্রচুর মানুষ আমাকে দেখার জন্য প্রত্যেক স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে। সেখানে তারা রেল লাইনে শুয়ে পড়ে ট্রেন থামায়। জনতা চিৎকার করে ওঠে 'প্রতিশোধ! প্রতিশোধ' বলে। জনতার উৎসাহে বলি, আমরা নির্বাচনে জিয়াকে পরাজিত করে আমাদের দুঃখকে শক্তিতে পরিণত করব। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বি দল, যারা মনে করে ভুট্টো ও পিপিপি-র শক্তিকে কবর দেয়া হয়েছে, তাদের জন্য জনতার এই রায়ই হবে সমোচিৎ শিক্ষা।

করাচিতে ফিরে পিপিপি নেতৃবৃন্দ ও সমর্থকদের সঙ্গে প্রতি দশ মিনিট অন্তর সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সাক্ষাত করি। প্রতি ঘণ্টায় বাগানে শোকার্তদের অভিনন্দন জানাই। আমাকে আর মা'কে, যার ইদ্দত শেষ হবার পর, দেখে তাদের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জনতা আমাদের বন্দিদশা ও বাবার মৃত্যু কোনোটাই মেনে নিতে পারেনি। তবুও নিজের চোখে আমাদের দেখে তাদের মধ্যে নতুন স্বপ্ন জেগে উঠেছে। একদল যায় তো আরেক দল বাগানে ঢোকে।

রাতে সাংগঠনিক বিষয়, নিয়মনীতি অভিযোগ পত্রাদি ও রাজনৈতিক গ্রেফতার নিয়ে আলোচনায় নিমজ্জিত থাকি এবং মা'র পড়ার জন্য একটা সারমর্ম তৈরি করি। মনে হয়, কাজ গুছাতে পারব না। পারতাম না যদি আমার স্কুলবন্ধু সামিয়া ও আমিনার সাহায্য না পেতাম। দুই যুবতী বাবার মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করার সময় থেকে আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে। পশ্চিমা সংবাদপত্র সামীয়া, আমিনা ও ইয়াসমিনকে চার্লিস অ্যাঞ্জেলস হিসেবে সংবাদ ছেপেছে। যদিও জানি সত্যিকারের চার্লিস অ্যাঞ্জেলস এদের কাজের মধ্যে চাপা পড়বে। একরাতে কোনো একটা প্রতিবেদন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরেরদিন আমার স্টাডিতে টুথপেস্ট ও ব্রাশ এনে রাখলাম।

জনতাকে শান্ত করার জন্য বাবার মৃত্যুদণ্ড দেয়ার আগে জেনারেল জিয়া আবারো প্রতিশ্রুতি দেন তিনি নির্বাচন দিয়ে সামরিক শাসন থেকে দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু সে কি পিপিপিকে জয়লাভ করতে দেবে? সে প্রকাশ্যে ঘোষণা করল যে, সে যাদের

www.pathagar.com

কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়েছে তাদের ফিরিয়ে দেবে না। নির্বাচনের একমাত্র ফলাফলই তার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে।

১৯৭৭ সালে বাবাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে সে এক দুর্বিপাকে পড়ে। নির্বাচনে পিপিপির নিশ্চিত বিজয়ের আশঙ্কায় সে নির্বাচন বাতিল করে এবং দলের সকল নেতাদের গ্রেফতার করে। জিয়া এখন কি করবে?

সেপ্টেম্বরে স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও পিপিপি জয়লাভ করে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জিয়ার বৈধতা পাওয়ার জন্য জেতা প্রয়োজন। ছলচাতুরি করে পিপিপিকে হারানো হবে জানতে পেরে, দলের নেতারা ৭০ ক্লিফটনের বাড়িতে সভায় বসেন। সভার এজেন্ডা ছিল পিপিপি নির্বাচনে যাবে না, বয়কট করবে। 'নির্বাচন বর্জন করা উচিত হবে না' বাবার কথা মনে করে আমি আমার বক্তব্যে বলি। বাধা যতই হোক, যতই জালিয়াতি হোক, আমাদের প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করতে হবে। সত্যই জালিয়াতি হয়েছে। যেরকমটি ধারণা করা হয়েছিল। পিপিপি নির্বাচনে অংশ নেয়ার ব্যাপারে ঘোষণা করা মাত্র জিয়া সবকিছু পরিবর্তন করেছে।

প্রশাসন আমাদের নির্দেশ দেয়– রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন করুন নয়তো নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।

প্রত্যাখ্যান করি। নিবন্ধন করা মানেই জিয়ার সামরিক সরকারকে মেনে নেয়া।

'আমরা স্বতন্ত্র নির্বাচন করব' যদিও জানি ব্যালটে দলীয় প্রতীক না থাকা এই সমাজে খুব ঝুঁকিপূর্ণ, যেখানে সরকারি হিসেবে শতকরা ২৭ জন শিক্ষিত কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিতের হার শতকরা ৮ জন। এবার প্রশাসন আরেক চাল চালে, এবার বলে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের শতকরা ৫১ ভাগ ভোট পেতে হবে। তাদের নতুন নিয়ম অনুযায়ী ।

'ভাল হয়েছে', আমরা মেনে নিই। এবারও আমরা নির্বাচন করব।

কিন্তু ১৫ই অক্টোবর ১৯৭৯ সাল, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার একমাস আগে পিপিপি দলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনুরোধে মা এক সভা আহ্বান করে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রশ্ন আবার ওঠে এবং এ বিষয়ে দল বিভক্ত হয়ে পড়ে। 'বয়কট! বয়কট!' ৭০ ক্লিফটনের বাড়িতে ডাইনিং রুমে, বর্তমানে কনফারেন্স রুম, দলের কয়েকজন নেতা বলতে থাকেন। এদের অনেকেই আমাকে পুচকে মেয়ে বলে অভিহিত করেন। তারপরও আমি নির্বাচনে অংশ গ্রহণের পক্ষে কথা বলে যাই। বলি, 'জিয়া বারবার নিয়ম পরিবর্তন করে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। আমরা হারব না। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জয়লাভ করেছি। জাতীয় নির্বাচনেও জয়লাভ করব। দীর্ঘ বিতর্কের পর যখন নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করি তখন রাত প্রায় শেষ।

পরের দিন জিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত শোনার পরে তার স্নায়ুচাপ বেড়ে যায়। নির্বাচন বাতিল করে ও আবারো ৭০ ক্লিফটনের বাড়িতে সৈন্য পাঠিয়ে ১৯৭৭-এর অবস্থার পুনরাবৃত্তি করে। 'বাড়ি ঘিরে ফেলা হয়েছে' মধ্যরাতে আমাদের এক স্টাফ বলল। তাড়াতাড়ি সকল রাজনৈতিক কাগজপত্র জড়ো করি– দলের কাগজপত্র, সদস্য তালিকা, চিঠি, জেলে যারা আছে তাদের তালিকা– বাথরুমে ফেলে দিই ও পুড়িয়ে ফেলি। আমি চাই না প্রশাসন খুব সহজেই আমাদের আক্রমণ করুক। কয়েক মিনিট পরে সেনারা বাড়িতে ঢুকে বন্দুকের মুখে মা আর আমাকে লারকানায় আমাদের গ্রামের বাড়ি আল-মুর্তাজায় নিয়ে যায়। আমাদের ছয়মাস বন্দি থাকতে হবে।

www.pathagar.com

আল-মুর্তাজার বারান্দায় হাঁটছি। দু'বছর আগে সামরিক অভ্যুত্থান থেকে এটা মা'র জন্য নবম বন্দি দশা আমার জন্য সপ্তম। কিন্তু জোরপূর্বক এই বন্দিদশাকে মেনে নিতে পারছি না। প্রতিবারে কারাবদ্ধতা রাগের আরেক মাত্রা যোগ করে। হয়তো বয়স ২৬, তাই। কিন্তু মনে হয়, আল-মুর্তাজায় বন্দি থেকে আমি কখনোই ভিন্নতা বোধ করব না।

আল-মুর্তাজা আমাদের পরিবারের হৃদয়। যে বাড়িতে আমরা পৃথিবীর যেখানেই থাকি ছুটে আসি– শীতের ছুটি কাটাতে, রমজান শেষে ঈদে এবং বাবার জন্মদিনে, বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমরা শতবছর ধরে এখানের আত্মীয়-স্বজনের কবর জেয়ারত করতে। এখন সামরিক সরকার আল-মুর্তাজাকে সাব-জেল ঘোষণা করেছে আমার আর মায়ের জন্য।

প্রশাসন পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমে বলছে যে আমরা গৃহবন্দি। কিন্তু এটা সঠিক নয়। গৃহবন্দিকে বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেয়া হয়, তারা জেলের মত কঠিন নিয়ন্ত্রণে থাকে না। তাদের পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিতে দেয়া হয়, স্থানীয় ও দূরবর্তী টেলিফোনে কথা বলতে দেয়া হয়, বইপত্র এবং মাঝে মাঝে তড়িৎ ভ্রমণ ও বাইরের সভায় অংশ গ্রহণেরও অনুমতি থাকে। সাব-জেল নিয়ম অনুযায়ী আল-মুর্তাজাকে জেল বানানো হয়েছে, সেখানে জেলের নিয়ম-কানুন চালু করা হয়েছে। আমাদের টেলিফোন বিচ্ছিন্ন। মা আর আমি এই গৃহেই সীমাবদ্ধ এবং সনম ছাড়া অন্য কোনো দর্শণার্থীর সঙ্গে স্বাক্ষাত নিষেধ।

উত্তর-পশ্চিমের সীমান্তবর্তী প্রদেশে পাঠান উপজাতিদের উপসামরিক বাহিনী ফ্রন্টিয়ার ফোর্স গৃহের বাইরে ও ভেতরে পাহারায় আছে। বাবার সময়ে বিশেষ কমান্ডো বাহিনী আল-মুর্তাজায় নিয়োজিত ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত বাইরের কেউ যেন ঢুকতে না পারে। আর এখন ফ্রন্টিয়ার ফোর্স-এর একমাত্র উদ্দেশ্য একজন বিধবা ও তার মেয়েকে বাড়ির ভিতরে অন্তরীণ রাখা। জিয়া চায় এদেশ, এমনকি এই বিশ্ব ভুলে যাক যে, ভুট্টো নামে কোনো পরিবার ছিল।

পাকিস্তানের পত্রিকাগুলো আমাদের ব্যাপারে এখন আর কিছু লেখে না। ১৬ অক্টোবর ১৯৭৯ যেদিন জিয়া নির্বাচন দ্বিতীয়বারের মত বাতিল করে এবং মা'কে আর আমাকে গ্রেফতার করে তখনই পত্রিকার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে সামরিক আইন নিয়ন্ত্রণের তালিকা বাড়িয়ে দেন। সামরিক আইন বিধি ৪১ অনুসারে সার্বভৌমত্ব, সংহতি, পাকিস্তানের নিরাপত্তা, অথবা নৈতিকতা ও জনতার শৃঙ্খলায় হুমকিও বিরোধী বলে বিবেচিত কোনো সংবাদ প্রকাশ করা হলে প্রকাশনীর সম্পাদককে দশ বেত্রাঘাত ও পঁচিশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হবে।

আমাদের দলীয় পত্রিকা 'মুসাওয়াত' যার বিক্রি শুধু মাত্র লাহোরেই ১০০,০০০ কপি বিক্রি হয়। হুমকি দেয়া হয় যে, তারা যদি সরকারের কথা মত না চলে তবে সরকার নিয়ন্ত্রিত যে সামান্য পরিমাণ নিউজপ্রিন্ট ও বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো তাও বন্ধ করে দেয়া হবে। ছয় বছরের মধ্যে বাবা, মা আর আমার ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়নি বললেই চলে। নামটা পর্যন্তও উল্লেখ করা হয়নি। সামরিক সেন্সরে যদি কোনো সংবাদ আমাদের অনুকূলে দেখতে পায় তবে পত্রিকার সেই অংশ ছেটে দেয়া হয়। মাঝে মাঝে পুরো পত্রিকার কলাম ফাঁকা থাকে। জানানো হয়, যে সংবাদ ছাপানোর কথা তা সেন্সন কেটে দিয়েছে।

পিপিপি-এর শক্তি জিয়াকে বাধ্য করে নিপীড়নমূলক রাজনৈতিক বিধি-নিষেধ আরোপ

www.pathagar.com

করতে। ১৯৭৭ সালে সামরিক আইন আরোপ করার সময় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছিল যে, এখন থেকে পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত যে কেউ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হলে কারাদণ্ড ও বেত্রাঘাতের জন্য বিবেচিত হবে। কিন্তু ১৯৭৯ সালের ১৬ অক্টোবর সামরিক সরকার নতুন ফরমান দিয়ে শুধু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই নয় সকল রাজনৈতিক দল অবৈধ ঘোষণা করে। বাবার জনপ্রিয়তা চিরতরে মুছে ফেলার জন্য এ ধররে ঘোষণা দেয় তারা।

জেনারেল জিয়ার সামরিক আইন বিধি ৪৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়। পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দল ও তাদের সকল গ্রুপ, শাখা ও কার্যক্রম বন্ধ থাকবে রাজনৈতিক দলে কোনো সদস্য অথবা যে নিজেকে দলের একজন মনে করে তবে সে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং ২৫ বেত্রাঘাতের জন্য বিবেচিত হবে। সেই মুহূর্ত থেকে পত্রিকায় পিপিপি'র পূর্বে বিলুপ্ত শব্দটা লাগাতে হয়, মা আর আমাকে এভাবেই 'বিলুপ্ত' গণতন্ত্রে 'বিলুপ্ত' দলের বিলুপ্ত নেতা আখ্যায়িত করা হয়।

লন্ডনে ১৯৩১ সালে ভারতীয় গোল টেবিল বৈঠকের দাদার ছবি, বাবার জন্ম দিনের ছবি এরকম আরো অনেক ছবি আল-মুর্তাজায় শোভা পাচ্ছে। বাবা ও তার তিন বোনের জন্ম এখানেই। লারকানার পার্শ্ববর্তী গ্রামে দাদার নির্মিত কোয়ার্টার থেকে ধাত্রী এসে এদের জন্মের সময় সহায়তা করেছে। পুরোনো বাড়ি ভেঙে নতুন করা হলেও ভুট্টো পরিবারের আল-মুর্তাজা একইরকম।

দরজার পাশে নীল ও সাদা টাইলস যাতে খচিত ২৫০০ বছর আগে অতি উন্নত সিন্ধু সভ্যতার নিকটে মহেঞ্জোদারের নারী পুরুষ খচিত। শৈশবে আমার মনে হতো প্রাচীন এই নগরীকে বলা হয় 'মুনজ জো দেরো' সিন্ধিতে যার অর্থ আমার স্থান। আমার ভাই বোন আর আমি গর্বিত যে আমরা মহেঞ্জোদারের কাছে বড় হয়েছি। সৃষ্টির শুরু থেকে যে সিন্ধু নদ এখানের জমিতে প্রাণ সঞ্চার করেছে তার ভিতরেই পালিত হয়েছি। অতীতে আর কোথাও এতো শান্তি পাইনি, কারণ ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে আমাদের পূর্বপুরুষরা আরবের মুসলমানদের আক্রমণের শিকার হতো। আমার দাদার দাদার সময়ে এক প্রলয়ঙ্করী বন্যায় এই পরিবারটি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। পূর্ব পুরুষের এক ডায়েরিতে ঘটনাটি পাওয়া যায়। শৈশবে আমাদের বলা হয় আমাদের বংশধর ছিল ভারতীয় হিন্দু যোদ্ধা শ্রেণী 'রাজপুত'। মুসলমানদের আক্রমণের সময় এরা ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হয়, অথবা আমরা এসেছি আরবদের থেকে যারা আমাদের স্বদেশ সিন্ধু দিয়ে ভারতে প্রবেশের সময় এর নাম দিয়ে যায় 'ইসলামের দ্বার'।

ভারত ও পাকিস্তানে ভুট্টোদের শত শত হাজার হাজার লোক কৃষক থেকে শুরু করে ভূস্বামী পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। আমাদের পরিবার বিখ্যাত সর্দার দুদু খানের বংশধরদের থেকে এসেছে। সিন্ধুর উঁচু অঞ্চলে কয়েকটি গ্রাম- মিরপুর ভুট্টোতে চাচার মুমতাজের পরিবার থাকত। গারহি খোদা বকশে আমাদের পারিবারিক গোরস্থান- আমাদের পূর্ব পুরুষের নামে রাখা হয়েছে। তাদের অনেক জমি ছিল এবং শত বছর ধরে এখানের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করত। নদেরাতে গারহি খোদা বকশে তাদের পরবর্তী পরিবারের একটা বাড়ি আছে যেখানে বাবা, ভাই ঈদের দিনগুলোতে যেতেন চিনি ও গোলাপজলে রান্না করা

www.pathagar.com

ভাতের দাওয়াত দিতে। কিন্তু দাদার সময় থেকে লারকানায় আল-মুর্তাজা আমাদের পারিবারের সত্যিকারের কেন্দ্র।

১৯৫৮ সালে প্রথম ভূমি জরিপের আগে ভুট্টো পরিবার প্রদেশটি কৃষি শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় নিয়োগ কর্তা। আমাদের জমি সিন্ধুর অন্যান্য ভূমি মালিকদের জমির মত একরে পরিমাপ না করে বর্গমাইলে করা হত। ১৮৪৩ সালে সিন্ধু বিজয়ী ব্রিটিশ নাগরিক চার্লস ন্যাপিয়ায়ের চমকপ্রদ গল্প শৈশবে শুনতে পছন্দ করতাম। ন্যাপিয়ার প্রদেশটি ঘুরার সময় তিনি বারবার ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করতেন 'এসব কার জমি?' উত্তর আসত 'ভুট্টোর জমি।' তিনি আদেশ করতেন, 'ভুট্টোর জমি শেষ হলে আমাকে জাগিয়ে দেবে।' কিছু সময় পর নিজেই জেগে উঠে তিনি প্রশ্ন করতেন। 'এই জমির মালিক কে?' ড্রাইভার পুনরায় বলে 'ভুট্টো'।

বাবা পূর্ব পুরুষের গল্প বলতে পছন্দ করতেন। বাবা শুরু করতেন একটা চমৎকার গল্প দিয়ে, তোমার প্রপিতামহ মীর গোলাম মুর্তাজা ভুট্টো ছিলেন ২১ বছর বয়সে একজন সুপুরুষ ও সাহসী যুবক। সিন্ধুতে সকল যুবতী এক ব্রিটিশ যুবতীসহ তার প্রেমে পড়ে যায়। সেই সময়ে কোনো বিদেশী যুবতীকে বিয়ে করা ছিল 'হারাম' কিন্তু তিনি বিদেশিনীর ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। এক ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা কর্নেল সে-ই নিষিদ্ধ সম্পর্কের কথা শুনে তোমার প্রপিতামহকে ডেকে পাঠান।

তিনি ভুট্টো পরিবারের নিজের শহর লারকানায় ছিলেন এটা ব্রিটিশ কর্মকর্তার জন্য কোনো ব্যাপার না। চোখ যতদূর যায় তার চেয়েও বেশি জমি ভুট্টো পরিবারের এটাও কোনো বিষয় না তার জন্য। ব্রিটিশদের আমাদের ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান ছিল না বললেই চলে। তারা যা দেখতো সেটা হলো আমাদের বাদামী রঙ-এর গায়ের চামড়া।

তোমার প্রপিতামহ কর্নেলের সামনে গেলে তিনি বলেন, 'তোমার কত সাহস তুমি ব্রিটিশ যুবতীর ভালবাসা পেতে চাও?' কর্নেল চাবুক তুলে নিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে উচিৎ শিক্ষা দেব।' কিন্তু যখন তিনি গোলাম মুর্তাজাকে চাবুক মারার জন্য হাত তুললেন তোমার প্রপিতামহ চাবুক কেড়ে নিয়ে কর্নেলকে চাবুক মারা শুরু করলেন। সাহায্যের জন্য চিৎকার করে সে টেবিলের নিচে আশ্রয় নিল যতক্ষণ না গোলাম মুর্তাজা সদর্পে বের হয়ে না আসল। গোলাম মুর্তাজার পরিবার ও বন্ধুবান্ধব তাকে বলল 'তুমি পালিয়ে যাও'। ব্রিটিশরা তোমাকে হত্যা করবে। তাই তোমার প্রপিতামহ লারকানা ত্যাগ করলেন, কিন্তু একা নয় শহরের সেই ব্রিটিশ যুবতীসহ, যে তার সঙ্গে যাবে বলে জেদ ধরেছিল।

ব্রিটিশরা তার পিছু নিল। গোলাম মুর্তাজা তার সহচরদের বললেন, তোমরা ভাগ হয়ে যাও। একদল আমার সাথে আস। বাকিরা ব্রিটিশ যুবতীর সাথে যাও। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই তরুণীকে ব্রিটিশদের হাতে দিও না। এটা মর্যাদার ব্যাপার। ব্রিটিশদের ফাঁকি দেয়ার জন্য তারা সিন্ধু নদের পার ধরে ভিন্ন পথে দ্রুত অগ্রসর হল। ব্রিটিশরা যুবতীসহ দলকে নাগাল পেয়ে গেল কারণ যুবতী তোমার প্রপিতামহের সমান দ্রুত যেতে পারেনি। ব্রিটিশদের বোকা বানানোর জন্য তোমার প্রপিতামহের সহচর বন্ধু একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিল এবং এর মুখটি লতা-পাতা দিয়ে ঢেকে দিয়ে ওই মহিলাকে লুকিয়ে রেখেছিল। ব্রিটিশরা সুড়ঙ্গ দেখতে পেলে তোমার প্রপিতামহের বন্ধুরা মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা গোলাম

www.pathagar.com

মুর্তাজাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তরুণীকে তারা ব্রিটিশদের হাতে সমর্পণ করবে না। শত্রুর কাছে পরাজিত হওয়ার অসম্মান তারা সহ্য করতে পারেনি। ব্রিটিশরা তরুণীর কাছে পৌঁছামাত্রই তোমার প্রপিতামহের বন্ধু তরুণীকে হত্যা করে।

গল্পের এখানে আমাদের চোখ বিস্ফোরিত হয়। কিন্তু সবেমাত্র গল্পের শুরু। আমাদের প্রপিতামহ স্বায়ত্তশাসিত বাহওয়ালপুরে পালিয়ে যান। কিন্তু ব্রিটিশরা প্রদেশটি আক্রমণ করার হুমকি দিলে আমার প্রপিতামহ নবাবকে তার আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সিন্ধু পার হলেন আফগানিস্তানের অভয়ারণ্যের জন্য। সেখানে তিনি রাজপরিবারের অতিথি হলেন। আক্রোশে ব্রিটিশরা তার সব জমি দখল করে নিল। আমাদের বাড়ি ও সিন্ধুর কার্পেট নিলামে তোলা হল।

আমদানিকৃত সিল্ক, পুরনো দিনের রেশম ও মখমলে তৈরি সোফা, খাঁটি সোনা ও রূপার অলংকারসমূহ, ধর্মীয় ছুটির দিনে হাজার হাজার অনুসারীদের পরিবারের রান্নার জন্য বিশাল পাত্র, অনুষ্ঠানের জন্য তাঁবু সকল কিছুই বিক্রি করে দেয়া হয়। গোলাম মুর্তাজাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে কারণ ব্রিটিশদের অমান্য করা অচিন্তনীয়। তারা যেন দেবতা। ভারতের কিছু অংশে স্বদেশীরা একই রাস্তায় হাঁটতে পারতো না, যে রাস্তায় ব্রিটিশরা হাঁটত। ব্রিটিশদের কোনো প্রতিউত্তর করতে পারত না আঘাত করা তো দূরের কথা।

পরিশেষে ব্রিটিশদের সঙ্গে একটা সমঝোতা হল এবং গোলাম মুর্তাজা লারকানায় ফিরে এলেন। কিন্তু তার দিন ফুরিয়ে এলো। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং ওজন কমতে শুরু করল। হেকিমি ও গ্রাম্য ডাক্তার বিষক্রিয়া সন্দেহ করল কিন্তু কেউই উৎস খুঁজে পেল না। তোমার প্রপিতামহ খাদ্যদ্রব্য ও পানির পরীক্ষক নিয়োগ করলেন কিন্তু বিষক্রিয়া চলতে থাকে। অবশেষে ২৭ বছর বয়সে তিনি মারা গেলেন। কিছুদিন পরেই রহস্য উদঘাটিত হল– রাতে খাবার পর তিনি যে হুক্কা খেতেন তা থেকে বিষক্রিয়া হয়।

আমি পরিবারের এসব গল্প শুনতে পছন্দ করতাম। আমার ভাই মীর মুর্তাজা ও শাহনেওয়াজও পছন্দ করত এবং ওরা প্রপিতামহের সঙ্গে নিজেদের এক করে ফেলত। আমাদের পূর্বপুরুষের প্রতিকূলতা আমাদের নৈতিক বোধ তৈরি করত যেমন আমার বাবাও তা চেয়েছেন। বিশ্বস্ততা। সম্মান। নিয়মনীতি।

আমার পিতামহ গোলাম মুর্তাজা ভুট্টোর পুত্র স্যার শাহ নেওয়াজ প্রথম ব্যক্তি যিনি ভুট্টো পরিবারে সামন্তবাদী প্রথা ভেঙে দেয়া শুরু করেন। এই সামন্তপ্রথা পুরো সমাজে ব্যবস্থাকে ব্যহত করছিল। তার সময় পর্যন্ত, ভুট্টো পরিবারে শুধু তাদের চাচাতো ভাইবোনের মধ্যেই বিয়ে হতো। ইসলাম নারীদের সম্পদের অধিকার দিয়েছে তাই সম্পদ নিজেদের মধ্যে ধরে রাখার একমাত্র উপায় নিজেদের মধ্যে বিয়ে। এই কারণে বাবার বিয়ে তার চাচাতো বোন আমির-এর সাথে হওয়ার কথা হয়েছিল যখন বাবার বয়স ১২ বছর এবং আমিরের ৮ কি ৯ বছর। বাবা বিয়ে না করার জন্যে জেদ ধরলো কিন্তু পিতামহ তাকে ইংল্যান্ড থেকে ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম এনে দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি রাজি হন। বিয়ের পর আমির ফিরে গেল তার পরিবারের সাথে থাকার জন্য এবং বাবা স্কুলে নিয়মিত যাওয়া শুরু করলেন। বাবার মনে এই নিয়ে অসমতার এক গভীর রেখাপাত করে কারণ, একজন নারী পরিবারের বিয়েতে বাধ্য এই বিষয়টি তাকে মনবেদনা দেয়।

www.pathagar.com

অন্তত পক্ষে আমিরের বিয়ে হলো। উপযুক্ত চাচাতো ভাই পাওয়া না গেলে ভুট্টো পরিবারের নারীদের বিয়েই হতো না। এ কারণে আমার ফুফুরা, পিতামহের মেয়েরা সারা জীবন একাই ছিল। পরিবার থেকে বাধা সত্ত্বেও, আমার পিতামহ তার দ্বিতীয় বিয়ের সময় থেকে তার মেয়েদের ভুট্টো পরিবারের বাইরে বিয়ে দেয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু এগুলো প্রেমের বিয়ে নয় বরং পরিবারের আয়োজনে বিয়ে। এক প্রজন্ম পরে আমার বোন সনম প্রথম নারী যে তার বিয়ের সিদ্ধান্ত নিজে নেয়। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি গতানুগতিক নিয়মে পরিবারের সিদ্ধান্তেই বিয়ে করেছি।

তারপরও আমার পিতামহকে অনেক প্রগতিশীল বলা চলে। তিনি তার ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করেছেন। মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়েছেন যেটা অন্যান্য ভূস্বামীদের চোখে কলঙ্কজনক। অনেক ভূস্বামী তাদের পুত্রদেরকেও শিক্ষিত করতো না। আমার ছেলেদের জমি আছে। তাদের নিজস্ব আয় আছে। তারা কখনো কারো অধীনে কাজ করবে না। কন্যারাও জমি পাবে। তাদেরকে তাদের স্বামী অথবা তাদের ভাই দেখা শোনা করবে। তাহলে পড়া-লেখার দরকার কি?

সামন্তবাদী নিয়মে এরকমই চলছে।

আমার পিতামহ ব্রিটিশ রাজত্বকালে বোম্বেতে সরকারি চাকরি করতেন। তিনি প্রথমত সেখানে শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানদের অগ্রসরতা প্রত্যক্ষ করেছেন। স্যার শাহ নেওয়াজ তার নিজের সন্তানদের শিক্ষিত করে সিন্ধু জমিদারদের মধ্যে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন যাতে ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পরও স্বাধীন পাকিস্তানে আমাদের সমাজ অচল না হয়ে পড়ে। সমালোচনা উপেক্ষা করেও তিনি বাবাকে বিদেশে পাঠিয়েছেন উচ্চ শিক্ষার জন্য। বাবা তাকে নিরাশ করেননি, বাবা বাকলেতে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চে আইন অধ্যয়ন করে লিংকনস ইন-এ যোগ দেন। সেখান থেকে এসে পাকিস্তানে আইন পেশায় নিয়োজিত হন। অপরপক্ষে আমার মা শহুরে শিল্পপতি ব্যবসায়ী পরিবার থেকে এসেছেন। যার চিন্তা চেতনা শহুরে, নাগরিক জমিদার শ্রেণী থেকে ভিন্ন। সে সময়ে ভুট্টো পরিবারের নারীরা পর্দা মেনে চলত। চার দেয়ালের বাইরে বের হতো না, বুরকা পরত। সে সময়ে মা ও তার বোনেরা করাচিতে ঘোমটা না দিয়ে ঘুরে বেড়াতো এবং নিজেরা গাড়ি চালাত। ইরানী ব্যবসায়ীর কন্যা হয়েও তারা কলেজে লেখাপড়া করেছে এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পরে আধাসামরিক বাহিনীতে উর্ধ্বতন মহিলা কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি করেছেন। ভুট্টো পরিবারের নারীদের জন্য এরকম খোলামেলা অবস্থান অসম্ভব ছিল।

১৯৫১ সালে মা ও বাবার বিয়ে হওয়ার পর, ভুট্টো অন্য পরিবারের নারীদের মতো পর্দা মেনে চলতেন। সপ্তাহে একবার শুধু তার বাবার বাড়িতে যাওয়ার সময় বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হলো। পুরোনো প্রথাগুলো সকলের কাছে ক্রমশ ক্লান্তিকর হয়ে যায়। একবার আমার মাতামহ করাচির বাড়ির বাইরে যেতে চাইলেন কিন্তু কোনো ড্রাইভার পাওয়া যাচ্ছিল না, পরে তিনি মা'কে গাড়ি চালাতে বললেন। পরিবারটি আল-মুর্তাজায় আসলে বাবা মায়ের সঙ্গে মহিলাদের থাকার কোয়ার্টারে থাকতে চেয়েছিলেন। ৭০ ক্লিফটনের বাড়িটি নির্মিত হলে মহিলাদের জন্য আলাদা কোনো গৃহ নির্মাণ করা হয়নি যদিও পিতামহ বাড়ির বিপরীতে একটা বাড়ি কিনেছিলেন তার পুরুষ অতিথিদের সাথে স্বাক্ষাৎ করার জন্য। পাকিস্তানে একটি নতুন ও অধিকতর আলোকিত প্রজন্মের জন্ম হচ্ছে।

www.pathagar.com

আমাদের পুরুষ শাসিত সমাজে, ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করে। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, খাবার সময়ও ছেলেকে দেয়া হয় আগে আর মেয়ে অপেক্ষা করে। এ ব্যাপারে আমাদের পরিবারে মোটেই কোনো বৈষম্য ছিল না। কোনো কিছু হলে আমি আগে পেতাম। চার জনের মধ্যে আমি বড়, আমার জন্ম হয়েছে ১৯৫৩ সালের ২১ জুন করাচিতে। আমার ত্বক গোলাপী হওয়ায় আমাকে পিংকী নামে ডাকা হত। আমার ভাই মুর্তাজার জন্ম আমার এক বছর পরে, সনম ১৯৫৭ সালে এবং শাহ্ নেওয়াজ ১৯৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করে। জন্ম হওয়ার পর থেকেই পরিবারে আমার একটা বিশেষ ও অন্তরঙ্গ অবস্থান ছিল। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা যখন বাবাকে জাতিসংঘে পাঠান তখন আমার বয়স চার, বাবার ২৮ বছর। এরপরেও প্রেসডেন্ট আইয়ুব খানের সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী, জ্বালানিমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে সাত বছর দায়িত্ব পালন করেন। এ জন্য মা ও বাবাকে বেশির ভাগ সময় বাড়ির বাইরে তো বটেই দেশের বাইরেও থাকতে হয়েছে।

আমি বাবাকে পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় যতনা দেখেছি– জাতিসংঘে পাকিস্তান ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পক্ষে কথা বলতে, ১৯৬০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্য ও কারিগরি সাহায্যের জন্য চুক্তির ব্যাপারে কথা, ১৯৬৩ সালে নিষিদ্ধ পিকিং-এ সীমান্ত চুক্তি, যাতে পাকিস্তানকে বিতর্কিত ৭৫০ বর্গমাইল অঞ্চল ছেড়ে দেয়া হয়– তার চেয়ে অনেক কম তাকে বাড়িতে দেখেছি। বাবার ভ্রমণের সময় মা'ও তার সঙ্গে যেতেন। ভাইবোন ও কাজের লোকজন আমার উপর ছেড়ে দিয়ে যেতেন। অন্যদের দেখাশোনার দায়িত্বও বাবা-মা আমাকে দিতেন। 'তুমি সবার বড়' মনে রেখ।

আট বছর বয়সে মা-বাবার বাইরে যাওয়ার সময় আমার উপর বাড়ির দায়িত্ব পড়ল। মা খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসপত্রের জন্য আমাকে টাকা দিয়ে যেতেন। সেই টাকা আমি বালিশের নিচে লুকিয়ে রাখতাম। যদিও তখন আমি স্কুলে মাত্র অঙ্ক শিখছি। প্রতি রাতে মায়ের অবর্তমানে রান্নাঘরে টুলের উপর উঠে আমাদের বিশ্বস্ত মেজর-ডোমো বাবু'র কাছ থেকে হিসেবের খাতা পরীক্ষা করার ভাব দেখাতাম। আমার মনে নেই, কখনো তার হিসেবে ভুল ধরতে পেরেছিলাম কি-না। ছোট ছোট অঙ্কের হিসেব ছিল। সে সময় দশ রূপিতে প্রায় দুই ডলার, পুরো পরিবারের খাবার চলত।

আমাদের বাড়িতে শিক্ষার গুরুত্ব ছিল বেশি। তার বাবার মত, আমার বাবা চেয়েছেন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও প্রগতিশীল পাকিস্তানি হয়ে গড়ে উঠুক। তিন বছর বয়সে আমাকে পাঠানো হলো লেডি জেনিংস নার্সারি স্কুলে, পাঁচ-বছর বয়সে করাচির অন্যতম কনভেন্ট অব জিসাস অ্যান্ড মেরি স্কুলে। সি.জে.এম-এর মাধ্যম ছিল ইংরেজি। আমরা বাসায় বাবা-মার মাতৃভাষা সিন্ধি ও ফারসি অথবা জাতীয় ভাষা উর্দুর চেয়ে ইংরেজি ব্যবহার করতাম বেশি। আইরিশ পাদ্রী সিজেএম-এর শিক্ষিকা, বড় ছাত্রদের 'ঐশী' প্রেরণামূলক নাম দিয়ে দলে ভাগ করলেও কখনো আমাদের খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে চেষ্টা করেননি। স্কুলটি ছিল মিশনারিদের আয়ের ভাল উৎস। তাই তারা কিছু সংখ্যক মুসলমান পরিবারকে যারা যথেষ্ট ধনী ও তাদের সন্তানদের পড়ানোর সময় খ্রীষ্টধর্মে দিক্ষিত করার ঝুঁকি নেননি।

বাবা আমাদের বারবার বলেন, 'আমি তোমাদের কাছ থেকে শুধু একটি জিনিস চাই আর তা হল তোমরা তোমাদের লেখাপড়ায় ভাল কর। আমরা বড় হলে বাবা আমাদের

www.pathagar.com

জন্য স্কুলের পরে বিকেলে গৃহ শিক্ষক রেখে দেন গণিত ও ইংরেজি পড়ানোর জন্য এবং তিনি পৃথিবীর যেখানে থাকেন না কেন টেলিফোন করে স্কুলে আমাদের অবস্থা জেনে নিতেন। ভাগ্যবসত আমি ভাল ছাত্র ছিলাম। এজন্য আমার জন্য একটা বড় পরিকল্পনা হল– আমাকে ভুট্টো পরিবারের প্রথম নারী হিসেবে বাইরে পাঠিয়ে পড়াশোনা করাবেন।

'তোমাদের স্যুটকেস গুছাও, তোমাদের বিমানবন্দরে নিয়ে যাব বিদায় জানাতে,' আমার যতটা মনে পড়ে তিনি আমাদের চারজনকেই বললেন। 'পিংকি এখন ছোট একটা মেয়ে ফিরবে সুন্দর যুবতী হয়ে, শাড়ি পরে। শাহনেওয়াজ এতো বেশি কাপড়-চোপড় নেবে যে, তার স্যুটকেসে ধরবে না, বাবুকে ডাকতে হবে, স্যুটকেসের উপরে বসে বসে চাপ দিয়ে স্যুটকেস লাগাতে।'

আমাদের পরিবারে এমন কোনো প্রশ্ন কখনো আসেনি যে ভাইদের মত আমাকেও আমার বোনদের সমান সুযোগ দিতে হবে। সমান অধিকারের বিষয়টি ইসলামেও নেই। শৈশবে আমরা জেনেছিলাম যে, আমাদের ধর্মের পুরুষের ব্যাখ্যা নারীদের সুযোগ সীমিত করেছে কিন্তু আমাদের ধর্মে তা করে না। শুরু থেকেই ইসলাম নারীদের প্রতি প্রগতিশীল। আরবে মেয়ে শিশু হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন নবী মুহম্মদ (সা.), নারীদের জন্যে শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছিলেন এবং পশ্চিমা সমাজের পূর্বেই নারীদের উত্তরাধিকারের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রথম ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত নারী বিবি খাদিজা ছিলেন বিধবা এবং তিনি তার নিজের ব্যবসা পরিচালনা করতেন। তিনি নবী মুহম্মদ (স.)কে নিয়োগ করেন তার ব্যবসায়ীক কাজে এবং পরে তিনি তাকে বিয়ে করেন। উম্মী-উম্মারা পুরুষের পাশে এক সঙ্গে যুদ্ধ করতেন ইসলামের প্রথম দিকের যুদ্ধে। শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের শক্তিশালী তরবারিতূল্য বাহু মুহম্মদ (সা.) এর জীবন রক্ষা করে। দক্ষিণ ভারতের মহিলা শাসক চাঁদ বিবি মুগল সম্রাট আকবরকে পরাজিত করে এবং তাকে বাধ্য করে তার সঙ্গে একটা শান্তি চুক্তি করতে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নুরজাহানও ভারতের অপ্রকাশ্য শাসনকর্তা ছিলেন এবং প্রশাসনে বেশ দক্ষ ছিলেন। মুসলিম ইতিহাস নারীদের বিরত্ব গাথায় পূর্ণ। নারীরা পুরুষদের মতই সফল প্রতিটা ক্ষেত্রে। কিছু করার ব্যাপারে ইসলাম নারীদের নিরুৎসাহিত করেনি, আমাকেও না। 'আমি দেখেছি এক নারীকে তাদের শাসন করতে এবং তাকে দেয়া হয়েছে সবকিছু প্রচুর পরিমাণে এবং একটা সম্মানজনক স্থান,' পবিত্র কোরানের সুরা আন-এ বলা হয়েছে। 'পুরুষ যা অর্জন করে তাকে তা দেয়া হয় আর নারী যা অর্জন করে তাকেও তা দেয়া হয়', সুরা নীসায় ব্যক্ত হয়েছে।

প্রত্যেক বিকেলে স্কুলের পড়া শেষ করে মৌলভীর কাছে ধর্ম বিষয়ে শেখার জন্য আমরা কোরানের বিভিন্ন সুরা পড়তাম। আরবিতে কোরান পড়া ও এর অর্থ শেখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। কঠিন আরবি শেখার চেষ্টা করে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যয় করেছি। উর্দুতে আমরা যে বর্ণমালা ব্যবহার করি তা আরবি বর্ণমালার সঙ্গে মিল থাকলেও ব্যাকরণ ও অর্থে মিল নেই যেমন ইংরেজি ও ফরাসির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে।

সর্বদা পিতামাতার প্রতি দয়া প্রদর্শন ও তাদের মেনে চলার ব্যাপারে কোরানের আদেশ উদ্ধৃতি করে মৌলভী বলতেন 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।' আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, মা এই শিক্ষা দিতেন যা মৌলভীও আমাদের পড়াতেন যে, পরকালে আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে ইহকালে আমাদের কর্মের দ্বারা। 'তোমাকে আগুনের পাহাড় অতিক্রম

করতে হবে একটা পুলের উপর দিয়ে আর পুলটা চুলের মত সরু হবে। তুমি কি জান না চুল কত সরু?' অনেক নাটকীয় করে বলত। যারা পাপ করেছে তারা দোজখের আগুনে পড়ে যবে এবং জ্বলতে থাকবে কিন্তু যারা ভাল করেছে তারা পার হয়ে বেহেশতে যাবে যেখানে পানির মত দুধ ও মধু বহমান।

মা আমাকে নামাজের নিয়ম-কানুন শিখিয়েছেন। তিনি তার বিশ্বাসকে গভীরভাবে গ্রহণ করেছিলেন। পৃথিবীর যেখানেই তিনি থাকেন, যাই করেন না কেন দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। নয় বছর বয়সে তিনি আমাকেও আমার শোবার ঘর থেকে ডেকে নিয়ে ফজরের নামাজ পড়াতে শুরু করলেন। এক সঙ্গে আমরা ওজু করতাম পবিত্র হয়ে আল্লার সামনে নিজেদের উপস্থাপন করতাম এবং কাবা ঘরের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করতাম।

অধিকাংশ ইরানিদের মত মা'ও শিয়া মুসলমান, কিন্তু কখনো এ বিষয়ে সমস্যা হয়নি। হাজার বছর ধরে শিয়া এবং সুন্নী এক সঙ্গে বসবাস করেছে, এদের মধ্যে বিয়ে হয়েছে এবং সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্য কম। অনেক ভাগ থাকলেও মৌলিক বিষয়টা হল, সকল মুসলমানকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নত হতে হবে এবং আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই, মুহম্মদ তার প্রেরিত শেষ নবী। এটাই মুসলমানদের কোরানের বাণী এবং আমাদের পরিবারের মূল বিষয়বস্তু।

যে মাসে নবীর নাতী ইমাম হোসেন ইরাকের কারবালায় নিহত হয় ও মহররম মাসে এই ঘটনাকে স্মরণ করা হয়। কালো কাপড় পড়ে আমি মায়ের সঙ্গে যেতাম অন্য মহিলাদের সঙ্গে শিয়াদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। মুসলমানদের এই শোক পালন সুন্নীদের চেয়ে শিয়ারা অনেক বিশাল পরিসরে করে। তাই মা আমাকে বলতেন 'মনোযোগ দিয়ে শুনো'। আমি কখনোই বক্তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারিনি যিনি ইমাম হোসেনের সেই মর্মান্তিক কাহিনী নাটকীয়ভাবে পুনরাবৃত্তি করেন– কারবালায় ইমাম হোসেন ও তার ছোট বাহিনী পরাজিত হওয়ার পরে সেখানে পাশবিকভাবে এজিদের সৈন্যরা তাকে জবাই করে হত্যা করে। কেউ তার কাছ থেকে রেহাই পায়নি, এমনকি শিশুদেরও এজিদ হত্যা করেছে। ইমাম হোসেনকে শিরচ্ছেদ করা হয়েছে এবং তার বোন জয়নবকে নগ্নশিরে এজিদের কোর্টে গিয়ে দেখতে হয়েছে হোসেনের মাথা নিয়ে জঘন্য খেলা। তার মনের কথাকে বলতে না দিয়ে তাকে অপমান করা হয়েছে, যেমনভাবে হোসেনের অনুসারীদেরও অপমান করা হয়েছে। তাদেরই পরবর্তী প্রজন্ম যারা শিয়া হিসেবে পরিচিত তারা কারবালার এই করুণ কাহিনী মনে রেখেছে।

'শুনুন ছোট্ট বাচ্চা পানির জন্য কাঁদছে' বক্তা বলে উঠলেন, তার কণ্ঠ আবেগপূর্ণ। 'যে মা শুনছে তার শিশুর চিৎকার তার হৃদয়টা অনুভব করুন। যে সুপুরুষ ঘোড়ায় চড়ে পানির জন্যে যাচ্ছে তার দিকে তাকান। সে নদীর কাছে নিচু হল। আমরা তাকে দেখছি নিচু হতে। দেখুন! দেখুন! লোকগুলো তলোয়ার নিয়ে তাকে আক্রমণ করছে....' যখন তিনি বললেন, তখন কিছু মহিলা তাদের বুকে আঘাত করে মাতম শুরু করল। কাহিনীর বর্ণনা ছিল খুবই জীবন্ত, আমি প্রায়ই কেঁদে ফেলেছিলাম।

আমার বাবা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন তার দেশ ও সন্তানদের বিশ শতকের আধুনিকতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। 'সন্তানরা কি পরিবারের মধ্যেই বিয়ে করবে?' মা'কে শুনলাম

www.pathagar.com

। তার উত্তরের প্রতীক্ষায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। 'আমি চাই ...র চাচাতো বোনদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আমাদের গৃহের চার দেয়ালের ...টকে রাখতে, তেমনি চাই আমার মেয়েদের, আত্মীয়স্বজনের গৃহের মধ্যে কবর হোক।' বাবার এই উক্তিতে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। 'ওদের আগে শিক্ষা শেষ করতে দাও। পরে ওরাই সিদ্ধান্ত নেবে জীবনে কি করবে।'

যেদিন মা আমাকে প্রথমবার বোরকা পরালেন, বাবার সেদিনের প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই আন্তরিক। করাচি থেকে ট্রেনে লারকানা আসব মা তার ব্যাগ থেকে একটা লম্বা কাপড় বের করে আমাকে পরিয়ে দিলেন। 'তুমি আর শিশু নও', কিছুটা বিরক্তি নিয়ে মা বললেন। শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণ করলে যে সংস্কৃতি জমিদার পরিবারে রক্ষণশীল কন্যাদের মেনে চলতে হয়, মা সেই পুরনো সংস্কৃতি পালন করায় আমার মনে হয় শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছি। কিন্তু আমার অশ্বস্তি লাগছে। আকাশ, ঘাস, ফুলের রং নেই, বিবর্ণ হয়ে গেছে, ধূসর হয়ে গেছে। চোখে সকল কিছুই ঝাপসা লাগছে। যে কাপড় আমি মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরেছি, ট্রেন থেকে ওঠা নামা ও হাঁটার সময় আমার অসুবিধে হচ্ছে। বাতাস যে ধরনের হোক না কেন গায়ে লাগছে না, মুখ বেয়ে ঘাম পড়তে শুরু করল।

আমরা আল মুর্তাজায় পৌঁছার পর মা বাবাকে বললেন, 'পিংকি আজ প্রথম বোরকা পরেছে।' দীর্ঘক্ষণ কোনো কথা নেই। বাবা বললেন, 'বোরকা পরার দরকার নেই'। 'নবী বলেছেন মনের পর্দাই বড় পর্দা'। তাকে তার চরিত্র ও মন দিয়ে নিজেকে বিচার করতে দাও পোশাকে নয়। আর আমিই প্রথম ভুট্টো পরিবারের প্রথম নারী যে নিরন্তর অন্ধকার জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম।

বাবা আমাকে বহিঃবিশ্বের একজন হতে উৎসাহ দিয়েছেন, তার শিক্ষা আমার মধ্যে ছাপ ফেলেছে। ১৯৬৩ সালের শরতে বাবার সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যক্তিগত রেল ভ্রমণে বাবা আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন 'এটা ঘুমানোর সময় নয়।' একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট গুলিবিদ্ধ হয়েছেন'। আমার বয়স দশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে অল্পই শুনেছি। বাবা প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি সম্পর্কে সর্বশেষ সংবাদ আমাকে পাশে বসিয়ে শুনছিলেন, যার সঙ্গে বাবা হোয়াইট হাউসে কয়েকবার দেখা করেছেন এবং তার উদার সমাজবাদ নীতির জন্যে প্রশংসা করেছেন।

মাঝেমধ্যেই পাকিস্তানে আসা বিদেশী প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করানোর জন্য আমার ভাই বোনদের ও আমাকে বাবা নিয়ে যেতেন। একদিন তিনি যখন বললেন চীনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের দেখা হবে, আমি খুব আবেগাপ্লুত হয়েছিলাম। বাবা প্রায়ই চীনা বিপ্লবের কথা এবং এর নেতা মাও সেতুং সম্পর্কে বলতেন যে তিনি তার সৈনিক নিয়ে পাহাড় মরুভূমি পাড়ি দিয়েছেন পুরনো সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে তাদের একজন মাও সেতুং হবেন যার টুপি, চীনা বিপ্লবের ব্যক্তিগত উপহার, বাবার ড্রেসিং রুমে ঝুলানো থাকবে। তাৎক্ষণিক নিউইয়র্কের সাকস ফিফথ এভিনিউ থেকে বাবা যে পোশাক এনছেন আমি তা পরে নিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে মাও সেতুং নেই তখন হতাশ হয়েছিলাম, ছিলেন চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই এবং আরো দুজন মন্ত্রী চেন-ই ও লিউ শাও চি যারা পরবর্তীতে সংস্কৃতি বিপ্লবের সময় জেলে মারা যান।

শুধু চৌ এন-লাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ অতিথি নন, যিনি আমার প্রত্যাশা অনুযায়ী ছিলেন

www.pathagar.com

না, আরেকজনের বেলায়ও তাই। আমরা জানলাম একজন ভিআইপি আমাদের এখানে রাতের খাবার খেতে আসবেন কারণ বাড়ির বাইরে আলোকসজ্জা করা হয়েছিল। যখন একটা লিমোজিন গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকল আমরা দোতলা থেকে উঁকি দিয়ে দেখলাম প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও একজন আমেরিকান ভদ্রলোক ৭০ ক্লিফটনের বাড়িতে ঢুকছেন। আমি আমেরিকান লোকটিকে তাৎক্ষণিক চিনতে পারলাম তাকে আমি একটা ফিল্মে দেখেছি। বব হোপকে কেমন লাগলো মা? পরের দিন সকালে মা'কে জিজ্ঞেস করলাম। 'কে'? মা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন। আমি বললাম 'বব হোপ'। 'কি বোকা তুমি' মা বললেন। ' লোকটি ছিল আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট হুবার্ট হামফ্রে। পরে বুঝতে পারলাম হুবার্ট হামফ্রে যুক্তারষ্ট্রের সৈন্যের জন্য ভিয়েতনামে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট সরবরাহের ব্যাপারে পাকিস্তানের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করছেন। ভিয়েতনামের গৃহযুদ্ধে কোনো বিদেশীর জড়ানো নীতিগত দিক থেকে ঠিক নয় মনে করে বাবা তার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন।

আমার বয়স যখন দশ এবং সনম সাত বছরের, মারির পাইন গাছ ঘেরা প্রাক্তন ব্রিটিশ হিল স্টেশনে আমাদের বোর্ডিং স্কুলে পাঠানো হলো। আমাদের গৃহশিক্ষিকা স্বল্প নোটিশে ইংল্যান্ডে ফিরে যাচ্ছেন। মনে হল বের্ডিং স্কুল তড়িৎ সমাধান, বাবা এটা পছন্দ করেছেন, কারণ এই স্কুলের নিয়মানুবর্তীতা আমাদের ভালভাবে গড়ে তুলবে। প্রথমবারের মত আমাকে নিজের বিছানা গোছাতে হয়, জুতো পরিষ্কার করতে হয়, করিডরে পানির টেপ থেকে গোসল ও হাত মুখ ধোঁয়ার জন্যে পানি আনতে হয়। আমার সন্তানদের অন্যদের মত দেখবেন, বাবা স্কুলের কর্তৃপক্ষকে বললেন। আর তারা আমাকে ও সানীকে নিয়ম ভাঙার জন্য পিটিয়ে তাই করলেন।

মারি থাকার সময় বাবা চিঠিতে আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষা চালিয়ে গেলেন। জাকার্তায় জোট নিরপেক্ষ এক শীর্ষ সম্মেলন থেকে ফিরে জাতিসংঘের ক্ষমতাধর দেশগুলোর স্বার্থ ও অবহেলিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বিশাল চিঠি লিখলেন। এক নান সনম ও আমাকে বসিয়ে পুরো চিঠি পড়ে শোনালেন যদিও আমরা কমই বুঝেছিলাম।

মারিতে আমাদের দ্বিতীয় ও শেষবর্ষে সনম ও আমি রাজনীতি সম্পর্কে কিছুটা শিখেছিলাম। ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মির নিয়ে যুদ্ধ শুরু হলে, বাবা জাতিসংঘে গিয়েছিলেন কাশ্মীরী জনগণের অধিকার ও ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলতে, এদিকে কনভেন্ট অব জিসাস অ্যান্ড মেরি নানগন ভারতের আগ্রাসনের সম্ভাবনায় ছাত্রদের প্রস্তুত করে তুলছেন। মারির মাঝখান দিয়ে কাশ্মিরে যাওয়ার রাস্তা, অনেকের মনে হয় ভারতীয় সেনারা এই রাস্তা ব্যবহার করে পাকিস্তানে আক্রমণ করবে।

যেখানে রাতের খাওয়ার পর ছাগলের হাড় দিয়ে কানামাছি আর জ্যাক খেলেছি অথবা বসে ঈনিড ব্লাইটন পড়েছি, এখানে এখন বিমান হামলা প্রশিক্ষণ ও অন্ধকারে কাজ করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছি। নানরা বড় মেয়েদের ছোট মেয়েদের দেখাশোনা করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল করে তুলছেন, আমি সানীকে রাতে স্যান্ডেল পরিয়ে দিতাম যাতে সে ওগুলো খুঁজতে সময় নষ্ট না করে। আমাদের স্কুল সহপাঠীদের অনেকেই বড় সরকারি কর্মকর্তা ও সেনা কর্মকর্তার মেয়ে ছিল এবং আমরা একে অন্যকে ছদ্মনাম দিয়ে দিলাম আর অনুশীলন শুরু করে দিলাম কারণ আমরা যদি শত্রুদের হাতে ধরা পড়ে যাই। কিশোরী হওয়ায় আমরা

www.pathagar.com

অপহরণ হওয়া ও পাহাড়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় সচেতন হয়েছিলাম। তাছাড়া সতেরো দিনের যুদ্ধে আক্রমণের ভয়টা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ।

যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের অবস্থা আরো জটিল করে তুলেছে। তারা যে অস্ত্র পাকিস্তানকে দিয়েছিল কমিউনিস্টদের আক্রমণ ঠেকাতে তা ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে দেখে শঙ্কিত হয়ে জনসন প্রশাসন পুরো উপমহাদেশে তাদের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা জারি করে। অপরদিকে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেই অস্ত্র পাচ্ছে পাকিস্তান পাচ্ছে না। এই প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ২৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের আহ্বানে যুদ্ধ বন্ধ পর্যন্ত আমাদের সৈনিকরা সফলভাবে যুদ্ধ করে গেল। যুদ্ধে পাকিস্তানের জয় হল। আমরা শুধু ভারতীয় আক্রমণকেই প্রতিহত করিনি, ভারতীয়রা আমাদের যতখানি ভূমি দখল করেছিল, তার থেকে অনেক বেশি আমরা তাদেরটা করেছিলাম।

আমাদের আনন্দ ছিল ক্ষণস্থায়ী কারণ তৎকালীন দক্ষিণ রাশিয়ার তাসখন্দ শহরে অনুষ্ঠিত শান্তি চুক্তির সময় আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে যা অর্জন করেছিলাম প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তার পুরোটাই হারালেন। তাসখন্দ চুক্তিতে উভয় দেশ তাদের সৈন্য যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে রাজি হল। বাবা তাতে বিরক্ত হলেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে তিনি পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন। যখন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রি চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরদিন হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন, বাবা মন্তব্য করেছিলেন যে, তিনি আনন্দের অতিশয্যে হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছেন।

চুক্তিপত্রটা যখন জনতার সামনে প্রকাশ করা হল, পুলিশের পাশবিকতার মধ্যেও পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে ব্যাপক আন্দোলনের জন্ম নিল। আন্দোলন তখনও চলছে। আর ভুট্টোদের জীবনও পাল্টে গেল সেই সঙ্গে।

১৯৬৬ সালের জুন মাসে আইয়ুব বাবার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করল। এখন আইয়ুব ও বাবার মধ্যেকার পার্থক্য সুস্পষ্ট এবং রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বাবার জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী হয়ে পড়ল। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যক্তিগত বাহনে লারকানাতে আমাদের শেষ ভ্রমণে জনতা যেন উন্মাদ হয়ে গেল, ট্রেনের সঙ্গে দৌড়াচ্ছে, আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য ট্রেনের হাতল ধরে ঝুলছে। ফখর-ই-এশিয়া- জিন্দাবাদ! এশিয়ার গর্ব দীর্ঘজীবী হোক! ট্রেনের ছাদে উঠে রেললাইনের পাশের ভবনগুলোতে উঠে জনতা উল্লাসে মেতে উঠল। 'ভুট্টো জিন্দাবাদ! দীর্ঘজীবি হোক ভুট্টো!'

আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম লাহোরে, যেখানে বাবা ট্রেন থেকে নেমে পাঞ্জাবের গভর্নরের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। 'ভুট্টো সাহেবের শার্টে রক্ত' কেউ একজন চিৎকার করে উঠল। আমার হৃদয়টা স্তব্ধ হয়ে গেল বাবাকে আসতে না দেখা পর্যন্ত। তিনি জনতার দিকে চেয়ে হাসছেন হাত নাড়ছেন। তার শার্ট ছেঁড়া ছিল এবং গায়ে সামান্যই আঁচড় ছিল, তাছাড়া কিছুই না। তার টাইটাও ছিল না। পরে শুনেছিলাম এটা এক হাজার রূপীতে নিলামে বিক্রি হয়ে ছিল। যখন তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাহনে ফিরে আসলেন জনতা ট্রেন দোলাতে শুরু করল। গতিবেগ বাড়ছে আমি শঙ্কিত ছিলাম যে, ট্রেন না জনতার ভারে কাত হয়ে লাইনচ্যুত হয়।

বাড়িতে নিরাপদে ফিরে আসার পর আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল রাজনীতি। বয়সে ছোট হলেও ঠাণ্ডা লড়াই 'অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা' এসব পরিভাষা আমাদের শব্দভাণ্ডারের অংশ হয়ে গিয়েছিল। আমরা বরং গোলটেবিল বৈঠকের ও শীর্ষ সম্মেলনের ফলাফল শুনতে

www.pathagar.com

বেশি আগ্রহী হয়েছিলাম যেমন অন্য ছেলেমেয়েরা বিশ্বকাপ ক্রিকেটের স্কোর জানতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু ১৯৬৬ সালে আইয়ুব খানের সঙ্গে বাবার সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর 'নাগরিক স্বাধীনতা' 'গণতন্ত্র' এসব শব্দ বেশি উত্থাপিত হয়েছে, যে শব্দগুলোর অধিকাংশই বাবার দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি গঠন পর্যন্ত পাকিস্তানিদের কাছে ছিল নতুন। বস্তুত: পাকিস্তানিরা আইয়ুবের অধীনে রাজনীতিতে সীমিত অংশগ্রহণ করতে পেরেছে।

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, এই মৌলিক চাহিদাগুলোতে পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রতিশ্রুতি ছিল যা লাখ লাখ পাকিস্তানির ছিল না। তাছাড়া যেখানে সকল মুসলমান আল্লাহর ইবাদত করে সেখানে আমাদের দেশের দরিদ্র লোক ধনীদের পা ছুঁয়ে সালাম করে। 'দাঁড়াও! অন্য কারো সামনে নত হয়ো না! তোমরা মানুষ এবং তোমাদের অধিকার আছে!' বাবা পাকিস্তানের দূর-দূরান্তের অবহেলিত জনপদে জনসভায় এই কথাগুলো বললেন। এসব স্থানে– যেখানে পূর্বে কোনো রাজনীতিবিদ যাননি। 'গণতন্ত্রের আহ্বান ধনী ও দরিদ্রের ভোটের মূল্য সমান।

কে ভুট্টো? ভুট্টো কি চায়? কেন লোকে বলে সবাই তার জনসভায় তার কথা শুনতে আসে, তার জনসভায় তো টোঙ্গা বা রিকশাচালক বা ভবঘুরেরা আসে। আইয়ুব খানের গভর্নর সরকার নিয়ন্ত্রিত এক সংবাদপত্রে এই প্রশ্নগুলো করেন। আমি নিজে আদর্শবাদী হওয়ায় এ কথাগুলো শুনে ব্যথিত হলাম, যদিও আমরা উন্নত জীবন-যাপন করছি। স্কুলে পড়ার সুযোগ পাচ্ছি, আমি এই অবহেলিত জনসাধারণকে দেখেছি যাদের জুতো নেই জামা নেই, চুলে জট হওয়া এবং জীর্ণ শিশুসহ যুবতীদের। দরিদ্ররা কি মানুষ নয়? তাছাড়া আমরা কোরান পড়ে জেনেছি আল্লাহর কাছে সবাই সমান। আমার পিতামাতা আমাদের শিখিয়েছেন সবাইকে সম্মান করতে, কাউকে আমাদের পা ধরে সালাম করতে দেননি।

আল্লাহর এমন কোনো আদেশ নেই যে পাকিস্তানে আমরা দরিদ্র থাকব, দরিদ্র জনতা ও জনতার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লাজুক নারীদের প্রতি উদ্দেশ্য করে বাবা বললেন। 'আমাদের দেশ ধনী। এর অনেক সম্পদ আছে। তবে এখানে কেন দারিদ্র, ক্ষুধা, জরা থাকবে?' এই প্রশ্নটি জনতা খুব সহজেই বুঝেছিল। আইয়ুবের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ তার পরিবার ও অন্য কিছু সংখ্যক লোক মাত্র ধনী হয়েছিল। আইয়ুবের এগার বছরের শাসনামলে পাকিস্তানে বাইশ পরিবার নামে খ্যাত একটা গোষ্ঠী পাকিস্তানের সকল ব্যাংক, বীমা কোম্পানি ও বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছিল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে বাবার আহ্বান শত শত হাজার হাজার লোককে আকৃষ্ট করেছিল।

করাচির ৭০ ক্লিফটনের বাড়ির দোতলায় পিপিপি'র শাখা করা হল। আমি চৌদ্দ আর আমার বোন এগার বছর বয়সে চার আনা চাঁদা দিয়ে দলের সদস্য হয়েছিলাম। যেন আমরা প্রতিদিন গেটে অপেক্ষমান লোকদের দলের সদস্য করতে 'ম্যাজর ডেমো' বারুকে সাহায্য করতে পারি। তাছাড়া দিনের সাধারণ কাজকর্মের মধ্যে– কে ফুটবল ও ক্রিকেটে জিতেছে– শুনতাম আইয়ুব শাসকের বাবাকে ঘুষ দেয়ার প্রচেষ্টার কথা। 'তোমার অল্প বয়স, তোমার সামনে সারাটা জীবন পড়ে আছে, আমাদের বিরোধীতা না করে বরং আমাদের সঙ্গে কাজ কর, তোমার সবকিছুই সহজ হবে। আইয়ুব ও তার সহকর্মীরা বাবাকে বলেতেন, ঠিক ওই কথাগুলোই পরে আমি অন্য এক স্বৈরাচারের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে শুনতাম। যখন আইয়ুবের ঘুষের প্রস্তাব বাবাকে দমাতে ব্যর্থ হল তখন মৃত্যুর হুমকি আসতে শুরু করল।

www.pathagar.com

সে সময় সংঘর্ষের বিশ্ব আমার কাছে অপরিচিত ছিল। সে সময়টা ছিল রাজনীতির বিশ্ব যেখানে ছিল বাবার বসবাস, ছিল শিশুদের বিশ্ব, স্কুল ও খেলাধূলা, সৈকতে হাসি তামাশা। কিন্তু দুই জগতের মধ্যে সংঘর্ষ হল যখন বাবার বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের খবর আসতে শুরু করল। পিপিপির রাজনৈতিক প্রাচারাভিযানে রহিমিয়ারখান, সাংঘার ও অন্যান্য বিরতিতে আইয়ুবের সমর্থকেরা বাবার উপর গুলি চালালো। ভাগ্যক্রমে হত্যা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। সাংঘারে বাবার সমর্থকরা তার জীবন রক্ষা করেছিল, তারা বাবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেরাই বুলেটবিদ্ধ হয়।

আমাদের পুরো বাড়ি দুঃশ্চিন্তায় ভারাগ্রস্ত হলেও আমি ভয় পাইনি। এতে কি ভাল থাকতে পারে? পাকিস্তানে আমাদের রাজনৈতিক জীবন ছিল মৃত্যু হুমকি, দুর্নীতি, দ্বন্দ্ব, এসব নিয়েই। আমি ভীত হইনি। এমনকি পাকিস্তান পিপলস পার্টি গঠনের এগার দিন পর বাবাসহ সিনিয়র নেতাদের গ্রেফতার করে জেলে দেয়ার পরও আমার কিছু মনেই হয়নি। স্বৈরাচারদের ধরনই ওইরকম। যেখানেই প্রতিবাদ– গুড়িয়ে দাও। যেখানে ভিন্নমত, গ্রেফতার কর। কোনো আইনের অধীনে করা হবে? আমরাই আইন।

১৯৬৮ সালের আন্দোলন পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিপ্লবী জ্বরে বিশ্ব কাঁপছে। ছাত্ররা প্যারিসে, টোকিও, মেক্সিকো সিটি, বাকলে ও রাওয়ালপিণ্ডিতে ক্যাম্পাসে বিদ্রোহ করছে। পাকিস্তানে আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এই খবরের সঙ্গে সঙ্গে যে, বাবাকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের এক কুখ্যাত কারাগার মেইনওয়ালিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আন্দোলন চলতে থাকে বাবাকে সহিওয়ালে ইঁদুরে ভরা কারাগারে প্রেরণ পর্যন্ত। আন্দোলন থামাতে সরকার সকল স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়।

ইতোমধ্যে আমি আমার শিক্ষাজীবনের সবচেয়ে সঙ্কটময় মুহূর্ত অতিক্রম করছি– ও লেভেল পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং এর সাথে আমার স্যাট পরীক্ষার জন্য আমি তিন বছর পার করেছি, সেই অর্জন ও রেডক্লিফে ভর্তির প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য।

আমি বাবার কাছে। বার্কলেতে যেখানে তিনি নিজেও পড়েছেন, সেখানে ভর্তি হওয়ার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু বাবা রাজি হলেন না। 'ক্যালিফোর্নিয়ার আবহাওয়া খুব বেশি চমৎকার,' বরং বাবা ব্যাখ্যা করে বুঝান 'ম্যাসাচুসেটস-এর তুষার ও বরফ তোমাকে পড়ায় মনোযোগী করবে।

আমার পরীক্ষা না দেয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না, যেহেতু বছরে একবার সাত ডিসেম্বরে পরীক্ষা নিতে তারা আসে। 'তুমি করাচিতে থাক আর লেখাপড়া কর, এই বলে মা তার অন্য সন্তানদের নিয়ে লাহোরে গেলেন বাবার আটকাদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিট হেবিয়াস কার্পাস করার জন্য। আমি ৭০ ক্লিফটনে একা, যেখানটা আন্দোলন-সংঘর্ষ ব্যস্ততম এলাকা বা বাণিজ্যিক এলাকা থেকে অনেক দূরে। কারাগারে বাবা সম্পর্কে চিন্তা না করে আমি আমার লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করলাম, প্রতিদিন গৃহশিক্ষক বাসায় এসে পড়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে বিকেলে, আমি আমার বান্ধবী ফিফি, থামিনেহ, ফাতিমা ও সামিয়ার সঙ্গে সিন্ধু ক্লাবে যোগ দিতাম। সিন্ধু ক্লাব এক সময় ছিল ব্রিটিশদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা, যেখানে 'দেশী ও কুকুর' প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল এখন স্বচ্ছল পাকিস্তানিদের স্পোর্টিং ক্লাব। আমরা স্কোয়াশ খেলতাম ও সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতাম, যদিও আমাদের জানা ছিল সময়টা ভাল না সাধারণভাবে এমন মনে হতো। যখন থেকে বাবা আইয়ুবের বিরোধীতা শুরু করে, তখন আমার বন্ধুর আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষিরা ওদের সতর্ক করে

www.pathagar.com

দিত এই বলে যে, ভুট্টো পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব বিপজ্জনক, এ যেন আইয়ুব সরকারের বিরোধীতার সামিল। সামীয়ার বাবাকে ইন্সপেক্টর জেনারেল স্বয়ং সতর্ক করেন। আমার সঙ্গে তার মেয়ের বন্ধুত্ব তার পরিবারে সমস্যা নিয়ে আসতে পারে। সামীয়া ও আরো কিছু বন্ধুরা সাহসের সঙ্গে আমার সঙ্গে ছিল, যদিও স্কুলের অন্য সহপাঠীরা আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো।

২৮ নভেম্বর বাবা সাহিওয়ান কারাগার থেকে চিঠিতে লিখলেন, 'আমি তোমার ও লেভেল পরীক্ষায় সাফল্য কামনা করছি।' আমি সত্যিই গর্বিত যে, আমার তোমার মত একজন মেধাবী মেয়ে আছে, যে আমার চেয়ে তিন বছর আগে পনের বছর বয়সে 'ও লেভেল' পরীক্ষা দিচ্ছে। এ কারণে বলা যায় তুমি একদিন প্রেসিডেন্ট হতে পার।'

বাবা কারাগারে নির্জনে বন্দি থাকলেও যেভাবে আমার পড়া-লেখার খোঁজ-খবর নিচ্ছেন, তাতে আমার বিশ্বাস করতেই হল যে, তিনি আমার শিক্ষার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। 'আমি জানি তুমি অনেক পড় তাছাড়া তোমার আরো বেশি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়া উচিৎ তার চিঠিতে লিখলেন। তোমার যে বইগুলো দরকার তা তোমার আছে। নেপলিয়ন বোনপার্ট সম্পর্কে পড়, আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসে যিনি একজন মহানায়ক। আমেরিকান বিপ্লব ও আব্রাহাম লিংকন সম্পর্কে পড়। পড় জন রীডের 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন', বিসমার্ক, আতাতুর্ক, মাও সে-তুং, এদের সম্পর্কে পড়তে হবে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস এবং সর্বোপরি ইসলামের ইতিহাস অবশেষে কারা ফরমে স্বাক্ষর 'জুলফিকার আলী ভুট্টো'।

আমি অন্য সবকিছুর চেয়ে পরিবারের সঙ্গে বেশি থাকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি। সনম আমাকে ফোন করে জানালো যে, মা সপ্তাহে দুই-তিন দিন করে বাবার মুক্তির দাবির আন্দোলনে মহিলাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এমনকি খেয়াল রাখছেন প্রত্যেক আন্দোলনকারী প্লাস্টিক ব্যাগে ভেজা তোয়ালে নিয়েছে কিনা, যদি আইয়ুবের দাঙ্গা পুলিশ টিয়ারগ্যাস ছুঁড়ে তাহলে এই ভেজা তোয়ালে দিয়ে চোখ রক্ষা করা যাবে। মাঝে মাঝে পুলিশ বাঁশের লাঠি দিয়ে তাড়া করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে তবুও আন্দোলন বাড়ছে। আইয়ুব সেনাবাহিনীকে আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু সেনারা মহিলাদের গ্রেফতার করতে অসম্মতি জানাল। পরিবর্তে তারা হাত নেড়ে অভিবাদন জানিয়েছে। এমনকি আইয়ুবের আমলেও মহিলাদের সম্মান করা হয়েছে।

ডিসেম্বরে ও-লেভেল পরীক্ষার সময় হলে, দি কনভেন্ট অব জিসাস মেরি আমাদের জন্য ভ্যাটিকান দূতাবাসে ও ক্লিফটনেও পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এর পবিত্রতা ও করাচি বাণিজ্যিক এলাকা থেকে এর দূরত্বের জন্য এটি ছিল নিরাপদ। যখন বৃটেনের ছাত্ররা সুন্দর ক্লাসরুমে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে, আমাদেরকে চার্চ অব রোমের পাকিস্তানের প্রধান কার্যালয়ে পরীক্ষার জন্য ঢুকতে হল।

ইতোমধ্যে সরকারবিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে, পুলিশ আন্দোলনকারীদের কয়েকজনকে গুলি করে হত্যা করলে আইয়ুবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তুঙ্গে ওঠে। তখন আন্দোলনকারীরা আইয়ুবের পদত্যাগ, বাবাসহ সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দাবি করে।

বাবাকে গ্রেফতারের তিন মাস পরে পাকিস্তানের পরিস্থিতি আইয়ুব খানকে বাধ্য করে পিপিপি নেতাদের ছেড়ে দিতে। যে বিমানে বাবাকে লাহোর থেকে লারকানায় আনা হবে সেটিকে দুর্ঘটনায় ফেলা হবে এবং বাবাকে হত্যা করা হবে, এরকম গুজব ছড়ালে এ ধরনের

www.pathagar.com

কিছু হওয়ার আগে বিষয়টি তুলে ধরে মা একটা সংবাদ সম্মেলন করেন। ফলে বাবাকে ট্রেনে লারকানায় আনা হল। আমি জীবনে আর কাউকে দেখে এতোটা খুশি হইনি। কিন্তু আইয়ুবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শেষ হয়নি।

নিচু হও! বাবা আমাকে ও সনমকে চিৎকার করে বললেন। লারকানায় এক বিজয় মিছিলে তার মুক্তির পর যখন আমাদের খোলা গাড়ি জনতার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল যখন জনতা 'জয় ভুট্টো!' ও আইয়ুবের পতন হোক, আইয়ুবের ভাঙ্গা দেয়াল আরেক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও' বলে চিৎকার করছে, তখন আইয়ুবের এক এজেন্ট বাবাকে লক্ষ্য করে সোজাসুজি গুলি ছুঁড়ল। আশ্চর্যের বিষয়, পিস্তল থেকে গুলি বের হলো না, কিন্তু জনতা ক্ষমাহীন।

বাবার বাহুর নিচ থেকে উঁকি দিয়ে দেখলাম এক যুবককে প্রায় ছিড়ে ফেলা হচ্ছে। তার গলা, মাথা, বাহু ও পা এক-একদিকে টানা হচ্ছে। তার মুখ একদিকে, মুখ থেকে রক্ত পড়ছে। আমাকে নিচের দিকে চাপ দিয়ে বাবা বললেন, 'ওসব দেখবে না!' আমি হাঁটুতে ভর করে নিচু হয়ে থাকলাম আর শুনলাম বাবা জনতার দিকে চিৎকার করে বলছেন, তার হত্যার প্রচেষ্টাকারীকে ছেড়ে দিতে। অনিচ্ছুক জনতা তাই করল, কিন্তু দৃশ্যটা কয়েকমাস পর্যন্ত আমার মনে ছিল।

আইয়ুবের স্বৈরাচারীতা ও নির্যাতন-গ্রেফতারের প্রতিবাদে বাবার অনশন ধর্মঘটের দৃশ্য আমি ভুলতে পারি না। তার মুক্তির পর আল-মুর্তাজায় সামিয়ানার নিচে দিনের পর দিন অনশন করেছিলেন। সকল লারকানাবাসী দেখে ভীত হয়ে গিয়েছিল যখন তিনি ক্রমাগত শুকিয়ে যাচ্ছিলেন। 'দয়া করে বাবার দাবি মেনে নাও!' আমি নীরবে আইয়ুব খানের প্রতি আবেদন জানিয়েছি। ভাবছি বাবার সঙ্গে বসে থাকা অনশনরত লোকগুলোকে এতো ভাল দেখাচ্ছে কেন। ওরা রাতে তাদের রুমে যেয়ে খেয়ে আসে, একজন স্টাফ আমাকে গোপনে বলে, 'তোমার বাবাকে আবার বলো না এ কথাটা।'

সারা পাকিস্তানে অনশন ধর্মঘট ব্যাঙের ছাতার মত দ্রুত বিস্তার করলো, বার এসোসিয়েশনের সামনে। শহরের ব্যস্ততম রাস্তায়। বিশাল জনতা প্রতিদিন জড়ো হলো অনশন ধর্মঘটকারীদের নৈতিক সমর্থন ও আইয়ুবের পদত্যাগের দাবিতে। তার পুলিশ বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না বুঝতে পেরে পরিশেষে ২৫ মার্চ ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খান পদত্যাগ করলেন। কিন্তু বিজয়ের ফলাফল ফাকা। সংবিধান অনুসারে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির স্পিকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে, পাকিস্তানে নতুন নেতা সেনা প্রধান ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা দেয়া হলো। আবারো পাকিস্তান সেনা শাসকের মুঠোয়। ইয়াহিয়া তাৎক্ষণিক নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে সামরিক আইন জারি করল।

এপ্রিলে মা বললেন, 'রেডক্লিফ থেকে তোমার একটা চিঠি এসেছে।' সংশয়ে মায়ের কাছ থেকে চিঠিটা নিলাম। 'আমি কি সত্যিই যেতে চেয়েছিলাম?' মনে প্রশ্নের উদয় হল। কলেজ কর্তৃপক্ষ বাবাকে সতর্ক করে দিয়েছিল ১৬ বছর বয়সে আমি রেডক্লিফে ভর্তি হতে পারব না, তারা আমাকে এক বছর অপেক্ষা করতে বলেছেন। কিন্তু বাবা আমাকে পিছিয়ে রাখার কোনো যুক্তি খুঁজে পেলেন না। এর পরিবর্তে তিনি তার বন্ধু হার্ভার্ডের অর্থনীতির অধ্যাপক ও ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত, কেনীথ গলব্র্যাইথের কাছে সাহায্য চাইলেন। আমি ইনভেলপ খুললাম। আমাকে ১৯৬৯-এর শরৎ সেশনে নেয়া হয়েছে। বাবা বিদায় উপহার হিসেবে মুক্তোয় বাঁধানো পবিত্র কোরান দিলেন। তিনি বললেন, 'তুমি

www.pathagar.com

আমেরিকায় অনেক কিছু দেখবে যা তোমাকে বিস্মিত করবে আবার কিছু তোমাকে ব্যথিত করবে। কিন্তু আমি জানি তোমার সহ্য করার ক্ষমতা আছে। সবচেয়ে বড় কথা তোমাকে অনেক পড়তে হবে। তোমার যে সুযোগ আছে পাকিস্তানে খুব কম সংখ্যক লোকেরই তা আছে। তুমি এর সদ্ব্যবহার করবে। কখনো ভুলে যাবে না যে টাকা তুমি খরচ করছ সেটা এদেশের মাটি থেকে আসে। যারা এই মাটিতে পরিশ্রম করে তাদের কাছ থেকে আসে। তুমি তাদের কাছে ঋণী। যে ঋণ তুমি পরিশোধ করতে পার, আল্লার দয়ায়, শিক্ষার মাধ্যমে তাদের জীবনকে উন্নততর করে।'

আগস্টের শেষের দিকে আমি ৭০ ক্লিফটনের কাজ করা কাঠের দরজায় দাঁড়িয়ে আছি, মা আমাকে আমার নতুন পবিত্র কোরান আমার মাথায় দিলেন। আমি চুম্বন করলাম। আর যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে আমরা বিমান বন্দরে রওয়ানা হলাম।

www.pathagar.com

৩

আল-মুর্তাজা'র স্মৃতি

গণতন্ত্রের প্রথম স্বাদ

আল-মুর্তাজায় আমার ও আমার মায়ের বন্দিত্বের দ্বিতীয় মাস পড়তেই লক্ষ্য করলাম বাগানটা প্রায় শেষ। বাবার বন্দিত্ব ও মৃত্যুর পূর্বে এই বিশাল বাগান ও মাঠ রক্ষণাবেক্ষণে দশজন কাজের লোকের দরকার হতো। কিন্তু আল-মুর্তাজাকে আমার ও মা'র জন্য সাবজেলে পরিণত করার পর জিয়ার সামরিক সরকার মাত্র তিনজন মালিকে বাগানে ঢোকার অনুমতি দিয়েছে। সুতরাং বাগানটা বাঁচাবার জন্য আমাকেও কাজে লাগতে হলো।

ফুল শুকিয়ে যাওয়া আমি দেখতে পারি না, বিশেষ করে বাবার পছন্দের গোলাপগুলো। বাবা বিদেশে গেলেই সঙ্গে করে নিয়ে আসতো নানা জাতের ফুল গাছের চারা- বেগুনি, কমলা রঙের গোলাপ যা দেখতে গোলাপের মত না হলেও মাটির তৈরি নিখুঁত ভাস্কর্যের মতো মনে হতো। বাবার পছন্দের ফুল ছিল নীল গোলাপ যাকে 'শান্তির গোলাপ' বলা হতো। এখন গোলাপ বাগানটার সর্বত্র অবহেলার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

এই গরমের সময় প্রতিটি দিন সকাল সাতটা থেকে মালিদেরকে সাহায্য করি বাগানে পানি দিতে, এক বেড থেকে আর এক বেডে। বাড়ির বিভিন্ন দিক থেকে সৈন্যরা আমার উপর নজর রাখে। মালিদেরকে এরা তিনদিন বাগানে পানি দিতে দেয়। সকাল আটটা পর্যন্ত এরা কাজ করে। শেষ গোলাপ পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই প্রথম গোলাপের গোড়াটা শুকাতে শুরু করে। আমি এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। পর্যাপ্ত পানি ছাড়া কি করে এগুলো বাঁচে তা দেখি এবং স্বাধীনতা ছাড়া আমার নিজের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা লাভ করি।

আমার জীবনের সুখময় মুহূর্তগুলো আমি কাটিয়েছি আল-মুর্তাজার এই সব গোলাপ ও ফলফলাদির গাছের শীতল ছায়ায়। দিনের বেলা, অনেক পাকিস্তানি রমণীদের মতো আমার মা তার খোঁপায় গুঁজে রাখতো মিষ্টি সাদা সেই ফুল 'দিন কা রাজা'- দিনের রাজা, বাতাসে ভাসতো তাঁর সুবাস। সূর্যাস্তের সময় বাতাস ভরে যেত 'রাত কি রানী'র সুঘ্রাণে, যা পুরো বাড়িটাকেই মিষ্টতায় ভরে দিত।

www.pathagar.com

পানি আর পানি। হাত ব্যথা না হওয়া পর্যন্ত গাছের পাতা ও লন ভিজাতে থাকতাম। এমনকি হাত দুটোতে ফোসকা পড়ে যেত। মধ্যাহ্নে মা বকতো, যখন আমি হাতের ব্যথায় কাতর হতাম। কেন তুমি নিজে এগুলো করতে যাও?' মা বলেন। 'কিছু একটা করা তো দরকার– আমি মা'কে বলি। কিন্তু এটা তো অনেক বেশি কাজ, মা বলেন। আমি যদি এত কষ্ট করি তবে শরীরের হাড়গুলো ক্লান্ত হয়, তখন আমি অচিন্তনীয় ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ি। এবং আমি সামরিক আইনের অধীনে যে সময়ের অপচয় হচ্ছে তা নিয়ে ভাবতে চাই না।

আমি ফুলের একটি নতুন বেড তৈরি করলাম। কিন্তু চারাগুলো বাঁচলো না। মা অবশ্য তার ঢেড়শ, মরিচ ও পুদিনার বাগান করে যথেষ্ট সফল হয়েছে। আমি কৃতজ্ঞ হই তখন, যখন দেখি শিশ দিলে একজোড়া পোষা সারস ডানা ঝাপটে এগিয়ে আসে এক টুকরো রুটি নিতে। আমি যে বেঁচে আছি তার প্রমাণ হচ্ছে, কোনো পশুকে ডাকলে সে আসে, কোনো চারা লাগালে তা বড় হয়, আমাদের কাজে লাগে।

যখন বাগানে কাজ থাকে না তখন সময় কাটতে চায় না। দাদার আমলের আর্ল স্ট্যানলি গার্ডনারের বইগুলো একবার, দু'বার, বারবার পড়ি, যদিও আমাকে ও মা'কে দিনরাত্রি অন্ধকারে রাখতে প্রায়ই বিদ্যুৎ বন্ধ রাখা হয়। একটা টেলিভিশন সেট আছে, যদি বিদ্যুৎ থাকেও, তাতে দেখার কিছুই থাকে না। বাবার আমলের টেলিভিশনে নাটক, সিনেমা এমনকি যাত্রা পর্যন্ত দেখানো হতো, পাশাপাশি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান যেমন টক শো ও সাহিত্য সম্পর্কিত অনুষ্ঠান দেখানো হতো জনগণকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। আমি এখন টেলিভিশন খুললেই দেখি, শুধু জিয়া আর জিয়া, জিয়ার বক্তৃতা, বক্তৃতার উপর আলোচনা এবং সেন্সর করা খবরে থাকে জিয়া কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ইত্যাদি। প্রতিদিনই ঠিক রাত ৮-১৫ মিনিটে রেডিওতে মা ও আমি বিবিসির উর্দু রিপোর্ট শুনি।

নভেম্বর বিবিসির মাধ্যমেই জানতে পারি যে, একদল লোক ইসলামাবাদে আমেরিকান দূতাবাসে আগুন দিয়েছে এই কারণে যে, তারা মনে করে মক্কার গ্রান্ড মসজিদ দখলে আমেরিকার হাত আছে। আমি আর আমার মা ঘটনাটি শুনে বিস্মিত হই যে, নিরাপত্তার কড়াকড়ি ও সামরিক শাসনের মধ্যেও ইসলামাবাদে বাসভর্তি করে লোক এনে সমাবেশ করার অনুমতি দেয়া হলো, মৌলবাদী ছাত্রদের পৌঁছে দেয়া হলো আমেরিকান দূতাবাসের সামনে আর সেখানে তাদের হাজির করে তাদের দিয়ে দূতাবাস পোড়ানো হলো। কর্তৃপক্ষের সামনেই দূতাবাস পোড়ানো হলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। তারা ধরে নিয়েছিল দোষটা পিপিপির ঘাড়ে চাপানো যাবে। আমেরিকান দূতাবাস পুড়ে ছাই হলো, একজন লোক মারা গেল। আমেরিকার কাছে ক্ষমা চেয়ে ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার কথা বলার জন্য অনুতপ্ত জিয়া টেলিভিশনে ভাষণ দিলেন। কিন্তু তিনি কেন এই খেলা খেললেন তা আজও রহস্যময় রয়ে গেল।

একমাস পরে বিবিসির সংবাদ আরো অনেক বিষোদগারে ভরা ছিল।

১৯৭৯-এর ২৭ নভেম্বর রাশিয়া আফগানিস্তান আক্রমণ করে। বিবিসির খবর শুনে মা আর আমি পরস্পরের প্রতি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকালাম। খবর পেলাম এই ঘটনার রাজনৈতিক পরিণতি ব্যাপক। বৃহৎ শক্তির দ্বন্দ্ব এখন পাকিস্তানের দোরগোড়ায়। যদি আমেরিকা চায় যে পাকিস্তান আফগানিস্তানে সোভিয়েত উপস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষম হোক তাহলে তারা প্রথমে পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে তৎপর হবে। আর যদি আফগানিস্তানে কি হয় দেখা যাক– আমেরিকা যদি বিষয়টি এভাবে নেয় তবে জিয়াউল হকের একনায়কত্ব

www.pathagar.com

শক্তিশালী হবে।

আমেরিকা। সেই আমেরিকাতেই আমি গণতন্ত্রের প্রথম পাঠ নিয়েছি, এবং সেখানেই আমি জীবনের সুখময় চারটি বছর কাটিয়েছি। আমি চোখ বন্ধ করে এখনও দেখতে পাই হার্ভার্ড র‍্যাডক্লিফ ক্যাম্পাস, শরতের হলুদাভ বৃক্ষরাজি শীতের নরম পেলব বরফের শয্যা এবং অনুভব করি বসন্তের প্রথম সুবজ বর্ণকে। র‍্যাডক্লিফের একজন ছাত্র হিসেবে আমি প্রত্যক্ষ করেছি বৃহৎ শক্তিগুলোর স্বার্থপরতার কাছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অসহনীয় অসহায়তা।

পাক-ই-স্তান? পার্ক-ই-স্তান কোথায়? র‍্যাডক্লিফে যখন প্রথমবার যাই তখন আমার নবাগত সহপাঠী জিজ্ঞেস করে। উত্তরটা তখন সহজ ছিলো।

'পাকিস্তান হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মুসলমান দেশ।' আমি উত্তর দেই– কণ্ঠস্বর অনেকটা দূতাবাসের বিবৃতির মত। 'ভারতের দু'পাশে পাকিস্তানের দু'টি অংশ।'

'ওহ, ভারত', স্বস্তির নিঃশ্বাসের সঙ্গে উত্তর আসে। 'তোমরা ভারতের পাশে।'

সেই দেশ যে দেশের সঙ্গে দুটো যুদ্ধ হয়েছে, সেই দেশের সঙ্গে নিজের দেশের পরিচয়ের উল্লেখে আমি সব সময়ই বিব্রত হই। পাকিস্তানের তো আমেরিকা শক্তিশালী মিত্র হওয়ার কথা ছিলো, ভারতের উপর সোভিয়েত প্রভাব, কম্যুনিস্ট চীন, আফগানিস্তান ও ইরানের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত। এসবের বিরুদ্ধে পাকিস্তান একটা বিকল্প হতে পারতো। ১৯৬০ সালের গ্যারী পাওয়ারের দুর্ভাগা প্লেন দুর্ঘটনাসহ ইউ-২ নামক আমেরিকার খবরদারি মিশনের জন্য তারা পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে আমাদের বিমানঘাঁটি ব্যবহার করেছিল। ১৯৭১ সালে ইসলামাবাদ থেকে চীনে হেনরি কিসিঞ্জারের গোপন সদর এতটা ফলপ্রসূ হয়েছিলো যে তা পরবর্তী বছরে প্রেসিডেন্ট নিকসনের ঐতিহাসিক সফরের দরজা খুলে দেয়। অথচ এখন মনে হচ্ছে আমাদের দেশের অস্তিত্ব সম্পর্কেই আমেরিকানদের কোনো ধারণাই নেই।

আমার জীবনের অজ্ঞতার প্রথম ধাক্কা খেলাম যখন দেখলাম তারা ভুট্টো সম্পর্কেও জানে না। পাকিস্তানে ভুট্টোকে সবাই জানে। পাকিস্তানের জনগণ আমার গুণের জন্য আমাকে চেনে না, আমার পরিবারের পরিচিতির কারণে চেনে, আমি কখনও তা জানতে পারিনি। হার্ভার্ডে আমি প্রথমবার মাত্র নিজের নামে পরিচিত হলাম। আমার মা কয়েক সপ্তাহ আমার সঙ্গে ছিলো, এলিয়ট হলে আমার থাকার সুব্যবস্থা করার কাজে, নামাজের কেবলা ঠিক করার জন্য মক্কা শরীফের দিক নির্ণয় করার কাজে সাহায্য করলো। মা আমার জন্য সিল্কের লাইনিং দেয়া আজানুলম্বিত গরম উলের সালোয়ার কামিজ তৈরি করিয়ে দিয়ে গেল।

আমি তার নামাজের নির্দেশ মেনে চলেছি কিন্তু তার দেয়া এই পোশাক পরতে পারিনি, কারণ এটা বৃষ্টিতে-বরফে বাস্তবসম্মত নয় বরং তা অন্য ছাত্রদের থেকে আমাকে পৃথক করে ফেলতো। দ্রুতই সালোয়ার কামিজ ছেড়ে হার্ভার্ড কো-অপারেটিভ থেকে কেনা জিনস-টি-শার্টে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। চুল লম্বা করলাম এবং পুলকিত বোধ করলাম যখন বন্ধুদের বলতে শুনলাম আমি নাকি জোয়ান বয়েজের মত দেখতে। গ্যালনের পর গ্যালন আপেলের রস পান করেছি, ব্রিগহাম আইস ক্রিম পারলার থেকে পেপারমিন্ট আইসক্রিম খেয়েছি

www.pathagar.com

অগণিত এবং বস্টনের রক কনসার্টে নিয়মিত যোগ দিয়েছি। পাশাপাশি আমার স্থানীয় অভিভাবক প্রফেসর ও মিসেস গলব্রেথ-এর গার্ডেন পার্টিতে যোগ দিয়েছি। আমেরিকার অভিনবত্বকে আমি ভালোবেসেছি।

যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। আমি হার্ভার্ড থেকে যুদ্ধবিরতি দিবসে হাজার হাজার ছাত্রের সঙ্গে মিছিল করে বস্টনে গেছি, বিশাল মিছিল করেছি ওয়াশিংটন ডিসিতে। নিষ্ঠুর সত্য হচ্ছে, প্রথমবারের মত টিয়ার গ্যাসে আক্রান্ত হয়েছি, স্নায়ুর কম্পন অনুভব করেছি যখন প্রথমবার 'ব্রিং দ্য বয়েজ হোম নাউ' লেখা ব্যাজ ধারণ করেছি। বিদেশী হিসেবে রাজনৈতিক সংস্পর্শে অংশ নেয়ার অপরাধে বহিষ্কারের ঝুঁকি নিয়েছি। আমি দেশেও ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতা করেছি, আমেরিকাতে যুদ্ধবিরোধী জোয়ারে মনোবল আরো চাঙ্গা হয়েছে। মিছিলে অংশ নেয়া হাজার হাজার ছাত্র-জনগণের সঙ্গে আমার মনোভাবও একইরকম। একটা এশীয় গৃহযুদ্ধে আমেরিকানদের জড়িত হওয়া উচিত নয়। পাকিস্তানে চারটি স্কুলের ছয়টি শাখায় পড়ার চেয়ে আমি হার্ভার্ডের চার বছর খুব উপভোগ করেছি। নারী আন্দোলন চূড়ান্তরূপ লাভ করছে এবং ক্যাম্পাসে বাইবেল হিসেবে খ্যাত কেট মিলেটের 'সেক্সুয়াল পলিটিক্স' এবং মিজ ম্যাগাজিন এর প্রথম সংখ্যাসহ নারী সম্পর্কিত বিপুল বইপত্রে ভরে গেছে হার্ভার্ড বুক শপ। আমরা আদৌ যদি বিয়ে করি- সেখানে যাকে বিয়ে করবো, তার সঙ্গে আমার বা পরস্পরের সম্পর্ক কী হবে এবং কী নতুন নিয়ম মেনে চলবো, এসব বিষয়ে রাতের পর রাত বন্ধুরা মিলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি। পাকিস্তানে আমি সংখ্যালঘুদের একজন যে নিজের বিয়ে ও পরিবার প্রথম লক্ষ্য মনে করে না। হার্ভার্ডে আমি অসংখ্য নারীদের একজন যারা তাদের লিঙ্গের কারণে বাধাগ্রস্ত হয় না। আমার সদ্য জাগ্রত বিশ্বাস বিকশিত হচ্ছে এবং পুরনো ধ্যান-ধ্যারনা ঝড়ে পড়ছে।

পাকিস্তানে আমার বোন, ভাইয়েরা এবং আমি একটা ছোট পরিসরের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে চলাফেরা করতাম। এর ফলে অপরিচিত লোকের সামনে আমি অস্বস্তিবোধ করতাম। কলেজ শুরুর পূর্ব মুহূর্তে একমাত্র পিটার গলব্রেথকে চিনতাম, যার সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো তার বাবার বাসায়। সে ছাড়া হার্ভার্ডে আর কাউকে চিনতাম না। আমার রক্ষণশীল চোখ পিটার গলব্রেথকে দেখে ধাক্কা খায়। তার ছিলো লম্বা চুল, পরিপাটহীন পোশাক এবং সে বাবা মার সামনেই ধূমপান করতো। তাকে দেখলে একজন উর্ধ্বতন কূটনীতিক ও সম্মানিত প্রফেসরের সন্তান বলে মনে হতো না, বরং আমেরিকার সাবেক একজন রাষ্ট্রদূত ভারত থেকে যে রকম একটা অপুষ্ট শিশু সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, তেমনই দেখাতো। তখনও আমি বুঝতে পারিনি যে এই পিটারই, যে আমার এক ভালো বন্ধু হবে, পনের বছর পর পাকিস্তানে আমার কারামুক্তির জন্য এতটা ভূমিকা রাখবে সে।

কিন্তু পিটার ছিলো হাজার হাজার ছাত্রের মধ্যে মাত্র একজন। লাইব্রেরি, হল, ডরমিটরি খুঁজে বের করতে আমাকে অপরিচিতদের থেকে সাহায্য নিতে হয়েছে। আমাকে মুখ বন্ধ করে থাকলে চলবে না। যেখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত ও বিদেশী পরিবেশের গভীরে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। সেখান থেকে বের হয়ে এসে আমার জন্য যা কিছু করার তা আমার নিজেকেই করতে হবে।

প্রথমবর্ষের ছাত্র অবস্থায়ই এলিয়ট হলের সামাজিক সম্পাদক হওয়া এবং হার্ভার্ড এর পত্রিকা 'দ্য ক্রিমসন'-এ কাজের চেষ্টা ও ক্রিমসন কি সোসাইটির ক্যাম্পাস গাইড হিসেবে ট্যুর পরিচালনা করা ইত্যাদি মিলিয়ে হার্ভার্ডে আমি দ্রুত মানিয়ে গেলাম। ক্যাম্পাস ট্যুরের

www.pathagar.com

প্রথম দিনেই নবাগত ছাত্রদের উজ্জীবিত করার জন্য আমি রসিকতা করে বললাম 'এই ভবনটির অফিসিয়াল নাম হচ্ছে সেন্টার অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স- কিন্তু আমরা সকলেই তো সিআইএ'র পুরো অর্থ জানি। যাইহোক হার্ভার্ডের বিতর্কিত ভিজুয়াল আর্টস বিল্ডিংটির নকশা করেছেন ফরাসি আর্কিটেক্ট লা করবুশিয়ার- যা আদৌ সুদৃশ্য নয়। এ বিষয়ে প্রচলিত কৌতুক হচ্ছে যারা এটা বানিয়েছেন, তারা নকশাটা উপর থেকে নিচের দিকে পড়েছে।

কিছু কিছু সংস্কারগত সংকট ছিলো। সেখানকার অনেক বিষয় বা আচরণ আমার পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভবপর ছিলো না। ছেলেদের এত কাছাকাছি থাকতে অভ্যস্ত ছিলাম না, বিশেষ করে সহশিক্ষার ক্ষেত্রে। এমনকি লন্ড্রিতে কর্মরত একজন পুরুষ ছাত্রকে দেখার পর তো আমার লন্ড্রিমুখী হওয়াই বন্ধ হলো। হার্ভার্ড ক্যাম্পাসের এলিয়ট হাউসে আসার পর আমার রুমমেট ইয়োলান্ডা কড্রজাইকি ও আমি একটা স্বতন্ত্র ঘর ও বাথরুম পেলাম, যার ফলে ওই সমস্যার সমাধান হলো। এখানকার লন্ড্রিটাও অনেক বড়।

আমি ভেবেছিলাম মনোবিজ্ঞান পড়বো। কিন্তু যখন বুঝলাম মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং প্রাণীদেহ ব্যবচ্ছেদের ব্যাপার যুক্ত রয়েছে তখন পিছিয়ে এসে তুলনামূলক রাজনীতি পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার বাবা চমৎকৃত হলেন। গোপনে তিনি র‍্যাডক্লিফের প্রেসিডেন্ট মেরি বান্টিংকে লিখে অনুরোধ করলেন যেন আমাকে রাজনৈতিক কোর্সগুলো পড়তে উদ্বুদ্ধ করা হয়। তবে মিসেস বান্টিং কখনো আমার বাবার এই পত্রের কথা আমাকে বলেননি, শুধু জানতে চেয়েছেন আমার লক্ষ্যটা কী। তুলনামূলক রাজনীতি নির্বাচন করাটা অবশ্যই বিচক্ষণতার পরিচায়ক ছিলো।

পাকিস্তানে বসবাস করেও পাকিস্তান সম্পর্কে যা জানতে পারিনি তা আমি জানলাম হার্ভার্ডে তুলনামূলক রাজনীতি পড়তে এসে। নবীন বরণ উপলক্ষে 'বিপ্লব' শীর্ষক সেমিনারে প্রফেসর জন ওম্যাক আমাদের একটা ছোট গ্রুপকে জিজ্ঞেস করলেন, 'একজন পুলিশ যখন রাস্তায় হাত উঁচু করে বলে, 'থামো', সবাই থেমে যায়। কিন্তু যখন তুমি বা আমি হাত উঁচু করে থামতে বলি, কেউ থামে না, কেন? কারণ, পুলিশকে শাসনতন্ত্র ও সরকার আইন প্রয়োগের কর্তৃত্ব দিয়েছে। তাকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, অধিকার দেয়া হয়েছে 'থামো' বলার, আমাকে বা তোমাকে নয়।'

আমার মনে পড়ছে, আমিই সম্ভবত একমাত্র ছাত্রী যে একনায়কতন্ত্র সরকারের অধীনের একটি দেশ থেকে এসেছে। আমার বসার ব্যবস্থা হয়েছিলো প্রফেসর ওম্যাকের পড়ার ঘরে। প্রফেসর ওম্যাক আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান ও পরবর্তীতে জিয়াউল হককে উদাহরণ হিসেবে ধরে পাকিস্তানের আইন শূন্যতা ও অপরাধের উল্লেখ করলেন। এই স্বৈরশাসকের ক্ষমতা জনগণ প্রদত্ত নয়, তাদের নিজের থেকে চাপিয়ে দেয়া। আমি প্রথমবার পরিষ্কার দেখতে পেলাম কেন পাকিস্তানের জনগণ এই জাতীয় শাসন মেনে নেয়ার বা 'থেমে যাওয়ার' কোনো যুক্তি খুঁজে পায়নি। যেখানে আইন বৈধ সরকার থাকে না, সেখানে থাকে নৈরাজ্য। আমি যখন পড়াশোনার মাঝামাঝি ঠিক সেই সময় পাকিস্তানে বৈধ সরকার বাস্তবের কাছাকাছি এলো। তেরো বছরের মধ্যে পাকিস্তানে ইয়াহিয়া খান প্রথম নির্বাচন দিলেন, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে। পৃথিবীর অপর প্রান্ত কেম্ব্রিজে, পাশে টেলিফোন রেখে আমি সারারাত পড়ছি। মা বললেন, অপ্রত্যাশিতভাবে বাবা ও তার পিপিপি ১৩৮টির মধ্যে ৮২টি আসনে জয়লাভ করেছে- আমি পুলকিত হলাম। অপরদিকে আওয়ামী লীগ

নেতা পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমান আরো বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেন। পরের দিন 'নিউইয়র্ক টাইমস' এ বাবার বিজয় সংবাদ দেখে সকলে আমাকে অভিনন্দিত করলো, তাদের অনেককেই আমি চিনি না।

যাইহোক আমার এই আনন্দের অনুভূতি দীর্ঘস্থায়ী হলো না। পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণের জন্য গ্রহণযোগ্য একটি নতুন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আমার বাবার সঙ্গে কাজ না করে মুজিব পশ্চিমের অংশ থেকে পূর্ব পাকিস্তান অথবা পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার আন্দোলনকে উস্কে দিলেন। টাইম পত্রিকা ও আমার বাবা আবারও পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখার জন্য একজন বেসামরিক লোক হিসেবে তার সঙ্গে একত্রে কাজ করা ও ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন হটাবার জন্য শেখ মুজিবকে অনুরোধ করলো। কিন্তু প্রয়োজনীয় উদারতা না দেখিয়ে ও রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করে যুক্তিহীন জিদ ধরলেন–মুজিব, যা আজও আমাকে দুঃখ দেয়। পূর্ব বাংলার মানুষ তার কথায় বিমানবন্দর দখল করে নিল। বাঙালিরা তাদের ট্যাক্স না দেয়ার ঘোষণা দিল। কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালি কর্মচারীরা ধর্মঘটে চলে গেল। পরিণামে মার্চ মাসে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়লো।

আমার বাবা মুজিবের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা চালিয়ে গেলেন– পাকিস্তান অখণ্ড রাখার এবং সামরিক শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার যে সহজ সুযোগ এসেছে তাকে কাজে লাগিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিক শাসন মুক্ত করার আশায়। ২৭ মার্চ ১৯৭১ (লেখক ২৭ মার্চ-১৯৭১ লিখেছেন), তিনি তখনও পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় মুজিবের সঙ্গে আর একদফা আলোচনার জন্য ছিলেন। এমন অবস্থায় তার চরম আশঙ্কাই সত্য হলা। ইয়াহিয়া খান সামরিক বাহিনীকে বিদ্রোহ প্রতিরোধের নির্দেশ দিল। হোটেলে বসে আমার বাবা প্রত্যক্ষ করলেন ঢাকায় আগুনের শিখা, ভগ্নহৃদয়ে দেখলেন জেনারেলদের শক্তিকেন্দ্রিক সমাধান। আর আমি ছয় হাজার মাইল দূরে কেম্ব্রিজে বসে এক দারুণ শিক্ষা পেলাম। লুট, ধর্ষণ, অপহরণ, হত্যা– হার্ভার্ডে থাকতে কাউকে পাকিস্তান নিয়ে ভাবতে দেখিনি– আজ দেখছি সকলেই ভাবছে। এবং এখন আমার দেশকে নিয়ে নিন্দাবাদ সর্বত্র। পূর্ববাংলার বিদ্রোহীরা যাকে এখন বাংলাদেশ বলছে সেখানে আমাদের সৈন্যদের বর্বরতা সম্পর্কে পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলোর বর্ণনা সত্য– একথা প্রথমে আমি বিশ্বাস করতেই চাইলাম না।

আমার বাবা-মার পাঠানো সরকার নিয়ন্ত্রিত যে সকল পত্র-পত্রিকা সপ্তাহান্তে আমার কাছে পাঠানো হতো, তাতে জানা যেতো যে, সংক্ষিপ্ত বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে। তাহলে ঢাকা মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে, ছাত্র, শিক্ষক, কবি, উপন্যাসিক, চিকিৎসক এবং আইনজীবী হত্যার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠানোর অভিযোগগুলো কি? আমি অবিশ্বাসে মাথা দোলাই। হাজার হাজার উদ্বাস্তু পালাচ্ছে বলে খবর আসছে, তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোককে আটক করে হত্যা করে তাদের মরদেহ দিয়ে সড়ক অবরোধের কাজ করা হয়েছে।

খবরগুলো এমন ভয়ঙ্কর যে আমি কি করবো তা ভেবে পাচ্ছি না। র‍্যাডক্লিফে নবাগতদের অভ্যর্থনার সপ্তাহ জুড়ে ধর্ষণের বিপদ সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিয়েছি তা এখন অসার বলে মনে হচ্ছে। আমেরিকা আসার আগ পর্যন্ত ধর্ষণ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না এবং পরবর্তী চার বছরের জন্য ধর্ষণের সম্ভাবনার আতঙ্কে রাতে একাকী বাইরে বেরুনো বন্ধ হয়ে গেল। এই বক্তৃতার পরে হার্ভার্ডে ধর্ষণের সম্ভাবনা খুবই বাস্তব মনে

www.pathagar.com

হলো। কিন্তু পূর্ব বাংলায় ধর্ষণের ঘটনা সত্য মনে হলো না। আমার মনে হলো পশ্চিমা প্রচারমাধ্যমে প্রচারিত রিপোর্টগুলো অতিরঞ্জিত এবং ইসলামী দেশগুলোর বিরুদ্ধে ইহুদীবাদী একটি ষড়যন্ত্র।

হার্ভার্ডে আমার সহপাঠীদের বোঝানো দায়। তোমাদের সেনাবাহিনী বর্বর– তাদের অভিযোগ। তোমরা বাঙালিদের হত্যা করেছো। 'আমরা বাঙালিদের হত্যা করছি না' আমি প্রতি উত্তর করি, অপমানে আমার মুখমণ্ডল নীল হয়ে যায়। তোমরা খবরের কাগজে যা পড় তার সবই কি বিশ্বাস কর? সকলেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে, এমন কি বছরের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের নগদ অর্থ সংগ্রহের জন্য যেসব বাড়িতে গেছি তারাও এর বিরুদ্ধে কথা বলছে। অভিযোগগুলো পর্বতপ্রমাণ। তোমরা ফ্যাসিস্ট একনায়ক। আমি নিজের জিভ কামড়ানোর চেষ্টাও করছি না বিশেষ করে যখন পড়ছি যে ভারত হাজার হাজার বাঙালি উদ্বাস্তুকে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়ে সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমরা ভারত সমর্থিত বিদ্রোহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। আমি জবাব দেই। আমরা আমাদের দেশকে একত্রে রাখার জন্য যুদ্ধ করছি, যেমন তোমরা তোমাদের গৃহযুদ্ধের সময় করেছো। নিন্দা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না, এমনকি যখন কোনো তর্কও থাকে না। 'পাকিস্তান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করছে,' শরৎকালে যুদ্ধ ও নৈতিকতা বিষয়ে এক বক্তৃতায় প্রফেসর ওয়ালজার গর্জে উঠলেন। আমি লেকচার হলে উপস্থিত অন্য ২০০ ছাত্রের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে জীবনের প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা দিলাম। 'প্রফেসর, এটা সম্পূর্ণ ভুল', আমি তাকে শুধরে দিলাম, আমার কণ্ঠস্বর কাঁপছে। 'বাংলার জনগণ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়ে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রয়োগ করেছে।' সর্বত্র এক বিস্ময়কর নীরবতা। কিন্তু আমার কথাগুলো ঐতিহাসিকভাবে সঠিক। যে মর্মান্তিক সত্যটির মুখোমুখি আমি হতে চাইনি, পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই সেখানে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল।

কতোবার যে আল্লাহকে ডেকেছি আমার অজ্ঞতাকে মাফ করে দেয়ার জন্য? আমি তখন দেখতে পাইনি যে, পাকিস্তানে গণতন্ত্রের চর্চা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে। সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তান সংখ্যাগুরু পূর্ব পাকিস্তানকে উপনিবেশ হিসেবে শাসন করছে। পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি আয় থেকে রাজস্ব হিসেবে আদায়কৃত একত্রিশ বিলিয়নেরও বেশি রূপী ব্যয় হয়েছে সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানের রাস্তাঘাট, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাসপাতাল নির্মাণে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে কোনো উন্নয়ন করা হয়নি। আমাদের মতো অতি দরিদ্র দেশের সেনাবাহিনীতে যেখানে সবচেয়ে বেশি লোক চাকরি করে, তার ৯০ শতাংশ লোক নেয়া হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। সরকারি চাকরির ৮০ শতাংশ পূরণ করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা। কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুকে আমাদের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করলো, যা পূর্ব পাকিস্তানের খুব অল্পসংখ্যক লোক বোঝে। এরপরও সরকারি চাকরি অথবা শিক্ষায় প্রতিযোগিতামূলকভাবে বাঙালিদের প্রতিবন্ধী করে রাখা হলো। তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন এবং শোষিত ভাববে– এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

হার্ভার্ডে থাকতে আমি এতো ছোট ও সরল ছিলাম যে, অন্যান্য সেনাবাহিনীর মতো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও যে বেসামরিক জনগণের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করতে পারে, তা বুঝতে সময় লেগেছে। মানসিকতা যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে তাতো ১৯৬৮ সালে আমেরিকান সেনাবাহিনী মাইলাইতে দেখিয়েছে। বহুদিন পরে আমার নিজ প্রদেশ সিন্ধুতে

www.pathagar.com

জিয়াউল হক যে অত্যাচার করেছে তা ভিন্ন কিছু নয়। সৈন্যরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বেসামরিক লোকজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জনগণকে শত্রু মনে করা এবং শত্রুকে গুলি করা, শত্রু সম্পত্তি লুট করা অথবা ধর্ষণ করা– সৈন্যরা এটা করতে পারে। তারপরও ১৯৭১-এর সেই ভয়ঙ্কর বসন্তে আমার ছেলেমি থেকেই পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রশংসা করেছি, যারা ১৯৬৫ সালে ভারতের বিরুদ্ধে একটা লড়াই করেছে। ধীরে ধীরে এবং বেদনাদায়কভাবে সেই ভাবমূর্তির মৃত্যু ঘটছে।

'পাকিস্তান একটা কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে' একথা আমার বাবা তার একটা দীর্ঘ চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন। যা পরবর্তীতে 'দ্য গ্রেট ট্রাজেডি' নামক বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'পাকিস্তানিরা পাকিস্তানিদের খুন করছে– এই দুঃস্বপ্ন এখনও বর্তমান। এখনও রক্ত বইছে। এর মধ্যে ভারতের আক্রমণাত্মক ভূমিকা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। আজকের এই অশান্তি থেকে উৎরে গেলেই পাকিস্তান তার লক্ষ্য অর্জন করে টিকে থাকবে, নতুবা সর্বনাশা বিপর্যয় পাকিস্তানকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।'

এই সর্বনাশা বিপর্যয় নেমে আসে ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর সকালে। 'না!' খবরের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কেঁদে ফেললাম। ভারতে আশ্রিত উদ্বাস্তুদের ফিরে যাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টির অজুহাতে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তান আক্রমণ করলো, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান। সোভিয়েত নির্মিত মিসাইল দিয়ে করাচি নৌবন্দরে অবস্থানরত যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দিল। ভারতীয় যুদ্ধ বিমানগুলো শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ধ্বংস করছে। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র এতো পুরাতন যে, আমরা যুদ্ধে টিকতে পারলাম না। এই মুহূর্তে আমার দেশের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়লো।

'তুমি এখানে না থেকে ভালো করেছো', সামিয়া করাচি থেকে আমাকে লিখলো। 'প্রতি রাতেই বিমান হামলা হচ্ছে, জানালা দিয়ে যাতে আলো বেরুতে না পারে সে জন্য জানালাগুলো কালো কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখতে হচ্ছে। স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ সুতরাং দুঃশ্চিন্তা ছাড়া সারাদিন কিছুই করার নেই। বরাবরের মতো খবরের কাগজেও কিছু নেই। কেউ একজন আমাদের দরজায় কড়া নেড়ে বলে গেছে যে, যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তার আগে আমরা জানতামই না যে ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করেছে। সকাল সাতটার খবরে বলছে আমরা জিতে যাচ্ছি। অপরদিকে বিবিসি এশিয়া প্রচার করছে যে আমরা হেরে যাচ্ছি। বিবিসিও বলছে যে, সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে ভয়ানক অপরাধ করেছে। এ ব্যাপারে তুমি কি কিছু শুনেছ?

করাচিতে তোমার তেরো বছরের ভাই শাহ নেওয়াজ খুবই উত্তেজিত। সে সিভিল ডিফেন্সে যোগ দিয়েছে, মোটর সাইকেলে করে ঘুরে ঘুরে প্রতি রাতে প্রতিবেশীদের দেখভাল করছে, সবাইকে রাতে বাতি নিভিয়ে রাখতে বলছে। আমরা খুবই ভীত সন্ত্রস্ত। আমি একদিন বিমান আক্রমণের সময় তোমাদের বাড়িতে সনমের সঙ্গে ছিলাম। তোমার মা আমাদের নিচতলার খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে কোনো জানালা ছিল না। বাড়িতে আমি আমার মায়ের সঙ্গে ঘুমাই। আমরা উভয়েই খুব সন্ত্রস্ত। আমাদের বাড়ির কাছে রাস্তায় তিনটি বোমা পড়েছে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেগুলো ফাটেনি। আমাদের বাগানের পুরোটাই ভাঙাকাঁচে ভরে গেছে।

ভারতীয় বিমান জানালার এত কাছ দিয়ে উড়ে যায় যে, চালককেও দেখা যায়। কিন্তু আমাদের বিমান বাহিনীকে কোনো প্রত্যাঘাত করতে দেখিনি। তিনদিন আগের রাতে এমন

www.pathagar.com

বোমার আওয়াজ হলো, মনে হলো যেন পাশের বাড়িতে পড়েছে। ছাদে উঠে দেখি সমস্ত আকাশ গোলাপী বর্ণ ধারণ করেছে। পরদিন সকালে শুনলাম করাচি নৌবন্দরের তেলের ডিপোতে মিসাইল আক্রমণ হয়েছে। তখনও আগুন জ্বলছে।

আমেরিকার সামরিক সাহায্য কখনও আসেনি। যদিও পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার একটা সামরিক চুক্তি আছে। আমেরিকা তাদের শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়নের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। কিন্তু আগাগোড়া পাকিস্তানের প্রকৃত শত্রু হচ্ছে ভারত। এমনকি সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য আফগান বিদ্রোহীদের যে সামরিক সাহায্য দেয়া হচ্ছে তা চলে যাচ্ছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য।

১৯৭১ সালের সঙ্কটের সময় প্রেসিডেন্ট নিক্সন সেনা হস্তক্ষেপের রাস্তা পরিহার করে কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন করলেন এবং অনেকটা পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়ার মত অবস্থান নিলেন। ৪ ডিসেম্বর, ১৩ দিনের যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন, আমেরিকার বিদেশ দপ্তর থেকে এই উত্তজনা সৃষ্টির জন্য ভারতকে দোষারোপ করে বিবৃতি দেয়া হলো। ৫ ডিসেম্বর তারা নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব উত্থাপন করলো। ডিসেম্বরের ৬ তারিখে নিক্সন প্রশাসন ভারতকে প্রতিশ্রুত পঁচাশি মিলিয়ন ডলারের উন্নয়ন ঋণ স্থগিত ঘোষণা করলো।

কিন্তু এসব উদ্যোগ অপ্রতুল প্রমাণিত হলো। ভারতের আক্রমণের এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের শেষ শক্ত ঘাঁটি ঢাকা পতনের মুখে পড়লো। ভারতের সৈন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সীমানা অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকে পড়লো। যুদ্ধক্ষেত্রে সামগ্রিক পরাজয়ের পর ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতা এবং পাকিস্তানকে রক্ষার কতৃত্ব যার– সেই আমার বাবার শরণাপন্ন হলো।

'আমি জাতিসংঘে আসছি। ডিসেম্বরের ৯ তারিখে নিউইয়র্কের পিয়েরে হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করো।' আমার বাবার পাঠানো খবর পেলাম।

আমার বাবার সঙ্গে দেখা হলে বাবা আমাকে বললো, 'তুমি কি মনে কর জাতিসংঘে পাকিস্তান নিরপেক্ষ বিচার পাবে?'

'অবশ্যই বাবা', আমার কণ্ঠে আঠারো বছরের যুব শক্তির নিশ্চয়তা। 'ভারত আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে অন্য দেশ আক্রমণ ও দখল করেছে– একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।'

'তুমি কি এটাও মনে কর যে, নিরাপত্তা পরিষদ ভারতের নিন্দা করবে এবং তার সেনা প্রত্যাহারের তাগিদ দেবে?'

'কেন নয়?' আমি দৃঢ়ভাবে জবাব দিলাম। এটা না করলে শান্তিরক্ষী সংস্থা হিসেবে তারা পরিহাসের পাত্র হয়ে যাবে। 'পিংকি, তুমি আন্তর্জাতিক আইনের একজন ভালো ছাত্রী হতে পারো এবং আমি একজন হার্ভার্ড গ্রাজুয়েটের মতকে অস্বীকার করবো না।' বাবা ধীরে ধীরে বললো। 'কিন্তু তুমি ক্ষমতার রাজনীতি সম্পর্কে কিছুই জানো না।'

আমার পরিষ্কার মনে আছে অখণ্ড পাকিস্তানকে রক্ষা করার বাবার ব্যর্থ চেষ্টার চারটি দিনের কথা।

নিরাপত্তা পরিষদে বাবার দুই সারি পেছনে বসলাম আমি। আমেরিকা ও চীনসহ

www.pathagar.com

১০৪টি দেশ ভারতকে নিন্দাসূচক ভোট দিল, কিন্তু রাশিয়ার ভেটোর ভয়ে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য এমনকি একটি যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবে একমত হতে পারলো না। ইন্দো-পাক সংঘাত নিয়ে সাতটি বৈঠক ও এক ডজনের মত খসড়া প্রস্তাব সত্ত্বেও নিরাপত্তা পরিষদ একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করতে পারলো না। তৃতীয় বিশ্বকে শোষণের জন্য বৃহৎ শক্তিগুলোর কর্মকৌশল সম্পর্কে আমার বাবা আমাকে যা কিছু শিখিয়েছে তার সবটাই এই একটি কক্ষের মধ্যে বাস্তবায়িত হতে দেখলাম। বৃহৎ শক্তিগুলোর কায়েমী স্বার্থের কাছে পাকিস্তান হেরে গেল।

১১ ডিসেম্বর, ৫-৪০ মিনিট। আমাদের সেনাবাহিনী বীরের মতোই যুদ্ধ করেছে কিন্তু বিমান ও নৌ সমর্থন ছাড়া এবং ৬ঃ১ অনুপাতে গতকাল থেকে ৩৬ ঘণ্টার বেশি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, এই নোট আমি হোটেল পিয়েরের কাগজেই করলাম। পরের দিন আমার নোটটা ছিল আরো হতাশাব্যাঞ্জক সকাল ৬-৩০ মিনিটে রাষ্ট্রদূত শাহনাওয়াজ এসে জানালেন পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ। এই মুহূর্তটির একমাত্র উপায় হচ্ছে চীনের সরাসরি হস্তক্ষেপ আর রাশিয়ার হস্তক্ষেপ থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্য আমেরিকার কিছু কলকব্জা ঠিক করতে হবে। বাবা ৩৬ ঘণ্টার বদলে আত্মসমর্পণের সময় ৭২ ঘণ্টা টিকে থাকার জন্য ইসলামাবাদে টেলিগ্রাম করলো। নিয়াজী বললেন, তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।

১২ ডিসেম্বর আমার বাবা নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতিসহ পাকিস্তানি ভূখণ্ড থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার, জাতিসংঘের সৈন্য মোতায়েন এবং পূর্ব পাকিস্তানে পুনরায় এরূপ আক্রমণ হবে না এই নিশ্চয়তার প্রস্তাব করলো। কিন্তু তার আবেদনে কেউ কর্ণপাত করলো না। বরং আমি নিজ কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যখন শুনলাম নিরাপত্তা পরিষদের পরবর্তী বৈঠক আগামীকাল সকাল ৯-৩০টায় বসবে নাকি ১১টায় বসবে এটা নিয়েই ঘণ্টাখানেক বিতর্ক হয়েছে। এরই মধ্যে আমরা যতদূর জানি পাকিস্তানের অন্তিম দশা চলছে।

'আমাদের এখনই ইয়াহিয়া খানকে পশ্চিম রণাঙ্গণে খুলে দেয়ার জন্য বলা উচিত', আমার বাবা হোটেল কক্ষে উপস্থিত পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলকে বললেন, 'পশ্চিম রণাঙ্গণে আক্রমণাত্মক হলে পূর্ব রণাঙ্গণে ভারতীয় সৈন্যরা থমকে যাবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে চাপ কমে যাবে। চাপ প্রয়োগ করা না গেলে পাকিস্তানের সবটাই হারানোর আশঙ্কা আছে।' আমি বাবার পক্ষে পাকিস্তানে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম কিন্তু ইয়াহিয়া খানের সামরিক সচিব বললেন যে, প্রেসিডেন্ট ঘুমাচ্ছেন এবং তাকে বিরক্ত করা যাবে না। আমার বাবা ফোনটা হাতে নিলেন। চিৎকার করে বললেন, 'যুদ্ধ চলছে, প্রেসিডেন্ট সাহেবকে জাগিয়ে দিন। তাকে এখনই পশ্চিম রণাঙ্গণ খুলতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের উপর অবশ্যই ভারতীয় চাপ কমাতে হবে।'

একজন পশ্চিমা সাংবাদিক জানালেন যে, জেনারেল নিয়াজী পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয়দের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। সব মিলিয়ে বাবা ইয়াহিয়া খানের উপর রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। 'গুজবে কান দিও না।' বাবা তখনও ইয়াহিয়ার সামরিক সচিবকে ধমকাচ্ছে, কেন না তখনও ইয়াহিয়াকে ফোনে পাওয়া যায়নি। 'যদি আমার হাতে দরকষাকষির মত কিছু না থাকে তবে আমি কি নিয়ে একটা সুবিধাজনক আলোচনা করবো?'

www.pathagar.com

পিয়েরে হোটেলের টেলিফোন অবিরাম বেজে চলেছে। একদিন বিকেলে আমি ফোন ধরলাম পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জারের, অপর হাতের ফোনটি চীনা প্রতিনিধিদলের নেতা হুয়াং হুয়ার। হেনরী কিসিঞ্জারের আশঙ্কা চীনারা পাকিস্তানের পক্ষ থেকে সামরিক হস্তক্ষেপ করবে। আমার বাবার চিন্তা চীন তা করবে না। বাবা যেখানে পরিকল্পনা করছে যে ইয়াহিয়া খানকে বলবে এখনই পিকিং গিয়ে শেষ চেষ্টা করুক, সেখানে হেনরী কিসিঞ্জার সিআইএ নিউইয়র্কের নিরাপদ বাড়িগুলোতে চীনাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন, একথা পরে পড়েছি।

সোভিয়েত প্রতিনিধিদল বাবার কক্ষে আশা-যাওয়া করছে। চীনারাও তাই করছে। জর্জ বুশের নেতৃত্বে আমেরিকান প্রতিনিধিরা একই কাজ করছে। জর্জ বুশ আমাকে তার কার্ড দিয়ে বললেন, 'আমার ছেলেও হার্ভার্ডে পড়ছে। কখনও কোনো প্রয়োজন পড়লে জানিও। এসবের মধ্যেই বেডরুমে ফোন নিয়ে বসে ছিলাম সঠিক বার্তা নোট করতে এবং গুজব বার্তাটি অন্যদের কাছে আবার পাঠিয়ে দিতে।

বাবা আমাকে বললো, 'মিটিং থামিয়ে দিও যদি রাশিয়ানরা এখানে থাকে। বলবে চীনারা ফোনে আছে। যদি আমেরিকানরা থাকে আমাকে বলবে যে রাশিয়ানরা অথবা ভারতীয়রা লাইনে আছে। এবং এখানে প্রকৃতপক্ষে কারা আছে তা কাউকে বলবে না। কূটনীতির একটা মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে সংশয় তৈরি করা; তোমার হাতের সকল কার্ড টেবিলে রেখো না।' আমি তার নির্দেশাবলি অনুসরণ করেছি কিন্তু তার শিক্ষা অনুসরণ করতে পারিনি। আমি সর্বদা সকল কার্ড টেবিলে মেলে ধরি।

যাইহোক নিউইয়র্কের কূটনৈতিক খেলার হঠাৎ করে পরিসমাপ্তি হলো। ইয়াহিয়া খান পশ্চিমা রণাঙ্গণ খোলেনি, সামরিক জান্তা এরই মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে হেরে যাওয়াটা মানসিকভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। সামরিক সমর্থনের বিবৃতি দিয়েও চীনারা হস্তক্ষেপ করেনি, ভুল সংশোধনের পরেও আমাদের সময়ের আগে আত্মসমর্পণের গুজব ক্ষতিকর একটা ইতিহাস রেখে গেল। ভারতীয়রা জেনে গেছে যে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের কমান্ডাররা যুদ্ধ পরিত্যাগ করতে চায়। জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যরাও তাই ভেবে নিলো, ঢাকার পতন আসন্ন।

১৫ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে আমি যথারীতি আমার বাবার পেছনে গিয়ে বসলাম, যখন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা অশ্রুসজল চিত্তে নিরূপায় হয়ে বসে রইলেন। 'নিরপেক্ষ প্রাণী বলতে কিছু নেই। আপনারা একটা পক্ষ নিন–' বাবা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দিকে আঙুল তুলে অভিযোগ করলো, কেননা তারা উপমহাদেশে তাদের নিজ স্বার্থে ভোটো প্রয়োগে অনুপস্থিত রয়েছে। 'আপনাদের হয় ন্যায়ের পক্ষে অথবা অন্যায়ের পক্ষে থাকতে হবে। আপনাদের হয় হামলাকারীর পক্ষে থাকতে হবে নতুবা আক্রান্তের পক্ষে থাকতে হবে। নিরপেক্ষতা বলে কিছু নেই।'

তার জোরালো বক্তৃতা কক্ষময় ছড়িয়ে গেল– আর আমি শিখলাম নীরবে মেনে নেয়া বনাম অস্বীকার করার মধ্যে পার্থক্য কতটা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বৃহৎ শক্তিগুলো যেখানে একতাবদ্ধ সেখানে সতর্কতার সঙ্গে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু বৃহৎশক্তির উপর সবকিছু ছেড়ে দেয়ার অর্থ হলো এই ঘটনার অংশীদার হওয়ার শামিল হওয়া। যে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া, ভারসাই চুক্তির চেয়ে খারাপ চুক্তি করা, আক্রমণকে আইনী স্বীকৃতি দেয়া, দখলকে স্বীকৃতি দেয়া, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত বেআইনী সকল কাজকে স্বীকৃতি দেয়া– আমি এসবের অংশীদার হবো না'– আমার বাবা গর্জে উঠলেন। 'রইলো তোমাদের

www.pathagar.com

নিরাপত্তা পরিষদ, আমি চললাম।' এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বাবা উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত কক্ষের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। আমি ব্যস্ত হয়ে কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে শ্বাসরুদ্ধকর নীরবতার মধ্যে পাকিস্তানি অন্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম।

ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় বাবার এই কাজকে জীবন্ত নাটক হিসেবে আখ্যায়িত করা হলো। কিন্তু আমাদের জন্য এটা সত্যিকার অর্থেই সঙ্কটের বিষয়, বিশেষ করে পাকিস্তানের ভবিষ্যতের জন্য, যদি ভবিষ্যতে পাকিস্তান নামে আদৌ কোনো দেশের অস্তিত্ব থাকে। পরে নিউইয়র্কের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বাবা আমাকে বললেন, 'ঢাকায় আমরা যদি সামরিকভাবে আত্মসমর্পণ করিও, আমরা অবশ্য রাজনৈতিকভাবে আত্মসমর্পণের অংশদীর হবো না।' নিরাপত্তা পরিষদ থেকে ওয়াকআউট করে এটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছিলাম যে, যদি আমরা কাঠামোগতভাবে বিধ্বস্ত হয়েও যাই, আমাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও অহঙ্কার ধ্বংস হবে না।' পাকিস্তানের সামনে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তা অনুভব করে আমার বাবা খুবই বিমর্ষ চিত্তে হাঁটছিলেন। 'একটা কি আপোষমূলক রাজনৈতিক সমাধান হবে, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটা গণভোট হতে পারে, যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে না পৃথক দেশ হিসেবে বাংলাদেশে থাকবে তা নির্ধারণ করবে। এখন পাকিস্তানকে ভারতের কাছে আত্মসমর্পণের বিড়ম্বনা সইতে হবে। একটা ভয়ঙ্কর মূল্য পাকিস্তানকে পরিশোধ করতে হবে।'

পরদিন সকালে আমার বাবা পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো, আমি ফিরে চললাম কেম্ব্রিজে। ঢাকার পতন ঘটলো।

বাংলাদেশকে হারানো পাকিস্তানের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই বিরাট ধাক্কার মতোই। আমাদের উভয়ের একই ধর্ম ইসলাম। আমরা মনে করতাম এই ধর্মই ভারতের ১০০০ মাইলের বিচ্ছিন্ন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করবে, কিন্তু সেই ধর্ম আমাদেরকে একসাথে রাখতে পারলো না। আমাদের অস্তিত্বের প্রমাণ যে দেশ– তার বিশ্বাসের ভিত নড়ে উঠেছে, পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের মধ্যে যে বন্ধন তাও প্রায় ভঙ্গুর।

টেলিভিশনের ক্যামেরায় দেখা গেল ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জেনারেল নিয়াজী তার প্রতিপক্ষ জেনারেল অরোরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না, যখন দেখলাম যে জেনারেল নিয়াজী ঢাকার বিজয়ীর সঙ্গে তরবারি বিনিময় করলেন (তারা রয়েল মিলিটারি একাডেমিতে একসঙ্গে ছিলেন) এবং আলিঙ্গণ করলেন। তাকে আলিঙ্গণ করা! এমনকি নাৎসীরাও এমন অসম্মানজনক আত্মসমর্পণ করেনি। পরাজিত সেনাদলের প্রধান হিসেবে নিয়াজী আরো সম্মানজনক কাজ করতে পারতেন, নিজেকে গুলি করে হলেও।

যখন আমার বাবা ইসলামাবাদে অবতরণ করলেন, নগরী তখন জ্বলছে। ক্ষিপ্ত জনতা অ্যালকোহলের দোকান জ্বালিয়ে দিল। সম্ভবত ওই দোকান ইয়াহিয়া খান ও তার সহযোগীদের অ্যালকোহল সরবরাহ করতো। টেলিভিশনের সপ্তাহের পর সপ্তাহ পাকিস্তানের বিজয়ের খবর পরিবেশনের পর পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ঢাকায় আত্মসমর্পণের খবর দেখে করাচি টেলিভিশন কেন্দ্র জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য হাজার হাজার

www.pathagar.com

লোক জড়ো হয়। ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পাদকীয়তে লিখেছে যে পাকিস্তানী একটা কৃত্রিম রাষ্ট্র, যার সৃষ্টি হওয়া উচিত হয়নি।

২০ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ উন্মত্ত জনগণ ইয়াহিয়া খানকে নেমে যেতে বাধ্য করলো। এবং পাকিস্তানের পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে আমার বাবা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন। যেহেতু কোনো সংবিধান ছিল না, তাই প্রথম বেসামরিক ব্যক্তি হিসেবে তাকে সামরিক আইন প্রশাসক হতে হলো।

হার্ভার্ডে আমি কখনও পাকিস্তানি পিংকী হিসেবে পরিচিত হলাম না, পরিচিত হলাম পিংকী ভুট্টো, 'পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কন্যা' হিসেবে। কিন্তু বাবার যে অর্জন তা ধুলিস্মাৎ হয়ে গেল পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। দু'সপ্তাহের যুদ্ধে আমাদের এক চতুর্থাংশ যুদ্ধ বিমান ধ্বংস হয়েছে। অর্ধেক নৌজাহাজ ডুবে গেছে। কোষাগার শূন্য। শুধু পূর্ব পাকিস্তান হারায়নি, ভারতীয় বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের ৫,০০০ বর্গমাইল এলাকা দখল করেছে এবং আমাদের ৯৩০০০ সৈন্য যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটক করেছে। অনেকেই ভবিষ্যৎবাণী করেছিল পাকিস্তান টিকে থাকবে না। বাংলাদেশ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৪৭ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর হাতে প্রতিষ্ঠিত অখণ্ড পাকিস্তানের মৃত্যু হলো।

সিমলা। ২৮ জুন, ১৯৭২। আমার বাবা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে শীর্ষ বৈঠক। এর ফলাফলের উপর নির্ভর করছে এই উপমহাদেশের ইতিহাস। আমার বাবা চাচ্ছিলেন যে, আমি ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকি। 'ফলাফল যাই হোক, এই বৈঠক পাকিস্তানের জন্য একটা যুগ সন্ধিক্ষণ হয়ে থাকবে, গ্রীষ্মের ছুটিতে আসার এক সপ্তাহ পর বাবা আমাকে বললেন, 'আমি চাই তুমি এই ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে থাকো।'

ছ'মাস পূর্বে জাতিসংঘে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে। সিমলা বৈঠক ছিল অসফলতা থেকে ফিরে আসা। বাবা সিমলায় ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করতে এলো শূন্য হাতে। ভারতের হাতে রইল দরকষাকষির সকল চাবিকাঠি, আমাদের যুদ্ধবন্দি, বিচারের হুমকি এবং আমাদের ৫,০০০ বর্গমাইল ভূখণ্ড। ভারতীয় পাঞ্জাবের চণ্ডীগড়ে প্রেসিডেন্টের বিমানের মধ্যে বাবা ও তার সফরসঙ্গী প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বিমর্ষচিত্ত। সিমলায় কি দু দেশের মধ্যকার উত্তেজনা কমবে? ভারতের সঙ্গে কি আমরা শান্তি চুক্তি করতে পারবো? অথবা আমাদের দেশ কি ধ্বংস হয়ে যাবে?

'সকলেই বৈঠকের অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে থাকবে, সুতরাং অতিরিক্ত সতর্ক থাকবে।' বিমানের মধ্যে বাবা আমাকে উপদেশ দিলো। যেহেতু আমাদের সৈন্যরা ভারতের হাতে যুদ্ধবন্দি, সেক্ষেত্রে তুমি হাসিমুখ দেখাবে না, আনন্দবোধ করছো এমন ভাবভঙ্গী দেখাবে না। আবার এমনভাবও দেখাবে না যে তুমি ভেঙে পড়েছো, যেটাতে জনগণ হতাশার চিহ্ন খুঁজে নেবে। তাদের একথা বলার সুযোগ দেয়া যাবে না যে, 'তার চেহারাটা দেখো, বৈঠকটি নিশ্চয়ই ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তানিদের স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাদের সফল হওয়ার সুযোগ নেই এবং তারা বড় ধরনের ছাড় দিতে যাচ্ছে।'

'তাহলে আমাকে কেমন দেখাতে হবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি এরই মধ্যে তোমাকে বলেছি। দুঃখিত বা আনন্দিত কোনোটাই হবে না। বাবা

www.pathagar.com

বললেন।

'সেটা খুবই কষ্টকর।'

'এটা মোটেও কষ্টসাধ্য নয়'।

ক্ষণিকের জন্য তিনি ভুল করলেন। চণ্ডীগড় থেকে যখন হিমালয়ের পাদদেশে ব্রিটিশ রাজের সাবেক গ্রীষ্মকালীন রাজধানী সিমলা রওনা হয়েছি হেলিকপ্টারে, সেসময় চেহারায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা খুবই কঠিন। এটা আরো কঠিন ছিলো যখন আমরা একটা ফুটবল মাঠে অবতরণ করলাম, টেলিভিশন ক্যামেরা দ্বারা আমরা ঘেরাও হয়ে আছি, স্বয়ং মিসেস ইন্দিরা গান্ধী আমাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। কি রকম ফিকে চেহারা, তার অসংখ্য ছবিতে যেমন দেখেছি আমি, তার চেয়ে ছোট আকৃতির মনে হলো। কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে শাড়ির উপর বর্ষাতি চাপিয়ে, কি সুন্দর মার্জিত অবয়ব তার। 'আস-সালাম ও-আলায়কুম', মুসলমান কায়দায় সালাম করলাম তাকে। 'নমস্তে,– অভিনন্দন', তিনি হাসিমুখে জবাব দিলেন। প্রতি উত্তরে আমি তাকে একটা নিস্পৃহ অর্ধহাসি উপহার দিলাম।

পরবর্তী পাঁচ দিন আমার বাবা ও তার অন্যান্য প্রতিনিধি আবেগতাড়িত সময় কাটালেন। প্রথম পর্বের আলোচনার মাঝখানে প্রতিনিধিদের একজন আমাকে জানালেন 'আলোচনা ভালই এগুচ্ছে'। সন্ধ্যায় আরেকজন বললেন, 'ভালো বোধ হচ্ছে না'। পরদিনের আলোচনায় চড়াই উৎরাই পেরিয়ে হতাশার ওপরে কিছুটা আশার আলো দেখা দিল। একটা শক্ত অবস্থানে থেকে মিসেস গান্ধী বিতর্কিত কাশ্মির সমস্যাসহ একটা প্যাকেজ সমাধানের জন্য চাপ দিলেন। পাকিস্তানি প্রতিনিধিগণ এই ভূখণ্ডের সমস্যাগুলো পর্যায়ক্রমে এক এক করে সমাধান চাইলেন। চাপের কাছে নতি স্বীকার করে কোনো সমাধান পাকিস্তানের জনগণ মেনে নেবে না বরং তা নতুন একটা যুদ্ধের সূচনা করবে।

কিন্তু আলোচনায় যখন অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়, বাইরের রাস্তায় তখন অন্য কিছু ঘটছে। যখনই আমি আমাদের আবাসস্থল, পাঞ্জাবের সাবেক ব্রিটিশ গভর্ণরের বাসভবন, হিমাচল ভবন ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছি, তখনই দেখেছি আমাকে একনজর দেখার জন্য রাস্তায় জনতার ভিড়। সবখানে উৎফুল্ল জনতা আমাকে অনুসরণ করছে। ব্রিটিশদের পুরনো কুটির, বাগান পেরিয়ে আমার নির্ধারিত ভ্রমণসূচীতে ছিলো পুতুল যাদুঘর, একটা হস্তশিল্প কেন্দ্র, ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা এবং একটা কনভেন্টে নাচের অনুষ্ঠান দেখা, যেখানে আমি আমার মারি কনভেন্টের কয়েকজন পুরাতন শিক্ষককে পেয়ে গেলাম। আমি নিচে শপিং মলে নেমে এলাম যেখানে রাজকীয় সরকারি কর্মকর্তারা তাদের স্ত্রীদের হাত ধরে বেড়াতেন, সেখানে আমাকে দেখার জন্য হাজারো জনতাকে সামলাতে সড়ক বন্ধ করে দিতে হলো। এতে আমি দারুণ অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। কেন আমাকে দেখার জন্য এতো আগ্রহ?

আমাকে ভারতে স্বাগত জানিয়ে লেখা চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম জমে গেছে অনেক। একজন তো লিখেছে আমার বাবা যেন আমাকে ভারতে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেয়! সাংবাদিক ও ফিচার লেখকগণ সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য ভিড় করছেন এবং অল ইন্ডিয়া রেডিওতে সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমার বিরক্তির কারণ পত্র-পত্রিকায় আমার পোশাক-পরিচ্ছদ প্রধান আলোচনার বিষয় হয়েছে এবং এমনই মনে হয় এটা যেন জাতীয় ফ্যাশন প্রতিযোগিতার বিষয় হয়ে গেছে। আসলে ওই পোশাকগুলো ছিল সামিয়ার বোনের কাছ থেকে ধার করা, আমার নিজস্ব পোশাক বলতে মূলত অনাধুনিক, সাধারণ ব্যবহারের জন্য কামিজ, জিনস ও ঘুমানোর পোশাক মাত্র। এ

www.pathagar.com

বিষয়টিতে আমার বিরক্তির কারণ হচ্ছে, আমি পোশাক পরিচ্ছদকে গৌণ মনে করি। আমার নিজেকে ভাবতে ইচ্ছা করে যুদ্ধ ও শান্তি চিন্তায় পরিপূর্ণ একজন হার্ভার্ডের বুদ্ধিজীবী হিসেবে, অথচ সাংবাদিকরা ব্যস্ত আমার পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে। একজন সাক্ষাৎকারীকে বলেই ফেললাম, 'ফ্যাশন হচ্ছে বুর্জোয়া বিলাস মাত্র।' কিন্তু পরের দিনই সংবাদপত্রে আমাকে নতুন ফ্যাশনের পথ প্রদর্শক হিসেবে দেখানো হলো।

আমার বাবাসহ পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের সদস্যরা কেউই বুঝে উঠতে পারলেন না যে, আমি কেন এতো লোকের মনযোগ আকর্ষণ করছি। 'তুমি নিশ্চয়ই আমাদের এখানকার আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব থেকে আলাদা কিছু', খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার ছবি দেখে বাবা টিপ্পনি কাটলো। 'তোমাকে মুসোলিনীর মতো দেখাচ্ছে।'

তার 'আলাদা' তত্ত্ব সম্ভবত ঠিক। আলোচনা চলছে পুরোমাত্রায় গোপনে, শুধু আমাকে ছাড়া আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের লোকদের কাছে সামান্যই সঠিক খবর পৌঁছাতে পারছে। কিন্তু আমার এই ব্যাপক সম্বর্ধনা অন্যকিছু বলে আমি মনে করি। আমি একটা নতুন প্রজন্মের প্রতীক হয়ে গেছি। আমি কখনও ভারতীয় ছিলাম না। আমি স্বাধীন পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি সেইসব মনোবৈকল্য ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত, যেসব বিষয় ভারতীয় ও পাকিস্তানিদের বিভক্ত করেছে। হয়ত জনগণ আশা করছে যে, নতুন প্রজন্মের একজন হিসেবে বাবা-দাদাদের সময়কার তিক্ত অতীতকে ঢেকে, তিন তিনটি যুদ্ধের সৃষ্ট উত্তেজনা পরিহার করে দু'দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তুলবো। সিমলায় জনগণের এই সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব দেখে আমার মনে হয়েছে এটা সম্ভব। আমরা কি এই ঘৃণিত দেয়ালের আড়ালে থাকবো, নাকি ইউরোপের একদা বিবদমান রাষ্ট্রগুলো যেমন পরস্পর একতাবদ্ধ হয়েছে তেমনই হবো।

ব্রিটিশ রাজ্যের এই ভবনে যে আপোষ-আলোচনা তার গন্তব্য খুঁজে ফিরছে, সেখানেই নিহিত রয়েছে আমার উপরের প্রশ্নের উত্তর। বাবা তার অবস্থানের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলো অচলাবস্থা নিরসনের আশায়। কিন্তু আমার বাবা কোনো আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না। ভারতীয় কাশ্মীর পশ্নে কাশ্মিরী জনগণ কোনো দিকে থাকতে চায়– এ ব্যাপারে গণভোটের পক্ষে পাকিস্তানের অবস্থানকে ক্রমাগত অস্বীকার করে যাচ্ছে ভারত।

মিসেস গান্ধীকে নিয়ে বাবা অসুবিধেয় পড়ছে। যদিও মিসেস গান্ধীর পিতা প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর প্রতি বাবার অগাধ শ্রদ্ধা, কিন্তু মিসেস গান্ধী সম্পর্কে বাবার ধারণা হলো– নেহেরুর যে প্রজ্ঞা ভারতকে একটি আন্তর্জাতিক মর্যাদা এনে দিয়েছে, মিসেস গান্ধীর মধ্যে তার অভাব আছে। আমার অবশ্য মিসেস গান্ধী সম্পর্কে খুব বেশি ধারণা নেই। ৩০ জুন তারিখ রাতে তিনি আমাদের প্রতিনিধিদের জন্য যে সংক্ষিপ্ত ডিনারের আয়োজন করেছিলেন, সেখানে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন অনেকক্ষণ, এতে আমি কিছুটা বিচলিত বোধ করছিলাম। আমি তার রাজনৈতিক পথপরিক্রমা গভীরভাবে অনুসরণ করেছি এবং তার অধ্যাবসায়ের প্রশংসা করি। ১৯৬৬ সালে যখন তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোয়ন দেয়া হয়, তখন কংগ্রেসের বিবদমান সদস্যরা মনে করেছিলেন যে, তিনি দুর্বলচিত্ত এবং তাকে নামকা ওয়াস্তে নির্বাচিত করা হলো। তাকে তারা আড়ালে বলতেন 'গুংগী গুড়িয়া' অর্থাৎ বোবা পুতুল। কিন্তু এই লৌহমানবী তাদের ধারণা পাল্টে দিয়েছেন। আমার বিচলিতভাব কমাবার জন্য আমি তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি অত্যন্ত স্বল্পবাক হওয়ায় তা সম্ভব হলো না। ঠাণ্ডা নিশ্ছিদ্র মানুষ বলে তার সম্পর্কে প্রচার আছে,

www.pathagar.com

শুধুমাত্র যখন তিনি হাসেন, ওইটুকুই ব্যতিক্রম।

আমার বিচলিত বোধ করায় আরেকটি কারণ হচ্ছে আমি আমার মায়ের দেয়া একটা সিল্কের শাড়ি পরেছিলাম ওই রাতে। যদিও মা কিভাবে গুছিয়ে পরতে হয়, সেটা শিখিয়ে দিয়েছিল, তবু আমার ভয় হচ্ছিল শাড়ি অকস্মাৎ খুলে না যায়। কেবল আমার মনে পড়ছে আমার আন্টি মুমতাজের কথা। জার্মানিতে একটা মার্কেটে এসকিলেটরে তার শাড়ি আটকে গিয়ে খুলতে শুরু করেছিল এবং এসকিলেটর বন্ধ করে তাকে সে যাত্রায় রক্ষা করা হয়েছিল। এই স্মৃতি আমাকে কোনো সাহায্য করলো না বরং মিসেস গান্ধী আমার দিকে তাকিয়েই রইলেন।

আমি ভাবলাম মনে মনে সম্ভবত তার পিতার সঙ্গে বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনে যাওয়ার স্মৃতি মনে পড়ছে। তিনি কি নিজেকে আমার মধ্যে খুঁজছেন? তিনি কি পিতার জন্যে কন্যার, কন্যার জন্যে পিতার ভালবাসা স্মরণ করছেন? তিনি বেশ ছোটখাটো দেখতে। কিন্তু তার মধ্যে এতো দৃঢ়তা কোথা থেকে এলো। পিতার মত উপেক্ষা করে তিনি একজন পার্সি ধর্মাবলম্বী রাজনীতিককে বিয়ে করেছিলেন, যা তার পিতা মেনে নেননি। তাদের এই বিয়ে টিকে থাকেনি এবং তারা স্বতন্ত্র বসবাসের মধ্য দিয়ে এই বিয়ের সমাপ্তি ঘটান। এখন তার পিতা ও স্বামী দু'জনেই মৃত। তিনি কি একাকীত্ব বোধ করেন।

আমি এটা ভেবে আশ্চর্য হলাম যে, সিমলায় পাকিস্তানি প্রতিনিধিদের উপস্থিতি অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা মনে করিয়ে দেয়। এটা সেই শহর যেখানে হিন্দু ভারত থেকে বিভক্ত হওয়া মুসলিম পাকিস্তানের সীমানা চিহ্নিত করার কাজে তার পিতা জওহরলাল নেহেরু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খানের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। এখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনিই পারেন পৃথক মুসলমান রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে, অথবা তিনিই পারেন এটা ধ্বংস করে দিতে। তিনি কোনোটা করবেন? উত্তর এলো চার দিন পর।

'জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। আমরা কালই চলে যাব।' জুলাইয়ের দুই তারিখে আমার বাবা আমাকে বললো।

'কোনো চুক্তি ছাড়াই?' আমার জিজ্ঞাসা।

'চুক্তি ছাড়াই', বাবা বললো, 'ভারতের চাপিয়ে দেয়া কোনো চুক্তি না মেনে বরং আমার পাকিস্তানে ফিরে যাওয়াই উত্তম। ভারতীয়রা মনে করছে কোনো চুক্তি ছাড়া আমি পাকিস্তানে ফিরে যেতে পারবো না এবং সেই কারণে আমরা ওদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হবো। কিন্তু আমি তাদের চালাকি ধরে ফেলেছি। আমি দেশ বেঁচে দেয়ার কোনো চুক্তিতে স্বাক্ষর করার চেয়ে বরং পাকিস্তানের মোহমুক্তির পরিস্থিতি মোকাবিলা করবো।'

হিমাচল ভবনে দীর্ঘ আলোচনায় ক্লান্ত প্রতিনিধিদের চেহারায় মলিনতার ছাপ। কাগজপত্রের বাঁধাছাদার শব্দই কেবল নীরবতা ভাঙছে। কেবলমাত্র অবশিষ্ট আছে আজ রাতে মিসেস গান্ধীর সঙ্গে বাবার সৌজন্য সাক্ষাৎ ও ভারতীয়দের জন্য পাকিস্তানি প্রতিনিধিদের দেয়া ডিনার। এরপর আমরা ইসলামাবাদ ফিরে যাবো। শোবার ঘরের মেঝেতে বসে কিছু একটা গোছাচ্ছিলাম, বাবা হঠাৎই দরজায় উঁকি দিলো। 'কাউকে বলো না', তার চোখে নতুন আশার আলো। 'আমি মিসেস গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই, যদিও এই সাক্ষাৎ আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। আমার মাথায় নতুন ধারণা কাজ করছে। কিন্তু যদি কোনো ফল না হয় তোমরা হতাশ হবে না;' এই বলে বাবা চলে

www.pathagar.com

গেলেন।

আমি জানালায় দাঁড়িয়ে তার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় রইলাম। বাইরে তার ফিরে আসার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড় চূড়ায় পাইন গাছের সারি, আঁকা বাঁকা পাহাড়ি সড়ক এবং কাঠের বাড়িঘর। সিমলা অনেকটা মারির মতই, যদিও সীমান্তের দুদিকের জনগণ কেউ কাউকে দর্শন করতে পারে না। বাবা হঠাৎই ফিরে এলো।

'আশার আলো দেখতে পাচ্ছি', বাবার হাসিমাখা মুখ। আমরা একটা চুক্তিতে আসবো, ইনশাল্লাহ'।

'এটা কিভাবে সম্ভব করলে, বাবা?' অন্য সকলে জানার আগেই পিনপতন নীরবতা থাকতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি লক্ষ্য করলাম আমাদের সফর নিয়ে মিসেস গান্ধী বেশ উদ্বিগ্ন আছেন', বাবা আমাকে বললেন। 'যাই হোক, আমরা ব্যর্থ হলে সে পরাজয় শুধু আমাদের নয়, তারও। আমাদের উভয়েরই রাজনৈতিক বিরোধীরা সে সুযোগ কাজে লাগাবে। মিসেস গান্ধী তার হাতব্যাগ নাড়তে নাড়তে এমন একটা ভাব দেখালেন যে, তার জিহ্বা গরম চায়ের স্বাদ নিতে পারছে না। সুতরাং আমি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বিরামহীন আধাঘন্টা কথা বললাম।

'আমরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত গণতান্ত্রিক নেতা', আমার বাবা তাকে বলেছেন। আমরা এই অঞ্চলকে শান্তিতে পরিণত করতে পারি, যা ভারত বিভাগের পর থেকে আমরা এড়িয়ে গেছি। অথবা আমরা ব্যর্থ হয়ে বর্তমানের ক্ষতকে বাড়িয়ে দিতে পারি। সামরিক প্রতিযোগিতা ইতিহাসেরই অংশ, কিন্তু রাষ্ট্রনেতাদের উচিত নয় এর ব্যাত্যয় ঘটানো। রাষ্ট্রনায়কদের উচিত ভবিষ্যতের দিকে তাকানো, এক্ষেত্রে বিজয়ী হচ্ছে ভারত, পাকিস্তান নয়। ভারতকেই শান্তির জন্য ছাড় দিতে হবে।

'তিনি কি রাজি?' পর্বতপ্রমাণ উত্তেজনা নিয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম। 'তিনি গররাজি হননি'। একটা চুরুট ধরিয়ে বাবা বলল। 'তিনি বলেছেন যে তিনি তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলাপ করে আজ রাতের ডিনারে জানিয়ে দেবেন।'

কিভাবে আমরা রাতের আহারে পৌছলাম, বক্তৃতা, প্রশংসাধ্বনিতে উচ্চারিত হলাম তা আমি কখনও জানতে পারবো না। আমি এবার মিসেস গান্ধীর দিকে তাকিয়ে রইলাম, কিন্তু তার চেহারা দেখে কিছুই অনুমান করতে পারলাম না। ডিনারের পর বাবা ও মিসেস গান্ধী একটা ছোট সিটিং রুমে গেলেন। অন্যরা বিরাট বড় একটা বিলিয়ার্ড রুমে। তারা বিলিয়ার্ড টেবিলকে বড় ডেস্ক হিসেবে ব্যবহার করলেন। যখনই তারা কোনো বিষয়ে রাজি বা গররাজি হচ্ছিলেন, একজন উঠে গিয়ে ছোট ঘর থেকে 'হ্যাঁ বা না' সূচক মত নিয়ে আসছিলেন।

খসড়া, পুনঃখসড়া, পরিবর্তন, সংশোধনে অনেক সময় গেল। উভয় দেশের সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান, প্রতিনিধিতে ঘর জনাকীর্ণ হয়ে গেল। আমি আমার উপরের শোবার ঘর থেকে প্রয়োজনে বার বার ওঠানামা করতে থাকলাম। সিঁড়ি থেকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করি, 'এখন পর্যন্ত কিছু হলো?' কারণ সব কাজ সরকারিভাবে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোনো ঘোষণা করা হবে না। 'যদি চুক্তি হয়, আমরা বলব একটা বালক জন্ম নিয়েছে, আর যদি না হয় তাহলে বলব কন্যা সন্তান জন্মলাভ করছে', এভাবেই পাকিস্তানি প্রতিনিধিরা নিজেদের কথাবার্তার কোড তৈরি করেছেন। 'কি অদ্ভুত!' আমি মন্তব্য করলাম কিন্তু কেউ শুনলো বলে মনে হল না।

www.pathagar.com

'ল্যাড়কা হ্যায়, ল্যাড়কা হ্যায়', রাত ১২-৪০ মিনিটে মিসেস গান্ধী ও আমার বাবা সেই ঐতিহাসিক সিমলা চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন।

সিমলা চুক্তি অনুসারে ৫,০০০ বর্গমাইল পাকিস্তানি ভূখন্ড ভারত ফেরত দিলো। দুই দেশের যোগাযোগ ও ব্যবসা চালু হলো, কিন্তু কাশ্মীর ইস্যু কোনো বাধা হলো না। বাংলাদেশে মুজিবের যুদ্ধবন্দিদের বিচারের হুমকি কোনো বাধা হলো না। যুদ্ধবন্দিদের ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত হলো। কিন্তু দ্রুত তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হলো না।

'মিসেস গান্ধী হয় ভূখণ্ড নয়তো যুদ্ধবন্দী ফেরৎ দিতে চান, আমি কেন ভূখণ্ড চাইলাম, জানো?' সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে বাবা বললেন।

'আমি সত্যিই জানি না বাবা', আমি দুঃখ করে বললাম।

'যদি যুদ্ধবন্দিরা মুক্ত হতো তাহলে পাকিস্তানের জনগণ বেশি খুশি হতো।'

'তারা মুক্ত হবে', বাবা আমাকে নিশ্চয়তা দিলো। 'যুদ্ধবন্দিরা হলো মানবিক সমস্যা। তাদের সংখ্যা ৯৩,০০০ বলেই এই সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেবে। তাদের অনির্দিষ্টকাল আটকে রাখা ভারতের জন্য অমানবিক হয়ে দাঁড়াবে। তাদের খাওয়ানো ও বসবাসের সমস্যাও অনেক বড়। ভূখণ্ড আত্মসাৎ করা যায়, বন্দিদের নয়। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে হারানো ভুখণ্ড আরবরা এখনও ফিরে পায়নি। যুদ্ধবন্দিরা যত আন্তর্জাতিক সমবেদনা পাবে, ভূখণ্ড ততো পাবে না। এবং ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার পর সকল যুদ্ধবন্দি মুক্তি পায়।

৩-জুলাই যখন আমরা রাওয়ালপিণ্ডি বিমান বন্দরে অবতরণ করলাম তখন পরিস্থিতি ছিল আনন্দময়। ভারতে যাওয়ার সময় যে দুঃখভারাক্রান্ত পরিস্থিতি ছিল, এখন তা বদলে গেল। হাজার হাজার জনতা হর্ষধ্বনি দিয়ে উঠলো যখন আমার বাবা লাল কার্পেটে মোড়া বিমান বন্দরে নামলো। বাবা জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, 'আজকের দিনটি স্মরণীয়। একটা বিরাট জয়লাভ ঘটেছে। এটা আমার জয় নয়। মিসেস গান্ধীর জয়ও নয়। তিন তিনটে যুদ্ধের পর এই জয় পাকিস্তান ও ভারতের জনগণের জয়।'

১৯৭২ সালের ৪ জুলাই। জাতীয় পরিষদে সর্বাত্মক সমর্থন পেয়ে সিমলা চুক্তি অনুমোদিত হলো। বিরোধীদলগুলোও এই চুক্তি সমর্থন করলো। সিমলা চুক্তি এখনও কার্যকর।

১৯৭৩ সালের ১৪ আগস্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে আমাদের পরিবারের সকলে দর্শকদের গ্যালারিতে প্রধানমন্ত্রীর বক্সে বসে আছি। জাতীয় পরিষদের সকল সদস্যের সমর্থনে, অবিশ্বাস্যভাবে আমার বাবার বিরোধীতার মুখে সংবিধানে ইসলামি ধারা সংযুক্ত হয়ে গেল। সমর্থন করলেন আমাদের আঞ্চলিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ। জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা হিসেবে আমার বাবা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন।

চার বছর পর জেনারেল জিয়া বাবাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পাকিস্তানের জনগণ অভূতপূর্ব মৌলিক মানবাধিকার ভোগ করছে। ১৯৭৩-এর সংবিধানে জাতি, লিঙ্গ অথবা ধর্ম ভিত্তিক বৈষম্য রহিত করে। এই সংবিধান বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও প্রশাসনের প্রভাবমুক্ত বিচার কার্যক্রমে নিশ্চয়তা দিয়েছিল। প্রফেসর ওম্যাক সেমিনারে পরিস্কারভাবে যেসব কথা বুঝিয়েছিলেন সেই লিগ্যাল ফ্রেইমওয়ার্ক যা পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত সরকারের ছিল।

১৯৭৩ সালের বসন্তে যখন হার্ভাড ছেড়ে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন আমেরিকার

www.pathagar.com

সংবিধানের অন্তঃশক্তির চমৎকার প্রদর্শন হলো। হার্ভার্ডের মনোরম আবহাওয়া ও রাগবি খেলার ধূম সত্ত্বেও আমরা ওয়াটার গেট শুনানি টেলিভিশনে দেখতাম। হায় আল্লাহ্। আমেরিকান জনগণ তাদের প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করছে সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে! এমনকি প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে, যিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন, চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছেন, সেই ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট তার দেশের আইনের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। আমি সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও জনগণের অধিকারের নিশ্চয়তার প্রয়োজনীয়তার উপর লেখা লক, রুশো ও জন স্টুয়ার্ট মিলের বইপত্র পড়েছি। যদিও তত্ত্বতো একই জিনিস। কিন্তু বাস্তবে এর উন্মোচন দেখাটা অন্য জিনিস।

ব্যক্তি কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া খেয়াল ও খুশিমাফিক অথবা বিতর্কিত আইনের বদলে জাতীয়ভাবে গৃহীত আইনের গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াটার গেট বিচার প্রক্রিয়া আমাকে প্রগাঢ় জ্ঞানদান করেছে। এক বছর পর ১৯৭৪ সালে আগস্টে যখন প্রেসিডেন্ট নিক্সন পদত্যাগ করেন, তখন ক্ষমতা হস্তান্তর পর্বটি অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্পন্ন হয়েছিল। আমেরিকার মত গণতান্ত্রিক সমাজের নেতৃবৃন্দ আসেন এবং বিদায় নেন কিন্তু আমেরিকান সংবিধান অক্ষত থাকে। পাকিস্তানে আমরা ততো সৌভাগ্যবান কখনও হবো না।

হার্ভার্ডের গ্রাজুয়েশন প্রাপ্তির সময় যত নিকটতর হচ্ছে, কেমব্রিজ তথা আমেরিকা ছেড়ে যাওয়ার বেদনা ততো প্রকট হচ্ছে। অক্সফোর্ডে পড়ার সুযোগ যখন এলো পিটার গর্লব্রেথসহ আমার অনেক বন্ধু সেখানে গেল কিন্তু আমি যেতে চাইনি। কেমব্রিজ ও বোস্টনের সঙ্গে আমার শেকড়ের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। আমি এখানকার জনগণকে চিনেছি এবং বুঝেছি। আমি বাবাকে বুঝালাম যে পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার আগে আমাকে টাফটস-এর ফ্লেচার স্কুল অব ডিপ্লোমেসিতে পড়তে দাও। কিন্তু বাবা আমাকে অক্সফোর্ডে পাঠাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাবা লিখলো, এক জায়গায় চার বছর পড়েছো, এই যথেষ্ট। আমেরিকায় দীর্ঘদিন থাকলে তুমি সেখানে মায়া বসিয়ে ফেলবে, সুতরাং চলে এসো।

এই প্রথমবার আমি অনুভব করলাম বাবা আমাকে বাধ্য করছে। কিন্তু আমি কি-ই বা করতে পারি? এই বাবাই তো আমাকে পড়াশুনার যাবতীয় খরচ যোগাচ্ছে। আমার কোনো বিকল্প ছিলো না। আমিও একজন বাস্তববাদী মানুষ।

মা আমার গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠানে এসেছিলো। মা এবং আমার ভাই মীর যে হার্ভার্ডে প্রথমবর্ষ শেষ করলো, দু'জনে মিলে আমাকে গোছাতে সাহায্য করলো। আমার রুমমেট ইওলান্দা কোড়রজিকী ও আমি ঘরের আসবাব ফেলে দিলাম, পোস্টারগুলো তুলে নিলাম। আমাদের ঘর হার্ভার্ডের উন্মুক্ত মাঠ ও কো-অপারেটিভ বুক শপের খালি শেলফের মতো ফাঁকা দেখাচ্ছে। সম্ভবত এটাই স্থানান্তর হওয়ায় প্রকৃত সময়। লোগান এয়ারপোর্টে বিমান ছাড়ার সময় শেষবারের মতো বোস্টনের আকাশ, ফিলেন্স বেজমেন্টে শপিং, দারজিলিং পার্কে খাওয়া, বোস্টন ইউনিভার্সিটি হকি খেলায় হেরে যাওয়ার কথা ভুলতে ক্যাসাব্লাঙ্কা যাওয়া ইত্যাদির কথা মনে পড়ছে। মানুষ চাঁদে গেছে আর আমি এমআইটিতে চাঁদের ধুলা দেখেছি। পিটার, পল ও মেরির সেই গান– 'আমি যাচ্ছি জেট প্লেনে করে যাচ্ছি, জানি না কখন ফিরে আসব'– মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, আমি উড়ে চলছি পাকিস্তানের পথে।

৪

আল-মুর্তাজা'র স্মৃতি

অক্সফোর্ডে যাওয়ার স্বপ্নপূরণ

১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাস। আল-মুর্তাজায় আমাদের বন্দিদশার তৃতীয় মাসে আমার কানের যন্ত্রণা আবারও শুরু হলো– অনবরত টিকটিক শব্দ– মনে হয় যেন কেউ মাথার মধ্যে হাতুড়ি পেটাচ্ছে। এর আগে ১৯৭৮ সালে বন্দি অবস্থায় এই কান ব্যথা শুরু হয়েছিল। সে সময় করাচিতে সামরিক জান্তার ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছিল, খুব বেশি বিমান ভ্রমণের ফলে আমার সাইনাস সমস্যা বেড়েছে। সে সময় আমি প্রতি দু'সপ্তাহ অন্তর বাবাকে দেখতে প্লেনে করে জেলে যেতাম। ডাক্তার আমার নাকের মধ্যে ইউস্টেশিয়ান টিউব খুলে দেয়ার জন্য সাইনাসগুলো ক্ষার জাতীয় পদার্থ দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। এখন আবারও আমি আমার কানের সেই পুরনো ভোঁ- ভোঁ করে যা আমার অস্বস্তি বাড়িয়েছিল– স্থানীয় ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে– কিন্তু কানের শব্দ বন্ধ হয়নি। আমি কারা কর্তৃপক্ষকে যিনি আমার অপারেশন করেছিলেন সেই ডাক্তারকে ডাকার জন্য অনুরোধ করলাম। কিন্তু যখন তারা একজন অপরিচিত ডাক্তারকে নিয়ে এলো আমি বিস্মিত হই। তবে নতুন এই ডাক্তার ছিলেন ভদ্র এবং তার ছিল সান্ত্বনামূলক কণ্ঠস্বর। আমার কান পরীক্ষা করার সময় তিনি আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বললেন, 'রিলাক্স, আপনি প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে আছেন।'

'উফ', আমি আর্তনাদ করে বললাম, 'আপনি আমাকে ব্যথা দিচ্ছেন।'

'এটা আপনার অমূলক ভয়', ডাক্তার উত্তরে বললেন, 'আমি শুধু আপনার কানের ভিতরে দেখার চেষ্টা করছি।'

পরদিন সকালে আমি যখন ঘুম থেকে উঠলাম, বালিশে কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখতে পেলাম। ডাক্তার আমাকে বললেন 'আপনি আপনার এয়ারড্রাম ফুটো করে ফেলেছেন। আপনি অবশ্যই কানে হেয়ার পিন ঢুকিয়ে এই সর্বনাশ করেছেন।' ডাক্তারের কথায় আমি আশ্চর্য হলাম। হেয়ার পিন? আমি কেন কানে হেয়ার পিন দেব? ডাক্তার আমাকে দুটো ওষুধ লিখে দিলেন এবং দিনে তিনবার করে ওষুধগুলো খাওয়ার জন্য বললেন। কিন্তু

www.pathagar.com

ডাক্তারের দেয়া বড়িগুলো খেয়ে আমার শুধু ঘুম হচ্ছিল। ঘুম ভাঙার পর আমি বিষণ্ণতায় ভুগতাম। তৃতীয়দিনে সূর্য ওঠার পরও আমি যখন ঘুমিয়ে থাকলাম, প্রতিদিনের মতো সকালে বাগানে গেলাম না, কিছু খেলাম না এমনকি দাঁত ব্রাশও করলাম না- আমার মা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তিনি এতই বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে সব ওষুধ ছুঁড়ে ফেললেন।

কয়েকদিন পর কানে ব্যাথা হতে লাগল; আবার নিজে নিজেই ব্যথা সেরে যেত কিন্তু কানের মধ্যে টিকটিক, টিকটিক শব্দ ক্রমেই বাড়তে থাকল। আমি ঘুমাতে পারি না, কোথাও কোনো কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। সামরিক জন্তার ডাক্তার কি পরিকল্পিতভাবেই আমার এয়ারড্রাম ফুটো করে দিয়েছে? নাকি সেটা ছিল একটি দুর্ঘটনা মাত্র? আমার কানের মধ্যে সবসময় টিকটিক, টিকটিক করে বাজছিল, আমি ঠিকমতো শুনতেও পেতাম না।

কানের যন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্য আমি সারাদিন বাগানে কাজ করতাম। এয়ারড্রামের ফুটো দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ত। গোসলের সময় আমি কানে পানি দিয়ে সেগুলো ধুয়ে ফেলতাম, আমি জানতাম না এবং ডাক্তারও আমাকে বলেননি যে, আমার কান শুকনো রাখতে হবে- ক্ষত অবস্থায় পানি লাগলে সেপটিক হতে পারে। টিকটিক, টিকটিক করে আমার কান বাজতেই থাকল।

রাতে ঘুমোতে পারি না। আল-মুর্তাজার ভেতরে আমি হেঁটে বেড়াই। ৭০ ক্লিফটনের বাড়ির মতো আল-মুর্তাজাতেও বহুবার রেইড হয়েছে। এর ফলে বাড়ির জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে কিংবা হারিয়ে গেছে। আমার বাবার এন্টিক বন্দুকের সংগ্রহ ছিল- যা আমার প্রপিতামহের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি পেয়েছিলেন। সামরিক জান্তা ওই সংগ্রহগুলো বাজেয়াপ্ত করে বাগানের একটি স্টোর রুমে সিল করে রেখেছে। সামরিক জান্তার লোকজন প্রতি সপ্তাহে আল-মুর্তাজায় এসে স্টোররুমের সিল পরীক্ষা করে দেখে- তালা ভাঙা কিনা। তাদের ধারণা সম্ভবত আমি এবং আমার মা এন্টিক ওই বন্দুক ছুঁড়ে পালিয়ে যাব।

আমি এখন শূন্য গানরুমে- যেটা এখন আমাদের পারিবারিক ডাইনিং রুম এবং এর পরেই কাঠের প্যানেল করা বিলিয়ার্ড রুমে বিনিদ্র রাত কাটাই। অক্সফোর্ড থেকে বেড়াতে আসা আমার বন্ধুদের সঙ্গে আমার ভাইদের বিলিয়ার্ডের প্রতিযোগিতা জমে উঠত এই রুমে। বিলিয়ার্ড রুমের একটি টেবিলে একটা সিরামিকের ভাস্কর্য ছিল। অনেকগুলো বাচ্চাসহ একটি মোটা চাইনিজ লোকের ভাস্কর্য- ভাস্কর্যটি ড্রইং রুমে ছিল, আমি সেটা বিলিয়ার্ড রুমে নিয়ে এসেছিলাম। ভাস্কর্যটি বাবার প্রিয়। তিনি প্রায়ই কৌতুক করে বলতেন যে, তিনি অনেক ছেলেমেয়ে চেয়েছিলেন যাদেরকে দিয়ে একটি ক্রিকেট টিম করার ইচ্ছে ছিল- তবে আধুনিক বিশ্বে এগারোজন ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখানো খুবই ব্যয়বহুল- তাই তিনি আমাদের চার ভাইবোন নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছেন।

বাবা আমাদের ভাইবোনদের সবসময় অক্সফোর্ড অক্সফোর্ড করে অধীর করে তুলতেন। তিনি বলতেন, অক্সফোর্ডই হচ্ছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এবং স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়। ইংলিশ হিস্ট্রির বিশাল ভাণ্ডার হচ্ছে অক্সফোর্ড। ইংরেজি সাহিত্য, গির্জার শাসন, রাজতন্ত্র এবং পার্লামেন্ট এসব বিষয়ই অক্সফোর্ডের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। বাবা আমেরিকান শিক্ষা ব্যবস্থাকেও উত্তম বলে স্বীকার করতেন তবে সেখানকার শিক্ষাদান পদ্ধতি খুবই শিথিল। তিনি বলতেন, অক্সফোর্ড আমাদের সামনে একটি নতুন দিগন্তের সন্ধান দেবে

www.pathagar.com

এবং আমাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তুলবে। চার ভাইবোনের জন্মের পর থেকেই বাবা আমাদের সঙ্গে অক্সফোর্ডের গল্প করতেন। ভাইবোনদের মধ্যে সকলের বড় হওয়ার সুবাদে- সামরিক অভ্যুত্থান আমাদের জীবনে মহাবিপর্যয় নিয়ে আসার আগেই সৌভাগ্যবশত একমাত্র আমিই অক্সফোর্ডে শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করতে পেরেছিলাম। দ্বিতীয় বর্ষে থাকাকালীন মীর অক্সফোর্ড ছেড়েছিল। আমার বাবার জীবন বাঁচানোর জন্য মীর অক্সফোর্ড পড়া ছেড়ে ইংল্যান্ডে লড়াইয়ে নামে। সনম অক্সফোর্ড যেতেই পারেনি। আমার বাবার প্রিয় বিদ্যাপীঠ অক্সফোর্ডে যেখানে তিনিও তার শিক্ষাজীবন কাটিয়েছেন- আমার ছাত্রজীবনও বাবার জন্য অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের বিষয় ছিল।

১৯৭৩ সালের শরতে অক্সফোর্ডে পৌঁছলাম। অক্সফোর্ড পৌঁছার পরপরই আমার বাবা রাওয়ালপিণ্ডির প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'বাইশ বছর আগে অক্সফোর্ডে ছেড়ে আসা আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করছ তুমি- এটা ভাবতেই আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করি। রেডক্লিফে তোমার পদচারণা আমাকে পুলকিত করে। কিন্তু যেহেতু আমি হার্ভার্ডে ছিলাম না তাই আমার স্মৃতির পর্দায় তোমার অবস্থান পুরোপুরি কল্পনা করতে পারিনি। অক্সফোর্ডে আমার সশরীরে উপস্থিতির মতোই আমি তোমার উপস্থিতি দেখতে পারছি। অক্সফোর্ডের রাস্তায় তোমার পথচলা, বরফাচ্ছাদিত পাথুরে সোপানে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ জ্ঞানের প্রতিটি সিংহদ্বার- যেখানে তুমি প্রবেশ করছ- সবকিছুই আমি দেখতে পারছি। তোমার অক্সফোর্ডে যাওয়ায় যেন একটি স্বপ্ন সত্যি হলো। আমরা প্রার্থনা করি এবং কামনা করি মানুষের কাজ করার জন্য তোমার উল্লেখযোগ্য বিকাশের মাধ্যমে এই স্বপ্ন একদিন বাস্তবে রূপ নেবে।'

অক্সফোর্ডের প্রথম জীবনে আমার বাবা আমার চেয়েও বেশি সুখী ছিলেন। হার্ভার্ডে আমার এবং অন্যান্য সহপাঠীদের থাকার রুমগুলো ছিল বড়, সুসজ্জিত এবং আরামদায়ক। তার তুলনায় অক্সফোর্ডের লেডি মার্গারেট হলে কমন বাথরুমে গোসলের ব্যবস্থা। ব্যক্তিগত ফোনের ব্যবস্থা ছিল না অক্সফোর্ডে। যোগাযোগের জন্য সেখানকার মান্ধাতা আমলের ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করতে হতো, এতে যে কোনো বার্তা আদান-প্রদানে সাধারণত দু'দিন লাগত। এবং দেখলাম অক্সফোর্ডের ইংরেজ সহপাঠীরা হার্ভার্ডের সহপাঠী বন্ধুদের তুলনায় গম্ভীর, অথচ হার্ভার্ডের সহপাঠীরা ছিল বরাবরই বন্ধুত্বপূর্ণ। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমি একজনই সঙ্গি পেয়েছিলাম- একজন আমেরিকান সহপাঠী- আমেরিকা থেকে অক্সফোর্ডে এসেছিল। তবে আমার বাবা সব সময়ই আমাকে সঙ্গ দিতেন- তিনি আমাকে প্রাচীন রোমের একটি ছবি পাঠিয়েছিলেন, ১৯৫০ সালে ক্রাইস্টচার্চে আমার বাবার রুমে ছবিটি ঝুলানো ছিল। আল-মুর্তাজা থেকে লেখা এক চিঠিতে বাবা লিখেছিলেন, 'অক্সফোর্ডে যাওয়ার পূর্বে এই ছবিটি তোমার জন্য তেমন অর্থবহ ছিল না। তবে এখন এই ছবিটি আমি তোমার জন্য পাঠালাম, ইচ্ছে করলে এটা তুমি তোমার রুমে ঝুলিয়ে রাখতে পার।' ছবিটি আমি আমার রুমের দেয়ালে ঝুলিয়েছিলাম। পাকিস্তানের ধুলো-ধূসরিত পথ বেয়ে অক্সফোর্ডের পরিচ্ছন্ন রাস্তায় আসা এই ছবিটি আমাকে ধারাবাহিকতার উষ্ণ পরশ বুলাতো।

হার্ভার্ডের তুলনা করে আমার বাবা আমাকে সতর্ক করে বলেছিলেন যে, অক্সফোর্ড আমাকে চাপের মধ্যে কাজ করার অভ্যেস গড়ে তুলবে। রাজনীতি, দর্শন এবং অর্থনীতি

www.pathagar.com

বিষয়ে টিউটোরিয়ালের জন্য সপ্তাহে দুটো রচনা লিখতে আমাকে যে পরিশ্রম করতে হতো– তাতে বাবার কথার সত্যতা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম। তিনি আমাকে অক্সফোর্ড ইউনিয়নে যোগ দেয়ার পরামর্শও দিয়েছিলেন।

অক্সফোর্ডে বিভিন্ন ধরনের সোসাইটি রয়েছে, এছাড়াও সমাজতন্ত্রী, রক্ষণশীল এবং উদার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্ন ক্লাব রয়েছে– যারা নিজেদের মতাদর্শ প্রচার এবং দলভারী করতে সচেষ্ট থাকে– এদের মধ্যে সর্বজনবিদিত এবং সুপরিচিত হলো– অক্সফোর্ড ইউনিয়ন ডিবেটিং সোসাইটি– হাউজ অব কমন্সের আদলে ১৮২৩ সালে এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভবিষ্যৎ রাজনীতিকদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয় এই ইউনিয়নকে। রাজনীতিক হওয়ার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না। কারণ রাজনীতিকদের জীবনের টান টান উত্তেজনা এবং প্রচণ্ড চাপ আমি প্রত্যক্ষ করেছি। পাকিস্তানের ফরেন সার্ভিসে কাজ করাই ছিল আমার লক্ষ্য। তা সত্ত্বেও আমার বাবাকে খুশি করার জন্যই আমি অক্সফোর্ড ইউনিয়নে যোগ দিয়েছিলাম।

বাবার ইচ্ছে পূরণ করতে গিয়ে আমি নিজেই বিতর্কের কলা-কৌশলের প্রতি আকৃষ্ট হই। ভারতীয় উপমহাদেশে যেখানে নিরক্ষরের হার বেশি সেখানে সবসময়ই বাগ্মিতার ব্যাপক ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী, জওয়াহার লাল নেহেরু, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং আমার বাবার কথায় লাখ লাখ মানুষ আন্দোলন করেছে। গল্প বলা, কবিতা লেখা এবং বাগ্মিতা আমাদের ঐতিহ্য। অক্সফোর্ড ইউনিয়নের শান্ত-নম্র পরিবেষ্টনীতে আমার মধ্যে কখন কিভাবে পাকিস্তানের লাখ লাখ মানুষের সামনে কথা বলার ক্ষমতা সঞ্চিত হয়েছিল, তখন তা বুঝতেই পারিনি।

পলিটিক্স, ফিলোসোফি এবং ইকোনোমির (পিপিই) উপর আমার তিন বছরের শিক্ষা জীবন এবং আন্তর্জাতিক ও কূটনীতি বিষয়ে চতুর্থ বছরের পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোর্সে অক্সফোর্ডের শিক্ষা জীবনে অক্সফোর্ড ইউনিয়ন ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং আনন্দদায়ক অধ্যায় যা আমার জীবনকে বিকশিত করেছিল। অক্সফোর্ডের কেন্দ্রস্থলে ইউনিয়ন ভবন, তার বাগান, দুটো লাইব্রেরি, রেস্টুরেন্টে বিলিয়ার্ড রুম আমার কাছে আল-মুর্তাজার মতো আপন হয়ে উঠেছিল। ডিবেটিং হলে আমরা নারীবাদী লেখক জার্মাইন গিরির থেকে শুরু করে ট্রেড ইউনিয়নিস্ট স্কারগিলের বক্তব্য শুনতাম। আমি অক্সফোর্ড ইউনিয়নে থাকাকালীন ব্রিটেনের দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রী লর্ড স্টকটন এবং এডওয়ার্ড হিথ– সেখানে এসেছিলেন। কার্নেশন খচিত আনুষ্ঠানিক পোশাক পরে ছাত্ররাই বিতর্ক অনুষ্ঠানে স্পিকারের দায়িত্ব পালন করে। ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য আমাকে জিনস ছেড়ে এনা বেলিন্ডার সিল্ক পড়তে হয়েছিল। ক্যান্ডেল-লাইট ডিনার শেষে আমরা বাকযুদ্ধে লিপ্ত হই।

জীবন আমাদের সঙ্গে কত বিচিত্র কৌতুক করে! গ্লাডস্টোন এবং ম্যাকমিলানের মতো ব্রিটেনের অভিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক যারা সংবিধানের বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব তাদের সামনে বিতর্কের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমি আমার প্রথম বক্তব্য দিয়েছিলাম। আমার প্রস্তাবনা এক রাষ্ট্রনায়ককে অপসারণের পক্ষে। আমার প্রস্তাবনা উপস্থাপনের জন্য ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আমাকে আহ্বান জানায়– এই হাউস নিক্সনকে ইম্পিচ করবে।

'এটা স্ববিরোধী মনে হলেও সত্য যে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন– তিনিই আজ আইন লঙ্ঘনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছেন। যার ফলে তার দেশের সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।' এভাবেই আমি

www.pathagar.com

আমার বক্তব্য শুরু করি। 'আর তাই আমেরিকার ইতি
প্রসঙ্গে আমি জর্জ ওয়াশিংটনের ছোটবেলার একটি গল্প
বাবা দেখলেন কে বা কারা তার চেরি গাছ কেটে ফেলে
জানতে চান কে এই কাজ করেছে। বালক জর্জ সাহসে
'বাবা আমি মিথ্যে বলতে পারব না, গাছ আমিই
প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে আমেরিকার যাত্রা শুরু হয় যিনি
সেখানে এমন একজন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন যিনি সত্য

বিশ বছর বয়সের একজন শিক্ষার্থীসুলভ সাদামাটা অভিযোগ উত্থাপন করেছিলাম আমি। আমেরিকান প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ইম্পিচযোগ্য যে অভিযোগগুলো আমি উত্থাপন করেছিলাম তার মধ্যে ছিল- কংগ্রেসের যুদ্ধ সংক্রান্ত ক্ষমতা লঙ্ঘন করে ভিয়েতনামে যুদ্ধ এবং কম্বোডিয়ায় গুপ্ত বোম্বিং, প্রাপ্ত উপহারের ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার জন্য ভাইস প্রেসিডেন্টের নথিতে অনেক আগের এক তারিখে স্বাক্ষর প্রদান, ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি এবং তার সেক্রেটারির টেপ নষ্ট করার সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা বিষয়ক অভিযোগ।

উপসংহারে আমি বলেছিলাম, 'বন্ধুরা ভুল করবেন না। উত্থাপিত অভিযোগগুলো গুরুতর। নিক্সন ক্রমাগতভাবে নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে বিবেচনা করছেন, তিনি তার ইচ্ছানুযায়ী সব করতে পারেন- এটাই তার ধারণা। এর থেকে পরিত্রাণের উৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে তার মস্তক কর্তন। কিন্তু আমরা এতো কঠোর ব্যবস্থা নিতে চাই না তবে কোনো অকার্যকর ব্যবস্থাও আমরা নেব না। জানা যায়, নিক্সন একদিন তার সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়েছিলেন, সাইকিয়াট্রিস্ট তাকে বলেছিলেন, 'মি. প্রেসিডেন্ট আপনার মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়নি কিন্তু সত্যিই আপনি ঘৃণিত। আজ নিক্সন শুধু ঘৃণিতই নন, তিনি তার সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন। জাতির কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হওয়ায় আমেরিকান জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার নৈতিক অধিকারও তিনি হারিয়েছেন। এটা নিক্সন এবং আমেরিকার জন্য দুর্ভাগ্য।

কে জানতো, পশ্চিমে থাকার বছরগুলোতে- গণতন্ত্রের মূল্যবোধ হিসেবে- আইনের শাসন, বিশ্বাসযোগ্যতা, নৈতিক অধিকার প্রভৃতি বিষয়কে অপরিহার্য বলে বিশ্বাস করেছিলাম- পাকিস্তানে আমার সেই বিশ্বাস ভলুণ্ঠিত হবে। অক্সফোর্ড ইউনিয়নের ইম্পিচমেন্টে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ৩৪৫ - ২ ভোটে অপসারিত হয়েছিলেন। আর পাকিস্তানে ভোট নয়- বন্দুকের নলে আমার বাবা ক্ষমতাচ্যুত হলেন।

আমি যখন অক্সফোর্ডে ছিলাম, পাকিস্তান আমার কাছে অনেক দূরে মনে হতো। অক্সফোর্ডের বছরগুলো ছিল হাসিআনন্দে পরিপূর্ণ। আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়গুলো আমি সেখানে কাটিয়েছি- ঠিক আমার বাবা যেমন আশা করেছিলেন। বন্ধুদের সঙ্গে করে শেরওয়েল নদীতে গিয়ে বৈঠা দিয়ে নৌকো বাইতাম এবং উডস্টকের কাছে সবুজে ঘেরা ব্রেনহেইম প্রাসাদে পিকনিক করতাম। অন্য এক উইকএন্ডে আমার হলুদ এমজিবিতে চড়ে আমরা বেরিয়ে পরতাম স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-এভোনে শেকসপিয়রের মঞ্চায়ন দেখার জন্য অথবা লন্ডন- সেখানে বাসকিন রবিনসের নতুন চালু হওয়া আইসক্রিম বারে আমার প্রিয় আমেরিকান পিপারমেন্ট স্টিক আইসক্রিম উপভোগ করতাম। আমার গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন হওয়ার পর বাবা আমাকে ওই হলুদ এমজিবি গাড়িটা উপহার

www.pathagar.com

. আন্তঃকলেজ নৌকা বাইচ উৎসবে সব কলেজের প্রতিযোগিরা যখন নদীতে .তা করত তখন আমরা কলেজের বোট হাউজ বাগানে পার্টিতে মশগুল থাকতাম। .রা মাঝির পোশাক কিংবা ব্লেজার পরত, মেয়েদের পরনে থাকত ফুলের নকশা আঁকা .ম্বা পোশাক এবং হ্যাট। পরীক্ষার সময় আমরা বিশেষ পোশাক পরতাম। ঐতিহ্যবাহী সাদাশার্ট, কালো স্কার্ট এবং হাতাছাড়া কালো গাউন। ওই পোশাকে আমরা যখন হেঁটে যেতাম তখন সবাই এমনকি যারা অক্সফোর্ডের ছাত্র নয় বলত– 'গুডলাক!'

হার্ভার্ডে বিদেশি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা গুটিকয়েক। রেডক্লিফে একটি ইংরেজ ছাত্রীসহ আমরা মাত্র চারজন ছিলাম। ইংরেজ ছাত্রীটিকে সেখানে বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত করার বিষয়টি আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে না হয়ে বরং আমাকে আহত করেছিল। তবে অক্সফোর্ডে বিদেশি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশি। পাকিস্তানের ক্রিকেটার ইমরান খানও সেখানে ছিলেন। আরো ছিলেন বাহরাম দেহকানি তাফতি– তার বাবা ছিলেন ইরানি। বাহারাম আমাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিয়ানো বাজিয়ে শোনাত। গিলবার্ট এবং সুলিভান থেকে শুরু করে স্কট জেপলিন থেকে ফৌরেসের রিকুয়েম পর্যন্ত সব ধরনের গান বাজাতে পারত সে। ১৯৮০ সালে ইরানে ইসলামিক বিপ্লব শুরু হওয়ার পর পরই বাহরাম নিহত হয়। অক্সফোর্ডে এশিয়ানদের যদিও বহিরাগত হিসেবেই বিবেচনা করা হতো, কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য তারা উপযুক্ত বলেও বিবেচিত হতো না, তবে সব ব্রিটিশরা এরকম ভাবতো না।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি পাকিস্তানে এলাম। আমার বাবার আহ্বানে তখন প্রথমবারের মতো লাহোরে ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনে প্রতিটি মুসলিম রাজা-বাদশাহ, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেছিলেন। আটত্রিশটি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে আমার বাবা অংশগ্রহণকারী সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের প্রতি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে কূটনৈতিক সাহায্যের হাত বাড়ানোর আহ্বান জানান। পরে ঘানার প্রেসিডেন্ট ইউরি বুমেদিনের প্রাইভেট প্লেনে করে শেখ মুজিবুর রহমানও ওই সম্মেলনে যোগ দেন। ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলন আমার বাবা এবং পাকিস্তানের জন্য ছিল এক বিরাট সাফল্য। মুজিবের প্রতি বাবা শান্তি ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন– এর মাধ্যমেই যুদ্ধবন্দি পাকিস্তানিদের যাদের যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে বিচার করার জন্য বাঙালি নেতা হুমকি দিচ্ছিলেন, শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদেরসহ সকল বন্দির দেশে প্রত্যাবর্তনের পথ তৈরি করেন।

নিজেকে এশিয়ান হিসেবে চেনার স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ নিয়ে আমি ইংল্যান্ডে ফিরি এবং প্রথমবারের মতো আমি সেখানে বর্ণবাদের শিকার হই।

'ইংল্যান্ডে আপনি কোথায় থাকবেন?' আমার পাসপোর্ট দেখার সময় ইমিগ্রেশন অফিসার আমাকে প্রশ্ন করল। 'অক্সফোর্ড', আমি উত্তর দেই, আমি সেখানকার ছাত্র। 'অক্সফোর্ড?' তিনি সার্কাস দেখানোর মতো তার চোখ দুটো কপালে তুলে প্রশ্ন করলেন। আমি আমার বিরক্তি দমন করে তাকে আমার ছাত্রত্বের পরিচয়পত্র দেই। 'ভুট্টো। মিস বেনজির ভুট্টো, করাচি, পাকিস্তান'। অবজ্ঞাভরে তিনি কথাগুলো উচ্চারণ করে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার পুলিশ কার্ড কোথায়?'

আমি আমার আপটুডেট পুলিশ কার্ড তার সামনে দিয়ে বলি, 'এই যে এখানে।' ইংল্যান্ডে প্রত্যেক বিদেশীর সঙ্গেই পুলিশ কার্ড রাখতে হয়।

www.pathagar.com

ইমিগ্রেশন অফিসার অত্যন্ত কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি অক্সফোর্ডের খরচ বহন করবেন কিভাবে?'

আমি একটি পেন্সিল এবং একটা টিনের মগ মাত্র নিয়ে এসছি এখানে। কথাটা মুখ ফসকে বলেই ফেলেছিলাম প্রায় কিন্তু নিজেকে সংবরণ করলাম। আমার ব্যাংক একাউন্টে আমার মা-বাবা টাকা পাঠিয়ে দেন।' আমার ব্যাংকের বই দেখিয়ে আমি বললাম।

তারপরও সেই অভদ্র অফিসারটি আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখল। অযথা বারবার আমার কাগজপত্রগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে থাকে– আমার নামের উপর বারবার তার চোখ যাচ্ছে– আমি নিশ্চিত ব্যাংকের বড় মোটা বইয়ে লেখা আমার নামটি দেখেও আমি কে তিনি তা বুঝতে পারছিলেন না।

অবশেষে আমার সব কাগজপত্র আমার দিকে ঠেলে দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করানোর মতো সামর্থ্য একজন পাকিস্তানির কি করে হয়?' আমি ক্রোধান্বিত হয়েছিলাম, গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘুরে গিয়ে আমি দীর্ঘ পদক্ষেপে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এলাম। একজন প্রধানমন্ত্রীর মেয়ের সঙ্গে যদি একজন ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা এই আচরণ করে তাহলে অন্যান্য পাকিস্তানিদের যারা ভালো ইংরেজি বলতে পারে না– কিংবা আমার মতো আক্রমণাত্মক না– তার সঙ্গে তারা কিরূপ আচরণ করে?

অক্সফোর্ডে যাওয়ার অনেক আগেই বাবা আমাকে পশ্চিমা দেশগুলোর বর্ণবাদী দুর্ব্যবহার সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থায় আমার বাবা এ ধরনের দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছিলেন, ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়াগোর এক হোটেল ক্লার্ক বাবাকে হোটেলে রুম দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। বাবা পাকিস্তানি হওয়ার জন্য নয় বরং তাকে মেক্সিকান ভেবে হোটেলে রুম দেয়নি ক্লার্ক।

আমি যখন অক্সফোর্ডে তখন পুনরায় বাবা আমাকে বর্ণবৈষম্যের বিভিন্ন ঝুঁকি এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন– কারণ অক্সফোর্ড থেকে লেখা আমার চিঠিগুলোতে প্রাচ্যের চেয়ে পাশ্চাত্যের ছাপ ফুটে উঠত। আমার মনে হয়– পশ্চিমের মোহময়তায় প্রলুব্ধ হয়ে আমি সেখানে থেকে যাব– আর কখনও পাকিস্তানে ফিরব না– এই ভেবে বাবা উদ্বিগ্ন হতেন। এক চিঠিতে বাবা লিখেছিলেন, 'পশ্চিমারা তাদের হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে তোমাকে একজন ছাত্র হিসেবেই বিশ্বাস করে এবং জানে তুমি তাদের দেশে স্থায়ীভাবে থাকবে না। তুমি তাদের দেশের অভিবাসী নও এবং তোমার কারণে তাদেরকে বর্ণগত দায় বহন করতে হবে না– এই কারণেই তারা তোমাকে গ্রহণ করেছে। তারা যখনই জানবে যে, তাদের মহান দেশে আরো একজন পাকিস্তানি বা এশিয়ান অভিবাসী কিংবা শরণার্থী হতে যাচ্ছ ঠিক তখনই তোমার প্রতি তাদের আচরণ পুরোপুরি পাল্টে যাবে। তারা তোমাকে অবজ্ঞা করা শুরু করবে। সাফল্যের পথে যে কোনো প্রতিযোগিতায় তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তারা অবৈধ বলে বিবেচনা করবে।

আমার উদ্দেশ্যে এই সতর্কবাণীগুলো লেখার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। কারণ পাকিস্তানে ফিরে না যাওয়ার কথা আমি কখনওই ভাবিনি। আমার মন পড়েছিল পাকিস্তানে। সেখানেই আমার ঐতিহ্য আমার সংস্কৃতি। আমার ভবিষ্যৎও ছিল পাকিস্তানেই, আমি সেখানকার কূটনীতিক হওয়ার স্বপ্ন দেখি। প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে হওয়ার সুবাদে কিছুটা কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল।

১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বাবার রাষ্ট্রীয় সফরে আমি সঙ্গী হয়েছিলাম। পাকিস্তানের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে আরোপিত অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করানোর ব্যাপারে বাবা চেষ্টা করছিলেন। হোয়াইট হাউজের এক আনুষ্ঠানিক নৈশভোজে আমি হ্যানরি কিসিঞ্জারের পাশে বসেছিলাম। স্যুপ খাওয়ার সময় আমার চিন্তায় হার্ভার্ড ল্যাম্পুন-এ প্রকাশিত কিসিঞ্জারকে নিয়ে একটি তীব্র ব্যঙ্গাত্মক কার্টুনের কথাই ঘুরপাক খাচ্ছিল– সেখানে সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পান্ডার লোমশ চামড়ায় শায়িত অবস্থায় দেখানো হয়েছিল। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওই সংখ্যাটি আমি পাকিস্তানে আমার বোন এবং সামিয়াকে পাঠিয়েছিলাম।

ফিশ কোর্সে নিজেকে বিরত রাখার জন্য আমি কিসিঞ্জারের সাথে হার্ভার্ডের অভিজাততন্ত্র এবং অন্যান্য বিতর্কবিহীন বিষয়ে আলোচনা করি। পরদিন রাতের নৈশভোজে কিসিঞ্জারের আচরণে আমি হতবিহ্বল হয়ে যাই। তিনি 'আমার বাবার কাধে হাত রেখে বলেন, 'মি. প্রাইম মিনিস্টার', আপনার মেয়ে আপনার চেয়েও ভয়ঙ্কর। আমার বাবা হাসিতে ফেটে পড়লেন, তিনি তার মন্তব্যকে প্রশংসা হিসেবে বিবেচনা করেন। এবং বলেন, 'আমি এখনও নিশ্চিত নই...'

ফ্রান্সের সাথে পাকিস্তানের পারমাণবিক সমঝোতা চলছিল। ১৯৭৪ সালে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জর্জেস পাম্পিডোর অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ায় বাবা অংশ নেন। তার আগের বছর পাম্পিডোর সঙ্গে বাবার একটি অনানুষ্ঠানিক পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তি হয়েছিল– সেই চুক্তি মোতাবেক ফ্রান্স পাকিস্তানকে রিপ্রসেসিং প্লান্ট দেয়ার কথা।

প্রেসিডেন্ট পাম্পিডো'র উত্তরসূরি ওই চুক্তি মেনে নেবেন কিনা সে বিষয়ে বাবা চিন্তিত ছিলেন। 'পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে হবেন বলে তোমার ধারণা?' মাক্সিমে বন্ধুদের সঙ্গে নৈশভোজের সময় বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করেন। 'গিসকার্ড দ্য এস্টেইং' আমি উত্তর দেই। ক্রাইস্ট চার্চে আমার টিউটর পিটার পালসারের কাছে শেখা ফ্রান্স পলিটিক্স সম্পর্কে আমার বিস্তর তথ্যের ভিত্তিতে আমি এই অনুমান করেছিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ আমার অনুমান সত্যি হয়। দ্য এস্টেইং প্রেসিডেন্ট হন এবং বাবার সঙ্গে তার পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্টের চুক্তিকে তিনি সমর্থন জানান। এমনকি হ্যানরি কিসিঞ্জার এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল চাপ সত্ত্বেও তিনি চুক্তি বাতিল করেননি।

তবে তিন বছর পূর্বে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পর্কে চীনে বেড়াবার সময় আমি যে মন্তব্য করেছিলাম– তা ঠিক ছিল না। একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আমার বাবা আমাদের চার ভাই-বোনকে চীনে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কে জয়লাভ করবেন এ সম্পর্কে আমার অনুমান জানতে চেয়েছিলেন। আমি বেশ আস্থার সঙ্গেই বলি, জর্জ ম্যাকগভার্ন। চৌ জানান যে, তার আমেরিকান সূত্র রিচার্ড নিক্সনের বিজয় সম্পর্কে তাকে নিশ্চিত তথ্য দিয়েছেন। চৌ আবারও আমার অনুমান জানতে চান। হার্ভার্ডে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী এবং উদারপন্থি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দা ম্যাকগভার্ন ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে আমার মন মানতে রাজি ছিল না। চৌ এন লাই আমাকে বলেন, 'আমেরিকায় ফিরে গিয়ে তুমি তোমার ধারণা আমাকে লিখে জানিও।' আমি তাকে লিখে জানিয়েছিলাম। একজন আন্তর্জাতিক রাজনীতির ছাত্র হিসেবে আমার নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনার ভিত্তিতে পুনরায় আমি 'ম্যাকগভার্ন'-এর নাম উল্লেখ করেছি।

১৯৭৬ সালে যখন আমি আমার এক বছরের পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোর্স করতে অক্সফোর্ড ফিরে এলাম– সে বছরটি ছিল আমার সফলতার বছর। শরতে প্রেসিডেন্টের

www.pathagar.com

পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য ব্যস্ত থাকলাম। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য। এবং জয়ী হয়েছিলাম। শিক্ষা জীবন শেষ করে ফরেন সার্ভিসে যোগ দেয়ার জন্য আমার আগ্রহ ছিল প্রচণ্ড। আমার বাবা তার সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি মনে করতেন প্রধানমন্ত্রীর সন্তান হিসেবে যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে আমাদের যোগ্যতা দ্বিগুণ হতে হবে যাতে কেউ তাকে বা আমাদের স্বজনপ্রীতির দায়ে অভিযুক্ত করতে না পারেন।

আমার ভাই মীর অক্সফোর্ডে তার শিক্ষাজীবনের বছর শুরু করলো। তাকে দেখাশোনার জন্য থেকে যাই অক্সফোর্ডে আরও একটি বছর। অতিরিক্ত এই একটি বছরে আমি অক্সফোর্ড ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পাই– এটাই ছিল আমার বাড়তি পাওনা।

কিন্তু এর আগেরবারের নির্বাচনে আমি হেরে গিয়েছিলাম। তবে পুরো বছর আমি ইউনিয়নের স্ট্যান্ডিং কমিটির কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছি। এবার আমি জয়ী হই। ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার বিজয়ে 'ওল্ড বয়েজ ক্লাব' খ্যাত ইউনিয়নের ছেলেদের আধিপত্য খর্ব হলো। আমি জয়ী হওয়ার দশ বছর পূর্বে আরেক মেয়ে এই সুযোগ পেয়েছিল। ইউনিয়নে ছেলে ও মেয়ে সদস্যের অনুপাতেও বিস্তর ব্যবধান। প্রতি সাতজন ছেলে সদস্যের বিপক্ষে মেয়ে সদস্য ছিল একজন। আমার বিজয়ে সবাই বিস্মিত হয় এমনকি আমার বাবাও।

১৯৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কয়েকদিন আগে এবং আমি যখন অক্সফোর্ড ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছি, বাবা আমাকে লিখলেন, 'নির্বাচনে একপক্ষ জিতবে অপরপক্ষ হারবে। তুমি তোমার সর্বোত্তম প্রয়াস চালিয়ে যাবে তবে নির্বাচনের ফলাফল অবশ্যই সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে হবে।' জিমি কার্টারের কাছে জেরাল্ড ফোর্ডের সম্ভাব্য পরাজয় সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে তিনি আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য লিখেছিলেন– কিন্তু একমাস পরেই আমার বাবার বার্তাটি ছিল পুরো ভিন্ন।

'অক্সফোর্ড ইউনিয়নে তুমি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। তুমি আমাদের চমৎকৃত করেছ। তোমার অসামান্য সাফল্যে আমাদের আন্তরিক উষ্ণ অভিনন্দন, বাবা।'

১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের তিনমাস আগেও সেন্ট মাইকেলের জন্মতিথীর ছুটিতে মীর এবং আমি যখন পাকিস্তানে আসি আমার জীবনাকাশে মেঘের কোনো ছিটেফোঁটাও ছিল না।

কয়েকদিন পর, আল-মুর্তাজায় বাবার জন্মদিনের পার্টিতে বাবার একজন সহকারী আমাকে বলেন, 'এসো, জিয়া-উল-হকের সঙ্গে দেখা করবে।' সেই প্রথম এবং শেষবার আমি জেনারেল জিয়াকে সামনা-সামনি দেখি– কে জানতো ওই লোকই ছয়মাস পর আমার বাবাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে।

আমার বাবার নিযুক্ত সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফকে দেখার কৌতূহল ছিল আমার মধ্যে। কারণ ওই পদের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল বাবাকে।

www.pathagar.com

সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদের জন্য উপযুক্ত ছয়জন সিনিয়র সেনা কর্মকর্তাকে ডিঙিয়ে জেনারেল জিয়াকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করা হয়। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা রিপোর্টে ওই ছয় সিনিয়র কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মদ্যপান, ব্যভিচার এবং সন্দেহমূলক আনুগত্যের মতো চারিত্রিক ত্রুটির উল্লেখ ছিল। জেনারেল জিয়াও ত্রুটিমুক্ত ছিলেন না– পিপিপি বিরোধী ইসলামী মৌলবাদী সংগঠন জামায়াত-ই-ইসলামীর সঙ্গে জিয়ার সম্পৃক্ততার গুজব ছিল। ধর্মনিরপেক্ষ নেতার পরিবর্তে ধর্মীয় নেতারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এটাই জামায়াত-ই-ইসলামের লক্ষ্য। এছাড়াও আমার বাবার একজন রাষ্ট্রদূত জেনারেল জিয়াকে ছিঁচকে চোর বলেও অভিযোগ করেন।

তবে জিয়ার কিছু ভালো দিকও ছিল। অন্যান্য অফিসারের মতো পূর্বপাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের কালিমা জিয়াকে স্পর্শ করেনি, কারণ গৃহযুদ্ধের সময় জিয়া দেশের বাইরে ছিল। সেনাবাহিনীতে শ্রদ্ধেয় কর্মকর্তা হিসেবে জিয়ার সুনাম ছিল। সেনাপ্রধান হিসেবে আর কোনো যোগ্যতা বাবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। সেনাপ্রধান নির্বাচনের দীর্ঘ প্রক্রিয়া বাবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন এজেন্সিগুলো সবাই যখন জিয়ার পক্ষে রিপোর্ট দেয় বাবা জিয়াকে সেনা প্রধান নির্বাচিত করেন। সেনা প্রধান নির্বাচন করতে পারায় বাবা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'সেনাবাহিনীর উপর একটি বেসামরিক সরকারের নিজস্ব পছন্দ চাপিয়ে দেয়া ঠিক না। জিয়া সেনাবাহিনীতে বয়োজ্যেষ্ঠ অফিসার না হলেও মনে হচ্ছে সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাকে পছন্দ করে। ওই সেদিনই ১৯৭৭ সালের ৫ জানুয়ারি আমি জিয়ার সঙ্গে সামনা-সামনি পরিচিতি হই– পরবর্তীতে সেই লোকটিই আমাদের সবার জীবন আকস্মিকভাবে বদলে দেয়।

আমার মনে পড়ে, জিয়াকে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। আমি মনে মনে সেনাপ্রধান হিসেবে জেমস বন্ডের মতো একজন দীর্ঘ, উগ্র এবং ইস্পাতদৃঢ় সৈন্যকে কল্পনা করেছিলাম– কিন্তু আমার সামনে যে জেনারেল দাঁড়ানো ছিল, তিনি ছিলেন খাটো, নার্ভাস এবং আত্মবিশ্বাসহীন একজন লোক। তার মাথার চুলগুলো সুগন্ধি জেল দিয়ে মসৃণ করে মাঝখানে দু'ভাগ করে সিঁথি করা। একজন সাহসী সেনাপতির বদলে তাকে ইংলিশ কার্টুনের ভিলেনের মতো দেখাচ্ছিল। সে আমাকে খুশি করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। বার বার একই কথা বলছিল যে, জুলফিকার আলি ভুট্টোর মতো মহান ব্যক্তির মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে সম্মনিত বোধ করছে। আমি ভাবলাম, বাবা ইচ্ছে করলে তার চেয়ে যোগ্য একজনকে সেনাপ্রধান করতে পারতেন। কিন্তু আমি এ বিষয়ে বাবাকে কিছুই বলিনি।

বাবার জন্মদিনের বিকেলে আল-মুর্তাজার বাগানে হাঁটার সময় বাবা আমাকে তার গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা বলেন, 'আমি নতুন ভূমি সংস্কার করতে যাচ্ছি এবং মার্চে নির্বাচন করার ঘোষণাও দেব। সংবিধান অনুযায়ী আগস্ট পর্যন্ত মেয়াদ রয়েছে কিন্তু ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন দেখি না। সাংবিধানিক আওতায় আমরা যে সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ করেছি সেগুলো এখন প্রতিষ্ঠিত এবং পার্লামেন্ট ও প্রাদেশিক সরকারগুলো কাজ করছে। এখন গণমতের ভিত্তিতে আমরা আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরো সহজভাবে এগিয়ে যেতে পারব। বাস্তবায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা শিল্পায়ন বিস্তার, নলকূপ স্থাপন, বীজ, সার বন্টন এবং উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন করব... বাগানে বেড়ানোর সময় বাবা তার বহুমুখী পরিকল্পনা ও স্বপ্নের কথা বলে যাচ্ছিলেন– তার আধুনিক এবং প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের স্বপ্ন ক্রমেই যেন তার দৃষ্টিতে

www.pathagar.com

স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ইতোমধ্যে বাবার অনেক সংস্কার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পিপিপি সংস্কার কার্যক্রমের প্রচারণায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের কাছে নিজেদের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে, স্বল্প সংখ্যক সামন্ত প্রভুদের অধীনে থাকা জমির পুনর্বন্টন শুরু হচ্ছিল। পাকিস্তানের অনেক শিল্প– যেগুলো 'বাইশ পরিবার' একচ্ছত্রভাবে ভোগ করে আসছিল– সেগুলো জাতীয়করণের মাধ্যমে আমার বাবা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিও চালু করেন। এর ফলে শিল্পখাত থেকে অর্জিত মুনাফা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে আসার পথ খুলে যায়। সরকার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে দেয়– যে শ্রমিকরা এতদিন শিল্প মালিক এবং সামন্ত প্রভুদের কাছে বিনা মজুরিতে কিংবা নামমাত্র মজুরিতে শ্রম দিত এবং সেই সঙ্গে শ্রমিক সংগঠন গড়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়, ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব এবং ভবিষ্যতের জন্য শ্রমিকদের এককালীন থোক বরাদ্দের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়– পাকিস্তানের ইতিহাসে শ্রমিকদের জন্য প্রথম এই উদ্যোগগুলো নিয়েছিলেন আমার বাবা।

গ্রামাঞ্চলের অনেক গ্রামে বিদ্যুতায়ন করা হয়। নিরক্ষর মহিলা এবং পুরুষদের জন্য সাক্ষরতা কর্মসূচি চালু হয় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নতুন স্কুল নির্মিত হয়। নগরের পরিত্যক্ত জায়গায় বাগান এবং পার্ক করা হয়। প্রদেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগের জন্য পূর্বে যেখানে সঙ্কীর্ণ কাঁচা রাস্তা ছিল সেখানে নতুন পাকা রাস্তা নির্মিত হচ্ছিল। চীনের সঙ্গে একটি চুক্তির মাধ্যমে হিন্দুকোশ পর্বতমালার ভেতর দিয়ে একটি নতুন হাইওয়ে নির্মিত হচ্ছিল– ওই হাইওয়ে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাকিস্তানের জনগণের জন্য আধুনিক সমৃদ্ধি আনার ব্যাপারে আমার বাবা ছিলেন দৃঢ়সঙ্কল্প।

বেলুচিস্তানের এক কৃষক আমার বাবার কাছে অভিযোগ করেন, 'নতুন রাস্তায় আমার গাধাগুলো শুধু ঘুমায়।' আমার বাবা ওই কৃষককে আশ্বস্ত করে বলেন, 'আমি আপনাকে নতুন প্রজাতির গাধা দেব যা আপনার শাক-সবজিগুলো তিনগুণ দ্রুততায় বাজারে পৌঁছে দেবে।' পরের সপ্তাহে বাবা ওই কৃষককে একটি জিপ পাঠিয়ে দেন।

অবশ্য বাবার কার্যক্রমের বিরোধীতাও হচ্ছিল। যে সকল শিল্পপতিদের ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান বাবা জাতীয়করণ করেন– নিশ্চিতভাবেই তারা বাবাকে পছন্দ করতেন না। ভূস্বামীরাও বাবাকে পছন্দ করতেন না, কারণ বাবা তাদের জমিগুলো ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করেন। এই কৃষকরা এগারো পুরুষেরও বেশি সময় ধরে ভূস্বামীদের জমি আবাদ করেছে এবং তাদের উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক জমির মালিককে দিতে হয়েছে। জামাত-ই-ইসলামির সদস্যরা– যাদের অনেকেই ছিল ক্ষুদ্র দোকানদার– বাবার সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে বিশেষ করে বাড়ির বাইরে কর্মরত মহিলাদের প্রতি সরকারের আন্তরিক সমর্থন এবং লিঙ্গবৈষম্যবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে তারা ক্ষুব্ধ হয়। বেলুচিস্তানের সাম্প্রদায়িক আন্দোলন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে স্বাধীনতার দাবি এবং ট্রাইবাল অঞ্চলের নেতারা তাদের জনগোষ্ঠীর উপর নিজস্ব আইন চালু রাখার জন্য চাপ দিতে থাকে এই সকল কায়েমি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে আমার বাবা সংহতি নীতি গ্রহণ করেন।

বস্তুত: ১৯৪৭ সালে জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রেণী-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল– কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারের, পুঁজিবাদিদের সঙ্গে সমাজবাদীদের, সামন্ত এবং সর্দারদের সঙ্গে শিক্ষিত-বিকশিত শ্রেণীর, দরিদ্রতম প্রদেশের জনগণের সঙ্গে পাঞ্জাবের ধনী অভিজাত আদিবাসীদের, সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের সঙ্গে

www.pathagar.com

আধুনিক গণতন্ত্রমনা প্রগতিশীল শ্রেণীর বিরোধ ১৯৭৭ সালেও বিদ্যমান ছিল এবং এ সবকিছুই শক্তিশালী সেনাবাহিনীর প্রশ্রয়েই চলছিল। দ্বিধা-বিভক্ত পাকিস্তান দেশটির একমাত্র সুশৃঙ্খল-সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান সুচারুরূপে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল।

পাকিস্তানের এ ধরনের বিপথগামী এবং বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী যাদের সাক্ষরতার হার এবং বার্ষিক মাথাপিছু আয় খুবই কম– সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব বলে মন্তব্য করেছিল কিছু পশ্চিমা রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং পাকিস্তানের সেনা কর্তৃপক্ষ। পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা এবং সংস্কৃতি ভিন্ন হওয়ায় এক অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের মানুষ কথাও বলতে পারত না। এ ধরনের জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় সামরিক শাসন– এটাই ছিল তাদের ধারণা। কিন্তু আমার বাবা দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের ধারণা ভুল প্রমাণ করেন। বাবা প্রমাণ করেছিলেন– সামরিক ক্ষমতা নয়– নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ রাষ্ট্রের নেতৃত্ব নির্বাচিত করতে সক্ষম। ১৯৭৭ সালের শুরুতে, কারো মনে এমন ভাবনাও উদয় হয়নি যে, মার্চের নির্বাচনে আমার বাবার সরকার পুনঃনির্বাচিত হতে পারবে না।

আমার বাবা যখন পাকিস্তানে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন– আমি অক্সফোর্ডে ফিরে আসি– ইউনিয়নে বিতর্কের আয়োজন করতে। আমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম বিতর্কের বিষয় ছিল 'পুঁজিবাদ সফল হবে' এই প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে বক্তব্য তুলে ধরার জন্য আমি তারিক আলিকে আমন্ত্রণ জানাই। তিনি অক্সফোর্ড ইউনিয়নের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং পাকিস্তানের বামপন্থিদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন মুখপাত্র। উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বিভেদের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধের লক্ষ্যে আমি আরো একটি বিতর্কের অবতারণা করি– এর শিরোনাম– 'তৃতীয় বিশ্বের ভারে পশ্চিমারা আর বেশিদিন টিকবে না।'

পাকিস্তানের আঞ্চলিকবাদী, মৌলবাদী এবং শিল্পপতিরা যখন পিপিপির বিরুদ্ধে পাকিস্তান ন্যাশনাল এলায়েন্স নামে নয় দলীয় জোট করে তখন অক্সফোর্ড ইউনিয়নে আমি পঞ্চম বিতর্কের আয়োজন করছি। ইউনিয়নের ঐতিহ্যগত আবহে এই বিতর্ক ছিল একটি মজার বিষয়। "That this house would rather Rock than Roll" ম্যাগডালেন কলেজের দুই বন্ধু যখন 'জেসাস খ্রিস্ট সুপারস্টার'-এর সুরে ইউনিয়নকে নিয়ে উচ্চস্বরে ডুয়েট গাচ্ছিল তখন ইউনিয়নের গুরুগম্ভীর পবিত্র বিতর্ক হলের চারপাশে রক মিউজিক প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। ইউনিয়নের ইতিহাসে সঙ্গীতের এটাই প্রথম ঘটনা। গান শেষে সবাই আমাকে তাদের ঘাড়ে তুলে নিয়ে হল থেকে হৈ হৈ করে বের হয় এবং আনন্দ করে।

আমি অক্সফোর্ডের প্রেসিডেন্ট কার্যালয় পাউডার ব্লু রঙের পেইন্ট করছিলাম এবং সবুজ এবং সাদা রঙে (পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার রঙ) বিতর্ক কর্মসূচি ছাপানোর কাজে যখন ব্যস্ত তখন পাকিস্তানে পিএনএ (পাকিস্তান ন্যাশনাল এলায়েন্স) নেতা এবং সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান আসগর খান ঘোষণা করেন যে, বিরোধী জোট মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেব না– কারণ নির্বাচনে বিরোধী জোট প্রতারিত হবে।

বিরোধী জোটের এই অভিযোগে আমি অবাক হই। কারণ আমি জানতাম– অন্যান্য সব গণতান্ত্রিক দেশের অনুসারেই আমার বাবাও নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়েছেন। তিনি অবাধ-নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতে স্বাধীন নির্বাচন

www.pathagar.com

কমিশন, নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল এবং নির্বাচনী আইন প্রণয়ন করেছেন। তা সত্ত্বেও নির্বাচনে পিপিপির অনিবার্য বিজয় মেনে না নেয়ার জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত করার অদ্ভুত প্রচারণা কৌশল নিয়েছিল আসগর খান।

১৮ জানুয়ারি, মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিনে আমার বাবা এবং তার অন্যান্য প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীদের আসনে পিএনএ-এর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বি মনোনয়নপত্র জমা না দেয়ায় নির্বাচনী প্রচারণা বাধার সৃষ্টি হয়। আমি ইংল্যান্ডে যখন এই খবর পড়ি তখন আমার কাছে খুবই অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। বিরোধী জোট প্রধানমন্ত্রী এবং চার প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কেন প্রতিদ্বন্দ্বি দেয়নি? পিএনএ প্রার্থীরা সম্ভবত জানতো তারা আমার বাবাকে পরাজিত করতে পারবে না তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত থেকে নিজেদের মুখ রক্ষা করেছে। আমার এই ধারণা হয়তো খুবই যৌক্তিক কিন্তু বিরোধী জোটের ব্যাখ্যা ছিল হাস্যকর তা সত্ত্বেও তাদের ওই ব্যাখ্যা সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়। 'আমাদের অপহরণ করা হয় এবং মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা দেয়া হয়।' এই বলে বিরোধীরা চিৎকার করতে থাকে। তারা আরো অভিযোগ করে যে, প্রার্থীর প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারীকেও পুলিশ আটক করে রাখে– মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময় পর্যন্ত। তাদের এই সমস্ত অভিযোগ ইংল্যান্ডে আমার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছিল।

আমার একবারের জন্যও বিশ্বাস হয়নি যে, পিএনএ নেতাদের অপহরণ করা হয়েছিল। প্রধান নির্বাচন কমিশনারও এই অভিযোগ বিশ্বাস করেননি। বিরোধীরা তাদের অভিযোগের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার অভিযোগ খারিজ করে দেন। তারা যদি অপহৃত হয়েও থাকেন– তাহলে সেটা তারাই করেছিল। তবে এটি ছিল একটি চতুর কৌশল। বিভিন্ন কারণে অপহরণের ঘটনা পাকিস্তানে সাধারণ একটি বিষয় এবং পিএনএ'র এই নোংরা ষড়যন্ত্রমূলক অভিযোগ সম্ভবত অনেকেই বিশ্বাসও করে।

ইংরেজি পত্রিকা, পাকিস্তানি সংবাদপত্র– যেগুলো প্রতি সপ্তাহে আমার বাবা-মা আমার কাছে পাঠাতেন এবং অন্যান্য এশিয়ান পত্রিকায় পাকিস্তানের নির্বাচনী প্রচারণার খবর আরো বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়তে থাকি। পিএনএ প্রতি মুহূর্তে ক্রমেই দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং বেপরোয়া হয়ে উঠছিল। ভুট্টোকে বিশ্বাস করা যায় না, তিনি প্রত্যেকের বাড়িঘর জাতীয়করণ এবং মহিলাদের অলঙ্কার বাজেয়াপ্ত করার পরিকল্পনা করেছেন, ভুট্টো ধনী এবং অভিজাত, তিনি সাধারণ মানুষকে তাচ্ছিল্য করেন, তিনি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি নন। তিনি দামি স্যাভিয়াল রো স্যুট, ইতালির জুতো পড়েন এবং স্কচ হুইস্কি পান করেন– এসব বলে বিরোধীরা তাদের চোঙা ফুকাচ্ছিল।

আইয়ুব খানের মন্ত্রীরাও একই অভিযোগ তোলেন। তাদের অভিযোগের বিরুদ্ধে আমার বাবার জবাবে আমি আনন্দিত হই। আমার বাবা একজন উন্মুক্ত মনের মানুষ এবং তিনি তার ব্যক্তিগত অবসরে কি করতেন তাও তিনি কখনও জনগণের কাছে গোপন করতেন না। লাহোরের এক জনসভায় বাবা বিরোধীদের অভিযোগ তাদের দিকেই ফিরিয়ে দেন। বাবা বলেন, 'আমি অস্বীকার করব না যে, দিনে আঠারো ঘণ্টা কাজের শেষে আমি কখনও কখনও মদ্যপান করি– কিন্তু অন্যান্য রাজনীতিকদের মতো আমি মানুষের রক্ত পান করি না।'

নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আমি কখনওই সন্দিহান ছিলাম না। পিএনএ'র নেতারা

www.pathagar.com

কেউ মহান ব্যক্তি ছিলেন না এমনকি ভালো মানুষও না। তাদের বেশিরভাগ নেতা বাবার চেয়ে বয়সে অনেক বড় এবং তাদের জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন। আমার বাবার সমতুল্য শিক্ষাগত যোগ্যতাও তাদের ছিল না। সরকার পরিচালনা এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতি সম্পর্কে বাবার মতো বাস্তব অভিজ্ঞতাও তাদের ছিল না। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানে আমার বাবা ছিলেন অদ্বিতীয়।

জেনারেলদের শাসনে শাসনে পাকিস্তানে রাজনীতিকরা কখনওই পরিপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করতে পারেননি– সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত ছিল সিভিল সার্ভিস, সেনাবাহিনী কিংবা শিল্পপতিদের হাতে। যারা আমার বাবার বিরোধীতা করেছে তারা সংখ্যায় নগণ্য, প্রাদেশিক ওইসব মানুষের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির দরুণ অতীতে পাকিস্তান ব্যর্থ হয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও পাকিস্তানকে ব্যর্থ করতে তারা উঠে পড়ে লাগে।

বিরোধী জোটের অযৌক্তিক মিথ্যা প্রচারণা বেড়েই যাচ্ছিল। আসগর খান দাবি করেন যে, ভুট্টো এমনই খারাপ একজন মুসলমান যিনি নামাজও পড়তে জানেন না। এখন তিনি নামাজ পড়া শিখছেন। ফেব্রুয়ারির ফার ইস্টার্ন ইকোনোমিক রিভিউতে খবরটি দেখে আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি। বাড়িতে আমি প্রায়ই বাবা-মা'র সঙ্গে নামাজ পড়ি। এই অভিযোগেরও চমৎকার উত্তর দিয়েছিলেন বাবা। একজন সাংবাদিক বাবাকে প্রশ্ন করেছিলেন– ফিলিস্তিনের পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত আপনার কাছে আসেন– বাবা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমাকে নামাজ পড়া শেখাতে।'

নির্বাচনী প্রচারণায় 'নিজাম-ই-মুস্তাফা' দলের স্লোগান ছিল 'মহানবীর রাজত্ব কায়েম করা'। জোটের অপর নেতারা নির্লজ্জভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে ব্যবহার করছিল। গ্রামাঞ্চলের একটি নির্বাচনী সমাবেশে জামাত-ই-ইসলামি দলের প্রধান বলেন, 'তাদের বিরুদ্ধে ভোট দেয়া আল্লাহর বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার শামিল। এবং পিএনএকে একটি ভোট দেয়া এক লাখ বছরের ইবাদতের সমান।'

যাই হোক সুস্থ মস্তিষ্কের বিরোধী নেতারা বুঝতে পারেন যে, ধর্মীয় ইস্যু ভয়ঙ্কর পরিণাম ডেকে আনতে পারে তাই তারা ধর্মীয় বিষয়ে প্রচারণা কমিয়ে দেন। পিপিপি'র বিরুদ্ধে তাদের নোংরা বিষোদগার সত্ত্বেও বিরোধীরা ভালোভাবেই জানতো, ইসলামের প্রতি পিপিপি'র শ্রদ্ধা ভক্তি প্রশ্নাতীত। আমার বাবাই প্রথম ব্যক্তি যিনি ১৯৭৩ সালে দেশে ইসলামিক সংবিধান প্রবর্তন করেন এবং তিনিই প্রথম পাকিস্তানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় চালু করেন। তার শাসনামলেই পাকিস্তানে প্রথম নির্ভুলভাবে পবিত্র কোরান শরিফ ছাপা হয়। আমার বাবার শাসনামলেই মক্কায় হজ গমনেচ্ছুদের ক্ষেত্রে আরোপিত পূর্ববর্তী সরকারের কোটা ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। সেই সঙ্গে পাকিস্তানের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে ধর্মীয় শিক্ষা হিসেবে 'ইসলামিয়াত' অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাকিস্তানিদের পবিত্র কোরান শরিফের আরবি ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্য টেলিভিশনে আরবি ভাষা শিক্ষা অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন এবং রমযান মাসে রোজা শুরু এবং শেষ হওয়া বিষয়ে সন্দেহ ও বিতর্ক দূর করার উদ্দেশে 'রুয়েত-ই-হিলালি' বা চাঁদ দেখা কমিটি গঠন করেন। পাকিস্তানের ইসলামিক ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খ্রিষ্টান ভাবধারার রেডক্রস-এর নাম ও প্রতীক বদলে রেডক্রিসেন্ট করা হয়েছিল আমার বাবা এবং তার সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায়।

সে কারণেই বিরোধীদের নির্বাচনী প্রচারণায় বাবার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন অভিযোগের খবর পড়েও আমি খুব একটা বিরক্ত বোধ করতাম না। আমি জানতাম–

www.pathagar.com

পাকিস্তানের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ভালো করে বোঝেন যে, মৌলবাদীদের শরিয়া আইনের প্রচলন পাকিস্তানের অর্জিত মানবাধিকার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এক হাজার বছর পিছনে নিয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইসলামিক আইন অনুযায়ী অর্থনৈতিক লেনদেন যদি সুদ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থাই ভেঙে পড়বে। এবং নারী উন্নয়নে আমার বাবা মহিলাদের যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন– মহিলারা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

ফরেন সার্ভিস, সিভিল সার্ভিস এবং পুলিশ বাহিনীতে মহিলাদের কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন বাবা। নারী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে একজন মহিলাকে নিয়োগ দেন। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে- সিন্ধু প্রদেশের গভর্নর করেন একজন মহিলাকে এবং ন্যাশনাল এসেম্বলিতে একজন মহিলা ডেপুটি স্পিকার করেন। যোগাযোগের ক্ষেত্রেও মহিলাদের কাজের সুযোগ করে দেন তিনি। তার আমলেই প্রথম টেলিভিশনের পর্দায় মহিলা সংবাদ পাঠিকাকে খবর পড়তে দেখা যায়।

রাষ্ট্রীয় কাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য আমার মা'কেও উৎসাহিত করেন বাবা। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকো সিটিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়ে আমার মা যুক্তরাষ্ট্র যান। আমার মা যখন ওই সম্মেলনের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন আমি গর্ববোধ করেছিলাম। আর এখন আমার মা ন্যাশনাল এসেম্বিলি নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন এটা রাজনীতিতে মহিলাদের প্রতি আমার বাবার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক স্বরূপ।

কিন্তু নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে– পিপিপির বিরুদ্ধে পিএনএ'র আক্রমণ ততই হিংস্র হয়ে ওঠে। আসগর খান ঘোষণা করেন, ৮ মার্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি তার অপ্রিয় পিপিপি নেতাদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠাবেন এবং তিনি আমার বাবাকে হত্যা করারও দম্ভোক্তি করেন।

বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, 'আমি কি ভুট্টোকে আটোক ব্রিজে ফাঁসি দেব না কি লাহোরের কোনো ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসি দেব?' তার এই কথায় আমি সত্যি সত্যিই কেঁপে উঠি। শোনা যায় সেনাবাহিনীর জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে আসগর খানের আত্মীয়-স্বজন আছে, যারা ১৯৭৪ সালে একটি ক্যু-এর ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। তিনি কি আবারও সেনাবাহিনীর ওই অংশকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছেন?

অক্সফোর্ডে আমি খুবই অসহায় বোধ করছিলাম। পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাবা কাজ করেছেন। এটা প্রমানিত যে গণতন্ত্রের জন্য আত্ম-শৃঙ্খলাবোধ আবশ্যক, কিন্তু সবার মধ্যে এই শিক্ষা ছিল না। করাচির পার্শ্ববর্তী এলাকায় পিএনএ'র এক প্রার্থী একটি পোস্টার ছড়িয়েছিল– যেখানে দেখানো হয় মেশিনগান হাতে আমার বাবা একটি দাঁড়ানো শিশুকে গুলি করে হত্যা করছেন।

ফেব্রুয়ারি মাসে আমার এক স্কুল জীবনের বন্ধু করাচি থেকে চিঠি লিখে আমাকে জানায়, 'বিরোধীরা এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করছে যে, আমার মতো রাজনীতি বিমুখ একজন সাধারণ মানুষও তাদের হুমকিতে চমকে উঠেছি। এখন– পাকিস্তানের সবাই পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি অনুধাবন করছে যে, তোমার বাবার প্রধানমন্ত্রী হওয়া কতটা জরুরি। আল্লাহ না করুন, যদি অন্য কেউ ক্ষমতা গ্রহণের কাছাকাছিও পৌঁছায় তাহলে আমার ধারণা সেটা আমাদের জাতিকে ধ্বংস করে দেবে।

www.pathagar.com

নির্বাচনের রাতে ক্রিশ্চিয়ান কলেজের বিপরীতে মীরের রুমে যাই এবং ফোনের অপেক্ষা করি। লন্ডনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত এবং আমার বাবার একজন মন্ত্রী দুজনই আমাদের কথা দিয়েছেন– নির্বাচনের ফলাফলের যে কোনো খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফোন করে আমাদের জানাবেন। মীর অনুমান করে– ন্যাশনাল এসেম্বিলিতে পিপিপি ১৫০ থেকে ১৫৬ আসনে জিতবে। ফোন বেজে উঠল, বাবা ফোন করেছেন– নির্বাচনের প্রচারণায় তার কণ্ঠস্বর ভেঙে গিয়ে ফ্যাঁস ফ্যাঁসে হয়েছিল– তিনি জানান– পিপিপি ২০০ আসনের মধ্যে ১৫৪টি আসনে জয়লাভ করেছে। আমি ফোনে চিৎকার করে বললাম, 'কনগ্রাচুলেশন, পাপা, তোমার বিজয়ে আমি খুবই আনন্দিত, পিপিপির বিজয়ে আমি যেমন উল্লাসিত হয়েছি অন্যদিকে নির্বাচনী টেনশন শেষ হয়ে যাওয়ায় স্বস্তি পেয়েছি। কিন্তু পরিস্থিতি তা ছিল না।

বিরোধী জোটের হুমকি সত্য হলো। পিএনএ জাতীয় নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ আনল এবং তিনদিন পর যে প্রাদেশিক এসেম্বলি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা– তা বর্জন করার ঘোষণা দিল। ফলে উত্তেজনা এবং অস্থিরতা আরো বাড়ল।

হঠাৎ করে খবর পাওয়া গেল একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবক মোটরসাইকেলে করে করাচি শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর শহরের ব্যাংক, সিনেমা হল, মদের দোকান এবং পিপিপির পতাকা উড়ছে এমন বাড়িগুলোতে অগ্নিসংযোগ করছে। একটি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে একই পরিবারের ১৩ জন সদস্যকে পুড়িয়ে হত্যা করে তারা। অগ্নিদগ্ধ মুমূর্ষু এক সদস্য যখন পানির জন্য কাতরাচ্ছিল তখন দুষ্কৃতিকারীরা তার মুখে প্রস্রাব করে তার উত্তর দিয়েছিল। একজন পিপিপি সদস্যকে পাবলিক ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হলো। পুলিশ রশি কেটে না নামানো পর্যন্ত তার মৃতদেহ ল্যাম্পপোস্টে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। পিপিপির মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যদের হত্যার হুমকি দেয়া হলো– শুধু তাই নয়, তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে অপহরণ করারও হুমকি দেয় সন্ত্রাসীরা।

করাচিতে দুঃস্বপ্নের মতো ভয়াবহ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রতিদিন সকালে আমার মেইলবক্স থেকে পাকিস্তানি পত্রিকা সংগ্রহের পূর্বেই আমি সেন্ট ক্যাথরিন কলেজের কমনরুমে ছুটে যেতাম ইংরেজি পত্রিকাগুলো দখল করার জন্য। আমি এবং মীর গভীর মনোযোগ সহকারে খবরগুলো পড়তাম– কিন্তু সেগুলো আমাদের কাছে মনে হতো অবিশ্বাস্য ঘটনা। আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের গণতন্ত্র আমরা দেখেছি– সেখানকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা তো এ ধরনের সন্ত্রাসী হামলা এবং গুণ্ডামীর আশ্রয় নেয় না। আমরা দু'জনই পিএনএ'র কৌশল বুঝতে পারলাম। তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের সংশয় ক্রমেই দানা বাঁধতে থাকল। একটা বিষয় নিশ্চিত ছিল যে, নির্বাচনে পিএনএ'র কোনো আগ্রহ নেই। তারা সম্ভবত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অন্য কারো হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য তাদের নৈরাজ্যকর কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছিল– সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করুক– হয়তো এটাই তারা চচ্ছিল।

সেনাবাহিনীই ছিল একমাত্র হুমকি। কিন্তু সশস্ত্র বাহিনীর বিশ্বস্ততায় সন্দেহ করার কোনো কারণ ছিল না। সোবাহিনীতে বাবা ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। তাছাড়া ছয়জন সিনিয়র সেনাকর্মকর্তাকে ডিঙিয়ে জিয়াকে আর্মি চিফ অব স্টাফ নির্বাচন করায় বাবার প্রতি তার সমর্থনও একরকম নিশ্চিত ছিল। আমাদের সংস্কৃতিতে কেউ উপকারীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। সেনাবাহিনীকে নিজের পক্ষে টানার জন্য আসরগর খান তখনও

www.pathagar.com

চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেনাবাহিনীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের ইঙ্গিত দিয়ে তিনি সশস্ত্র বাহিনীতে একটি চিঠি প্রচার করেন। কিন্তু তার এই আহ্বানে কেউ সাড়া দেয়নি বরং নৌ, বিমান এবং সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফরা একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশের মাধ্যমে বাবার নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি সমর্থন জানান। পিএনএ তাদের অবস্থানে অনড় থাকল।

করাচি এবং হায়দারাবাদে প্রায় তিন সপ্তাহ বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের পর পিএনএ লাহোরে দাঙ্গা এবং লুট করার চেষ্টা করল। আবারও বিশ-ত্রিশ জনের দুষ্কৃতিকারী যুবকের দল মোটরসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এবার তাদের দ্বারা আক্রান্ত হলো বাজারগুলো। তারা পাথর ছুঁড়ে দোকানদারদের আক্রমণ করল। ভয় দেখিয়ে বলপূর্বক ব্যবসায়ীদের দোকান বন্ধ করতে বাধ্য করল। ব্যাংক এবং বাসে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল।

অক্সফোর্ডে থেকে পত্রিকায় পিএনএ'র ক্রমবর্ধমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির খবর পড়ে মীর এবং আমার বিরক্তি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। নির্বাচনে জনগণের রায়ে নিজেদের পরাজয় মেনে নেয়ার পরিবর্তে পুরনো ধ্যান-ধারণার রাজনীতিকরা সন্ত্রাস এবং গুজব ছড়াচ্ছিল। 'বেগম ভুট্টো তল্পিতল্পা নিয়ে পালিয়ে গেছেন, ভুট্টোও শিগগিরই পালাবেন'– পিএনএ'র অনেক গুজবের মধ্যে এটি ছিল একটি।

পাকিস্তানে পিপিপির শক্তি সম্পর্কে আমার বাবা নিশ্চিত ছিলেন তাই তিনি প্রাদেশিক নির্বাচন করার প্রস্তাব দিলেন এবং ওই নির্বাচনে পিএনএ যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে তাহলে পুনরায় জাতীয় নির্বাচন করা হবে। কিন্তু পিএনএ নেতারা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এমনকি তারা আলোচনায় বসতেও রাজি হলেন না। বাবার পদত্যাগ ব্যতীত কোনো কিছুতেই তারা তুষ্ট হবে না। একটি অবাধ গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিশাল বিজয়ের মধ্য দিয়ে আমার বাবা পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন– স্বাভাবিকভাবেই তিনি বিরোধীদের দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন।

অক্সফোর্ডে আমার উপরেও সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করেছিল পিএনএ। মার্চের শেষের দিকে এক বিকেলে আমি যখন বডলিয়েন লাইব্রেরি থেকে ফিরে দেখলাম, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের একজন সদস্য আমার জন্য অপেক্ষা করছেন– আমি বিস্মিত হলাম। ব্রিটিশ ওই অফিসার আমাকে বললেন, 'আপনাকে আতঙ্কিত করতে চাইনি মিস ভুট্টো, কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে যে, আপনার বিপদ হতে পারে।'

আমার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছাড়াই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড খামোখা কষ্ট করে একজন লোককে অক্সফোর্ডে পাঠিয়েছিল– আমার তা মনে হয় না। তাই সেদিন থেকে শুরু করে জুনে অক্সফোর্ড ছাড়ার দিন পর্যন্ত আমি সেই কর্মকর্তার নির্দেশনা সতর্কতার সাথে অনুসরণ করতাম। আমার গাড়ির দরজা খোলার আগে– গাড়ির নিচে কোনো বিস্ফোরক আছে কি-না তা পরীক্ষা করতাম। গাড়ির তালা পরীক্ষা করে দেখতাম– অগোচরে কেউ তাতে কোনো কারিগরি ফলিয়েছে কি-না। আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের নির্দেশ মতো আমার সময়সূচি পরিবর্তন করতাম এবং নির্দিষ্ট কোনো রুটিন অনুসরণ করতাম না। দেখা গেল আমার একটি ক্লাস দশটায় শেষ হবে– আমি সাড়ে ন'টায় কিংবা খুব দেরি করলে ৯:৫৫ তে ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসতাম। আজও আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের শেখানো নিরাপত্তা বিষয়ক কিছু কিছু সতর্কতা মেনে চলি।

পাকিস্তানে, এপ্রিলের প্রথমদিকেই পিএনএ-এর হট্টগোল স্তিমিত হয়ে আসছিল। সঙ্কট

www.pathagar.com

কেটে যাবে এমন সম্ভাবনার সংবাদ যখন আসলো– তখন ঘটনা একটি নতুন এবং অশুভ মোড় নিয়েছিল।

তখন মানুষের হাতে হঠাৎ করেই মুঠো মুঠো আমেরিকান ডলার আসা শুরু হয়েছিল– তারা কাজকর্ম বন্ধ করে দিচ্ছিল। আমার বন্ধু সামিয়া আমাকে চিঠিতে এ খবর জানিয়েছিল। আমার কাজিনের চাকরানি এবং তাদের অন্যান্য সহকর্মী বন্ধুরা জানিয়েছে পিএনএ-এর মিছিলে গেলে তারা চাকরির চেয়ে বেশি টাকা পাচ্ছে। সে লিখেছিল, মার্চ মাস থেকে মার্কিন মুদ্রায় বাজার সয়লাব হয়ে গেছে। কালোবাজারে ডলারের মূল্য ৩০ শতাংশে নেমে গিয়েছিল। অর্থনৈতিক ক্ষতির কথা না ভেবেই করাচির ব্যক্তিমালিকানাধীন ট্রাক এবং বাস চালকরা ধর্মঘট করল। এর ফলে একটি ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেল কারণ পরিবহনের ব্যবস্থা না থাকায় কর্মচারীরা কাজে আসতে পারছিল না। অথচ ওই ট্রাক এবং বাসগুলো পিএনএ'র বিক্ষোভকারীদের বহন করছিল।

এশিয়ানরা সবসময়ই কোনো কিছুর পেছনে ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু এক্ষেত্রে, আমার বাবা এবং পিপিপি'র অন্য সদস্যরা বুঝতে পেরেছিল যে, আমেরিকার সম্পৃক্ততার কারণেই ওই অস্থিরতার উৎপত্তি। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর সাহায্যপুষ্ট চিলির সেনাবাহিনী যখন নির্বাচিত গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট আলেন্দেকে উৎখাত করেছিল তখন সেখানেও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির জন্য পরিবহন ধর্মঘট করা হয়েছিল- পাকিস্তানের ট্রাক ড্রাইভাররা যখন ধর্মঘট করল তখন আমার কাছে তা চিলির ঘটনার অনুরূপ প্যাটার্ন মনে হয়েছিল। মার্কিন কূটনীতিকদের সাথে পিএনএ সদস্যদের ঘনঘন বৈঠকের বিষয়টি আমাদের গোয়েন্দারাও লক্ষ্য করেছিল।

পিএনএ-সমর্থিত ধর্মঘটের কার্যকারিতা নিয়ে যথেষ্ট সংশয়ও ছিল। আমার বাবা যখন ক্ষমতায় আসেন তখন তিনি জেনেছিলেন যে, ১৯৫৮ সালে মার্কিনিরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে একটি 'টপ সিক্রেট' ট্রেনিং করেছিল– ধর্মঘটের মাধ্যমে সরকারকে কীভাবে নিশ্চল করে দেয়া যায় তারই কৌশল শেখানো হয়েছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে। এই গোপন কৌশলকে বলা হতো, 'চাক্কা বন্ধ কর্মসূচি'। এখন পিএনএ দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিচ্ছে। এর নাম কি 'চাক্কা বন্ধ কর্মসূচি'? পাকিস্তানের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে অস্থিতিশীল করছে– আমি এটা মানতে চাইতাম না। কিন্তু হ্যানরি কিসিঞ্জারের একটি কথা আমার মনে পড়ে– ১৯৭৬ সালে পাকিস্তান সফরের সময় কিসিঞ্জার বাবাকে কথাটি বলেছিলেন। সে সময় পারমাণবিক পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য ফ্রান্সের সঙ্গে একটি সমঝোতার চুক্তি করার ব্যাপারে আমার বাবা দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন। ওই প্ল্যান্ট পাকিস্তানের জ্বালানি এবং শক্তি নিশ্চিত করত– জ্বালানি তেলের ঊর্ধ্বগতিতে সমৃদ্ধশালী পশ্চিমা দেশগুলোর অর্থনীতিতে যখন প্রত্যক্ষ নেতিবাচক প্রভাব পড়ছিল ঠিক সেই সময় আমার বাবা পারমাণবিক প্ল্যান্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ফ্রান্সের সাথে পারমাণবিক চুক্তি বাতিল করানোর জন্য আমার বাবাকে বাধ্য করতে ড. কিসিঞ্জার সমান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ওই প্ল্যান্টে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সম্ভাবনার দিকটাই দেখেছিল মার্কিন সরকার এবং তারা আশঙ্কা করে ওই প্ল্যান্টে পাকিস্তান 'ইসলামিক বোমা' তৈরি করবে– যা মুক্ত বিশ্বের স্বার্থে নিশ্চিত হুমকি।

কিসিঞ্জারের সঙ্গে বাবার আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। বাবা যখন বাড়ি ফিরলেন তখন ক্রোধে তার চেহরা লাল হয়েছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন, হ্যানরি কিসিঞ্জার তার সঙ্গে

www.pathagar.com

অভদ্র এবং রূঢ় আচরণ করেছেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন– ফ্রান্সের সঙ্গে পাকিস্তানের পারমাণবিক চুক্তি (রিপ্রসেসিং প্ল্যান্ট এগ্রিমেন্ট) যুক্তরাষ্ট্র মেনে নেবে না। তাদের দাবি, হয় চুক্তি বাতিল করতে হবে না হয় চুক্তি বিলম্বিত করতে হবে– যতদিন পর্যন্ত না পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সম্ভাবনামুক্ত নতুন প্রযুক্তি তৈরি হয়।

বৈঠকে কিসিঞ্জার বাবাকে একজন বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক বলে অভিহিত করেছিলেন। একজন 'শুভাকাঙ্ক্ষী' হিসেবেই কিসিঞ্জার তাকে (বাবাকে) সতর্ক করেছিলেন যে, ফ্রান্সের সাথে পারমাণবিক চুক্তি পুনর্বিবেচনা করুন অন্যথায় এর পরিণতি হবে ভয়াবহ।

যদিও তিনমাস আগে জিমি কার্টার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন এবং হ্যানরি কিসিঞ্জারের পরিবর্তে সাইরাস ভ্যান্স হয়ে ছিলেন তখনকার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী– তবুও ওই আলোচনা আমার স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। কারণ মার্কিন প্রশাসনের পরিবর্তনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রতিটি কেন্দ্রেই পরিবর্তন হবে তা মনে করার কোনো কারণ নেই। আমার সাত বছরের সরকার সংক্রান্ত পড়াশোনায় আমি জানতাম সিআইএ প্রায়শই স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং তাদের নীতিগুলো রাতারাতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফ্রান্সের সাথে পারমাণবিক চুক্তি বাতিল করাতে ব্যর্থ হলে আমার বাবাকে সরিয়ে ফেলার নীতি গ্রহণ করেছিল কি তারা? আমার বাবা কি অসতর্কভাবে তাদের হাতের পুতুল হয়ে নির্ধারিত সময়ের এক বছর আগেই নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছিলেন?

সিআইএ'র কাছে আমার বাবার ডোশিয়ের কল্পনা আমি করতে পারি। সিআইএ'র কাছে আমার বাবা এমন একজন ব্যক্তি যিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন নীতির বিরোধীতা করেছেন, যিনি সমাজতন্ত্রী চীনের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, ১৯৭৩ সালের যুদ্ধে যিনি আরবকে সমর্থন করেছেন এবং 'তৃতীয় বিশ্ব সম্মেলন'-এ যিনি সুপার পাওয়ারদের কর্তৃত্ব মুক্তির পক্ষে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি কি তার সামর্থ্যের চেয়ে নিজেকে বড় করে প্রকাশ করেননি?

আরো একটি গোয়েন্দা রিপোর্ট এসেছিল, সেটি ছিল দুই আমেরিকান কূটনীতিকের রেকর্ডকৃত কথপোকথন। আমার বাবার সরকারকে উদ্দেশ্য করে এক কূটনীতিক বলেছেন, 'পার্টির সময় শেষ! তিনিও বিদায় হচ্ছেন!' ন্যাশনাল এসেম্বলির এক ভাষণে আমার বাবা এর উত্তরে বলেছিলেন, 'ভদ্র মহোদয়গণ, পার্টি ফুরিয়ে যায়নি, মহান এই জাতির জন্য আমার মিশন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত পার্টি শেষ হবে না।' অন্যদিকে ভাড়াটে মৌলবাদীরা রাস্তায় নোংরা প্রচারণা শুরু করল। তারা স্লোগান দিল– 'ভুট্টো হিন্দু', 'ভুট্টো ইহুদি'। আমার বাবা একজন মুসলিম– তা সত্ত্বেও তাকে ওই দুই ধর্মের উপযুক্ত বলেই প্রচারণা চলছিল।

আমার মা আমাকে লিখেছিলেন, 'এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে তোমাকে কি লিখব– জানি না। আমি জানি সংবাদপত্রে আমরা যা পড়ি তুমিও তাই পড়, 'দি মর্নিং নিউজ'-ই সবচেয়ে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদপত্র। তারা চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশনে বিশ্বাসী না। কাজেই আমি যতটুকু জানি তুমিও তা-ই জানো।'

আমি সনমকে (আমার বোন ১৯৭৫ সালে রেডক্লিফে ভর্তি হয়েছে) এবং মীরকে লিখেছিলাম– এই গ্রীষ্মে যেন কোনো বন্ধুকে আমন্ত্রণ না করে। আমার চিঠি তারা পেয়েছে কি-না আমি জানি না কারণ ইতিপূর্বে অনেক চিঠিই খোয়া গেছে।

এজন্য আমি লিখেছিলাম– 'তুমি যদি এই চিঠি পাও তবে অন্যদের একথা জানিয়ে

www.pathagar.com

দিও।'

শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের জন্য আমার বাবার প্রস্তাব পিএনএ নেতারা বারবার প্রত্যাখ্যান করছিলেন। লুটপাট-অগ্নিসংযোগ এবং পিপিপি সমর্থকদের হত্যার ঘটনায় আমার বাবা বেশ কিছু পিএনএ নেতাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন তাদের উস্কানিমূলক বক্তব্য সাময়িক বন্ধ থাকলে দেশ শান্ত হবে। কিন্তু ২০ এপ্রিলে অনির্দিষ্টকালের জন্য 'চাক্কা বন্ধ কর্মসূচি'তে করাচি অচল হয়ে পড়ল। ট্রাক চালকদের ধর্মঘট এবং দোকানপাট, ব্যাংক, বাজারঘাট ও টেক্সটাইল মিলগুলো বন্ধ থাকল। ২১ এপ্রিল আমার বাবা সাংবিধানিক নিয়মে করাচি, লাহোর এবং হায়দারাবাদের মতো প্রধান শহরগুলোতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষার জন্য সিভিল প্রশাসনকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সেনা তলব করলেন। প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রশমিত হলো। ২২ এপ্রিলের গণবিক্ষোভ এবং দেশজুড়ে হরতাল কর্মসূচি ব্যর্থ হলো। এমনকি এক সপ্তাহ পরে আহুত 'লংমার্চ'ও তারা করতে পারল না। বিশ লক্ষ লোক নিয়ে রাওয়ালপিণ্ডির উদ্দেশ্যে লংমার্চ করে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাওয়ের ঘোষণা দিয়েছিল পিএনএ। লংমার্চ করতে ব্যর্থ হওয়ায় পিএনএ-এর আন্দোলনের বেলুন পুরোপুরি ফেটে যায়। অথচ আমার বাবা যখন রাওয়ালপিণ্ডির রাস্তায় গাড়িতে করে ঘুরলেন– উৎফুল্ল জনতা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। তবে পিএনএ'র আন্দোলন চড়া মূল্য নিয়েছিল। হাজার হাজার নতুন গাড়ি এবং বাস পুড়েছে, করাচির ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ ছিল কিংবা উৎপাদনে পিছিয়ে পড়েছিল, কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে, প্রাণহানী ঘটেছে। ৩ জুনে প্রকাশিত সংবাদপত্রের খবর পড়ে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম– অবশেষে পিএনএ আমার বাবার সাথে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে– সরকার ভেঙে দিয়ে নতুন করে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়ার শর্ত আমার বাবাও মেনে নেয়ার আশা দিয়েছিলেন।

ঘটনাপ্রবাহে মনে হচ্ছিল অবশেষে পাকিস্তানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে। পিএনএ নেতাদের সাথে চারদিনের সমঝোতা আলোচনায় আমার বাবা সেনা প্রত্যাহার করে নিলেন। এক সপ্তাহ পরে আন্দোলন চলাকালীন সময় গ্রেফতারকৃত পিএনএ নেতৃবর্গ এবং অন্যদের মুক্তি দেয়া হলো। অক্টোবরে পুনরায় নির্বাচনের যে ঘোষণা আমার বাবা দিয়েছিলেন তাতে চরম কট্টরপন্থি পিএনএ নেতারাও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে উঠলেন। 'নিউজউইক'-এর ১৩ জুনের সংখ্যায় আমার বাবার সাথে মিটিং-এর পর একজন বিরোধী নেতার মন্তব্য উদ্ধৃতি দিয়ে খবর প্রকাশ করে– 'এখন আমি ক্ষীণ আশার আলো দেখতে পাচ্ছি, আসুন প্রার্থনা করি এটা যেন ব্যর্থ না হয়।'

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কেও উন্নতি হচ্ছিল। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. আজিজ আহমেদ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইরাস ভ্যান্সের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্যারিস গিয়েছিলেন। মি. আজিজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৫০ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। পাকিস্তানের সরকারকে অস্থিতিশীল করার জন্য আমেরিকার সম্পৃক্ততা থাকার ব্যাপারে সরকারের সন্দেহের কারণগুলো উল্লেখ ছিল ওই রিপোর্টে। আমার বাবা আমাকে বলেছিলেন যে, সাইরাস ভ্যান্স রিপোর্টটি একপাশে সরিয়ে রেখে বলেছেন– 'আর অভিযোগ নয় মি. আজিজ আহমেদ, আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে নতুন অধ্যায় শুরু করতে চাই। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের যে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তাকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দেই।'

আমার বাবার সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে আমেরিকানদের কি ভূমিকা ছিল? এটা আমরা কখনই প্রমাণ করতে পারব না। আমেরিকায় আমার বন্ধুদের মাধ্যমে এই বিষয়ে আরো তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলাম– যুক্তরাষ্ট্রের 'তথ্যের স্বাধীনতা' আইনের আওতায়– আমি ব্যর্থ হয়েছিলাম। আমার আবেদনে সিআইএ ছয়টি ডকুমেন্ট বা নথি পাঠিয়েছিল। এর মধ্যে একটি নথিতে ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানের প্রতি চীনের সমর্থনের বিশ্লেষণ ছিল– সে সময় আমার বাবা ছিলেন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। একটি নথিতে ছিল সেই সময়কার রাওয়ালপিণ্ডিতে বেসামরিক কনভয় চলাচল সংক্রান্ত একটি তারবার্তা। একটি নথিই শুধুমাত্র আমার বাবা এবং পিপিপি সংক্রান্ত ছিল। সেটা ছিল ১৯৭৩ সালে আমার বাবার প্রস্তাবিত সংবিধানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিরোধ সংক্রান্ত।

কাভারিং লেটারে সিএইএ জানিয়েছিল, 'আপনার অনুরোধের প্রেক্ষিতে জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রসঙ্গে সিআইএ রেকর্ডে কোনো তথ্য থাকা বা না থাকার বিষয়টি আমরা নিশ্চিতও করছি না আবার অস্বীকারও করছি না। এ জাতীয় তথ্য রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় বিষয় এবং জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে তা অবশ্যই প্রকাশযোগ্য নয়। এই চিঠির মাধ্যমে এ ধরনের তথ্যের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সম্পর্কে স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই করা হচ্ছে না। জুলফিকার আলি ভুট্টো সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আপনি যে অনুরোধ করছেন তা প্রত্যাখ্যান করা হলো...'

১৯৭৭ সালে পাকিস্তানে যাই ঘটেছিল– তার সুযোগ সৃষ্টি করেছিল কিছু মানুষ। পিএনএ নেতারা যদি নিজেদের স্বার্থ-চিন্তা না করে পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থের কথা ভাবতেন– আমার বাবার নিযুক্ত চিফ অব স্টাফ যদি তার ব্যক্তিগত স্বার্থে অন্ধ না হয়ে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতেন– তাহলে একটি গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাত হতো না। এটা ছিল সেদিনের এবং আজও আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। যুক্তরাষ্ট্র তাদের জাতীয় স্বার্থেই তখন কাজ করেছিল কিন্তু আমরা আমাদের দেশের স্বার্থে কাজ করিনি। কিছু লোক ১৯৭৭ সালের ঘটনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করার সহজ উপায় বেছে নেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রকে সহযোগিতা করার জন্য কি আমাদের মধ্য থেকে কোনো সহযোগী ছিল না– যারা দেশের কথা না ভেবে পাকিস্তানের নির্বাচিত সরকারের কোনোরূপ বিপর্যয়ের কথা না ভেবে ক্ষমতা দখলের সুযোগ খুঁজছিলেন। অক্সফোর্ডের ছাত্রী হয়েও এখনও বিষয়টি আমার বোধগম্য হয়নি।

২১ জুন আমার ২৪তম জন্মদিন। ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখলাম আকাশে প্রদীপ্ত সূর্য– গ্রীষ্মের একটি উষ্ণ দিনের ঘোষণা করছিল। আমার জন্মদিন এবং বিদায়ী পার্টির জন্য আমি তৈরি হলাম। পাকিস্তানে ফেরার পূর্বে রাণী এলিজাবেথ হাউসের বাগানে আমি এই পার্টির আয়োজন করেছিলাম। আমার অক্সফোর্ড এড্রেসবুকে লিপিবদ্ধ পরিচিতি সকলকেই পার্টিতে আমন্ত্রণ করেছিলাম। পার্টিতে উপস্থিত অতিথিদের ভিড় দেখে বোঝা যাচ্ছিল আমন্ত্রিত সকলেই এসেছিল।

স্ট্রবেরি এবং ক্রিমের সমাহারে আমরা নিজেদের মধ্যে স্মৃতিচারণ করছিলাম এবং বাড়ির ঠিকানা দেয়া-নেয়া হচ্ছিল।

অক্সফোর্ড এবং সেখানকার অনেক বন্ধুকে ছেড়ে আসার ভাবনায় আমি বিষণ্ন

www.pathagar.com

হয়েছিলাম। আমার প্রিয় হলুদ গাড়িটি ছেড়ে আসতেও আমার কষ্ট হচ্ছিল। মীর শরতে গাড়িটি বিক্রি করে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিল। চার বছর ধরে আমার গাড়িটি সংবাদ বুলেটিন বোর্ড হিসেবে কাজ করেছে– আমার বন্ধুরা তাদের বার্তা এবং হিংসুটে ট্রাফিকরা পার্কিং টিকেট সেঁটে দিত এর গায়ে।

কিন্তু পাকিস্তানে অপেক্ষারত আমার ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রের ব্যাপারেও আমি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। আমার ব্যাপারে বাবা তার প্রাথমিক পরিকল্পনা আমাকে আগেই জানিয়ে ছিলেন। গ্রীষ্মে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এবং আন্তঃপ্রাদেশিক পরিষদে আমাকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। যাতে করে আমি আন্তঃপ্রাদেশিক সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত হয়ে উঠি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে তিনি আমাকে জাতিসংঘে পাঠাবেন– এতে আমার ভালো প্রকাশ ঘটবে এবং সেখানকার সবকিছুর সঙ্গে পরিচিতি হবে।

ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে আমি নভেম্বরে পাকিস্তানে ফিরে আসব– এই ছিল উজ্জ্বল, ঝকঝকে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা– যা আমার জন্য তৈরি হয়েছিল।

বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমি যতটা ব্যকুল ছিলাম– আমার বাবাও আমার দেশে ফেরার প্রতীক্ষায় উদগ্রীব ছিলেন। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'আমি কথা দিচ্ছি শিগগিরই পাকিস্তানে তোমাকে তোমার উপযুক্ত আনন্দময় পরিবেশ দেয়ার জন্য আমার সর্বসাধ্য চেষ্টা করব। তারপর তুমি তোমার মতো করে চলবে। তবে আমার বিরক্তিকর কৌতুক তোমাকে সহ্য করতে হবে। দুর্ভাগ্য যে, এই বয়সে আমি আমার মেজাজ বদলাতে পারব না। তবে আমি আমার প্রথম সন্তানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব নিজেকে সংবরণ করতে। তোমার মধ্যেও এই সমস্যা রয়েছে– তুমিও অত্যন্ত জেদী এবং তোমার চোখে অশ্রু আসলে আমার চোখেও অশ্রু ঝরে। কারণ আমরা একই রক্ত-মাংসের।

এসো আমরা একে অপরকে বোঝার জন্য সন্ধি করি। তুমি একজন পরিশীলিত মানুষ। তোমার মতো একজন মানুষ কীভাবে উত্তাপহীন মরুভূমি বা বরফহীন পাহাড়ের আশা করে? তোমার মূল্যবোধ এবং আত্মিক শক্তির মধ্যেই তুমি তোমার সূর্যোদয় এবং রংধনু খুঁজে পাবে এবং তোমাকে উৎকৃষ্ট করে তুলবে। প্রশংসনীয় সাফল্যের লক্ষ্যে আমরা দু'জনে এক সঙ্গে কাজ করব এবং আমরা তা পারব এ বিষয়ে তুমি বাজি ধরতে পার।'

২৫ জুন, ১৯৭৭-এ মীর এবং আমি মা-বাবা এবং পরিবারের অন্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য রাওয়ালপিণ্ডির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। সুইজারল্যান্ডের স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এলো শাহনেওয়াজ এবং হার্ভার্ড থেকে এলো সনম। সেবারই শেষবারের মতো আমরা সম্পূর্ণ পরিবার একত্রিত হয়েছিলাম।

www.pathagar.com

৫

আল-মুর্তাজা'র স্মৃতি

জিয়াউল হকের চরম বিশ্বাসঘাতকতা

আল-মুর্তাজার জানালা দিয়ে আমি দেখলাম– আমাদের বন্দিকর্তার রাইফেলের ডগায় ফেব্রুয়ারির সূর্য জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আমাদের বন্দিদশা যখন চারমাসে পড়ল তখন বাড়িটাকেও আমার কাছে বন্দি মনে হলো। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক নেতৃবর্গ আমার বাবার সাথে এখানে দেখা করতে আসতেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইরানের শাহ্ আবুধাবির শাসক এবং আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ জায়েদ, আগাখান প্রিন্স করিম, মার্কিন সিনেটর জর্জ ম্যাকগভার্ন, ব্রিটিশ কেবিনেট মন্ত্রী ডানকান স্যান্ডি প্রমুখ। আমার বাবা অতিথিদের সম্মানে প্রায় শিকারের আয়োজন করতেন, যদিও তিনি নিজে শিকার পছন্দ করতেন না। তবে আমার ভাইরা বন্দুক চালনায় পারদর্শী ছিল। অতিথিদের উৎসাহিত করার জন্য তারা মাঝেমাঝে নিপুণ নিশানায় পাখি বা হরিণ শিকার করে দিত।

খুব সাধারণ দিনেও আল মুর্তাজা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরে থাকত। আমার বাবা প্রায়ই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার বেসুরো গলায় গান গেয়ে উঠতেন– গভীর উৎসাহে তিনি সিন্ধি ফোক গান কিংবা তার প্রিয় কোনো ইংরেজি গান গাইতেন। যেমন– নিউইয়র্কে দেখা সাউথ প্যাসিফিকের 'Some Enchanted Evening', 'Strangers in the Night', আমার বাবা এবং মায়ের বিয়ের পূর্বে তাদের প্রণয়ের দিনে ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার গান করাচিতে খুবই জনপ্রিয় ছিল। তার সবচেয়ে সেরা গান ছিল 'Que Sera, Sera', আমি এখনও শুনতে পারি আমার বাবা গাইছেন– 'Whatever will be, will be, the futures not ours to see....'

তমশাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের ব্যাপারে কে-ই বা পরিজ্ঞাত ছিল– যে ভবিষ্যৎ হঠাৎ করেই একদিন আমার বাবাকে বিপর্যস্ত করবে– ৫ জুলাই ১৯৭৭ সালের ভোরে, সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমাদের বক্তিগত জীবনে বেদনার পাহাড় ভেঙে পড়েছিল এবং শুরু হয়েছিল পাকিস্তানের দুর্দশা।

www.pathagar.com

৫ জুলাই, ১৯৭৭, রাত ১:৪৫, রাওয়ালপিণ্ডি, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন

'ওঠো, ওঠো, কাপড় পরো– জলদি!' মা হুড়মুড় করে আমার ঘরের মধ্য দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে আমার বোনকে জাগালেন। 'সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে, সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে।'

কয়েক মিনিট পর সন্ত্রস্ত হয়ে আমি আমার বাবা-মা'র বেডরুমে গেলাম। কি ঘটছে আমি কিছুই জানতাম না। অভ্যুত্থান? অভ্যুত্থান কেন হবে? বিতর্কিত নির্বাচন নিয়ে যে বিরোধ ছিল সে বিষয়ে পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং বিরোধী নেতারা একটি চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছেছেন। আর যদি সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে তাহলে সেনাবাহিনীর কোনো অংশ তা করল?

দু'দিন আগেও জেনারেল জিয়া এবং কোর কমান্ডাররা আমার বাবার সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে তারা তাদের সমর্থন এবং আনুগত্য প্রকাশ করে গেছন।

আর্মি চিফ অব স্টাফ এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আমার বাবা টেলিফোন নিয়ে বসলেন। শিক্ষামন্ত্রীর বাসা থেকে প্রথম কলটি আসলো। ইতোমধ্যেই সেনাবাহিনী সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। শিক্ষামন্ত্রী হাফিজ পীরজাদার কন্যা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'সৈন্যরা বাবাকে মারধর করে তাকে নিয়ে গেছে।' হাফিজ পীরজাদা কয়েক ঘণ্টা আগেও আমার বাবার সঙ্গে ছিলেন। বিরোধীদলের সঙ্গে সমঝোতার ব্যাপারটি নিয়ে দু'জনেই আলোচনা করছিলেন এবং তারা উভয়েই বেশ উৎফুল্ল ছিলেন। লনে বসে তারা গল্প করছিলেন, আমি সে সময় আমার বোনের সঙ্গে গল্প করছিলাম। আমি তাদের সিগারের জ্বলন্ত আগুন দেখতে পারছিলাম– তাদের হাসির শব্দ আমার কানে ভেসে আসছিল। বাবা ফোনে শান্ত কণ্ঠে পীরজাদার মেয়েকে বললেন, 'শান্ত হও, তোমার পারিবারিক সম্মান বজায় রাখো'। ফোনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নরের সঙ্গে কথা বলার মাঝখানে টেলিফোন ডেড হয়ে গেল।

আমার মায়ের চেহারা মৃতের মতো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। বাবা অভ্যুত্থানের বিষয়ে কিভাবে জানলেন, মা আমার কানে কানে তা বললেন, সেনাবাহিনীকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ঘিরে ফেলতে দেখে একজন পুলিশ নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেনা কর্মকর্তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ফ্রন্ট ডোর পর্যন্ত পৌঁছে আমার বাবার ভ্যালেট উর্সকে জরুরি তাগাদা দিয়ে বলেন, 'মি. ভুট্টোকে গিয়ে বলো– সেনাবাহিনী তাকে হত্যা করতে আসছে। তাকে শিগগিরই লুকিয়ে পড়তে বলো।' উর্স আমার বাবাকে একথা জানালে তিনি শান্তভাবে তার কথা শোনেন এবং বলেন, 'আল্লাহর হাতে আমার জীবন, সেনাবাহিনী যদি আমাকে হত্যা করতে চায় তাহলে তারা আমাকে হত্যা করবে। এখানে লুকানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এবং তোমরাও কোনো বাধা দেবে না, তাদেরকে আসতে দাও।' যাই হোক, সম্ভবত ওই পুলিশের সতর্কতার কারণেই আমাদের সকলের জীবন রক্ষা পেয়েছিল।

'প্রধানমন্ত্রী চিফ অব আর্মি স্টাফের সঙ্গে কথা বলতে চান'। আমার বাবা সনমের ফোনে কথা বলছিলেন। সনমের এই ফোন সংযোগটি ছিল একটি প্রাইভেট লাইন। এই ফোনে সে তার বন্ধুদের সঙ্গে অনর্গল কথা বলত এবং অলৌকিকভাবে ফোনটি সচল ছিল।

জিয়া তাৎক্ষণিকভাবে ফোন ধরলেন, অভ্যুত্থানের বিষয়টি আমার বাবা জানতে পেরেছেন জেনে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন। জিয়া মাত্র কয়েকদিন আগে সম্পাদিত রাজনৈতিক সংকটের শান্তিপূর্ণ চুক্তির কোনো উল্লেখ না করে কোনো রাখ-ঢাক না করে তার

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন– 'আমি দুঃখিত স্যার, আমাকে এটা করতেই হলো। আমরা আপনাকে কিছু সময়ের জন্য 'নিরাপদ হেফাজতে' রাখব। কিন্তু আমি নব্বইদিনের মধ্যেই নতুন নির্বাচন করাব, আপনি আবারও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন স্যার, এবং আমি আপনাকে স্যালুট করব।'

এতক্ষণে আমার বাবা জানতে পারলেন কার নেতৃত্বে এই অভ্যুত্থান হয়েছে। জিয়া যখন বললেন, বাবা যেখানে যেতে চান তাকে সেখানেই নিয়ে যাওয়া হবে– লারকানায় আমাদের বাড়ির কাছে মারিতে প্রধানমন্ত্রীর রেস্ট হাউস অথবা অন্য যে কোনো স্থানে– বাবা তখন তার চোখ দুটো কুচকাচ্ছিলেন। জিয়া জানালো, রাওয়ালপিণ্ডির প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আমাদের পরিবার একমাস থাকবে এবং রাত ২-৩০ মিনিটে সেনাবাহিনী বাবাকে নিয়ে যাবে। বাবা বললেন, 'আমি লারকানায় যাব এবং আমার পরিবার করাচি ফিরে যাবে। এটা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, ঘটনাদৃষ্টে মনে হচ্ছে এখন আর আমি প্রধানমন্ত্রী নই, তাই সন্ধ্যার আগেই আমার পরিবার এখান থেকে চলে যাবে।' বাবা যখন ফোন ছাড়লেন তখন তাকে অত্যন্ত গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তিনি যখন পুনরায় রিসিভার তুলে আরও একটি কল করতে চাইলেন দেখা গেল সনমের লাইনও ডেড হয়ে গেছে।

আমার ভাই মীর এবং শাহ নাওয়াজ দ্রুতবেগে ঘরে ঢুকল। তারা তাড়াহুড়ো করে কাপড় পরে এসেছে।

'আমরা প্রতিরোধ করব', মীর বলল।

'সেনা অভ্যুত্থানে কখনোই বাধা দিও না', বাবা শান্তভাবে বললেন। জেনারেলরা আমাদের হত্যা করতে চায়, আমাদের হত্যাকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণের জন্য আমরা অবশ্যই কোনো অজুহাত তাদেরকে দেব না।'

দু'বছর আগে সামরিক অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব এবং তার প্রায় পুরো পরিবারকে বাড়ির ভেতরে একসঙ্গে নৃশংসভাবে হত্যা করার কথা স্মরণ করে আমি ভয়ে কাঁপছিলাম। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী কিছুদিন আগেও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অংশ ছিল। আমাদের সেনাবাহিনী অপেক্ষা তারা কি করে ব্যতিক্রম হবে?

আমার মা, ভাইদের বললেন, 'জিয়া ক্যু করেছে।' আমরা যতটুকু জানি মা ততটুকুই আমার ভাইদের জানালেন, 'আসগার খান এবং অন্যান্য পিএনএ নেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। মন্ত্রী পীরজাদা, মমতাজ, নিয়াজী এবং খারকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। জিয়া বলেছে– বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আসগার খানের বিচার হবে, নিয়াজী এবং খারও বাদ যাবে না। নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন করবে বলেও জিয়া জানিয়েছে।'

শাহ বলল, 'সে নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন এবং এসব কিছু করবে?' শাহ, পরিবারের সবচেয়ে কনিষ্ঠতম সদস্য এবং ওই বছরগুলোতে আমাদের চেয়ে সেই বেশি সময় বাড়িতে কাটিয়েছে এবং রাজনৈতিক দিক থেকে সে আমাদের চেয়েও বিচক্ষণ ছিল। এরকম উত্তর না জানা অনেক প্রশ্নই তখন বাতাসে উড়ছিল। জিয়া কেন বেছে বেছে এইসব রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করল? এটা কি লোক দেখানো নাটক? এদের গ্রেফতার করে ষড়যন্ত্রকারীদের ঢাকা হচ্ছে না তো? আমরা ছোট ছোট তথ্য থেকে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছিলাম– যেখানে হঠাৎ করেই সবকিছু দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছিল।

জিয়া অভ্যুত্থান ঘটাতে এত বিলম্ব করল কেন? যেখানে এপ্রিলেই অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলতা প্রশমিত হয়েছিল এবং মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে পিএনএ'র সাথে সরকারের

সমঝোতা হয়েছে।

'জিয়া হিসেবে ভুল করেছে।' বাবা বললেন, সে ধরে নিয়েছিল পিএনএ'র সাথে আলোচনা ব্যর্থ হবে এবং ক্ষমতা দখলের একটি অজুহাত সে পাবে। তাই আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার আগেই সে আঘাত হেনেছে।'

আমার মা ক্ষীণস্বরে বললেন, 'আল্লাহই জানেন– আমাদের কি হবে।' তিনি তার ড্রেসিং রুমে গেলেন এবং সেফ খুলে কিছু টাকা নিয়ে ফিরে এলেন। আমার ভাইদের হাতে টাকাগুলো দিয়ে তিনি বললেন, ' তোমরা খুব সকালেই করাচির উদ্দেশে রওনা হবে। বেনজির, সনম এবং আমি করাচিতে তোমাদের সাথে মিলিত হব। যদি সন্ধ্যার আগে আমরা তোমাদের কাছে না পৌঁছাই তাহলে তোমরা দেশ ছেড়ে চলে যাবে।'

রাত প্রায় ২:০০টা। আমরা অপেক্ষা করছি কখন বাবাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেনাবাহিনী আসবে। আমাদের নিজেদের যাত্রার প্রস্তুতি নেয়ার বিষয়টি বাদ রেখে আমরা বাবা-মা'র বেডরুমে অপেক্ষা করছিলাম। আমরা সবাই তখনও ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলাম– এরপর কি ঘটবে। জেনারেল জিয়া কি আমাদের পুরো পরিবার একত্রিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে– যাতে সবাইকে একসঙ্গে শেষ করতে পারে? মাথার মধ্যে এ ধরনের ভয়ঙ্কর চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমি চেষ্টা করেও দুশ্চিন্তাগুলোকে রোধ করতে পারছিলাম না। প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের হত্যাযজ্ঞে তার দুই মেয়ে বেঁচে গিয়েছিল– কারণ সে সময় তারা দেশে ছিলেন না। তাদেরই একজন বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কি আমাদের বেলায় সেই ভুল করতে চায়নি?

আমার ভাইরা, বোন এবং আমি পৃথকভাবে বাড়ি গিয়েছিলাম। সুইজারল্যান্ডের স্কুল থেকে শাহ, হার্ভার্ড থেকে সনম, মীর এবং আমি অক্সফোর্ড থেকে। দুর্ঘটনার ভয়ে আমার বাবা-মা আমাদের ভাই-বোনদের একসঙ্গে ভ্রমণের অনুমতি দিতেন না। 'আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি, পড়াশুনা শেষ করে তুমি বাড়ি ফিরে এসেছ।' দশ বছর আগে এভাবেই বাবা আমাকে সম্ভাষণ করে ছিলেন। 'এখন তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে।'

প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের একটি অফিসে আমি কাজে যোগ দিলাম। অফিসিয়াল গোপনীয়তা রক্ষার্থে শপথ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বেশ কিছু ফাইলের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ করতে শুরু করেছিলাম। সেখানে আমি আমার নিজস্ব মন্তব্যও সংযোজন করতাম। এক সপ্তাহের মধ্যেই সবকিছু বদলে গেল– কার্যতঃ কয়েক ঘণ্টায়।

খবর শোনার জন্য আমার মা রেডিও খুললেন, যদিও এত রাতে কোনো সংবাদ প্রচার না হওয়ারই কথা। এবং হলোও তাই– কোনো খবর নেই। আমরা যখন সেনাবাহিনীর অপেক্ষা করছিলাম– আমার বাবা ততক্ষণে প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছেন। 'আমার কাঁধ থেকে দায়িত্বের বোঝা নেমে গেল।' বাবা বললেন, 'সরকার হচ্ছে আস্থার প্রতীক এবং আমি বিশ্বস্ততার সঙ্গেই তা সমুন্নত রেখেছি। এখন আর আমার সেই দায় নেই।'

বাবা-মায়ের বেডরুমের সোফায় আমরা নিঃসাড় বসেছিলাম। সে সময় বাবা তার নিজস্ব রুটিনমাফিক ধীরস্থিরভাবে বিভিন্ন ফাইল পড়ছিলেন। তার আর্মচেয়ারের পিছনের একটি টেবিলে ফাইলের স্তূপ। একটি কালো ফাইলে কিছু না পড়েই বাবা প্রতিটি বিষয়ে স্বাক্ষর করছিলেন। বাবা বললেন, 'প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি প্রথম যে কাজ করেছি তা ছিল মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামির মৃত্যুদণ্ড রদ করা, আমার শেষ কাজও তাই। প্রাণভিক্ষার আবেদন পড়তে আমি সবসময়ই ঘৃণা করি।' বাবাকে আলিঙ্গন করার জন্য আমি তার কাছে

www.pathagar.com

গেলাম কিন্তু বাবা আমাকে ধীরে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এখন ভাবাবেগ প্রকাশের সময় নয়, এখন শক্ত হতে হবে।'

আড়াইটা পার হয়ে সাড়ে তিনটা বাজলো কিন্তু বাবাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেউ এলো না। আমার অস্বস্তি বাড়ছিল। সেনাবাহিনী কি পরিকল্পনা করছে? ভোর চারটার দিকে বাবার সামরিক সচিব এলেন। তার চোখগুলো ছিল লাল এবং তাকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। তিনি জেনারেলের হেডকোয়ার্টার থেকে সোজা আমাদের কাছে এসেছেন– জেনারেল জিয়া তাকে হেড কোয়ার্টারে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি জানালেন, 'বাবাকে লারকানায় নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছে জেনারেল জিয়া– কারণ তা সম্ভব নয়।' খুব অসুবিধা না হলে– বাবাকে মারির প্রধানমন্ত্রীর রেস্ট হাউসে নিয়ে যাওয়া হবে– প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা নিয়েই তিনি সেখানে থাকবেন। সকাল ৬-০০টায় তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে।

সনম প্রশ্ন করল, 'আমি অবাক হচ্ছি– কেন তারা পরিকল্পনা পরিবর্তন করল?' উত্তরে বাবা বললেন, 'আমার ফোন পেয়ে হয়তো জিয়া ঘাবড়ে গিয়েছিল। সে হয়তো ধারণা করেছে– তাকে ফোন করার পূর্বেই আমি আমার অনুগত সেনা কর্মকর্তাদের পাল্টা অভ্যুত্থানের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছি।'

আবার শুরু হলো আমাদের অস্বস্তিকর প্রতীক্ষার পালা। এক ঘণ্টা পর আমাদের একজন বেয়ারা এসে জানালো, হাউজহোল্ড ম্যানেজারকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তাকে মারির প্রধানমন্ত্রীর রেস্টহাউস প্রস্তুত করার জন্য পাঠানো হয়েছে।

'জেনারেল জিয়া বলেছিল আমাকে নিতে তারা ২-৩০টায় আসছে, এখন সকাল ছয়টা, এখনও তারা রেস্ট হাউস প্রস্তুত করেনি। অন্যদের গ্রেফতার করার পরিকল্পনা করেছে তারা, কিন্তু আমাকে গ্রেফতারের পরিকল্পনা তাদের ছিল না। ' বাবা অস্ফুট স্বরে কথাগুলো বললেন। তার এই কথার গভীর তাৎপর্য ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

শাহ আমার কানে কানে বলল, 'বাস্টার্ডটা আমাদের হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল।'

মা আমার ভাইদের বললেন, 'যাও, তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে ফেল, ৭-০০টায় তোমাদের ফ্লাইট।' সেনাবাহিনী কর্তৃক পাকিস্তানের ক্ষমতা দখলের খবর শোনার জন্য আমরা বিবিসি'র সকালের উর্দু খবর টিউন করলাম।

বাবা আমাকে বললেন, 'ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্টের তুমি একজন ছাত্রী, তুমি কি মনে করো জিয়া নির্বাচন দেবে?'

পূর্ণ ছাত্রসুলভ আদর্শ এবং পুঁথিগত যুক্তিতে আমি বললাম, 'হ্যাঁ বাবা, আমি মনে করি সে নির্বাচন দেবে। জিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন করার মাধ্যমে বিরোধীদের 'নির্বাচনে কারচুপি'র অভিযোগ উত্থাপনের রাস্তা বন্ধ করে দেবে এবং বিরোধীরা নতুন করে আন্দোলনে নামার কোনো অজুহাত পাবে না।'

'বোকার মতো কথা বলো না পিংকি। সেনাবাহিনী ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার জন্য ক্ষমতা দখল করে না। এবং নির্বাচন করে গণতান্ত্রিক সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জেনারেলরা চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে না।' বাবা শান্তভাবে কথাগুলো বললেন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি গোছগাছ করার জন্য বাবা-মা'র রুম থেকে বেরিয়ে এলাম। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার এই মুহূর্তের জন্য বাবা আমাদের প্রথম থেকেই মানসিকভাবে তৈরি করেছিলেন। তবে আমি কখনোই এভাবে রাইফেলের নলের

www.pathagar.com

মুখে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ভাবিনি। আমরা কখনোই প্রধানমন্ত্রীর রেসিডেন্সকে একটি সরকারি ভবন ভিন্ন বাড়ি বলে বিবেচনা করিনি– আমার বাবা সবসময়ই আমাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দিতেন। তিনি চাইতেন, ভোটে হেরে গিয়ে যদি কখনও প্রধানমন্ত্রীত্ব হারান- তাহলে আমরা যত শিগগির সম্ভব সরকারি বাসভবন ছেড়ে যেতে পারি। তিনি তার পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী ইয়াহিয়া খানের মতো পদ হারানোর পরও মাসের পর মাস সরকারি ভবনে থাকা অপছন্দ করতেন। 'একদিনের মধ্যে যদি গোছগাছ হয়ে যায় তাহলে আর এক মুহূর্তও সেখানে থাকবে না।' আমার বাবা সবসময়ই আমাদের একথা বলতেন। কিন্তু আমি এই গুরুত্বপূর্ণ নিয়মের লংঘন করেছিলাম, দু'সপ্তাহ পূর্বে আমি অক্সফোর্ড থেকে সোজা রাওয়ালপিণ্ডি চলে এসেছিলাম– আমার সঙ্গে বই-পুস্তক ও কাপড়ের স্তূপ নিয়ে এসেছিলাম। আমি সেগুলো আমাদের করাচির বাড়িতে স্থানান্তর করার পরিকল্পনা করেছিলাম– কিন্তু আমি তা করে উঠতে পারিনি। বাবার সঙ্গে কাজে আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম।

গোছগাছ করার সময় পুরোপুরি দিশেহারা বোধ করছিলাম। আমি বারবার আমার ঘর এবং বাবার ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করছিলাম– আমার অজান্তে বাবা কিছু নিয়েছেন কি-না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য। এই ছুটোছুটির মধ্যে আমার ইরানি বিড়াল সুগার-এর ওপর আমার পা পরে, পরেই যাচ্ছিলাম প্রায়; সুগার কোনো প্রতিবাদ করেনি– সেও আমাদের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বুঝে নিয়েছিল। আমার পায়ে গা ঘেঁষে শুধু মিঁউ-মিঁউ করছিল। মা যখন আমার ঘরে এলেন তখন আমার রুম প্রায় খালি।

তিনি বললেন, 'আটটা বাজে অথচ এখনও সেনাবাহিনী এলো না। এডিসি আমাদের জানালেন– মারি রেস্ট হাউসের প্রস্তুতির কাজ চলছে– কে জানে কি হচ্ছে? ছেলেদেরকে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে, আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া।'

দিনের আলো কিছুটা স্বস্তি নিয়ে এসেছিল। জিনিসপত্র গোছগাছ এবং বাঁধাবাধির কাজে ব্যস্ত থাকায় আমার উত্তেজনাও অনেক স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। আমি এবং মা দু'ঘরের সংযোগ দরজা ঠেলে সনমের ঘরে গেলাম। তাকে দেখার জন্য। সনম তার কাপড়, ছবি, রেকর্ড এলবাম সবকিছু ট্রাঙ্কের মধ্যে ভরছে– এমনকি 'হারপারর্স বাজার' এবং 'ভোগ'-এর পুরনো সংখ্যাগুলোও ট্রাঙ্কে ভরছে। 'আমার কোনো জিনিস তাদেরকে ছুঁতে দেব না।' রাগত কণ্ঠে সে বলল। জিনিস এবং টি-শার্ট পড়েছিল সনম, তার দীর্ঘ চুলগুলোতে তখনও চিরুনি করা হয়নি।

৯-০০টার ঠিক আগে মা চিৎকার করে আমাদের ডাকলেন, 'পিংকি! সানি!! তাড়াতাড়ি এসো, তোমাদের বাবা চলে যাচ্ছেন।'

'জলদী! তাড়াতাড়ি আসুন সাহেব যাচ্ছেন!' পাগড়ি পরা– প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের লাল এবং সাদা উর্দি পরা একজন কর্মচারী আমার দরজায় এসে আমাকে জানালেন। লোকটির চোখে অশ্রু।

আমার চোখে অশ্রুধারা বইতে লাগল সনমের চোখও লাল হয়ে উঠেছিল। আমি বললাম, 'এই অবস্থায় আমরা কিভাবে বাবাকে বিদায় জানাব?' সনম বলল, 'তাড়াতাড়ি এসো, আমার কাছে আই ড্রপ আছে'। আমরা দ্রুত সনমের ড্রেসিং রুমে গেলাম, কাঁপা হাতে একে অপরের চোখে ড্রপ দিলাম। চোখ পিটপিট করে আমরা দৌড়ে সাদা এবং সোনালি রঙের প্যানেল করা করিডোর পেরিয়ে ফ্রন্ট এন্ট্রান্সে দিকে গেলাম। লন থেকে ভেসে আসা বিলাপ ও কান্নাকাটির শব্দ শুনতে পেলাম। সেখানে সব কর্মচারীরা জড়ো

হয়েছিল।

বাবা ততক্ষণে প্রধানমন্ত্রীর কালো মার্সিডিজের সিটে বসেছেন, গাড়ি সানি এবং আমি দ্রুতবেগে ফ্রন্টপোর্চে ক্রন্দনরত কর্মচারীদের পিছনে ফেলে আমি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললাম, 'গুডবাই পাপা', উত্তেজিতভাবে আমি নাড়ছিলাম। বাবা আমার দিকে ফিরে তাকালেন– অর্ধস্ফুট হাসলেন, প্র এর বাসভবনের ফটক পেরিয়ে গাড়ি চলে গেল। সকালের সূর্যরশ্মিতে গাড়ির লাইসেন্স প্লেটে প্রধানমন্ত্রীর সোনালী স্মারক চকচক করে উঠেছিল।

সেনাবাহিনীর গাড়িবহর আমার বাবাকে মারি নিয়ে গেল, সেখানে তাকে তিন সপ্তাহ 'নিরাপদ হেফাজতে'-এ রাখা হবে। জেনারেল জিয়া তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের গ্রেফতারকে যুক্তিসঙ্গত হিসেবে চালানোর জন্য নতুন এই ব্যবস্থা– 'নিরাপদ হেফাজত'-এর প্রবর্তন করে। মারির রেস্ট হাউসটি ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশরা তৈরি করেছিল। কাশ্মির পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতমালার কোল ঘেঁষে সাদা ওই রেস্ট হাউস নির্মিত হয়েছিল। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা পুরো পরিবার মারির রেস্ট হাউসে কাটাতাম। ঔপনিবেশিক আমলের ফ্রন্টপোর্চে স্ক্র্যাবল খেলে অলস সময় কাটাতাম। আর এখন আমার বাবা সেখানে যাচ্ছেন সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি হিসেবে। আমার বাবার গণতান্ত্রিক সরকারের পুরোটাই হরণ করা হলো। পাকিস্তানে আবারও শুরু হলো জেনারেলদের শাসন।

আমার বোঝা উচিত ছিল যে, অভ্যুত্থানই ছিল চূড়ান্ত লক্ষ্য, আমার বাবাকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটেছে। ১৯৭৩ সালের সংবিধান রদ করা হয়েছে, সামরিক শাসন জারি করা হয়েছে। কিন্তু আমার শিক্ষাগত যুক্তি-বিচার এবং আমার অপরিপক্ব বিবেচনায় একগুঁয়েভাবেই বিশ্বাস করতাম যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জিয়া নির্বাচন দেবে– জিয়া বারংবার দেশবাসীর সামনে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অভ্যুত্থানের সকালে জিয়া ঘোষণা করে, 'আমি একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ আমার নেই এবং সেনাবাহিনীও তার সৈন্যের পেশা ছাড়বে না। আমার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে– অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করা– যা এবছরের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের পরপরই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। আমি গভীর আশ্বাস দিচ্ছি যে, আমি এই সময়সূচি থেকে বিচ্যুত হব না।' সে মিথ্যা বলেছিল।

সামরিক আইন আদেশ নং-৫, সামরিক প্রশাসকের অনুমতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র ইউনিয়ন কিংবা রাজনৈতিকদলের সভা করলে অথবা সভায় যোগ দিলে দশ দোরড়া (বেত্রাঘাত) এবং পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড।

সামরিক আইন আদেশ নং-১৩ : মৌখিক কিংবা লিখিতভাবে সেনাবাহিনীর সমালোচনা করা শাস্তিযোগ্য– দশ বেত্রাঘাত এবং পাঁচ বছরের কারাদণ্ড।

সামরিক আইন আদেশ নং-১৬ : প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়াউল হকের বিরুদ্ধে কোনো সেনা সদস্যকে উস্কানি দিয়ে দায়িত্বচ্যুত করা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ।

সামরিক আইনের ৬ নং আদেশে উল্লেখ করা হয়েছিল– কোনো ব্যক্তি লুট করবে না,

www.pathagar.com

লুটের সর্বোচ্চ শাস্তি– হস্ত কর্তন। অভ্যুত্থানের দিন এই আদেশগুলো জারি করা হয়।

জনসাধারণকে আরো আতঙ্কিত করার জন্য জিয়া ধর্মীয় মৌলবাদীদের উন্মুক্ত করে দিলেন। পবিত্র রোজার মাসে পাকিস্তানের মুসলমানরা রোজা রাখবে বা রাখবে না– তা সবসময় ছিল ব্যক্তিগত অভিরুচি। জিয়ার শাসনে হোটেল এবং খাবারের দোকানগুলো সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে রোজার সময় ছাত্রদের পানি পান থেকে বিরত রাখতে ক্যাম্পাসের পানি সরবরাহের লাইন এমনকি বাথরুমের পানির সরবরাহও বন্ধ করে দেওয়া হলো। মৌলবাদী গ্যাং স্বাধীনভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়াত।

মধ্যরাতে তারা মানুষের দরজা পিটিয়ে নিশ্চিত হতো সেহরি তৈরি করছে কি-না। উন্মুক্তভাবে ধূমপান, পানিপান অথবা খাওয়া ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার আর কোনো সুযোগ থাকল না পাকিস্তানে– মনে হচ্ছিল পাকিস্তানে একটি শক্তিশালী ধর্মীয় শাসনামল চালু হয়েছে। আমরা রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ফিরে আসার পর। আমার বাবার গ্রেফতারে এবং পাকিস্তানে যে অন্ধকার নেমে এসেছিল তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে পিপিপি সমর্থকরা ৭০ ক্লিফটনে আমাদের বাগানে সমবেত হয়েছিল– আমার মা নিম্নরক্তচাপে ভুগছিলেন, তিনি আমাকে আগত মহিলাদের সাথে দেখা করে আশ্বস্ত করতে বললেন, তাদেরকে বলো 'হওসলা রাকখো'– অর্থাৎ মনোবল অটুট রাখো। আমি একজনের পর একজন প্রত্যেক দর্শনার্থীদের একই কথা পুনরাবৃত্তি করে গেলাম, 'হওসলা রাকখো, হওসলা রাকখো।' উর্দুতে বলতে গিয়ে আমার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল– আট বছর বিদেশে থাকায় আমার উর্দু বলার সাবলীলতা কমে গিয়েছিল।

জিয়া সংবাদপত্রে আমার বাবার বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করল। 'ভুট্টো আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।' 'ভুট্টো আমাকে অপহরণ করেছিল'– এই শিরোনামে আমার বাবার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা খবর ছাপতে লাগল এবং এটা পরিষ্কার হলো যে, তারা সকলেই স্বাধীন এবং বহাল তবিয়তেই ছিল। মারি থেকে ফোনালাপের সময় আমার বাবা একদিন রুক্ষভাবে বলেছিলেন, 'তোমাকে কলঙ্কময় অপপ্রচারের সম্মুখীন হতে হবে, এটা 'অপারেশন ফেয়ারপ্লে'-এর অংশ।' জেনারেল জিয়া তার অভ্যুত্থানকে এই নামেই ব্যাখ্যা করেছিলেন। মৌরির রেস্টহাউস থেকে জিয়া এক এক করে কর্মচারী ছাটাই করেছিল। আমার বাবা বলেছিলেন, 'ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।'

আমার বাবার মনোবল অটুট ছিল। তিনি তখনও রসিকতা করতেন। বাবা একদিন জানালেন, 'আজ একজন সাংবাদিক আমাকে ফোন করে জানতে চাইলেন– আমার সময় কেমন কাটছে, আমি তাকে বললাম, নেপোলিয়নের উপর আমি প্রচুর পড়াশুনা করছি– তিনি কিভাবে তার জেনারেলদের নিয়ন্ত্রণ করেছেন তা শেখার জন্য কারণ আমি আমার জেনারেলদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি।'

বাবার অটুট মনোবল আমাদের সবাইকে স্বাভাবিক থাকতে সাহায্য করেছিল। বিষাদগ্রস্ত হওয়ার পরিবর্তে আমরা নিজেদেরকে শক্তিশালী, আত্মবিশ্বাসী এবং সমুন্নত বোধ করতাম। প্রথমত : আমার বাবা জীবিত, দ্বিতীয়ত : সাধারণ মানুষ তাকে সমর্থন করে এবং পিপিপিও এখনো আগের মতোই জনপ্রিয়। বাবা যখন মীরকে তার নির্বাচনী এলাকা লারকানার তত্ত্বাবধানে পাঠালেন তখন আমি এবং শাহ প্রচুর মানুষের সঙ্গে আলোচনা করতাম– যারা প্রতিদিন ৭০ ক্লিফটনে আসতেন এবং তাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করতেন।

www.pathagar.com

আমাদের পরিবার চালিত সংবাদপত্র 'মুসাওয়াত'-এর একজন সাংবাদিক এবং একজন ফটোগ্রাফার আলোচনাগুলো রেকর্ড করত। পরদিন 'মুসাওয়াত'– পিপিপি'র লক্ষ্য আদর্শ প্রচারের একমাত্র পত্রিকায়– তা প্রকাশ হতো। পিপিপি ঘরানায় কি ঘটছে এবং সামরিক সরকার সমর্থিত পত্রিকাগুলো পিপিপি'র বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার-প্রপাগাণ্ডা করত তার পাল্টা জবাব প্রকাশ করত।

বাবার গ্রেফতারের পর নাটকীয়ভাবে 'মুসাওয়াত'-এর সার্কুলেশন ব্যাপকভাবে বেড়ে গেল। শুধু লাহোরেই কয়েক হাজারের সার্কুলেশন বেড়ে এক লাখে দাঁড়াল। প্রেসে যখন চাহিদা অনুযায়ী পত্রিকা ছাপানো যাচ্ছিল না তখন চতুর, সুযোগ সন্ধানীরা বেশি দামে 'মুসাওয়াত'- বিক্রি করতে লাগল। 'কালোবাজারে 'মুসাওয়াত'-এর একটি সংখ্যা বিক্রি হচ্ছিল দশ রুপিতে।' উচ্ছ্বসিত হয়ে আমি বাবাকে জানিয়েছিলাম। সে সময় দশ রুপি পাকিস্তানিদের গড় দৈনিক আয়ের চেয়েও বেশি ছিল। ব্যাপক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর সমাজে, সরকারি বিজ্ঞাপন ছাড়া এবং বিক্রির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও 'মুসাওয়াত'-এর বিপুলসংখ্যক সার্কুলেশন ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৫ জুলাই টেলিফোনে বাবা জানালেন, 'জিয়া আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে।' পরদিন সংবাদপত্রে সেই ছবি ছাপা হলো। ছবিতে বাবাকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল– তার চেহারায় দেশের সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। অন্যদিকে জিয়াকে অপরাধীর মতো দেখাচ্ছিল, তার একহাত বুকের কাছে ভাঁজ করা, চেহারায় তার পোশাকি হাসি। মিটিং-এর পর বাবা আমাদের ফোন করে জানিয়েছিলেন, 'জিয়া আবারও অবাধ নির্বাচন করানোর ব্যাপারে তার সৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছে, নির্বাচনে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সে শুধু একজন নিরপেক্ষ রেফারির দায়িত্ব পালন করবে বলে জানিয়েছে।' জিয়া সততার সাথে নির্বাচন করাবে তা আমাদেরকে জানানোর প্রয়োজন মনে করছে কেন সে? সততা এবং নিরপেক্ষতার প্রশ্নে আমার বাবা জিয়াকে বিশ্বাস করতেন না। আমরাও করতাম না। সামরিক সরকার নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ায় আমার বাবা এবং পিপিপির বিরুদ্ধে যে ব্যাপক বিকারগ্রস্ত প্রচারণা শুরু হয়েছিল– তা বিশ্বাস করা আমাদের জন্যও সহজসাধ্য ছিল না।

অনেক বিষয় ছিল অজানা এবং দুর্বোধ্য। পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করা হলো। ইতোপূর্বের দু'বারের সামরিক শাসনামলেও যা হয়নি। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছিলেন– প্রধানমন্ত্রীর সচিব আফজাল সায়িদ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রাও রশিদ, আমাদের জন্মভূমি লারকানার ডেপুটি কমিশনার খালিদ আহমেদ, শক্তিশালী ৫০০ সদস্যের ফেডারেল সিকিউরিটি ফোর্সের প্রধান মাসুদ মাহমুদসহ আরো অনেকে। রাজনীতিতে সরকারি কর্মকর্তাদের কি কাজ? সরকার কি করতে চাচ্ছে?

সরকারি মিডিয়ায় এক সাক্ষাৎকারে জিয়া বলেন যে, সেনাবাহিনী একটি 'আকস্মিক পরিকল্পনা'য় ক্যু করেছে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে জিয়া স্বীকার করলেন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্যু করা হয়েছে। কাজেই সরকারি কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের বিষয়টি আকস্মিক কোনো সিদ্ধান্ত নয় বরং সেনাবাহিনীর পরিকল্পনার একটি অংশ। এর পিছনে কে ছিল? আমাদের বিরুদ্ধে পত্রিকায় গাঁজাখুরি-মিথ্যা গালগল্প প্রচারের যে পরিকল্পনা সেনাবাহিনী করেছিল তাও ছিল দুর্বোধ্য। জিয়া যদি পক্ষপাতহীন অবাধ নির্বাচনই করে তাহলে এসবের কোনো অর্থ হয় না।

www.pathagar.com

এর মধ্যে সাংবাদিকরা ৭০ ক্লিফটনে ফোন করে আমার বাবা সম্পর্কে, পিপিপি সম্পর্কে, জিয়ার প্রতিশ্রুত নির্বাচন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানতে চাইতো। সংবাদিকদের চায়ের নিমন্ত্রণ দেয়ার পরামর্শ দিলেন বাবা। আমি তাই করলাম। ৭০ ক্লিফটনে আমাদের ডাইনিং রুমে সাংবাদিকদের গাদাগাদি ভিড় দেখে আমি হতবিহ্বল হয়ে পড়লাম। ভিড় এত বেশি ছিল যে এয়ার কন্ডিশনেও কোনো কাজ হচ্ছিল না। সামিয়া এবং তার বোনের পাশাপাশি আমার চাচাতো বোন ফাখরি এবং লালেহ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি সন্ত্রস্ত বোধ করছিলাম। কিন্তু একটি প্রশ্নে আমি পুরোপুরি বিক্ষুব্ধ হলাম।

'এটা কি সত্য যে, নিজের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য মি. ভুট্টো এবং জেনারেল জিয়া পরিকল্পিতভাবে এই ক্যু করেছেন?' চা এবং সমোসা খাওয়ার ফাঁকে এক সাংবাদিক এই প্রশ্ন করলেন।

'অফকোর্স নট' আমি শুধু এটুকুই বলতে পেরেছিলাম, আমার স্মৃতিতে বাবাকে গ্রেফতারের সেই ভয়ঙ্কর রাতের আতঙ্ক এবং অনিশ্চয়তার কথা ভেসে উঠেছিল। কিন্তু পরদিন পিপিপি'র দর্শনার্থীদের কাছে ঘটনাটি জানিয়ে আরো বিস্মিত হলাম এই জেনে যে তখন এটি একটি বহুল প্রচারিত গুজব।

আমাদের সমর্থকদের বিভ্রান্ত করার জন্য এবং সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে জনরোষ প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী এই গুজব ছড়িয়েছে। ওই গুজব এবং আরো অনেক গুজব– যুক্তিতর্ক, সত্য-মিথ্যার তোয়াক্কা না করে গুঞ্জরিত হতে থাকল।

পাকিস্তানের মতো একটি দেশে– যেখানে সাক্ষরতার হার খুবই কম– গুজব এবং বাজারের গালগল্প সত্যের সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়, সেগুলো কতটা যৌক্তিক তা বিবেচ্য নয়– গুজব তার আপন গতিতেই ছড়িয়ে পড়ে– এমনকি শিক্ষিত, উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেও। আমার এক পুরনো সহপাঠী একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে মিটিং রেকর্ড করার জন্য তুমি কি সত্যিই তোমার হ্যান্ডব্যাগে ভিডিও টেপ ক্যামেরা নিয়ে যাও?' আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না– তাকে জিজ্ঞাস করলাম, 'হ্যান্ডব্যাগে ক্যামেরা-ফিল্ম বহন করা কি আদৌ সম্ভব?' আমার সাথে সে একমত হয়ে বলল, 'ওহ, আমি তা মনে করি না। খবরের কাগজে আমি এটা পড়েছি।' সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের দু'সপ্তাহ পর থেকে প্রবল গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টি শুরু হলো। এর জন্যও আমার বাবাকে দায়ী করা হলো। একজন পিপিপি সমর্থক আমাকে বলেছিল, 'মৌলভীরা বলে বেড়াচ্ছে– ভুট্টো সাহেবের কারণেই এই বৃষ্টি হচ্ছে, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রতিশোধস্বরূপ এই বৃষ্টিপাত।' প্রবল বর্ষণে সৃষ্ট বন্যায় মানুষের বাড়িঘর এবং শস্য বিনষ্ট হয়েছিল– এই বন্যার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কিছু লোক সম্ভবত এই গল্প বিশ্বাসও করেছিল। কিন্তু লাহোরের সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় এই গল্প কোনো প্রভাব ফেলেনি। সেখানকার পিপিপি সমর্থক অধ্যুষিত একটি বস্তিতে বন্যা প্রবল আঘাত হেনেছিল।

আমার বাবা বললেন, 'লাহোরে যাও, বন্যায় সেখানে সবকিছু বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে গিয়ে তাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করো।'

আমি লাহোরে যাব? ইতোপূর্বে আমি কখনো কোনো দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নেইনি। ভয়ে আমার পাকস্থলী মোচড় দিয়ে উঠল, বাবা বললেন, 'মুসাওয়াত'-এ তোমার কর্মসূচি ঘোষণা করো এবং শাহকে সঙ্গে নিও।' চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি এবং শাহ লাহোরে

www.pathagar.com

পৌঁছলাম।

বিমানবন্দরে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে শত শত পিপিপি সমর্থক এসেছিলেন। সামরিক নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তারা পিপিপি'র স্লোগান দিচ্ছিলেন যদিও সামরিক আইনের ৫ নং আদেশে উল্লেখ আছে রাজনৈতিক সভা করা বা সভায় যোগদান করলে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড। সমর্থকদের সেই জমায়েত ছিল স্বতস্ফূর্ত, তাদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে অনেক কষ্টে জায়গা করে নিয়ে শাহ এবং আমি গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছলাম। আমার আঠারো বছরের ভাই এবং আমি দু'জনই অভিভূত হয়েছিলাম এই অপ্রত্যাশিত সম্বর্ধনায়। আমরা কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নই, আমরা শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর সন্তান।

বেগম খাকওয়ানি– পাঞ্জাবের মহিলা শাখার প্রেসিডেন্ট– তার বাংলোতে মানুষের ভিড় ছিল আরো বিশাল। বাংলোর বিশাল বাগান এবং রাস্তা জুড়ে মানুষের ঢল। রিসিপশন রুমে মানুষের ভিড়ে শাহ এবং আমি ঘেমে একাকার হলাম, এবং ফটোগ্রাফারদের অবিরাম ক্যামেরার ফ্লাশে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। অভ্যর্থনার মাঝামাঝি সময়ে টেলিফোনে আমার ডাক এলো 'প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোর ফোন', জনতার মধ্যে এই বার্তা গুঞ্জরিত হতে থাকল, 'চেয়ারম্যান ভুট্টো ফোন করেছেন'।

লিভিং রুমে আমার সাথে অনেক মানুষ ছিল। অভ্যর্থনার কথা ভুলে শাহ এবং আমি টেলিফোনে বাবার সঙ্গে কথা বললাম। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কেমন আছো?' বিমানবন্দরে এবং লাহোরে হাজার হাজার মানুষের জামায়েতের কথা বাবাকে যখন বললাম, তিনি খুশি হলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে এই বার্তা পৌঁছে দাও। আমি ফোন ছেড়ে উৎসুক জনতার দিকে ফিরলাম। আমি বললাম 'বন্যায় যাদের বাড়িঘর ও শস্য বিনষ্ট হয়েছে আমার বাবা তাদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।' উর্দু বলতে আমার জড়তা ছিল, 'বন্যা দুর্গত পরিবারদের পিপিপি-এর পক্ষ থেকে রিলিফ দেয়া হবে।' আমার বাবা এবং পিপিপির প্রতি জনসমর্থনের স্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে জিয়া পিএনএ-এর জনসমর্থন প্রদর্শনের পদক্ষেপ নিল। জুলাইয়ের মাঝামাঝি জিয়া ঘোষণা করল– সব দলের বন্দি নেতাদের সঙ্গে দর্শনার্থীরা দেখা করতে পারবে। কিন্তু তার এই চালও ব্যর্থ হলো। মারির প্রধানমন্ত্রীর রেস্ট হাউসে আমার বাবাকে দেখার জন্য প্রতিদিন দর্শনার্থীর ভিড় বাড়তে লাগল। কিন্তু বন্দি বিরোধীদলের নেতাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকাল না। জিয়া তার এই ব্যর্থতা ঢাকার জন্য জন্য শিগগিরই একটি অজুহাত বের করল 'বন্দি নেতারা মানুষের সাথে দেখা করার অধিকারের অপব্যবহার করায় ওই অধিকার বাতিল করা হলো। ১৯ জুলাই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এই ঘোষণা দিল।

অভ্যুত্থানে জিয়া আশানুরূপ ফল পাচ্ছিল না। ঐতিহ্যগতভাবে পাকিস্তানের মানুষ সব সময়ই ক্ষমতাচ্যুত নেতাকে পরিত্যাগ করে সম্ভাব্য বিজয়ী এবং নতুন নেতার প্রতি তাদের সমর্থন জানায়। কিন্তু এটি একটি দৃষ্টান্ত– আমার বাবাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ঘটনায় উল্টো প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আমার বাবাকে পরিত্যাগ করার বদলে তার প্রতি মানুষের সমর্থন এবং আনুগত্য একশগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

অভ্যুত্থানের তিন সপ্তাহ পর জিয়া যখন আমার বাবা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দিল লাখ লাখ, আক্ষরিক অর্থেই লাখ লাখ মানুষ আমার বাবাকে অভ্যর্থনা

www.pathagar.com

জানাতে আসছিল– যখন তিনি পাকিস্তানের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে সফরে যেতেন। পশ্চিমের কোনো জনসমাবেশ কখনোই আকারে এশিয়ান জনসমাবেশের ধারে কাছেও আসতে পারবে না। কিন্তু এশিয়ার বিচারেও আমার বাবার জনসমাবেশে উপচে পড়া ভিড় হতো।

ছাড়া পাওয়ার পর বাবা প্রথমে করাচি এলেন। বিশাল জনতার সমুদ্র ইঞ্চি ইঞ্চি করে পার হয়েছিলেন তিনি। ট্রেন স্টেশন থেকে আমাদের বাড়ি স্বাভাবিক অবস্থায় আধাঘণ্টার পথ। কিন্তু আমার বাবার লেগেছিল দশ ঘণ্টা। তিনি যখন ৭০ ক্লিফটনে পৌঁছলেন– তার গাড়ি ছিল দুমড়ানো–আঁচড়ানো। মানুষের ভিড়ে চাপা পরার ভয়ে আমরা ভাই-বোনেরা সেদিন বাবাকে অভ্যর্থনা জানাতে বাইরে গেটে যেতে পারিনি। তার বদলে আমরা বাড়ি ছাদে গিয়ে তার প্রত্যাবর্তন চাক্ষুস করেছিলাম। ইতোপূর্বে যদিও আমরা উৎসুক জনতার ভিড় দেখেছিলাম কিন্তু এরকম মানুষের ঢল কখনো দেখিনি। অসংখ্য মানুষ তাকে এক নজর দেখার জন্য, একটু ছোঁয়ার জন্য, একটু কাছে আসার জন্য হুড়োহুড়ি করছিল, তাদের ভারে আমাদের বাড়ির বারো ফুট বাউন্ডারি দেয়াল ভেঙে পড়ল।

রাতে আমরা যখন সবাই বাবার বেডরুমে একত্রিত হলাম তখন আমি বললাম, 'ওহ, পাপা তুমি ছাড়া পাওয়ায় আমি খুব খুশি হয়েছি।' বাবা বললেন, 'এটা সাময়িক মুক্তি।' আমি বললাম, 'তোমাকে আবার গ্রেফতার করার সাহস করবে না জিয়া, আজকের মানুষের ভিড় জিয়া দেখেছে।'

বাবা আমাকে সতর্ক করে বললেন, 'এসব বলো না।' তিনি তার আঙুল বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে বোঝালেন যে, ঘরে সম্ভবত আড়িপাতা যন্ত্র রয়েছে।

আমার জেদ চেপে গিয়েছিল আমি উচ্চস্বরে বললাম, 'জিয়া একটা কাপুরুষ এবং প্রতারক। সে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।' মনে মনে চাচ্ছিলাম সে আমার কথাগুলো শুনুক, আমি বোকার মতো ভেবেছিলাম যে, বাবার বিশাল জনসমর্থন তাকে রক্ষা করবে।

বাবা ধমকের সুরে বললেন, 'তুমি বেপরোয়া হয়ে উঠছ, তুমি এখন পশ্চিমা গণতন্ত্রে বাস করছ না, তুমি সামরিক শাসনে বাস করছ।'

আমরা যখন সপরিবার বাবার সঙ্গে লারকানা সফরে গেলাম তখন সামরিক শাসনের অশুভ ছায়া আরও গাঢ় হলো। এখানেও বাবাকে স্বাগত জানাতে জনতার বাঁধভাঙা ঢল নেমেছিল– যা আমার মধ্যে আবারও ভ্রান্ত নিরাপত্তা বোধ জাগিয়েছিল এবং বাবার সঙ্গ আমার আনন্দ বাড়িয়ে দিয়েছিল। আল-মুর্তাজায় আমার মা-বাবার বেডরুমে যখন আমরা সাবাই একত্রিত হলাম তখন সবকিছুই পরিচিত এবং স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। কিন্তু কিছুই স্বাভাবিক ছিল না। ইসলামাবাদ থেকে একজন সিনিয়র আমলার একটা বার্তা নিয়ে এলেন বাবার একজন আত্মীয়, ওই আমলা জানিয়েছিলেন, সামরিক জান্তা বাবাকে একটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

হত্যা? ঘরের মধ্যে একটি শীতল পরশ বয়ে গেল। নিঃশব্দে বাবা-মা নিজেদের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি বিনিময় করলেন। বাবা মা'কে বললেন, 'তুমি ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য বিদেশে স্কুলে পাঠানোর প্রস্তুতি নেও। তাদের সমস্ত কাগজপত্র, ব্যাংকের বই যেন ঠিক থাকে। আল্লাহই জানেন কি হবে।' বাবার কথায় মা সম্মতি জানালেন। বাবা আমার দিকে ফিরে বললেন, 'পিংকি, তুমিও কিছুদিনের জন্য পাকিস্তানের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটি ভেবে দেখো। এখনকার পরিস্থিতি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত তুমি ইচ্ছে করলে

www.pathagar.com

বিদেশে অন্য কোনো বিষয়ে গ্রাজুয়েট কোর্স করতে পার।' ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে আমি বাবার দিকে তাকালাম। সবেমাত্র বাড়িতে এসেছি। এখনই আবার পাকিস্তান ছেড়ে যেতে হবে?

'চাকর-বাকরাও সমস্যায় পড়তে পারে।' বাবা বলে চললেন, 'সামরিক শাসনে কেউ-ই নিরাপদ নয়।' বাবা সকালে সব কর্মচারীকে ডেকে বললেন, 'তোমাদের সকলকেই বিপদে পড়তে হতে পারে, তোমরা ইচ্ছে করলে এখনই কাজ ছেড়ে গ্রামে চলে যেতে পার। সমস্যা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানেই থাকো। আমি বুঝতে পারছি জেনারেল জিয়ার শাসনে আমি তোমাদের নিরাপত্তা দিতে পারব না।' কোনো কর্মচারীই যেতে রাজি হলেন না এবং আমিও না। বাবা লাহোরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

জিয়ো ভুট্টো। জিয়ো, ভুট্টো! স্লোগান ধ্বনিত হচ্ছিল পাঞ্জাবের রাজধানী লাহারের বিশাল জনসমুদ্র থেকে। সেনাবাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি লাহোরে সেদিন প্রায় ত্রিশ লাখ মানুষের সমাবেশ হয়েছিল। পাকিস্তানে সর্বকালের বৃহৎ জনসমাবেশ। আমার বাবার রাজনৈতিক সমর্থন নস্যাৎ করার কোনো উপায় ছিল না জেনারেল জিয়ার। লাহোরে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বাবা অবস্থান করছিলেন সেখানে একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা বাবাকে দ্বিতীয় একটি বার্তা দেন। 'স্যার, জেনারেল জিয়া এবং সেনাবাহিনী আপনাকে হত্যা করতে বদ্ধ পরিকর। তারা আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা খুনের মামলা করার জন্য গ্রেফতারকৃত সরকারি কর্মকর্তাদের নির্যাতন করছে।' কথাগুলো বলার সময় গোয়েন্দা কর্মকর্তাটি শিউরে উঠছিলেন। তিনি বাবাকে অনুরোধ করলেন, 'আল্লাহর দোহাই, আপনি দেশে ছেড়ে চলে যান, স্যার। আপনার জীবন ঝুঁকিপূর্ণ।' হুমকি এবং সন্ত্রাসী কৌশলে ভীত হওয়ার পাত্র ছিলেন না আমার বাবা। এই বার্তা পাওয়ার পর ওই রাতে বাড়িতে ফোন করে বাবা শুধু এইটুকুই আভাস দিয়েছিলেন যে, তিনি আর বেশিদিন মুক্ত থাকবেন না। তিনি ৭০ ক্লিফটনে ফিরে আসার পর বিরামহীন রাজনৈতিক মিটিং চলতে থাকল। ১৮ অক্টোবর জিয়া নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে এবং ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে একমাসের জন্য নির্বাচনী প্রচারণার অনুমতি দিয়েছে। নিচতলায় বাবা যখন দলীয় নেতাদের সঙ্গে মিটিং করতেন আমি তখন দোতলায় ডাইনিং রুমে উর্দু শিখতাম। আমার বাবা আমাকে বলেছিলেন, ' তোমার উর্দু চর্চা করার প্রয়োজন আছে। আমার হয়ে কথা বলার জন্য তোমাকে দরকার হতে পারে।' আগস্টে প্রতিদিন দু'ঘণ্টা করে গৃহশিক্ষকের কাছে গভীর মনোযোগ সহকারে উর্দু সংবাদপত্র পড়তাম এবং উর্দুতে রাজনৈতিক শব্দাবলী আয়ত্ব করতাম। বাবা মিটিং-এর মাঝে দোতালায় উঠে ডাইনিং রুমের দরজায় এসে শিক্ষককে জিজ্ঞেস করতেন, 'কেমন শিখছে আপনার ছাত্রী?'

আগস্টের শেষের দিকে আমি বাবার সঙ্গে রাওয়ালপিণ্ডি গেলাম। করাচি এবং লারকানা সফরের সময় ট্রেন স্টেশনে বাবাকে অভ্যর্থনা জানাতে যে বিশাল জনসমাগম হয়েছিল তা প্রতিহত করতে– রাজনৈতিক নেতাদের ট্রেনে ভ্রমণের উপর সামরিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল জিয়া। রাওয়ালপিণ্ডিতে জিয়া বাড়তি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়েছিল। বিমানবন্দরে প্রবেশের সকল রাস্তা বন্ধ করতে সামরিক টহল জোরদার করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহুলোক কৌশলে সকল প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়েছিল। বিমান বন্দরের রাস্তায় বাবার গাড়ি ঘিরে হাজার হাজার মানুষের দীর্ঘ লাইন হয়েছিল।

www.pathagar.com

রাওয়ালপিণ্ডিতে স্বতস্ফূর্ত জনতার ভিড় যখন আমাদের গাড়ি ঘিরে ফেলেছিল– সেই সময় করাচিতে পিপিপি সমর্থক একজন সাংবাদিক– বশির রিয়াজ- আমার মাকে বাবা সম্পর্কে আরও একটি হুমকির বিষয়ে জানাচ্ছিলেন।

'আমি মিনতী করছি, আপনি ভুট্টো সাহেবকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলুন।' জিয়ার একজন বিশ্বস্ত সহযোগী– যিনি আমারও বন্ধু– বলেছিলেন যে, 'ভুট্টো সাহেবের আর কোনো আশা নেই, তিনি আর কোনোদিনই ক্ষমতায় আসতে পারবেন না।' সে আমাকে আরও বলেছিল, 'হত্যা মামলায় ভুট্টো সাহেবকে ফাঁসি ঝোলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিয়া'। তিনি তার পক্ষাবলম্বন করার জন্য আমাকে যে কোনো মূল্যের ব্লাংক চেক দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি।

এদিকে জিয়া তার নিয়ন্ত্রণের ফাঁস শক্ত করছিল, প্রথমবারের মতো আমার প্রতি তার নিয়ন্ত্রণের হাত প্রসারিত করলেন। পরদিন আমি চায়ের দাওয়াতে গেলাম খোখার পরিবারে- পিপিপির সমর্থক একটি বড় পরিবার। প্রায় একশ' মহিলা সেখানে সমবেত হয়েছিল। খোখারের তিন বোন আমাকে অুনরাধ করল, 'এদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।' তিন বোনের মধ্যে দু'জন পিপিপি কর্মকর্তা এবং তৃতীয় বোন– আবিদা- প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আমার মায়ের সেক্রেটারিদের একজন ছিল। উপস্থিত মহিলাদের আমি বললাম, 'হওসলা রাকখো। গভীর আন্তরিকতায় শেখা উর্দুতে সেদিন আমি দুই মিনিট বক্তব্য দিয়েছিলাম। আমি তাদের বলেছিলাম– 'আপনাদের মনোবল অটুট রাখুন।' যখন ফিরে আসছিলাম তখন গেটের বাইরে পুলিশের বড় একটি বাহিনী দেখে আমি বিস্মিত হলাম। সেখানে মহিলা পুলিশও ছিল। খোখারের একবোন আমাকে জানালো, 'আপনার জন্যই তারা এখানে এসেছে।'

পরে ওই রাতেই আমি আরও বিস্মিত হলাম যখন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়ার তরফ থেকে আমাকে নোটিশ দেওয়া হলো– আমার যতদূর মনে পড়ে জেনারেল আরিফ ওই নোটিশে স্বাক্ষর করেছিল। আমাকে রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করার জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। সামরিক শাসন জারি করার দেড় মাস পর জিয়ার তরফ থেকে আমি প্রথম সরকারি নোটিশ পেলাম। কিন্তু বিষয়টি আমি মোটেও গুরুত্বের সাথে নেইনি। আমি হাসতে হাসতে বাবার বেডরুমে ঢুকে বললাম, 'ভাবতে পারো বাবা, একটা চায়ের দাওয়াতে উপস্থিত হওয়ায় তারা আমাকে সামরিক শাসনের জন্য হুমকি বলে বিবেচনা করছে।' বাবা শান্তভাবে বললেন, 'এটা হাসির ব্যাপার নয়, মার্শাল'ল মারাত্মক এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়।'

মারাত্মক এই বিষয়টি ক্রমেই তীব্রতর হতে থাকল। অন্যদিকে সে সময় সকলেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে বাবার পাকিস্তান পিপলস পার্টিকে পরাস্ত করতে পারবে না বিরোধীরা। নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হওয়ার দু'সপ্তাহ আগে বাবাকে পুনরায় গ্রেফতার করার জন্য এজেন্ট পাঠালো জিয়া।

সেপ্টেম্বর ৩, ভোর ৪টা, ৭০ ক্লিফটন, করাচি।

আমার বেডরুমে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, হঠাৎ সিঁড়িতে লঘু পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। তখন ছিল রমযান মাস– ভাবলাম কোনো গৃহকর্মী হয়তো আমার জন্য সেহরি নিয়ে

www.pathagar.com

আসছে। কিন্তু না, কোনো গৃহকর্মী নয় পাঁচ জন সাদা পোশাকের লোক আচমকা আমার ঘরের দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তাদের ক্রু কাট চুল এবং শক্তিশালী দৈহিক গড়ণ দেখে আমি তৎক্ষণাৎ তাদের সেনাবাহিনীর কমান্ডো হিসেবে চিনেছিলাম। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ডিউটিরত অবস্থায় আমি তাদের বহুবার দেখেছি। কিন্তু তারা সাদা পোশাকে কেন? ৬ষ্ঠ কমান্ডো কামরায় ঢোকার পর পরই তারা আমার দিকে মেশিনগান তাক করল।

৬ষ্ঠ কমান্ডোটি আমার ঘরের মধ্যে তছনছ শুরু করল, আমার ড্রেসিং টেবিলের সমস্ত জিনিস ছুঁড়ে ফেলল, হুক থেকে আমার কাপড়-চোপড় টেনে-হিঁচড়ে ফেলে দিল, বুক সেলফ থেকে বইপত্র ছুঁড়ে ফেলল, আমার টেবিল ল্যাম্পটি গুড়িয়ে দিল এবং আমার বিছানার কাছের টেলিফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল। ভয়ার্ত কণ্ঠে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কি চাও?' মুসলিম মহিলার ঘরে এভাবে কেউ অনুপ্রবেশ করে না। তাদের দলনেতা আমাকে বলল, 'বাঁচতে চাইলে চুপ করে থাকো।' আমার ঘরটাকে ধ্বংসস্তূপ করে দলটি দরজার দিকে এগুলো। 'তোমরা কি আমার বাবাকে খুন করতে যাচ্ছো?' ষষ্ঠ লোকটিকে আমি প্রশ্ন করলাম। ক্ষণিকের জন্য মনে হলো আমার প্রতি তার দয়া হলো, একটু ইতস্তত করে সে উত্তর দিল, 'না'। তার চেহারা আবারও কঠোর হয়ে উঠল, 'যদি নিজের ভালো চাও তাহলে নড়াচড়া করো না।' আমার দিক পিস্তল উঁচিয়ে কমান্ডোটি বলল এবং আমার ঘরের দরজা জোরে ধাক্কা দিয়ে অন্যদের সাথে বেরিয়ে গেল। মেঝের স্তূপ থেকে টান দিয়ে একটা কাপড় তুলে নিয়ে দ্রুত টি-শার্টের উপর চালালাম। আমার বোন আতঙ্কিত হয়ে আমার কাছে ছুটে এলো, সনম আর্তনাদ করে বলল, 'যেয়ো না, যেয়ো না, কোথায় যাচ্ছ তুমি? তারা আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে।'

'চুপ করো', আমি তাকে ধমক দিলাম। 'আমাকে বাবার কাছে যেতে হবে।'

আমি দ্রুত রুম থেকে বের হলাম, সনম আমার পিছু নিল। দেখলাম হলরুমে আর্মি কমান্ডোরা তাদের রাইফেল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে– প্রত্যেকেই সাদা পোশাকে। সিঁড়ি দিয়ে রিসিপশন হলে নামার সময় তারা আমাদের দেখতে পেল। রিসিপশন হলে কমান্ডোদের সংখ্যা আরো বেশি। আমি ফ্রন্টডোর খুলে কম্পাউন্ডের ওপারে এনেক্স বিল্ডিং-এ যেতে চাচ্ছিলাম– সেখানে আমার ভাইরা থাকে– কিন্তু কমান্ডোরা আমাকে ঘিরে ফেলল এবং বন্দুকের নলে আমাদের দু'বোনকে সোফায় বসতে বাধ্য করল। ঘরে ঢোকার প্রতিটি দরজায় দু'জন করে কমান্ডোকে দাঁড়ানোর জন্য আদেশ দেওয়া হলো– তাদের বন্দুকগুলো ছিল উত্তোলিত।

আমার বাবার কাছে আমাকে যেতে হবে, তার জীবন হুমকির সম্মুখীন, আমি অবশ্যই তার কাছে পৌঁছব। আর্মি কমান্ডোরা আমাদের বাড়িতে হামলা চালানোর জন্য মধ্যরাত বেছে নিয়েছিল এবং তারা এসেছিল বিনা উর্দিতে। এসবের কোনো প্রয়োজনই ছিল না। গ্রেফতারি পরোয়ানা কিংবা সামরিক আদেশ বলে বাবাকে যে কোনো সময় শান্তভাবেই গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা আমাদের আতঙ্কিত এবং অপমানিত করার চেষ্টা করে। আসলে তারা কি করতে চেয়েছিল? সম্ভবত তারা যা করতে চেয়েছিল সে কাজটি তারা সেদিন করতে পারেনি। কারণ তারা চায়নি মানুষ জানুক আমার বাবাকে তারা কি করেছে। কিন্তু আমিও দৃঢ় সঙ্কল্প ছিলাম আমি থাকতে তারা আমার বাবার কিছু করতে পারবে না।

www.pathagar.com

কিচেনের দরজায় দাঁড়ানো দু'জনকে আমি উর্দুতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেয়া আপ ফৌজি হ্যায় (আপারা কি সৈন্য)?' তারা একে অপরের দিকে তাকালো কিন্তু সামরিক শৃঙ্খলার কারণে তারা কোনো উত্তর দিল না। আমি গভীর শ্বাস নিয়ে আমার বোনকে উচ্চস্বরে উর্দুতে বললাম, 'এই সৈন্যগুলোর দিকে দেখো, তারা এত বেশরম-নির্লজ্জ কেমন করে হতে পারে? যে প্রধানমন্ত্রী জুলিফকার আলি ভুট্টো তাদেরকে ভারতের বন্দিশালা থেকে উদ্ধার করে এনেছে সেই প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে জোরপূর্বক অনুপ্রবেশ করে, সেখানকার পবিত্রতা বিনষ্ট করে তারই প্রতিদান দিচ্ছে। অথচ তাদের জেনারেলরা তাদেরকে ভারতের বন্দিশিবিরে পঁচে মরার জন্য ছেড়ে এসেছিল।'

আমি বাঁকা চোখে তাকিয়ে লক্ষ্য করলাম লোকগুলো বিচলিতভাবে একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে। তাদের একজন জিজ্ঞেস করল, 'ইয়ে কিস কা ঘার হ্যায়' এটা কার বাড়ি? আমি হঠাৎ করেই অনুধাবন করলাম এদের মধ্যে অনেকেই এটাও জানে না– তারা কোথায় এবং কেন এসেছে? আমি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, ' তোমরা কি জানো না জোরপূর্বক তোমরা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে অনুপ্রবেশ করেছ?' অপ্রতীভ হয়ে তারা তাদের রাইফেলগুলো নিচু করল। আমি ঝড়ের গতিতে সিঁড়ি টপকে বাবার ঘরে গেলাম এখন আর কেউ আমাকে থামালো না।

বিছানার এক পাশে বাবা বসেছিলেন, আমার মা তখনও বালিশে মাথা দিয়ে শোয়া, তার চিবুক পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা। তার কানের প্লাগ হাতে ধরা- বাবা রাতে দেরি করে ফিরলে তার যাতে ঘুমের ব্যাঘাত না হয় সেজন্য তিনি কানে গোজার ইয়ার প্লাগ খুলে রাখতেন। কমান্ডোরা অস্ত্র নামিয়ে তাদের ঘিরে রেখেছিল। যে লোকটি আমার ঘরে তছনছ করেছিল এখন সে বাবার ঘরে নেচে বেড়াচ্ছে, বাবার বেডরুমের দরজায় আড়াআড়ি করে ঝুলানো দুটি আনুষ্ঠানিক তরবারী নিয়ে লড়াইয়ের মহরা দিচ্ছিল। আমি ঘরে ঢুকলে বাবা শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এখানে কি করছ?' আমার বাবার কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর কখনোই তার গাম্ভীর্য হারাতো না, বাবার প্রশ্নে লোকটি তখনই থেমে গেল।

আমার বাবা উঠে এসে আমাকে তার পাশে বসালেন। একজন মোটা গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক আমার মায়ের সাদা ও নীল কারুকাজ করা নরম লুইস-১৫ চেয়ারে অলসভাবে বসে ছিল। আমি ফিসফিস করে বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ইনি কে?' 'সগির আনোয়ার, ফেডারেল ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সির পরিচালক' বাবা আমাকে বললেন। এফআইএ পরিচালককে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কাছে কি গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে?' লোকটি কার্পেটের দিকে তাকিয়ে অভদ্রের মতো উত্তর দিলেন 'না'। বাবা আবারও জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে কোনো অভিযোগে আপনি আমাকে আমার বাড়ি থেকে নিয়ে যাচ্ছেন?' আনোয়ার বলল, 'আপনাকে মিলিটারি হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়ার আদেশ পালন করছি আমি।' বাবা প্রশ্ন করলেন, 'কার আদেশ?' 'জেনারেল জিয়ার'। লোকটি উত্তর দিল।

বাবা অনুত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'এই সময়ে আমি আপনাকে প্রত্যাশা করিনি, আমার তৈরি হতে আধাঘণ্টা লাগবে, কাপড়-চোপড় গুছানোর জন্য আমার ভ্যালেটকে ডেকে পাঠান। সগির আনোয়ার তা প্রত্যাখ্যান করে বলল যে, প্রধানমন্ত্রীর সাথে কারো দেখা করার অনুমতি নেই। 'উর্সকে ডেকে পাঠান'। আমার বাবা শান্ত কণ্ঠে আবারও বললেন। আনোয়ার একজন কমান্ডোকে পাঠালো।

আমি পরে দেখলাম– অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে উর্সকেও বন্দুকের নলে কোর্ট ইয়ার্ডে

জড়ো করেছে কমান্ডোরা। কমান্ডোরা তাদেরকে পিস্তল নেড়ে ইংরেজিতে আদেশ করছিল, 'বি কোয়াইট', হ্যান্ডস বিহাইন্ড ইওর ব্যাকস!' বিবেকের পাশাপাশি তাদের বুদ্ধিও লোপ পেয়েছিল। যে কমান্ডোটিকে ঘর থেকে পাঠানো হয়েছিল সে জিজ্ঞেস করল, 'হু ইজ উর্স?' উর্স উত্তর দিল, 'আই অ্যাম', কথা বলার জন্য পিস্তলের বাঁট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করল কমান্ডো। হাস্যকরভাবে কমান্ডোটি পুনরায় লাইনের প্রত্যেক কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করতে লাগল– সে উর্স কি না। বেশ কয়েকজন কর্মচারী তাদের মাথা নাড়ানোর পর সে উর্সের কাছে এলো– ইতোমধ্যে সে শিখেছিল মাথা নেড়ে উত্তর দিতে হবে। তার গলা ও পা ধরে ঝুলিয়ে কমান্ডোরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে এলো। বন্দুকের নলে সে আমার বাবার কাপড়-চোপড় ব্যাগে গুছিয়ে দিল। যখন সে আমার বাবার ব্যাগগুলো অপেক্ষারত মার্কিংবিহীন গাড়িতে তুলে দিতে গেল তখন ছয়জন কমান্ডো তার মাথা এবং বুক লক্ষ্য করে তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ধরে ছিল।

উপরতলায় বাবা গোসল করে পোশাক পড়লেন। আমি তার স্থৈর্য দেখে অবাক হচ্ছিলাম। সে সময় আমাদের পুরো বাড়িতে সশস্ত্র সৈন্যের ভিড়ে বাবার স্থৈর্যকে এক বিশাল শক্তিশালী অস্ত্র মনে হচ্ছিল। আমি যখন বাবার সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিলাম তখন একজন কমান্ডো আমাকে বলল, 'পিছনে থাকো।' আমি তার কথায় ভ্রূক্ষেপ করলাম না। তারা আমাকে যেতে দিল।

নিচতলায় আমার বোন সনম এবং বাবা দৃষ্টি বিনিময় করলেন। বাবাকে যখন গাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল আমার লাজুক বোনটি বাবার বন্দিকর্তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, 'তুমি একটা নির্লজ্জ কাপুরুষ, তুমি একটা নির্লজ্জ কাপুরুষ।'

আবারও আমি আমার বাবাকে নিয়ে যেতে দেখলাম তাকে কোথায় নিয়ে গেল জানি না, আমি কি আর কোনোদিন তার দেখা পাব– তাও জানি না। এক মুহূর্তের জন্য আমি টলে উঠলাম– আমার অর্ধেক হৃদয় ভেঙে চৌচির– বাকি অর্ধেক জমে যাচ্ছিল। 'পিংকি'– আমি যেন কার ডাক শুনতে পেলাম। ফিরে তাকিয়ে দেখি কোর্ট ইয়ার্ডে সব কর্মচারীদের সাথে আমার ভাই শাহ নওয়াজকে দাঁড় করানো হয়েছে। যে সৈন্যটি তাকে ধরেছিল আমি তাকে চিৎকার করে বললাম– 'উসকো ছোড়ো'– ওকে ছেড়ে দাও। আমি আমার নতুন কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে উঠেছিলাম। তবে সৈন্যটি পিছিয়ে গেল।

বাড়ির ভেতরে এসে দেখলাম আমার মায়ের চেহারা সাদা চকের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তার রক্তচাপ আরো নেমে গেছে। শাহ্ নাওয়াজ, সনম এবং আমি রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক করার জন্য তার পায়ের তালুতে ম্যাসাজ করতে লাগলাম। আমি ডাক্তারকে ফোন করার চেষ্টা করলাম কিন্তু ফোন লাইন বিচ্ছিন্ন। আমি গেটের প্রহরীকে অনুরোধ করলাম আমার মা'কে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দিতে কিন্তু এখানেও কোনো কাজ হলো না। আমাদের মেজর ডোমো সকালে যখন ৭০ ক্লিফটনে পৌঁছলেন কেবল তখনই তিনি একজন সিন্ধি গার্ডের সহানুভূতি অর্জন করে তার কাছ থেকে পুরো বৃত্তান্ত জানতে পারেন– এর আগে বাবার গ্রেফতারের ঘটনা কেউ-ই জানতে পারেনি। দোস্ত মোহাম্মদ তার মোটর স্কুটার নিয়ে করাচি শহরে কয়েক ঘণ্টা ধরে ঘুরে দলীয় নেতাদের, আল-মুর্তাজায় আমার ভাই মীর, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, মিডিয়া এবং আমার মায়ের ডাক্তারকে বাবার গ্রেফতারের ঘটনা জানিয়ে সতর্ক করে দেন। কিন্তু আমার মায়ের ডাক্তার ডা. আশরাফ আব্বাসী যখন বাড়ির গেটে এলেন তাকে ঢুকতে

www.pathagar.com

দেওয়া হলো না। অবশেষে দুপুরে সামরিক জান্তা অনুমোদিত একজন ডাক্তার এলেন এবং মা'কে ইনজেকশন দিলেন– যা তার জন্য ছিল অত্যন্ত জরুরি।

বিকেলে সেনাবাহিনীর একজন কর্নেল এলেন। পরনে তার যুদ্ধের পোশাক। তার সবুজ-বাদামী শার্টের উপর নাম লেখা ছিল– ফারুক। তিনি একটি সাদা কাগজ নিয়ে এসেছিলেন। কর্নেল আমাকে বললেন, 'প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়া এই কাগজে আপনাকে এবং আপনার মাকে স্বাক্ষর করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি প্রত্যাখ্যান করলাম। কর্নেল আমাকে হুমকি দিল, 'আমি তোমাকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেব।' তার ছোট গোল চোখ দুটো আরো সঙ্কুচিত হলো, তার ছোট মুখ আরো হিংস্র হয়ে উঠল। আমি আমার নতুন কণ্ঠস্বরে তাকে বললাম, 'তুমি আমাকে মেরে ফেললেও আমাকে দিয়ে স্বাক্ষর করাতে পারবে না। তোমার জেনারেল জিয়াও তা পারবে না।'

'তুমি তোমার ভালোটা বুঝলে না।' স্পষ্ট এবং শীতল কণ্ঠে কর্নেল কথাগুলো বলে ফিরে গেল। অবশেষে বিকেল ৫টায় আমাদের বাড়ি থেকে সৈন্য তুলে নেয়া হলো। শাহ নাওয়াজ এবং আমি তৎক্ষণাৎ পিপিপি দলীয় কার্যালয়ে ছুটে গেলাম। সেখানে বেশ কিছু দলীয় কর্মকর্তার মধ্যে আতঙ্ক চেপে বসেছিল। দলের কিছু সদস্য যখন বাবার গ্রেফতারির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ, ধর্মঘট এবং অন্যান্য কর্মসূচির প্রস্তাব দিচ্ছিল তখন অন্য শীর্ষ নেতারা আমার বাবার সাথে যোগাযোগ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরামর্শ দিচ্ছিলেন– বাবার সাথে যোগাযোগ? তাতে কত সময় লাগবে তা কে জানে?

পরদিন আমার মা যে খবরটি পেলেন তা আরো খারাপ। তিনি বাবার আইনজীবীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। বাবাকে যে গোপন হুঁশিয়ারিগুলো দেয়া হয়েছিল– তা-ই সত্য হলো। আমার বাবার বিরুদ্ধে 'হত্যার ষড়যন্ত্র'-এর অভিযোগ আনা হয়েছে। হত্যা? আমি এও জানি না– কাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনা হয়েছে বাবার বিরুদ্ধে?

আমার মা আমাকে পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন, একজন সাধারণ রাজনীতিবিদ– আহমেদ রাজা কাসুরি– যিনি এখনও বহাল তবিয়তেই আছেন। তিন বছর পূর্বে কোনো এক ভ্রমণের সময় লাহোরের কাছে কে বা কারা কাসুরি এবং তার পরিবারের সদস্যদের গাড়িতে হামলা চালায়– ওই হামলায় কাসুরির বাবা- একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজিস্ট্রেট– মারা যান। পিপিপি-র টিকেটে বিজয়ী ন্যাশনাল এসেম্বলির সদস্য কাসুরি সে সময় দাবি করেছিল– তাকে লক্ষ্য করেই হামলা চালানো হয়েছিল। পরে ওই রাজনীতিবিদি বিরোধীদলে যোগ দিয়েছিল। তার অনেকে শত্রু আছে এটা সবাই জানে। শোনা যায়, যদিও অবিশ্বাস্য, পনেরো বার তার উপর প্রাণনাশক হামলা হলেও প্রতিবারই সে বেঁচে গেছে। সর্বশেষ হামলার সঙ্গে আমার বাবা জড়িত– এমন সন্দেহ পোষণ করে পুলিশে রিপোর্ট করেছে। সেই সময় গণতান্ত্রিক পাকিস্তানে এমনই স্বাধীনতা ছিল যে, পুলিশ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও রিপোর্ট দাখিল করত। হাইকোর্টের তদন্তে ওই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বাবার কোনো সম্পর্ক নেই উল্লেখ করে অভিযোগ থেকে আদালত তাকে অব্যাহতি দিয়েছিল এবং ওই দুঃখজনক ঘটনা সবাই ভুলে গিয়েছিল– ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত।

কাসুরি পুনরায় পিপিপিতে যোগ দিয়েছিল এবং মার্চের পার্লামেন্ট নির্বাচনে পিপিপির মনোনয়ন পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিল। কিন্তু পিপিপি কাসুরির পরিবর্তে অন্য কাউকে মনোনয়ন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এতে কাসুরি ক্ষুব্ধ হয়ে আমার বাবার বিরুদ্ধে নতুন নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হওয়ার দু'সপ্তাহ আগে পুনরায় মামলা দায়ের করেছিল। আমার

www.pathagar.com

বাবার পুরনো মামলার অজুহাতে জিয়া তাকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু জিয়ার এই কৌশলও উল্টো হলো।

গ্রেফতারের দশদিন পর বাবার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার বিষয়বস্তু পরস্পরবিরোধী এবং অসম্পূর্ণ বলে প্রতীয়মান হলো বিচারকের কাছে এবং আমার বাবাকে অপরাধী ভাবার কোনো কারণ খুঁজে না পাওয়ায় বিচারক তাকে জামিনে মুক্তি দিলেন। আবারও আমি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে উঠলাম। জিয়া সাংবাদিকদের সামনে মন্তব্য করল, 'সিভিল কোর্ট যদি প্রধানমন্ত্রীকে মুক্তি দেয় তাহলে তাকে সামরিক আদেশে আটকে রাখার কোনো কারণ দেখি না আমি।'

১৩ সেপ্টেম্বর ছাড়া পাওয়ার পর বাবা সোজা করাচির বাড়িতে চলে আসেন। পরদিন সকালে ছোট ভাই শাহ নাওয়াজকে নিয়ে লারকানায় যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন। লারকানায় আমার ভাই মীরের সঙ্গে ঈদ পালন করাই তার উদ্দেশ্য। সে সময় বাবার উপর প্রচণ্ড চাপ। প্রচারণা শুরু হওয়ার মাত্র পাঁচ দিন বাকি এবং প্রচারণার ত্রিশ দিনে নব্বইটি জনসভা করার সময়সূচি তৈরি করা হয়েছে। বরাবরের মতো রাতে আমরা বাবার বেডরুমে সমবেত হলাম– সেদিন অপ্রত্যাশিত একটি বিষয়ে আলোচনা শুরু হলো।

'শুনছো নুসরাত, পিংকির বিয়ের সময় হয়ে গেছে।' আমার বাবা বিছানায় শুয়ে সিগার ফুঁকতে ফুঁকতে অকস্মাৎ বললেন, 'আমি ওর জন্য পাত্র দেখছি'।

আমি সোজা কাউচের উপর বসে পড়লাম, মেঝেতে আমার মায়ের পেসেন্স খেলা অল্পের জন্য ভণ্ডুল করে দিয়েছিলাম প্রায়।

'আমি বিয়ে করব না।' আমি প্রতিবাদ করলাম, 'আমি সবেমাত্র বাড়ি ফিরেছি।'

সনম, এবং শাহ ছেলেবেলার মতো উত্ত্যক্ত করার মোক্ষম সুযোগটা লুফে নিল। তারা একসাথে বলতে লাগল, 'তোমাকে বিয়ে করতে হবে। তোমাকে বিয়ে করতে হবে।'

আমার বাবা বলতে লাগলেন, 'সত্যি বলতে, আমি একটি ছেলেকে পছন্দও করেছি।

আমার মা হাসলেন। সম্ভবত তারা আমার বিয়ের পরিকল্পনা সেরে ফেলেছেন।

আমি বিদ্রোহাত্মক ভঙ্গিতে বললাম, 'আমি এখনই বিয়ে করব না, এবং তোমরা আমাকে রাজি করাতে পারবে না।'

বাবা বললেন, 'তুমি তোমার বাবার কথায় অমত করতে পারবে না।' শাহ এবং সনম এই কথা এক সাথে পুনরাবৃত্তি করতে থাকল।

'না, না, না' আমি বললাম, সেই মুহূর্তে বাবার লেটনাইট ডিনার ট্রলি আসায় আমি রক্ষা পেলাম। আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। কিন্তু নতুন আলোচ্য বিষয়টি ছিল আরো ভীতিকর।

বাবা খেতে খেতে বললেন, 'একজন পিপিপি নেতা আজ আমাকে বলেছে, জিয়া আমাকে ছাড়বে না, আমার পালিয়ে যাওয়া উচিৎ। আর সে নিজে পালিয়ে যাওয়ার জন্য আমার কাছে টাকা চেয়েছে। আমি তাকে বলেছি– তুমি যেতে চাইলে যাও, কিন্তু আমি ইঁদুরের মতো ভয়ে পালাবো না। আমি এখানে থেকেই জিয়ার মুখোমুখি হবো।'

আমি উচ্চস্বরে বললাম, 'তুমি নির্বাচনে জিতে জিয়ার চরম বিশ্বাসঘাতকতার বিচার করবে।'

বাবা আমাকে সতর্ক করে বললেন, 'বি কেয়ারফুল, পিংকি।' ইশারায় আবারও ঘরে আড়িপাতা যন্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু বাবাকে কারামুক্ত এবং বাড়িতে পেয়ে

www.pathagar.com

আমার মানসিক প্রশান্তির অতিশয্যে সব সতর্কতা ভুলে গিয়েছিলাম। বাবা রেগে যাওয়া পর্যন্ত আমি জিয়ার প্রতারণা সম্পর্কে নিন্দা করেই যাচ্ছিলাম।

বাবা আমাকে কড়া ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ করো, তুমি নিজেই জানো না তুমি কি বলছো।'

আমরা দু'জনে দু'জনার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম কিছুক্ষণ। তারপর ক্ষোভে-দুঃখে আমি ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

আমি এখন বুঝি যে, তিনি জানতেন– পরিস্থিতি কতটা খারাপের দিকে যাচ্ছিল। শুরু থেকেই তিনি বাস্তবতা দেখতে পেরেছিলেন– যা আমি মানতে চাইনি। জেনারেল জিয়া কতটা ক্রূর তা তিনি জানতেন এবং আমাকে উস্কানিমূলক বক্তব্য দেয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতেন। কিন্তু আমি এতই একরোখা ছিলাম যে তা বুঝতাম না। লারকানা যাওয়ার আগে বাবা আমাকে এ বিষয়ে সজাগ করেছিলেন– এজন্য আল্লাহর কাছে আমি যে কতবার শুকরিয়া আদায় করেছি তার ইয়ত্তা নেই।

আমার বিছানার পাশে বসে বাবা আমাকে বলেছিলেন, 'গতরাতে আমি তোমাকে যা বলেছি তার জন্য মন খারাপ করো না। আমি চাই না তোমার কোনো ক্ষতি হোক।' তিনি আমাকে তার বাহুবন্ধনে ধরে রেখেছিলেন।

'আমি বুঝি বাবা, এবং আমার আচরণের জন্য আমিও দুঃখিত বাবা।' আমি তাকে বললাম এবং তাকে চুমু দিয়ে বিদায় জানালাম। সেই মুহূর্তের দৃশ্য এখনও স্পষ্ট আমি দেখতে পাই– বাবা গ্রে সালোয়ার-কামিজ পরেছিলেন এবং শালিমার সেন্ট মেখেছিলেন। সেটাই ছিল বাবাকে মুক্ত অবস্থায় আমার শেষ দেখা।

সেপ্টেম্বর ১৭, ১৯৭৭, রাত ৩-৩০, আল-মুর্তাজা

লারকানাতে একজন কর্মচারী- বাহাওয়াল- সেদিনকার ঘটনার বর্ণনা দিয়েছিল– কারণ আমি সেখানে ছিলাম না।

রাত প্রায় ২টা নাগাদ সত্তুরজন আর্মি কমান্ডো এবং পুলিশ আল-মুর্তাজার দেয়াল বেয়ে ভেতরে আসে– লাঠি দিয়ে চৌকিদারদের আঘাত করে তারা বাড়ির দিকে যেতে থাকে।

ফ্রন্ট ডোরে তারা করাঘাত করতে থাকে এবং চিৎকার করে বলে, 'দরজা খোলো।' তখন আমি এবং অন্য কর্মচারীরা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে রেখেছিলাম।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কি চান?'

'ভুট্টো'

'অপেক্ষা করুন, তাকে জাগাতে হবে।'

তারা চিৎকার করে বলল, 'দরজা খোলো'। তারা দরজায় চাপ দিচ্ছিল জোর করে খোলার জন্য এবং অনবরত ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছিল।

মীর হৈ-চৈ শুনতে পেরে ভুট্টো সাহেবকে জাগাতে গিয়েছিল। ভুট্টো সাহেব মীরকে বললেন, 'তাদেরকে গিয়ে বলো দরজা ভাঙার দরকার নেই এবং দু'জন অফিসারকে ভতরে আসতে দাও। আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে সময় লাগবে।' তারা আসবে এটা তিনি জানতেন। তার স্যুটকেশ, ব্রিফকেস সবই গোছানো ছিল।

দশ মিনিট পরেই তারা ভুট্টো সাহেবকে নিয়ে গেল আমাদের সবাইকে বন্দুকের নলে

www.pathagar.com

ঘরের মধ্যে যেতে বাধ্য করে এবং আমাদেরকে ভেতরে আটকে রাখে। বাড়ির বাইরে এবং ভিতরে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়। আমরা সবাই কেঁদেছিলাম।

মীর, বাবা খুবই রেগে গিয়েছিলেন। তিনি করাচিতে ফোন করার চেষ্টা করলেন কিন্তু লাইন কাটা ছিল। পরদিন সকালে আমি গার্ডদের ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে দৌড়ে অন্যবাড়িতে বেগম সাহেবাকে খবর দিতে গেলাম। ততক্ষণে গ্রামে এই খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। শত শত গ্রামবাসী আল-মুর্তাজার গেটের বাইরে সমবেত হয়ে শ্লোগান দিতে থাকে– জিয়ে ভুট্টো!– ভুট্টো দীর্ঘজীবী হও। পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে।

আমার বাবাকে শুক্কুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখান থেকে করাচি এবং পরে লাহোরে। বাবাকে কোথায় রাখা হয়েছে– তা মানুষকে জানানোর ঝুঁকি নেয়নি জিয়া। এবার বাবাকে চিরতরে শেষ করার জন্য জিয়া বদ্ধ পরিকর ছিল। বাবার বিরুদ্ধে আবারও সেই পুরনো হত্যার অভিযোগ আনলো। কিন্তু এবার বাবাকে দোষী প্রমাণিত করার সব ব্যবস্থাই সম্পন্ন করেছিল জিয়া।

www.pathagar.com

৬

আল-মুর্তাজা'র স্মৃতি

বাবাকে হত্যার সাজানো বিচার

মার্চ, ১৯৮০ । আল মুর্তাজায় সময় যেন তলাবিহীন বালু ঘড়ির মতো, টিপ টিপ করে বালু কণা ছিদ্রতলা দিয়ে নিচের পাত্রে গড়িয়ে পরছে। আমার কাছে মনে হলো যেন আমি মানব অভিজ্ঞতার সবকিছু ছিন্ন করে জীবন্ত কবরে বসবাস করছি। আমার মা আটকাদেশের অশেষ ঘন্টাগুলো তাসের ধৈর্যের খেলা খেলে পার করছেন। কিন্তু আল মুর্তাজায় বন্দি হওয়ার পাঁচ মাস পর আমি যেন আগের চেয়ে আরো অস্থির। আমরা কখন মুক্ত হব তার কোনো ধারণা ছিল না আমার। এর সবকিছুই নির্ভর করছে জিয়ার ওপর।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের পছন্দ ঠিক করে ফেলেছে। শীত চলে গেল বসন্ত আসলো, পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মার্কিনিরা জিয়ার সামরিক একনায়কতন্ত্রকে বেছে নিয়েছে এবং গণতন্ত্র ফিরে আসার পক্ষে না। আফগানিস্তানে সোভিয়েতের উপস্থিতি বৃদ্ধিতে প্ররোচিত হয়ে ১৯৮০ সালের মার্চে প্রেসিডেন্ট কার্টার পাকিস্তানকে ৪০ কোটি ডলার সাহায্যের প্রস্তাব দেন। এ সাহায্য 'খুব সামান্য' হওয়ায় তা প্রত্যাখ্যান করেন জিয়া। শরণার্থীরা আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে ঢুকছে এবং সংখ্যায় বাড়ছে। আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ প্রবল হলে শরণার্থীর সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বাড়বে। আমাদের সদর দরজায় শরণার্থী ও সোভিয়েত সৈন্য জিয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে বিদেশী সাহায্য বাড়াবে। অবশেষে ইসরায়েল ও মিশরের পর তৃতীয় বৃহত্তম মার্কিন সাহায্য গ্রহীতা দেশে পরিণত হলো পাকিস্তান। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন পাকিস্তানে 'জিয়াকে ব্রেজনেভের উপহার' হিসেবে পরিচিতি পায়। অন্যদিকে আমার মা আর আমি আল মুর্তাজায় কারারুদ্ধ হয়ে পড়ে রইলাম।

কারাগার ও সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা পরিবেষ্টিত হয়ে সনম আসলো। যদিও সামরিক কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ছাড়া মা ও বোনের সঙ্গে দেখা করার তার অনুমতি ছিল

www.pathagar.com

না। নিম্ন রক্তচাপে অসুস্থ হয়ে মা শোবার ঘরে বিছানায়। আমাদের সাক্ষাতটি মহিলা কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সেখানে হতে পারে কি না জিজ্ঞেস করলাম। সনম ও আমি ফ্যামিলি কোয়াটারের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় আমাদের পেছনে পায়ের আওয়াজ পেলাম। দেখলাম তিনি জেলের মহিলা মেট্রন পুলিশ নন। সামরিক কর্মকর্তা– ক্যাপ্টেন ইফতিখার। আমি বড় বড় চোখ করে তার দিকে তাকাই। আত্মীয় হলেও ফ্যামিলি কোয়ার্টারে কোনো পুরুষের ঢোকার অনুমতি নেই।

'এমনকি কারাবিধিতে আছে, কেবল মহিলা পুলিশই মহিলা কারাগারে ঢুকতে পারে।' আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, 'আমি থাকবো।' 'তখন আমাদের সাক্ষাৎ আদৌ হতে পারে না। আমি আমার বোনকে জানাবো।' ইতোমধ্যে সনম আমার মায়ের কক্ষের দিকে চলে গেছে। আমাদের সাক্ষাৎটি যে স্থগিত হয়ে গেছে তা মা ও আমার বোনকে বলতে। লম্বা বারান্দা দিয়ে ফ্যামিলি কোয়াটারে হাঁটা দিলাম। আমার পেছনে কিছুর আওয়াজ পেলাম। ক্যাপ্টেন ইফতিখার তখনও আমাকে অনুসরণ করছেন। 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন তা কি চিন্তা করেছেন? আপনি এখানে আসতে পারেন না।' তার বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গেই বলি।

কিন্তু তিনি সবকিছু ভুলে গিয়ে বলেন, 'আপনি কি জানেন আমি কে? তিনি চিৎকার করে বললেন, 'পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আমি একজন ক্যাপ্টেন। আমি চাইলে সবখানে যেতে পারি।'

আমিও একইভাবে চিৎকার করে উত্তর দিলাম, 'আপনি কি জানেন, আমি কে?' আমি এমন একজন মানুষের মেয়ে, যিনি ঢাকায় আপনাদের অশোভন, অসম্মানজনক আত্মসমর্পণের পর আপনাদেরকে ফিরিয়ে এনেছেন।' ক্যাপ্টেন ইফতিখার আমাকে আঘাত করতে হাত তোলেন। এ ঘটনায় আমি বিস্মিত হয়ে আমার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি।

'এই বাড়িতে আপনি আপনার হাত উঠিয়েছেন। আপনি একজন নোংরা মানুষ। সেই মানুষটির কবরের ছায়ার কাছে এই বাড়িতে আপনি হাত ওঠানোর সাহস করেছেন, যিনি আপনাদেরকে জীবন বাঁচিয়েছিলেন। আপনি এবং আপনার সেনাবাহিনী ভারতীয় সেনাদের পায়ে পড়েছিলেন। আমার বাবাই আপনাদের সম্মান ফিরিয়ে দেন। আর আপনি তার মেয়ের দিকে হাত ওঠালেন?'

দ্রুত তিনি তার হাত নামালেন। অসংলগ্নভাবে বললেন, 'কি ঘটে আমরা দেখব', বলে তিনি গট গট করে চলে গেলেন। সনমের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ বাতিল হলো।

আমি বিষয়টি জানিয়ে আদালতকে একটা চিঠি লিখি। এই আদালতে আমি ও আমার মা গ্রেফতার হওয়ার পরই আল মুর্তজায় বন্দি থাকার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করি। ১৯৭৯ সালের সামরিক আইনে বেসামরিক আদালত তখনও সামরিক বিধিতে গ্রেফতারের বিষয়টিও পর্যালোচনা করত। আমাদের ফ্যামিলি কোয়ার্টারে সে দিন কি ঘটছে ওই চিঠিতে আমি তার বিবরণ তুলে ধরি। জেনারেল জিয়া চাদর (পর্দা) ও চার দিয়ারীর (চার দেয়াল) পবিত্রতার কথা বলতেন প্রায়ই। পারিবারিক জীবনের ধর্মীয় বিধিনিষেধ বোঝাতে তিনি এসব কথা বলতেন। যদিও তিনি কিংবা ক্যাপ্টেন ইফতিখার, তাদের কেউই এসব মানতেন না। চিঠিটি আমি জেলারকে দেই। আদালতে তিনি চিঠিটি পৌঁছে দেবেন বলে কথা দেন। আদালতের গ্রহণ কপিও আমাকে দেবেন বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। সে সময়ে ওই কপির মূল্য কত সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না।

www.pathagar.com

'চিন্তা করি বলেই আমি আছি', এই দার্শনিক বক্তব্য নিয়ে অক্সফোর্ডে সব সময় আমার সমস্যা হতো। আর এখন এটি নিয়ে আমি আরো সমস্যায় আছি। এখানে না চাইলেও কিন্তু আমি চিন্তা করি। বন্দিত্বের দিনগুলো ধীরে ধীরে পার হয়। আমি উপলব্ধি করতে পারি না আমার অস্তিত্ব। যার অস্তিত্ব আছে তার অভিঘাত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও আছে। আমার উপলব্ধিতে এ সকলের কিছু নেই।

আমার ওপর বাবার ছাপ আমাকে চলমান রাখে। সহনশীলতা, সম্মান, নীতিবোধ। আমার বাবা আমাদেরকে গল্প বলতেন, সেখানে ভুট্টোরা সব সময় একটি নৈতিক যুদ্ধে জয়ী হতো। 'অক্সফোর্ডের কাছে উডস্টক বনে রূপার্ট আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে'– এন্থনী হোপের উপন্যাসগুলোতে রূপার্ট অব হেন্টজোর সঙ্গে তার লড়াইয়ের গল্প বাবা এভাবে শুরু করতেন। উঠে দাঁড়িয়ে বাবা তখন খাপ থেকে একটি কাল্পনিক তলোয়ার বের করতেন।' 'সে আমাকে ঘাড়ে তলোয়ার দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে, টুকরো টুকরো করে আমার পা। কিন্তু আমি লড়াই চালিয়ে যাই। কারণ একজন সম্মানিত মানুষ মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করে।' আমরা যখন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখতাম, বাবা থামতেন। সে জোর করে ঢুকিয়ে দিতেন। পেটের ক্ষত থেকে রক্তের নিঃসরণ সে উপেক্ষা করতো। হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তিনি রূপার্টকে শেষ করে দিতেন। এরপর তিনি তার চেয়ারে ক্লান্তিতে ডুবে যেতেন। জামা তুলে তার অ্যাপেনডিক্সের দাগ দেখিয়ে তিনি বলতেন, 'একটি পবিত্র ক্ষতচিহ্ন।'

এটি এবং অন্য ভুট্টোদের কিংবদন্তীতে বলীয়ান হয়ে আমি দেখতাম, সামরিক অভ্যুত্থানের পর বিশ্বাস না করার কোনো কারণ নেই যে, আমার বাবাও জিয়াকে পরাজিত করবেন। যদিও আমার বাবা তার গল্পের মধ্য দিয়ে আমাদের ভেতর সে অনুপ্রেরণাদায়ী চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছেন, তার সঙ্গে প্রকৃত শত্রু যা তার জন্য অপেক্ষা করছিল আমার কাছে তার পার্থক্য ছিল না।

সেপ্টেম্বর ১৯৭৭। করাতের দাতের মতো খাঁজ কাটা ইটের বিশাল দেয়াল। ছোট উঁচু জানালাগুলো মরিচাপাড়া লোহার গ্রিল দিয়ে ঢাকা। বিশাল লোহার দরজা। কোট লাখপাট জেল। আমি পা ফেলায় দরজার খটখট ক্যাচক্যাচ শব্দ হলো। এর আগে আমি কখনো জেলের ভেতর ঢুকিনি।

আমার সামনে আরেকটি স্টিলের দেয়াল পেলাম। সশস্ত্র পুলিশের পাহারায় এটি। আমার চারদিকে সব নারীপুরুষ শিশু খাবারের বক্সগুলো স্টিলের ছোট একটি দরজা দিয়ে সামনের দিকে দিচ্ছে। কাপড়-চোপড়, বিছানা, থালা বাসনের কোনো সুবন্দোবস্ত পাকিস্তানের কারাগারে। না থাকায় কারাবন্দিদের পরিবারকে এসব সরবরাহ করতে হতো এমনকি খাবার অত্যন্ত গরিব পরিবারের পক্ষে সরবরাহ সম্ভব নয়। তাদের গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্তদের সঙ্গে সি ক্যাটাগরির কারাবাসে রাখা হয়। এটি গ্রুপ সেল। সেখানে গা ঘিন ঘিন করা মাদুরে ৫০ জন ঘুমায়। আর সবার জন্য সেলের কোণার দিকে আছে একমাত্র শৌচাগার। দুই বাটি একেবারে পানির মতো ডাল আর এক টুকরা রুটির দৈনিক রেশন তাদের খাবার। একশ' ডিগ্রির ওপর তাপমাত্রা থেকে বাঁচতে কোনো ফ্যান নেই। ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য কোনো গোসলেরও ব্যবস্থা নেই। বাবার সঙ্গে দেখা করাতে জেল সুপারিনটেন্ডের কাছে আমাকে নিয়ে গেল পুলিশ। "খুনের অভিযোগকে পুনরুজ্জীবিত করে

www.pathagar.com

জিয়া আবারো প্রকাশ্যেই আমাদের বিরুদ্ধে নেমেছে। জিয়া এটি বাস্তবায়ন না করার আগে অন্য ছেলেমেয়েদের দ্রুত দেশ ত্যাগ করতে হবে।" বাবা আরও বলেন, 'বিশেষ করে ছেলেদের। আমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাদের দেশের বাইরে পাঠাতে চাই।' মীর ও শাহ এখন দেশ ত্যাগে অনিচ্ছুক জেনেও আমি বলি, 'হ্যাঁ, বাবা।' কারাগারে বাবাকে রেখে তারা কিভাবে লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারে?

'তুমি তোমার লেখাপড়া শেষ করেছো। কিন্তু তুমি যদি মনে কর ইংল্যান্ডে ফিরে যাবে, এবং নিরাপদ জীবন কাটাবে, আমি তা মেনে নেব। তুমি যেতে পার।' বাবা বলতে থাকেন। 'তুমি যদি এখানে থাকতে পছন্দ করো, তাহলে জানবে যে, আমরা প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে আছি।' আমি তাকে বলি, 'আমি এখানে থাকবো বাবা এবং তোমার মামলায় সাহায্য করবো।' বাবা বললেন, 'তাহলে তোমার শক্ত মনোবল থাকতে হবে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মীর কয়েকদিন পর ইংল্যান্ডে ফিরে যায়। এরপর সে আর বাবাকে কখনই দেখেনি। কয়েকদিন আগে শাহনওয়াজ কোট লাখপাট জেলে বাবাকে দেখতে এলেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে ও সুইজারল্যান্ডে ফিরে যায়।

'বাবাকে দেখতে অনুমতি আছে। আমি বাবাকে বিদায় জানাতে এসেছি।' জেলের ভেতর প্রথম দরজার কাছে নিরাপত্তা কর্মী শাহ বলে 'আপনাকে ভেতরে যেতে দিতে আমাদের কাছে কোনো অনুমতি নেই। আমরা আপনাকে ভেতরে যেতে দিতে পারি না।' আমার বাবা তাঁর আইনজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ভেতরের স্টিলের বেড়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শাহর ওই তর্কবিতর্ক শুনতে পান। 'তুমি আমার ছেলে। কোনো ধরনের সুবিধা পাওয়ার জন্য তাদের অনুরোধ করবে না।' তিনি উচ্চস্বরে আমার ভাইকে বললেন। 'তুমি তোমার লেখাপড়া চালিয়ে যাও এবং কঠোর পরিশ্রম করো। তোমার জন্য আমাকে গর্বিত করো।'

কয়েকদিন পরেই সনম হার্ভার্ডে ফিরে যায়। এর দশ দিন পর ১৯৭৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর আমি প্রথমবারের মতো গ্রেফতার হই।

ঝাকে ঝাকে লোক। সালোয়ার কামিজ পরা যুবকেরা গাছের ডাল আর ল্যাম্পপোস্টগুলোতে আটকে আছে, বাস, ট্রাকগুলোতে স্থির হয়ে আছে, পরিবারগুলো তাদের জানালা, ছাদ আর বারান্দা থেকে উঁকি মারছে। লোকজনের এমন ভিড় ও চাপাচাপি যে কেউ মূর্ছা যেতে পারে। জনতার এক প্রান্তে বোরখা পরা মহিলারা। তাদের কারাবন্দি প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে এসেছে তাদেরকে কিছু বলতে। আমার কাছে মনে হলো রাজনৈতিক মঞ্চে একজন নারীর দাঁড়ানো সমবেত জনতার কাছে আশ্চর্যের কিছু নয়। উপমহাদেশের অন্য নারীরা আমার আগে তাদের স্বামী, ভাই ও বাবাদের জন্য রাজনৈতিক ব্যানার ধরে ছিলেন। নারীদের মাধ্যমে রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বহন করা দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল। ভারতে ইন্দিরাগান্ধী, শ্রীলঙ্কায় শ্রীমাভো বন্দরনায়েক, পাকিস্তানে ফাতিমা জিন্নাহ ও আমার নিজের মা। আমি কখনই ভাবিনি এটি আমার ক্ষেত্রেও ঘটবে।

বাণিজ্যিক শহর ফয়সালাবাদে কোনো মতে কাজ চালানোর মতো মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি

www.pathagar.com

ভয় পেয়েছিলাম। ২৪ বছর বয়সে আমি নিজেকে রাজনৈতিক নেত্রী কিংবা একজন প্রকাশ্য বক্তা হিসেবে ভাবিনি। কিন্তু আমার কোনো উপায় ছিল না। 'সোনামণি, তোমাকে যে প্রচারণায় যেতে হয়। তোমার বাবার কর্মসূচি আমাদেরকে ভাগ করতে হয়।' করাচিতে গত সপ্তাহে মা আমাকে বলেন। 'পিপিপির অন্য নেতারা হয় আটক, আর নয়তো অন্যান্য কর্মসূচিতে তারা ব্যস্ত। কেবল আমারই কোনো প্রোগ্রাম ছিল না।' 'কিন্তু কি বলতে হবে তা আমি জানি না।' আমি তাকে বললাম। 'ভয় পেয়ো না।' তিনি বললেন, 'আমরা তোমাকে বক্তৃতা দিয়ে দেব।'

'ভুট্টো কো রেহা করো– ভুট্টোকে মুক্ত করো, বিপুল জমায়েত শ্লোগান দিচ্ছে। এক দিন আগে রাওয়ালপিন্ডিতে আমার মায়ের জন্য ১০ লাখ লোক একই রকম শ্লোগান দিয়েছিল। মঞ্চে আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আর শিখছিলাম। 'তোমার বাবা জেলে বলে ভয় পেয়ো না। তোমার মা এখনও মুক্ত।' তিনি জনতাকে বললেন, 'আমার ট্যাংকও নেই বন্দুকও নেই কিন্তু আমি নিশ্চিত আমার নিপীড়িত জনতার অদম্য ক্ষমতা আছে। যা দিয়ে পৃথিবীর যে কোনো ক্ষমতার মুখোমুখি হতে পারি। তার কণ্ঠস্বর ছিল অটল। কিন্তু লোকজনকে উদ্দেশ্য হাত নাড়ানোর সময় তা হালকা কাঁপছিল। তার প্রতি ভালোবাসায় ও মুগ্ধতায় আমার হৃদয় ভরে গিয়েছিল। আমার মা এ ধরনের জীবন চাননি। আমার বাবা যখন কারাগারে ছিলেন, তখন তিনি পিপিপির দায়িত্ব নিতে চাননি। তিনি তখনও তার নিম্নরক্তচাপে ভুগছিলেন এবং খুব অসুস্থ ছিলেন। দলের নেতারা যখন প্রেসিডেন্টের পদ নিয়ে বাকবিতণ্ডায় জর্জরিত তখন আপোস রফা হিসেবে তাকে প্রেসিডেন্ট করার প্রস্তাব দেয়া হয় এবং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু কারাগার থেকে বাবা দলের প্রস্তাব মেনে নেয়ার জন্য মাকে লিখে জানালে তিনি তা গ্রহণ করেন। প্রথম প্রতিশ্রুত নির্বাচনের বাকি ছিল মাত্র দু'মাস। এবং জনগণ পিপিপিকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার পথে প্রস্তুত।

জিয়ার অপারেশন ফেয়ারপ্লে– ন্যায় বিচার অভিযান সব কিছুতেই হাজির হয়। কিন্তু জনগণের ব্যাপক অংশে তৈরি হয় ভীতি। সামরিক অভ্যুত্থানের দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে আমার বাবার জাতীয়করণ করা আটা ও ধানকলগুলো তার মালিকদের কাছে ফিরে আসে। আরো বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়েছিল। ট্রেড ইউনিয়নের নেতা সংগঠকদের চাকরিচ্যুতি করে শিল্পপতিরা দেশজুড়ে উৎসব পালন করে। কেবল লাহোরেই ৫০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছিল। 'তোমাদের ভুট্টো বাবা এখন কোথায়?' – বলে শিল্পপতিরা চাকরিচ্যুত শ্রমিকদেরকে খোঁচা দেয়। শ্রমিকরা চাকরিচ্যুতি ও বেতন কাটার হুমকির মধ্যে ছিল।

'এই নাও অথবা যাও' – কৃষকরা ন্যায্য দামে বিক্রি করতে এসে এভাবে দাম পেত। আবারো সামন্ত ভূমি মালিকরা এবং মিল মালিকরা লাভের অর্থ পকেটে ভরছিলেন। ১৯৭৫ সালের তুলনায় পিঁয়াজ পাঁচ গুণ, আলু দ্বিগুণ এবং ডিম ও আটার দাম ৩০ শতাংশ বাড়ে। আমার বাবার নীতির বিপরীতে জঘন্যরকম এ জবরদস্তির কথা পাকিস্তান জুড়ে পিপিপির সমাবেশে সজোরে উচ্চারিত হয়েছিল। ভুট্টো কো রেহা কারো। 'ভুট্টো কো রেহা কারো!' (ভুট্টোকে মুক্ত করো)।

ফয়সালাবাদে আমি বলিষ্ঠভাবে বক্তৃতা দিই। যা ইসলামাবাদে আমি আমার রুমে বারবার অনুশীলন করেছিলাম। চোখ তুলে তাকাও। নিচে তাকিও না। অক্সফোর্ড

www.pathagar.com

ইউনিয়নে কি সব সুশৃঙ্খল কৌশল ছিল। আমার সামনে এখন প্রসারিত খেলার মাঠ। যেখানটাতে মনে হচ্ছিল অগণিত মানুষের জমায়েত। 'জান্তার বিরুদ্ধে বেশি বলবে না, নির্বাচন বাতিলের জন্য জিয়াকে কোনো অজুহাত দিও না।' আমার মা আমাকে সতর্ক করে দিলেন। কিন্তু জনতা ছিল অদম্য। 'একেবারেই অবিশ্বাস্য এতো লোক।' দলের স্থানীয় এক কর্মী তার চারদিকে ভ্রূ নাচিয়ে বললো। 'আমি আমার জীবনে এত বড় সভা আর দেখিনি।'

কিছু লোক আমার মুখের কাছে মাইক্রোফোন ধরে। এগুলো তার দিয়ে লাউড স্পিকারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তারগুলো স্পার্ক করছিল। আমার বক্তৃতার সময় মাইকের লোকজন তারগুলোর চারদিকে কাপড় মোড়ানোর চেষ্টা করে। না, এটি কোনো অক্সফোর্ড ইউনিয়ন নয়।

'ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সমঝোতা আলোচনার জন্য বাবা যখন ভারত সফরে যান, তখন আমি ও তার সঙ্গে ছিলাম। সেখানে তিনি বিছানায় ঘুমাতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি মেঝেতে ঘুমান। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি মেঝেতে কেন ঘুমাচ্ছেন?' উত্তরে তিনি বলেন, 'ভারতে আমি বিছানায় ঘুমাতে পারি না। আমাদের যুদ্ধ বন্দিদের ক্যাম্পে মাটি ছাড়া ঘুমানোর কিচ্ছুই নেই।

সেনা জওয়ানদের ঘর ছিল পাঞ্জাব। তারা আমার বাবার সংগঠকদের প্রতি অনুরক্ত ছিল। জওয়ানদের সঙ্গে আমার বাবার ব্যবহার ছিল আন্তরিক। পশ্চিম পাকিস্তানে শীতকালে সৈন্যদের জন্য গরম কাপড় সরবরাহ, তাদের বেতন বৃদ্ধি এবং উচ্চপদে উন্নীত হওয়ার বড় ধরনের সুযোগ করে দিয়ে তিনি যথাযোগ্য ব্যবহার করেছিলেন। এখন সৈন্যদের পরিবারগুলো আমাদের সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছেন।

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে এক ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন' ২৯ সেপ্টেম্বর সাহিওয়ালে পৌঁছানোর পর আমার গৃহকর্ত্রী শংকা আর ভয় মিশিয়ে বললেন। ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে বললেন, 'এই বাড়িটি সাব জেল ঘোষণা করা হয়েছে। আপনি ১৫ দিনের জন্য বন্দি।'

একেবারেই অবিশ্বাস্য ঘটনা বাড়িটি পুলিশ ঘেরাও করে রাখলো। টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। পর্যায়ক্রমে পানি ও বিদ্যুৎও। সমস্ত প্রতিবেশীর দিকের রাস্তাগুলো কর্ডন করে রাখা হয়। গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী, যারা পরবর্তীকালে দল ত্যাগ করে– তারাও আমার সঙ্গে আটক ছিলেন। উত্তেজিত হয়ে তিন দিন আমি আমার শোবার ঘরে পায়চারি করে কাটিয়ে দিলাম।

অভিযোগগুলো কি ছিল? আমি কোনো আইন ভঙ্গ করিনি, এমনকি সামরিক আইনও না। জিয়ার অনুমতিতে আমি আমার বাবার প্রচারাভিযানে অংশ নিয়েছিলাম। 'আমার মেয়ে অলংকার পরতো। এখন সে বন্দির শিকল পরে গর্বিত হবে।' আমার মা করাচিতে একটি প্রচারণা সমাবেশে বলেছিলেন। সেখানে জনতার উপস্থিতি আগের রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছিল। পিপিপিকে রাজনৈতিকভাবে পরাজিত করার ব্যাপারে জিয়ার সে আশা তা গুড়িয়ে দিতে আমরা ব্যাপক সাড়া পেয়েছিলাম। জেলে থাকা ভুট্টোর চেয়ে আরো বেশি শক্তিশালী হলো প্রচারাভিযানের ভুট্টো।

পরদিন টেলিভিশনে নির্বাচন বাতিলের ঘোষণা এলো। সেই মুহূর্ত থেকে আমি জানলাম, দেশে আর কোনো আইন নেই।

www.pathagar.com

২৪ অক্টোবর, ১৯৭৭। হত্যাকাণ্ডে ষড়যন্ত্রের জন্য আমার বাবার বিচার শুরু হয়েছিল এদিন। সাধারণ হত্যা মামলার বিচার নিম্ন আদালতে শুরু হয়। কিন্তু আমার বাবার বিচার শুরু হয়েছিল এক লাফে লাহোর হাইকোর্টে। ফলে হাইকোর্টে যে আপিলেরও সুযোগ থাকে, সেটা আর থাকবে না। বিচার প্রক্রিয়ার এক ধাপ কমে গেল এবং আমার বাবা হাইকোর্টে আপিলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। ছয় সপ্তাহ আগে যে বিচারক আমার বাবার জামিন দিয়েছিলেন, হাইকোর্টের দায়িত্ব থেকে তাকে সরিয়ে দেয়া হয়, এবং বিশেষভাবে নির্বাচিত পাঁচ বিচারপতি দিয়ে বেঞ্চ গঠন করা হয়। আমার বাবার জামিন বাতিল করা ছিল এই নতুন বেঞ্চের প্রথম কাজ। এর ফলে ফৌজদারী অভিযোগে এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউল হকের নির্দেশ। এই দুই কারণে আমার বাবা আটক থাকবেন।

আমার মায়ের সঙ্গে বাবার পক্ষে কাজ চালিয়ে যেতে অন্তত আমি মুক্ত ছিলাম। নির্বাচন বাতিল হওয়ার কয়েকদিন পরেই আমি বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাই। পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে আমাদের দলের এক সমর্থক একটি ফাকা আসবাবপত্র শূন্য ঘর আমার বাবার বিচারকালে এখানে দলের অফিস ও সভার কাজে ব্যবহার করতে দেন। প্রতিদিনই আমাদের একজন আদালতে শুনানিতে উপস্থিত থাকতেন। ১৮৬৬ সালে ব্রিটিশদের তৈরি একটি সুন্দর ভবনে শুনানি চলতো। দামি লাল গালিচাসহ বাকা কাঠের সিলিংয়ের আদালত কক্ষের বেশভুষা ছিল সর্বত্র। বিচারপতিরা প্রবেশ করার সময় সবাই উঠে দাঁড়াতেন। বিচারপতিদের আগে আগে থাকতেন লম্বা সবুজ কোট ও সাদা পাগড়িপরা বেয়ারা। তাদের হাতে থাকতো রুপোর গোল মাথাযুক্ত রাজদণ্ড। বিচারপতিরা পরতেন লম্বা ঢিলেঢালা কালো পোষাক এবং সাদা পরচুলা। বসতেন পেছনে উঁচু পাঁচটি চেয়ারে। বাবার আইনজীবীরা এর আগেই আদালতে চলে আসতেন। তাদের পরনে কালো কোটের ওপর কালো সিল্কের গাউন। দর্শকরা আদালতের বেঞ্চের সারিগুলো পূর্ণ করে ফেলতো। মনে হতো বৃটিশ আইন অনুসৃত হয়ে খুব সঠিকভাবে বিচারিক কাজ চলছে। আসলে তা হয়নি।

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর (এফএসএফ) মহাপরিচালক মাসুদ মাহমুদের স্বীকারোক্তির ফলে আমার বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ থেমে ছিল। সামরিক অভ্যুত্থানের পর আটক হওয়া সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে মাসুদ মাহমুদ একজন। নির্যাতন করে তাকে আমার বাবার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা হয়। সামরিক হেফাজতে প্রায় দুই মাস আটক থাকার পর তিনি রাজসাক্ষী হতে রাজি হন। মাসুদ মাহমুদ রাজি হন, তিনি তার অপরাধ স্বীকার করবেন এবং ক্ষমা পাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে তিনি অন্য অভিযুক্তদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন। এখন তিনি দাবি করলেন যে, রাজনীতিক কাসুরিকে হত্যার নির্দেশ দেন আবার বাবা। ষড়যন্ত্রের অভিযোগের সঙ্গে আমার বাবার সরাসরি সম্পৃক্ততার একমাত্র সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল মাসুদ মাহমুদের বক্তব্য। অন্য চার অভিযুক্তও এফএসএফের সদস্য ছিলেন। তারাও মহাসচিবের নির্দেশে তথাকথিত হামলায় অংশ নিয়েছিলেন। মাসুদ মাহমুদের মতো অভ্যুত্থানের অল্পক্ষণ পরেই তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। হামলার প্রত্যক্ষদর্শী কোনো সাক্ষী ছিল না। এফএসএসের চার অভিযুক্তকে তাদের আইনজীবীদের পর বসানোর সময় গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা পরিবেষ্টিত করে আমার বাবাকে আনা হলো। এরপর তাকে কাঠগড়ার মধ্যে রাখা হলো। কেবল এ বিচারের জন্যই এ কাঠগড়া তৈরি করা হয়েছিল। 'আমি জানি, আপনি খুব আরামদায়ক জীবন যাপন করতেন। তাই আমি আপনাকে বেঞ্চের পরিবর্তে চেয়ার দিচ্ছি।' বিচারের প্রথম দিনে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মৌলভী মুসতাক

www.pathagar.com

হুসেইন বিদ্রূপের সঙ্গে আমার বাবাকে এভাবে বললেন। জিয়ার সময় বিচার বিভাগে শীর্ষ পদে নিয়োগ পাওয়াদের মধ্যে একজন ছিলেন মৌলভী মুশতাক। জিয়ার গ্রামের বাড়ি ভারতের জুলানদার থেকে তিনি আসেন। তিনি ছিলেন আমার বাবার পুরানো শত্রু। পিপিপি সরকারের সময় তিনি প্রধান বিচারপতি হতে পারেননি। কারণ আইন মন্ত্রণালয়, এটর্নি জেনারেল ও আমার বাবা তার ওই পদোন্নতি উপযুক্ত মনে করেননি। আমার বাবা সকল ক্ষেত্রে তাকে অনুপযুক্ত ভাবতেন। অভ্যুত্থানের পরপরই প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে জিয়ার নিয়োগ গ্রহণ করে তিনি নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণকে প্রহসন বানান। তার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন।

আদালতের এক পেশে কর্মকাণ্ড ছিল পরিষ্কার। এফএসএফের অভিযুক্তদের একজন মিয়া আব্বাস ছিলেন সৎ ও সাহসী। বিচারের প্রথম দিনে তিনি দাঁড়িয়ে তার দোষ স্বীকার করে পূর্বে দেয়া স্বাক্ষ্য অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'নির্যাতন করে আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে,' পরদিন তিনি আদালতে উপস্থিত হননি। আদালত ব্যাখ্যা দিল, তিনি অসুস্থ।

বিবাদী পক্ষের আইনজীবীরা আমার বাবার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণের কপির জন্য অনুরোধ করলেন। 'যথাযথ সময় পর্যন্ত' অপেক্ষা করার উল্লেখ করে আবেদনটি মূলতবি করলেন প্রধান বিচারপতি। বিচারের অগ্রগতি হওয়ায় বিবাদী পক্ষের প্রধান আইনজীবী ডি. এম আয়ানকে প্রধান বিচারপতি তার চেম্বারে ডাকলেন। সেখানে প্রধান বিচারপতি তাকে 'তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা' করার পরামর্শ দিলেন। আমার বাবার পক্ষে সঠিক আইনি ব্যবস্থা নেয়ার কথা আয়ান জোরের সঙ্গে জানালে প্রধান বিচারপতি পাল্টা বলেন, আদালতে আয়ানের অন্য মামলাগুলোর রায় তার বিপক্ষে যাবে। পরিশেষে আয়ান তার মক্কেলদের অন্য আইনজীবী দেখতে বললেন। মৌলভী মুশতাক যখন মাসুদ মাহমুদের গাড়ি চালকের সাক্ষ্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করছিলেন, আমার বাবা ও এফএসএফের মহাসচিবের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। 'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যখন মাহমুদ দেখা করতে গিয়েছিলেন আপনি তখন গাড়ি চালিয়েছিলেন তা কি সত্য?' প্রধান বিচারপতি জিজ্ঞেস করলেন।

আতঙ্কিত গাড়ি চালক উত্তর দিলেন, 'না'। মৌলভী মুশতাক স্টেনোগ্রাফারকে নির্দেশ দিলেন, লেখ– 'প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে মাসুদ মাহমুদকে গাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

বিবাদী পক্ষের আইনজীবী উঠে দাঁড়িয়ে আপত্তি করলেন, 'অবজেকশন, মাইলর্ড।'

মৌলভী মুশতাক তা নাকচ করে দিয়ে বললেন, 'ওভার রুলড' তিনি তার সাদা ভারি ভ্রূ রেগে একত্র করলেন। এরপর সাক্ষীর কাছে ফিরে এলেন। 'তোমার বলার অর্থ হলো তুমি মনে রাখোনি। কিন্তু তুমি হয়তো মাহমুদকে চালিয়ে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে গিয়েছিলে।' প্রধান বিচারপতি বললেন।

চালক উত্তর দিলেন, 'না, স্যার, আমি তাকে চালিয়ে নিয়ে যাইনি।'

প্রধান বিচারপতি স্টেনোগ্রাফারকে নির্দেশ দিলেন, 'লেখ : মাসুদ মাহমুদ নিজেই গাড়ি চালিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে গিয়েছিলেন।' 'অবজেকশন'। প্রধান আইনজীবী আবারো উঠে আপত্তি করলেন।

গর্জে উঠে মৌলভী মুশতাক বললেন, 'বসুন'। তিনি চালকের কাছে ফিরে এলেন। 'মাসুদ মাহমুদ নিজে গাড়ি চালিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে যেতে পারেন। তিনি তো তা করতে পারেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

www.pathagar.com

'না, স্যার' চালক বললেন।

'কেন নয়' চিৎকার করে বললেন মুসতাক।

'কারণ, আমার কাছেই চাবি ছিল, স্যার।' তিরতির করে কেঁপে চালক বললেন।

নভেম্বরে বিচারে অংশ নিতে ইংল্যান্ড থেকে এসেছিলেন আইনজীবী জন ম্যাথিউস কিউ সি। বিচার প্রক্রিয়ায় তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। পরে তিনি একজন ব্রিটিশ সাংবাদিককে বলেন, 'বিশেষ করে সাক্ষীর কাছে গ্রহণযোগ্য উত্তরকে তাৎক্ষণিকভাবে বেঞ্চ থেকে কিভাবে ব্যাহত করা হতো তা নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম। তারা মামলার সাক্ষীদের বক্তব্য উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা ও প্রশ্ন করে তা তাদের থেকে আদায় করতেন। সাক্ষীকে দিয়ে তার উত্তরকে কাটছাট করতেন।' বিবাদী পক্ষের আইনজীবীদের উদ্বেগ ছিলো আরো বেশি। বিচার শেষে এমন কোনো আপত্তি ছিল না যে তারা তোলেননি। অথবা ৭০৬ পৃষ্ঠার এজাহারের তথ্য প্রমাণেও স্ববিরোধিতাগুলো তারা তুলে ধরেন।

এমনকি পুরো বিচারে নিরপেক্ষতারও কোনো ভান ছিল না। একদিন সকালে যখন আমি আদালতে পৌঁছলাম তখন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার উপপরিচালক আবদুল খালিকের কথা শুনে ফেলি। তিনি একদল সাক্ষীকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাদের সাক্ষ্যকালে তারা কি বলবেন। 'বিচারের নামে এটা কি?' আমি উচ্চস্বরে প্রতিবাদ করি। লোকজন সমবেত হতে শুরু করলো। খালিক পুলিশকে নির্দেশ দিলেন 'তাকে (আমাকে) দুরে সরাও।' চিৎকার করে বললাম, 'আমি যাব না'। আমার প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা ছিল বিচারিক কাজকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলা। এতে খালিক আবারো বললেন, 'তাকে নিয়ে যাও'। পুলিশ আমাকে ধরতে এগোনোর সময় করিডরে গুঞ্জন শোনা গেল, আমার বাবা কারাগার থেকে পৌঁছেছেন। আমি চাইনি আমার বাবা এসব দেখুক। তাই আমি ঝগড়া না করে সরে এলাম। পরে আমি শুনেছিলাম, সাক্ষীর সাক্ষ্য-প্রমাণ মাজাঘঁষা করতে আদালতের কাছে একটি ঘর ভাড়া নেয়া হয়েছিল। সঙ্গে ছিল ভালো খাবার আর পানীয়র ব্যবস্থা।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এটর্নি জেনারেল রামসে ক্লার্ক আমার বাবার বিচারিক কাজ পর্যবেক্ষণ করতে এসেছিলেন। পরে এ সম্পর্কে দ্য নেশনে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। 'কয়েকজন সাক্ষীর ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো পুরো মামলা। স্বীকারোক্তি না দেয়া পর্যন্ত তারা আটক ছিলেন। বারবার তারা তাদের স্বীকারোক্তি ও সাক্ষ্যপ্রমাণ পরিবর্তন ও বৃদ্ধি করেন। মাসুদ মাহমুদ (এফএসএফের মহাসচিব) ছাড়া অন্যদের কাছ থেকে শোনা কথা কোর্টকে তাদের সাক্ষ্য প্রমাণে ঘটনার চারটি ভিন্ন তত্ত্ব সামনে আসেন। যা একজন প্রত্যক্ষদর্শী, বা সরাসরি প্রমাণের দ্বারা পুরোপুরি অসমর্থিত ছিল।'

আমি ন্যায় বিচারে বিশ্বাস করতাম। নৈতিকতার বিধি-বিধানে আমি বিশ্বাস করতাম, বিশ্বস্ত ছিলাম সাক্ষ্যপ্রমাণ আর বিচারিক প্রক্রিয়ায়। কিন্তু আমার বাবার প্রহসনমূলক বিচারে এর কোনো কিছুই ছিল না। বিবাদী পক্ষের আইনজীবী একটি সামরিক লগ বইয়ের নাগাল পেয়েছিলেন। সেখানে প্রমাণ পাওয়া যায় কাসুরের ওপর হামলার সময় ব্যবহৃত অভিযুক্ত গাড়িটি এমনকি তখন লাহোরেও ছিল না। আদালত আপত্তি তোলে, 'যাতায়াত লগ বই দিয়ে সত্য প্রমাণিত হয় না।' যদিও তারা নিজেরাই মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রে লগবইটি আদালতে জমা দিয়েছিল।

বাদিপক্ষের আইনজীবীরা এফএসএফের যাতায়াত ভাউচারে দেখান যে, ঘটনার দিন আরেকটি কাজে গুলাম হুসেইন করাচিতে ছিলেন। এ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হত্যা প্রচেষ্টা

www.pathagar.com

সংঘটিত ও তত্ত্বাবধানের অভিযোগ ছিল। বস্তুত ভাউচারে প্রকাশিত হয়, ঘটনার ১০ দিন আগে থেকে তিনি করাচিত ছিলেন। শুধু তাই নয় ঘটনা ঘটার পর থেকে ১০ দিন তিনি সেখানেই ছিলেন। 'ওই সকল নথিপত্রে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বানানো হয়েছে' সরকারি প্রসিকিউটার দাবি করেন। যদিও এর আগে আদালত কিংবা 'অভিযোগ স্বীকারকারীরা' ওই তথ্যের বিষয়ে কিছুই বলেনি।

সমগ্র হত্যা মামলায় যে জালিয়াতি করা হয়েছিল তার অকাট্য প্রমাণ আমার বাবার আইনজীবীদের হাজির করা প্রকৃতগুলির গতি সম্পর্কিত একটি রিপোর্টে বের হয়ে আসে। 'আততায়ী'দের দাবি অনুযায়ী তারা যে অবস্থান থেকে গুলি করেছিল, তার সঙ্গে গাড়িতে সৃষ্ট গুলির গর্তটি মেলেনি। আদালত দু'জনের দাবি করলেও সেখানে ছিলেন চারজন আততায়ী। তাছাড়া এফএসএফের যে বন্দুক দিয়ে গুলি করা হয়েছিল তার সঙ্গে ঘটনাস্থলে পাওয়া খালি কার্টিজের মিল ছিল না।

আদালতে উল্লাসের সঙ্গে রেহানা সরওয়ার আমাকে বললেন, 'মামলায় আমরা জিতে গেছি।' তিনি আমার বাবার এক আইনজীবীর বোন। তিনি নিজেও আইনজীবী।

সময় নষ্ট না করে চা বিরতির সময় আমার বাবাকে তাড়াতাড়ি বলতে গেলাম। সে সময় আদালত রাজসাক্ষীদের তাদের দীর্ঘক্ষণ পরিবারের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ দিত এবং বাবাকে পেছনের দিকে ছোট একটি কক্ষে ব্যাপক পুলিশি বেষ্টনীর মধ্যে রাখা হতো। আমি সময় নষ্ট না করে দৌড়ে গিয়ে গুলির গতি সম্পর্কিত রিপোর্টের কথা জানিয়ে আমি তাকে বললাম, 'আমরা জিতে গেছি। আমরা জিতে গেছি!' উচ্ছ্বাস ভরা কথাগুলো তিনি শোনার সময় তার মুখে যে করুণার চেহারা ছিল তা আমি কখনই ভুলব না। 'তুমি বোঝ না', তিনি শান্তভাবে বললেন। 'তারা আমাকে হত্যা করতে যাচ্ছে। প্রমাণ নিয়ে তোমার বা অন্য কারোর কি চিন্তা তাতে কোনো কিছু যায় আসে না। একটি হত্যার জন্য তারা আমাকে হত্যা করতে যাচ্ছে, যে হত্যার কারণ দেখিয়ে যা আমি করিনি।'

আমি তার কথায় হতবাক হলাম; তাকে বিশ্বাস করলাম না, বিশ্বাস করতেও চাইনি। তার আইনজীবীরাসহ আদালত কক্ষের আমাদের কেউই তাকে বিশ্বাস করতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু তিনি জানতেন। করাচিতে মধ্যরাতে তার জন্য যখন জিয়ার সৈন্যরা এসেছিল তখন সে থেকে তার জানা ছিল। আসন্ন হত্যা মামলার অভিযোগ সম্পর্কে তার বোন যখন প্রথম গুজব শুনেছিলেন তখনই তাকে অনুনয়-বিনয় করে বলেছিলেন, 'পালাও'। অন্যরাও অনুনয়-বিনয় করে তাকে পালাতে বলেছিল। এখনকার মতো তার উত্তর বরাবরই একই রকম ছিল। 'অন্য কেউ নয়, আমার জীবন আল্লাহর হাতে।' চা বিরতির সময় তিনি আমাকে বলেন, "আমি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত, যখনই তিনি ডাকবেন। আমার বিবেক-নীতিবোধ পরিষ্কার। ইতিহাসে আমার নাম, আমার সম্মান ও আমার স্থান আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই আমি এর জন্যই লড়াই করতে যাচ্ছি।'

আমার বাবা জানতেন, আপনি একজন মানুষকে বন্দি করতে পারতেন, কিন্তু তার আদর্শকে নয়। আপনি একজনকে নির্বাসনে দিতে পারেন কিন্তু তার আদর্শকে নয়। আপনি একজনকে নির্বাসনে দিতে পারেন কিন্তু তার আদর্শকে নয়। আপনি একজন মানুষকে হত্যা করতে পারেন কিন্তু আদর্শকে নয়। কিন্তু জিয়া এসবের প্রতি অন্ধ ছিলেন। জনগণকে আরেকটি বার্তা পাঠানোর চেষ্টা ছিল তার। দেখে তোমাদের প্রধানমন্ত্রীক। যে কোনো সাধারণ লোকের মতোই তিনি রক্তমাংস দিয়ে তৈরি। তার নীতিগুলো এখন তাকে কোনো

www.pathagar.com

লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে? তুমি যেভাবে নিহত হতে পার তিনিও সেভাবেই নিহত হতে পারেন। দেখো, আমরা তোমাদের প্রধানমন্ত্রীকে কি করছি। আমরা তোমাদেরকে কি করতে পারি কল্পনা করো।

আমার বাবা আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, সামনে কি আছে। কিন্তু আমি তার কথা শুনেও না শোনার ভান করলাম। আমি তার কথাটি সেখানেই রেখে দিলাম। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে আনা একের পর এক নতুন অভিযোগ মোকাবিলায় আমি যুদ্ধ করতে পারতাম না। তার সম্মান বাঁচানোর লড়াই যেন আমার নিজেরই হয়ে গেল।

করাচিতে আমার বাবা গ্রেফতার হওয়ার একদিন পর জিয়া সামরিক আইন আদেশ নং ২১ জারি করলেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ সাল (পাকিস্তান পিপলস পার্টির বছরগুলো) পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের সকল সদস্য সিনেটর এবং প্রাদেশিক সরকারের সদস্যদেরকে তাদের সকল সম্পত্তি ও কেনা জিনিসপত্রের বিবরণ (জমির মৌজা, যন্ত্রপাতি, অলংকার থেকে ইন্সুরেন্স পলিসি ও অফিস সরবরাহ পর্যন্ত) সামরিক সরকারের কাছে জমা দিতে বলা হলো। এ নির্দেশ মানতে যারা ব্যর্থ হবে তাদের শাস্তি ছিল সাত বছরের কঠোর কারাবাস এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ।

সামরিক সরকার যদি মনে করে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সহায় সম্পত্তিগুলো অর্জিত হয়েছিল অথবা সরকারি সম্পত্তির অপব্যবহার হয়েছে তাহলে যে কোনো নির্বাচিত অথবা মনোনীত রাজনৈতিক অভিযোগ প্রমাণিত ব্যক্তি অযোগ্য বিবেচিত হবে। সামরিক সরকারের প্রতি সম্মতি আদায় করতে পার্লামেন্ট সদস্যদেরকে ভয় দেখাতে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ নতুন আইন ব্যবহার করতো যাকে তাকে অযোগ্য ঘোষণা করে। অযোগ্য বিবেচিতদের কাছে আপিলের একমাত্র পথ খোলা ছিল একই সামরিক সরকার স্থাপিত 'আদালত'। ওই আদালতেই তাদেরকে আবার প্রথম পর্যায়ে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল। অবশ্য যারা সামরিক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করত তারা আবার আশ্চর্যজনকভাবে যোগ্যতা ফিরে পেত।

অযোগ্য রাজনীতিবিদদের প্রথম তালিকায় শীর্ষে ছিলেন আমার মা। যদিও মাত্র তিন মাস তিনি পার্লামেন্ট সদস্য ছিলেন। সামরিক সরকার গঠিত ট্রাইব্যুনালে তিনি বার বার হাজিরা দিতে চেয়েছিলেন। সামরিক সরকার দেখল, তার বিরুদ্ধে যে কোনো অভিযোগ গঠন করা কঠিন। তার শুনানি বারবার স্থগিত করা হলো। কিন্তু ১৯৭৭ সালের শরৎ ও শীতকালের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিলেন আমার বাবা। তার সুখ্যাতি জিয়া মরিয়া হয়ে ধ্বংস করতে চাইলেন।

পিপলস পার্টির কর্মীদের জন্য মোটর সাইকেল ও বাইসাইকেল কিনতে সরকারি তহবিল ব্যবহার করেছিলেন ভুট্টো। সরকারি ব্যয়ে লারকানা ও করাচিতে ভুট্টো তার বাড়িকে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করেন। সরকারি অর্থ দিয়ে ভুট্টো তার ব্যক্তিগত থালা-বাসন ও কাপড়-চোপড় কিনতে আমাদের বিদেশি দূতাবাসগুলো ব্যবহার করেছিলেন।

আমার বাবার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, সরকারি তহবিল তসরূপ এমনকি ফৌজদারী অপরাধের একের পর এক অভিযোগের স্তূপ বানিয়ে ফেলল সামরিক সরকার। তারা জানত বন্দি অবস্থায় তার পক্ষে এসব মিথ্যা অভিযোগ প্রমাণ করা কঠিন হবে। বাড়তি সতর্কতার জন্য

তার ব্যক্তিগত সচিবকেও তারা কারাগারে রাখে। কিন্তু আমার বাবার নথিপত্র রাখার পদ্ধতি ৬০-এর অধিক মামলায় তাকে দুর্দমনীয় প্রতিপক্ষ প্রমাণ করেছিল।

আমার বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো খণ্ডন করতে করাচিতে তার নথিপত্রে প্রয়োজনীয় সবকিছু আমি দেখলাম। দিনের পর দিন পারিবারিক হিসাব বিবরণী পড়লাম, আইনজীবীদের তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দ্রুত পৌঁছে দিলাম, আগামী দিনে যা যা দরকার তার নির্দেশনা নিতে থাকলাম। আমার বাবার প্রত্যেকটি ব্যয় আলাদা করে রেকর্ড করা ছিল। ১৯৭৩ সালে থাইল্যান্ড সফরে ২৪ ডলার মূল্যের কাপড়ের ক্রয় রিসিট, অথবা ১৯৭৫ থেকে ২১৮ ডলার মূল্যের ইতালীয় দেয়াল কাগজের আঠার রশিদ। এমনকি তিনি তার নিজের পড়ার চশমা কেনার অর্থও পরিশোধ করেছিলেন। এ ঘটনা আমাকে বিস্মিত করেছিল। কারণ প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য সুবিধা বিনামূল্যে দেয়ার নিয়ম ছিল। কিন্তু এসব অভিযোগের অসারতা কখনই সংবাদপত্রে ছাপা হয়নি। সেখানে শুধু অভিযোগগুলোই ছাপা হয়। অভিযোগগুলোর অসারতা আমাদের নিজস্ব ব্যবস্থায় মুদ্রণ করালাম এবং তা জনগণের মধ্যে বিলির ব্যবস্থা করা হলো।

আমরা প্রচারপত্রও বের করি। পরে এসব নিয়ে 'ভুট্টো : গুজব ও বাস্তবতা' নামে গ্রন্থ বের হয়। এতে আমার বাবার বিরুদ্ধে গুজবগুলোর রূপরেখা দিয়ে তা খণ্ডন করা হয়। প্রচারপত্র তৈরি ছিল ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কারণ আমার বাবা সম্পর্কে ইতিবাচক যে কোনো ধরনের লেখাজোখা ছিল রাষ্ট্রদ্রোহের সামিল। এসব মুদ্রণ বা বিলির সঙ্গে জড়িতদের জেল এবং তা বাজেয়াপ্তকরণ হতে পারত। পাকিস্তানি ও বিদেশি সাংবাদিক যারা আমার বাবা ও পিপিপির বিরুদ্ধে সামরিক সরকারের প্রপাগান্ডার সঙ্গে ভেসে গিয়েছিল তাদের জন্য ওই মিথ্যা প্রমাণগুলো দরকার ছিল।

'ধর্মঘট, বিক্ষোভ অথবা অন্যকিছুর জন্য জনগণকে আহ্বান জানানোর অধিকার আমাদের রয়েছে।' দলীয় নেতাদেরকে আমি বললাম। আমাদের ভাড়া করা বাড়িতে রাতে গোপন সভায় যোগ দিতে নেতারা এসেছিলেন। কিন্তু নেতারা আমার কথায় ভীত হয়ে আপত্তি করলেন। আমাদের দলীয় লাইন ঠিক না করা পর্যন্ত কোনো কিছুই করবেন না।' তারা একথা বারবার বলতে থাকলেন। তাদের অনীহায় আমার ধৈর্যচ্যুত ঘটল। 'চলুন আমরা মাজারে গিয়ে প্রার্থনা করি।' সামরিক সরকার ইসলাম-ইসলাম-ইসলাম বলে প্রত্যেকের মাথা চাপড়াচ্ছে– এ বিশ্বাস থেকে আমি এই প্রস্তাব দিলাম। ধর্মীয় ব্যক্তিদের মাজারে প্রার্থনা করার সময় আমাদেরকে গ্রেফতার করতে সাহস পাবে না সরকার। আমার প্রস্তাবটি গৃহীত হলো। দেশের সব মসজিদ ও মাজারে পিপিপি কর্মীরা সমবেত হতে শুরু করলো। তারা আমার বাবার মুক্তির জন্য পবিত্র কোরান তেলাওয়াত ও নামাজ পড়া শুরু করলেন। কিন্তু মাজারেও সামরিক সরকারের কঠিন হস্তক্ষেপ নেমে এলো।

গ্রেফতার ও মারপিট চলতে থাকলো। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরেই গ্রেফতারের মোট সংখ্যা দাঁড়াল ৭শ'। সামরিক অভ্যুত্থানের পর আমার বাবার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণ দিতে আটক হওয়া মাসুদ মাহমুদ ও অন্য বেসামরিক কর্মকর্তাদেরকে সামরিক সরকার কি করেছিল তা লারকানার ডেপুটি কমিশনার খালিদ আহমেদের মামলাটি বলে দেয়। জিয়ার একটি লিখিত আদেশ নিয়ে দুই সেনা খালিদ আহমেদের বাসায় এসেছিলেন। তার স্ত্রী আজরা আমাকে বলেন, 'আগামীকাল আমি যদি তোমাকে ফোন না করি তাহলে বুঝবে কোনো খারাপ কিছু হয়েছে।' তাকে সৈন্যরা নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি একথা বলেন।

www.pathagar.com

তারপর কোনো ফোন এলো না। অবশেষে তিনি এক মাস পর ইসলামাবাদের একটি কারাগারে তার স্বামীকে শনাক্ত করলেন। তিনি বললেন, 'ওই দিনের কথা আমি ভুলতে পারবো না।' তার মুখ ছিল ধূসর, তার ঠোঁট দুটো শুষ্ক ও ফাঁটা। তার মুখের চারদিকে সাদা থুথুর প্রলেপের মতো সাদা দাগ। তার শরীরের সংবেদনশীল অংশে বৈদ্যুতিক শক দেয়া হয়েছিল। আদালতে ভুট্টোর বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতে তাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল তারা।'

খালিদ পাঁচ মাস নিঃসঙ্গ কারাবাস করেন। কারাগার সংলগ্ন উঁচু সমতল জায়গায় একটি বাগানে প্রত্যেক বিকেলে আজরা যেতেন। যেখান থেকে কারাগারের বারান্দা দেখা যেত। তিনি বলেন, 'দিনে আধা ঘণ্টা ব্যায়াম করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল তাকে।' তিনি বলেন, 'শুধুই তাকে এক নজর দেখার জন্য আমি বাগানের বেঞ্চে কয়েক ঘণ্টা ধরে বসে থাকতাম। তিনি যে বেঁচে আছে তা নিশ্চিত করতে প্রতিদিন ওই বাগানে যেতাম।' বাবার প্রথম গ্রেফতারের অল্প কিছুদিন পর সামরিক আইনে তার আটকাদেশের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে আমার মা হাইকোর্টে যে রীট করেছিলেন। এর ফলে খালিদ আহমেদ এবং সম্ভবত অন্য কয়েকজনের জীবন রক্ষা পেয়েছিল। ১৯৭৭ সালের নভেম্বর সামরিক আইনকে সুপ্রিমকোর্ট বৈধতা দেয়। যদি অন্য কোনো খাবার সহজে না পাওয়া যায় তবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পবিত্র কোরানে মুসলমানদেরকে শূকরের মাংস খাওয়ার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। কোরানের এই ব্যাখ্যাকে রেখে সুপ্রিম কোর্ট সামরিক আইনকে 'অনিবার্য' হিসেবে ঘোষণা করে। তবে আদালত পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দেয় সামরিক আইন সীমিত সময়ের জন্য। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করতে সরকার ঘোষিত প্রয়োজনীয় নয় মাসই হবে সামরিক আইনের মেয়াদ।

বিচারকদের জারি করা রুলে আরো বলা হয়, সামরিক আদালত গৃহীত ব্যবস্থাগুলোর বিচারিক পর্যালোচনা উচ্চ বেসামরিক আদালতে অব্যাহত থাকবে। বেসামরিক আদালতে বিচারিক পর্যালোচনার এখতিয়ার ছাড়া সামরিক অভ্যুত্থানের পর গ্রেফতার হওয়া রাজনৈতিক কর্মী, সরকারি চাকরিজীবীসহ হাজার হাজার মানুষ তাদের আটকাদেশের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন করতে সক্ষম হতেন না। যদিও আমি আটক থাকাকালে আমার আপিলসহ সব আপিল বেঞ্চে পৌঁছুতে অনেক মাস সময় নিয়েছিল। তবে ওই সময়ে বেসামরিক আদালতের মাধ্যমে অন্তত কিছু একটা হবে বলে আশা ছিল।

১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে খালিদ আহমেদকে মুক্তি দেয় হাইকোর্ট। কারণ তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সামান্যতম প্রমাণও ছিল না। এমনকি গ্রেফতার আদেশও ছিল না। কিন্তু সামরিক সরকার আদালতের রায়কে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে জেল থেকে মুক্তি দেয়ার পর পরই আবার গ্রেফতার করে। যেভাবে আমার বাবাকে ফের গ্রেফতার করেছিল। সামরিক কর্মকর্তাদের আবার গ্রেফতারের কারণ জিজ্ঞেস করলে শুধু বলতো, উপরের থেকে আদেশ। আর এখন একই কাজ খালিদের ক্ষেত্রেও করলেন। সাবেক এ কমিশনার মুক্তি পাওয়ার পর তার এক বন্ধু তাকে সতর্ক করেছিলেন যে, তিনি আবারো সামরিক আইনের (আদেশ নং ২১) আওতায় গ্রেফতার হতে পারেন। সরকারি গাড়ি ও এয়ারকন্ডিশনার ব্যবহারের জন্য তাকে গ্রেফতার করা হতে পারে। একটি এয়ার কন্ডিশনার! আজরা বললেন, 'আমি তাকে অনুনয়-বিনয় করে দেশ ছাড়তে বললাম।' তার চোখ দুটো তখন পানিতে ভরা। তার স্বামী ওই রাতেই লন্ডনের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করেন। তাকে বিদেশে থাকতে বাধ্য করায় তার মামলাগুলো এখনও ঝুলে আছে। তাদের দুই সন্তানকে আজরা

www.pathagar.com

একাই দেখাশোনা করেন। এ পরিবারসহ অন্যদের ওপর এরকম অবিচারের শুরুটা ছিল ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে। দুই সপ্তাহ পরে তা আরো তীব্র করে তোলে।

টিয়ারগ্যাস, আর্তনাদ আর মানুষের দৌড়াদৌড়ি। আমার ঘাড়ে তীব্র ব্যাথা অনুভব করলাম। 'মা তুমি কোথায়? তুমি কি ঠিক আছো, মা?'

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৭। ভারতের কাছে আমাদের সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের বার্ষিকী। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়াম। বিচার থেকে আমাদের মনকে একটু দূরে সরিয়ে রাখতে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই আমরা। আমাদের কাছে মহিলাদের জন্য টিকেট ছিল। আমরা সেখানে পৌঁছে দেখি মাত্র একটি গেট খোলা। অন্যগুলো বন্ধ। একমাত্র খোলা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকি। দর্শকদের আনন্দ আর উল্লাসের শুরুটা দেখতে পেলাম। কিন্তু হঠাৎ ক্রিকেটাররা মাঠ ছাড়লেন! আমার মুখের সামনে দ্রুত ভারী কিছু চলে গেল।

'টিয়ার গ্যাস! টিয়ার গ্যাস!' আর্তনাদ শুনি আমি। মানুষ আতঙ্কিত হয়ে বের হওয়ার দরজার (যেটি আটকানো ছিল) দিকে ছুটছে। আমি শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছি না। দেখতেও পাচ্ছি না! গ্যাসের প্লাবনে আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসতে শুরু করে। আমার ফুসফুস কি বাতাস পাচ্ছে? আমার ঘাড়! আমি প্রায় পড়েই যাই। 'মা!' আমি ডাক দিলাম। 'মা!'

আমার ডাকে তিনি মাথা তোলেন। তার মাথার গভীর ক্ষত থেকে রক্তের ধারা বইছে। 'হাসপাতাল', আমার মা'কে হাসপাতালে নিতে হবে। আমি আর্তনাদ করে উঠি। আমার মা শান্তভাবে বললেন, 'না'। আমরা প্রথমে সামরিক আইন প্রশাসকের কাছে যাব।

তার মুখে রক্তের ডোরাকাটা দাগ। পোশাকে লাল ফোটা ফোটা দাগ। জনতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাই এবং একটি গাড়ি দেখতে পাই। তিনি বললেন, সামরিক আইন প্রশাসকের বাড়িতে আমাদের নিয়ে চলো। সামরিক আইন প্রশাসকের ভবনের গেটের নিরাপত্তারক্ষী আমাদের দেখে মর্মাহত হলেন এবং ভেতরে ঢুকতে দিলেন। গাড়ি থেকে মা নামার সময় আমার পেছনে জেনারেলের গাড়ি এসে থামে।

এদিনটি তোমার কি মনে আছে, জেনারেল? তিনি বললেন। জিয়ার নিয়োগ করা পাঞ্জাবের সামরিক আইন প্রশাসক ইকবালকে তিনি বললেন, 'এই দিনে তোমরা ভারতীয় সেনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলে। আর আজকের দিনে তোমরাই আমার রক্ত ঝরিয়েছো। তোমাদের নিজেদেরই লজ্জা পাওয়া উচিত। সম্মান শব্দটি তোমাদের জানা নেই। কেবলই অসম্মান।'

তিনি আমার মা'র দিকে তাকিয়ে হকচকিয়ে গেলেন। এরপর সদর্পে আমার মা ফিরে এসে গাড়িতে উঠলেন। আমরা সরাসরি হাসপাতালে যাই। সেখানে তার ক্ষতস্থানে ১২টি সেলাই দিতে হয়।

ওই দিন বিকেলে আমি বাসায় গ্রেফতার হই। আর আমার মা গ্রেফতার হন হাসপাতালে। পরদিন জিয়া ওই ঘটনা নিয়ন্ত্রণের জন্য পাঞ্জাব প্রশানসকে অভিনন্দন জানাতে টেলিভিশনে হাজির হলেন। অন্যদিকে আমার বাবা 'উচ্ছনেন যাক' বলায় তাকে আদালত থেকে সরিয়ে নেয়া হয়। এর আগে তিনি বোঝার চেষ্টা করছিলেন, আসলে আমাদের কি হয়েছে। প্রধান বিচারপতি বললেন, 'তার জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে

www.pathagar.com

দূরে রাখো।' পরদিন আমার বাবা আদালতে অবিচারের অভিযোগ এনে একটি আবেদন করেন। তবে তা নাকচ করে দেয়া হয়।

লাহোরে আমাদের আসবাবপত্রবিহীন বাড়িটি তালবদ্ধ করা হলো। জিয়া আমাদের মনোবলকে যে ধ্বংস করতে চাচ্ছেন তা আমি এই প্রথমবারে মতো পরিস্কারভাবে দেখলাম। ক্রিকেট ম্যাচে আমাদের ওপর হামলা যে পূর্বপরিকল্পিত, আমার মনে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। গেটগুলো পুলিশ নিজেরাই বন্ধ করেছিল। যাতে আমরা তাদের টিয়ারগ্যাস ও বাঁশের লাঠির স্রোতে ফিরে যেতে বাধ্য হই। এ ঘটনার অনেক ইঙ্গিত ছিল। এর আগে শাস্তি কিংবা হয়রানি করার জন্য নারীদের কখনোই আলাদা করে বেছে নেয়া হয়নি। অতীত পাকিস্তানে আমাদের যেসব ঘটনার কখনোই কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, আমরা তার মধ্যেই প্রবেশ করছিলাম।

এক সপ্তাহের মধ্যে আমার মা আমার সঙ্গে জেল হাজতে যোগ দিলেন। তার মাথায় তখনও সেলাই ছিল। কি ঘটতে যাচ্ছে– অবিশ্বাসের সুরে আমরা একে অপরের কাছে প্রশ্ন রাখলাম। আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি, তা কি সত্যিকার অর্থেই বাস্তব! এসব বোঝার জন্য আমাদের মন ঠিক প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু আগাগোড়া আমাদের কিসের সম্মুখীন করা হচ্ছিল সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। প্রত্যেকটি নতুন নতুন নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ড আমাদের জন্য একটি একটি করে প্রচণ্ড ধাক্কা বয়ে আনছিল। একই সঙ্গে জন্ম দিচ্ছিল আরেকটি নতুন প্রতিজ্ঞার।

পাকিস্তানে ফিরে এসে আমি প্রথম নববর্ষ কাটালাম কারাগারে। ঠিক এক বছর আগে অক্সফোর্ড থেকে আমি আল মুর্তাজায় ফিরে এসেছিলাম। সে সময় আমার বাবার জন্মদিনে জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। এখন আমার বাবা তার জন্মদিনে কারাগারে। আমার মা এবং আমি আমাদের ১৫ দিনের কারাবাসের দিনগুলো গুণে গুণে পার করছিলাম।

আমার বাবার কাছে নির্ধারিত দিনে যাওয়া-আসার বিষয়টি আমাকে কষ্ট দিত। তবে তাকে দেখে আমি সব সময় আনন্দিত হতাম। এবং তার হাতে লিখে রাখা নির্দেশনাগুলো আমি নিয়ে আসতাম। এগুলো তিনি হলুদ বৈধ কাগজে লিখে তার সেলে স্তূপ করে রাখতেন। তার সেলের খরাপ অবস্থা ছিল। মেঝে ময়লা। তার জন্য আরও কত বেশি খারাপ সেল অপেক্ষা করছে তা আমার কমই জানা ছিল।

পরবর্তীকালে কর্তৃপক্ষ মানসিকভাবে অপ্রকৃতস্থ একদল বন্দির সঙ্গে আমার বাবাকে রেখেছিল। প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গণে অন্য রাজনৈতিক বন্দিদের ওপর বেত্রাঘাতের শব্দ শোনার ব্যবস্থাও নিশ্চিত করেছিল তারা। কোনো কোনো সময় তাদের মুখে মাইক্রোফোন গুঁজে দেওয়া হত। কিন্তু তাকে ভাঙতে পারেনি সামরিক শাসক। 'আমার নীতিবোধ অনেক উঁচু।' কারাগারে তার সঙ্গে দেখা করার সময় একদিন তিনি একথা আমাকে বলেছিলেন। 'আমি কাঠ দিয়ে তৈরি নই যে আমাকে সহজেই পোড়ানো যাবে।'

কারাগারের বাইরে তখন বিক্ষোভের আগুন জ্বলছিল। যাই হোক ১৯৭৮ সালের জানুয়ারির প্রথমদিকে গণহত্যার ব্যাপারে সামরিক সরকার তার প্রথম পরিকল্পনা করলেন। আমার মা আর আমি গ্রেফতার হওয়ার আগে জানুয়ারির পাঁচ তারিখকে গণতন্ত্র দিবস হিসেবে ঘোষণা

www.pathagar.com

দিল পিপিপি। তারিখটি ছিল আমার বাবার জন্মদিন। বোনাসের দাবিতে মুলতানের কলোনী টেক্সটাইল মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে আসছিল। অতীতে তারা এ বোনাস পেলেও তাদের শিল্প মালিকরা এটি কেটে রেখেছিল। তারা গণতন্ত্র দিবসে বিক্ষোভ করবে বলে ঠিক করলো। তবে তারা আর কখনোই ওই সুযোগটি পায়নি।

গণতন্ত্র দিবসের তিন দিন আগে সেনাবাহিনী মিলের গেটগুলো বন্ধ করে দিয়ে ছাদে অবস্থান নেয়। এরপর তারা নিচে শ্রমিকদের ফাঁদে ফেলে গুলি করা শুরু করে। উপমহাদেশে দেখা ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মধ্যে এটি ছিল সবচেয়ে জঘন্যতম। আমাদের বলা হয়েছিল কয়েকশ মারা গেছে। আসলে কেউই জানে না সংখ্যাটি কত! কেউ কেউ বলেছিল দুইশ', আবার কারো কারো মতে তিনশ'। কয়েকদিন ধরে মাঠ, নর্দমা থেকে লাশ পাওয়া গিয়েছিল।

সবচেয়ে ভয়াবহ জুলুমের দিন হিসেবে হাজির হয়েছিল গণতন্ত্র দিবস। দেশজুড়ে পিপিপির কয়েক হাজার সমর্থক গ্রেফতার হয়েছিল। এর সঙ্গে দেশে অমানুষিক অত্যাচার আরো তীব্র হয়।

ভুট্টো দীর্ঘজীবী হোক অথবা গণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক বলার জন্য যে কারোর ওপর নেমে আসতো নির্যাতন। একইভাবে পিপিপি পতাকা প্রদর্শনের জন্যও শাস্তি পেতে হলো। সামরিক সরকার তার আইনকে দ্রুতই প্রয়োগ করতো। প্রায়ই মাত্র একঘণ্টার মধ্যে সাঁজা দেয়া হতো। কোট লাখপাত কারাগারে বন্দিদের হাত পা টান টান করে সরু চামড়ার রশি দিয়ে বেঁধে বেত্রাঘাত করা হতো। দ্রুত মৃত্যু ঠেকাতে বেত্রাঘাতের শিকার বন্দিদের নাড়ি পরীক্ষা করতে ডাক্তারদের ডাকা হতো। প্রায়ই স্মেলসল্ট (ঝাঝালো গন্ধ) দিয়ে ওইসব বন্দির জ্ঞান ফেরানোর ব্যবস্থা ছিল যাতে বেত্রাঘাতের নির্ধারিত সংখ্যাটি (সাধারণ ১০ থেকে ১৫টি) পূর্ণ করা যায়। কারাগারের বাইরে সাধারণ জনগণকে বেত্রাঘাত করার বিষয়টি নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ালো। ভ্রাম্যমাণ সামরিক আদালতের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। একজন সামরিক আইন কর্মকর্তার নেতৃত্ব বাজারে বাজারে আদালত বসতো। সেখানে ব্যবসায়ীরা ওজনে ফাঁকি দেয়, বেশি দামে কিংবা খারাপ পণ্য বিক্রি করছে কিনা আদালত খতিয়ে দেখতো। একদিন শুক্কুরে একজন সামরিক কর্মকর্তা স্থানীয় যে কোনো একজনকে তাদের হাতে তুলে দিতে অনুরোধ করলেন। ওই কর্মকর্তা বললেন, 'বেত্রাঘাত করতে আমাদের কয়েকজনকে দরকার।' দোকানীরা ভেবে পেল না কি করবে তারা! অবশেষে কালো বাজারে এক চিনি বিক্রেতাকে সামরিক কর্মকর্তার হাতে তুলে দিল। তাকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হলো। যদিও বাজারে এই অপরাধের সঙ্গেই প্রায় সবাই জড়িত ছিলেন।

এরকম বর্বরতা দেখার জন্য্য আমার জীবনে কোনো প্রস্তুতি ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডে সমাজের পুরো কাঠামো সম্পর্কে আমার যা জানা ছিল এবং ১৯৭৩ সালের সংবিধান অনুযায়ী পাকিস্তানে বসবাসের যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল তা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল।

আমাদের কারাবাসের শেষ দিনে গেটগুলো খোলা হলো এবং ম্যাজিস্ট্রেট ভেতরে এলেন। কিন্তু আমাদের বের হতে দেয়া হলো না। এর পরিবর্তে নতুন করে আরো ১৫ দিনের জন্য আটকাদেশের নোটিশ আমাদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হলো। আরো একটি বৈধ আইনি ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আমার বাবার বেসামরিক সরকারের সময়ে ভবিষ্যৎ

www.pathagar.com

অপরাধ এড়াতে আটকাদেশের নির্দেশ ছিল পুরোপুরি সংরক্ষিত। কেউই ক্রমাগত কিংবা বারবার আটকাদেশ পেত না। শুনানি হত আদালতে। আর এখন একটি নতুন ও ভয়ঙ্কর পাকিস্তানের ইতিহাস লেখা হয়ে থাকলো।

মুক্তি, বন্দি, আবার মুক্তি। আবার বন্দি। বাবার বিচার চলাকালে সরকার এভাবেই তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে। মা'কে এবং আমাকে এত ঘন ঘন বন্দি করা এবং মুক্তি দেয়া হয় যে, আমাদের পক্ষে যেকোনো ধরনের পরিকল্পনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। ১৯৭৮-এর প্রথম কয়েক মাসে আমি বার বার আটক হই এবং আমার কাজকর্ম বাধাগ্রস্ত হয়। কখনও কখনও হয়ত সরকার নিজেও জানতো না যে আমাকে আটক করা হচ্ছে না মুক্তি দেয়া হচ্ছে।

মা ও আমি লাহোরে আটকাবস্থা থেকে মুক্তি পাই জানুয়ারির মাঝামাঝি। সঙ্গে সঙ্গে আমি করাচি যাই। সেখানে আয়কর বিভাগ আমাকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ? আমাকে আমার দাদার বিষয় সম্পত্তি এবং ঋণের একটা তালিকা দিতে বলা হয়েছিল। যদিও দাদা মারা যান আমার চার বছর বয়সে। আমাকে বলা হয়েছিল যথা সময়ে সেখানে আমি উপস্থিত হতে না পারলে আমার বিরুদ্ধে একতরফা সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। মধ্যরাতে আমি ৭০ ক্লিফটনের বাড়িতে পৌঁছাই।

ঠক! ঠক! শব্দে রাত দুটোয় আমি জেগে উঠি। আতঙ্কিত হয়ে জানতে চাই, 'এটা কি হচ্ছে?' – চার মাস আগে কমান্ডোরা যে আমার ঘরে ঢুকে পড়েছিল সেই থেকে আতঙ্ক আমার কাছ ছাড়া হয়নি। 'পুলিশ সারাবাড়ি ঘিরে ফেলেছে', দোস্ত মোহাম্মদ বলল। আমি নিচতলায় গেলাম।

'আমরা আপনার লাহোরে যাবার জন্য সকাল সাতটার বিমানে বুকিং দিয়েছি', অফিসার বললেন, 'আপনাকে সিন্ধু ছেড়ে যেতে হবে। 'কেন?' আমি প্রশ্ন করলাম, 'আমি সবেমাত্র এখানে আসছি আমার বিরুদ্ধে আনা সরকারের অভিযোগগুলোর জবাব দিতে।' অফিসার বললেন, 'জেনারেল জিয়া ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ক্যালাহান-এর সঙ্গে একটা ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে এখানে আসছেন।' মুহূর্তের জন্য আমি কথা হারিয়ে ফেললাম। 'এর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?' আমি জানতে চাইলাম, 'আমি জানিও না যে এখানে একটা ক্রিকেট ম্যাচ হবে।'

'প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক চান না যে এখানে কোনো ধরনের ঝামেলা হোক। আপনি ম্যাচ দেখতে যেতে চাইতে পারেন, এজন্য তিনি আপনাকে এখানে না থাকার আদেশ দিয়েছেন;' অফিসার বললেন। সকাল ছ'টায় আমাকে পুলিশ প্রহরায় বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আমি লাহোরগামী বিমানে উঠে বসি। মনে আমার একটাই প্রশ্ন, কেন এই দিনে তারা আমাকে নিজের ঘরেও থাকতে দিল না?

দুইদিন পর লাহোরে আমার বন্ধুদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজের সময় পুলিশ বাড়িটিকে ঘিরে ফেলে। 'আপনাকে পাঁচ দিনের জন্য আটক করা হচ্ছে'– দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমাকে বলেন। 'কেন?' আমি প্রশ্ন করি। 'কারণ এখন দাতা সাহেবের মৃত্যু বার্ষিকীর সময়', অফিসার বললেন। দাতা সাহেব অতি শ্রদ্ধেয় সাধক মানুষদের একজন; তার বিষয়টা আমারও জানা ছিল। 'আপনি তার সমাধিতে যেতে চাইতে পারেন। সে কারণে আর কি...'।

আবার আমি মায়ের সঙ্গে বন্দি থাকতে চললাম। আমি ঘরে পা দিয়ে তাকে সহিষ্ণু

www.pathagar.com

দেখলাম। আমাদের চিঠিপত্রের যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফোন লাইন কেটে দেয়া হয়েছে। ফেব্রুয়ারির প্রথমে ছাড়া পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি বাবাকে দেখতে যাই। আটক থাকার কারণে তিনটি মূল্যবান দিন আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারিনি। যাইহোক, আদালতের কোনো সেশন আমি হারাইনি।

প্রধান বিচারপতি ওয়ার্ল্ড প্রেসকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছিলেন যে, বিচার দিনের আলোর মতো প্রকাশ্যে হবে, কিন্তু ২৫ জানুয়ারি বাবার সাক্ষ্য নেয়ার দিন, আদালত সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ ছিল। ওয়ার্লড প্রেসকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল অভিযোগ শুনানির সময়, কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় কেউই সেখানে হাজির ছিলেন না। আদালতের এই পক্ষপাতিত্বের কারণে বাবা তার আইনজীবীদের প্রত্যাহার করে নেন। পরের সময়টুকু তিনি নীরব দর্শকের মতো বিচার প্রক্রিয়া দেখতে থাকেন। আমার বাবা ছিলেন পাকিস্তানের দক্ষিণ প্রান্ত সিন্ধু'র লোক। সে কারণে পাঞ্জাবের প্রধান বিচারপতি শুনানির ইন ক্যামেরা সেশনে সিন্ধিদের বিষয়ে তার জাতি-বিদ্বেষ তুলে ধরেন। বাবা এবং পিপিপি'র হাইকমান্ড প্রধান বিচারপতির এই পক্ষপাতিত্বের কারণে পুনঃবিচার দাবি করলে তা কোনো কাজে আসেনি।

বাবার মামলায় যখন আমি সাহায্য করছিলাম মা সে সময় কাসুরসহ পাঞ্জাবের নানা জায়গা সফর করছিলেন। তিনি কাসুরে মুসলিম দরবেশ বুবা বুল্লা শাহ'র সমাধিতে গিয়ে প্রার্থনা করেন। কোট লাখপাত জেল থেকে বাবা আমাকে সিন্ধুতে যেতে বলেন। বলেন, 'তুমি এবং তোমার মা দুজনেই পাঞ্জাবে সব সময় ব্যয় করছো। বরং পিপিপি কর্মীদের কর্মোদীপ্ত করতে তোমরা সফর শুরু করো।'

করাচি থেকে লারকানায় আমি এমনভাবে যাচ্ছিলাম যাতে সবাই মনে করে যে আমি আমার পূর্বপুরুষদের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যেই যাচ্ছি। অবশ্য রওয়ানা হওয়ার সময় আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। আমি যখন করাচিতে, মায়ের সাবধান বাণী দেখলাম, 'জিয়ার নিন্দা বা সমালোচনা করো না, বরং মূল্যবৃদ্ধির মতো বিষয়ে কথা বল। তুমি সেখানে এমনভাবে কাজ করবে যেন তা দলের কাজে আসে এবং দলের গতি আনে।' তিনি লাহোর থেকে লিখে ছিলেন– তিনি গোপনে মুলতান যান একটা টেক্সটাইল ফ্যাক্টরির নিহত-আহত শ্রমিক-কর্মচারির পরিবার পরিজনদের সান্ত্বনা দিতে।

এছাড়া তিনি আমাকেও গ্রেফতার হওয়া দলীয় কর্মীদের নামের তালিকা এবং তাদের পরিবারকে দেয়ার জন্য টাকাও দেন। এই টাকার বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয় পরিবারের সদস্য সংখ্যার অনুপাতে। 'যদি গ্রেফতার হওয়া মানুষটা হন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তাহলে তাদের ঠিকানা নিয়ে এসো যাতে সে ছাড়া পাবার পূর্ব পর্যন্ত মাসে মাসে তাদের বাড়ির ঠিকানায় আমরা টাকা পাঠাতে পারি', মা লেখেন আমাকে। এবং লেখা শেষ করেন: 'তোমার মার্সিডিজে যাওয়া উচিত। এটা মজবুত এবং নির্ভরযোগ্য, আর গতিও ভালো। তোমার জন্য অনেক ভালোবাসা– তোমার মা।'

মুসওয়াত পত্রিকায় আমার যাত্রার খবর ছাপা হয়। ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ আমার প্রথম সিন্ধু-সফর শুরু হয়। আমার সাথে যান মুসওয়াতের একজন বক্তৃতা-লেখক, একজন রিপোর্টার এবং একজন আলোকচিত্রী। এছাড়া আমার অভিভাবক হিসেবে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন পিপিপি'র সিন্ধু অঞ্চলের মহিলা শাখা প্রধান বেগম সুমরো।

আমরা যাবার পথে অতিক্রম করি থাট্টা, যেখানে আলেকজান্ডার তার সেনাদলসহ অবস্থান নিয়েছিলেন, হায়দ্রাবাদ, যেখানকার বাড়িগুলোতে ঘরের ভিতর প্রাকৃতিকভাবে ঠাণ্ডা

বাতাস প্রবাহের প্রাচীন পদ্ধতি রয়েছে। সারাটা পথ মানুষের ভিড় আমাদের গাড়ির ওপর উপচে পড়েছিল। যেকোন রাজনৈতিক সমাবেশ নিষিদ্ধ ছিল বলে আমরা সুবিধাজনক বাড়িগুলোর চার দেয়ালের মধ্যেই আলাপ-আলোচনা চালালাম। মাইকের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল বলে একটার পর আরেকটা বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় উঠোনে দাঁড়ানো মানুষের উদ্দেশে বলতাম, 'পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোর পক্ষ থেকে আমি আপনাদের জন্য সালাম ও অভিবাবদন বয়ে এনেছি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যেন জনসাধারণের বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনা।

থেরপারকার, সাংহার, বার এসোসিয়েশন, প্রেসক্লাব। যেখানে সম্ভব সেখানেই আমি বক্তব্য দিলাম। বললাম, সরকার অবৈধ। আমার বাবা এবং পিপিপির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ বানানো ও উদ্দেশ্যমূলক।

সাংহার ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্মি ট্রাক আমাদের পিছু নিল। আমাদের গাড়িগুলোর ফাঁকে ফাঁকে তারা ঢুকে পড়ল। যে বাড়িতে আমাদের রাত কাটাবার কথা ছিল সেখানেই আমরা থাকলাম কিন্তু তা বেয়নেটের নিচে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসে বললেন, 'আপনি আর এগুতে পারবেন না।' 'আপনি আমাকে লিখিত অর্ডার দেখান' আমি বললাম। তার কাছে কোনো অর্ডার ছিল না। আমাদের সঙ্গে সফররত পিপিপি- নেতা মাখদুম খালেক বললেন, 'সে আমাদের ভয় দেখাতে এসেছে। পরদিন আমরা নওয়াব শাহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম, সেখানে আমাদের সর্ববৃহৎ সভাটি হওয়ার কথা। কিন্তু আমরা সেখানে পৌঁছতে পারলাম না। খায়েরপুর– নওয়াব শাহ সীমান্তে নিরাপত্তা বাহিনীর লোক রাস্তা অবরোধ করেছিল। এবার তারা আমাকে লিখিত অর্ডার দেখালো। ফেব্রুয়ারির ১৮ তারিখে আমাকে নওয়াব শাহ থেকে করাচি পাঠানো হলো এবং করাচি থেকে অন্য কোথাও যাওয়া নিষিদ্ধ করা হলো। বাবার সঙ্গে আরেকবার আমার পাক্ষিক– সাক্ষাৎ করা হলো না।

১৯৭৮-এর মার্চ। করাচিতে একজন সাংবাদিক আমায় বললেন, 'জিয়ার ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে আমি খবর পেয়েছি যে, লাহোর হাইকোর্ট ভুট্টো সাহেবকে মৃত্যুদণ্ড দেবে।' এই সংবাদ আমি লাহোরে আমার মা'কে জানালাম। এছাড়া সিন্ধু এবং করাচির পিপিপির প্রধানদেরও আমি তা জানাই। যদিও এই কথা আমি বিশ্বাস করতে চাইনি কিন্তু তার আলামত ছিল সর্বত্র।

তিনজন অরাজনৈতিক অপরাধীকে মার্চের শুরুতে বন্দি করা হয় এবং লাহোরে সর্বসমক্ষে তাদের ফাঁসি দেয়া হয়। সংবাদপত্র এবং টেলিভিশনে খবরটা ব্যাপক প্রচার পায়। কোনো খেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মতো করে এই ফাঁসি কার্যকর ও প্রচার করা হয়। কালো কাপড়ে মাথা ঢাকা অবস্থায় মানুষগুলোকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানোর এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে প্রায় দুই লাখ লোকের সমাগম হয়েছিল। এ ঘটনা ছিল আমার বাবার ফাঁসির জন্য জনগণকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা। তবে ওই সময় ব্যাপারটাকে আমার কাছে একটা অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ বলে মনে হয়েছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে, সে ঘটনার এক বছর আগে আসগর খান তার নির্বাচনী প্রচারণায় বলেছিলেন, 'আমি ভুট্টোকে কোথায় ফাঁসিতে ঝুলাব, আটক ব্রিজে না একটা ল্যাম্পপোস্টে?'

আদালতের রায়কে কার্যকর করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছিল। সকল সরকারি

www.pathagar.com

ভবন এবং ব্যাঙ্কে সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। অস্ত্রসজ্জিত সৈনিকরা গাড়িতে করে রাওয়ালপিণ্ডিতে মহড়া দিচ্ছিল। নিরাপরাধ পিপিপি সদস্যদের গ্রেফতার করা হচ্ছিল এই বলে যে আমার বাবার বিষয়ে আদালতের রায় বেরুলে তারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পারে। তাদের বিরুদ্ধে লিখিত চার্জে বলা হচ্ছিল, ' যেহেতু আপনি, (সম্পূর্ণ নাম), ভুট্টোর বিচারে আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যা তৈরি করতে পারেন, তাই আপনাকে আটক করা হলো।' জিয়া যেমন বলতেন বিচার বিভাগ যদি তেমনি স্বাধীন এবং বিচার ব্যবস্থা যদি তেমনি নিরপেক্ষ হতো তাহলে কী রায় হবে সরকার তা কি করে জানল?

অজস্র মানুষকে বন্দি করা হলো। পাঞ্জাব থেকে ৮০,০০০ সীমান্ত প্রদেশ থেকে ৩০,০০০ এবং সিন্ধু থেকে ৬০,০০০। এতো মানুষ বন্দি হলো যে, সরকারকে পাকিস্তান জুড়ে বন্দি শিবির স্থাপন করতে হলো। ঘোড়দৌড়ের মাঠ পরিণত হলো উন্মুক্ত বন্দি শিবিরে, সেখানে ছিল না কোনো ধরনের জীবন-যাপনের উপকরণ– কেবল বৈদ্যুতিক তার দিয়ে সেটা ঘিরে ফেলা হলো আর চারদিকে বসানো হলো সশস্ত্র প্রহরা। খেলার স্টেডিয়ামও খণ্ডকালীন কারাগার বনে গেল। মহিলারাও এসময় বন্দি হলেন, এমনকি অনেকে শিশু সন্তানসহ।

১৫ মার্চ, ১৯৭৮। কিশওয়ার কাইয়ুম নাজামি, প্রাক্তন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যের স্ত্রী :

আমি ও আমার স্বামী রাত একটায় বন্দি হই। পুলিশ সারা বাড়ি ঘিরে ফেলে। একটা খোলা সামরিক গাড়িতে করে আমাদের জেলখানায় নিয়ে আসা হয়। আমাদের শিশু সন্তানের বয়স মাত্র কয়েক মাস হওয়ায় তাকেও আমি সাথে নেই। কোট লাখপাত জেলের তরফ থেকে জানানো হয় যে, সেখানে মহিলা রাজবন্দিদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। পরে অবশ্য তারা আমাকে অন্য আরও ছয়জন মহিলার সঙ্গে একটা স্টোর রুমে আটকে রাখে। এ ছয়জনের মধ্যে ছিলেন ভুট্টো সাহেবের আইনজীবীর বোন রেহানা সরোয়ার এবং পাঞ্জাবের মহিলা পরিষদের প্রেসিডেন্ট খাকওয়ানী। বেগম খাকওয়ানী পুলিশের কাছে আমাদের বন্দি করার কারণ জানতে চাইলে পুলিশ বললো– 'ভুট্টোর বিষয়ে কিছু প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে এটা করা হয়েছে।' 'কিন্তু আপনারা কিভাবে জানেন যে এই সিদ্ধান্ত ভুট্টোর বিপক্ষে যাবে? খাকওয়ানী বললেন।' পুলিশ সে কথার কোনো উত্তর দিল না।

সেখানে কর্তব্যরত জেলের ম্যাট্রন এসে আমাদের তল্লাশি করল এবং আমার বিয়ের আঙটি আর হাতঘড়ি নিয়ে গেল। পরে জেল ছাড়ার সময় আমি এগুলোর কথা জিজ্ঞেস করলে তারা বলল যে সেগুলো হারিয়ে গেছে। যে ঘরে আমাদের রাখা হয়েছিল সেখানে না ছিল কোনো বিছানা না কোনো টয়লেট– সেখানে ছিল কেবল একসারি ইটের স্তূপ। যাহোক, আমাদের একটুও ঘুম হয়নি। পাশের খোলা জায়গায় পুলিশ সেই মধ্য রাতেই রাজবন্দিদের চাবুক মারতে শুরু করে। মানুষগুলোর পিঠের ওপর দগদগে দাগ থেকে গণনা করা যাচ্ছিল যে কতটা করে কষাঘাত তাদের করা হয়েছে। যে লোকটা চাবুক মারছিল সে ছিল একজন কুস্তিগির। তার পরনে ছিল একটা নেংটি। সারা শরীর তার ছিল তৈলাক্ত। পাশে বসা ছিল একজন সেনা অফিসার। সে আদেশ করা মাত্র লোকটা, সম্ভবত শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ছুটে ছুটে যাচ্ছিল আর চাবুক মারছিল। প্রতিটি পর্বে বিশ

www.pathagar.com

থেকে ত্রিশ জনকে চাবুক মারা হচ্ছিল এবং সামরিক অফিসারটি প্রতিজনকে মারা চাবুকের সংখ্যা গুনছিল। চাবুক খাওয়া এসব বন্দিদের আর্তনাদ আমরা রাতভর শুনলাম। একটা করে চাবুক তাদের পিঠের ওপর আঘাত করছিল আর তারা বলছিল– 'জিয়ো ভুট্টো'– ভুট্টো দীর্ঘজীবী হোন! আমি কানে আঙুল দিলাম আর.প্রার্থনা করলাম যেন আমার স্বামী তাদের মধ্যে না থাকেন। তবে ১৯৭৭-এর সেপ্টেম্বরে তাকে একবার চাবুক খেতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় দিন সকালে আমাদের হঠাৎ ছেড়ে দেয়া হয়। আমরা ব্যস্ত হয়ে গেটের দিকে যেতেই আমাদেরকে পুনরায় বন্দি করা হলো– এবার আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে। শাসকরা পরে অনুধাবন করেছিলেন যে, আদালতের রায়ের আগেই ওই কারণ দেখিয়ে আমাদের বন্দি রাখাটা একপ্রকার খারাপই দেখাচ্ছে। অতএব, আমরা পুনরায় স্টোর রুমে ফিরে এলাম।

আমাদের ঘরটা থেকে ভুট্টো সাহেবের ঘর স্পষ্ট দেখা যেত। আমাদের দেখতে পেয়ে তিনি তার আইনজীবীর মাধ্যমে আমাদের জন্য একঝুড়ি ফল পাঠান যার মধ্যে ছিল একটা ছোট নোট : 'দেখ, বনেদী পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে জিয়ার আচরণটা কি রকম!' আমার বাচ্চার অসুস্থতা এবং জেলে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা না থাকায় দু' সপ্তাহ পর জেল থেকে গৃহবন্দি জীবনে ফিরে এলাম। অবশ্য অন্য মহিলারা একমাসের আগে জেলখানা থেকে বেরোতে পারেননি।

আমাকে বন্দি করার আদেশ আসে তাদের আদেশ আসার তিনদিন পর ১৮ মার্চ সকালে। ভোর ৪-৩০ মিনিটে আমাকে জানানো হয় অতি পরিচিত সেই সংবাদ, পুলিশ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমি জানতাম পুলিশ কেন দেখা করতে চায়। তবে তা জানার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল মায়ের কাছে ছুটে যেতে কিন্তু তিনি নিজেও সে সময় বন্দি ছিলেন লাহোরে। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল বাবার কাছে ছুটে যেতে। ইচ্ছা হচ্ছিল সামিয়া বা মীর বা শাহনেওয়াজ বা সানী অথবা আমার আইনজীবী বা আর কারও কাছে যেতে... কোথাও ছুটে যেতে। আমি একাকী এ ভার বহন করতে পারছিলাম না। ও আল্লাহ! সাহায্য কর আমায়, আমার নিজের ঘরে বন্দি একাকী আমি বারবার সেসব কথা ভাবছিলাম।

বিকেল নাগাদ মানুষের আর্তনাদ শুনতে পেলাম আমি। সে আর্তনাদ আসছিল রান্নাঘর থেকে, বাগান থেকে, ৭০ ক্লিফটন রোডের গেট থেকে। আমার হৃদকম্পন ভয়ানক বেড়ে গেল এবং থামল না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ভাবলাম, এসব নেহায়েত অসার ভাবনা। তখন হঠাৎ গেট খুলে গেল আর আমার খালাতো বোন ফাখরী বড় ড্রয়িং রুমে বিলাপ করতে করতে আছড়ে পড়ল। সে মেঝেতে তার মাথা ঠুকতে ঠুকতে চিৎকার করছিল, 'খুনী!' 'সব খুনীর দল!' জিয়ার বিচারকেরা আমার বাবাকে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দিয়েছেন। যেসব বিস্মিত সেনারা গেটে ফাখরীকে দেখেছিল অল্প কিছুক্ষণ বাদেই তারা তার জন্য এক সপ্তাহের এবং আমার জন্য তিন মাসের আটকাদেশ নিয়ে এলো। এক সপ্তাহ ফখরী আমার সঙ্গেই থাকল।

একটার পর একটা লোহার দরজা। লম্বা নোঙরা পথ। ম্যাট্রন পুলিশ আমার ওপর তল্লাশি চালাল; তাদের হাত আমার চুল, হাত, বুক, বাহু অনুসন্ধান করল। তারপর আরও

www.pathagar.com

একটি লোহার দরজা। পর পর তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারাপ্রকোষ্ঠ, প্রতিটা লোহার দরজা দিয়ে আটকানো।

'পিংকি? তুমি?'

আমি কারা প্রকোষ্ঠে উঁকি দিলাম, ভেতরে শুধুই অন্ধকার। জেলের কর্মকর্তারা দরজা খুলে দিলে আমি আমার বাবার ডেথ সেলে প্রবেশ করলাম। ভেতরটা স্যাঁতসেতে পুঁতিগন্ধময়। পুরু প্রাচীর আর দেয়াল ভেদ করে এর ভেতর কখনো সূর্যের আলো প্রবেশ করেনি। ঘরটার অর্ধেক জুড়ে বিছান পাতা যা মেঝের সঙ্গে ভারী লোহার শিকল দিয়ে আটকানো। প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা বাবাকে বিছানায় থাকতে হয়েছে শৃঙ্খলিত অবস্থায়। তার পায়ের গোড়ালিতে এখনও সে দাগ স্পষ্ট। বিছানার পাশে একটা উন্মুক্ত গর্ত যেটি মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাওয়া আসামিদের জন্য শৌচাগার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেখানে পূতিগন্ধটা রীতিমত বমি উদ্রেককারী।

'বাবা'!

আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম। তার ওজন অস্বাভাবিকভাবে কমে গেছে। আমি সেখানকার আলোর সঙ্গে ধাতস্ত হলে তার শরীরে অসংখ্য মশার কামড়ের চিহ্ন চোখে পড়ল। এখানকার স্যাঁতসেতে ও উষ্ণ আবহাওয়ায় মশার বংশ বিস্তার ঘটেছে ভালোই; তার শরীরে সর্বত্র মশার কামড়ের লালাভ চিহ্ন।

অব্যক্ত কান্না আমার কণ্ঠনালী পেরিয়ে ওপরে আসতে চাচ্ছিল। আমি তা দমন করলাম; তার সামনে এভাবে আমি কাঁদতে পারি না! উপরন্তু আমি তাকে হাসতে দেখলাম– তিনি হাসছেন!

'তুই এখানে আসলি কি করে?' তিনি বললেন। 'প্রাদেশিক প্রশাসনকে এই মর্মে আবেদন করেছিলাম যে একজন পারিবারিক সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কারা বিধি অনুযায়ী আমি তোমার সঙ্গে সাপ্তাহিক সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।' আমি বাবাকে বললাম, 'স্বরাষ্ট্র সচিব তোমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিলেন।' সেনা বোঝাই ট্রাক, জিপ ও গাড়ির বহর আমাকে কোট লাখপাত কারাগারে নিয়ে আসার ঘটনা তাকে বললাম। 'সরকার আতঙ্কগ্রস্ত', আমি বললাম। তার মৃত্যুর আদেশ জারি হবার এক সপ্তাহের মধ্যে সিন্ধুর লোকালয়গুলোতে দাঙ্গা এবং কারফিউ জারির ঘটনাও বললাম তাকে। লারকানায় কাছাকাছি গ্রামের ১৪৬টি বাড়ি থেকে ১২০ জনকে বন্দি করা হয়েছে। তাছাড়া একজন চিত্রতারকার ছবির পাশে বাবার ছবি রাখার কারণে এক দোকানীকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

'অন্যদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে জিয়ার কাছে আবেদন আসছে সদয় হওয়ার জন্য।' আমি তাকে জানালাম, 'বিবিসিতে এর সবই আমি শুনতে পাই। ব্রেজনেভ এবং হুয়া কুয়ো ফেং চিঠি লিখেছেন। সিরিয়া থেকে আসাদ, কায়রো থেকে আনোয়ার সাদা'ত, ইরাকের প্রেসিডেন্ট, সৌদি সরকার, ইন্দিরা গান্ধী, সিনেটর ম্যাক গর্ভান– কার্যত, প্রেসিডেন্ট কার্টার ছাড়া সবাই আবেদন করেছেন। কানাডার হাউজ অব কমনসে শাস্তির কঠোরতা কমাবার ব্যাপারে একটা প্রস্তাব পাশ হয়েছে, ১৫০ জন ব্রিটিশ সাংসদ তাদের সরকারকে কার্যকরি পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। গ্রীস, পোল্যান্ড, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, জাতিসংঘের মহাসচিব, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স প্রত্যেকে তোমার ব্যাপারে অনুরোধ জানিয়েছে। বাবা, জিয়া তোমাকে নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করতে পারবে না।'

'এসব ভালো খবর' বাবা বললেন, 'কিন্তু আমরা অবশ্যই কোনো আবেদন করবো না।'

www.pathagar.com

আমি সে কথায় আহত হলাম; বললাম, 'বাবা, তুমি অবশ্যই আবেদন করবে।'

'জিয়ার আদালতের পুরোটাই প্রহসন। মিছিমিছি কেন তা দীর্ঘায়িত করা?'

আমাদের কথা বলার পুরো সময়টাতে জেলার দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। সে সবকিছু দেখছিল ও শুনছিল। বাবা এক সময় মাথা নাড়িয়ে তার কাছাকাছি যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন। আমি আমার হাতের মধ্যে এক টুকরো কাগজ অনুভব করলাম। জেলারের মনোযোগ অন্যদিকে সরাবার জন্য আমি জোরে বললাম, 'তুমি কোনোভাবেই আশা ছাড়তে পার না বাবা!' বাবা বললেন, 'আল্লাহ্ জানেন যে আমি নিরপরাধ। আমি আমার আবেদন তার কাছে জানাবো, শুধু তার কাছে শেষ বিচারের দিনে। সময় শেষ হয়ে আসছে– তুমি যাও।' আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম। তিনি চুপিচুপি অত্যন্ত দ্রুত আমার কানে কানে বললেন, 'কোনোভাবেই কাগজটা যেন কারও হাতে না পড়ে; তাহলে তোমার এখানে আসার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।'

'আবার দেখা হবে বাবা!'

জেল থেকে বের হবার পথে আমার ওপর তল্লাশি চালানো হলো কিন্তু তারা কিছু পেল না। দ্বিতীয়বার তল্লাশি চালানো হয় যখন আমি লাহোরে আমার বন্দি মা'কে দেখতে যাই এবং দেখে ফিরেও আসি। সেবারও আমার কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায়নি। এসব তল্লাশিতে কখনো কখনো তল্লাশকারীরা সহানুভূতিপ্রবণ হতেন। যেমন, করাচিতে আমার বন্দি জীবনে ফিরে আসার সময়কার ঘটনা। বিমানবন্দরে সে সময় আমাকে তিন ঘণ্টা একটা গাড়িতে বসে অপেক্ষা করতে হয়েছিল, অনেকগুলো সামরিক গাড়ি আমাকে ঘিরেছিল তখন। অবশেষে বিমান প্রস্তুত হলো। গাড়ি থেকে আমি স্পষ্ট দেখলাম যে বিমানের যাত্রীরা সব উঠে গেছে। ইঞ্জিন চালু হলো। বিমানের হেডলাইট রানওয়ের ওপর আলো ফেলল। পুলিশ আমাকে গাড়ির বাইরে আনল এবং দ্রুত হাঁটতে থাকল, একজন পুলিশ সামনে এবং অপর একজন আমার পিছনে তাককরা বন্দুক নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাদের বেতার-যন্ত্রটাতে শব্দ হলো; তারা আমাকে পুনরায় গাড়ির দিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

আজও তার মোটাসোটা শরীরের হেলেদুলে আসার ভঙ্গী আমার মনে পড়ে। সেই রাতে সে হেঁটে আসছিল রানওয়ে ধরে। আমি তাকে ভালোভাবেই চিনতাম; সে ছিল বিমানবন্দরের একজন মহিলা নিরাপত্তাকর্মী যাকে আমি প্রতিবার লাহোরে আসা ও যাওয়ার সময় কর্তব্যরত দেখতাম। তিনি এতটা অসহানুভূতিহীন ছিলেন যে, আমার মনে হয়, সরকার আমার তল্লাশির বিষয়টা ভেবে তাকে এখানে রেখেছিল। তাকে আমার সেই মানুষটার মতো হীন মনে হয়েছিল যারা সার্চ করার সময় আঙটি আর ঘড়ি খুলে কখনো আর ফেরত দেয় না। এই মহিলার জন্য সর্বত্র অনুসন্ধান করাটা ছিল সমান প্রয়োজনীয়। সে আমার লিপিস্টিকের কেস খুলেছিল এবং এ্যাপয়েন্টমেন্ট ডায়রির প্রতিটা পাতা পড়ে দেখেছিল– এবং অবশ্যই সে তার কাজ উপভোগ করছিল।

'আর কোনো তল্লাশি নয়! সে আমাকে তল্লাশি করবে না।' গাড়ির পিছনে রেখে তাককরা বন্দুকগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি চিৎকার করলাম, 'আমাকে যথেষ্ট তল্লাশি করা হয়েছে। তল্লাশি করা হয়েছে কারারুদ্ধ বাবাকে দেখতে যাওয়া ও দেখে আসার সময়, তল্লাশি করা হয়েছে বন্দি মা'কে দেখার ক্ষেত্রেও– যথেষ্ট! যথেষ্ট তল্লাশি করা হয়েছে।'

সামরিক নিরাপত্তা গাড়িগুলো আমার চারদিকে তাদের অবস্থান ঠিক করে নিল।

www.pathagar.com

চারদিকে আরও বন্দুক। আরও পুলিশ। 'আপনাকে আবার তল্লাশি করা হবে' পুলিশ অফিসার বললেন, 'না হলে আপনাকে প্লেন ছাড়ার আগে যেতে দেয়া হবে না।'

'আমার জন্য সেটাই ভালো' আমি চিৎকার করলাম, 'আমার আর কি অবশিষ্ট আছে? আমার বাবাকে আপনারা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, মা'র মাথা ফাটিয়েছেন। নিঃসঙ্গ করার জন্য আপনারা আমাকে রেখেছেন করাচিতে, আমার মা'কে লাহোরে, আর বাবা একাকী প্রহর গুণছেন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। আমরা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে পারছি না, খোঁজ-খবর নিতে পারছি না। এখন আমি জীবন বা মৃত্যুর কিছুরই পরোয়া করি না– আপনাদের যা ইচ্ছা করতে পারেন!'

আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম। আমার সামনে আর কোনো পথ ছিল? দেয়ালে আমার পিঠ ঠেকে গিয়েছিল। আমাকে ফেটে পড়তে দেখে নিরাপত্তা কর্মী মহিলাটি থমকে গিয়েছিলেন; কিন্তু তল্লাশি চালালে বাবার চিরকুটটি তিনি পেতেন।

'চলে আসেন। আপনি চলে আসেন। তাকে তার মতো থাকতে দিন।' কেউ কেউ বললেন। 'আপনি যেতে পারেন' অফিসারটি বললেন।

করাচির পথে আমি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লাম। প্রথমবারের মতো আমার কানে যন্ত্রণাদায়ক ব্যথা অনুভূত হলো। যেকোনো ধরনের শব্দও আমার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠলল– এমনকি ৭০ নং ক্লিফটন রোডের বাড়িতে ফিরে ঘুমানোটাও আমার জন্য কষ্টকর হয়ে উঠল। শেষমেষ সরকারের তরফ থেকে আমার জন্য ডাক্তার পাঠানো হলো যিনি আমার নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন।

এবার আমি বাবার লেখা চিরকুটটি পড়লাম। এতে তিনি আমার বেআইনী আটকাদেশের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। আমি আদালতের উপযোগী করে একটা খসড়া নোট লেখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তা করা হলো না।

এ সময় আমাদের বাড়ির পশুপাখিদের জীবনে যা ঘটেছিল তা ছিল বিস্ময়কর। বাবার মৃত্যু পরোয়ানা জারির দিন তার ঘনলোমওয়ালা কুকুরগুলোর একটি মারা যায়– অবশ্য মৃত্যুর ঠিক আগেকার মুহূর্তটিতেও সে ছিল একেবারে সুস্থ। পরের দিন তার মাদী সঙ্গীটিও কোনো কারণ ছাড়াই মারা যায়। এছাড়া ৭০ নং ক্লিফটনে আমার থাই-বিড়ালটিও মারা যায় তৃতীয় দিন।

কোন কোন মুসলমানের বিশ্বাস, গৃহস্বামীর কোনো বিপদ উপস্থিত হলে তার পোষা প্রাণীরা সে বিপদ তাড়াতে নিজেরা মৃত্যুবরণ করে। সে সময় ওই অসুস্থ অবস্থায় আমি কেবল এটুকু ভাবতে পেরেছিলাম যে আমার বাবার ওপর এতো প্রবল বিপদ আসছে যে আমাদের তিনটি পোষা প্রাণী মৃত্যুবরণ করেছে। অবশ্য এই চিন্তা আমাকে স্বস্তি দিল না। প্রতিদিন ভোর ছ'টায় বিবিসির সংবাদে আমি জিয়ার মৃত্যুসংবাদ শোনার জন্য প্রার্থনা করতাম। যদিও জিয়া ছিলেন আগের মতোই জীবিত।

বাবার দেয়া পয়েন্টগুলোর ভিত্তিতে ৭০ ক্লিফটনের বাড়িতে বসেই আমার আটকাদেশের আমি চ্যালেঞ্জ করি। আদালতে আমার শুনানি পিছিয়ে প্রথমে এপ্রিল, পরে মে মাসে ধার্য্য হয়। এতে প্রতিবারই শুনানির জন্য আমাকে আবেদনপত্র নতুন করে জমা দিতে হয়। অবশেষে ১৪ জুন আমার আইনজীবী আমার জন্মদিনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি নিয়ে আসেন। আটকাদেশের যুক্তিযুক্ত কারণ না থাকায় আমার আটকাদেশকে অবৈধ বলে রায় দেন বিচারক ফখরুদ্দীন। অর্থাৎ আমি এখন মুক্ত। আমার অত্যন্ত ভগ্নস্বাস্থ্যের যত্ন নিতে

www.pathagar.com

পারবো এবার।

জুনের শেষদিকে করাচির মিডইস্ট হাসপাতালে আমার কান ও সাইনাসের অপারেশন করা হয়। অপারেশনের অচেতন থেকে জেগে আমার মনে আবার ভয় জেগে উঠল। 'ওরা আমার বাবাকে মেরে ফেলবে!' আমার অন্তরাত্মা চিৎকার করে উঠল, 'ওরা আমার বাবাকে মেরে ফেলবে!' আমার নাকে তখন ব্যান্ডেজ ছিল। এর ফলে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল আমার। মা'র জন্য তখন আমি অপেক্ষাকৃত ভালো বোধ করছিলাম; লাহোরে বন্দি মা'কে অবশেষে তারা পুলিশ প্রহরায় আমাকে দেখতে আসার অনুমতি দিয়েছে।

সুস্থ্য হওয়ার পর অতি বিষণ্ন একটি ভূবন দেখতে পেলাম আমি। 'মুসাওয়াত' নামের আমাদের সংবাদপত্রটির করাচি শাখাকে সরকার গত এপ্রিলে বন্ধ ঘোষণা করেছে এবং এর অফিস দখল করে নিয়েছে। বাবার ওপর 'নিষিদ্ধ বিষয়' ছাপবার অপরাধে সম্পাদক ও প্রকাশককে বন্দি করা হয়েছে। অন্য সংবাদপত্রের সাংবাদিকেরা এর প্রতিবাদে ধর্মঘট করেন। এদের নব্বইজনকে গ্রেফতার করা হয়, চার জনকে চাবুক মারা হয় এবং পাকিস্তান টাইমসের একজন সিনিয়র সম্পাদককে হাতকড়া পরানো হয়। বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি কাড়ে। ১৯৭৮-এর গ্রীষ্মনাগাদ 'মুসাওয়াত' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকসহ পঞ্চাশজন রাজবন্দির বিষয়ে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ভাবতে শুরু করে। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা। তারা রাজবন্দিদের বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করে। সরকারের সাহায্য ছাড়াই এ্যামনেস্টি বত্রিশজন রাজবন্দির বিষয় পর্যবেক্ষণ করছে। এ বছরের গোড়তে পাকিস্তানে এ্যামনেস্টির একটি তথ্য অনুসন্ধান দলের দু'জন প্রতিনিধিকে জিয়া কথা দেন যে, তিনি এ্যামনেস্টিকে সহায়তা দেবেন। কিন্তু মার্চে এ্যামনেস্টির রিপোর্ট বের হওয়া পর্যন্ত সরকার তাদের কোনোরকম সাহায্য করেনি।

জানুয়ারিতে অ্যামনেস্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমার কথা হয়। সে সময় জিয়ার সামরিক শাসনের পায়ের নিচে চাঁপা পরা মৌলিক মানবাধিকারের লঙ্ঘনের বিষয়টি নিয়ে তাদের কাছে আমি আমার উদ্বেগ প্রকাশ করি। এক্ষেত্রে সাধারণ বন্দি এবং রাজবন্দিদের ওপর সেনা-আদালত এবং প্রহসন-সুলভ বিচারে 'নির্মম শাস্তি'র বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমি আমার বাবার বেআইনী বিচার এবং দুর্বিসহ বন্দিত্ব নিয়েও আমার উদ্বেগ প্রকাশ করি। স্বাভাবিকভাবেই তারা আমার কথা যাচাই করতে চাচ্ছিলেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা এ কারণে জেলে বাবার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চান– এবং তা পেতে ব্যর্থ হন।

এপ্রিল ২৮, ১৯৭৮। কোট লাখপাত কারাগার। ডা. জাফর নিয়াজি, আমার বাবার দন্ত চিকিৎসক :

> এপ্রিল মাসে কোট লাখপাত জেলে জনাব ভুট্টোকে যখন আমি দেখি সে সময় তার দাঁতের মাড়ির দ্রুত ক্ষতি হচ্ছিল। জেলের পরিবেশ ছিল অস্বাস্থ্যকর এবং তার খাবার ছিল অপর্যাপ্ত। তার মাড়ির কোষগুলো লালাভ এবং যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাকে চিকিৎসা দেয়ার মতো যথেষ্ট সুযোগ সেখানে ছিল না। অবশ্য আমি নিশ্চিত নই যে, ওরকম অমানবিক পরিবেশে কোনো চিকিৎসা কার্যকরী হতো কি না। আমার সাক্ষাতের পর সরকারের নিকট আমি এই মর্মে একটা রিপোর্ট লিখলাম যে, তার অবস্থার উন্নতি না হলে ভুট্টো সাহেবের দন্ত চিকিৎসক হিসেবে আমার আর বিশেষ কিছুই করার

www.pathagar.com

থাকবে না। আমি জানতাম যে, সরকার এ ধরনের কোনো রিপোর্টকে ভালো চোখে দেখবে না। আমার অনেক রোগী ছিলেন বিদেশী কূটনীতিক এবং আমি নিশ্চিত সরকার এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন যে আমি এসব বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারি। সাবধানতার জন্য আমি তাই আমার রিপোর্টের একটা কপি আমার স্ত্রীকে দিই। যদি আর্মি আমাকে গ্রেফতার করে, আমি তাকে বলি, 'এটা বিদেশী কোনো সংবাদ মাধ্যমকে দিও'। দুদিন বাদে আমার খোঁজে পুলিশ এলো।

ডাক্তার নিয়াজি এবং তার পরিবারের ওপর নীপিড়ণের সেই শুরু। তিনি দু'বার গ্রেফতার হন। একবার যখন তিনি তার ক্লিনিকে এনেস্থেসিয়া দিয়ে চিকিৎসা করছিলেন তখন পুলিশ আসে। রোগীর চিকিৎসা সম্পন্ন করতে তিনি তাদের কাছে একঘণ্টা সময় চান। তারা তাকে কোনোরকম সময় দিতে অস্বীকার করে। ফলে রোগীকে চেয়ারে ফেলে রেখেই তাকে যেতে হয়। প্রথমবার গ্রেফতারের সময় পুলিশ তার বাড়িতে তল্লাশি চালায় রাত দুটোয়। তাকে অভিযুক্ত করার জন্য যেকোন কিছু পেতে এ সময় তারা তার বিছানাপত্র, কাপবোর্ডে রাখা পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র উল্টেপাল্টে দেখে। তারা সেখানে কেবল আধ-বোতল ওয়াইন পায় যা ডাক্তার নিয়াজির মার্কিন সহযোগী ফেলে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন চোয়ালের অস্বাভাবিকতা এবং এলোমেলোভাবে ওঠা দাঁতের বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, তিনমাস অন্তর তিনি তার চেম্বারে বসতেন। এতে করে ডাক্তার নিয়াজি তার বাড়িতে মাদক রাখার দায়ে অভিযুক্ত হন। ডাক্তার নিয়াজি পাকিস্তান পিপলস পার্টির কোনো সদস্য ছিলেন না বা অন্য কোনো ধরনের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা তার ছিল না। তবু মাদক রাখার দায়ে তার ছ'মাসের কারাদণ্ড হয়। তিনি মুক্ত হওয়ার সময় আমার বাবাকে কোট লাখপাত জেল থেকে রাওয়ালপিণ্ডি সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তর করা হয়। ডাক্তার নিয়াজি আবারও বাবাকে দেখতে চাওয়ার আবেদন করেন– তার আবেদন নামঞ্জুর হয়।

জুন ২১, ১৯৭৮। রাওয়ালপিণ্ডি সেন্ট্রাল জেল। আমার পঁচিশতম জন্মদিন।

বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবার অপেক্ষায় রাওয়ালপিণ্ডির ফ্ল্যাশম্যানস হোটেলের একটা ছোট কক্ষে বসে আছি আমি। আমি বার বার ঘড়ি দেখছি; মা এখনো কোথায়? বাবার আইনজীবী আমার এই জন্মদিনে একটা কোর্ট অর্ডার যোগাড় করতে সমর্থ হয়েছেন যার বদৌলতে মা ও আমি একত্রে বাবাকে দেখতে যেতে পারব। এতক্ষণে বিকেল হয়ে এসেছে আর আমি অপেক্ষায় আছি সকাল ৯টা থেকে। পুলিশ লাহোর কারাগার থেকে মাকে নিয়ে এখনও পৌঁছায়নি– এবারও তারা দেরি করছে। মায়ের বিষয়ে আমি উদ্বিগ্ন। তিনি তীব্র মাথা যন্ত্রণায় ভুগছেন এবং এ কারণে প্রায়ই তিনি অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। তার রক্তচাপও কমে যাচ্ছে। লাহোর থেকে পিন্ডিতে বাবাকে দেখতে যাওয়ার সময় দু'বার তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। আইনজীবীরা তাকে ইসলামাবাদে বাবার কারাগার থেকে গাড়িতে যাওয়া সম্ভব এমন দূরত্বে স্থানান্তর করতে বলেন, কিন্তু তারপরও তাকে লাহোরে রাখা হয়েছে। আবার তিনি একেবারে একা হয়ে গেছেন। এখন তার একমাত্র সঙ্গী একটা ছোট বিড়াল ছানা যেটাকে আমি আমার পকেটে ভরে চুরি করে তাকে দিয়েছিলাম। মা বলেছেন 'চু-চু' বিড়াল ছানাটি তাকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে। মা যখন একা একা কার্ড খেলেন সে তখন তার

www.pathagar.com

কোমল তুলতুলে থাবা মায়ের হাতের ওপর রেখে বসে থাকে।

আমি আমার সালোয়ার-কামিজ ঠিক করে নিই। জন্মদিনে আমি আমার মা-বাবাকে দেখাতে চাই যে, আমার মনোবল অটুট আছে। বেলা ১টা... বেলা ২টা...। এটা সরকারের একটা প্রিয় কৌশল। যখন আমি বন্দি অবস্থায় বাবাকে দেখতে যেতাম তখনও ঠিক সময়মতো প্রস্তুত হয়ে থাকতাম। তবু ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে অপেক্ষা করে যেতে হতো। প্রতি দু'সপ্তাহ অন্তর তাকে দেখতে যাই আমি। প্রশাসন এটা জানে যে, এই সাক্ষাৎ আমায় চাঙ্গা করে তোলে। এ কারণে তারা আমায় সেখানে নিয়ে যেতে দেরি করে যেন কোনোরকম আধঘণ্টা সময় আমি পাই, অথবা মোটেও নিয়ে যায় না। তারা কেন এখনো এসে পৌঁছছে না? প্রশাসন কি আদালতের আদেশ উপেক্ষা করবে?

বেলা তিনটা.... বেলা সাড়ে তিনটা...। আদালতের বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে সূর্যাস্তের সঙ্গেই দর্শণার্থীদের সব চলে যেতে হবে। আমি দশ বছর আগে অক্সফোর্ডের লনে আমার জন্মদিনের কথা মনে করলাম। বিস্ময় লাগে, সত্যিই কি সে ঘটনা আদৌ ঘটেছিল!

বেলা চারটা। অবশেষে বিমানবন্দরে মা'র আগমন সংবাদ এসে পৌঁছল। 'শুভ জন্মদিন পিংকি!' জেলের ফটকে আমাদের দু'জনের যখন দেখা হলো আমাকে আলিঙ্গন করে মা বললেন। আমরা একত্রে বাবার সেলের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। বাবার কাছে গিয়ে পৌঁছলে তিনি বললেন, 'পিংকি, এটা অতি সৌভাগ্য যে তুমি দীর্ঘতম দিবসে তোমার জন্ম হয়েছে। এমনকি সরকার পর্যন্ত তোমার জন্মদিনটাতে সূর্যকে আগে আগে ডুবিয়ে দিতে পারছে না!' জেলের ভেতরদিকের একটা সেলে এখন আছেন তিনি। সেখানে সামরিক বাহিনী তাবু গেড়ে অবস্থান করছে। সামরিক রক্ষীরা বদ্ধ প্রবেশদ্বারে তাদের অবস্থান নিয়েছে। বেসামরিক বিচারের নামে কী প্রহসন! এর সবই সামরিক ক্রিয়াকলাপ, যেন আমরা আছি একটি সেনা ছাউনিতে।

অস্পষ্ট আলো আর স্যাঁতসেতে ঘরটা ৬ ফুট বাই ৯ ফুট। তার দরজার সামনে মশা প্রতিরোধের জন্য কোনো নেট নেই যা তার পাশের রক্ষীদের জন্য রয়েছে। মশা আর মাছি যত্রতত্র উড়ে বেড়াচ্ছে। একটা ঘুমন্ত বাদুর ঝুলে রয়েছে সিলিংয়ের সঙ্গে, রঙহীন টিকটিকি দেয়ালের এদিক- সেদিক হেঁটে বেড়াচ্ছে। আমি তার ধাতব খাটটির দিকে তাকালে মা বললেন, দু'সপ্তাহ আগে আমি যে তোষকটা পাঠিয়ে ছিলাম তারা তা তোমাকে দেয়নি?' 'না', বাবা বললেন। জেলের এই শক্তখাটে শুয়ে শুয়ে বাবার পিঠে যন্ত্রণাদায়ক কালশিরে পড়ে গেছে। দু'বার তার হয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জা। এছাড়া ফুটানো পানি খেতে না পাওয়ায় পাকস্থলীর সমস্যাও প্রকট হয়ে উঠেছে। তিনবার তার রক্তবমি হয়েছে আর একবার রক্ত ঝরেছে নাক দিয়ে।

তিনি অনেক শুকিয়ে গেলেও অবিশাস্যজনকভাবে তাকে চাঙ্গা মনে হচ্ছে– অবশ্য সবসময়ই তাকে আমার ভালো মনে হয়– হয়ত অন্য কোনোভাবে আমি তাকে ভাবতে চাইনি কখনো।

'আমার ইচ্ছা এবার ঈদে তুমি লারকানা যাও এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের কবর জিয়ারত কর' বাবা বললেন। 'কিন্তু বাবা, তাহলে তোমার সঙ্গে আমার পরের সাক্ষাৎটা বরবাদ হয়ে যাবে'। আমি প্রতিবাদ করলাম। 'তোমার মা এখনও কারাবাসে থাকছেন। তুমি ছাড়া যাবার তো আর কেউ নেই।' তিনি বললেন।

আমি প্রমাদ গুণলাম। ঈদে কখনো আমি আমাদের পারিবারিক কবরস্থানে যাইনি

www.pathagar.com

অথবা নওদেরোতে আমাদের বাড়ির বা গ্রামের মানুষজনের সঙ্গে ওঠাবসা করিনি। পরিবারের পুরুষেরা সবসময় এসব দায়িত্ব পালন করে এসেছেন, রমজানে স্কুল ছুটি থাকলে আমার ভাইয়েরা বাবাকে সঙ্গ দিয়েছেন। আমি ভয়ানক একাকীত্ব অনুভব করলাম। আশা করলাম, বাবা যেন শিগগিরই মুক্ত হয়ে যান।

'লাল শাহবাজ কালান্দারের দরগায় গিয়ে প্রার্থনা করো' বাবা বললেন, 'গত ঈদে আমি সেখানে যাইনি।' লাল শাহবাজ কালান্দার আমাদের অতি বিখ্যাত সুফিদের একজন। আমার দাদী সেখানে গিয়েছিলেন আমার বাবা যখন অতি শৈশবে মরতে বসেছিলেন। আল্লাহ কি সেই একই মানুষের মধ্য দিয়ে শুনবেন একজন কন্যার প্রার্থনা?

আমরা সেখানে মূল্যবান একটা ঘণ্টা কাটালাম। আমরা আমাদের মাথাগুলো খুব কাছাকাছি এনে কথা বলছিলাম যেন রক্ষীরা সেসব শুনতে না পায়। তবে এ সময় উপস্থিত তিনজন জেলারই আমাদের প্রতি সদয় ছিলেন। আমাদের ওপর তারা কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ করেননি।

'তোর বয়স পঁচিশ হলো' বাবা রসিকতা করলেন। 'অফিসে বসার জন্য এটা যথেষ্ট– জিয়া কখনও কোনো নির্বাচনে দাঁড়াবে না।'

'কী যে বল, বাবা!' আমি বললাম। আমরা হাসি। কিন্তু কিভাবে এসব সামলাব আমরা? জেলের কোনো এক স্থানে ঝুলছে জল্লাদের ফাঁসির দড়ি যার ছায়া আমাদের জীবন। সেনারা তাকে উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা করে, বাবা বলেন, যাতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। প্রতি রাতে তারা এ ঘরের ছাদে উঠে তাদের বুটজুতো পরে দাপাদাপি করে– বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় মুজিবুর রহমানের সঙ্গেও তারা এই ধরনের কূটচালের আশ্রয় নিয়েছিল। এক্ষেত্রে তারা আশা করে যে বন্দি তার মেজাজ গরম করে রক্ষীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হবে এবং একসময় বদমেজাজী কোনো সৈনিক ক্ষিপ্ত হয়ে গুলি চালাবে। যাইহোক, বাবা তাদের কৌশল বুঝতেন এবং এসব থেকে আত্মরক্ষা করে চলতেন।

দুই বা তিনটি সামরিক গাড়িভর্তি সেনা প্রহারায় আমি ফ্লাশম্যানস হোটেলে ফিরে আসি। এখন আমাকে কড়া দৃষ্টিতে রাখতে সামরিক গাড়ির সংখ্যা সাত-আট এমনকি দশে পৌঁছায়। পথচারীরা আমার এমন চলাচলের সময় অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কারও কারও চোখে থাকে সহানুভূতি, কেউবা আবার আনত চোখে চলে যায় যেন যা কিছু ঘটছে কিছুই তার বিশ্বাস করতে চায় না তারা।

রহস্যময় নীরবতা নেমে আসে শহরের ওপর, গোটা দেশের ওপর। গোটা জাতি যেন আজ স্থবির। এক লাখের মতো মানুষ গ্রেফতার হযেছে বলে শোনা গেছে। 'প্রধানমন্ত্রীকে জিয়া এভাবে বন্দি রাখতে পারেন না। কিছুতেই না।' মানুষেরা কানাকানি করছে। সবার মুখে আমার বাবার দণ্ডাদেশের খবর, মৃত্যুর সংবাদ, তার সুপ্রিমকোর্ট আপিল।

তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা রাওয়ালপিণ্ডিতে পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্টে আপিল করি।

'আমি আমার স্ত্রী ও কন্যার দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্মান জানাতে বিশেষভাবে বাধিত– তবে আমাদের সম্পর্কের কারণে নয়, বরং এর থেকেও মহিমান্বিত কোনো কারণে' বাবা পাকিস্তানের সাবেক এটর্নী জেনারেল এবং সুপ্রিমকোর্টে তার প্রধান আইনজীবী জনাব ইয়াহিয়া বখতিয়ারকে লেখেন। 'তারা উভয়ই এই অসামান্য বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার

পরিচয় দিয়েছে। আমার সিদ্ধান্তের ওপর কথা বলবার ব্যক্তি ও রাজনৈতিক অধিকার তাদের রয়েছে।'

আদালত মে মাসে এই মামলার শুনানি শুরু করে। অন্য ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করার জন্য একমাস সময় দেয়া হলেও বাবার ক্ষেত্রে তা কমিয়ে এক সপ্তাহে আনা হয়। বাবার আইনজবীরা তখন ফ্লাশম্যানস-এ একটা ছোট অফিস গড়ে তুলেছিলেন যাতে করে আপিলের কাজকর্ম তারা যতটা সম্ভব ভালোভাবে করতে পারেন। ডাক্তার নিয়াজির কিশোরী কন্যা ইয়াসমিন নিয়াজি সেখানে কাজে যোগ দেন। তিনি আমার কাজের সময় ঠিক রাখতেন। আমিনা পিরাচা সে সময় আইনজীবীদের ছোট্ট সেই দলটির সঙ্গে বিদেশী সংবাদ মাধ্যমগুলোর যোগসূত্র হিসেবে কাজ করতেন। এছাড়া আমার অক্সফোর্ডের বন্ধু ভিক্টোরিয়া স্কফিল্ড ও আমাদের সাহায্যের জন্য পাকিস্তানে এসে পৌঁছায়। আমার পরে ভিক্টেরিয় অক্সফোর্ড ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কিছু কিছু দিন আমি নিজেকে এক প্রকার বাধ্য করে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতাম। দ্রুত তৈরি হতাম। পোশাক পরিচ্ছদ পরতাম। দিনের কাজকর্ম শুরু করতাম। জেলের বাইরের কিছু দলীয় কর্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম, রাওয়ালপিণ্ডিতে জড়ো হওয়া সংবাদ মাধ্যমগুলোকে সাক্ষাৎকার দিতাম। সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন সংবাদ মাধ্যমগুলোতে সে সময় কেবল বাবার বিরোধীতা করে খবর ছাপতো। আমাদের পত্রিকা মুসাওয়াতের করাচি শাখা বন্ধ হয়ে গেলেও রাওয়ালপিণ্ডি শাখা তখনও কাজ করে যাচ্ছিল। শেষমেষ মুসাওয়াত এবং ওয়ার্ল্ড প্রেস হয়ে উঠল সত্য ঘটনা প্রকাশের একমাত্র ভরসা। গার্ডিয়ান পত্রিকার পিটার নাইসেওন এবং ডেইলি টেলিগ্রাফের ব্রুস লাউডন হয়ে উঠে ছিলেন অতিপরিচিত মুখ।

জুলাইয়ের শেষ নাগাদ সরকার ১৯৭৭-এর সংঘটিত নির্বাচনের সমালোচনা করে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। ফ্লাশম্যানস-এ আমরা সে সময় শ্বেতপত্রে বাবার ওপর আরোপিত মিথ্যা অভিযোগগুলোর জবাব তৈরি করছিলাম; বাবা চেয়েছিলেন সুপ্রিমকোর্টেও সেগুলো তার সপক্ষে হাজির করা হোক। আইনজীবীরা প্রতিদিন রাওয়ালপিণ্ডি সেন্ট্রাল জেল থেকে বাবার হাতে লেখা যেসব কাগজপত্র আনত ভিক্টোরিয়া ও আমি আবার সেই কাগজ দেখে নতুন করে লিখতাম। কাগজের উভয়পাশে বাবার লেখাগুলো থাকত দুর্বোধ্য এবং তা বুঝে ওঠা ছিল কষ্টকর। আগস্টের গরমের দিনে রোজা রেখে মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়ে লিখে যাওয়াটা তার জন্য, অবশ্যই, অপেক্ষাকৃত বেশি কষ্টকর ছিল। টাইপ করা লেখাগুলো আইনজীবীরা পুনরায় বাবার কাছে নিয়ে যেতেন। বাবা সেগুলো সংশোধন করতেন এবং ফের টাইপ করার জন্য পাঠাতেন। আমরা তার সংশোধিত প্রত্যুত্তর 'রেগি' নামের একটা কোড ব্যবহার করে লাহোরের এক গোপন ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিতাম।

কিন্তু সুপ্রিমকোর্টে পৌঁছানোর আগে মুদ্রিত সেসব কাগজপত্র জব্দ করা হলো। অবশেষে তিনশ পৃষ্ঠার এই দলিল সুপ্রিমকোর্ট এবং বিদেশী সংবাদমাধ্যমে দেয়ার জন্য পিপিপি কর্মীদের সারারাত জেগে ফটোকপি করতে হয়। ফটোকপি করার স্থান, কর্মীদের ও সাহায্যকারীদের যে পরিচয় আমরা ব্যবহার করতাম সেগুলোও গোপন রাখতে হয়েছিল।

ফ্লেশম্যানস-এর চারদিকে প্রহরা বাড়ছিল। একরাতে পুলিশ আমাদের চার সহকারীর একজনকে গ্রেফতার করল এবং সামরিক আদালতে পাঠিয়ে দিল। পরবর্তী সময়ে আবার কী হতে যাচ্ছে সেই অজানা আশঙ্কা নিয়ে ভীতির মুখে আমরা কাজ করে যেতে লাগলাম।

প্রত্যুত্তরটা শেষাবধি সুপ্রিমকোর্টে জমা দেয়া হলে এটার প্রকাশনা প্রধান বিচারপতি

www.pathagar.com

কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। অবশ্য ইতোমধ্যে মধ্যে তার কতগুলো কপি দেশের বাইরে পৌঁছে গেছে। পরে এই প্রত্যুত্তরপত্র 'যদি আমি আততায়ীর হাতে নিহত হই' এই শিরোনামে ভারতে প্রকাশিত হয় এবং সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের মর্যাদা লাভ করে।

গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে সুপ্রিমকোর্টের রায় যেকোনো মুহূর্তে বেরুবে। শুনানির প্রথমদিকে প্রধান বিচারপতি আনোয়ার উল হক যত দ্রুত সম্ভব এই আপিলের কাজ শেষ করতে বলেন। বাবার আইনজাবীরীরাও ছিলেন আশাবাদী। ৯ জন বিচারকের বেঞ্চটিতে ৫ জন এমনভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন এবং উত্তর খুঁজছিলেন যে মনে হলো, লাহোরে বিচারের রায় একেবারে ভেস্তে যাবে। কিন্তু হঠাৎ জুন মাসে প্রধান বিচারপতি আদালত মূলতবি করে একটা কনফারেন্সে জাকার্তা চলে গেলেন। আমরা উপলব্ধি করলাম, যতক্ষণ বিচারক বেকসুর খালাসের কথা ভাববেন ততক্ষণ আপিল দীর্ঘায়িত ও বিলম্বিত হবে। উপরন্তু মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামিদের বিষয়ে বেঞ্চের একমাত্র অভিজ্ঞ বিচারক মহোদয় জুলাইয়ের শেষে অবসরে যাচ্ছেন। আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও প্রধান বিচারপতি আনোয়ার উল-হক তাকে শুনানি শেষ হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। অপর একজন স্বাধীনচেতা বিচারকও সেপ্টেম্বরে তার কাজ ছাড়তে বাধ্য হলেন– তিনি তার বামচোখের পিছনে আঘাতজনিত কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। অল্প কিছুদের মধ্যে তার আরোগ্য হওয়া পর্যন্ত আদালত মূলতবী রাখার জন্য তিনি আবেদন করেন; এবং তার আবেদন নামঞ্জুর হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচারকদের বেঞ্চের ভারসাম্য ৪ঃ৩-এ বিভক্তি দাঁড়ায়, যা কার্যত আমাদের বিপক্ষে যায়।

লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির মতো সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতিও ছিলেন পক্ষপাতদুষ্ট। তার মতো তিনিও ছিলেন জিয়ার আদিনিবাস ভারতের ঝুলন্ধরের লোক। এছাড়া সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করার কোনো লক্ষণও ছিল না। ১৯৭৮-এর সেপ্টেম্বরে জিয়া মক্কায় হজ করতে গেলে আনোয়ার উল-হক রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করতে শপথ নেন। এসব ছাড়া প্রধান বিচারপতির অফিসের সঙ্গে প্রধান সামরিক প্রশাসকের অফিসের এক ধরনের আতাত ছিল।

পক্ষপাতদুষ্ট আনোয়ার উল হক সুপ্রিমকোর্টের অপর একজন বিচারপতি সফদার শাহকে দেশের বাইরে নির্বাসনে যাবার পথ তৈরি করেন। বাবার আপিল চলাকালে সফদার শাহকে বেঞ্চের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তখন প্রধান বিচারপতি তাকে বলেন, 'আমরা জানি যে, ভুট্টো নির্দোষ; কিন্তু পাকিস্তানের ভালোর জন্য তাকে সরিয়ে দিতে হবে।' আমার বাবার বেকসুর খালাসের পক্ষে ভোট দিতে যাওয়ায় তিনি আনোয়ার-উল-হক ও সরকারের শ্যেন দৃষ্টিতে পড়েন এবং বিদেশে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হন। এত কিছুর পরও জিয়া ও আনোয়ার উল-হক বড়াই করে বলতে থাকেন যে আমার বাবার বিচার একটা নিরপেক্ষ ও স্বাধীন আদালতেই হচ্ছে। 'আমরা সকল প্রমাণাদি খোলা মন নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছি', আনোয়ার উল-হক বলেন।

এই অবস্থায় কি করার আছে? সরকারের হাতে আদালত, সেনাবাহিনী, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ। উপরন্তু বাবার সুনামকে কলঙ্কিত করার জন্য সরকার তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগে পূর্ণ শ্বেতপত্র চারটি বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করে এবং বিদেশী দূতাবাসগুলোতে তা বিলি করেছে। একই সময়ে বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী আহমেদ রেজা কাসুরী ইউরোপ ও আমেরিকা সফরে যান। তিনি সেখানে দামি হোটেলে

www.pathagar.com

থাকেন এবং বিভিন্ন সভা-সমিতি করে মানুষকে জানাচ্ছেন যে পাকিস্তানে আমার বাবার 'ন্যায় বিচার' হচ্ছে। কাসুরী দাবি করেন যে এসব ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করছেন। কিন্তু পিপিপি'র সদস্য বা জিয়ার সামরিক শাসনের অধীনে বেঁচে থাকা মানুষেরা এ টাকার উৎস ভালোভাবেই জানেন। সরকার ছাড়া আর কে যোগাচ্ছে এ টাকা?

সেপ্টেম্বর মাসে বাবা আমাকে বলেন, সীমান্ত প্রদেশগুলো সফর করতে। 'আমাদের মানুষের মনোবল চাঙ্গা রাখতে হবে। আমার মাও টুপিটা তুমি সাথে নিও। ৭০ ক্লিফটনে আমার ড্রেসিং রুমে এটা আছে। কথা বলার সময় এটা তুমি মাথায় রেখো, তারপর খুলে রাখবে মাটিতে।' তাদের বলো 'আমার বাবা বলেছেন তার মাথার টুপি জনগণের পায়ের পাশে থাকার যোগ্য।'

এসব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেও তার স্বাস্থ্য নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। যতবার তাকে আমি জেলে দেখতে যাই মনে হয় তিনি আগের থেকে আরও বেশি শুকিয়ে গেছেন। তার দাঁতের মাড়ি গাঢ় লাল হয়ে উঠেছে এবং কোথাও কোথাও ক্ষত দেখা দিয়েছে। প্রায়শ জ্বর হয় তার। মা ও আমি সাধারণত চিকেন স্যান্ডউইচ নিয়ে যাই এবং তাকে খাওয়াতে চেষ্টা করি– নরম আর সতেজ রাখতে আমরা ওগুলোকে ভেজা কাপড়ে পেঁচিয়ে নিই। কিন্তু সেপ্টেম্বরে বাবাকে খাবারের প্রতি অমোনযোগী মনে হলো, পক্ষান্তরে আমার বক্তৃতার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তিনি আমায় কোচিং দিতে শুরু করলেন। 'সামরিক শাসনের কারণে প্রদেশগুলোর স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি আবার ফিরে আসবে', বাবা বললেন, 'জনগণকে মনে করিয়ে দিও যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমি তাদের ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিলাম এবং কেবল গণতন্ত্রের মাধ্যমেই পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষা করা সম্ভব।' আমরা চলে আসার সময় বাবা যেন একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। 'তোমাকে কোনো বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে আমি একদম চাই না। তারা বেপরোয়া হলে তোমাকে আবার গ্রেফতার করতে পারে। আমি অবশ্য শুরু থেকেই এরকম লড়াইয়ে অভ্যস্ত। আবার যখন আমি ভাবি সেইসব মানুষের কথা যারা আমাদের জন্য চাবুক সহ্য করেছে এবং নানাভাবে নিপীড়িত হয়েছে...।

'ঠিক আছে, বাবা', আমি বলি– 'একজন পিতা হিসেবে তুমি তোমার কন্যার জন্য উদ্বিগ্ন। কিন্তু আমার কাছে তুমি পিতারও অধিক– তুমি আমার নেতা যেমন নেতা তুমি আপামর নিপিড়িতের।'

'সাবধানে থেকে পিংকি', বাবা বলেন, 'তুই যাচ্ছিস উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকায়। ওরা যে কতটা রক্ষণশীল তা যেন ভুলে না যাস। কথা বলার সময় প্রায়ই তোর ওড়না মাথা থেকে খুলে পড়ে– মনে করে পরে নিস।'

'আমি সাবধানে চলব বাবা', আমি তাকে আশ্বস্ত করি। 'ভালো থাকিস পিংকি'। বাবা বলেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভিক্টোরিয়া গেল আমার সঙ্গে। উপজাতি অধ্যুষিত এই অঞ্চলটির উত্তরে চীন আর পশ্চিমে আফগানিস্তান সীমান্ত। ইয়াসমিনও গেল আমার সঙ্গে।

www.pathagar.com

গতানুগতিক রক্ষণশীল একটি পাকিস্তানি পরিবারে বেড়ে ওঠা ইয়াসমিনের জন্য একটা সাহসের কাজ। ফ্ল্যাশম্যানস-এ আমার সঙ্গে থাকার আগে একটা রাতও সে জীবনে বাড়ির বাইরে কাটায়নি। সরকারের ভয়ে নয় বরং অবিবাহিত মেয়েদের বাড়ির বাইরে রাত কাটানোর রেওয়াজ নেই বলে তার দাদী অনিচ্ছুক সত্ত্বেও বাইরে আসার অনুমতি দেন।

অন্য অনেক পরিবারের মতো নিয়াজীরাও শাসকের নির্মমতার কারণে অনেক প্রথার বিরুদ্ধাচারণ করছেন। নিজেদের যথেষ্ট বিপদ ডেকে এনেও নিয়াজী পরিবারের সদস্যরা আমাকে হোটেলে না থেকে তাদের বাড়িতে থাকার জন্য বলেন যাতে করে আমি পারিবারিক একটা পরিবেশে বসবাস করতে পারি। পরিণামে তারা নিপীড়িত হয়ে চলেছেন। তাদের বিরুদ্ধে ট্যাক্স লিয়েন– ফাইল করা হয়েছে। তাদের বাড়ির সামনের রাস্তা গোয়েন্দা ও ট্রাকে ভরে উঠেছে। এরা মিসেস নিয়াজিকে বাজারে যাবার পথে, তাদের বাচ্চাদের স্কুলের পথে এবং জনাব নিয়াজির দাঁতের রোগীদের পর্যন্ত অনুসরণ করছে। তা তারা করতেই থাকল যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ক্লিনিকে রোগীর সংখ্যা শূন্যে এসে ঠেকল।

স্থানীয় পিপিপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আমরা গেলাম মর্দান (যেটি বুদ্ধ সভ্যতার এক সময়কার কেন্দ্রভূমি গান্ধারায় অবস্থিত), আবোটাবাদ (যা একসময় ছিল এক ব্রিটিশ পার্বত্য স্টেশন) এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রাজধানী পেশোয়ার সেখানে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন গিরিমাটির দেয়াল যা তৈরি করা হয়েছিল মধ্য এশিয়ার হানাদারদের রুখতে। সীমান্ত প্রদেশগুলোতে এবং পাঠানদের দ্বারা স্বশাসিত অঞ্চলগুলোতে আমি অন্তর থেকে উপলব্ধি করেছিলাম পাঠানদের কঠোর নিয়ম-কানুন : সকল অতিথির জন্য সেবা, আর প্রতিশোধ প্রতিটি অপমানের জন্য! 'আত্মমর্যাদা বোধের জন্য জাতি হিসেবে পাঠানরা সুপরিচিত। আমার বাবা কেবল তার নিজের মর্যাদার জন্য নন বরং দেশের মর্যাদার জন্য লড়ছেন।' খাইবার পাসের মতো অমসৃণ ও এলোমেলো উপস্থিতি জনতাকে আমি বললাম। আমরা গেলাম সুবিস্তৃত ধানক্ষেতে ভরা সোয়াতে, বাতাসে ভেসে বেড়ানো লবণের ভূমি কোহাটে। আঞ্চলিক ভাষা পশতু না জানায়, উর্দুতে বক্তৃতা করলাম আমি– পাঠানেরা এমন মনোযোগ দিয়ে তা শুনল যেন আমি পশতু-ই বলছি।

এখানে আমি মহিলা হিসেবে অনিরাপদ ও পৃথক ভাবিনি। যদিও এখানকার মেয়েরা পর্দা ও আড়ালের মধ্যেই থাকে। দেশমাতৃকার এ দুর্ভোগ, আমার পরিবার ও আমাদের সবার ভোগান্তি আজ ছাপিয়ে গেছে নারী-পুরুষের পার্থক্যকে, পাঠানদের বলা পশতু ধ্বনিতে 'রাশা, রাশা, বেনজির রাশা!' –স্বাগত, স্বাগত, বেনজীর তোমায় স্বাগত!

পাঞ্জাব সফরের আগে রাওয়ালপিণ্ডিতে বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আর সেলের দরজায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে আমায় তিনি অভিনন্দন জানালেন, বীরঙ্গনার মতো কাজ করছে!

আমার কথা শোনার জন্য শত শত পিপিপি-কর্মী লাহোরে এক পিপিপি'র নেতার বাড়িতে জমায়েত হয়েছিল। সরকারের নির্মম নির্যাতনের পরও দলীয়কর্মীদের সাহস এতটুকু হ্রাস পায়নি। 'এটা একটা অন্যায় বিচার' গ্রেফতার হয়ে আমরা এর প্রতিবাদ জানাব', একজন পিপিপি ভক্ত আমায় বললেন, 'মৃত্যুদণ্ড দেয়ার আগে জিয়াকে আমাদের সকলকে গ্রেফতার করতে হবে।' সারগোদায়, যেখানে ভূ-স্বামীরা রয়েছে, অপেক্ষাকৃত বেশি হৈ- হট্টগোল হলো। সেখানে মানুষের ভিতর এক ধরনের মনোবল তৈরি হচ্ছিল, আর তাই সরকার যত দ্রুত সম্ভব তা বিনষ্ট করতে উদ্যোগী হলো। সারগোদা থেকে আমার চলে

www.pathagar.com

আসার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে ধরপাকড় শুরু হলো। অনেক মানুষের মধ্যে আমার আশ্রয়দাতাও বন্দি হলেন; তার একমাত্র অপরাধ ছিল তার বাড়িটা আমাকে ব্যবহার করতে দেয়া। এ 'অপরাধে' তাকে একবছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লাখ রূপী বা দশ হাজার ডলার জরিমানা করা হলো।

'সরকার ক্ষিপ্ত। এখনই আমাদের মুলতান যাওয়া ঠিক হবে না'। লাহোরে পার্টি-সদস্যদের কেউ কেউ বললেন। অন্যরা যুক্তি দেখালেন, 'আমাদের জন্য এটা এক ধরনের সতর্কাবস্থা। আবেগের সঙ্গে কাজ করতে গেলে আমাদের গ্রেফতার হতে হবে। বরং এখন কিছুটা চুপ থেকে আরো অধিক শক্তি সঞ্চয় করে আরও বেশি সময় নিয়ে অনেক বেশি মানুষের কাছে আমরা পৌঁছতে পারি।' দ্বিতীয় যুক্তিটি গৃহীত হলো, সরকার পক্ষের আরেকটি মামলার জবাব দিতে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আমি করাচি ফিরে এলাম।

ইত্যবসরে গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের দায়বোধ ভিন্নমাত্রা পেল, বিভিন্ন শহরে মানুষেরা নিজেদের শরীরে অগ্নিসংযোগ করল। 'মুসাওয়াত' পত্রিকায় তাদের ছবি দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে অন্তত তাদের দু'জনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। এদের একজন আনিস। সে কয়েকমাসে আগে ফ্লাশম্যানস হোটেলে এসে তার সঙ্গে একটা ছবিতে পোজ দেয়ার অনুরোধ করে। সে সময় আমি অত্যন্ত ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও তার সঙ্গে পোজ দেই। আজ যখন আমি জানলাম যে, তিনি নিজেকে জীবন্ত দগ্ধ করেছেন অতীতে তার জন্য আমার যৎসামান্য অবদানের কথা মনে করে ভালো লাগল। অপরজন হলেন, পারভেজ ইয়াকুম নামের একজন খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী। ১৯৯৭-এর সেপ্টেম্বরে বাবা গ্রেফতার হবার পর পর তিনি আমার কাছে এসেছিলেন একটা প্রস্তাব নিয়ে। প্রস্তাবটা ছিল বিমান ছিনতাইয়ের। তিনি বলেছিলেন যে বিমানের সকল যাত্রীকে তিনি জিম্মি করে রাখবেন যতক্ষণ না সরকার আমার বাবাকে মুক্ত করে দেয়। 'আপনি অবশ্যই তা করবেন না।' আমি তাকে বলি, এতে নিরপরাধ মানুষেরা মারা পড়তে পারেন। সেক্ষেত্রে সরকারের ভিতরকার আইন-হীন মানুষগুলোর সাথে আপনার পার্থক্য কি থাকল? আমরা লড়ব, এবং তাদের পথ অনুসণ করব না।' আইনের মধ্যে থেকে এখন তিনি লাহোরে নিজেকে জীবন্ত দগ্ধ করে– চরম বিসর্জন দিলেন।

অক্টোবর ৪, ১৯৭৮। মুলতান বিমান বন্দর

পাঞ্জাব সফরের সময় করাচি থেকে মুলতানগামী বিমান বড় বেশি দেরি করল। সকাল সাতটায় ইয়াসমিন ও আমি বিমানবন্দরে পৌঁছাই, কিন্তু বিকাল না হওয়া পর্যন্ত বিমান ছাড়ল না। মুলতানে পৌঁছে এর কারণ আমরা জানতে পারলাম। টার্মিনালের লাগোয়া জায়গায় না থেমে বিমান থামল রানওয়ের এক প্রান্তে– এবং থামার অল্পকিছুক্ষণের মধ্যে সামরিক জিপ ও ট্রাক বিমানটাকে ঘিরে ফেলল।

বিমানে উঠে সাদা পোশাকের দু'জন মানুষ জানতে চাইল, 'বেনজির ভুট্টো কোথায় বসেছেন?' বিমানের স্টুয়ার্ড আমাকে দেখিয়ে দিলেন। 'আমাদের সঙ্গে আসেন', তারা বলল। 'কিন্তু কেন? কি কারণে?' 'কোনো প্রশ্ন নয়!' ইয়াসমিন ও আমি নেমে এসে নিকটেই একটা ছোট বিমান দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

'আপনি বিমানে ওঠেন', অফিসাররা আমায় বললেন, 'সে এখানে থাকুক।' আমি

www.pathagar.com

ইয়াসমিনের দিকে তাকালাম। ডাগর চোখের তরুণী ইয়াসমিন এই অজানা শহরে একেবারে একা। আল্লাহ জানে তার কী হবে। অথচ সামরিক আইন প্রণেতারা এবং মৌলবাদীরা আমার বাবার ও মায়ের এবং তাদের স্বামী-সন্তানের গ্রেফতারের বিরোধীতা করতে আসা মেয়েদের ঘরের বাইরে মিছিল-সমাবেশে যোগ দিতে দেখলে 'কুকুর' বলে অসম্মান করতো। ইয়াসমিনও চিন্তিত আমার ভবিষ্যত নিয়ে। তবে দু'জন একসঙ্গে থাকার মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তা রয়েছে।

'তাকে ছাড়া আমি যাব না', আমি পুলিশকে বললাম। তাদের চোখ সঙ্কুচিত করে তারা বলল, 'আপনি প্লেনে ওঠেন।' ইয়াসমিনের হাত শক্ত করে ধরে আমি বললাম, 'আমি যাব না'। তখন অবিশ্বাস্যভাবে তারা আমার দিকে তেড়ে এল।

এবং পিচঢালা রানওয়ে দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল। আমাকে ধরে রাখবার জন্য ইয়াসমিনও যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল; আমি বললাম, 'আমাকে একা যেতে দিও না ইয়াসমিন!'

বিমানের যাত্রীদের আমরা দেখলাম বিস্ফোরিত নয়নে আমাদের টেনেহিচড়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে। আমার সালোয়ার কিছুটা ছিড়ে গেল, পায়ের চামড়া কেটে গিয়ে রক্ত বেরুলো। ইয়াসমিন চিৎকার করতে শুরু করল– এবং এই অবস্থায়ও আমরা একে অন্যকে ধরে রেখেছিলাম।

পুলিশের দ্বি-মুখী ওয়্যারলেস কাজ তখন শুরু হলো। অন্যসব সময়ের মতো এখনও তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না এবং কী করবে সে সম্পর্কে নির্দেশ চাইছে। পুলিশের কর্মব্যস্ততার মাঝে ইয়াসমিন ও আমি তিন আসনের ছোট্ট বিমানে গিয়ে উঠলাম। বিমানের পাইলট পুলিশদের জানালেন যে, এখনই তাকে উড়াল দিতে হবে নইলে ল্যান্ড করার মতো যথেষ্ট আলো কোথাও পাওয়া যাবে না। আমরা জানি না কোথায় ল্যান্ড করার কথা সে বলছে। মুলতানের সেনা কমান্ডার ওয়্যারলেসের মাধ্যমে পাইলটের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তিনি আমাদের যেতে দেয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ছোট্ট বিমানটি তবু দাঁড়িয়ে রানওয়েতে।

'সকাল সাতটা থেকে পানি বা খাবার কিছুই আমার খাওয়া হয়নি।' বিমান চালক পাইলট ধীরস্থিরভাবে পুলিশকে বললেন। দ্রুত তারা তাকে একটা লাঞ্চ-বক্স এনে দিল। আমরা যখন আকাশে উড়লাম তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি খেয়েছি। এটা আমি আপনাদের জন্য নিলাম– সেনা কমান্ডারকে করা পানির জন্য আমার ব্যর্থ অনুরোধ এভাবে তিনি পূর্ণ করলেন। পাঁচঘণ্টা পর আমরা রাওয়ালপিণ্ডি ফিরলাম। আমি যে পিণ্ডি পৌঁছেছি তা বুঝলাম বিমান থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগত পুলিশকে দেখে। অবশেষে ইয়াসমিন তার শহরে এসে পৌঁছল। বিমানের দরজা দিয়ে নামতে আমার অসুবিধা হওয়ায় পাইলট আমার দিকে ফিরে তাকালেন। তার ভয়ার্তমুখে উদ্বেগ চোখে অশ্রুর আভাস। 'আমি একজন সিন্ধি', তিনি বললেন। তার এতটুকু কথাই আমার জন্য যথেষ্ট হলো।

আমাকে দেখে মা খুশি হলেন। তিনি দশ মাসের জন্য যে বাড়িতে বন্দি ছিলেন সেখানে তার সঙ্গে দেখা হলো আমার। কি সৌভাগ্য! তিনি বলেন– কারণ, প্রকৃতপক্ষে তিনি আশা

www.pathagar.com

করছিলেন যে আমি তাকে দেখতে যাব। আমার ছিড়ে যাওয়া পোশাক আর পায়ের রক্তের দাগ দেখে তিনি বিচলিত বোধ করলেন। 'আচ্ছা! দেখি! দেখি!', ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বললেন। আমরা আবার আটক হলাম।

আমি আমেরিকায় মীরকে চিঠি লিখলাম। সে সেখানে গেছে জাতিসংঘে আবেদন জানাতে যাতে করে সরকারের ওপর বেশি মাত্রায় চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। বাবা তোমায় কিছু দিক নির্দেশনা দিতে বলেছেন। তিনি উপদেশ দিচ্ছেন, সমালোচনা করছেন না।

১. সিজারের স্ত্রীকে অবশ্যই সন্দেহের উর্ধ্বে থাকতে হবে। এখানকার সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে যে লন্ডনে তুমি অসংযত জীবন-যাপন করছো। বাবা সেসব বিশ্বাস করেন না কিন্তু তিনি চান যে সেখানে তোমার ব্যক্তি জীবন সাবধান ও সতর্ক হবে। কোনো সিনেমা দেখা নয়, কোনো বাড়াবাড়ি বা অপব্যয় নয়– অন্যথায় মানুষ বলবে যে, যখন তোমার বাবা ডেথ সেলে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন তখন তুমি ভোগ-বিলাসে মগ্ন।

২. ভারত এবং ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো ধরনের সাক্ষাৎ বা যোগাযোগ করা থেকে বিরত থাকবে। কোনো এক ভারতীয় পত্রিকায় তোমার সাক্ষাৎকার এখানে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছে।

মীরকে অভিভাবকসুলভ এ ধরনের চিঠি লিখতে আমার মোটেও ভালো লাগছিল না; কারণ আমি জানি যে তাকে কত কষ্টে সেখানে কাজ করতে হয়। আমার ছোট এমজিবিটা সে বিক্রি করে দিয়েছে, আর সেই টাকা দিয়ে সরকারের শ্বেতপত্রের বাবার প্রত্যুত্তর ছাপাবার কাজ সে করছে লন্ডনে। সেখানে বসবাসরত বিদেশি সরকারের প্রতিনিধি, যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব, সে সাক্ষাৎ করেছে। এছাড়া ইংল্যান্ডে বসবাসরত পাকিস্তানিদের সে এক কাতারে এনে বাবার মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে কাজ করে যাচ্ছে। আমার খুব ইচ্ছা মীর আর শাহ-সহ আমরা সবাই যদি একযোগে আন্দোলন চালাতে পারতাম! বিদেশে তারা এসব কাজের জন্য তাদের লেখাপড়া পরিত্যাগ করেছে। এছাড়া পাকিস্তানে এলে তারা গ্রেফতার এড়াতে পারবে না। কাজেই, আমাদের সবাইকে আন্দোলন করতে হচ্ছে কিন্তু প্রত্যেককে একাকী থেকে।

ডিসেম্বর ১৮, ১৯৭৮। সুপ্রিমকোর্ট, রাওয়ালপিণ্ডি।

তাদের প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্য সমস্ত আদালত কক্ষে মানুষের প্লাবন। সেখানে সুদীর্ঘ বাকযুদ্ধের পর বাবার আইনজীবীরা তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সশরীরে আদালতে উপস্থিত হবার ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। তার বক্তব্য রাখার চারটি দিনেই গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে অজস্র লোক সেখানে উপস্থিত থেকেছিল। তারা সারিবদ্ধ বেঞ্চের ফাঁকে দেয়ালে বইয়ের তাকের পাশে এবং থাকা সম্ভব আদালত কক্ষের এমন প্রতিটা বিন্দুতে তারা দাঁড়িয়েছিল। এছাড়া আরও অসংখ্য মানুষ বাবাকে আসতে ও যেতে দেখার জন্য নিরাপত্তা বেষ্টানীর ওপাশে অপেক্ষা করছিল। সেখানে তারা ছিল সকাল ৯টা থেকে বিকেল পর্যন্ত।

আদালতে যেতে আমি ব্যাকুল ছিলাম কিন্তু আমি আটক থাকায় এবং সেখানে যাবার অনুমতি না পাওয়ায় আমার যাওয়া হয়নি। প্রায় এক বছর আটক থাকার পর মা নভেম্বরে মুক্তি পেয়েছেন এবং সেখানে যেতে পেরেছেন। বাবার ভ্যালেট উরস আদালতের অনুমতি

www.pathagar.com

যোগাড় করতে পেরেছে। মিসেস নিয়াজী এবং ইয়াসমিন, ভিক্টোরিয়া এবং আমিনা প্রত্যেকে আদালতের অনুমতি পেয়েছে। পরে এসবের ভিত্তিতে ভিক্টোরিয়া 'ভুট্টো : বিচার ও মৃত্যুদণ্ড' নামে একটা বই লেখে। আমার মতে, বইটার নাম হওয়া দরকার ছিল 'আইনী হত্যা'।

মা বললেন যে, বাবা বুদ্ধিদীপ্ত বক্তৃতা রেখেছেন। চারদিন ধরে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত হত্যা মামলার অভিযোগগুলোর অসঙ্গতি এবং পরস্পর বিরোধীতার উল্লেখ করে সেগুলো খণ্ডন করেন। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে ছিল যে তিনি কেবল নামে মুসলমান এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি ভোট জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত। এ অভিযোগের জবাবে বাবা বলেন, 'উর্বরা এই সিন্ধু উপত্যকা সরকারি এবং বেসরকারি কর্মকর্তাদের অজস্র চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার জন্য আমি দায়ী থাকতে পারি না!' কোনো ধরনের পূর্ব প্রস্তুতি এবং নোট ছাড়াই উপস্থিত জনমণ্ডলীর মাঝে বাবা আরেকবার তার প্রতিভা ও বাগ্মীতার পরিচয় দেন।

'রক্ত মাংসের সবাইকে একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হয়। জীবনকে আমি স্রেফ জীবন হিসেবে দেখিনি, জীবন আমার কাছে ন্যায়পরায়ণতার বিষয়, তিনি বলেন, এটা প্রশ্ন নয় যে আমি নিরপরাধ কিনা প্রমাণ করা, বরং প্রশ্ন এটা যে, বাদি পক্ষকে সন্দেহাতীতভাবে তাদের মামলা প্রমাণ করতে পেরেছে কিনা। আমার নিরাপরাধ সত্ত্বাকে আমি ব্যক্তি ভুট্টোর কারণে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছি না। বরং এই মামলা যে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক এবং অসঙ্গতিপূর্ণ আমি সেই কথাটা বলতে চাই। এটা মামলার সত্যকে ঢেকে ফেলেছে।'

আমি বলব যে, যে পরিবেশে তাকে রাখা হয়েছিল সেই তুলনায় বাবা অনেক ভালো বলেছেন। শেষ দিকে সেনা সদস্যরা তাকে রাতভর জাগিয়ে রাখত। গত ছয়মাস তাকে সূর্যের আলো দেখতে দেয়া হয়নি, এবং পঁচিশ দিন ডেথ-সেলে রয়েছেন তিনি বিশুদ্ধ পানি ছাড়া। 'তিনি মলিন ও দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন', মা বলেছিলেন, 'কিন্তু কথা বলার সময় তিনি যেন কোথা থেকে শক্তি পেলেন।' আমার কিছুটা খারাপ লাগছে, কোর্টরুমে ঢুকে বাবা বলেছিলেন। মানুষ এবং এসব কিছুর সঙ্গে তাল মেলাতে আমার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু মানুষকে দেখতে পাওয়া আমার কাছে সত্যিই চমৎকার, উপস্থিত মানুষদের দিকে চেয়ে তিনি বলেছিলেন।

কোর্টরুমে তার প্রতিবার আসা ও যাওয়ার সময় সেখানে উপস্থিত মানুষেরা উঠে দাঁড়িয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করত। জনতার সামনে তিনি নিখুঁত ও পরিপাটি পোশাকে যাওয়ার জন্য বলতেন সবসময় যেমনটি তিনি নিজে ছিলেন পাকিস্তানের কেতাদূরস্ত প্রধানমন্ত্রী। উরস তার জন্য ৭০ ক্লিফটনের বাড়ি থেকে স্যুট, সিল্কের জামা ও টাই এবং রঙিন একটা রুমাল এনে দেয় যা পরে তিনি প্রথমদিন কোর্টে হাজির হন। সবই ঠিক ছিল কেবল পোশাকগুলোর তুলনায় তার শরীরের ওজন কমে যাওয়ায় সেগুলো ঢিলা লাগছিল।

প্রথমদিকে কর্তৃপক্ষ তাকে দুই সারি আসনের মধ্যবর্তী সরু জায়গা দিয়ে কোর্টে প্রবেশ করতে দেয়। কিন্তু তারা যখন দেখল যে মানুষজন বাবার কাছাকাছি গিয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করছে এবং তিনি নিজেও তাদের ভালোবাসার উষ্ণ প্রতিদান হিসেবে হাসছেন এবং তাদের স্পর্শ করছেন, তখন তার চারদিকে তারা রক্ষীদের দিয়ে একটা নিরাপত্তা বেস্টনী তৈরি করে ফেলল। পরের তিনদিন সর্বদাই তিনি ছয় জন রক্ষীর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন।

২৩ ডিসেম্বর আপিল শেষ হয়। মা ও আমি ২৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানের স্থপতি মোহাম্মদ

www.pathagar.com

আলী জিন্নাহর জন্মদিনে বাবাকে দেখতে যাওয়ার অনুমতি চাই। এদিন এবং এর পাঁচ দিন পর তার ৫১তম জন্মদিনে তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমাদের আবেদন নামঞ্জুর হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯তে সুপ্রিমকোর্টের রায় বের হয়। এতে ৩-৪ বিভক্তি রায়ে পূর্বেকার মৃত্যু দণ্ড রায়ই বলবৎ থাকে।

বেলা এগারোটায়, রায় ঘোষণার পরপরই, মা ও আমি আদালতের এই সিদ্ধান্ত জানতে পারি। জিয়ার বেঞ্চের কাছ থেকে আমরা অলৌকিক কিছুর আশায় বুক বেঁধে ছিলাম। বেঞ্চের ৭ জনের ৪ জন বিচারক ছিলেন পাকিস্তানের সামরিক হৃৎপিণ্ড বলে কথিত পাঞ্জাবের লোক। এই চার জনের দু'জন ছিলেন বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত। রায় ঘোষণার পর সামরিক সরকার কর্তৃপক্ষ তাদের নিয়োগ পাকাপোক্ত করে। এরা নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখতে ভূমিকা রাখেন। অন্যদিকে অন্য তিন বিচারক ছিলেন অপেক্ষাকৃত প্রবীণ এবং তারা নিম্নআদালতের রায় বহাল না রাখার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এই রায় আমাকে শারীরিকভাবে অসুস্থ করে তোলে।

মা সে সময় বাবার সঙ্গে তার মঙ্গলবারের সাপ্তাহিক সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমাদের ভাড়া বাড়িতে তখন সামরিক আইনের লোক এলো মায়ের আটকাদেশ নিয়ে। কিন্তু মা তাদের এই আগমন ব্যর্থ করে দেন। তারা কোনো কিছু বোঝার আগেই মা ব্যস্ত হয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে সোজা তার দ্রুতগতি সম্পন্ন জাগুয়ার গাড়িতে চড়ে বসেন। মুলতান বিমানবন্দরে আমি আটক হওয়ার পর থেকে আমি যে বাড়িতে আটক আছি সে বাড়ির চারদিকে প্রহরারত পুলিশকে তিনি বলেন, 'দরজা খোল!' মায়ের আটকাদেশের বিষয়টা তাদের জানা না থাকায় তারা দরজা খুলে দিল। এরপর তিনি দ্রুতগতিতে গাড়ি হাঁকিয়ে, তার পিছনে নেয়া সামরিক যানগুলোকে পেছনে ফেলে, রাওয়ালপিণ্ডি সেন্ট্রাল জেলে হাজির হলেন। কারা কর্তৃপক্ষ যেহেতু বাবাকে দেখার জন্য তাকে জেলে আশা করেছিল তাই তাকে তারা জেলের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলো।

একের পর এক স্টিল গেট পেরিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন। মা তার আটকাদেশ জেলে পৌঁছানোর আগেই দ্রুত বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য ভেতরে ঢুকে পড়লেন। তিনি যদি তা না করতে পারতেন তাহলে তার বাবার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেতেন না। তার সামনে জেলের ভিতরকার ফাকা জায়গা। তিনি সোজা সেনা ছাউনী এবং অস্ত্রশস্ত্রের মজুদ পেরিয়ে বাবার সেলের সামনে গিয়ে হাজির হলেন।

বাবা তখনও ছিলেন ডেথ সেলে। 'আমাদের আপিল না-মঞ্জুর হয়েছে।' কারা কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ মা'কে ধরার আগে কথাগুলো তিনি বাবাকে বলতে পারলেন। তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন শান্ত মনে। 'আমি কাজটা করতে পেরেছি', মা বললেন, 'তোমার বাবাকে অন্য কেউ আদালতে রায় জানিয়ে যেন বিকৃত আনন্দ উপভোগ করতে না পারে তার ব্যবস্থা আমি করতে পেরেছি।' আরেকবারের জন্য মা ও আমি আটক রইলাম। বাবার পক্ষে আপিল করার জন্য আর মাত্র একসপ্তাহ সময় রইলো হাতে।

ফ্র্যাশম্যানস-এ আইনজীবীরা পিটিশন পুনর্বিবেচনার জন্য বিরামহীন কাজ করলেন। সুপ্রিমকোর্টের সিদ্ধান্তের ১৫০০ পৃষ্ঠার ৪ সেট ফটোকপির জন্য তারা আবেদন করলেন– উল্লেখ্য যে এই ১৫০০ পৃষ্ঠার ৮০০ পৃষ্ঠাই আনোয়ার-উল-হকের লেখা। এই আবেদনের

www.pathagar.com

প্রেক্ষিতে তারা এর এক কপি পেলেন। সেই কপি থেকে ফটোকপির জন্য একজন সেক্রেটারিকে নিয়োগ করা হলো। ফটোকপির চলার মাঝে তাকে গ্রেফতার করা হয় ফটোকপি মেশিনের মালিক হওয়ার কারণে।

অবশেষে আমাদের প্রতিরক্ষা দল একটা ফটোকপি মেশিন কেনে এবং তা ফ্ল্যাশম্যানস-এ স্থানান্তরিত করা হয়। কাজটা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। বছরের শুরুতে সরকার টাইপ রাইটার এবং ফটোকপি মেশিনের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিক্রয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফলে পিপিপি বা অন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠন গোপন কোনো কিছু মুদ্রিত করতে পারবে না। অর্থাৎ ফটোকপি মেশিন বা টাইপরাইটারের ব্যবহার রাষ্ট্রবিরোধী কাজে পরিণত হয়েছে। এর ফলে আমাদের কাছে এ ধরনের জিনিসপত্র বিক্রেতারা গ্রেফতারের ঝুঁকির মধ্যে থাকছেন। যাইহোক, আইনজীবীরা তাদের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। মায়ের সঙ্গে ইসলামাবাদে বন্দি থাকার সময়টা আমার কাছে নিঃশেষ দুঃস্বপ্নের মতো মনে হলো। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের কথা মাথায় রেখে আরো একদফা গণ গ্রেফতার চলে এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। জিয়া সব সময় তার পক্ষে বিরূপ হতে পারে এমনসব ঘটনা আগে থাকতে দমন করতেন। কোনো ধরনের প্রতিরোধ ছড়িয়ে পড়ার আগেই তিনি তা বিনষ্ট করতেন।

সামরিক সরকারের এই দমননীতির ফলে জনগণ শঙ্কিত ও স্তব্ধ হলো। নিজ নিজ জীবনে বিপদ দেখা দিলে মানুষ আর সবকিছু থেকে দূরে সরে গিয়ে তাদের নিজের জীবনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নীরবতার মাঝেই আছে নিরাপত্তা। তারা নিজ নিজ নিরাপত্তার জন্য অন্যসব দিকে উদাসীন হয়ে ওঠে। নিজেদের ভয়কে অতিক্রম করে তারা এটা ভাবতে পারে না যে, কখনও তারাও হতে পারে এই অবস্থার শিকার।

কিন্তু আমি অন্যদের মতো এতটা ভাগ্যবান ছিলাম না। বাবার মৃত্যুদণ্ডের আলোড়ণ থেকে আমি নিজেকে দূরে সরাতে পারিনি। আয়নায় তাকালে যেন আমি নিজেকে চিনতে পারতাম না। এসব ধকলের ফলে আমার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল এবং তাতে মেসতা ও ব্রন জাতীয় জিনিসের উদ্ভব ঘটেছিল। আমার ওজন এতটাই কমে গিয়েছিল যে থুতনি, চোয়াল এবং চোখের ভ্রু যেন বেরিয়ে আসতে চাইছিল। আমার চিবুক বসে গিয়েছিল এভং চামড়া টানটান হয়ে উঠেছিল।

প্রতি সকালে ১৫ মিনিট ব্যায়াম করার বিষয়টা বেছে নিয়েছিলাম। আমি জগিং করতাম একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু এ বিষয়ে আমার মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায় এবং আমি ব্যায়াম করা বন্ধ করে দেই। সবকিছুর পরও আমি ঘুমুতে পারলাম না। মা আমাকে ভালিয়াম দিলেন। আমি ২ মিলিগ্রাম নিলাম, কিন্তু ঘুম হলো না– আমার মনে এক ধরনের অশান্তি। মা পরামর্শ দিলেন আতিবা ব্যবহারের জন্য। তখন আমার কান্না পেল। আমি আতিবা'র পরিবর্তে মোগাডন ব্যবহার করলাম। কিন্তু সবই বিফল।

ফেব্রুয়ারি ১২, ১৯৭৯। সিহালা পুলিশ ক্যাম্প।

ওইদিন সকালে মাকে জানানো হয় যে, আমাদের সিহালায় পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্পে যেতে হবে। জায়গাটা ছিল বাবার রাওয়ালপিণ্ডি কারাগার থেকে কয়েক মাইল দূরে। আমাদের একটা নিস্ফলা টিলার ওপর একটা বিরান বাড়িতে রাখা হলো। বাড়িটি ঘেরা ছিল

www.pathagar.com

বৈদ্যুতিক তার দিয়ে। আমাদের জীবন-যাপনের জন্য কিছুই দেয়া হলো না। না কম্বল, না খাবার। কিছুই না। ইব্রাহিম ও বশির নামে আমাদের দুজন গৃহকর্মী আল মুর্তাজা থেকে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আমাদের জন্য খাবার ও অন্য জিনিসপত্র নিয়ে আসত।

ফেব্রুয়ারি ১৩, ১৯৭৯। আইনজীবীরা ভোর পাঁচটায় তাদের আবেদন লেখার কাজ শেষ করেন– এদিন সকালেই তা জমা দেয়ার কথা। আবেদন পর্যবেক্ষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আদালত রায় কার্যকর করাকে স্থগিত ঘোষণা করে। ২৪ ফেব্রুয়ারি আদালতে শুনানি শুরু হলো। এ সময় পৃথিবীর নানান দেশ দেশ থেকে অনেক রাষ্ট্রনায়ক দয়া ও উদারতার অনুরোধ জানালেন।' 'এ প্রসঙ্গে জিয়া বললেন, 'পৃথিবীর অনেক রাজনীতিবিদ আরেকজন রাজনীতিকের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন, কিন্তু কোনো অরাজনৈতিক লোক কোনো ধরনের অনুরোধ জানাননি।' 'এটা একটা ট্রেড ইউনিয়ন জাতীয় কাজ' জিয়া উপহাস ভরে বললেন।

মার্চের গোড়ার দিকে আমি সিহালা থেকে বাবাকে দেখতে গেলাম। আমি জানি া কিভাবে তিনি এখন সেখানে রয়েছেন। মৃত্যুদণ্ড বলবৎ থাকার পর থেকে তিনি যেকোন ধরনের চিকিৎসা নেয়া থেকে বিরত রয়েছেন। তিনি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন; এটা কেবল তার দাঁত ও মাড়ির ব্যথার জন্য নয়, বরং চিকিৎসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেও। এখন তিনি তার সেলে তালাবদ্ধ, বন্দি– কারা কর্মচারীরা অন্য সেলে তার জন্য কমোড বসিয়েছে তাও তিনি ব্যবহার করতে পারছেন না।

অন্য সব সময়ের মতো তাকে দেখার জন্য আমি ব্যাকুল ছিলাম; উপরন্তু তাকে অবাক করে দেয়ার মতো তার জন্য একটা কিছু আমার সঙ্গে ছিল। সাম্প্রতিক আটক হবার আগে মা করাচি থেকে বাবার কুকুর 'হ্যাপি'কে নিয়ে আসেন আমাদের সঙ্গী হবার জন্য। আমি এবং আমরা সবাই হ্যাপিকে ভালোবাসতাম, সে ছিলো সাদা রঙের শংকর জাতীয় একটা তুলতুলে প্রাণী যাকে উপহার হিসেবে আমার বোন বাবাকে দিয়েছিল। রাওয়ালপিণ্ডি সেন্ট্রাল জেলে পৌঁছে আমি তাকে আমার কোটের ভিতর গোপন করে নিই এবং কানে কানে বলি, 'এবার তোমাকে চুপ হয়ে থাকতে হবে।'

জেলে প্রবেশের প্রথম তল্লাশির জায়গায় জেল সুপারিনটেন্ডেন্টকে সৌভাগ্যবশত অনুপস্থিত দেখলাম। জেলে সেনা সদস্যদের প্রধান কর্নেল রফি, যিনি সব সময় আমাদের চলাচলের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন তখন ছিলেন না। 'হ্যাপি' ও আমি দ্বিতীয় দরজায় পৌঁছলে সেখানে তল্লাশি করার মহিলা পুলিশ কিছুই বললেন না। তাদের একজন বরং সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, 'কুকুরের ওপর তল্লাশি চালাবার কোনো নির্দেশ আমাদের নেই।' অবশেষে শেষ প্রাঙ্গণ পার হয়ে আমি 'হ্যাপি'কে ছেড়ে দিয়ে বললাম, 'যাও, তাকে খুঁজে বের কর।

মাটি শুকে এ সেলে ও সেলে ঘুরতে লাগল সে। আমি তার উল্লাসভরা চিৎকার শুনে বুঝলাম যে সে বিস্মৃত হওয়া বাবাকে খুঁজে পেয়েছে। তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছলে বাবা বললেন, 'মানুষের থেকে কুকুর কত বেশি বিশ্বস্ত!'

কারা কর্তৃপক্ষ কুকুরের বিষয়টা জানার পর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। 'হ্যাপি' কখনো আর বাবার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেল না। কিন্তু তারপরও আমি বাবাকে এমন একটা মুহূর্তের কথা মনে করিয়ে দিতে পেরেছিলাম যখন আমার মা-বাবা আর তাদের চার সন্তানসহ একটা পরিবার একই ছাদের নিচে বসবাস করে, আর তাদের বাগানে তাদের প্রিয় কুকুর ও বিড়ালেরা আছে।

www.pathagar.com

মার্চের প্রথম সপ্তাহগুলোয় আমাদের আইনজীবীরা আরও বেশি বিষয়ের ওপর পুনর্নিরীক্ষণের (রায়ের রিভিউ) জন্য আদালতে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। তাদের বিপুল সেই কর্মভার তাদের সমস্ত শক্তিকে যেন নিঃশেষ করে ফেলেছিল। মার্চের শুরুতে মা এবং আমি বিবিসি'র সংবাদে গোলাম আলী মেমনের মৃত্যু সংবাদ শুনতে পাই। তিনি ছিলেন বাবার পক্ষে লড়া এবং পাকিস্তানের অতি সম্মানিত আইনজীবীদের একজন। ফ্ল্যাশম্যানস-এ তার কাজের টেবিলে হার্ট অ্যাটাকে তার মৃত্যু হয়। সুপ্রিমকোর্টে বাবার রায় ঘোষণার পর তিনি তার কাজের মাঝেই খুব আফসোসা করে বলে উঠেছিলেন, 'আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ'– সুপ্রিকমোর্টের এই রায়ের বিপক্ষে তিনি কিভাবে লড়বেন! বিবিসিতে তার মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্র আমরা রেডিও বন্ধ করে দেই। এরপর আমাদের আর কি বলার আছে?

২৩ মার্চ ছিল একটা ঐতিহাসিক দিন। এই দিন পাকিস্তানের স্থপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এই দিনে জিয়া ঘোষণা করলেন যে, আসছে শরৎকালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পরের দিন সুপ্রিমকোর্ট তার মতামত দেয়। যদিও বাবার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয় তবু কোর্ট বাবাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পক্ষে সুপারিশ করে। পুনরায় আশা সঞ্জীবিত হলো। এখন সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে স্রেফ জিয়ার ওপর।

সাতদিন। মাত্র ৭ দিন সময় রয়েছে আর। মাত্র সাত দিন আছে, এর মধ্যেই তাকে বা অন্য কাউকে আমার বাবার মৃত্যুদণ্ড রহিত করার জন্য বলতে হবে, জিয়ার সে অনুরোধ গ্রহণ করতে যথেষ্ট সুযোগও ছিল। পাকিস্তানে ৩-৪ বিভক্তি রায়ে কখনো কারও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়নি। বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে মৃত্যুদন্ডের বিপরীতে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সর্বসম্মতি সুপারিশ কখনো এভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়নি। এবং এই উপমহাদেশে কেউ-ই হত্যার ষড়যন্ত্রের দায়ে মৃত্যুবরণ করেনি।

জিয়ার ওপরে বিদেশ থেকেও চাপ ছিল। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা আবারও অনুরোধ করলেন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তৃতীয়বারের মতো অনুরোধ করলেন। সৌদি আরব অনুরোধ করল এবং প্রেসিডেন্ট কার্টারও এবার শামিল হলেন এই অনুরোধে। কিন্তু জিয়ার দিক থেকে কোনো সাড়া মিলল না। সময় আমার বাবাকে দুর্ভাগ্যের দিকে নিয়ে গেল।

ফাঁসির দিন ঘোষণা হয়নি, মানুষ এখনও আশায় আশায় আছে। যদিও বাবা জানতেন, মানুষের যা কখনো বিশ্বাস করেনি তা হলো আদালতের সুপারিশ এবং মুসলিম দেশগুলোকে দেয়া জিয়ার আশ্বাস সত্ত্বেও বাবাকে তিনি ফাঁসির পরিবর্তে যাব্বজীবন কারাদণ্ডের সুবিধাটা দেবেন না। জিয়া মনে করেছিলেন যে আমার বাবা বা তার পরিবারের কারও অনুরোধ তার মুখ রক্ষা করবে এবং তিনি মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করতে পারবেন। কিন্তু বাবা, যিনি অনেক আগেই এই নিশ্চিত নিয়তির কথা ভাবতে পেরেছিলেন, সব সময় জীবন ভিক্ষার আবেদন করার বিষয়ে নিষেধ করে এসেছেন এই বলে যে, যে দুষ্কর্ম তিনি করেননি তার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করা একজন নিরাপরাধ মানুষের কাজ নয়! তবু হায়দ্রাবাদের আমার এক ফুফু বাবার বড় বোন, সময় শেষ হবার একঘণ্টা আগে জিয়ার বাড়ির সামনে তার আবেদন পেশ করে। কিন্তু এবারও জিয়ার তরফ থেকে কোনো উত্তর আসেনি।

লক্ষণগুলো অশুভ হয়ে উঠতে লাগল। রাওয়ালপিণ্ডি সেন্ট্রাল জেলে বিছানাসহ বাবার সেলে রাখা সব কিছু সরিয়ে ফেলা হলো। তিনি মেঝেতে ঘুমাতে লাগলেন। তার দাড়ি কামাবার রেজারও তারা নিয়ে গেল; সাধারণত বাবা প্রতিদিন দাড়ি কামাতে পছন্দ

করতেন। তার মুখ ধূসর দাড়িতে ভরে উঠল। তিনি খুব বেশি অসুস্থ আর দুর্বল হয়ে গেলেন।

সিহালায় আমি আরও ১৫ দিনের আটকাদেশ পেলাম। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, 'বাবার মুক্তির জন্য আমার চালানো রাজনৈতিক তৎপরতা শান্তি প্রতিষ্ঠায় সামরিক আইনের পরিপন্থী।'

কেউই জানত না কী ঘটতে যাচ্ছে। আদালতের সুপারিশ এবং সারা পৃথিবীর নিন্দার পরও কি জিয়া আর অগ্রসর হবেন? যদি হন, তবে কখন? ৩-এপ্রিল বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেল। সেদিন মা ও আমি শেষবারের মতো আলাপ আলোচনা করি।

ইয়াসমিন! ইয়াসমিন! তারা তাকে আজ রাতেই হত্যা করবে!

আমিনা! তুমিও এখানে, শোনো, আজ রাতেই তারা করবে!

আইনজীরীরা আরেকটি আবেদন পাঠান। আমিনা করাচিতে যায়, সে এবং বাবার আইনজীবী জনাব হাফিজ লাখো আদালতে আরেকটি আবেদনপত্র জমা দিতে চেষ্টা করে। কোর্ট রেজিস্ট্রার সেটি জমা নিতে অস্বীকার করেন। রেজিস্ট্রার বিচারকদের কাছে সেটি জমা দিতে বলেন। বিচারকরাও এটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এমনকি তাদের এড়াতে একজন বিচারক আদালতের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। আমিনা এবং জনাব লাখো এরপর সিনিয়র বিচারপতির বাড়িতে যান এবং বাড়ির গেটে অপেক্ষা করেন। বিচারক মহোদয় তাদের সঙ্গে দেখা করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। ভগ্ন হৃদয়ে আমিনা ইসলামাবাদে ফিরে আসে।

এপ্রিল ৩, ১৯৭৯ / টিক! টিক! সামরিক বাহিনী গারি খুদাবক্সে যাবার সকল পথ বন্ধ করে দিয়ে আমাদের পারিবারিক কবরস্থান ঘিরে ফেলে। আমিনা বিমানবন্দর থেকে সোজা নিয়াজি সাহেবের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। ড. নিয়াজী বার বার ফোনে কথা বলছিলেন। 'আজ রাতে। আজ রাতে তা ঘটতে যাচ্ছে।' বার বার ফোনে ওই কথাটা বলেই যাচ্ছেন। ইয়াসমিন ও আমিনা নীরবে জেগে থাকে, নির্ঘুম অন্ধকারে।

খুব সকালে রাওয়ালপিণ্ডি সেন্ট্রাল জেল থেকে একটি আর্মি-ট্রাক অতি দ্রুত বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ বাদে ইয়াসমিন ইসলামাবাদের আকাশে একটা ছোট বিমান উড়ে যেতে দেখে। তার মনে হয়েছিল, কোনো আরব নেতা হয়তো বাবার মুক্তির ব্যাপারে এসেছেন। কিন্তু যে বিমানের শব্দ ইয়াসমিন শুনেছিল কার্যত তাতে শায়িত ছিল বাবার মৃতদেহ, উড়ে চলেছিল তা তার লারকানার বাড়িতে।

www.pathagar.com

৭

আল মুর্তাজা কারাগার থেকে মুক্তি

মার্শাল ল'র প্রতি গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ

আল মুর্তাজা থেকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত আমার বাবার কবরস্থান এলাকা থেকে অলৌকিক সব ঘটনার খবর আসতে থাকে। সেখানে একটি পঙ্গু ছেলে হাঁটতে শুরু করেছে। এক বন্ধ্যা মহিলা সেখানে গিয়ে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছে। আমার পিতার ফাসির পর থেকেই লোকজন আমাদের পারিবারিক কবরস্থানে অনেকটা তীর্থ যাত্রায় যেতে শুরু করে। সেখানে গিয়ে কেউ গোলাপের পাপড়ি ছিটিয়ে দেন, কেউ মোনাজাতের সময় কবরস্থান থেকে একটুখানি মাটি নিয়ে জিহ্বার উপর রাখেন। স্থানীয় প্রশাসকরা মরুভূমিতে বিচ্ছিন্ন কবরস্থানের দিক নির্দেশিত চিহ্নটি তুলে ফেলেছে। কিন্তু এখনো সেখানে মানুষ আসে।

আমার পিতার ফাঁসির প্রথম বছরকে সামনে রেখে ১৯৮০ সালের ৪ এপ্রিল জনগণ ছুটতে থাকে গারহি খুদা বক্সে আমার বাবার কবরের দিকে। এ. সময় আমাদের ডিটেনশনের ছয়মাস চলছে। আমি এবং আমার মা শাসক গোষ্ঠির কাছে আবেদন জানালাম বাবার কবরস্থানে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে। কিন্তু আমি জানতাম যে অনুমতি মিলবে না। এই শাসকরা আমার পিতার সমর্থক ও পিপিপি'র কর্মীদের প্রতিবাদ বিক্ষোভ নিয়ে এতটাই শঙ্কিত যে আমাদের পৈত্রিক গ্রামে যাওয়ার রাস্তা চারপাশের কয়েক শ' মাইল এলাকা নিয়ে বন্ধ করে রেখেছে।

কত অস্ত্র জনগণের দিকে তাক করে রেখেছে সেটার চেয়ে বড় কথা জিয়াকে আমার পিতার প্রেতাত্মা তাড়িয়ে ফিরছে। জীবিত থাকতে আমার পিতা একজন সুদক্ষ কূটনীতিক এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হতেন। তাকে হত্যা করার পর তিনি তার অনুসারীদের কাছে একজন শহীদ হিসাবে মর্যাদা লাভ করেন। কেউ কেউ তাকে পীর বলে মনে করতে থাকে। একটি মুসলিম দেশে এরচেয়ে শক্তিশালী আর কিছু নেই।

পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর টহলদাররা তাদের হয়রানি করে। গাড়ি নিয়ে এলে তারা গাড়ির নাম্বার লিখে রাখে। আবার যারা পায়ে হেঁটে আসে তাদের নাম ঠিকানা লিখে রাখে।

www.pathagar.com

অধিকাংশ সময়ই তাদের সঙ্গে থাকা খাবার জব্দ করা হয় এবং স্থানীয় বাসিন্দারা পান করার জন্য যে জগ ভরে পানি রাখে তা ফেলে দেয়া হয়। কিন্তু তারপরও মানুষ আসে। তারা আমার পিতার ছবি ফ্রেমে করে রাখে। গোলাপ ফুলের, গাদাফুলের মালা দিয়ে কবরের উপর স্তুপ তৈরি করে ফেলে।

আমার বাবার মৃত্যু বার্ষিকীর আট দিন পর করাচিতে আমাদের ডিটেনশনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের শোনানির দিন ধার্য্য হয়। যখন আমাদের আইনজীবী উল্লেখ করেন সনমের সফরের সময় ক্যাপটেন ইফতিখারের অসম্মান করা নিয়ে প্রতিবাদ করে আমার চিঠি লেখার কথা তখন অ্যাডভোকেট জেনারেল এমন কোনো চিঠির কথা জানেন না বলে অস্বীকার করেন। কিন্তু আমার কাছে জেলারের স্বাক্ষর করা কাগজের কপি আছে। সেটি কোর্টে উপস্থাপনের জন্য আমার আইনজীবি এক দিনের জন্য কোর্ট মূলতবি রাখার অনুরোধ জানান। কোর্টের কোনো চিঠির ব্যাপারে অবজ্ঞা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ জন্য ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। তারা ভাল করে জানে যে আমার কাছে এর প্রমাণ রয়েছে। কর্তৃপক্ষ তখন বুঝতে পারল অবহেলার অভিযোগ গঠনের আগেই কিছু করা প্রয়োজন। ওই রাতে হঠাৎ করে আমাকে এবং আমার মাকে মুক্তি দেয়া হয়। আমি এই জেলারকে আর কখনো দেখিনি। পরে আমি শুনতে পেয়েছি যে তার প্রমোশন আটকে দেয়া হয়েছে এবং শাস্তিমূলক বদলী করা হয়েছে।

মুক্তি। কিন্তু কে জানে তা কতদিনের জন্য! আল মুর্তাজা জেল থেকে মুক্তির পর আমার মা থেকে গেলেন করাচিতে। আমি প্লেনে চড়ে চলে গেলাম রাওয়ালপিণ্ডিতে । বিগত ছয়মাস ডিটেনশনে থাকার সময় সেখানকার অবস্থার কতটা উন্নতি হয়েছে তা দেখার জন্য। প্লেনে ওড়ার সময় আমার কানের উপর অসম্ভব চাপ পড়ল। যা সহ্য রা খুবই কঠিন। বিশেষ করে পিণ্ডিতে প্লেন থেকে নামার সময়। পরদিন সকালে আমি ইয়াসমিনের বাসায় যখন ঘুম থেকে উঠলাম, দেখলাম বালিশের কভার পুঁজ ও রক্তে ভিজে আছে। আমার বন্ধুরা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তার আমার কান পরিস্কার করতে করতে বললেন,আপনি খুবই ভাগ্যবান। আপনার কানে যে ইনফেকশন হয়েছিল তা প্লেনের বাতাসের চাপে বাইরের দিকে ফেটে গেছে। যদি ভেতরের দিকে ফাটতো তাহলে বড় ধরণের ক্ষতি হতে পারতো।

কী চিন্তা করব তা আমার জানা ছিল না। আল মুর্তাজা হাসপাতালের সরকারি ডাক্তার আমাকে প্রথমে বোঝালো আমার কানে সামান্য কিছু সমস্যা রয়েছে। পরে আমাকে অভিযোগ করে বলা হল আমি কানে ছিদ্র করে ফেলেছি। বর্তমান ডাক্তার আমি কতটা ভাগ্যবান বলে খুব সাধারণ একটি পরামর্শ দিলেন আমি যেন আমার ডাক্তার দিয়ে প্রতি দুই সপ্তাহে একবার কানের চেক করার ব্যবস্থা করি। এই ডাক্তাররা কী অযোগ্য ছিল, নাকি এরা আমার অবস্থাকে গায়ে মাখেনি। এরা কেউ আমাকে বলেনি যে আমার কানে মারাত্মক ধরণের মাসটয়েড ইনফেকশন হয়েছে, যা ধীরে ধীরে কানের গভীরে নরম হাড়কে সংক্রামিত করছে। একারণেই আমি কানে কিছু কম শুনতাম। পরে আমি জানতে পেরেছি, অপারেশন ছাড়া দীর্ঘদিনের এই প্রদাহ মানুষকে পুরোপুরি কালা করে দিতে পারে। এর থেকে মুখের পারালাইসিসও হতে পারে। কিন্তু আমাকে এসবের কিছুই বলা হয়নি।

আমি করাচি ফিরে এলে মা ভীষনভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি আমাকে অনুরোধ

www.pathagar.com

করে বলেন, তুমি অনুমতি চাও দেশের বাইরে চেক আপ করাতে যাওয়ার জন্য। তোমার রাজনীতির সঙ্গে স্বাস্থ্যের কোনো সম্পর্ক নেই।' আমি শাসকদের কাছে সে অনুসারে আবেদন করলাম। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তারা আমাদেরকে সেখানেই রাখতে চাইল যেখান থেকে তারা দেখতে পারে।

৭০ নং ক্লিফটনের বাসার সামনে ২৪ ঘন্টা মিলিটারি ভ্যান পার্ক করা থাকতো। যখনই আমার মা বা আমি ঘর থেকে বের হতাম তখনই তারা অনুসরণ করতো। বাসায় যেই আসুক না কেন তার ছবি তোলা হতো এবং তাদের গাড়ির প্লেট নম্বর নোট করে রাখতো। আমাদের টেলিফোনে আড়িপাতা ছিল। মাঝে মাঝে ওর ভেতর থেকে কুটকুট শব্দ হতো। এছাড়া বাকি অধিকাংশ সময়েই এটি ডেড থাকতো।

আমার অবস্থার যখন একটু উন্নতি হলো তখন মা আমাকে বললেন, তুমি কেন সোজা লারকানায় গিয়ে নিজেদের ফার্মের হিসাব নিকাশ করছ না? দুই বছর ধরে কেউ ওগুলোর হিসাব নিকাশ দেখাশোনা করতে পারছে না।

আমি আল মুর্তাজায় ফিরলাম ম্যানেজারের সঙ্গে ফসল চাষ ও তোলা নিয়ে আলোচনা করতে। এ সময় সারাক্ষণ গোয়েন্দা সংস্থা আমার পেছনে লেগে থাকল। আমার কোনো ধারণাই ছিল না আসলে আমার কী করতে হবে। আমার পিতা এবং ভাইয়েরাই সব সময় জমি জমার খোঁজ খবর করতেন।

গ্রীস্মের আগে প্রতিটি সকাল এমন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে যে সহ্য করা কঠিন। আমি জিপে করে পেয়ারা বাগান, ধান ক্ষেত আখক্ষেতের ভেতর দিয়ে ভ্রমন করে নিজেকে নতুন দায়িত্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে থাকলাম। গা পুড়িয়ে দেয়া রোদ থেকে রক্ষার জন্য স্কার্ফ ও স্ট্র হ্যাট পরে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকলাম। শিখতে থাকলাম ক্ষেতের ভেতর দিয়ে কীভাবে ছোট ছোট খাল কওরে টিউবওয়েল থেকে পানি তুলে সেচ কাজ করা হয়, গ্রীস্মে ধান এবং তুলা চাষ করতে কী করতে হয় এবং জানতে থাকলাম কী করে আখ চাষ করতে হয় এবং জলাবদ্ধতার সমস্যাটি কেমন। এই শারীরিক কষ্ট আমার শরীরকে প্রশমিত করল।

বর্গাচাষীরা, জোগানদাররা, ম্যানেজার, মন্সি এবং হিসাবরক্ষাকারীরা ভুট্টো পরিবারের একজনকে তাদের পেছনে পেয়ে মহা স্বস্তি বোধ করল। একজন আমাকে বলল, মালিকের পায়ের নীচে সোনা থাকে। এখন আপনি এখানে আছেন, আমরা অবশ্যই উন্নতি করব। আমরা এখন আর এতিম নই।

এই জমিজমা আমার ভালই লাগছিল। লারকানায় পুরুষের পাশাপাশি কাজ করাটা খুব ভাল চোখে দেখা হয় না। এখানকার গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা ভীষন রক্ষনশীল। তারা বোরখা ছাড়া ঘর থেকে বের হয় না। এবং অবশ্যই তারা কেউ গাড়ি ড্রাইভ করে না। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। আমার পরিবারের কোনো পুরুষ পাকিস্তানে নেই। আমার পিতাকে মেরে ফেলা হয়েছে, আমার ভাইয়েরা কেউ পাকিস্তানে এলেই সাথে সাথে বন্দি করা হবে। তারা আফগানিস্তানে বসবাস করে। সুতরাং প্রতিদিন সকালে আমাকেই মাঠে যেতে হতো। সুতরাং আমার সুযোগ রইল না, আমাদের জীবনে সুযোগ রইল না পরম্পরা ধরে রাখার।

এক হিসাবে বলতে গেলে আমার লীঙ্গ পরিবর্তন হয়েছিল। এমন কেউ ছিল না যে জানতো না যে আমি বাধ্য হয়েছি একটি ধনী পরিবারের ধরণ থেকে বের হয়ে যেতে। এ ধরণের পরিবারের একজন তরুণী যদি কখনো নিকটাত্মীয় ছাড়া ঘর থেকে বের হতো

তাহলে ইর্ষণীয়ভাবে তার সঙ্গে কেউ পাহারায় থাকত। আমাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী পরিবারের সম্মান হলো মেয়েরা। তাদের সে সম্মান বাঁচাতে এবং মেয়েদের নিজেদের সম্মান ধরে রাখতে পরিবারগুলো চার দেয়ালের মধ্যে ঘোমটার আড়ালে মেয়েদেরকে ধরে রাখে।

আমার দাদার প্রথমপক্ষের চার মেয়ে, অর্থাৎ আমার চার ফুপু ছিলেন এই ঐতিহ্যের ধারক। ভুট্টো পরিবারের বিবাহযোগ্যা আর কোনো মেয়ে ছিল না। ফলে হায়দারাবাদের চারদেয়ালের মধ্যে তাদের চারজনের উপরই দায়িত্ব ছিল ঐতিহ্য ধরে রাখার। পরিবারের মধ্যে তাদের একটা আলাদা মর্যাদা ছিল, কারণ সবাই জানতো তারা কেন বিয়ে করেননি। তারা সব সময় খুবই হাসিখুশি ছিলেন। এবং তাদের সম্পর্কে কখনো অন্যরকম কোনো কিছু শোনা যায়নি। তাদের চোখ মুখে কোনো ভীতির রেখা ছিল না। আমার মা তাদের কাছ থেকে ঘুরে এসে সব সময় একথা বলতেন।

আমার কাছে এই জীবন একটি একঘেয়ে জীবন বলে মনে হতো। কিন্তু তাদেরকে সর্বদা সন্তোষ্ট মনে হয়েছে। তারা সবাই কোরআন শরীফ পড়ার জন্য ভাল আরবী শিখেছিলেন। রান্নার তদারকি করতেন। তারা চমৎকার গাজরের আচার তৈরি করতে জানতেন, মিষ্টান্ন তৈরি করতে জানতেন। সেলাই এবং বুননে ছিলেন দক্ষ। স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য তারা বাড়ির উঠোনে হাঁটাহাঁটি করতেন। মাঝে মাঝে কাপড়ওয়ালা আসতো নতুন কাপড় নিয়ে। দরজার বাহির থেকে সতর্কতার সঙ্গে ডাক দিত। তারা পর্দার আড়াল থেকে কাপড় পছন্দ করতেন। এরা ছিলেন সেকেলে প্রজন্মের। কিন্তু আমিতো এই প্রজন্মের মানুষ।

সন্ধ্যাবেলা আল মুর্তাজায় ছাত্রনেতা এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হতো। তারা জেলখানায় থাকা অন্য সহকর্মীদের ব্যাপারে খবরাখবর নিয়ে আসতো। মিলিটারির বিরুদ্ধে বর্তমান কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খোঁজ দিত। আমরা বসে তালিকা করতাম জেল গেটে কারা দেখা করতে যাবে এবং পরিবারকে কারা শান্তনা দিতে যাবে। দুপুরে আমাদের অবসর থাকতো। আব্বার কবরের উপরের সামিয়ানার ব্যবস্থা করলাম।

মায়ের অনুরোধে আল মুর্তাজার পুরোনো জানালা ফেলে কাচ লাগানো হলো। আল মুর্তাজায় ডিটেনশনে থাকার লম্বা সময়টাতে আমরা নিঃশেষিত হয়ে পড়ছিলাম। মা বললেন, আমাকে অনেক শান্ত দেখা যাচ্ছে। বললেন, কে জানে আবার কবে আমদের ডিটেনশন কাঁধে নিয়ে জেলে যেতে হয়। আমরা হয়তো সে জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম।

আমি লক্ষ করলাম নিজেকে পুর্বদেশের একটি অপরিচিত ঐতিহ্যের মধ্যে ছুড়ে দিয়েছি। যেখানে ভুট্টো পরিবারের মাত্র একজন রয়েছে সেখানে গ্রামবাসী আমাকেই হঠাৎ মুরুব্বি বলে বিবেচনা করতে থাকল। একটি মাটির ঘরের সামনের উঠোনে গ্রামবাসীরা তাদের দ্বন্দ্ব এবং সমস্যা নিয়ে আমার শরনাপন্ন হতে থাকল। সামন্তযুগ থেকে চলে আসা নিয়মে একজন নেতা তাদের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। উপজাতীয় বিচারের এই পন্থা এখনো গ্রামাঞ্চলে প্রচলন রয়েছে। যদিও আমি অবশ্যই ভুট্টো পরিবারের প্রধান নই তবু উপজাতীয় লোকেরা আমার কাছেই আসতে শুরু করে। পাকিস্তানে বিচার চাইতে গেলে দেখা যায় তা খুবই মন্থর, অনেক দূর যেতে হয় এবং ব্যয়বহুলও বটে। এছাড়া বিচার বিভাগকে দুর্নীতিপরায়ন বলেও মনে করা হয়। পুলিশের নাম আছে শুধু পকেট খরচের টাকার জন্য মানুষকে গ্রেফতার করে। ঘুষ দিলে তখন তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। এরচেয়ে

www.pathagar.com

বরং জনগণ যে কেনো ঝামেলায় ফয়সালা চায়। অথবা যে পরিবারকে চেনে বা আস্থা আছে সেই পরিবারের কাছে বিচার দেয়। কিন্তু আমি বুঝতে পারি আট বছর পশ্চিমা দেশে থাকার পর এই গ্রামের মানুষদের ব্যাপারগুলোর ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। এক সকালে আমি উঠোনে একটি দড়ির দোলনা বিছানায় বসে আছি। এক বুড়ো এসে আমার সামনে দাঁড়াল। তার দাঁত পড়ে গেছে। বললেন, চল্লিশ বছর আগে এর চাচাতো ভাই আমার ছেলেকে হত্যা করেছে। তখন তোমার বড় চাচা ফয়সালা করে দিয়েছিলেন, এই পরিবারে যদি কোনো মেয়ে জন্ম গ্রহন করে তাহলে সেই মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। এই দেখ এই মেয়েটি তাদের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছে। কিন্তু সে এখন তার মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছে না!

আমি দেখলাম আট বছর বয়সের শিশু কন্যা তার বাবার পেছনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এর উত্তরে মেয়েটির বাবা বলল, আমার মেয়ে যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে কোনো কথা বলেনি। আমি ভেবেছিলাম অনেক বছর আগের সেই হত্যার জন্য সে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছে। আমি যদি জানতাম সে দাবী করবে তাহলে আমি মেয়েকে আগেই সেভাবে বড় করতাম এবং তাকে বলতাম যে সে আমাদের না এবং একদিন তাকে আমাদের দিয়ে দিতে হবে। এখন আমরা মেয়েটিকে অন্য পরিবারে বিয়ে দেয়ার চিন্তা করছি। এবং তারা তাকে চায়। আমরা তাদেরকে ইতিমধ্যেই কথা দিয়েছি। এখন সেই কথা ভাঙবো কী করে?

এই দরিদ্র কন্যাটিকে নিয়ে আমার চিন্তা কম্পিত হয়ে উঠল। গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের ভাগ্য সবসময় প্রসন্ন নয়, সুখের নয়। তাদের মধ্যে খুব কম মেয়ের নিজেদের পছন্দের বিষয় থাকে। খুব কম মেয়েকেই জিজ্ঞেস করা হয় তার পছন্দের কথা। আমি বৃদ্ধকে বলরাম, তুমি মেয়েটিকে পাবে না। তার বদলে ক্ষতিপুরণ হিসাবে পাবে একটি গরু এবং নগদ ২০ হাজার রুপি। এটাই আমার বিচার। তাদের কথা বার্তা পাকা হওয়ার আগে তোমার অভিযোগ জানানো উচিৎ ছিল।

একটি মেয়ের বদলে একটি গরু, র‍্যাডক্লিফে নারী আন্দোলনের আলোচনায় এমন হিসাব আসেনি। কিন্তু এটা পাকিস্তান। বৃদ্ধ লোকটি ক্ষেপে গেল এবং চিৎকার করতে করতে চলে গেল।

আমার এই ফয়সালা পরের দিন এক ধ্বংস ডেকে আনল। একজন লোক এসে আমার সামনে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলল আমার স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে! তার শশুরও চিৎকার করতে থাকল। লোকটি বলল, আমাদের মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়েছে। আমাদের জীবন শেষ। সারাদিন আমার শিশুরা তাদের মায়ের জন্য কান্নাকাটি করছে। আপনি তাকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করুন!

আমি জানতে চাইলাম, তোমরা কাকে সন্দেহ কর? তারা নাম বলার পর আমি সেখানে লোক পাঠালাম গ্রামের মুরব্বিদের সঙ্গে কথা বলতে। তাতে অল্পবয়সী মেয়েটিকে সফলভাবে ফিরিয়ে আনা গেল। এতে মেয়েটি ভয়ঙ্কর ক্ষেপে গেল। বলল, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে বসবাস করওতে চাই না! আমি অন্য একজনকে ভালবাসি।এবার নিয়ে এই তৃতীয়বার আমি পালিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলাম! আমি মনে করেছিলাম আপনি একজন মেয়ে হয়ে মেয়ে মানুষকে বুঝবেন আর আমার প্রতি সদয় হবেন!

www.pathagar.com

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমি ছাড়া আর প্রত্যেকে জানে যে স্বামীগৃহ ত্যাগ করার জন্য মেয়েদের একমাত্র উপায় অপহরণ হওয়া। এটাই কী উপজাতীদের পন্থা? একজন অসুখী স্ত্রী স্বেচ্ছায় ঘর ত্যাগ করতে পারে না। পরে আমি জানতে পেরেছি এই দরিদ্র তরুনী মেয়েটি আর পালাতে পারেনি। এটাই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা নয় যে উপজাতীয় ঐতিহ্য ও মানবাধিকার বা নিজস্ব পছন্দ অপছন্দের দ্বন্দ্ব দেখলাম।

গণতান্ত্রিক পাকিস্তান এবং সামরিক একনায়কতন্ত্রের পাকিস্তানের তফাৎ দিনদিন বেড়েই চলছিল। আমি যখন লারকানার কৃষি খামারে এসব ফয়সালা নিয়ে ব্যস্ত তখন জিয়া দেশের সব প্রদেশে স্পেশাল মিলিটারি কোর্ট বসিয়েছে। একজন মেজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে দুজন করে অফিসার দিয়ে একের পর এক মৃত্যুদন্ড ও জেল দিয়ে যাচ্ছে। এসব অফিসারের কোনো সঠিক প্রশিক্ষনও নেই। শত শত মিলিটারি কোর্টে চলছে অবিচার। একজন অদক্ষ অফিসার শুনানির পর বছরের পর বছর সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করছে, কাউকে কাউকে বেত্রঘাত করা হয়েছে। আমি যে ফয়সালা করছিলাম সেখানে কোনো বাধ্যবাধতকা ছিল না। ইচ্ছা করলেই যে কেউ কোর্টে যেতে পারতো। কিন্তু মিলিটারি কোর্টে কাউকে ল'ইয়ার রাখতে দেয়া হয়নি। আপিল করারও কোনো সুযোগ ছিল না। শুধুমাত্র প্রিসাইডিং অফিসারকে ঘুষ দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। ঘুষের পরিমান ছিল এক বেত্রাঘাতের পরিবর্তে ১০ হাজার রুপি বা ১০০ ডলার। এই টাকা দিলে শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যেত। মার্শাল ল'র মৃত্যুদন্ডের শাস্তিতে ছিল কড়াকড়ি।

মার্শালল' আদেশ নং-৭৭, মে, ১৯৮০: সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের রাষ্ট্রদ্রোহ, নাশকতামুলক কর্মকাণ্ডের বেসামরিক আদালতের জুরিসডিকশনকে মার্শাল ল'র অধীনে আনা হয়। শাস্তি হল ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড, বেত্রাঘাত এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

মার্শাল ল' আদেশ নং ৭৮: রাজনৈতিক বন্দিদের বিনা বিচারে ১২ মাস কারাদণ্ডের কথা বারবার বলা হয়েছে। তবে আরেকটু বিকৃত করে। যেসব মানুষকে রাস্তা অথবা ঘর থেকে বন্দি করা হবে তাদের ক্ষেত্রে আর কোনো রকম ব্যাখ্যা দেয়ার দরকার হবে না। আদেশ অনুযায়ী ডিটেনশনের কারণ ও ক্ষেত্র কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে আলাদা করে দেখা হবে না। যতদিন মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষ মনে করবেন ততোদিন পর্যন্ত ডিটেনশন বর্ধিত করতে পারবেন। এখন থেকে যে কোনো লোক, যে কোনো জায়গায় গ্রেফতার হলে কোনো আপিলের সুযোগ থাকবে না।

১৯ জুন লাহোরে এই আদেশ তুলে নিতে এবং বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য নির্বাচনের দাবীতে আইনজীবীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ৮৬ জন আইনজীবীকে পেটানো হয় এবং গ্রেফতার করা হয়। ১৯৭৩ সালের সংবিধান পুনর্বহালের দাবী জানালে করাচিতে আগষ্টে ১২ জন আইনজীবীসহ বেশকিছু লোককে গ্রেফতার করা হয়। ছাত্রনেতা এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদেরকে গ্রেফতার ও হত্যা করা হয় সন্ত্রাসী কায়দায়।

গ্রীষ্মে আমি করাচিতে ফিরে এলে মা আমাকে সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু শাসকরা কোনো ঝুকি নিতে চাইল না। আমরা আগষ্টে লাহোর গেলাম পরিবারে একজনের বিয়েতে যোগদানের জন্য। আমাদের হোটেল পুলিশ ঘিরে ফেলল। আমরা তখন পাঞ্জাব

www.pathagar.com

প্রদেশের বাইরে। পুলিশ আমাদের কড়া প্রহরায় এয়ারপোর্ট নিয়ে এল এবং করাচিগামী একটি প্লেনে তুলে দিল।

এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল যে সামরিক অভ্যুত্থানের তিন বছর পরও জনগনকে মুগুর পেটা করে সমর্থন আদায় করতে পারেনি। অধিকন্তু দিনে দিনে তার তার ভিত্তি আরো দুর্বল হচ্ছে। জিয়ার প্রায় কোনো রাজনৈতিক সমর্থন ছিলই না। শুধু সেনাবাহিনীকে সে নিয়ন্ত্রন করেছে। এমনকি পিএনএ সদস্যরা, যারা ১৯৭৭ সালে আমার পিতা এবং পিপিপি'র বিরুদ্ধে ছিল এবং যার কয়েকজন জিয়ার মন্ত্রী হয়েছেন তারাও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আমার পিতার মৃত্যুর ছয়মাস পর জিয়া যাদের মধ্যে মন্ত্রণালয় বন্টণ করেছিল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে সেই পিএনএও নিজেদের একটি রাজনৈতিক বিশৃংখলার মধ্যে দেখতে পায়। যার ফলে ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে আমাকে এবং আমার মাকে যখন আল মুর্তাজায় ডিটেনশন দেয়া হয় তখন পিএনএর কিছু নেতা জিয়ার বিরুদ্ধে পিপিপিকে সমর্থন দিতে এগিয়ে আসে। তাদের এই এগিয়ে আসাটাকে আমরা রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে গ্রহণ করি। তারা জিয়াকে পরিস্কার জানিয়ে দেন যদি আপনি আমাদের মন্ত্রী হিসাবে না নেন তাহলে আমরা পিপিতে যোগদান করব। ১৯৮০ সালের হেমন্তে আমাদের এই পুরোনো প্রতিপক্ষ থেকে আবার প্রস্তাব এল। এবার আমরা তাদেরকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করলাম।

একটি রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি করার জন্য জিয়া এবং তার অবশিষ্ট সমর্থকরা মরিয়া হয়ে উঠল, তারা ঘুষ প্রদানের পথ অবলম্বন করল। প্রতিদিন জিয়ার প্রলোভনের নতুন খবর আসতে থাকল। একজন দরিদ্র পিপিপি নেতার ছেলে ধোকি। সে একটি বাইসাইকেলের দোকানে কাজ করতো। প্রতিদিন দু'টাকা ছিল আয়। তাকে পিপিপির সমর্থন ছেড়ে মুসলিম লীগে যাওয়ার জন্য এক হাজার টাকা অফার করা হল। পি এন এর কিছু বিচ্ছিন্ন কর্মীয় জিয়াকে সমর্থন দিতে থাকল। সিন্ধুর সাবেক চিপ মিনিষ্টার এবং পিপিপির সিন্ধু প্রদেশের সভাপতি গুলাম মুসতাফা জাতোইর মত একজন ক্ষমতাম্পন্ন নেতাকেও জিয়া সরাসরি প্রস্তাব দিল। তাকে প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রস্তাব দেয়া হয় এবং তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন বলেও শোনা যায়। জিয়ার রাজনীতি গোছানোর প্রচেষ্টা ছিল খুবই বিপদজনক। জনগণকে সে ধোকা দিতে চেয়েছিল যে শীঘ্রই একটি সিভিল সরকারের সমাধানে পৌছাতে যাচ্ছে।

সেপ্টেম্বর মাসে জাতোইকে প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রস্তাব দেয়ার পর মা আমাকে বললেন, জিয়ার কোনো কুটকৌশল প্রয়োগের ইচ্ছা আগেই আমাদেরকে তার উপর সেটা করতে হবে। তিনি বললেন, আমরা বোধ হয় পিএনএর জায়গাটি পুরণ করতে যাচ্ছি। জিয়ার বিরুদ্ধে আলাদা হওয়ার কোনো যুক্তি নেই।

প্রথমে আমি বিস্মিত হলাম। আমি প্রতিবাদ করে বললাম, এতে পার্টি নেতাদের মধ্যে ঝড় বয়ে যাবে। আমরা কী করে ভুলবো যে এই পিএনএ প্রথম পিপিপির বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগ তুলেছিল এবং পিএনএ-ই সেনাবাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণকে প্রশস্ত করেছিল? বাবার মৃত্যুর সময় তারাই ছিল জিয়ার কেবিনেটের মন্ত্রী।

মা বললেন, এর বাইরে আমাদের কী করার আছে? এখন তারা জাতোইকে হাত করেছে। আগামীকাল আর কাউকে হাত করবে। আদর্শের বিষয়টি যখন অনুপস্থিত তখন রাজনীতির নোংরা বাস্তবতা নিয়েই তোমকে চলতে হবে।

তিনি গোপন মিটিং ডাকলেন পিপিপির ৩০ জনের মত নির্বাহী সদস্যকে নিয়ে। আমরা

www.pathagar.com

জানতাম যে বড় ধরণের একটি ঝুঁকি নিচ্ছি। রাজনৈতিক সমাবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু আমরা যদি চুপ করে বসে থাকি তাহলে সেটা হবে এই শাসনকে মেনে নেয়া। অন্যান্য মিটিং এর মতই এই মিটিংও ডাকা হল ৭০ ক্লিফটনে। তারা দূর দূরান্তের এমনকি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বালুচিস্তান থেকে এসে হাজির হলেন। এবং সত্যিই বিতর্ক হল খুবই তীব্র।

সিন্ধু থেকে আসা একজন নেতা উচ্চস্বরে বললেন, পিএনএর লোকেরা হত্যাকারী! আজ তাদের সঙ্গে যদি আমরা আতাত করি তাহলে কাল সরাসরি জিয়ার সঙ্গে আতাত করাতে বাধা থাকবে কোথায়?

বর্ষীয়ান নেতা শেখ রশিদ বললেন, জাপান যখন চীন আক্রমন করল তখন মাও সেতুঙ আতাত করেছিলেন চিয়াং ইসেকের সঙ্গে। জাতীয় স্বার্থে তারা যদি ঐক্য গড়ে তুলতে পারেন তাহলে আমি মনে করি আমাদেরও পিএনএর সঙ্গে এ মুহূর্তে ঐক্য করা উচিৎ।

যুক্তি পাল্টা যুক্তি তীব্র হয়ে উঠল। আমি বললাম,আমি স্বীকার করি যে তারা সুযোগ সন্ধানী এবং স্বার্থান্বেষী। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা অন্য কী করতে পারি? এ ছাড়া আমরা বসে থাকতে পারি সুযোগ এসে আমদের হাতে পড়বে সেই অপেক্ষায়, অথবা বসে বসে তীক্ততা হজম করতে পারি। আমি মনে করি এখন নিজেদের দলের স্বাতন্ত্র বজায় রেখে তাদের সঙ্গে জোট করাটাই শ্রেয়।

সাত ঘন্টা তর্ক তির্কের পর আমাদের যুক্তিই জয়ী হল। আমরা সবাই মনের বিরুদ্ধে রাজি হলাম পিএনএ'র প্রস্তাবে। আমরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের খসরা তৈরি করলাম।

আমার মা বললেন, আমরা দুজনই একই সঙ্গে জেলে থাকলে সেটা খুবই খারাপ হবে। সুতরাং তুমি অল্প স্বল্প কাজ করো। এভাবে আমাদের যে কারো একজনের জেলের বাইরে থাকা দরকার পার্টিকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। অনিচ্ছা সত্বেও আমি মায়ের কথায় রাজি হলাম। কিন্তু একইসঙ্গে নিজেকে অনেকটা মুক্ত মনে হল। যদিও রাজনীতির স্বার্থে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার একটি ভাল কথা, কিন্তু তখনও মনে মনে আমি পিতার পুরোনো শত্রুদের সঙ্গে ঐক্য মেনে নিতে পারিনি। সাবেক এই বিরোধীদলের নেতারা দেখল পিপিপি'র সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলা খুবই মুশকিলের কাজ। একে অপরের সঙ্গেই মিলতে পারছে না। একে অপরের প্রতি সন্দেহপ্রবণ। এই দুই দলের নেতারা পার্লামেন্ট প্রিলিমিনিরি মিটিংয়ের সময় একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতো না। তারা কথা বলতেন লোক মারফত।

এই দুই দলের নেতাদের মধ্যে আরো জটিলতা দেখা দিল জোট তৈরির পর। বিশেষ করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের চার্টার নিয়ে, পিপিপি নির্বাচনে কারচুপি করেছিল কিনা, আমার পিতার মৃত্যুকে হত্যা না ফাঁসি কী বলা উচিৎ তাই নিয়ে। অক্টোবর ১৯৮০ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ এই চারমাস সময় লাগল দশটি দলের মধ্যে মতবিরোধের কারণে স্থবির হয়ে পড়া খসরা চুক্তি ঠিক করতে। বিষয়টি মোটেই সহজ ছিল না।

মোহাম্মদ খান জুনেজোর মুসলিম লীগ পার্টি শেষ সময়ে ঐক্য থেকে সড়ে দাঁড়ালো। অন্যান্য নেতারা এবং পার্টি ডেপুটিরা ১৯৮১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ক্লিফটনে সামনাসামনি মিলিত হলেন।

আমি দেখলাম আমার পিতার শত্রুরা তারই বাড়িতে বসে তার বিধবা হওয়া স্ত্রী, পিপিপি চেয়ারপারসন এবং তার কন্যার সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা করছে। কী শক্তিশালী

পেশা এই রাজনীতি! আমার মায়ের ঠিক ডানপাশে বসেছেন পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ফেজ টুপি পরিহিত নেতা নাসরুল্লাহ খান। আমার সম্মুখে বসেছেন মডারেট দল তারিখ ই ইস্তিকলাল দলের নেতা আসগর খানের প্রতিনিধি কাসুরি। কক্ষের এক পাশে বসেছেন শশ্রুমন্ডিত জামায়াত উল উলেমা ই ইসলাম দলের নেতারা। তাদের উল্টোদিকে বসেছেন ছোট বাম দল মজদুর পার্টির ফতেহইয়াব। তিনি পড়েছেন ঢিলে সাদা জামা, চোস্ত পায়জামা এবং চুড়িদার কুর্তা। সব মিলিয়ে প্রায় ২০ জন। এদের অধিকাংশই সাবেক পিএনএ কোয়ালিশনের। আমার মাথায় সবসময় কাজ করছিল আমরা সবাই একত্র হয়েছি জিয়ার গদি উৎখাতের জন্য। আমাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা দৃষ্টি সত্ত্বেও আমরা একটি জোট তৈরি করছি জিয়াকে নির্বাচন ঘোষনায় বাধ্য করতে। কিন্তু কাজটি ছিল কঠিন।

সিগারেটের ধোয়া এবং বাতির কারনে ড্রইংরুম উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। আলোচনা এত দীর্ঘ হল যে পরের দিন সকালে আবার আলোচনার জন্য বলা হল। এক পর্যায়ে একজন সাবেক পিএনএ নেতা ১৯৭৭ সালে পিপিপির বিরুদ্ধে তার দলের বিক্ষোভের বিষয়টি বিশ্লেষন করতে চেষ্টা করলেন। আমি বিস্মিত হলাম আমাদের ঘরে বসে পিপিপির সমালোচনার চেষ্টায়।

আমি ঠান্ডা গলায় বললাম, আমরা এখানে বসেছি গণতন্ত্রের জন্য একটি জোট গঠন করতে। আপনারা আমাদের নিয়ে কী চিন্তা করেন এবং আমরা আপনাদের নিয়ে কী চিন্তা করি তা নিয়ে আলোচনা করতে নয়।

নাসরুল্লাহ খান আমাদের দুজনকেই শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। বললেন, হ্যা, আমাদেরকে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে, পেছনের দিকে নয়।

তখনো আমার এই দৃশ্য দেখতে কষ্ট হচ্ছে যে রাজনৈতিক নেতারা আমার বাবার সোফায় বসে কফি খাচ্ছেন, বন্ধুদের কাছে উত্তেজিত কণ্ঠে টেলিফোন করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছেন। আমি কী সত্যিই ৭০ ক্লিফটনে বসে আছি! মি. ভুট্টোর বাড়িতে!

ইয়াসমিন, আমিনা এবং সামিয়া আমাকে শান্ত করল। সমিয়া বললো, এরা এসেছে তোমার কাছে। পিপিপির এই শক্তি বজায় রাখতে হবে।

আমিনা বলল, তুমি এই ভোট চেয়েছিলে। রাজনীতির খাতিরে তোমাকে এসব মেনে নিতে হবে। আমি আমার আপত্তিকে হজম করলাম। নেতারা সব একে একে চার্টারে স্বাক্ষর করলেন। এভাবেই ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১ সাল, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলন (এম আর ডি)জন্ম নিল।

এই চার্টারে স্বাক্ষরের খবর পাকিস্তানের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই বিবিসিতে এই স্বাক্ষরের কথা শুনেছেন। এতে জনগণের মানসিক শক্তি বেড়ে গেল। তারা ধারণা করে নিল এটা পাকিস্তানের মাশাল ল' এবং অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সংকেত। প্রথম সীমান্ত প্রদেশের ছাত্ররা রাস্তায় নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে জিয়া সরকার আমাকে এবং মাকে বাইরে যাবার উপর নিষেধ ঠুকে দেয়। যাতে আমরা আহতদের দেখতে যেতে না পারি।

অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে পাঞ্জাব এবং সিন্ধুতেও। এখানে অধ্যাপক আইনজীবী এবং ডাক্তাররাও যোগ দেন আন্দোলনে। ছাত্রদের অধিক তীব্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে মুলতান, বাহয়ালপুর, শেইকিপুরা, এবং কোয়েটায়। ট্যাক্সিচালক, দোকানদার, ছোট ব্যবসায়ীরা ফিসফিস করে বলতে থাকে, আল্লাহর কাছে এম আর ডি'র (মুভমেন্ট টু রিস্টোর

www.pathagar.com

ডেমোক্রেসি) জন্য অশেষ শুকরিয়া। জিয়ার দিন শেষ হয়ে গেছে। করাচির এক্সপ্রেস মার্কেট থেকে ফিরে এসে আমাদের বাবুর্চি জানালো, কষাইরাও এম আর ডির ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

জিয়া বুঝতে পারল সে চাপে পড়েছে। গোটা পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিল। পাঁজনের বেশি একত্র হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা দিল। কিন্তু প্রতিবাদ বিক্ষোভ চলতে থাকল। টাইম্‌স ম্যাগাজিন মন্তব্য করল, বিরোধী দলগুলোর প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়েছেন জেনারেল জিয়া।

লাহোরে এম আর ডি'র গোপন বৈঠক ডাকা হল ২৭ ফেব্রুয়ারি। জিয়া সঙ্গে সঙ্গে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি এম আর ডি'র অনেক নেতাকে গ্রেফতার করা হল। অন্যান্য পিপিপি এবং এম আর ডি' নেতার উপর পাঞ্জাবে চলাচলে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হল। আদেশে বলা হলো, আপনার পাঞ্জাবে প্রবেশ জননিরাপত্তার জন্য হুমকী সৃষ্টি করতে পারে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে এবং আইনশৃংখলার অবনতি হতে পারে। পাঞ্জাব সরকারের পক্ষে এই আদেশ জারি করা হল।

মা আমাকে রাজনীতি সীমিত করার যে আদেশ দিয়েছিলেন তার উপর জোর দিলেন। তিনি খুব শক্ত করে বললেন, 'এই মুহূর্তে রাজনৈতিক কোনো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বে না। আমি গ্রেফতার হলে তোমাকে হাল ধরতে হবে।'

পরিস্থিতি বিস্ফোরণোম্মুখ হয়ে উঠল। জিয়ার গদি নড়ে উঠল। বাধার মুখে আমি উত্তেজনা বোধ করতে থাকলাম। আমার মায়ের দায়িত্ব পড়ল লাহোরে গোপন বৈঠকে অংশ গ্রহণ করার। সমস্ত রাস্তা পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে এবং প্রতিটি গাড়ি তল্লাশি করছে। তারপরও এম আর ডি'র নেতারা বিভিন্ন পথে বৈঠকে সমবেত হলেন। আমার মা সেখানে গেলেন দাদী সেজে বোরখা চড়িয়ে। আমাদেরই এক কর্মচারীর ১৩ বছরের ছেলেকে নাতী বানানো হয়েছিল।

পুলিশ সেই বৈঠকে হানা দিয়ে আমার মা সহ অন্যান্য নেতাদের ধরে ফেলেছিল। মাকে করাচিতে ফেরত পাঠানো হয়। কিন্তু পুলিশ এম আর ডি'র আল্টিমেটামের আগে ধরতে পারেনি। এম আর ডি ততোক্ষনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তিন মাসের মধ্যে মার্শাল ল' তুলে নিতে হবে এবং নির্বাচনের ঘোষণা দিতে হবে। লাহোরে ওইদিন এম আর ডি ঘোষণা করল, আমরা অচিরে জিয়ার পদত্যাগ দাবী করছি। তা না হলে পাকিস্তানের জনগণের অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছায় মার্শাল ল' সরকারকে উৎখাত করা হবে।

সর্বাত্মক আন্দোলনের জন্য এম আর ডি ২৩ মার্চ দিন ধার্য করল। ২৩ মার্চ পাকিস্তান ব্যাপি হরতালের এবং বিক্ষোভের ডাক দেয়া হল। কিছু পিপিপি কাউন্সিলর ১৯৭৯'র স্থানীয় নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন-তারাও পদত্যাগে রাজি হলেন এবং জিয়ার পদত্যাগ দাবী করলেন। পাকিস্তানে বেসামরিক শাসনের এবং জিয়ার পতনের দিন গোনা শুরু হয়ে গেল। ঘড়ির কাটা শেষ পর্যন্ত জিয়ার উপর গিয়ে বেজে উঠল।

২ মার্চ, ১৯৮১

৭০ ক্লিফটনের বাসায় বসেছিলাম একদল পার্টি কর্মী নিয়ে। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোন করেছে রয়টারের করাচি প্রতিনিধি ইব্রাহিম খান।

www.pathagar.com

ওই খবরটির ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

কোন খবর?

একটি পাকিস্তান ইন্টারন্যাশণাল এয়ারলাইনস প্লেন হাইজ্যাক হয়েছে।

এর আগে কখনো পিআইএ'র কোনো বিমান হাইজ্যাক হয়নি। আমি চমকে উঠে জানতে চাইলাম, কারা হাইজ্যাক করেছে?

খান বললেন, এখন পর্যন্ত কেউ তা জানে না। কারা হাইজ্যাকার, তারা প্লেনটিকে কোথায় নিয়ে গেছে, তাদের দাবী কী এসব কেউ কেউ জানে না। আমি চেষ্টা করছি, কিছু জানতে পারলে আপনাকে জানাবো। কিন্তু আপাতত আপনার কোনো প্রতিক্রিয়া জানতে পারি?

আমার ভেতর থেকেই উত্তর বের হয়ে এল। বললাম, সব ধরণের হাইজ্যাকই খারাপ সেটা হোক একটি প্লেন অথবা একটি জাতি। আমি ফোন রাখতেই পিপিপির সদস্যরা আমার দিকে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকল।

আমি বললাম, আমাদের একটি প্লেন হাইজ্যাক হয়েছে। আপাতত এটুকুই জানি।

www.pathagar.com

৮

সুক্কুর কারাগারে নিঃসঙ্গ বন্দি জীবন

সুক্কুর সেন্ট্রাল জেল, ১৩ মার্চ, ১৯৮১

আমি এখানে কেন? বুঝতে পারি না। জেল, এখন? সিন্ধু মরুভুমির প্রত্যন্ত অঞ্চলের কারাগার। ভীষন ঠান্ডা। জেল খানার ঘড়িতে ঘন্টা বাজতে থাকে ১টা..২টা...। আমি ঘুমাতে পারি না। হিমেল মরুভুমির বাতাস এসে আছড়ে পড়ে লোহার ফাঁক ফাঁক শিক দিয়ে। চারদিকে লোহার শিকের খোলা দেয়াল। সেলটি একটি বড় খাঁচার মত। ভেতরে পুরো জায়গা ফাকা, শুধু মাঝখানে একটি দড়ির খাট। আমি গুটিশুটি মেরে সেই খাটের উপর শুয়ে থাকি। ঠান্ডায় দু'পাটি দাঁত ঠকঠক করে বাড়ি খায়। আমার গায়ে কোনো সোয়েটার নেই, নেই গায়ে দেয়ার কোনো কম্বল। কিছুই নেই। আমার পরণে শুধু সেলোয়ার কামিজ। পাঁচদিন আগে করাচিতে গ্রেফতার হওয়ার সময় পরণে যা ছিল। প্রহরীদের একজনের আমাকে দেখে মায়া হল। সে এতটা অতি সন্তর্পণে একজোড়া মোজা এনে দিল। কিন্তু ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে এতটাই সে ভীত হয়ে পড়েছিল যে, সে পরেরদিন সকালেই সে পরেরদিন মোজা জোড়া ফেরত চেয়েছিল। আমার হাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে। আমি যদি শুধু দেখতে পারতাম একটু চারদিকে হাঁটতে পারতাম! কিন্তু ৭ টার সময়ই আমার থাকবার জায়গাটির বৈদ্যুতিক বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়। চারপাশে তখন থাকে শীতল গাঢ় অন্ধকার।

মার্চ মাসের ৭ তারিখে পুলিশ আমাদের ক্লিফটনের বাসায় আসে আমাকে খুঁজতে। আমি তখন বাসায় ছিলাম না। আমি সেই রাতে সামিয়ার সঙ্গে। ৭০ ক্লিফটনে এমআরডি'র নেতাদের সঙ্গে মা যে বৈঠক করেছেন তা থেকে দূরে থাকার জন্য। পুলিশ আমাকে ধরতে মরিয়া হয়ে উঠল। আমার খালাতো বোন ফাকরির বসায় হানা দিল। ৭০ ক্লিফটনে হানা দিল যেখান থেকে আমার মাকে গ্রেফতার করা হয়। সেখানকার কাজ শেষ করে আমাকে খুঁজতে বের হল। আমাকে খুঁজতে গিয়ে ম্যাচবাক্স খালি করে ফেলছে দেখে আমার বোন সানি বলল, আপনারা কী মনে করেন, সেকি একটা পোকা যে এর মধ্যে থাকবে?

www.pathagar.com

গোটা করাচি তল্লাশি করে পুলিশ আমার স্কুল বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে হানা দিতে থাকল। এমনকি সেই পুস্থাকিসদের জরুষ্ট্রিয়ান পরিবারে। তাদের ত্রিশ বছর বয়সের কন্যা পরীকে পুলিশ ধরে থানায় নিয়ে যায়। সেখানে তারা তাকে ৭ ঘন্টা জেরা করে। পরী এবং তার পরিবার ছিল ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্য। জিয়ার ইসলামিকরণের নীতি ছিল মুসলমান নয় এমন প্রত্যেকেই শাস্তির যোগ্য। পরীর আটকাদেশের বিরুদ্ধে তার পরিবার প্রতিবাদ করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলে পুলিশ হুশিয়ার করে বলে, আমরা জানি এদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কী করতে হয়! এই দেশে রাজনীতিতে তোমাদের কোনো জায়গা নেই। তোমরা রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পার না। আমার দুই বন্ধু পুচি এবং হুমোর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে অবশেষে পরের দিন আমাকে জাতীয় সংসদের সাবেক ডেপুটি স্পিকার এবং করাচিতে আমার মায়ের চিকিৎসক ড. আশরাফ আব্বাসীর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। কিছু একটা করার জন্য আমি ইসলামাবাদের বন্ধুদের কাছে ফোন করার প্রস্তুতি নিচ্ছি, ঠিক তখনই ড. আব্বাসীর ছেলে সফদার এসে বললো, পুলিশ ঘিরে ফেলেছে এবং বাড়ি তল্লাশি করতে চাচ্ছে। আমরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। যেহেতু আমি তাদের হানা দেয়া সম্পর্কে কিছুই জানি না এবং নিজে এমআরডির রাজনীতি কঠিনভাবে এড়িয়ে চলছি, সেহেতু আমার ধারণা হল তারা ড. আব্বাসী অথবা তার ছেলে মুনাওয়ারকে খুঁজতে এসেছে। আমি সফদরকে বললাম, বাড়ি তল্লাশি করার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা কাকে চায় জিজ্ঞেস কর। সে বললো, তারা তোমাকে খুঁজতে এসেছে।

এবারের গ্রেফতার ভয়ানক এবং অন্যরকম মনে হল। সেটা আমি বুঝতে পারলাম যখন আমাকে নিয়ে একদল পুলিশের সঙ্গে একটা জিপের পেছনে বসানো হল। শেষবার ওরা যখন আমাকে গ্রেফতার করেছিল তখন একটি প্রাইভেট কার ব্যবহার করেছিল। আমি পেছনে বসতে অস্বীকৃতি জানালাম। শেষ পর্যন্ত ওরা আমাকে জিপের সামনে বসতে দিল। ফাকা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় আমার পেছনে পেছনে যে মিলিটারি কনভয় অনুসরণ করল তা অনেক বড়। গন্তব্যটিও ছিল অশুভ, একটি থানায়। এর আগে কখনো আমাকে থানায় নেয়া হয়নি। কী হতে যাচ্ছে? পাঁচ ঘন্টা আমি একটি খালি কক্ষে বসে রইলাম কিন্তু কেউ আমাকে জানালো না এসব কী হচ্ছে। দেখলাম পুলশ প্রহরীরা একের পর এক সিগারেট ফুকে যাচ্ছে। দেয়ালের গায়ে পানের পিক ফেলছে। আগে থেকেই দেয়াল পানের রসে কালচে হয়ে আছে। তাদের চোখ মুখ আতঙ্কে জমে গেছে। অল্পসময় পর বুঝতে পারলাম, জিয়ার নির্যাতন, নীপিড়নে তার পুর্বের অবস্থানকে ছাড়িয়ে গেছে। গোটা পাকিস্তান থেকে শতশত মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ যাবতকালে এমন বড় ধরণের ধরপাকড় আর হয়নি। এই অভিযানের বিষয়টি কর্তৃপক্ষ জানতো, কিন্তু আমার জানা ছিল না। অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল সবসময় খুব ধীর গতিতে আগায়। তারাই হিসাব দিল, শুধুমাত্র ১৯৮১ সালের মার্চ মাসেই ছয় হাজারের বেশি লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে। মার্চ মাসের দুই তারিখে পিআইএর প্লেন হাইজ্যাকের পর জিয়া এই ছিনতাইকে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে কাজে লাগালো। সে এই হাইজ্যাককে ছুতো হিসাবে গ্রহণ করল এমআরডির আন্দোলনকে দমন করতে। এমআরডি বা পিপিপির সঙ্গে যার সামান্যতম যোগাযোগ রয়েছে তাকেই গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠাতে থাকল।

www.pathagar.com

নিয়াজিরা গ্রেফতার হলেন ইসলামাবাদে। পুলিশ আমিনাকেও ধরতে এল। তারা যখন দেখল আমিনা ৯ মাসের অন্তসত্ত্বা তখন তাকে রেখে তার স্বামী সালিমকে ধরে নিয়ে গেল। আমিনা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। আমার পিতার আইনজীবি ছিলেন এবং পাকিস্তানের সাবেক অ্যাটর্নী জেনারেল ইয়াহিয়া বখতিয়ারকে গ্রেফতার করা হল বালুচিস্তান থেকে। জাতীয় সংসদের সাবেকদস্য ফয়সাল হায়াতকে গ্রেফতার করা হল লাহোর থেকে। ফয়সাল ছিলেন লারকানার ডেপুটি কমিশনার খালিদ আহমেদের ভাগ্নে। এই খালিদ আহমেদকে নির্বাসনে যেতে বাধ্য করা হয়। এছাড়া পিপিপির অনেক নারী কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। রাওয়ালপিন্ডিতে তৃতীয়বারের মত গ্রেফতার করা হয় ফ্লাশম্যান হোটেলের এগ্রেসিস্টেন্ট ম্যানেজার কাজী সুলতান মাহমুদকে। এমনিভাবে করাচিতে মুশাওয়াত পত্রিকার সম্পাদক ইশরাদ রাওকে এবং সিন্ধু প্রদেশের নেতৃস্থানীয় পিপিপি নেতা পারভেজ আলী শাহকেও গ্রেফতার করা হয়। গেফতারের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হতে থাকে। এবং আমাদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয় তা বর্বরতাকেও হার মানায়।

পুলিশ স্টেশনে আমি কয়েকজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মা কোথায়?

তারা বলল, করাচি কেন্দ্রীয় কারাগারে।

আমি আবার জানতে চাইলাম, তাকে কী রেষ্ট হাউসে রাখা হয়েছে? রেস্ট হাউসে জায়গা বেশি এবং অপেক্ষাকৃত আরাম দায়ক। সেখানে সাধারণত জেলের কর্মকর্তারা এসে থাকেন। প্রথমদিকে আমার বাবাকে এই রেস্ট হাউসে রাখা হয়েছিল।

ওরা বলল, তাকে একটি সেলে রাখা হয়েছে।

আমি আৎকে উঠলাম। আমার মা, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বিধবা স্ত্রীকে রাখা হয়েছে সি শ্রেনীর একটি সেলে, যেখানে কোনো আলো নেই, খাবার পানি নেই, বিছানার ব্যবস্থা নেই?

পুলিশের কাছে আমি জানতে চাইলাম, আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

তারা বলল, আপনার মায়ের কাছে।

তারা মিথ্যা কথা বলছিল।

করাচি কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রথম পাঁচদিন কেটে গেল কারো সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছাড়াই। এরপর সেখান থেকে আসবাবপত্রগুলো খুলে নেয়া হল। কর্তৃপক্ষ দাবী করল মা কোথায় আছেন তারা জানেন না। এমনকি তিনি করাচিতে আটক হয়েছেন সেকথাও অস্বীকার করলেন। আমাকে আইনজীবির সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দেয়া হল না। আমার সঙ্গে কোনো জামাকাপড় ছিল না। আমি যে পোষাকে গ্রেফতার হয়েছিলাম সেই পোষাকেই আছি। আমার কাছে কোনো চুলের ব্রাশ, চিরুনি নেই। টুথ ব্রাশ বা টুথ পেষ্ট নেই। কিছুই আমাকে দেয়া হয়নি। অধিকন্তু আমাকে ওষুধ খেতে হয় কারণ আমি স্ত্রী রোগে আক্রান্ত ছিলাম। সে সময় অসুখ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। আমার আরো ওষুধ প্রয়োজন। কিন্তু সেখানে কোনো ডাক্তার এমনকি কোনো মেয়েলোকও ছিল না যাকে আমি সমস্যার কথা বলতে পারি।

১২ তারিখ রাতে সুপারেনটেন্ডেন্ট এসে বললেন, আপনাকে আড়াইটার সময় নিয়ে যাওয়া হবে। প্রস্তুত থাকুন। তাকে বেশ আতঙ্কগ্রস্থ দেখা যাচ্ছিল। আমি জানতে চাইলাম, আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে? তিনি কোনো উত্তর দিলেন না।

আমি আবার জানতে চাইলাম, আমার মা কোথায়?

www.pathagar.com

এবারো তিনি কোনো উত্তর দিলেন না।

এই প্রথমবারের মত আমি ভয় পেলাম। আমি শুনেছি অনেকে বলে জেল কর্তৃপক্ষ প্রায়শই বিতর্কিত বন্দীদের রাতে মরুভূমিতে নিয়ে যায় এবং সোজা মেরে ফেলে। তাদের আত্মীয় স্বজন জানার আগেই তাদের কবর দেয়া হয় এবং বলা হয় পালানোর চেষ্টা করার সময় মারা গেছে অথবা বলা হয় হঠাৎ রহস্যজনকভাবে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে। আমাকে রেষ্ট হাউসে নিয়ে আসতেই আমি সিন্ধুর হাইকোর্টে গ্রেফতারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে একটি আবেদন করি। উল্লেখ করি হয় আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হোক অথবা একজন আইনজীবি পাঠানো হোক। আমি ভীষন উদগ্রীব হয়ে থাকি চিঠিটা হাইকোর্টে পৌছানোর জন্য। আমি কোনো কর্মকর্তার সাক্ষাত পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। পরদিন সকালে একজন জেলার এলে আমি তাকে বলি, আমার এই চিঠিটা দয়া করে হাইকোর্টে পৌছে দিন। তিনি দ্রুত চিঠিটা নিয়ে পকেটে পুরে ফেললেন। আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ। তিনি যদি চিঠিটা কোর্টে প্রেরণ করেন তাহলে অন্তত একটা নমুনা থাকে যে আমি কোথায় আছি এবং আমাকে কোথা থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ঠিক আড়াইটার সময় গাড়ি ভরে মহিলা পুলিশ আসে আমাকে নিতে। তারা ট্রাক ভরে পুলিশ এবং সেনা সদস্য নিয়ে এসেছে সাথে। কালো কাচের একটি প্রাইভেট কারে করে ফাকা রাস্তা দিয়ে দ্রত গাড়ি চালিয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। মনে হয় যেন আমাদেরকে কেউ অ্যামবুশ করতে পারে। হঠাৎ একটি জায়গায় গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। সেখানে নীচুস্বরে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে কথোপকথন হতে থাকে।

আমি পরিস্কার নির্দেশ শুনতে পেলাম, তাকে টারমাকে নিয়ে যাও। আমি স্বস্তি বোধ কললাম। অন্তত পক্ষে আমি বিমানবন্দরে আছি। কিন্তু তারা আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছিল? প্লেনের সময়সূচি আমার জানা ছিল। এই সময় পাকিস্তানের কোনো জায়গার ফ্লাইট নেই। নিজেকে আমি শান্তনা দিলাম, হয়তো লারকানায় নিয়ে যাচ্ছে। হয়তো গোপনীয়তা রক্ষার্থে তারা একটি বিশেষ প্লেনের ব্যবস্থা করেছে। এবার অপেক্ষার পালা। আমি বসে থাকলাম তো থাকলামই। ভোর না হওয়া পর্যন্ত চারঘন্টা আমাকে বসে থাকতে হল।

৬.৩০ মিনিটে একটি সাধারণ যাত্রীবাহী প্লেন এসে টারমাকে থামল। আমাকে সেই প্লেনে ঢোকানো হল। একজন মহিলা পুলিশ আমার পাশের সিটে বসল দু'জন বসল আমার পেছনে। আর প্লেনের দু'পাশের সিটগুলোর মাঝে যে চলার পথ সেখানে থাকল দুজন। আমি এয়ার হোস্টেসের কাছে জানতে চাইলাম, আমরা কোথায় যাচ্ছি। বাধ সাধল পুলশ, আপনি বন্দী। আপনার কারো সঙ্গে কথা বলা বারণ।

কী ঘটে চলেছে? করাচি জেলে পাঁচদিন কেটে গেছে আমি কোনো সংবাদপত্র দেখতে পারিনি। এবং আমার কোনো ধারণাই নেই কেন আমার মা এবং আমার প্রতি এমন বিরুপ আচরণ করা হচ্ছে। আমি নিশ্চিত যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে জিয়ার প্রতি আমাদের চ্যালেঞ্জের বিষয়টি এর সঙ্গে জড়িত। যে কারণে শেষবার গ্রেফতারের বন্যা বয়ে গেছে। আমি গ্রেফতার হওয়ার আগের এক সপ্তাহ কিছু খবর সংবাদ পত্রে এসেছে। কিন্তু আমাদের প্রতি বিশেষভাবে ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ কি যে এমন কঠিন আচরণ করছে? প্লেনের যাত্রীদের চোখমুখে, এমনকি পুলিশের চোখ মুখে এত আতঙ্কের ছাপ কেন?

www.pathagar.com

এয়ার হোস্টেস আমাকে একটি সংবাদপত্র দিয়ে গেল। পত্রিকাটিতে এমআরডির কোনো সংবাদ নেই। আছে প্লেন হাইজ্যাকের খবর দিয়ে ভরা। হাইজ্যাকাররা ৫৫ জন রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চেয়েছে। তারা প্লেনটিকে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে যেতে বাধ্য করেছে। সেখানে তারা একজন যাত্রীকে হত্যা করেছে। যাকে হত্যা করা হয়েছে তিনি একজন সেনা অফিসার। মেজর তারিক রহিম। এই তারিক রহিম একসময় আমার বাবার দেয়া ক্যাম্পে ছিলেন। এরপর পাইলটকে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে যেতে বাধ্য করা হয়।

আমি এই খবর পড়ার সময় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। খবরের অর্ধেক বিশ্বাস না করলেও বাকী অর্ধেকতো সত্যি! হাইজ্যাকাররা নিজেদেরকে বিদ্রোহী গ্রুপ আল জুলফিকারের সদস্য বলে দাবী করেছে। আল জুলফিকার মুলতঃ কাবুল ভিত্তিক সংগঠন যেখানে আমার দুই ভাই বাস করছে। প্রতিবেদনে দাবী করা হয়েছে এই গ্রুপের নেতা আমার ভাই মীর।

একত্রিশ, বত্রিশ, তেত্রিশ। ব্রাশ দিয়ে চুলে সাতবার আচড় দিতে হবে। দাত ব্রাশ করার সময় একশত গুনতে হবে। আটানব্বই, সাতানব্বই, ছিয়ানব্বই। তারপর পনের মিনিট উঠোন দিয়ে হাঁটতে হবে। পুরো ডিসিপ্লিন জীবন। অবশ্যই আমি পথভ্রস্ট হতে পারি না। জেলের মধ্যে চারদিকে নোংরা পরিবেশ। আমি যে কক্ষটিতে আবদ্ধ তার সামনের সেলটিও তাই। জেলার আমাকে বলেছে আমার জন্য সব খালি করে ফেলা হয়েছে। তারা আমাকে আসলে একটি চরম একাকিত্বের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

অধিকন্তু কারারক্ষীরা সকালে এসে আমার খাঁচাটি খুলে এককাপ নিন্মমানের চা এবং রুটি পরিবেশন করে। পাতলা ডাল, সেদ্ধ করা কুমড়া খেতে দেয়। সপ্তাহে দুদিন দুপুরে বা রাতে একটুখানি মাছ পরিবেশন করে আবার আমাকে তালাবদ্ধ করে দেয়া হয়। আমার সঙ্গে কারো দেখা হয় না। আমি কাউকে দেখি না। পাঁচ মাস সুক্কুর জেলে থাকার সময় খুব কমই কোনো মানুষের গলার আওয়াজ শুনেছি। শুধুমাত্র হতাশ করার খবরগুলো আমি শুনতাম। সাপ্তাহিক পরিদর্শনে এসে জেল কর্তৃপক্ষ বলতো, আজ আরো পঞ্চাশ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অথবা বলতো, আজ একজন রাজনৈতিক বন্দীকে পেটানো হয়েছে।

আফগানিস্তানে সোভিয়েত অনুপ্রবেশের মত হাইজ্যাক ও জিয়ার জন্য একটি জটিল বিসয় হয়ে দাঁড়ালো। গণআন্দোলনের মুখে পড়ে জিয়া যখন প্রায় পদত্যাগের সম্মুখীন তখন তিনি মিথ্যাচারের মাধ্যমে পিপিপিকে সন্ত্রাসের দায়ে দায়ী করলেন। পরিবেশটা এমন হয়ে উঠেছিল যে অনেকেই অনুমান করেছে যে জিয়া নিজেই হাইজ্যাকের ঘটনা সাজিয়েছেন। প্লেন হাইজ্যাকের ১৩ দিন পর এবং হাইজ্যাকারদের প্লেন উড়িয়ে দেয়ার হুমকীর সময়সীমার কয়েক মিনিট আগে জিয়া তাদের শর্তাবলী মেনে নিলেন। রজি হলেন ৫৫ জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে। এই ৫৫ জনকে মুক্তি দিতে রাজি হওয়ার ফলাফল হল হাজার হাজার বিরোধীকে বন্দী করা হল সন্ত্রাসের অভিযোগে। এমআরডির চ্যালেঞ্জ আর পত্রিকার কাছে কোনো গুরুত্ব পেল না। তারা হাইজ্যাকিং এবং আল জুলফিকারের খবর

www.pathagar.com

ছাপতে থাকল।

জেলখানায় বন্দী থেকে আমি বুঝতে পারিনি যে জিয়া পিপিপিকে আল জুলা সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে চেষ্টা করছেন। বিশেষ করে আমার মা এবং আমাকে। এরপরও আমি মুক্ত হওয়ার কথা চিন্তা করতে থাকি। খুবই স্বস্তি বোধ করলাম আমার আইনজীবি মি. লাখো যখন জেলখানায় আমার সঙ্গে দেখা করে ডিটেনশন থেকে মুক্তির আবেদনের কথা বললেন। এছাড়া একজন সৎ কারারক্ষী আমাকে সাহায্য করছিলেন সিন্ধু হাইকোর্টে আবেদন পাঠাতে। কিন্তু লাখো বা সেই কারারক্ষীর চেষ্টা বিফলে গিয়েছিল।

মার্চ মাসের ২৩ তারিখ, মি. লাখো আমার সঙ্গে দেখা করার তিন অথবা চারদিন পর সেনা শাসক 'প্রভিন্সিয়াল কনস্টিটিউশন অর্ডার' জারি করেন। বলা হয়, জেনারেল জিয়া সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা সংরক্ষন করবেন। এই নয়া আদেশের পরপরই জিয়া মার্শাল ল'য়ের বিরুদ্ধে বেসামরিক আদালতের শুনানি বাতিল করে দেন। মি. লাখোর মাধ্যমে আমি এবং অন্যান্য যারা আপিল করেছিলাম তা মুলত অকার্যকর হয়ে গেল। কোনো আইন ছাড়াই আমাদের ভাগ্যে জেল, হত্যা যে কোনো কিছু ঘটতে পারতো জিয়া তার সেনা আদালতের মাধ্যমে। এছাড়াও নতুন আদেশের বলে জিয়া যে কোনো বিচার বিভাগীয় নালিশকে খারিজ করে দিতে পারতেন। সব বিচারককে তখন মার্শাল ল' এবং জিয়াকে চিফ মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্টেটর হিসাবে মেনে নেয়ার শপথ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। যেসব বিচারক এই শপথ নিতে অস্বীকার করলেন তাদেরকে বরখাস্ত করা হল। শাসকদের নতুন আদেশের বলে পাকিস্তানের এক চতুর্থাংশ বিচারককে বরখাস্ত করা হল। এমনকি যেসব বিচারকরা রাজনৈতিক বন্দীদের সশ্রম কারাদন্ড এবং মৃত্যুদন্ডাদেশ খারিজ করলেন তাদেরকেও বরখাস্ত করা হল। গার্ডিয়ান পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে জিয়া উল্লেখ করলেন, 'যদি বিচারকদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিতে হয় আমি তাতে রাজি না। তারা আছেন আইনের ব্যাখ্যা করার জন্য।' আন্তর্জাতিক আইন অ্যাসোসিয়েশন এবং অ্যামনেষ্টি ইন্টান্যাশনাল এর তীব্র প্রতিবাদ জানালো। কিন্তু এতে কোনো ফল হল না। পাকিস্তানের সিভিল ল'কে পুরোপুরি জব্দ করা হল। এবং মি. লাখোকে আর আমার সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হয়নি।

সময় বড় নিষ্ঠুর, একঘেয়ে। আমার মস্তিস্ককে সচল রাখতে যা ঘটছিল তা একটি ছোটো নোটবইতে টুকে রাখছিলাম। সহৃদয় একজন কারারক্ষী আমাকে এই নোটবুকটি লুকিয়ে এনে দিয়েছিলেন। ওতে লিখে কিছু সময় আমি পার করতে পেরেছি। প্রতিদিন আমাকে একটি সংবাদপত্র দেয়া হতো। ডন পত্রিকার সিন্ধুর নতুন সংস্করণ। মন্থর গতিতে সেই পত্রিকা পড়ে আমি প্রায় মুখস্ত করে ফেলতাম। প্রতিটি শব্দ ধরে পড়তাম। মাছ ধরার কাহিনী, শিশুদের জন্য পাজল, মুসলিম ধর্মের নিয়মানুন, রন্ধনপ্রণালী এসব। কিন্তু এই ত্রিকা পড়া একঘন্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যেত।

সাপ্তাহিক পরিদর্শনে জেল সুপারেনটেন্ডেন্ট এলে আমি তাকে বললাম, আপনি কী আমাকে একটি টাইম অথবা নিউজ উইক দিতে পারেন?

তিনি জবাব দিলেন, ওগুলো কমিউনিস্ট প্রকাশনা। ওগুলো দেয়ার অনুমতি নেই।

www.pathagar.com

।মেমাত্র কম্যুনিস্ট । কিন্তু ওগুলো তো পুজিবাদের

আপনাদের লাইব্রেরীতে কী বই আছে?

়র এখানে কোনো লাইব্রেরী নেই ।

মাস এল । সংবাদপত্রের দিকে তাকিয়ে আমি অতঙ্কিত হতে ়নতাই সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রথম পাতায় । এবং তাতে আমার ভাই মী... সংবাদ । একটি সাক্ষাতকার পড়লাম যেখানে মীর ছিনতাই ঘটনার দায়িত্ব স্বী... ়রেছে । অন্য এক জায়গায় সে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছে । সরকার সমর্থক পত্রিকাগুলো ধীরে ধীরে এই কথাই বলতে থাকল যে আল জুলফিকার হল পিপিপির সশস্ত্র শাখা ।

কী শঠতাপূর্ণ অভিযোগ! পিপিপি যা সর্বাত্মকভাবে চেয়েছে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে । তা না হলে কেন আমরা জিয়ার সব ছলচাতুরির মধ্যেও মার্শাল ল'-এর বন্দুকের মুখে নির্বাচন দিতে চাপ প্রয়োগ করেছি? হৃদয় ও আনুগত্য কখনো শক্তি প্রয়োগ করে অর্জন করা যায় না । এমনকি জিয়াও তা অবশ্যই জানতেন । তারপর জিয়া আল জুলফিকারের নামে এমআরডি, পিপিপি তথা ভুট্টো পরিবারকে ধ্বংস করতে প্রচেষ্ট থাকলেন ।

সুক্কুর কারাগারের সেলে বসে আমার ধারণা আরো বদ্ধমুল হতে থাকল যে তারা আমাকে হত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছে । একজন কারা কর্মকর্তা আমাকে জানালেন যে গোপন মিলিটারি আদালতে আমার বিচার করা হবে এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে । অন্য এক কর্মকর্তা জানালেন যে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার একটি সেল খালি করা হচ্ছে আমাকে সেখানে বদলী করার জন্য । তিনি জানালেন আমার ভাইয়েরা আমার মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনে আমাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করবে এমন খবরের ভিত্তিতে জেলখানার নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে । আরো একটি খবর ছড়িয়ে পড়েছিল যে আমাকে বালুচিস্তানের একটি নির্যাতন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে । সেখানে আমাকে স্বীকার করতে হবে যে প্লেন ছিনতাইয়ের সঙ্গে আমার যোগসাজশ রয়েছে । একজন আমার জন্য দুঃখ করে বললো, আপনার সামনে ভয়ঙ্কর দিন অপেক্ষা করছে । আপনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন যাতে বাঁচতে পারেন । কারা মহাপরিচালক সুক্কুর জেল পরিদর্শন করতে এলেন এবং এসব গুজবের সত্যতা স্বীকার করলেন । দরদী চেহারার ধুসর চুলের লোকটি ফিসফিস করে আমাকে বললেন ওরা কিছু লোককে নির্যাতন করছে যাতে আল জুলফিকারের সঙ্গে আপনার জড়িত থাকার কথা বলে । আমার সামনে যে বিপদ সে ব্যাপারে তিনি আমাকে সতর্ক করতে চাইলেন ।

আমি বোকার মত বললাম, কিন্তু আমি নির্দোষ । ওরা আমাকে সংশ্লিষ্ট করতে পারে না ।

মহাপরিচালক মাথা দোলালেন । তার চোখের কোনে অশ্রু জমতে দেখা গেল । বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি আপনার শহর লারকানার এক বালকের পায়ের নখ টেনে তুলে ফেলা হয়েছে । আমি জানি না কতজন তা সহ্য করতে পারবে ।

আমি তার কথায় বা জেল কর্মচারীদের বিশ্বাস করতে চাইলাম না । বেঁচে থাকার প্রশ্নে

www.pathagar.com

বাস্তবতাকে কেউ মেনে নিতে চায় না। বাস্তবতা মেনে নেয়া ওই হুমকীকে মেনে নেয়ার সামিল। কিন্তু অবচেতন মনে আমার শরীর এই শঙ্কাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। আমার শরীরের সমস্যাগুলো জেঁকে বসতে থাকল। কারাগারে যেহেতু আমার কোনো প্রাইভেসি ছিল না তাই সুক্কুর জেলে আসার পরপরই সেখানকার ম্যাট্রন আমার গাইনোকলজির সমস্যাগুলো বুঝতে পারেন। তিনি একজন ডাক্তারকে ডেকে আনেন, কিন্তু তার ডায়াগনসিস সম্পর্কে আমাকে কিছুই জানানো হয়নি।

কারারক্ষীরা আমার জন্য যে খাবার নিয়ে আসে আমি তা ঠেলে সরিয়ে দিতে থাকলাম। কারণ আমি খাবার মুখে নিতে পারছি না। আমি প্রায় কিছুই খাচ্ছি না, তারপরও বুঝতে পারলাম আমি মুটিয়ে যাচ্ছি। মনে হল আমার পেট স্ফীত হয়ে যাচ্ছে। অনুভব করলাম পাঁজরগুলো আকারে বোধকরি বড় হয়ে গেছে। এরপর অনুধাবন করলাম যে আমার খাবার অরুচি দেখা দিয়েছে।

যখন দিনে দিনে ওজন হারাতে থাকলাম তখন যারা আমাকে বলেছিল যে শাসকরা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চায় তারা শঙ্কিত হয়ে পড়ল। তারা ভাবল যে আমি বোধ হয় নিজে নিজেই মরতে বসেছি। এপ্রিল মাসের ১৬ তারিখে জেলখানার ম্যাট্রন এসে বললেন, আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন। আপনাকে করাচি পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। এটা ছিল সুক্কুর কারাগারে আসার পাঁচ সপ্তাহ পরের ঘটনা।

আমি জানতে চাইলাম, কেন?

উত্তর পেলাম, আপনার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। তাই আপনাকে করাচি নেয়া হচ্ছে।

করাচি এয়ারপোর্টের পুলিশ আমাকে জানালো, আপনাকে করাচির বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। ৭০ নং ক্লিফটন! জেলখানার হলুদ পানির বদলে আমি বিশুদ্ধ, ঠাণ্ডা পানি পাব! দরির খাটের বদলে আমার নিজের বিছানা। ভাবলাম আমার নিদারুন কষ্টের এবার শেষ হল। কিন্তু বিষয়টি তা ছিল না।

দীর্ঘপথ যাত্রা করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। যে বাড়িটিতে আমাকে নেয়া হল সেটা আমি কোনোদিন দেখিনি। আমি প্রতিবাদ করে বললা, এটাতো আমার বাড়ি না।

যে পুলিশরা পাহাড়ায় নিযুক্ত ছিল তারা বলল, আগে আপনাকে আমরা ডাক্তার দেখাতে চাই। তারপর আপনার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে।

দেখলাম একজন অপরিচিত মহিলা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি বললাম, আপনারা কেন আমাকে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন না? সেখানে তো আমার নিজের ডাক্তার আছে।

পুলিশ একথার কোনো জবাব দিল না।

আর যাই হোক ডাক্তারের মুখটা মায়া মাখা। মহিলা ডাক্তার আমাকে শান্তস্বরে বললেন, সুক্কুরের ডাক্তাররা মনে করছেন আপনার ইউটারির ক্যানসার হয়েছে। আমি নিশ্চিত নই। আমরা একটি এক্সপ্লোরেটরি অপারেশন করবো।

www.pathagar.com

আমি অবিশ্বাসের সঙ্গে তাকালাম। ক্যানসার? এই আটাশ বছর বয়সে? সত্যিই আমার ক্যানসার হয়েছে, নাকি ওরা আমাকে ভূল বোঝাতে চাচ্ছে? এই ডাক্তারকেও তো অন্য ডাক্তারের মত সরকারই বেছে নিয়েছে।

আমাদের কথা বলার সময় তিনি প্যাডের উপর খচখচ করে লিখে যাচ্ছিলেন। তিনি কাগজটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, ভয়ের কিছু নেই। আমি একজন বন্ধু এবং সহানুভূতিশীল। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।

কিন্তু আমি কী বিশ্বাস করতে পারি? আমার কাছে কী কোনো কারণ আছে বিশ্বাস করার? করাচির রাস্তা দিয়ে জিপে করে যাওয়ার সময় আমি পুলিশকে বললাম, আপনারা বলেছিলেন আমাকে ৭০ ক্লিফটনে নিয়ে যাবেন। কিন্তু এটাতো ক্লিফটনে যাওয়ার রাস্তা নয়?

তারা বলল, আপনি বাড়িতে পরে যাবেন। প্রথমে আপনাকে করাচি জেলে নেয়া হচ্ছে আপনার মায়ের সঙ্গে দেখা করানোর জন্য।

আমি ভীষণ উত্তেজনা বোধ করলাম। একমাস আগে গ্রেফতার করার পর থেকে মাকে দেখি না। মার সঙ্গে আমার বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে কথা বলা খুবই দরকার। বিশেষ করে আমার শারীরিক অবস্থা নিয়ে, এমআরডির আন্দোলন নিয়ে, রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা নিয়ে যা অবশ্যই আমাদের বিরুদ্ধে তারা করবে।

রেষ্ট হাউসে নিয়ে যেতেই আমি চিৎকার করে বলতে থাকলাম, মা, মা! এই যে আমি পিঙ্কি! আমি এখানে!

কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। ওরা আরো একবার মিথ্যা কথা বলেছে। একজন কারারক্ষী আমাকে গোপনে বলল আমার মাকে অন্য একটি ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। আমি সাথে সাথে মাকে দেখার জন্য আবেদন জানালাম। কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। পরের দিন ক্লিফটনের বাড়িতে নেয়ার বদলে পুলিশ আমাকে একটি বড় সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করল। পরিত্যক্ত করিডর। এমন কোনো মানুষ নেই যারা সাধারণত আত্মীয়স্বজনের অপারেশনের সময় দরজার কাছে ভীড় করে থাকে। পরিবারের কাউকে ছাড়া আমি খুব নিঃসঙ্গ বোধ করতে থাকলাম। অপারেশনের পর জ্ঞান ফিরে এলে ভীষন স্বস্তি বোধ করলাম আমার বোন সনমকে দেখে। শাসকরা অন্তত তাকে আসার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু সে এখানে এসে ভীষনভাবে হতাশ হয়ে পড়ে।

বিশাল আকারের হাসপাতাল। আমি তখন জানি না কোথায় তাকে খুঁজব বা কার কাছে জিজ্ঞেস করব। যার কাছেই আমি তার নাম বলতে থাকলাম সেই যেন শক্ত হয়ে গেল এবং আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকাল। আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। গত কয়েকমাসে বাড়ি থেকে বের হইনি। ওই সময় পাকিস্তান ছিল এক বিপদজনক জায়গা। বিশেষ করে যার নামের সঙ্গে ভুট্টো নামটি আছে তার জন্য। কিন্তু আমার যাবার কোনো জায়গাও ছিল না। বিশাল হাসপাতালে আমি একজনের পর একজনকে বলতে থাকলাম, পি-জ, আমাকে সাহায্য করুন। তাদের কেউ বলল, এদিকে যান, কেউ বলল, ওদিকে দেখুন। হঠাৎ শুনতে পেলাম একজন মহিলা চিৎকার করছে। পাশের একজন মহিলার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, হায় আল্লাহ, আমার বোন! মহিলা সম্ভবত গোয়েন্দা বিভাগের। উত্তরে বললেন,

www.pathagar.com

এটা আপনার বোন না। আপনার বোনকে আনা হয়েছে ছোট একটি অপারেশনের জন্য। এই মহিলা চিৎকার করছে প্রসব বেদনায়।

আমি জানতাম এটা পিঙ্কি। আমার মনে হয়েছে পিঙ্কি। উচ্চস্বরে চিৎকারের শব্দ লক্ষ করে আমি দৌড়ে গেলাম। দেখলাম দ্রুত তাকে ট্রলিতে করে অপারেশন রুম থেকে হল রুমের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চারপাশে পুলিশ প্রহরা। হাতে এবং নাকের ভেতর নল ঢোকানো আছে। অর্ধচেতন অবস্থায় সে উচ্চস্বরে বলছে, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে বাবা, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। ওদের আপনারা নিষেধ করুণ।

আমি দেখলাম তার মাথায় একটি পাকা চুল। তাকে অনেকগুলো জন্মদিনে আটকে রাখা হয়েছে, জন মানবশুন্য করে রাখা হয়েছে। তার ফলে সে কী পেয়েছে? একটি সাদা চুল। সে জেগে না ওঠা পর্যন্ত আমি তার বিছানার পাশে বসে থাকলাম। আমি ভেবেছিলাম তারা আমাকে অন্তত একটি বেলা ওর কাছে থাকতে দেবে। কিন্তু তারা মাত্র আধঘন্টা সময় আমাকে ওর কাছে থাকতে দিল। বের হয়ে আসার সময় ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, আপনার বোনকে বলুন যে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সে সুযোগ আমি পাইনি। ওই দুপুরেই ওরা তাকে করাচি সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যায়।

আমার কানে উচ্চ আওয়াজ পেতে প্রবেশ করতে থাকল। চোখের সামনে থেকে অন্ধকার কেটে যেতে থাকল। করাচি সেন্ট্রাল জেলে আমি চোখ খুলে তাকালাম। দেখলাম এক মহিলা পুলিশ আমার হাতব্যাগ হাতরাচ্ছে। যে ছোট্ট নোট বুকটি তে আমি সুক্কুর জেলে বসে লিখেছি সেই নোটবুকটি সে ব্যাগ থেকে তুলে নিল। আমি দূর্বল স্বরে বললাম, আপনি কী করছেন? সে হঠাৎ চমকে আমার দিকে ফিরে তাকাল। বলল, ঠিক আছে। নোটবুকটি সে আবার জায়গামত রেখে দিল। সে চলে যেতেই আমার অবচেতন মন আমাকে বিছানা থেকে টেনে তুলল। আমি তখনও জ্বরের ঘোরের মধ্যে আছি। তারপরও নিজেকে টেনে বাথরুমে নিয়ে গেলাম এবং সেখানে নোটবুকটি পুড়িয়ে ফেললাম। একঘণ্টার মধ্যে এরজন পুরুষ এবং একজন মহিলা পুলিশ ফিরে এল। তারা সরারি প্রশ্ন করল, আপনার বোন আপনাকে কিছু একটা দিয়ে গেছে, সেটা কোথায়? নোট বুকটির কথা তারা এভাবেই ভেবেছে। আমি বললাম, আপনার কীসের কথা বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। তারা চিৎকার করে বললো, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। তারা আমার জামাকাপড়, হাতব্যাগ সব তল্লাশি করে দেখল। কিছু না পেয়ে তাদের রাগ আরো বেড়ে গেল।

পরদিন সকালে দুজন মহিলা পুলিশ আমাকে ধমকে বলল, জ্লদি উঠুন! আমি উঠে দাঁড়াতে গিয়ে খুবই দুর্বল বোধ করলাম। আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম, ডাক্তার আমাকে চল্লিশ ঘন্টার মধ্যে নড়াচড়া করতে নিষেধ করেছেন। তারা আমার কথায় কোনো কর্নপাত করল না। আমার অল্প কয়েকটি জিনিসপত্র একটি ব্যাগে পুরে ফেলল। তারা দ্রুত গতিতে আমাকে একটি প্রাইভেট কারে নিয়ে ঢোকালো। তারপর প্রাইভেট কার থেকে একটি প্লেনে। আমার মনে হতে থাকল আমি ডুবে যাচ্ছি। তাদের কথা বলার শব্দ আমার কানে প্রবেশ করতে থাকল অনেক দূর থেকে। অন্ধকারের ঢেউ আমার দিকে তেড়ে আসছে। আল্লাহ, আমাকে ওদের মধ্যে তলিয়ে দিওনা। আমি নিস্তেজ হতে চাইনা। কিন্তু

www.pathagar.com

আবার আমি অন্ধকারে তলিয়ে গেলাম। আবার যখন আম চেতনা ফিরে পেলাম তখন সুক্কুর জেলে। শুনতে পেলাম কেউ একজন বলছে, সে জীবিত আছে। অন্য কেউ আরেকজন বললো, তাকে এত তাড়াতাড়ি টানাটানি করা উচিৎ হয়নি। এরপর আবার আমি আবার অন্ধকারে তলিয়ে গেলাম। কিন্তু এবার নিরাপদ ভাবে। আমি বেঁচে গেছি। আমি জানতাম না কতটা ভাগ্যবান ছিলাম। কয়েক বছর পর পিপিপির সাবেক মন্ত্রী এবং লন্ডনে নির্বাসিত জাম সাদিক আলীর সঙ্গে আমার কথা হয়। তিনি আমাকে বলেছেন যে আমি হাসপাতালে থাকতে তিনি পাকিস্তান থেকে একটি ফোন কল পান। টেলিফোন যিনি করেন তিনি সাদিক আলীকে বলেছেন, আপনি কিছু একটা করুন। ওরা তাকে অপারেশন টেবিলে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে। সাদিক আলী তখন একটি সংবাদ সম্মেলন করেন আমার জীবনের প্রতি হুমকীর কথা বলে। তখন পরিকল্পনাকারীরা আমাকে হত্যার পরিকল্পনা ত্যাগ করে।

অপারেশনের কয়েক সপ্তাহ পর সুক্কুর কারাগারে আমি ভীষন ক্লান্ত, দুর্বল রক্তশুন্যতায় ভুগছি। এমনকি হাঁটতে পারি না। কারাগারের নীম্ন পর্যায়ের কর্মচারীরা এসময় আমার প্রতি অধিক সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। তারা ঝুকি নিয়ে আমার জন্য কলম, নতুন নোটবুক লুকিয়ে নিয়ে আসে। কিছু নিউজ উইকের কপিও তারা এনে দেয়। তাদের একজন আমার জন্য কিছু তাজা ফলও নিয়ে আসে। যতক্ষন সম্ভব আমার সময় কাটতে থাকল জেলখানার ঘটনাবলী লিখে। নোটবুকে এবং খবরের কাগজ টুকরো অংশগুলোতে। জেলের লোকেরা প্রতিদিন পত্রিকাগুলো ফেরত নিয়ে যেত। কারন হঠাৎ কর্মকর্তারা পরিদর্শনে এসে কিছু পেলে নিশ্চিত চাকরি যাবে। আমি পরদিন সকালে সেই কাগজগুলো নিয়ে ওদের ফিরে আসার জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকতাম।

জেলখানার ডায়েরি থেকে কিছু অংশ :

এপ্রিল ২০, ১৮৮১। শাসকদের মদদপুষ্ট জং পত্রিকা শিরোনাম করেছে বিবিসিকে দেয়া মীর মুর্তাজা ভুট্টোর সাক্ষাতকার দিয়ে। সাক্ষাতকারে সেবলেছে প্লেন ছিনতাইয়ের সময় সে কাবুলে ছিল। ঘটনা ঘটার আগে এ ব্যাপারে সে কিছুই জানতো না। মীর মুর্তাজা বলেছে তার মা এবং বোন যারা পাকিস্তানে রয়েছেন তারা আল জুলফিকারের ব্যাপারে স্বীকৃতি দেননি। সে বলেছে পিপিপির সঙ্গে তার কোনো সংস্রব নেই এবং মা ও বোনের সঙ্গে তার কোনোরকম যোগাযোগ নেই।

এপ্রিল ২১। ডন, রেডিও অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, বোম্বেতে অবস্থানরত মীর বলেছে তার আল জুলফিকার সংগঠন (যার অন্য নাম পাকিস্তান লিবারেশন আর্মি) পাকিস্তানে উত্থান পতন ঘটাতে পারে। তারা বর্তমান প্রশাসনকে উৎখাতের আহ্বান জানিয়েছে। মীর বলেছে, আল জুলফিকার পাকিস্তানের অভ্যন্তরে কমপক্ষে ৫৪ টি অপারেশনে নেতৃত্ব দিয়েছে। পোপ আসার আগে করাচি স্টেডিয়ামের বিষ্ফোরণও তারা ঘটিয়েছে। তাদের সদর দপ্তর কাবুলে কিনা তার জবাবে মীর জানিয়েছে, কাবুলে আমাদের উপস্থিতি রয়েছে, কিন্তু আমাদের সদর দপ্তর পাকিস্তানের অভ্যন্তরেই।

এই সংবাদ পড়ার সময় চরমভাবে আবেগাপ্লুত হলাম। আমি যদি মীরকে একটু দেখতে পারতাম, একটু কথা বলতে পারতাম! তারসঙ্গে আমার বিগত পাঁচ বছর কোনো যোগাযোগ নেই। শাহ নেওয়াজ এবং দেখতে এখন কেমন তা একমাত্র পত্রিকার ছবি

www.pathagar.com

দেখেই জানতে পারি। আমি বুঝতে পারলাম তার এই ক্ষুব্ধ জবানবন্দী, (আমি জানি না এই জবানবন্দী সতিই নাকি শাসকদের বানানো) আমার জন্য এবং পিপিপির সদস্যদের জন্য আরো বিপদ ডেকে আনছে। পিপিপিকে বিনাশ করার জন্য জিয়া এটাকে ছুতো হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। সে হাতের কাছে আমার ভাইকে পাবে না, কিন্তু ইতিমধ্যেই তার হাতের মধ্যে আমরা রয়েছি।

এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখে মীরের নাম পাস্তিানের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় নিবন্ধ করা হয়। এবং ডেপুটি মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কারা পরিদর্শনে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে আমার সঙ্গে দেখা করেন। জেল সুপারেনটেন্ডেন্ট এবং অন্য কয়েকজন কর্মকর্তাকে নিয়ে তিনি আমার সেলে আসেন। আমরা দুজনে দুটি চেয়ারে বসি।

আমি তার কাছে জানতে চাই, কেন আমাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে?

উত্তরে তিনি বললেন, আল জুলফিকারের কারণে।

আল জুলফিকারের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

তিনি বললেন, আমরা আপনার ঘরে আল জুলফিকারের বুপ্রিন্ট পেয়েছি যেখানে সব পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করা আছে।

আমি বুঝতে পালাম না তিনি কী বলছেন। আমি বললাম, প্লেন ছিনতাইয়ের আগে আমি কখনো আল জুলফিকারের নাম পর্যন্ত শুনিনি।

স্টেডিয়ামে বোমা হামলা, লালা আসাদ এবং আল জুলফিকারের সঙ্গে আপনার কোনো যোগসূত্র আছে কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে আদালত।

লালা আসাদ? সিন্ধুর ছাত্র সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট? আমি লালা আসাদকে চিনি। সে খায়েরপুরের প্রকৌশল বিষয়ের ছাত্র। আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে আল জুলফিকার নামে যদি কোনো সংগঠন থাকে সেটার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে। কিন্তু শাসকরা আল জুলফিকারের নাম সমানেই ব্যবহার করছে পিপিপির অনুসারীদের উপর। ডেপুটি মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বললেন, 'আরো একজনকে প্লেন ছিনতাইয়ে জড়িত থাকার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে হল নাসের বালুচ। ' আমি নাসের বালুচকেও চিনি। নাসের বালুচ হলেন করাচি স্টীল মিলের পিপিপি'র শ্রমিক নেতা।

তিনি চলে যাবার পর আমি ডায়েরিতে লিখলাম, এই আলোচনা থেকে আমি যা বুঝতে পারলাম তা'হল ওরা ভাবছে আল জুলফিকারের অংশ হিসাবে আমি লালা আসাদ এবং অন্যান্যদের নিয়ে স্টেডিয়ামে বোমা হামলার ষড়যন্ত্র করেছি। একথা বিশ্বাস করতেও আমার কষ্ট হয়। আমার কাছে মনে হচ্ছে একি পরাবাস্তব এবং ভয়ঙ্কর। নির্দোষরা শাস্তি পাচ্ছে, অপরাধীরা শাসন করছে! কী আজব দুনিয়া।

দুদিন পর সবকিছু আরো অমঙ্গলময় হয়ে উঠল। জঙ পত্রিকার শিরোনামে লেখা হয়েছে, কাগজপত্রে প্রমান হয়েছে যে ভুট্টো পরিবারের নারীরা এর সম্পর্কে জানে। মুহূর্তের জন্য আমার হৃদপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেল। একটি ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল মেরুদন্ড বেয়ে। ওরা আমাকে ওই বুপ্রিন্টের জন্য দায়ী করছে যে বুপ্রিন্ট আমার ঘরে পাওয়া গেছে মার্শাল ল' প্রশাসক বলে গেছেন। শাসকরা আবার প্রস্তুত হচ্ছে ভুট্টো পরিবারের কাউকে বিচার করার

www.pathagar.com

জন্য।

৩০ এপ্রিল আমি ডায়েরিতে লিখলাম, আমরা যেন একটি দুঃস্বপ্ন দেখছি। প্রথমে ধাক্কা খেয়েছিলাম মীর এবং আল জুলফিকারের ব্যাপারে। এখন শাসকরা অভিযোগের সঙ্গে আমাদের জড়াতে চাচ্ছে। উদ্ভট। কিন্তু কেন? তারা একই কাজ করেছিল বাবার ব্যাপারে। তারা এখন আবার শঠতার পুনরাবৃত্তি করতে চাচ্ছে। বিশ্ব এটাকে শঠতা বলেই জানে। তারা হয়তো মনে করেছে বিশ্ব তাদের এই কর্মকে শঠতা বলে জানে না। প্রকৃত সত্যটা কি? সেনা আদালত এটা প্রমাণ করার জন্য কোন সুযোগটি গ্রহণ করেছে? আমাদেরকে রাজনৈতিকভাবে ধ্বংস করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। তাই জিয়া শারীরিকভাবে আমাদের নসাৎ করার পরিকল্পনা করেছে। তারা আমাদের শেষ করে দিতে কতটা নিষ্ঠুর ও পাশবিক হতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

করাচিতে বালদিয়া কেন্দ্র এবং ৫৫৫ ডিভিশন, লাহোরে বার্ডউড ব্যারাক ও লাহোর দুর্গ, পাঞ্জাবের উত্তরে আটক দূর্গ। রাওয়ালপিণ্ডির উপকূলে চাকলালা এয়ার ফোর্স ঘাটি, বালুচিস্তানের খালী ক্যাম্প ও ম্যাচ জেল। এইসব নির্যাতন কেন্দ্রগুলো পিপিপি'র কর্মী দিয়ে ভরে ফেলেছে। অ্যামনেস্টি ইন্টান্যাশণাল এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলো ভীষন উদ্বিগ্ন। আর পিপিপিকে জড়িত করার জন্য আমি এবং আমার মা রয়েছি আল জুলফিকারে। কয়েক বছর আগে আমি জেনেছি এইসব নির্যাতন কেন্দ্রে কী ধরণের নির্যাতন চালানো হয়ে থাকে। শেকল দিয়ে বাধা হয়, বরফের উপর রাখা হয়। বন্দীদের গুহ্যদ্বারে মরিচ ঢুকিয়ে দেয়া হয়। আমার বন্ধু এবং সহকর্মীদের কাছে এইসব শুনে আমি রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়ি। মানুষ কত নিষ্ঠুর হতে পারে। জিয়ার মার্শাল দু'য়ের অধীনে কী ধরনের অত্যাচার করা হয়েছে তার কিছু কিছু নজির রয়ে গেছে।

ফয়সাল হায়াত, একজন আইনজীবী, পাঞ্জাবের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির একজন সাবেক সদস্য:

> ১২ এপ্রিল, ১৯৮১, ভোর ৩টা ৩০ মিনিটে সুপারেনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর একজন কর্নেলের নেতৃত্বে চারশত পুলিশ লাহোরে আমার বাড়ি ঘিরে ফেলে। বাসার কাজের লোককে তার বেদম প্রহার করে এবং দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। আমার বোনকে মাত্র কয়েকদিন আগে লিভার সার্জারি করা হয়েছে। তাকে তার বেডরুম থেকে টেনে বের করা হয়। তারা আমার মাকে তার ঘর থেকে টেনে বের করে। এরপর আমার বেডরুমের দরোজা ভেঙে ফেলে। আমার গলা ধরে টেনে বের করতে করতে তারা বলতে থাকে, 'এই বাড়ি হল আল জুলফিকারের হেড কোয়ার্টার! আপনার এই বাড়ির বেজমেন্টে রকেট লঞ্চার, বাজুকা, সাবমেশিনগান এবং গোলাবারুদ আছে। আমরা সেগুলো জব্দ করতে এসেছি।'
>
> আমি হতভম্ব হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বললাম, 'আপনারা যেভাবে খুশি তল্লাশি চালিয়ে দেখেন। এটা একটা পরিবারের বাসা। কোনো হেডকোয়ার্টার নয়। তাছাড়া এ বাড়ির কোনো বেজমেন্ট নেই।' এরপরও তারা আমাকে গ্রেফতার করল।
>
> প্রথম ২৪ ঘন্টা আমার জেলে কাটল কোনো খাবার বা পানি ছাড়াই। এরপর আমাকে চোখ বেধে লাহোর দুর্গে নিয়ে যাওয়া হল। ৪৫০ বছর পুরোনো পোড়া ইটের তৈরী এই দুর্গ

www.pathagar.com

মোগল আমলে তৈরী। তাজমহলের নির্মাতা শাহজাহান ল
প্রস্তুত করেছিলেন। আমার পরিবার এবং আমি গ্রীস্মকা
এসে সময় কাটাতাম। কিন্তু প্লেন ছিনতাইয়ের পর থে
বানানো হয়েছে। পাকিস্তানের বাস্তিল দুর্গে পরিণত করা হয়েছে।

আমাদের ২৫ থেকে ৩০ জনকে একই সময়ে গ্রেফতার করা হয়ে
পাঞ্জাব পিপিপির অতিরিক্ত সেক্রেটারি জেনারেল জাহাঙ্গীর বদর, সেক্রেটা
শওকত মাহমুদ, আমাদের অর্থ সচীব নাজিম শাহ, সাবেক মন্ত্রী মুক্তার আওয়ানের ম
পর্যায়ের লোকেরা। এ যেন রাষ্ট্রের এক নিদারুন সংকটের সময়।

প্রতি দুইদিন পরপর আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হতো। তারা আসতো সকাল ৬ টায়, যেত সন্ধ্যায় অথবা গভীর রাতে। আমি বুঝতে পারতাম না। জেলে থাকা সত্ত্বেও আমাদের হাতে হাতকড়া পরিয়ে রাখা হতো কেনো। তদন্ত করতো পাঞ্জাবের মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেরের চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার রাহিব তোরায়শি, এবং প্রাদেশিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আবদুল কাইউম। যতদিন বেঁচে আছি সারা জীবন এই দুটি নাম আমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে।

তাদের সামনে আমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। তারা বলতো, 'আমরা আপনাকে বেঁচে যাওয়ার সুযোগ দেব। আপনি বয়সে তরুণ। মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারের ছেলে। আপনার ভবিষ্যত আছে। আপনাকে যা করতে হবে তাহল বেগাম নুসরাত ভুট্টো এবং বেনজির ভুট্টো বিরুদ্ধে প্লেন ছিনতাইয়ে জড়িত থাকার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে হবে।'

আমি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। তখন তারা প্রলোভন দেখালো। বলল, 'আপনি রাজনীতির সঙ্গে আছেন। আমরা আপনাকে মন্ত্রী বানিয়ে দিব। আপনি টেক্সটাইলের ব্যবসা করেন। আপনার নতুন একটি মিলের জন্য অনুমোদনের আবেদন বাতিল করা হয়েছে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য। আমরা ওই অনুমোদন পুনর্বিবেচনা করে ঠিক করে দেব। আপনি যথেষ্ট লাভবান হবেন।'

আমি যখন কোনোক্রমেই রাজি হচ্ছি না তখন তারা কৌশল পরিবর্তন করল। তারা হুমকী দিয়ে বললো, 'আমরা আপনাকে ২৫ বছর কারাগারে অন্তরীন রাখতে পারি। আমরা সামরিক শাসক। আমাদের জন্য কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ কিছুর দরকার নেই। আমরা আপনাকে যখন তখন লটকাতে পারি।'

চারফুট পাঁচ ফুট একটি আমাকে তিনমাস আটকে রাখা হল। আমি ৬ ফুট লম্বা। দিনে বা রাতে কখনোই আমি হাত পা টান করতে পারিনি। এধরণের চারটি কক্ষ ছিল আমাদের ব্লকে। কক্ষগুলোর চারদিকে দেয়াল শুধু পশ্চিম দিকে খোলা লোহার শিক দেয়া। দুপুরে গা পুড়িয়ে দেয়া রোদের তাপ এসে লাগতো। তাপমাত্রা কখনো কখনো ১১৫ ডিগ্রিতে উঠে যেত। এই তাপ থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় ছিল না। সেলের বাইরে ফ্যান ছিল। সেই ফ্যানের মুখ ছিল কোরিডোরের দিকে। যে বাতাস এসে লাগতো তা মনে হতো জলন্ত আগুন।

আমার ঠোঁট দুটো এমনভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছিল যে পানি খেতে পারতাম না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের সর্বত্র ফোস্কা পড়ে গেল। জায়গায় জায়গায় কালো দাগ পড়ে গেল। একদিন লোহার শিকের সঙ্গে আমার গায়ের জামাটি দিয়ে রোদ ঠেকাতে চেষ্টা করলাম। প্রহরী এসে সাথে সাথে শার্টটি ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তিনদিন পর শার্টটি ফেরত দেয়া হল।

হিটস্ট্রোকের কারণে আমার পার্শ্ববর্তী সেলের লোকেরা অসুস্থ হয়ে যেতে থাকল। আমি তাদের দুর্বল আকুতি শুনতে পেতাম। তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে প্রলাপ করতে শুরু করল। আমি ছিলাম সেখানে সবচেয়ে তরুণ। আমার বয়স ২৭ বছর। ফলে আমি তাদের চেয়ে অধিক সময় সহিষ্ণু ছিলাম। কিন্তু দুই মাস পর আমিও ভেঙে পড়লাম। চেতনা হারিয়ে

www.pathagar.com

ফেললাম। দু'দিন পর চেতনা ফিরে পেয়ে আবিস্কার করলাম আমি জেল খানার মাটির নিচে একটি কক্ষে। জেল কর্তৃপক্ষ মাটির নিচে অস্থায়ী হাসপাতাল বানিয়েছে। যখন ডাক্তাররা নিশ্চিত করল যে আমি জ্ঞান ফিরে পেয়েছি তখন আবার আমাকে নির্ধারিত সেলে ফিরিয়ে আনা হল।

দিনের চাইতে রাত আরো কঠিন হয়ে দেখা দিত। আমার বা আমার আশেপাশের কারো জন্য কোনো বিছানা, বালিশ বা চাদরের ব্যবস্থা ছিল না। আমাদেরকে ভাঙাচোরা মেঝেতে গুটিশুটি মেরে পড়ে থাকতে হতো। মেঝের এক পাশে একটি বড় ছিদ্র আছে। ওটাই টয়লেট হিসাবে ব্যবহার করতে হয়। পিঁপড়া, তেলাপোকা, টিকটিকি, ইদুর সহ যাবতীয় পোকামাকড় আমাদের গায়ে উঠে আসতো। পাশাপাশি সার্বক্ষণিক জ্বালাময়ী গরম তো আছেই। জেল কর্তৃপক্ষ ৫০০ পাওয়ারের বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগিয়ে দিয়েছে ৭ ফুট উচু সিলিং এর সঙ্গে। সারা রাত এই বাল্ব জ্বলতে থাকে। তারা খুব সতর্কতার সঙ্গে সকেট সিলিঙের ভেতরের দিকে আটকে দিয়েছে যাতে আমরা কেউ তারে হাত ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করতে না পারি। আমার মনে হয় সম্ভব হলে আমি কাজটি করতাম।

আমার শরীর দ্রুত অবনতির দিকে যেতে থাকল। পরিবেশ এতটা অস্বাস্থ্যকর তা একমাত্র যারা কারাগারে থেকেছেন তারাই জানেন। লোহার শিকের বাইরে থেকে যে সামান্য খাবার দেয়া হতো তা টেনে নিয়ে খেতে দশ সেকেন্ড সময় লাগত। কাঁকড়, বালি মেশানো রুটি। পাতলা তরকারির উপর মরা মাছি ভাসছে। আমি বার বার আমাশয়, ম্যালেরিয়া, কলেরায় আক্রান্ত হলাম। একবার আমার গায়ের তাপমাত্রা উঠে গেল ১০৫ ডিগ্রিতে। মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠি। রাতে মনে হতো বাল্বের আলো চোখের মধ্য দিয়ে মাথার মধ্যে প্রবেশ করছে। যন্ত্রনায় চিৎকার করা থেকে নিজেকে সংবরণ করতে পারতাম না। একবার আগুনের মত তাপ আবার বরফের মত ঠাণ্ডায় শরীর ডুবতে থাকল। ফলে অসুস্থতা থেকে কোনো নিস্তার পাই না। একবার বমি করে চারদিন সেই বমির উপর শুয়ে ছিলাম।

একদিন ব্রিগেডিয়ার কোরাইশি এবং মেজর জেনারেল কাইউম আমাকে এসে বললেন, 'দেখুন কে এসেছে আপনাকে দেখতে।'

ইন্টারোগেশন রুমে খুবই পরিচিত আদলটির দিকে আমি চোখ পিটপিট করে তাকালাম। ওরা আমার মা'কে নিয়ে এসেছে।

আমার মায়ের দিকে তাকিয়ে মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বললেন, 'তাকে এভাবে ২৫ বছর কারাগারে থাকতে হবে। ভুট্টোদের বিরুদ্ধে স্বাক্ষী না দিলে ২৫ বছর থাকতে হবে এভাবে।'

চোখের জলে মায়ের মুখ ভেসে যাচ্ছে। আমার মা এমনিতেই ভেঙে পড়েছিলেন। তার দেবরকে নির্যাতন করে দেশ থেকে নির্বাসন দেয়া হয়েছে, ছেলেকে এভাবে নিঃশেষ করে ফেলেছে। আমাদের ফসলের জমি শুকিয়ে চৌচির হয়ে আছে কারণ সরকার আমাদের পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। তারপরও মা ছিলেন ভীষন কোমল মনের মানুষ। কিন্তু সেদিন শাসকদের সামনে যে দৃঢ়তা তিনি দেখালেন তা আমি কোনো দিন দেখিনি। সরাসরি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে মা বললেন, 'ওরা যেন তোমাকে আতঙ্কিত করতে না পারে ফয়সাল। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওরা যেন তোমাকে না নিতে পারে। তুমি তাই করবে যা তোমার মন করতে বলে।'

আমি মাকে বললাম, 'আমি আল্লাহর উপর ভরসা করি। এরা তো মাত্র মানুষ। আল্লাহ যদি চান আমি ২৫ বছর জেলে থাকব তাহলে আমার কিছু করার থাকবে না। কিন্তু আমি ভুট্টো পরিবারের সঙ্গে বেঈমানি করতে পারব না।'

বেঈমানি রা আমার দ্বারা সম্ভব ছিল না। লাহোর দুর্গে আমরা যারা রাজনৈতিক বন্দি

www.pathagar.com

ছিলাম তাদের কারো পক্ষেই তা করা সম্ভব না। আমরা সবাই ঐতিহ্যশালী পরিবার থেকে এসেছি। আমরা ধার্মিক এবং সরকারি উচ্চ পদে চাকরির ঐতিহ্য রয়েছে। আমরা শিক্ষিত পরিবারের সন্তান। সমাজে আমাদের সুনাম আছে। যত হুমকীই থাকুক আমরা মিথ্যা বলে তারপর সমাজে মাথা নিচু করে বাঁচতে পারি না।

সাবেক সরকারি কর্মকর্তারা কেউ ভুট্টোর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজি হননি। তিনমাস প্রচেষ্টা করে অবশেষে শাসকরা ক্ষান্ত দেয়। আমাদেরকে স্থানীয় জেলখানায় বদলী করে দেয়া হয়। আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় লাহোর থেকে চল্লিশ মাইল উত্তরে গুজরানেওয়ালা কারাগারে। পরবর্তী দু'মাস আমি ওই জেলে দিনাতিপাত করেছি। শাসকরা সাহস পায়নি লাহোর দূর্গ থেকে সরাসরি আমাদের মুক্তি দিয়ে সমাজে ফিরিয়ে দিতে। তাহলে আমাদের শরীরের অবস্থা নিয়েও তাদের বিব্রত হতে হতো।

কাজী সুলতান মাহমুদ, রাওয়ালপিণ্ডির ফ্ল্যাশম্যান হোটেলের সাবেক কর্মচারী এবং রাওয়ালপিণ্ডি শহর পিপিপি'র জেনারেল সেক্রেটারি:

আমি ইতিমধ্যেই এক বছর মিয়ানওয়ারী কেন্দ্রীয় কারাগারে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছি চেয়ারম্যান ভুট্টোর ফাঁসির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে। পিপিপি'র পক্ষে কাজ করার জন্য কোনো রকম ক্ষতিপুরণ ছাড়াই আমাকে হোটেল থেকে চাকুরিচ্যুত করা হয়। প্লেন ছিনতাইয়ের পর আবার আমাকে গ্রেফতার করা হয়। প্রথমে আমাকে রাওয়ালপিণ্ডি কারিগারে নেয়া হয়, সেখানে থেকে গুজরানেওয়ালা জেল এবং তারপর লাহোর দূর্গ। এটি ছিল সবচেয়ে ভয়ানক জায়গা।

জেল কর্তৃপক্ষ প্রথমেই বারবার আমার কাছে জানতে চাইল, 'মিস ভুট্টো এবং আল জুলফিকারের মধ্যে সম্পর্ক কী আমাদের বল।' আমি যখন বললাম তিনি কখনো এনিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করেননি এবং এই ছিনতাই সম্পর্কে আমার নিজেরও কোনো ধারণা ছিল না তখন তারা আমাকে চামড়ার তৈরী চাবুক দিয়ে পেটাতে শুরু করল। তারা বাঁশের লাঠি দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করল। এটা ছিল শুরু মাত্র।

আমি অত্যন্ত ছোটখাটো মানুষ। আমার উচ্চতা মাত্র তিনফুট এবং ওজন আটচল্লিশ পাউণ্ডের মত হবে। সুতরাং আমাকে নিয়ে খেলা করা তাদের জন্য ছিল খুবই সহজ। আমি যখন তাদের মিথ্যা কথায় সায় দিলাম না তখন তারা আমার হাতে অসম্ভব ভারী হাতকড়া পরিয়ে দিল। এবং আদেশ করল হাত মাথার উপরের দিকে তুলে রাখতে। আমার হাত খুবই ক্ষীণ। যেই হাত পড়ে যায় সাথে সাথে তারা আমাকে পাড়া দিয়ে ধরে এবং উচ্চস্বরে হাসতে থাকে। মাঝেমাঝেই তারা আমার পেটের মাংস খাবলে ধরে উপরে তুলে ফেলে এবং হয় মাটিতে আছাড় দেয় অথবা ফুটবলের মত দেয়ালে ছুঁড়ে মারে।

তারা মাঝেমাঝেই আমার চোখ বেধে কোথাও নিয়ে যায়। আমি জানি না সেটা কোথায়। এসময়ে তারা বলে, তোমাকে মেরে ফেলতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আল জুলফিকারের সঙ্গে ভুট্টোদের জড়িত থাকার কথা না বললে তোমাকে মেরে ফেলা হবে। আমি প্রত্যাখ্যান করলেই ওরা আমাকে দেয়ালে উচু দেয়ালের সঙ্গে এক ফুট পরিমান শুন্যে ঝুলিয়ে রাখে। বলে, কেন তুমি মরতে চাও? শুধু স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর কর।

আমি তাদেরকে বলি, 'আপনারা আমাকে মেরে ফেলুন, কিন্তু আমি আপনাদেরকে তা বলতে পারব না যা আমি নিজে জানি না।'

এভাবেই তারা আমাকে ৩৫ দিন লাগাতার নির্যাতন করতে থাকে। তাদের একটি প্রিয় নির্যাতন ছিল আমাকে নগ্ন করে তাদের সামনে দাঁড় করানো। তারপর দু' পায়ের মাঝখানে

www.pathagar.com

একটি লাঠি দিয়ে আটকে দিত। এই অবস্থায় দু থেকে তিন মিনিট থাকা আমার জন্য কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না। আমি আমার মুখের সামনেই প্রস্রাব করে দিতাম। আমার নাক দিয়ে, দাঁত দিয়ে রক্ত এসে যেত। ওরা হাসতো। বিষয়টি ওদের হাসির উদ্রেক করতো।

ওরা উপহাস করে বলতো, 'আহ্ তুমি হলে একজন বড় নেতা। তোমার মধ্যে এমন কী আছে যে ভুট্টো তোমাকে এত পছন্দ করতো? তোমার মধ্যে কী বিশেষ কিছু ছিল? তুমি এমন ধরণের যে তোমাকে একজনের অপছন্দ করার কথা। তুমিতো দেখতে সুন্দরও। তোমার ভেতরে নিশ্চয়ই এমন কোনো গুণ বা এমন কোনো। গোপন কোনো ব্যাপার আছে যা তুমি আল জুলফিকারের জন্য করছ।' এরপর তারা আমাকে লাথি মারতে শুরু করতো এবং পেটাতো।

এরপর আমি আরও ৩৫ দিন নিঃসঙ্গভাবে বন্দি হয়ে রইলাম। আমাকে অন্ধকার একটি কক্ষে আটকে রাখা হতো। আমাকে ফেলে রাখা হল ধুলিময় একটি জীবন্ত কবরে। খুব সামান্য খাবার দেয়া হতো। একটি আধছেকা রুটি অথবা একটি চাপাতির সঙ্গে দেয়া হতো পাতলা ডাল। ওরা কক্ষের ভেতর কোনো রকমে খাবার ফেলে যেত ছোট ফাক দিয়ে। আমি ময়লা থেকে খাবার তুলে নিয়ে খেতাম। এক কাপ চা প্রতিদিন দেয়া হতো। আমি চায়ের কাপটি ধরতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই চা পড়ে যেত। ভাগ্য ভাল হলে এক চুমুক অথবা দুই চুমুক চা পান করতে পারতাম। আমার মাথা এবং পা পুড়ে যেত।

দুই মাস পর ছাড়া পেয়ে আমি অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের ব্যাপারে বক্তব্য দিলাম। জেনারেল জিয়ার অধীনে কারাগারে অন্যদের সঙ্গে আমার সহ অবস্থান এবং তাদের অবস্থা বর্ণনা করলাম। গার্ডিয়ান সেই কাহিনী ইংল্যান্ডে ছাপল। এপি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিল। এরপর আমাকে আবার গ্রেফতার করে নিঃসঙ্গ বন্দীত্ব দেয়া হল। এবার আমি দুই বছর চারমাস অন্তরীন থাকলাম। এরপর এখটি সামরিক আদালত আমাকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে প্রথমে মুলতান কেন্দ্রীয় কারাগারে এবং পরে অটক জেলে প্রেরণ করল অবশেষে ১৯৯৫ সালের ১৫ জুন আমি মুক্তি পেলাম।

আমার ভাগ্নে আমাকে চালিয়ে নিতে থাকল। কারণ তখনও আমি কালো তালিকাভুক্ত। কিন্তু আমি পিপিপি'র পক্ষে কাজ করে যেতে থাকলাম। আমি কখনো বিচ্যুত হবো না। যতক্ষন জীবিত আছি ততক্ষন বেনজির ভুট্টোকে ছেড়ে যাব না।

পারভেজ আলী শাহ্, বর্তমান সিন্ধু পিপিপির ভাইস প্রেসিডেন্ট, তৎকালীন সিন্ধু পিপিপির অন্যতম সদস্য এবং সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন জাভেদ-এর প্রকাশক ও প্রধান সম্পাদক:

২৪ মার্চ, ১৯৮১, আমি আমার ছেলেকে নিয়ে ক্রিকেট খেলছি। কোনো নাম্বার বা চিহ্ন ছাড়া একটি প্রাইভেটকার এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে সাদা পোশাকধারী লোকেরা নেমে এসে আমাকে গাড়িতে উঠতে বললো। তারা পরিচয় দিল পুলিশ। কিন্তু তাদের কাছে কোনো রকম গ্রেফতারি পরোয়ানা নেই।

আগেও আমি তিনবার গ্রেফতার হয়েছি। প্রথমবার গ্রেফতার হয়েছিলাম ১৯৭৭ মালের ১ অক্টোবর যে সময় প্রথম নির্বাচন বাতিল করা হয়। সেবার আমার সঙ্গে বাবাও গ্রেফতার হয়েছিলেন। তখন প্রাইভেট কার এবং জিপ বোঝাই পুলিশ এসেছিল সিন্ধুর অন্তর্বর্তী খায়েরপুরের আমাদের বাড়িতে। আমি পিপিপির টিকেটে প্রাদেশিক অ্যাসেম্বলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলাম। পুলিশ এসে আমার বাবাকে এবং আমাকে হাত কড়া পড়ালো। তারপর খোলা রাস্তায় প্যারেড করাতে করাতে নিয়ে যেতে থাকল। পেছনে পেছনে চলল প্রাইভেট কার এবং

www.pathagar.com

জিপ। রাস্তার দুই ধারে জনগণ ভীড় করে অবাক চোখে আমাদের দেখল। সম্মানী কোনো পরিবারের সদস্যের কথা দূরে থাক, সামাজিক কোনো অপরাধীদের সঙ্গেও এমন আচরণ করা হয় না। প্রথম আমি লজ্জায় হাতের হাতকরা রুমাল দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু যখন আমি তাকিয়ে দেখলাম জনগণের চোখে জল তখন সেই রুমাল সরিয়ে নিলাম। থানার মেঝেতে ২৫ দিন শুয়ে কাটানোর পর একজন মেজর এসে আমাকে মুক্তি দিল। কিন্তু আমার বাবাকে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়ে সুক্কুর কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হল।

এক বছর পর খায়েরপুরে মিসেস ভুট্টোর মুক্তির দাবী উঠলে তারা আবার ফিরে এল। এই সময় আমি বাড়িতে ছিলাম না। তারপরও পুলিশ আমাকে খুঁজতে অন্দরমহলে প্রবেশ করল। যেখানে কেউ কখনো ঢোকেনি। তারা আলমারির ড্রয়ার টেনে কাপড়চোপড় পর্যন্ত মেঝেতে ফেলে দিল। শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছিল আমার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে। আমি সেখানে বন্ধুর বিয়েতে উপস্থিত হতে গিয়েছিলাম। আমাকে গ্রেফতার করে একটি সেলে রাখা হল। সেলটি দশ ফুট লম্বা এবং সাত ফুট চওড়া। এই সেলে আমি সহ আরো ২১ জনকে রাখা হল। আমার বিরুদ্ধে অগ্নি সংযোগের চার্জ গঠন করা হল। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে তারা কোনো সাক্ষী জোগাড় করতে পারল না। শেষমেষ তারা জনগণকে উত্তেজিত করে তোলার দায়ে আমাকে এক বছরের কারাদণ্ড দিল।

কিন্তু ১৯৮১ সালের গ্রেফতার ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। আমাকে চোখ বেধে ৬ ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে খায়েরপুরে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হল। সেই জেলে আমাকে তিনদিন রাখা হল অনাহারে। এরপর আমাকে সেখান থেকে আবার নিয়ে যাওয়া হল। প্রথমে হায়দারাবাদে এবং পরে রাতের অন্ধকারে করাচিতে। আমি পুলিশের কাছে কাকুতি করে বললাম, 'আমাকে অন্ত ত পক্ষে এক কাপ চা দিন।' উত্তরে তারা বলল, ৫৫৫ তে গিয়ে আপনার যা দরকার সব পাবেন। ৫৫৫ হলো সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের সেই ভয়ঙ্কর সদর দপ্তর।

আবার আমাকে পুলিশের ভ্যানে ওঠানো হল। এবার আমাকে নিয়ে রাখা হল একটি কুচকুচে কালো সেলে যার সিলিং আমার মাথা ছুয়ে গেছে। নিকষ কালো অন্ধকারে অন্য একজনের গায়ে পা পড়তেই সে উচ্চস্বরে বলে উঠল দেখে পা রাখেন। বলতে পারবো না আমরা গাদাগাদি করে কত সময় সেই কক্ষটিতে ছিলাম।

আমাকে কর্নেল সেলিমের সামনে নিয়ে যাওয়া হল। কর্নেল সেলিম তখন আই এস আই'র প্রধান। তিনি আমার হাতে এক টুকরো কাগজ এবং একটি পেন্সিল তুলে দিলেন। বললেন, এখানে লেখ যে মিস ভুট্টো বোমা হামলার নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং প্লেন ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।'

আমি বললাম, আমি কী করে এমন কথা লিখব যে সম্পর্কে আমার সামান্য ধারণা নেই!' তিনি আবার লিখতে বললেন। আমি আবার তা লিখতে অস্বীকৃতি জানালাম। তিনি লালা খানকে ডাকলেন। লালা খান হল ৫৫৫ এর কুখ্যাত নির্যাতনকারী। সে এসে আমার পা দুটো রশি দিয়ে একটা কাঠের সঙ্গে বাধল। তারপর লম্বা মোটা লাঠি দিয়ে আমার হাটুতে বাড়ি দিতে শুরু করল। ব্যাথা তীব্র থেকে তীব্র হতে থাকল। আমার দু'গাল বেয়ে চোখের পানি ঝরতে থাকল। আমি ক্ষমা চেয়ে বললাম, 'বোমা হামলা বা প্লেন চিনতাই সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। লালা আমাকে প্রহার করতে থাকল। এরপর সে একসময় থামল। দেখলাম আমি আমার দু'পা নাড়াতে পারছি না। লালা ঠান্ডা গলায় বলল, 'উঠে দাঁড়াও। না হলে আর জীবনে কখনো হাঁটতে পারবে না।'

আমাকে অন্য একটি সেলে নিয়ে যাওয়া হল। এরপর পালা করে গোয়েন্দা বিভাগের চারটি শাখা থেকে লোকরা আসতে থাকল। তাদের একই কথা, বেনজির এবং বেগম সাহিবার কথা বল। আমি যখনই অস্বীকৃতি জানাই তখনই তারা লালাকে ডাকে।

www.pathagar.com

অন্যদেরকে অত্যাচার করার সময় লালা তা আমাকে দেখাতো। তাদেরকে প্রহার করতে থাকত যতক্ষন তারা চিৎকার করতে শুরু না করতো। মাঝে মাঝেই আমাকে এমনভাবে সিলিং এর সঙ্গে বাধা হতো যে আমার পায়ের পাতা কোনোক্রমে মেঝেতে ছুয়ে থাকতো। এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাকে বেধে রাখা হতো। রাতে যারা পাহারা দিত তারা আমাকে ঘুমাতে দিত না। নানা ধরণের ছোটখাটো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করতো। আমি উত্তর না দিলে হাতের লাঠি দিয়ে খোঁচা দিত। মাঝে মাঝে যখন আমি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যেতাম এবং প্রতিদিন দু'গ্লাস পানি ও পাতলা ডাল দিত তা খাওয়া ছেড়ে দিতাম, তখন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ কারীদের সঙ্গে দুপুরে খাবার জন্য নিয়ে যাওয়া হতো। নোংরা পোষাকে আমাকে জাঁকালো খাবারের সামনে বসানো হতো। সঙ্গে থাকতো ধুমায়িত চা। তারা বলতো, ' তুমি নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ। তুমি একটি ভাল পরিবারের শিক্ষিত ছেলে। কেন এমন ঝামেলা করছ? তুমি শুধু বলে দাও যে বেনজির ভুট্টো এই ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল। দেখবে সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আর কোনো ঝামেলা নেই। আমি অস্বীকার করতাম। এবং সাথে সাথে আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে নেয়া হতো এবং আবার নির্যাতন চালাতো।

তিনমাস পর আমাকে প্রথমে করাচি জেলে এবং পরে খায়েরপুর জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমার পরিবারকে মাসে একবার সাক্ষাতের সুযোগ দেয়া হতো। সেখানে আমাকে সাতবার সামরিক আদালতের সম্মুখীন করা হয়। তারা আমার বিরুদ্ধে কোনো স্বাক্ষ্য কিংবা অভিযোগ দাঁড় করাতে পারেনি। অবশেষে ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তারা আমাকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে পাকিস্তানের নিরাপত্তা, ন্যায়পরায়নতা এবং আদর্শের পরিপন্থী অপপ্রচার চালানোর দায়ে। ইতিমধ্যে চার বছর যে আমি জেলে কাটালাম সেজন্য কারাদণ্ডে কোনো মওকুফ দেয়া হল না। তিনটি সন্তানকে পালন করতে এবং আমাদের ছোট ব্যবসা দেখে রাখতে গিয়ে আমার স্ত্রী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল।

পারভেজ আলী শাহকে অ্যামনেষ্টি ইন্টান্যাশনাল প্রিজনার অব কনসায়েন্স হিসাবে গ্রহণ করেছিল। সেই ভয়ানক সময়ে এমআরডি গঠন এবং প্লেন ছিনতাইয়ের জন্য এমন অনেকের ভাগ্যবরণ করতে হয়েছিল। অ্যামনেষ্টি ইন্টান্যাশনাল রিপোর্ট করল, ১৯৮১ সালের গোটা সময়টাতে পাকিস্তানে কারাভোগ এবং নির্যাতন নাটকীয় ভাবে বেড়ে গেছে। এই হতভাগাদের অধিকাংশই ছিল ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী, ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য এবং রাজনৈতিক দলের আইনজীবি। প্লেন ছিনতাইয়ের ঘটনায় কারাবন্দীর নতুন মাত্রা যোগ হয়। সে সময় অ্যামনেষ্টি ইন্টান্যাশনাল রিপোর্ট প্রকাশ করে যে অ্যামনেষ্টি ইন্টান্যাশনালের কাছে রিপোর্ট আছে চারজন নারীবন্দীকে নির্যাতন করা হয়। এরা হলো পিপিপির কর্মকর্তাদের স্ত্রী নাসিরা রানা এবং বেগম আরিফ ভাট্টি, পিপিপি সদস্য ফরখান্দা বুখারি এবং ছয় সন্তানের জননী মিসেস সাফুরান। আমি এদের সকলকে চিনি।

নাসিরা রানা, ১৩ এপ্রিল, লাহোর।

আমার স্বামী ছিলেন এমআরডির একজন সদস্য। এপ্রিলের প্রথম দিকে একদিন হঠাৎ করে পুলিশ এসে যখন আমার বসার ঘরে হানা দেয় তখন তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তিনি ছিলেন করাচিতে। যে লোকটি আমার মাথার দিকে রাইফেল তাক করে আছে তার দিকে তাকিয়ে আমি আতঙ্কের সাথে বললাম, আপনি কে? তার পরণে কোনো ইউনিফর্ম ছিল না। একটি

www.pathagar.com

খোলামেলা শার্ট এবং পরনে কালো প্যান্ট। তার গলায় ছিল সোনার একটি চেইন। এখনো তা আমার চোখের সামনে ভাসে।

সে কঠোর গলায় বললো, 'আমি কে তা জানতে পারবে। আমি পাকিস্তান আর্মির একজন মেজর।' কথা বলতে বলতে সে রাইফেলের নল আমার কপালের সঙ্গে আরো জোরে ঠেসে ধরছে। আমি ব্যথা পেলাম। হাত দিয়ে রাইফেলটি সরিয়ে দিলাম। সে রাইফেলের বাট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আমাকে আঘাত করল। আমার হাতের হাড় ভেঙে গেল, আঙুলও ভাঙল। আমার বারো বছরের মেয়েটি এ দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠল।

সে জানতে চাইল, 'তোমার স্বামী কোথায়?' অন্যান্য সেনা সদস্যরা তখন সারা ঘর ওলোট পালট করে ফেলছে।

আমি বললাম, সে এখানে নেই।

সে আবার তার রাইফেলের বাটটি উচু করল। বলল, গোপন পথে যাওয়ার রাস্তা কোনটি?

আমি বললাম, 'আমাদের কোনো গোপন পথ নেই।'

তারা আমাকে এবং আমার মেয়েকে একটি কক্ষে তালা দিয়ে রেখে চলে যায়। এরপর তারা আবার ফিরে আসে ১৫ দিন পর।

পুলিশের অতিরিক্ত সুপার এবং একজন মেজিস্ট্রেট এসে বলেন, 'আমাদের সঙ্গে আসুন। আপনাকে গ্রেফতার করা হল।'

আমি জানতে চাইলাম, 'আপনাদের কাছে গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে?'

তারা উত্তর দিল, 'আমরা নিজেরাই পরোয়ানা।'

আমাকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে সারারাত আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হল। সেখানে ঘণ্টায় ঘণ্টায় নতুন জিজ্ঞাসাবাদ করার লোক আসতে থাকে।

'বেনজির ভুট্টো এবং বেগম ভুট্টোর মতই আপনার স্বামী আল জুলফিকারের একজন সদস্য। আমরা জানি এর সব ঘটনাবলী। আপনি বিষয়টি নিশ্চিত করুন।'

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় পার হয়ে যায়। আমি আমার অবস্থানে অনড় থাকি। তারা যাই বলুক আমার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার আছে। লক্ষ করলাম আমার হাটু ভেঙে যাচ্ছে। ঠিক পেছনে রাখা চেয়ারটায় বসতে গেলাম। ওরা প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল, সরে যাও!'

দু'দিন পর আমাকে লাহোর কারাগারে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে আমার সঙ্গে অন্য বন্দীদের দেখা হল। এরমধ্যে ছিলেন বেগম ভাট্টি, যার স্বামী ছিলেন একজন প্রাদেশিক মন্ত্রী। তিনি পাঞ্জাবের রাজস্ব মন্ত্রীও ছিলেন।

বেগম ভাট্টিঃ

সরকারের এগারোটি সংস্থা আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা শুধু চিৎকার করে একই কথা জানতে চায়, 'তোমাদের স্বামীরা কোথায়! তারা সন্ত্রাসী এবং ভুট্টোদের সঙ্গে জড়িত।'

জেল কর্তৃপক্ষ সারারাত আমাদের জাগিয়ে রাখতো। তিনরাত আমরা ঘুমাতে পারিনি। সেলের কাছে এসে তারা চিৎকার করে, শিকের সঙ্গে লাঠি পিটিয়ে, হাতে তালি দিয়ে বলতো, 'ঘুমানো চলবে না মিসেস রানা। এই বেগম ভাট্টি! জেগে থাকুন!'

পরদিন ওরা আমাদের নিয়ে গেল গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান জেনারেল কাইউমের কাছে। একই প্রশ্ন, আমারও একই উত্তর। এক পর্যায়ে মেজর জেনারেল কাইউম আমার চুল ধরে টেনে নিয়ে মাথাটা দেয়ালের সঙ্গে ঠুকে দিলেন।

www.pathagar.com

তিনি চিৎকার করে বললেন, 'তোমার স্বামী কোথায়!'

'আমি জানি না।'

তিনি আমার বাহুর সঙ্গে সিগারেটের আগুন ঠেসে ধরলেন। যে পর্যন্ত মাংস পোড়া গন্ধ না বের হওয়া পর্যন্ত তিনি ধরে রাখলেন। 'বল স্বামী কোথায়!'

আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে থাকলাম। এরই মাঝে শুনতে পেলাম নাসিরা চিৎকার করছে।

মেজর জেনারেল কাইউম চিৎকার করে বললেন, 'তোমাদের তেল মজাবো!'

সবকিছু অন্ধকারে চলে যাওয়ার আগে আমি শুধু এই কথাটি শুনতে পেলাম।

নাসিরা:

পাঁচ সপ্তাহ ধরে আমরা লাহোরের দুর্গে আবদ্ধ ছিলাম। তখন বছরের সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা। সুর্যের তুখোড় তাপ ছিল নির্দয়। দুপুর বেলা আমাদেরকে জেলখানার প্রধান উঠোনে নিয়ে আস হল। চারদিকে প্রহরীরা। বললো, এখন আমরা যা চাই তাই তোমরা বলবে। আমাদেরকে ঘণ্টার পর ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হল। চোখের সামনে অন্ধকার দেখতে থাকলাম। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। জিহ্বা প্রচণ্ডভাবে শুকিয়ে আসছে। গার্ডরা আমাদের সামনেই পানি পান করছে, হাসছে। সময় পার হয়। গার্ডদের বদলী ডিউটি পড়ে। কে জানে আমরা কতক্ষন দাড়িয়ে। প্রতি তিন ঘন্টা পরপর প্রহরী চেঞ্জ হওয়ার কথা।

তিন বার তারা আমাদেরকে স্পেশাল রুমে নিয়ে গেল। হাতের কব্জির সঙ্গে টাইট করে ভেজা স্পঞ্জ বাধা হয়। সেই স্পঞ্জের ভেতর দিয়ে বৈদ্যুতিক তার বের হয়ে গেছে। প্রতি কয়েক সেকেণ্ড পর পর সেই তারের ভেতর দিয়ে শক খেতে থাকলাম। একের পর এক এই শক খাচ্ছি। আমার ভাঙা হাত ছিল খুই স্পর্শকাতর অবস্থায়। আমি কোনোক্রমেই সহ্য করতে পারলাম না। তারা হুমকী দিয়ে বললো, 'আমরা তোমাকে ধরে এনে নির্যাতন করবো, তোমার মেয়েকে ধরে আনবো!

বেগম ভাট্টি:

সেলের মধ্যে আমাদের জন্য কোনো খাট বা বিছানা ছিল না। ওরা আমাদেরকে থাকতে দিয়েছিল চটের উপর। আমি যখন সেই চট বিছাতে গেলাম ওর ভেতর থেকে তিন ফুট লম্বা একটি সাপ বের হয়ে এল। আমি নাসিরার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'চিৎকার করো না। সাপটির প্রতি হঠাৎ আমার ভীষন রাগ হল। আমি চট দিয়ে সাপটিকে ধরলাম। দেয়ালের সঙ্গে আছরে দিলাম। প্রহরারত পুলিশ মহিলা সাপটি দেখে চিৎকার দিয়ে উঠল।

কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছ থেকে জবানবন্দী লিখে নিতে চাইল যে সাপটি নিজেই সেলের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এর জন্য দায়ী না। আমরা তাতে সই করতে অস্বীকার করলাম।

তারা লাগাতার বলে যেতে থাকল বেনজিরের নাম বল, বেগম সাহিবার নাম বল, তোমার স্বামীর জড়িত থাকার কথা বল।

আমি জিজ্ঞাসাবাদকারী একজনকে বললাম, আপনার স্ত্রী যদি আমার জায়গায় হতো সে কী করতো?

সে বলল, 'সে হ্যা বলতো।'

'তাহলে সে একজন লজ্জাসকর মহিলা।' আমি বললাম।

www.pathagar.com

নাসিরা:

> আমি একজন প্রহরীর কাছ থেকে শুনলাম আমার স্বামীকে আটক করে দূর্গে নিয়ে আসা হয়েছে। আমি জানি না তারা তাকে কী করেছে। আমি তা জানতে চাই না। তাকে নির্যাতন করার পর তার হার্ট এটাক করেছিল। সে নীল হয়ে গিয়েছিল এবং শ্বাস নিতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তখন তারা তাকে হাসপাতালে নিয়েছিল। কারণ তারা চায় না যে নির্যাতনের ফলে মারা গেছে এমন কথা উঠুক। সে আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গিয়েছিল।

আমি সুক্কুরে থাকতে এসব নির্যাতনের কথা শুনতে পাইনি। আমি জানতাম না যে ড. নিয়াজি প্লেন ছিনতাইয়ের পরপরই তার স্ত্রী ও পরিবারের অন্য সদস্যদের চাপে তৃতীয় দফা পুলিশ ধরে ফেলার এক মিনিট আগে পাকিস্তান ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। তিনি কাবুলে অবস্থানকালে ভয়ঙ্কর হার্ট এটাকের সম্মুখীন হন এবং লন্ডনে বাইপাস সার্জারির মাধ্যমে অল্পের জন্য বেঁচে যান। তিনি সেখানে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন।

ইয়াসমিনও অল্পের জন্য গ্রেফতার থেকে রক্ষা পেয়েছিল। বাসার গেটের সামনে গিয়ে পুলিশ জানতে চেয়েছে, 'ইয়াসমিন কী বাসায় আছেন? ইয়াসমিনই উত্তর দিয়েছে, 'না, সে বাসায় নেই।' পুলিশ তখন সিদ্ধান্ত নিল ইয়াসমিনের মাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার। তখনই ইয়াসমিন এবং তার মায়ের মধ্যে পুলিশের গোচরের বাইরে তর্ক শুরু হল। ফিসফিস করে ইয়াসমিন বললো, 'মা আমি পুলিশকে আমার পরিচয় দিয়ে দিচ্ছি।' ইয়াসমিনের মা বললেন, 'ইয়াসমিন, তুমি যদি সত্যিই তা কর তাহলে আমার মরা মুখ দেখবে।' সুতরাং হয় তুমি আমাকে জেলে যেতে দাও অথবা আমার মৃতদেহ গ্রহণ কর। এখন তোমার পছন্দ তুমি কী চাও।' ইয়াসমিন শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল যখন পুলিশ তার মা'কে ও ওর সামনে দিয়ে পুলিশ রাওয়ালপিণ্ডি সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে গেল। সেখানে তিনি অন্য তিন মহিলার সঙ্গে একটি সেলে আটক ছিলেন। ওই সেলটি আমার বাবাকে ফাঁসি দেয়ার আগে যে সেলে রাখা হয়েছিল ঠিক তার উল্টোদিকে। মিসেস নিয়াজি আটক হওয়ার পর প্রথম পাঁচদিন সেলটিতে এত বন্দি ছিল যে মহিলাদের সকলকে কাত হয়ে শুতে হতো।

ইয়াসমিন পরবর্তী তিন মাস আত্মগোপন করেছিল। পুলিশ তাকে খুঁজতে থাকে। মহাবিপদ তার উপর। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে মেয়ের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন ড. নিয়াজি। তিনি ইয়াসমিনের জন্য পিআইএর একটি টিকেট ক্রয় করেন লণ্ডন পর্যন্ত। কিন্তু ইয়াসমিন কী করে দেশ থেকে বের হবে? জেল থেকে মুক্ত হয়ে মিসেস নিয়াজি ব্রিটিশ দুতাবাসে ফোন করেন। ভাগ্যক্রমে ইয়াসমিন জন্মগ্রহণ করেছিল ইংল্যান্ডে। দুতাবাস জানালো তারা ইয়াসমিনকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে একটি ব্রিটিশ পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দিতে পারে যদি ইয়াসমিনের মা ইয়াসমিন ছোটবেলা তার সঙ্গে ইংল্যান্ডে গিয়েছিল সেই পাসপোর্ট তাদের দেখাতে পারেন। মিসেস নিয়াজি আঠারো বছর আগের একটি পাসপোর্ট খুঁজে পেলেন বাড়ির নিচতলার একটি বাক্সের ভেতর। কয়েকবছর পরও মিসেস নিয়াজি আতঙ্কিত স্বরে আমাকে বলেছিলেন, 'আমি ইয়াসমিনের সঙ্গে এয়ারপোর্টে যেতে পারিনি কারণ ওরা আমাকে চিনে ফেলবে। আমি ইয়াসমিনকে একটি বোরকা পড়িয়ে দিলাম। সাথে ওর বোন গেল। ইয়াসমিনকে গ্রেফতারের আদেশ দিয়েছিলেন খোদ জিয়া। তার গ্রেফতারের

www.pathagar.com

আদেশটি জারি হয় ইসলামাবাদে। সারা দেশেই তাকে খোঁজা হচ্ছিল। এমন কোনো লিষ্ট ছিল না যেখানে ইয়াসমিনের নাম নেই। ইয়াসমিন দেশ থেকে বের হতে পেরেছিল একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায়।'

এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশণ অফিষার ইয়াসমিনকে বললেন, 'আপনার পাসপোর্টে কোনো এন্ট্রি ভিসা নেই।' ইয়াসমিন ধোকা দিতে চেয়ে বলল, এটা অস্বাভাবিক। হয়তো ভুল হয়ে থাকতে পারে। অফিসার তার নাম তালিকায় আছে কিনা তা দেখার জন্য তাকালেন। ঠিক সেই সময় এয়ারপোর্টের বিদ্যুত চলে গেল। প্রায় এক মিনিট গোটা এয়াপোর্ট অন্ধকারে ডুবে রইল। প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে যার যার প্লে ধরার জন্য ব্যতিব্যস্ততা শুরু হল। বিদ্যুত যখন ফিরে এল তখন ইমিগ্রেশন অফিসার এতটাই ব্যস্ত যে দ্রুততার সঙ্গে ইয়াসমিনের পাসপোর্টে সিল মেরে দিলেন। ইয়াসমিন এয়ারপোর্টের ভেতরে ঢুকে গেল।

ইয়াসমিন নিরাপদেই লন্ডনে নেমেছিল। সেখানে সে আমার চাচাতো ভাই তারিককে বিয়ে করে। তারিকও রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী ছিল। তারা এখনো সেখানে বাস করছে। ওদের দুটি শিশু সন্তান রয়েছে।

মে মাসে সুক্কুর জেল উত্তপ্ত হয়ে উঠল: শুস্ক, গুমোট গরম সেলের মধ্যে থেকে মনে হয় যেন ওভেনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার সেলের খোলা পাশ দিয়ে অনবরত বাতাস বয়ে যেতে থাকল। চারদিকে সিন্ধু মরুভূমি হওয়ায় বাতাসের তাপ ১১০ ডিগ্রি থেকে ১২০ ডিগ্রিতে উঠে যায়। সারাক্ষণ ধুলা উড়ে আমার সেলের মধ্যে আসতে থাকে। শরীরের ঘামের সঙ্গে ধুলা মিশে আঠালো হয়ে যায়। সারা গায়ে বালি কিচকিচ করে।

আমার শরীরের চামড়া ফেটে ফেটে গেল, চামড়া যেন খোসা খোসা হয়ে গেছে। মুখে আরো ফোস্কার পড়তে থাকল। সেই ফোস্কার উপর যখন ঘাম ঝরে তখন মনে হয় এসিড এসে পড়েছে। আমার চুল বেশ মোটা। সেই চুলগুলোতে হাত দিলেই দেখা যায় হাতের সঙ্গে উঠে এসেছে। আমার কাছে কোনো আয়না নেই। কিন্তু হাতের আঙুল দিয়েই আমি মাথার চামড়া অনুভব করতে পারি। ভেজা ভেজা, ধুলিকনা ভরা। প্রতিদিন সকালে উঠে দেখি বালিশের উপর থোকা ধরা চুল পড়ে আছে।

সেলের ভেতরে দখলদার সেনাবাহিনীর মত যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। ফড়িং, মশা, ভেজা মাছি, মৌমাছি। সারাক্ষণ আমার মুখের উপর ভনভন করতে থাকে। পা বেয়ে ওঠে। আমি হাত নেড়ে ওগুলো তাড়াতে চেষ্টা করি। কিন্তু মাঝে মাঝে সংখ্যায় এত বেশি হয় যে চেষ্টায় কোনো কাজ হয় না। পোকামাকড় উঠে আসে মেঝের ফাটল দিয়ে। লোহার শিকের খোলা অংশ দিয়ে। বড়বড় কালো পিপড়া, তেলাপোকাও ঢুকে পড়ে। দলা বেধে ছোট লাল পিপড়া আসে। আসে মাকড়শা। আমি রাতে চাদর টেনে মুড়ি দিয়ে রাখি ওদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। যখন প্রচণ্ড গরমে আর দম নিতে পারি না তখন চাদর কিছুক্ষনের জন্য সরিয়ে ফেলি।

পানি! আমি স্বপ্ন দেখতে থাকি ঠাণ্ডা পরিস্কার পানির। জেলখানায় আমাকে পান করার জন্য যে পানি দেয়া হয় তা ঘোলা অথবা হলুদ রঙের। ওই পানি দিয়ে পচা ডিমের গন্ধ আসে। স্বাদেও পানির মত মনে হয় না। তৃষ্ণা মেটে না। কিন্তু জেলের কর্তৃপক্ষ আমাকে

www.pathagar.com

টাটকা ও পরিস্কার পানি খেতে দেয় না। মুজিব ছিলেন একজন আইনজীবি। তিনি ছিলেন প্রতিবেশি। আমাকে পানি পাঠান। জেল সুপারেনটেনডেন্ট আমাকে সেই পানি না দিয়ে বললেন, 'এটা আপনার ভালোর জন্য। এরা হল আপনার শত্রু। আপনার দলের নেতারাই আপনাকে তাদের পথ থেকে সরিয়ে দিতে চায়।' আরেকদিন মুজিব আমার জন্য কিছু কমলা পাঠান। জেল সুপারেনটেনডেন্ট তা নিজে খেয়ে ফেললেন। বললেন, এটা আপনার নিরাপত্তার জন্যই। সে হয়তো এই কমলার মধ্যে বিষ ইনজেক্ট করে দিয়েছে।' একেবারে ছেলে মানুষী নাটক।

জেল কর্তৃপক্ষের একজনকে আমি বললাম, 'আপনি কি দয়া করে আমাকে একটি ইনসেক্ট স্প্রের ব্যবস্থা করতে পারেন?'

তিনি বললেন, 'না না। ওগুলোতে বিষ আছে। আপনার কোনো ক্ষতি হোক আমরা চাই না।'

তারা এত বিষ বিষ করছে কেন? হঠাৎ আমার মনে হল তারা আমার মাথায় আত্মহত্যার কথা ঢুকিয়ে দিতে চাইছে। তাতে জনগণের কাছ থেকে কী সুবিধা পাবে আমার মৃত্যুর ঘোষণায়? সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এর প্রমান পেলাম অচিরেই। শক্তিশালী ডিটারজেন্ট এক বোতল ফিনাইল আমার সেলের কাছে রেখে দেয়া হল। বোতলের গায়ে বিপদজনিত সংকেত মাথার খুলি এবং ক্রস করা হাড়। যে মহিলা প্রতি সপ্তাহে জেল সুপারেনটেনডেন্টের সফরের সময় পরিস্কার করতে আসে জেল সুপারেনটেনডেন্ট তার উদ্দেশে উচ্চস্বরে বললেন, ' ওটা তার হাতের কাছে রেখ না। তোমার চোখের সামনে থেকে ওটা যাতে সরাতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখ। তিনি কিন্তু ওটা পান করে সব সমস্যার ইতি টানতে পারেন।' কিন্তু দেখা গেছে বোতল যেখানে আছে সেখানেই রয়ে গেছে।

তারা কি আমার মন নিয়ে খেলা করছে? আমি কানে আবার সমস্যা উপলব্ধি করতে থাকলাম। ঘাম এবং ধুলায় আমার দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলো তীব্রতর হতে থাকল। কিন্তু জেলখানার ডাক্তার বলতে থাকলেন কোনো সমস্যা নেই। তিনি আমাকে শান্ত করার জন্য বললেন, 'আপনার নিঃসঙ্গ বন্দীত্ব এই সমস্যাগুলোর সৃষ্টি করছে। আপনার মত অবস্থায় অনেকেই যন্ত্রনা এবং বেদনা বোধ করে যা আসলে নেই।' আমি তাকে কিছু কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করলাম। রাত দিন যে দুর্বিসহ অবস্থা, হয়তো সেটাই আমাকে বেদনার অনুভূতি দেয়।

২৩ মে করাচি জেলখানা থেকে মা আমাকে চিঠি লিখলেন। তিনি আমাকে গরম থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় লিখে পাঠালেন। 'প্রিয়তম পিঙ্কি, গরম থেকে রক্ষা পেতে আমি প্রতিদিন গায়ে তিন থেকে চারবার পানি ঢেলে থাকি। তুমিও তা করতে পার। প্রথমে আমি মাথাটা বেধে ফেলি। তারপর গলা বা ঘাড়ে কয়েক মগ ভরে পানি ঢেলে দেই। এরপর আমি আমার মাথার তালুতে পানি ঢালি। এবং পরে সারা গায়ের কাপড় পানি দিয়ে ভিজিয়ে ফেলি। তারপর আমি বিছানায় ফ্যানের নিচে বসি। কাপড় না শুকানো পর্যন্ত এতে বেশ ঠাণ্ডা অনুভব হয়। দেখা যায় কাপড় শুকানোর পরও কতক্ষন ঠাণ্ডা থাকা যায়। এইপদ্ধতি প্রয়োগ করলে তুমি অন্তত গুমোট গরম থেকে রক্ষা পাবে। মন্দা কথা এটা খাটি ব্যবস্থা। আমি এই ব্যবস্থায় বিশ্বাস করি...তোমার জন্য ভালোবাসা রইল, তোমার মা।'

মার এই উপদেশ আমি অনুসরণ করলাম। সকালে পুরো বালতির পানি মাথায়

www.pathagar.com

ঢাললাম। সুক্কুর করাচির চেয়ে অনেক উষ্ণ এলাকা। তাছাড়া আমার সেলে কোনো ফ্যানও ছিল না। কিন্তু গরম বাতাসে যতক্ষন আমার পোষাক শুকাতে সময় নিত ততক্ষন আমি আরাম বোধ করতাম। সঙ্গে এটাও বুঝতে পারতাম আমার কানে পানি ঢুকে ইনফেকশন বাড়িয়ে দিচ্ছে। জেলখানার ডাক্তারও একইভাবে বলতে থাকল'এটা আপনার কল্পনা।' এই ডাক্তার কোনো স্পেশালিষ্ট ছিল না। আমার আর কোনোদিন জানা হয়নি এই ডাক্তার ইচ্ছাকৃত এমন বলত নাকি অজ্ঞতাবশত।

জায়গায় দাঁড়িয়ে ২৫০ বার পা দৌড় দেয়া, চল্লিশবার নিচু হয়ে ব্যায়াম করা, হাত পা সুইম করানো, কুড়িবার গভীরভাবে নিশ্বাস গ্রহণ, পত্রিকা পাঠ এসব করতে থাকলাম। মা আর আমার ছিনতাইয়ে জড়িত থাকার গল্পে কান দেয়া থেকে বিরত থাকলাম। এর বদলে এমব্রয়ডারি কাজ করতে থাকলাম। জনাব মুজিব এবং তার স্ত্রী আলমাস আমাকে কাপড়, সুই, সুতা এবং একটি প্যাটার্ন বই পাঠিয়েছিলেন।

মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে নোটবইতে লিখলাম 'আমি একটি ট্রলির কাপড় এবং চারটি রুমাল তৈরী করে ফেলেছি। যখন আমি অবসরে তখন আমি নানা কিছু সেলাই করতে পারি। এবং তাই করেছি জেলখানায় বসে। আরেকটা ছোট্ট বিষয় হল সেলাইয়ের সয়ম খুব সুদূরপ্রসারী চিন্তা করা যায় না। অধিকন্তু এই নিঃসঙ্গ বন্দী দশায় কিছু একটা করা উপলক্ষে মনোনিবেশ করা যায়।

আমি নিজের সঙ্গে জোর করে প্রতিদিন অন্তত এক ঘন্টা ডায়েরি লেখা শুরু করলাম। মে মাসের ১১ তারিখে আমি নোট বইতে লিখলাম, 'ফ্রাঁসোয়া মিতেঁরা ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় তিনিই ফ্রান্সের প্রথম স্যোসালিস্ট প্রেসিডেন্ট। অ্যাঙলো আমেরিকান প্রচারমাধ্যম প্রচণ্ড রকমের এন্টি গিসকার্ড প্রচারে নেমেছে। এই নির্বাচন ইউরোপের রাজনীতিতে একটি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনবে। স্যোসালিষ্ট পলিসি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ফ্রান্স একটি বড় রকমের ঝামেলায় পড়ে যেতে পারে। ফ্রান্সের ফলে তার আক্রমণাত্মক পররাস্ট্রনীতি থেকে ছিটকে পড়তে পারে। আরব এবং আফ্রিকার দেশগুলোতে ফ্রান্সের যে প্রভাব রয়েছে তা পরিপূর্ণ করবে কে? ফ্রান্স এবং জার্মানির মধ্যে 'টেকনোক্র্যাট' 'বন্ধুত্ব'র অংশিদারমূলক সম্পর্ক রক্ষা পাবে কী করে? ইটালীর ব্যাপারে কী হবে?

একই দিনে আমি নোট করলাম আয়ারল্যাণ্ডের ভীন্ন মতাবলম্বী ববি স্যাণ্ডস এর মৃত্যুর কথা। '৬৬ দিন অনশন ধর্মঘট করার পর ববি স্যাণ্ডস ব্রিটেনের একটি কারাগারে মৃত্যুবরণ করে। ব্রিটিশদের চোখে ববি স্যাণ্ডস একজন সন্ত্রাসী। কিন্তু তার দেশবাসীর চোখে ববি স্যাণ্ডস রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকারের জন্য যুদ্ধ করেছেন। এটাই দুনিয়ার নিয়ম।' মাঝে মাঝেই আমি কিছুই লিখি না। এমনিতেই না লিখেই দিন পার করে দেই। জুন মাসের ৮ তারিখে আমি নিজেকেই ভর্ৎসনা করে লিখলাম, 'বেশ কয়েকদিন আমি ঠিক মত লিখি নাই। পত্রিকায় লেখার কিছু নেই এই প্রবোধ ধোপে টেকে না। কারণ প্রতিদিনের পত্রিকা থেকে কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে টুকে রাখা যায়। লেখা চালিয়ে না গেলে যে কেউ তার অভিব্যক্তিগুলো হারিয়ে ফেলতে পারে। শব্দ এবং বাক্যগুলো নষ্ট হতে পারে এবং চিন্তার বহিঃপ্রকাশে অসুবিধা দেখা দিতে পারে।'

ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে আমি একটি নিজস্ব কায়দা তৈরী করলাম। ১১ জুন আমি

www.pathagar.com

লিখলাম, ' দিনের বা সপ্তাহের প্রতি ঘণ্টা ধীরতর হচ্ছে । অ্যাডজাস্ট শব্দটি :
আমি ঘৃণ্য জায়গাটির ক্ষেত্রে অ্যাডজাস্ট শব্দটি ব্যবহারকরতে পারি না ।
রকমে কুলিয়ে উঠছি মাত্র । প্রতিটি সময়কে টেনে আনছি, তা পেছনে ফেলে য
আমাকে এই অগ্নি পরিক্ষায় সহায়তা করছে । তার সাহায্য ছাড়া আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম ।'

জুন মাসের ১২ তারিখ সুক্কুর জেলখানায় ডিটেনশন শেষ হল । আমার কোনো ধারণাই ছিল না আমি মুক্ত হবো নাকি ডিটেনশন আরো দীর্ঘায়িত হবে । নাকি আমাকে ফাসি কাষ্ঠে ঝোলানো হবে । নোট বইতে আমি লিখলাম, মৃত্যু এদিন আসবেই, সেজন্য আমি ভীত নই । শাসক পশুরা একজনকে শেষ করতে পারে কিন্তু তারা ধারণাকে শেষ করতে পারবে না । গণতন্ত্রের ধারণা বেঁচে থাকবে । এবং গণতন্ত্রের অপরিহার্য বিজয়ের মধ্যে দিয়ে আবার আমরা বেঁচে থাকব । হয়তো বেঁচে থাকব না, কিন্তু অন্তত পক্ষে এই বিষন্ন নিঃসঙ্গ বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাব । '

যেদিন আমার ডিটেনশন শেষ হল সেদিন ১১টার সময় ডেপুটিমার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটররের কাছ থেকে নির্দেশ এল । তিনি লিখেছেন নতুন করে ডিটেনশন দিতে পেরে তিনি আনন্দিত । ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সুক্কুর কারাগারে আমাকে অবরুদ্ধ রাখা বর্ধিত করা হল ।

২১ জুন, আমার ২৮ তম জন্মবার্ষিকী । সুক্কুর কারাগার ।

আমার বোন সনমঃ

তার জন্মদিনে আমাকে দেখা করার অনুমতি দেয়া হয় । তখন সে তৃতীয় দফা ডিটেনশন খাটছে । করাচি থেকে আমার ফ্লাইটটি বিলম্ব হয় । যার ফলে তাকে দেখার জন্য আমার হাতে মাত্র এক ঘণ্টা সময় থাকে । আমি তার সেলে পৌছেইচিৎকার করে কাঁদতে থাকি । আমি ভীষণ রকমের হতাশ হয়ে পড়েছিলাম । আমাকে বারবার তল্লাশী করা হচ্ছিল । জেলখানার মেট্রন আমার চুলে পর্যন্ত তল্লাশী চালালো । সে সময় আমার চুল ছিল খুবই ছোট । তারা আমার ব্যাগ খালি করে তল্লাশী চালালো । আমার সঙ্গে একটি কসমোপলিটান ম্যাগাজিন ছিল । সেই ম্যাগাজিনের প্রতিটি পাতা তারা উল্টিয়ে দেখল । ম্যাগাজিনটি আমি আমার বোনের জন্য এনেছিলাম । আমি কিছু খাবার নিয়ে এসেছিলাম । তারা সেগুলো আমাকে দিয়ে খাইয়ে পরিক্ষা করল ওর ভেতরে কোনো বিষ আছে কি না । জেল খানার দেয়াল থেকে সেল পর্যন্ত চারটি দরজা । জেলার ধীরে ধীরে একটি একটি করে দরোজা খুলছে এবং সেটিতে ঢুকে আবার তালা দিচ্ছে । আমি অস্থির হয়ে আছি । প্রতিবাদ করে বললাম, 'আমিতো তার সঙ্গে দেখা করার কোনো সময়ই পাব না । ' তারা ওর জন্মদিনেও হতাশ করতে চাইল ।

আমাকে দেখেই সে এমন আচরণ করল যে সে একজন উদার গৃহী আর আমি সম্মানীত কোনো অতিথি । ওইদিন তার এক বন্ধু তারজন্য কিছু কমলা পাঠিয়েছে । সে আমাকে একটি খেতে দিল । ক্ষমা চেয়ে বলল তার কাছে কোনো প্লেট নেই বা ছিলে দেয়ার জন্য কোনো চাকু নেই । হেসে বলল, 'ওরা ভয় পায় যে আমি আমার কব্জির রগ কেটে ফেলতে পারি । '

আমার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হল । আমি কাঁদছি আর তাকে আমার ফ্লাইটের বিলম্ব হওয়ার কথা বর্ণনা করছি, আর সে এই সুক্কুর জেলের অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে থেকেও কোনো অভিযোগ করছে না । তাকে ভীষন অসস্থি দেখাচ্ছে । একেবারে চর্মসার হয়ে গেছে । আমি

আতঙ্কিত চোখে দেখলাম তার চুল একেবারে পাতলা হয়ে গেছে। আমি স্পষ্ট তার মাথার চামড়া দেখতে পাই!

সে বলল, ' আমাকে গল্প বল। ' যেন আমরা আমাদের বাড়ির বিছানায় বসে আছি। তাকে কিছু জরুরি কথা বলা আমার খুব প্রয়োজন। কিন্তু বিশাল দেহেরএক পুলিশ খোলা শিকের গারদের পাশেই বসে আছে। আমাদের আলোচনার প্রতিটি শব্দ শুনছে। বিছানা ছাড়া বসার আর কোনো জায়গা নেই। আমি বিছানা তার খুবই কাছে কাত হয়ে শুয়ে পড়লাম। ফিসফিস করে বললাম, 'নাসির আমাকে বিয়ে করতে চায়। '

এজন পুরুষ পুলিশ বলল, ' এই, তাদেরকে ফিস ফিস করে কথা বলতে দিও না!'

মহিলা পুলিশ আমাদের অতি কাছে চলে এল। আমার বোন বলল, 'আহ সানি, চমৎকার খবর। শুনে ভারী খুশি হলাম। '

পুলিশ মহিলা খুব কাছে থেকে আমাদের দু' বোনকে নিরিক্ষা করছে। আমি শান্তস্বরে বোনকে বললাম, 'তুমি আর মা জেলে থাকতে আমি বিয়ে করতে পারি না। আমি নাসেরকে বলেছি যতক্ষন আমার পরিবার আমার কাছে ফিরে না আসে ততক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। '

পিঙ্কি বলল, 'শুধু এ কারণে তোমার অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। কে জানে আমরা কবে জেল থেকে বের হবো? তুমি একা বাস করছ এ নিয়েওতো আমরা দু'জনই চিন্তিত। বরং স্বামী কাছে থাকলে তুমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারবে। আমরাও তোমার ব্যাপারে অনেকটা নিরাপদ বোধ করব। '

আমি তার গলা জড়িয়ে ধরে বললাম, 'পিঙ্কি, তুমি এভাবে কেন ভাবছ?'

পুলিশ লোকটি সাথে সাথে চিৎকার করে উঠল। 'না! না!'

পুলিশ মহিলা এসে আমাদের টেনে সরিয়ে দিল। ওকে আলাদা করার জন্য ওর পা দুটো বিছানায় তুলে দিল।

পিঙ্কি বলল, বিশ্বাস করুন, আমরা কোনো রাজনীতির আলোচনা করছি না। আমরা শুধু আমাদের পরিবারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। আমি কয়েক মাস ধরে আমার বোনকে দেখি না। আজ আমার জন্মদিন। আমরা কী একটু প্রাইভেসি পেতে পারি না?

পুলিশ তার কথায় কোনা কান দিল না। ঘচঘচ করে লিখতে থাকল আমাদের আলাপচারিতার কথা। ওই এক ঘণ্টার বাকী সময়টা মহিলা পুলিশ আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। আমি যখন তাকেওই ভয়ঙ্কর মানুষগুলোর মধ্যে খালি কক্ষে আটকা অবস্থায় রেখে চলে আসি তখন আবার আমার ডুকড়ে কান্না আসে। সে পেছন থেকে বলল, 'আমি তোমার আর নাসেরের সুখী জীবন কামনা করছি। '

পুলিশ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি কোনোরকমে পেছন ফিরে বললাম, 'হ্যাপি বার্থ ডে পিঙ্কি!'

প্রেরক
বেনজির ভুট্টো
সুক্কুর সেন্ট্রাল জেল

বেগম নুসরাত ভুট্টো
করাচি সেন্ট্রাল জেল
জুন, ১৯৮১

www.pathagar.com

মা মনি

এ সময়ে এটা নিয়ে তোমাকে দ্বিতীয়বার চিঠি লিখছি তোমার জন্মদিনকে সামনে রেখে। আমার স্মৃতি আমাকে নিয়ে গেছে সেই সময়ে। ইংল্যাণ্ডের ডাক্তার আমাদের সেই সুখের খবরটি জানালেন। তখন তোমার বাবা ইংল্যাণ্ডে পড়াশুনা করছেন। ডাক্তার জানালেন আমি অন্তসত্ত্বা। আহা! কী উত্তেজিত, কী আনন্দিতই না হয়েছিলাম আমরা! তুমি ছিলে আমাদের প্রথম সন্তান, প্রথম ভালোবাসা। আমরা কী রকম আনন্দ করেছিলাম এই খবরে! করাচির পিন্টো হাসপাতালে আমার ঘুম হতো না। আমি সারাক্ষণ তোমাকে কোলে কোলে রাখতে চাইতাম। সারাক্ষণ আমি তাকিয়ে থাকতাম তোমার দিকে। তোমার কী সুন্দর থোকা থোকা চুল, গোলাপি মুখটা। লম্বা লম্বা নখ সম্বলিত সুন্দর হাত। আমার মনটা যে নেচে উঠত তোমাকে দেখতে দেখতে।

তোমার বাবা যখন ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এলেন তখন তোমার বয়স তিন মাস। তিনি তখন তার মা বাবার সামনে লজ্জা পাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন আমরা একা হলাম তখন তিনি তোমার দিকে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকলেন। তারপর তোমার হাত ও মুখ ছুয়ে দেখলেন। এমন মিষ্টি শিশু পেয়ে তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তিনি জানতে চাইলেন তোমাকে কোলে নেবেন কীভাবে? আমি তোমাকে তুলে তার কোলে দিলাম। বললাম, 'একটা হাত ওর মাথার নিচ দিয়ে রাখুন আর বাকি হাত দিয়ে শরীরের নিচ দিয়ে ধরুন।' তিনি বললেন তুমি দেখতে ঠিক তার মত। কীযে পুলকিত হয়েছিলেন তিনি! দুই বাহু দিয়ে তোমাকে ধরে তিনি ঘরে ঘুরতে লাগলেন- আমি আর বর্ণনা করতে পারছি না। আমার চোখ ভিজে উঠছে সেই সোনালী দিনগুলোর কথা মনে পড়ায়।

প্রথম সেই দিনটির কথা আমার মনে আছে যেদিন তুমি প্রথম পা ফেলে হেঁটেছিলে। তখন তোমার বয়স মাত্র দশ মাস। আমার মনে আছে যে দিন তুমি প্রথম কথা বলে উঠেছিলে। কোয়েটায় তোমার প্রথম জন্মদিনের কয়েক সপ্তাহ আগে। সেই দিনের কথা, যেদিন তোমাকে আমি নার্সারি স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলাম। তখন তোমার বয়স তিন বছর ছ'মাস। তোমার ছোট সেই স্কুল ড্রেসটি আমি গভীর দরদ দিয়ে নিজে সেলাই করেছিলাম, তাতে এমব্রয়ডারি করেছিলাম। প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ পড়ে তোমার সুখ, শান্তি কামনা করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম।

এই তো জুন মাসের ২১ তারিখ চলে এল। আমি তোমাকে শুভ জন্মদিন জানাচ্ছি। অনেক অনেক দিন তুমি বেঁচে থাক। আমি তোমাকে কোনো উপহার দিতে পারছি না। এমনকি একটি ছোট চুমোও না। আমরা আরও নব্বই দিন আটকে থাকব। .... আমি আশা করি মা, তুমি ঠিকভাবে খাওয়া দাওয়া করবে। বেশি করে পানি খাবে। ফল এবং তরকারি খেতে ভুলবে না কিন্তু। তোমার ভবিষ্যত কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

তোমার প্রিয় মা।

ফল এবং তরকারি। পানি। মায়ের কাছ থেকে কী সুন্দর চিন্তা। মায়ের জন্য আমার ভীষণ কষ্ট হল। নতুন ডিটেনশনের আদেশ হয়েছে। আর কতদিন তারা মাকে এমন ভোগাবে?

আমার নিজের ডিটেনশনকে 'এ' শ্রেনীতে উন্নীত করা হয়েছে। আমাকে রেডিও, টেলিভিশন সেট, ফ্রিজ দেয়ার কথা। আমি কল্পনা করলাম ঠাণ্ডা, বিশুদ্ধ পানির। এয়ার কণ্ডিশনের। আমি সাময়িকভাবে পুলকিত হলাম। যদিও খোলা সেলটিতে এয়ার কন্ডিশন

কীভাবে ব্যবহার করবে তা মাথায় এল না। এ নিয়ে আমার আর ভাবা দরকার পড়ল না। এ শ্রেনীতে উন্নীত করার একটি সুবিধাই আমাকে দেয়া হল। তাহল আমি রাতে কক্ষের বাইরে হাঁটাহাঁটি করতে পারব। কিন্তু তা দীর্ঘায়িত হল না। জেল সুপার এসে এমন ভাব করল যেন আমাকে বিশাল কোনো উপহার দেয়া হয়ে গেছে। তিনি আমাকে সেলে তালা দিতে চাইলেন। জেল সুপারের কছে আমি লিখলাম, 'আমি আপনারদেয়া 'এ' শ্রেণতিে উন্নীত করা প্রত্যাখ্যান করছি। আমি আপনার মিথ্যাচারে সামিল হতে পারি না।'

আমি মুক্তির স্বপ্ন দেখতে থাকলাম। আমি ভাবি অক্সফোর্ডের সোরবনে রেষ্টুরেন্টে বসে মাংস আর মাশরুম খাবার কথা। ভাবি নিউ ইংল্যাণ্ডে বসে অ্যাপেল রস খাবার কথা, ভাবি ব্রিগহ্যামে বসে আইসক্রীম খাবার কথা। আমার বাবা তার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সেলে বসে কারো যাদু মন্ত্রের কথা ভাবতেন। আমি চিন্তা করতাম ইয়লান্ডা কদ্রস্কির কথা। সে র‍্যাডক্লিফে আমার রুমমেট ছিল। শেষবার আমি তার কথা শুনেছি সে ম্যাসাচুসেটসে ইকোনোমিষ্ট হিসাবে কাজ করছে। আমি পিটার গলব্রেথের কথা ভাবি। সে ওয়াশিংটনে সিনেট ফরেইন রিলেশন কমিটিতে কাজ করছে। বিয়ে করেছে আমার আরেক বান্ধবী আনে ও লিয়েরিকে। আমিই তাদেরকে হাভার্ডে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। সময় আমার কানের কাছে গুনগুন করে। আমার বাবা জেলখানায় বসে আমাকে বলেছিলেন'এই সময় অতিক্রান্ত হবে। সবচেয়ে বড় কথা এই সময়কে আমরা সম্মানের সঙ্গে পার করছি।'

বাবার এই সহিষ্ণুতা আমার নেই। আমার প্রয়োজন ওখান থেকে বের হওয়া। শুধুবের হওয়া। সানি আমাকে বলেছে সিন্ধুর মার্শাল ল' এডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেল আব্বাসি বলেছেন সরকার চায় শারীরিকভাবে, নৈতিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে আমাদের ধ্বংস করে দিতে। সম্প্রতি মে মাসে তারা একটি ফাইল স্যুটকরেছে আমাদের ক্লিফটন ৭০ বাড়ি, আল মুর্তাজা এবং আমাদের জমি নিলামে বিক্রি করে দেয়ার জন্য। কী ঘটছিল আমার কোনো ধারণাই ছিল না। আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে কি ফিরে যাওয়ার মত কোনো বাড়ি আমার থাকবে। আমি কী নিজের বিছানায় ঘুমাতে পারব? প্রচণ্ডে গরমে আমি নিজেকে কল্পনায় নিয়ে যাই ৭০ ক্লিফটন অথবা আল মুর্তাজায়। এসময় আমার কেন যেন আমার মনে হল শারীরিকভাবে আমার উপস্থিতিতে সরকার আমার বাড়ি ঘর দখল করতে পারবে না। এসময় আমি তাদেরকে বারবার অনুরোধ জানাই, তারা বারবার অস্বীকার করে। ওরা বলে, 'আমরা আপনার জন্য প্রচুর প্রহরীর ব্যবস্থা করতে পারি না।' ভাবটা এমন যে একজন মহিলাকে পাহাড়া দিতে পুরো রেজিমেন্ট দরকার।

জেল সুপারেনটেনডেন্ট আমার মনোবল ভেঙে দিতে নতুন পন্থা অবলম্বন করলেন। বললেন, আপনার দলের নেতারা আপনাকে ত্যাগ করেছে। আমাকে তিনি গল্প শোনালেন যে পিপিপির নেতারা অন্য বিরোধী দল, এমনকি সরকারের সঙ্গে মিটিং করেছেন। তিনি বললেন, 'তারা আপনাকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আপনি কেন আপনার জীবন এই জেলখানার ভেতরে নষ্ট করবেন? আপনি রাজনীতি ত্যাগ করার ঘোষণা দিলেই আপনার সমস্ত ঝামেলা দূর হয়ে যাবে।'

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম যাতে তিনি আমাকে শক্তি দেন। আমি জেল সুপারেনটেনডেন্ট বললাম, যদি একা স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হয় তাহলে তাই করব। আমি আপনার মিথ্যাচারে বিশ্বাস করি না। সবাই আত্মসমর্পন করলেও আমি করব

www.pathagar.com

না।' আমি পিপিপি নেতাদের ব্যাপারে বিশ্বাস করি নাই যে গত জুনে যারা মুক্তি পেয়েছেন তারা দল ত্যাগ করবেন। আমি নিজের ভেতরে এই বিশ্বাস আনতে পারিনি।

আমি আল্লাহর কাছে বিশেষ প্রার্থনা শুরু করলাম। জেলখানার একজন মেট্রন আমাকে এই বিশেষ প্রার্থনার কথা বলেছেন। কোরান শরীফের ১১২ তম সুরার কিছু অংশ ৪১ বার করে পড়তে হবে। 'কুলহুয়া আল্লাহু আহাদ..বল তিনিই একমাত্র প্রভু।' এরপর একটি মগের পানিতে ফু দিয়ে সেই পানি সেলের চারদিকে ছিটিয়ে দেই। এবং আমি প্রত্যেক বন্দির জন্য দোয়া করি। আমার মায়ের জন্য দোয়া করি। নিজের জন্য প্রার্থনা করি। চতুর্থ বুধবারে জেলখানার মেট্রন এসে আমাকে জানালেন যে শীঘ্রই জেলের দরোজা খোলা হবে। এবং তাই হল।

চতুর্থ মাসের চতুর্থ বুধবার জেল কর্তৃপক্ষ জেলের তালা খুলে আমাকে অল্প সময়ের জন্য করাচি নিয়ে গেল মায়ের সঙ্গে দেখা করাতে। চার বুধবারের এই ধর্মীয় নিয়ম পালনের পর মায়ের জেলগেটের দরোজা খুলে গেল। জুলাই মাসে রক্তবমি হওয়ার পর মা'কে ডিটেনশন থেকে মুক্তি দেয়া হল। জেল ডাক্তাররা পরিক্ষা করে বলেছেন মা'র আলসার হয়েছে। তিনি ভয়ঙ্কর কাশিতে ভুগছিলেন। ডাক্তাররাও ধারণা করলেন মা'র টিবি হয়েছে।

মার শারীরিক অবস্থার খবর আমি কিছুই জানতাম না। শুধু মেট্রনের কাছ থেকে জানতে পেলাম মায়ের মুক্তির কথা। আমার প্রার্থনা কাজ দিয়েছে দেখে আমি সুক্কুর জেলে চতুর্গুন মাত্রায় প্রার্থনা বাড়িয়ে দিলাম। অন্যান্য দোয়াদরুদও পড়তে থাকলাম। প্রার্থনা করি আমার সেলের চারদিকে পানি ছিটিয়ে দেই। বন্দীদের জন্য দোয়া করি, আমার নিজের জন্য দোয়া করি। আল্লাহু সামাদ- আল্লাহ চিরন্তন। আগস্ট মাসের চতুর্থ বুধবার আমার সেলটির তালা আবার খোলা হল। মেট্রন বললেন, আপনি ছাড়া পাচ্ছেন। আমি আমার জিনিসপত্র সব এক জায়গায় করলাম। আল্লাহকে বললাম, আল্লাহ, আমি যেন ৭০ ক্লিফটনে যেতে পারি।

সেনাবাহিনী এবং পুলিশের বহর আমাকে ৭০ ক্লিফটনে নিল না। বরং আমাকে নিয়ে বন্দি করা হল করাচি সেন্ট্রাল জেলের সেই সেলটিতে যেখানে মা'কে রাখা হয়েছিল।

www.pathagar.com

৯

করাচি সেন্ট্রাল জেলের সেই সেলে যেখানে মা ছিলেন

আগষ্ট ১৫, ১৯৮১ ।

সিমেন্ট খসে পড়েছে । লোহার শিক । চারদিকে রম নিস্তব্ধতা । আবার আমি ভয়ঙ্কর রকমের একাকিত্বে পড়ে গেলাম । আমার চারপাশের সেলগুলো সব ফাঁকা । মানুষের গলার আওয়াজ পাবার জন্য আমি উতলা হয়ে রইলাম । কিন্তু শুধুই নিস্তব্ধতা ।

করাচির সেল যেমন ভেজা ভেজা তেমনি ভ্যাপসা, গুমোট । সিলিংফ্যানেও কোনো পরিত্রান নেই । বারবার বিদ্যুত চলে যায় । প্রতিদিনই বিদ্যুত যায় । কখনো কখনো তিন ঘন্টা বা তারও বেশি সময় ধরে বিদ্যুত থাকে না । জেল কর্তৃপক্ষ বলে এটা প্রধান পাওয়ার স্টেশন থেকে হয় । কিন্তু আমি জানি কথাটা সত্যি না । রাতে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি অন্যান্য সেলে বিদ্যুত আছে । শুধু আমার সেলের ব্লকটি অন্ধকারে ঢাকা ।

কর্তৃপক্ষ আমাকে প্রথম শ্রেনীর বন্দির মর্যাদা দিয়েছে বলে দাবী করছে কিন্তু আমি তার কোনো সুবিধা পাই না । সেলের ডান পাশের এবং বাম পাশের কক্ষ দুটিও আমার হওয়ার কথা । একটি বসার জন্য আরেকটি রান্না ঘর । কিন্তু ওই দুটো একেবারেই খালি এবং বন্ধ থাকে । যে সেলটিতে আমাকে থাকতে দেয়া হয়েছে তা যেমন ছোট তেমনি নোংরা । টয়লেটে কোনো ফ্লাশ নেই এবং থোকা থোকা মাছি ও জলের পোকায় পরিপূর্ণ । জেলের বারান্দার পাশ দিয়ে যে নর্দমা চলে গেছে তার দুর্গন্ধ ভেসে আসে । পানি রাখার একমাত্র পাত্রটি পোকামাকড়ে ভরা ।

প্রতিদিন সকালে আমি চাবির ছড়ার আওয়াজ পাই । তালা খোলার শব্দ হয় । তখন বুঝতে পারি আমার খাবার নিয়ে আসা হয়েছে । কোনো কথা না বলেই ধুসর পোষাক পরিহিত জেলের মেট্রন খাবার দিয়ে যায় । মেট্রন সেলের থেকে দুরে এক কোনায় ঘুমায় । কর্তৃপক্ষ ৭০ ক্লিফটন থেকে আমার খাবার পরিবেশনের অনুমতি দিয়েছে । খেতে গিয়ে প্রথমে আমার গলা আটকে থাকে । খাবার খুলি । মা যত্ন করে ঘি দিয়ে ভাজা মুরগি, মাসরুম কাবাব, চিকেন শিক পাঠান । ক্ষুধা থাকলেও আমি খুব সামান্য মুখে দেই । আমাদের রান্নাঘরে মা কত যত্ন করে ওসব বানিয়েছেন তাই নিয়ে ভাবতে থাকি ।

www.pathagar.com

মা'কে নিয়ে আমি, ভীষন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। করাচি জেলে আসার দ্বিতীয় সপ্তাহে তাকে অনুমোদন দেয়া হয় আমার সঙ্গে সাক্ষাতের। মা শেষ পর্যন্ত বেঁচে আছেন দেখে আমার স্বস্তি হলেও তার চেহারা দেখে আমি ভীষন হতাশ হলাম। এ যেন আমার দেখা সেই মা নন। সেই আত্মবিশ্বাসী, অভিজাত মা নন। বিবর্ণ, উস্কোখুস্কো, সিথির মাঝখানের চুলগুলো ধুসর, চলাফেরায় কেমন নার্ভাস।

আমাকে তার পুরোনো সেলে বন্দি দেখে তার চোখ ভিজে উঠল। কিন্তু আমরা দু'জনই সাহসের সঙ্গে হাসতে চেষ্টা করলাম। আশপাশে জেলের রক্ষীরা ভীড় করে আছে। তারা খবরাখবর জানতে চায়। আমাদের ওদিকে লক্ষই থাকল না। মা নিচুস্বরে আমাকে বললেন তিনি কাশিতে পড়েছিলেন জেলে থাকতে। প্রথমে ভেবেছিলেন ধুলোবালি থেকে কাশ হয়েছে। পরে কাশির সঙ্গে রক্ত আসতে থাকে। ডাক্তার কয়েক দফা দেখার পর ধারণা করল যক্ষা হয়েছে। পরীক্ষা করে তা পাওয়া গেল। পাকিস্তানের অনেক মানুষেরই যক্ষা হয় লাঞ্জে অতিরিক্ত ধুলা প্রবেশ করার কারণে। অস্বাস্থ্যকর স্যানিটারি ব্যবস্থার জন্য তাদের টিবি সহ নানা ধরণের রোগ হয়ে থাকে। জলখানায় বন্দিরা মাঝে মাঝেই বমি করে থাকে। সেই বমি থেকে জেলখানার বাতাসে জীবানু ছড়িয়ে পড়ে।

মা আমাকে বললেন, তার ডাক্তাররা আরো খারাপ কিছু ধারণা করেছেন। মা'র তখনো একটি ব্রোঙ্কসকপি করার প্রয়োজন। যদিও তার শরীর খুবই দুর্বল। এমনকি ডাক্তাররা তার লাঞ্জ ক্যানসারের সম্ভাবনাকেও বাতিল করে দেননি। আমি মা'কে জড়িয়ে ধরলাম। চেষ্টা করলাম যেন আমার ভেঙে পড়া বুজতে না পারেন। শক্ত থাকতে চেষ্টা করলাম দুটি কারণে। মা ছাড়াও ওখানে রয়েছে জেলের লোকেরা। এবং আমি জানি তারা জেনারেল জিয়ার কাছে সবকিছু রিপোর্ট করবে।

আমি দৃঢ়কণ্ঠে মা'কে বলতে চেষ্টা করলাম, মা, হয়তো আপনার লাঞ্জ ক্যানসার না। ব্রঙ্কোস্কটির রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করুন।'

মা বললেন, 'ডাক্তার ভাবছেন সময়মতো চিকিৎসা হলে সেরে ওঠা সম্ভব। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে দেশের বাইরেও চিকিৎসা নিতে হতেপারে।'

'আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে যান। 'মা'কে বলে ফেললাম। কিন্তু আমার হৃদয়টা ভেঙে গেল মায়ের পাকিস্তানের বাইরে যাওয়ার চিন্তায়।

'কিন্তু তোমার কী হবে মা? তোমাকে এখানে ফেলে আমি যাই কী করে?'

আমি তাকে নিশ্চিত করলাম যে আমি ভাল আছি। আসলে আমি ভাল নেই।

মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের তিনদিন পর আমি বিছানায় শুয়ে সিলিং এর দিকে তাকিয়ে। হতাশা এবং বিস্ময়ে নিস্তেজ পড়ে আছি। ব্যায়াম করতে ইচ্ছা করছে না, পোষাক পাল্টাতে ইচ্ছা করছে না, উঠে পরিস্কার হতে ইচ্ছা করছে না। কিছু খেতে পারছি না। ভাবলাম, আল্লাহ, আমি আমার বাবাকে হারিয়েছি, এখন মা'কে হারাতে বসেছি। আমি জানি যে নিজে নিজেই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছি। কিন্তু মাথা থেকে কোনোক্রমেই দুঃশ্চিন্তা সরাতে পারছি না। মা আমাকে ভাল দু'টি সংবাদ শুনিয়েছেন। সনম এবং শাহ ওদের যার যার প্রেমিককে বিয়ে করছে আগামী সেপ্টেম্বরে। বাবা বন্দী থাকা অবস্থায় আমাদের সতর্ক করে বলেছিলেন কখনো নিজের জায়গা থেকে বিচ্যুত হবে না। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন 'যদি কখনো সিনেমায় যাও তাহলে বুরখা পরে যাবে।' এখন পরিবার একত্রিত হচ্ছে। যেন আমি

www.pathagar.com

স্থায়ীভাবে জেলখানায় বসবাস করছি সেই রকমভাবে। তারা এখন নিজেদের জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যেন আমি আর জীবিত নেই।

পানি ছাড়া কিছু না খেয়ে তিনদিন পর আমি ভীষন দুর্বল ও নিস্তেজ বোধ করলাম। আমার মাথার ভেতর থেকে বলে উঠল, জিয়ার হাতে পরাস্থ হয়ো না। পানির বালতি থেকে জোর করে এক মগ পানি খেলাম । বেশ একটু সতেজ বোধ করলাম। এরপর সংবাদপত্রে দেয়া ধাধা (পাজ্‌ল) মেলাতে চেষ্টা করলাম। মা আমাকে নিয়মিত সংবাদ পত্র পাঠান, কিন্তু বেশ কয়েকদিন তা ধরে দেখা হয়নি। সংবাদ পত্রের ছাপা অনেকটা ঝাপসা মনে হল। করাচি জেলখানায় স্থানান্তরের পর থেকেই আমি মাথা ধরা রোগের লক্ষণ অনুভব করেছি। দাঁত এবং দাতের মাড়িতে ব্যথা অনুভব করি। কানের সমস্যা তো আছেই। এছাড়া মাথার চুল পড়াও থামেনি।

পরে ডাক্তাররা আমাকে বলেছেন, শারীরিক সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছিল বডি সিস্টেমে ছন্দপতনের কারণে। তিনি আমাকে বলেছেন কর্ডিয়ভাসকুলার, মাসকুলার, ডাইজেসটিভ, রেস্পাইরেটরি এবং নার্ভাস সিস্টেমগুলোর প্রত্যেকটি খাদ্য থেকে নেয়া শক্তি গ্রহণ করে থাকে। বিষন্ন সময়ে নার্ভাস সিস্টেম অধিক সতর্ক হয়ে ওঠে এবং অন্যান্য সিস্টেমের কাছ থেকে অতিরিক্ত শক্তি গ্রহণ করে থাকে এবং সেগুলোকে দুর্বল করে দেয়। শরীরের মধ্যে হৃদপিণ্ডই সবচেয়ে বেশি আক্রমনের উপযোগি। এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় জেল খানা থেকে। দেখা যায় প্রচুর রাজনৈতিক বন্দি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। হয়তো আমরা মনোবলের দিক দিয়ে সবল থাকি, কিন্তু এর মূল্য দিতে হয় আমাদের শরীরকে। যার ফলে অনেক ধরণের অনিশ্চয়তার মধ্যে আমরা পড়ে থাকি।

সেপ্টেম্বর মাসের ১৩ তারিখে আমার ডিটেনশন শেষ হওয়ার কথা। দিনটি খুব দূরে নেই। বেশ কয়েকবার জেলখানার মেট্রন আমার কাছে ফিসফিস করে বলেছেন, তিনি শুনেছেন যে অতি শীঘ্রই রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়া হবে। ছিনতাইয়ের পর গ্রেফতার হওয়া মানুষগুলোকে যদি শাসকরা ছেড়ে দেয় তাহলে আমাকে ছাড়বে না কেন?

সংাদপত্রগুলো এখন আর আমার বা মা'র আল-জুলফিকারের সঙ্গে জড়িত থাকা নিয়ে আলোচনা করছে না। নির্যাতন এবং বানানো সাক্ষ্য প্রমানের পরও সরকার মিথ্যা কাহিনী রচনা করতে সামর্থ হয়নি যা বিশ্ব মতামতকে সরাতে পারে। জিয়া পশ্চিমা দেশের, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের অনুদানের ব্যাপারে কোনো ঝুকি নিতে পারে না। ১৯৭৯ সাল থেকে পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। তারা ধারণা করেছিল যে পাকিস্তান পারমাণবিক বোমা তৈরি করছে অথবা ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে। কার্টার প্রশাসন পরমাণু বিস্তার রোধ নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং পাকিস্তানের সাহায্য বন্ধ করে দেন। কিন্তু সেটা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান দখলের আগে। কিন্তু এরপর জিয়া খুব সফলভাবেই পাকিস্তানের সীমান্তে সোভিয়েত উপস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে পরমাণু বিষয়ে আমেরিকার উদ্বেগকে ঢেকে ফেলেছিলেন এবং অর্থ সাহায্য আদায় করেছেন। রিগ্যান প্রশাসন পাকিস্তানকে ৩.২ বিলিয়ন ডলার প্যাকেজ হিসাবে অর্থসাহায্য ও সামরিক উন্নয়নে সহায়তা দিয়েছে। এই সাহায্যের পরিমান ছিল কার্টার প্রশাসনের প্রস্তাবিত সাহায্যের দ্বিগুন। যুক্তরাষ্ট্র এছাড়াও দিয়েছে ৪০টিএফ ১৬ জঙ্গী বিমান যা জিয়ার কাছে ছিল একটি বড় চাওয়া। এই প্যাকেজ ১৯৮১ সালের হেমন্তে কংগ্রেসে উত্থাপিত হয়। জিয়ার কাছে

www.pathagar.com

এটি ছিল খুবই আকাঙ্খিত। কিন্তু আমরা যারা বিশ্বাস করি যে সোভিয়েত ইউনিয়নের হুমকীর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্টের এই আগ্রহ মানবাধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দ্বারা ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া উচিত, তাদের কাছে ছিল হতাশাজনক।

জিয়ার অবস্থান আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, চীন এমনকি জাতিসংঘ হাই কমিশন, ওয়ার্ল্ড ফুডপ্রোগ্রাম এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ত্রাণ প্রতিষ্ঠানের দেয়া রিফিউজিদের জন্য কোটি কোটি ডলার প্রাপ্তির মাধ্যমে। কিছু রিফিউজি হিন্দুকুশ পর্বতমালা দিয়ে স্মাগলারও ব্যবসায়ীদের মাধমে সীমান্ত পার হয়। পাকিস্তান থেকে যুদ্ধ করতে অথবা বিদ্রোহী মুজাহিদদের সঙ্গে যোগ দিতে। সে দেখে, দেখতে দেখতে লক্ষ লক্ষ রিফিউজি হয়ে যায়। রিফিউজি আশ্রয় কেন্দ্র, হাসপাতাল, স্কুল ও সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায়। যার ফলে পাকিস্তান সরকারের লোকেরা সাহায্যের যে স্রোত আসতে থাকে তা থেকে মুল অংশটা তুলে নেয়। জাতিসংঘের একজন কর্মকর্তা হিসাব করেছিলেন যে মাত্র এক তৃতীয়াংশ সাহায্য প্রকৃত রিফিউজিদের হাতে পৌছে। পরে আমি রিচার্ড রিভসের বই প্যাসেজ টু পেশোয়ার পড়েছি। যে অস্ত্র মুজাহিদীনদের কাছে পাঠানো হয় তাও পাকিস্তানের মাধ্যমে। যা জিয়া এবং তার লোকদের একটা অংশ রেখে দেয়ার সুযোগ করে দেয়। এছাড়া অস্ত্র বিক্রি থেকেও তারা মোটা অঙ্কের মিশন পেয়েছে। অন্য এক আমেরিকান সাংবাদিক পরে আমাকে বলেছেন, ওয়াশিংটন কর্মকর্তারা একমাত্র তাদের গন্তব্যে পৌছতে চায়।

আমার সন্দেহ ছিল যে আফগানিস্তানের যুদ্ধে পাকিস্তানের ভুমিকায় সিআইএ-র গভীর হাত রয়েছে। কিন্তু আমেরিকান জার্নালিষ্ট বব উডওয়ার্ডের বই ভেইল:দি সিক্রেট ওয়ার অফ দি সিআইএ না পড়া পর্যন্ত অনুধাবন করতে পারিনি যে জিয়াকে পরিচালনায় সিআইএ কতটা বিস্তৃত ছিল। মি. উডওয়ার্ড লিখেছেন, 'এমন অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কোনো শাসক কখনো দেশ পরিচালনা করেননি। সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল পাকিস্তান নিজেদের প্যারামিলিটারির দিয়ে আফগান বিদ্রোহীদের সহায়তা দানের জন্য সিআইএ-কে জিয়ার অনুমোদন দেয়ার আগ্রহ। সিআইএ পরিচালক ক্যাসে, রিগ্যান প্রশাসন সবাই চেয়েছে যে জিয়াই ক্ষমতায় টিকে থাকুক। শুধু তাদের প্রয়োজন ছিল তার সরকারের ভেতরে কী ঘটছে তার ওয়াকিবহাল থাকার। ইসলামাবাদে সিআইএ স্টেশন ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়।'

আমি বুঝতে পারিনি সিআইএ ডিরেক্টর ক্যাসের সঙ্গে জিয়ার পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতা কতটা। উডওয়ার্ড লিখেছেন, কংগ্রেস আমেরিকার ব্যবসার স্বার্থে বাইরে ঘুষ অথবা লেনদেন করাকে অবৈধ করেছে। কিন্তু ক্যাসে জানেন যে বিদেশের নেতাদের সঙ্গে লেনদেন করা বা অনুককূল্য দেখানো অথবা গোয়েন্দা সোর্স ব্যবহার বৈধ, যাকে বলে বৈধ ঘুষ। যেমন তিনি পাকিস্তানের জিয়ার কাছে বছরে একবার বা দুইবার সফরকে নিশ্চিত করেছেন। এরপর তিনি রিগ্যান প্রশাসনের মধ্যে জিয়ার সবচেয়ে কাছের মানুষে পরিণত হয়েছেন।

এভাবেই জিয়ার মত একজন ফাঁসিওয়ালা এবং নিষ্ঠুর স্বৈরশাসকের ভাবকে পরিবর্তীত করা হয়েছে একজন 'ওয়ার্ল্ড স্টেটসম্যান' হিসাবে। তার কুখ্যাত ভাষ্য, ১৯৭৮ সালে ডেইলি মেইল পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে চা খেতে খেতে বলেছিলেন, 'আমরা মানুষকে

www.pathagar.com

ফাঁসিতে ঝোলাব। কিছু সংখ্যককে। 'তাকে সেখান থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে ভিন্ন মূর্তিতে, পাকিস্তান হল একটি 'ফ্রন্ট লাইন স্টেট', তারা জিহাদিদেরকে পবিত্র যুদ্ধে সহায়তা করছে ঈশ্বরহীন কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে। আর আমেরিকানরা জিয়ার এই নয়া মনোভাবে শ্রদ্ধা না থাকলেও সায় দিয়ে গিলেছে। প্রথমবারের মত আমি দেখলাম লোকাল ইন্টান্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনে লেখা হয়েছে, জিয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে একজন 'দয়ালু স্বৈরশাসক' হিসাবে।

পত্রিকার এইসব নিরাশ করার মত রিপোর্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার জন্য আমি আবার ব্যায়াম শুরু করলাম। প্রতিদিন সেল ব্লকের সামনে দিয়ে বাকা করিডোরে এক ঘন্টা দৌড়াই। ক্ষুধা না লাগলেও ৭০ ক্লিফটন থেকে পাঠানো খাবার জোর করে খাই। আগষ্ট পার হয়ে যখন সেপ্টেম্বর মাস এল, আমার মধ্যে এক ধরণের আশা জেগে উঠল। সনমের বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে ৮ তারিখ। আমি বিয়েতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আবেদন করেছি। এখনো হতে পারে যে আমি তখন মুক্ত হয়ে গেছি।

আমি এরমধ্যেই কল্পনা করতে শুরু করেছি। যখনই পায়ের শব্দ পাই আমার সেলের দিকে আসছে তখনই মনে করি আমার মুক্তির খবর নিয়ে আসছে। আমি কল্পনা করি যে পদশব্দ পাওয়া যাচ্ছে তা আমার টিফিন নিয়ে আসছে। প্রতি সোমবার সকালে যে পদশব্দ পাওয়া যায় আমি সেই শব্দকে কল্পনা করি। প্রতি সোমবার ছোটখাটো একজন নার্ভাস প্রকৃতির লোক আসে। জেল সুপারেনটেন্ডেন্ট। কোনো কোনো সময় সে আসে তার সহকারীকে নিয়ে। তার একই বার্তা।

প্রতি সপ্তাহেই সে এসে জানতে চায়, 'কেন আপনি আপনার জীবন এভাবে নষ্ট করছেন, যেখানে আপনার দলের অন্যরা মুক্ত হয়ে জীবন যাপন করছে? আপনি যদি আপাতত রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন তাহলেই তো মুক্ত হতে পারেন।'

শাসকরা কী চাচ্ছে? আমি জানি সরকারের নির্দেশ ছাড়া সুপারেনটেন্ডেন্ট কখনো এসব বলার সাহস করবে না। তা ছাড়া যদি জিয়া আমাকে ছেড়ে দিতে চায় তাহলে ছাড়তে পারে, আর না চাইলে আটকে রাখতে পারে। কিন্তু আমাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছে কেন? আপোষ করতে চাইছে কেন? তারা কি সত্যিই মনে করে যে আমি তাদের সঙ্গে একমত হবো? নাকি তারা আমার মনোবল ভেঙে দিতে চাচ্ছে? আইয়ুব খান আমার পিতার সঙ্গে তাই করেছিল।

সুপারেনটেন্ডেন্ট আমাকে বলতো, 'আপনি আগামীকালই মুক্ত হতে পারেন। আপনি নিজেই আপনাকে জেলে পুরে রেখেছেন। আপনি কি লন্ডন, প্যারিস সফরে যেতে চান না? আপনি যুবতী। অথচ জেলখানার মধ্যে সময় নষ্ট করছেন। কী জন্য? আপনি শুধু অপেক্ষাই করতে পারেন সময়ের।'

লোকটি চলে গেলেই আমি বিচলিত হয়ে পড়তাম। যদিও আমি সামান্যতমও প্রলোভিত হইনি তার প্রস্তাবের প্রতি। আমি তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম না। সে কি আমার ভালো চায় নাকি খারাপ মতলব? আমার সবাইকে সন্দেহ করার নতুন প্রবণতাকে আমি অপছন্দ করি। যদিও এই প্রবণতার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এ ছাড়া আমি টিকে থাকব কী করে? আমি সন্দেহ করতাম, সরকার আমাকে ভারসাম্যহীন করে তুলতে চাচ্ছে। আমি ধরে নিলাম তারা আমার সেলের চারদিকে রহস্যময় শব্দ তৈরি করে আবার আমার মনোবল

www.pathagar.com

ভেঙে দিতে চাচ্ছে!

ফিসফিস করে কথা বলছে! দু'জন পুরুষ এবং একজন মহিলা নিচু স্বরে কথা বলছে। কখনো কখনো এই শব্দে আমি ভোর হওয়ার আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়ি। আমার ওয়ার্ডের কাছে কারো আসার অনুমতি নেই পুলিশ ছাড়া। আমি জেল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করলাম তারা উদ্দেশ্যমুলকভাবে আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। ডেপুটি সুপারেনটেন্ডেন্টের কাছ থেকে জবাব এল, ' আপনার ওয়ার্ডে কেউ নেই, আপনি শুধু কল্পনা করছেন।'

পায়ের শব্দ। একজন পুরুষের ভারী পায়ের আওয়াজ। আস্তে আস্তে কাছে আসছে! আমি চাদরের নিচ থেকে দরোজার দিকে চিৎকার করে বললাম 'কে ওখানে!' নিস্তব্ধ। কোনো শব্দ নেই। আমি মেট্রনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছেন?' তিনি বললেন, না, আমি কোনো শব্দ শুনতে পাইনি। 'আমি আবার অভিযোগ করলাম। উত্তর এল, 'আপনার কল্পনাপ্রসূত। '

টুনটুন, টুনটুন। নতুন শব্দ। অনেকটা ঝুমুর ঝুমুর করা মেয়েদের পায়ের নুপুরের শব্দ। তারপর আবার ফিসফিস শব্দ। আরো ভোরে ঘুম ভেঙে যেতে থাকল। শেষ পর্যন্ত আর ঘুমাতে পারি না। ঘুমই আসে না। যখন পুরান মেট্রনকে পরিবর্তন করে নতুন মেট্রন আনা হল আমি তার কাছে বিষয়টি বলার চেষ্টা করলাম। দাত পড়ে যাওয়া পাঠান এই মহিলাকে বললাম, আপনি কী রাতে কোনো শব্দ শুনতে পান না?'

'হুস! এমন ভাব করবেন যেন আপনি কিছু শুনতে পাননি!' তিনি উত্তরে বললেন। তার চোখ দ্রুত দুদিক দেখে নিল। হাত দুটো নার্ভাসভাবে পোষাকের সঙ্গে ঘষলেন।

আমি শেষ পর্যন্ত একটি নিশ্চয়তা পেয়ে পুলক অনুভব করলাম। বললাম, ' কিন্তু কে?

তিনি ফিসফিস করে বললেন, পেত্নী!পেত্নী, একটি মেয়েলোকের প্রেতাত্মা যার পায়ের পাতা সামনের বদলে পেছনের দিকে? আমি মেট্রনকে বললাম, 'পেত্নী বলতে কিছু নেই। 'তিনি বিশ্বাস করাতে চাইলেন, 'হ্যা, অবশ্যই আছে! মেয়েদের ব্লকে সবাই তার শব্দ শুনেছে। এমন ভাব করবেন যেন আপনি কোনো শব্দ শুনতে পাননি। তাহলে আর ক্ষতি করতে পারবে না। '

ঝুনঝুন, ঝুনঝুন। সেই রাতে এবং পরে অনেক রাতের জন্য আমার সব আস্থা ভেঙে গেল। আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁপতে থাকি আর ভাবি, আমার এখানে না এসে সে কেন মেয়েদের ব্লকে বাস করে না? কিন্তু শব্দ হতেই থাকে।

ক্ল্যাং ক্ল্যাং। কেউ যেন কিছু নাড়ছে। মনে হয় যেন আমার রুমের ঠিক বাইরে ময়লার ঝুড়িতে কিছু খুঁজছে। আবার পদশব্দ পাই। আমার সেলের দিকে এগিয়ে আসছে! যদিও ওয়ার্ড খোলার কোনো শব্দ নেই। ইয়া আল্লাহ, এসব কী হচ্ছে? ইয়া আল্লাহ, আমাকে সাহায্য কর। আমি শুনতে পেলাম আমার খালি টিফিন বক্সটি তুলে দরোজার বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। বক্সের ঢাকনাটি খোলা হল। তারপর দেয়ালের সঙ্গে সেটিকে ঠুকে দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ! আমি নার্ভ শক্ত করলাম এবং জোর করে দরজার সামনে গেলাম। টিফিন বক্সটি জায়গামতই পড়ে আছে। সেখানে কেউ নেই। জেল সুপারেনটেন্ডেন্ট পরে ভিজিট করতে এসে আমাকে বললেন, আপনি বিপর্যস্ত হয়ে আছেন। তিনি আমাকে বললেন যে আমার সেলটি যেখানে তৈরি করা হয়েছে সেখানে ছিল পানসি ঘাট। ব্রিটিশরা এখানে মানুষকে ফাঁসি দিত। জেলার আমাকে বললেন, হয়তো কিছু আত্মা এখানে ঘোরাফেরা

www.pathagar.com

করছে যাদের কোনো গতি হয়নি। এসব চিন্তা মোটেই সুখকর নয়। মেট্রন যে কাহিনী বলেছেন তাও না। তিনি একদিন আমাকে এক কাহিনী বলছিলেন। বলার সময় তার চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিল। ' আমার স্বামী ছিলেন নৈশ প্রহরী। তাকে কয়েকজন চোর হত্যা করেছিল। তার হত্যাকারীদের কখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। এটা অবশ্যই যে তার প্রেতাত্মা যে শান্তিতে নেই।'

আমি অবশ্যই অতিপ্রাকৃতিক কিছুতে বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি যে সরকার আমার নার্ভকে দুর্বল করে দেয়ার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। যা তারা রাওয়ালপিণ্ডিতে আমার বাবার বেলায়ও করেছিল। কিন্তু সতর্কতা হিসাবে আমিপানসি ঘাটের সেইসব আত্মার জন্য প্রার্থনা করতে থাকলাম। কয়েক মাস পর সেইসব শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। আজও আমার জানা নেই কী কারণে তা বন্ধ হয়েছিল।

আমি সুক্কুরজেলখানায় মেট্রনের কাছে শেখা সেই প্রার্থনা রীতি আবার শুরু করলাম। কুরআনের সুরা পড়ে বালতির পানিতে ফু দিয়ে কিছু অংশ সেলের চারদিকে ছিটিয়ে দেই। সেলের গঠন ছিল অপ্রচলিত ধরণের। ফলে সেখানে চারকোনা ছিল না। তাই আমার মধ্যে ভয় কাজ করতো যে সুরা পড়ায় হয়তো কাজ হচ্ছে না। আমি প্রার্থনা করে জানতে চাইলাম, আমি কী অন্তত পক্ষে সনমের বিয়েতে উপস্থিত হতে পারব? আমার আবেদনের কোনো জবাব পেলাম না। আমি প্রার্থনা করলাম, কুলহু আল্লাহু আহাদ...তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। দ্বিতীয় বুধবারের পর তৃতীয় বুধবারের আগে সেই পাঠান মেট্রন সকালে আমার সেলের সামনে এসে হাজির। তিনি বললেন, 'আমার খাটের কাছেই কয়েকজনের কণ্ঠ শুনতে পেয়েছি। তারা বলছে সে আজকেই যাচ্ছে।' আমি মনে মনে ভাবলাম, এই মহিলা পাগল। এর দু'ঘণ্টা পর জেল কর্তৃপক্ষের লোক এল। তারা আমাকে বলল, আপনি শীঘ্রই এখান থেকে বের হচ্ছেন। আপনার বোনের বিয়েতে যাওয়ার অনুমতি হয়ে গেছে।'

৭০ ক্লিফটন। গেটের উপর সেই সম্মানজনক ফলকটি এখনো ঝকঝক করছে। স্যার শাহ নেওয়াজ খান ভুট্টো, জুলফিকার আলী ভুট্টো, বার এট ল'। গত ছয় মাসের উদ্বেগ অনেকটা প্রশমিত হল যখন পুলিশের কনভয় আমাকে বাড়ির গেটের কাছে নামিয়ে দিল। আমি মোটামুটি ভেবে নিয়েছিলাম যে আর কখনোই আমি বাড়িটি দেখতে পাব না। এই ৭০ ক্লিফটন বাড়িটি হয় সরকার জব্দ করবে অথবা বাড়িতে আসার আগেই সুক্কুর জেল খানায় আমাকে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু এখন আমি এখানে, জীবিত অবস্থায়! বাড়ির দেয়াল আলোকিত করে সাজানো হয়েছে আমার বোনের বিয়ে উপলক্ষে। আমি এবং মা দু'জনই বেঁচে আছি।

আমার চির পরিচিত গেটটি খুলে যেতেই জীবনের নতুন একটি উত্তেজনা অনুভব করলাম। কনভয় ভেতরে ঢুকল, চৌকিদার আমাকে স্যালুট দিল। আমার মনে হল আল্লাহ আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন। তার সাহায্যের কারণেই আমি শত্রুদের কাছে পরাজিত হইনি। সেই সময়ই আমি নতুন শক্তির প্রেরণা পেলাম। আমার মনে হল আমি নতুন করে জন্ম নিলাম।

ড্রাম বাজছে, নাচ চলছে, জেসমিন আর গোলাপের মালা। পরিবারের সকল সদস্য

www.pathagar.com

পারিবারিক কর্মচারী সবাই এসে সামনে বারান্দায় ভীড় করল। ঢোলকের তালে তালে সাবাই কাধে কাধ মিলিয়ে নাচছে। চৌকিদার, বেয়ারা, সেক্রেটারি। দেখলাম দোস্ত মোহাম্মদ আছেন, যিনি প্রিজন প্রহরীদের আগে দৌড়ে বাবার কাছে পৌছে গিয়েছিলেন। আছেন উরস, আমার বাবার ভ্যালট। পিস্তল নিয়ে বাবাকে পাহাড়া দিত। বাবাকে গ্রেফতার করার সময় তাকে সেনারা মেরেছিল। বশির এবং ইব্রাহিম আছে। বাবাকে যখন ফাঁসি দেয়া হয় তখন মা এবং আমার সঙ্গে ছিল ওরা। লারকানা থেকে নজর মোহাম্মদ এসেছে সেই বাবার লাশ গ্রহন করেছিল এবং বাবাকে কবর দিয়েছিল।

তাদের সবার মুখে এখন হাসি, তারা নাচছে, গাইছে। গাড়ি থেকে নেমে আমার মনে হল কী চমৎকার বিয়ে বাড়ির পরিবেশ! তারা সবাই আমার দিকে ধেয়ে আসল এবং আমার গলায় মালা জড়িয়ে দিতে থাকল। আমার কান পর্যন্ত ফুলের মালায় ঢেকে গেছে। আমি বললাম, 'ওগুলো বরযাত্রীদের জন্য রাখ।' সবাই বলে উঠল, 'না, না, আমরা তোমার জন্য মালা এনেছি। আমরা তোমাকে কাছে পেয়ে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত।'

নিজ বাড়ি! আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আত্মীয় স্বজনরা বারান্দায় বের হয়ে এলে আকাশ বাতাস মুখোরিত হয়ে উঠল। আমার খালা, বেহজাত খালা এসেছেন লন্ডন থেকে। খালাতো বোন জিনাত এসেছে লস এঞ্জেলেস থেকে। আমার ফকরি, বাবাকে ফাঁসি দেয়ার পর সেও আমার সঙ্গে কারাগারে ছিল। আমার বাবার বোন, ফুপু মান্না আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তার আরো তিন সৎবোন এসেছেন হায়দারাবাদ থেকে। তারা সবাই বাবার প্রাণভিক্ষা চেয়ে দরখাস্ত করেছিলেন। কোনো কাজে আসেনি। আত্মীয় স্বজনরা সবাই এসেছেন ভারত, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ইরান, ফ্রান্স থেকে। পুরো বাড়ি ভরে গেছে। পাশেই ভাইদের আলাদা বাড়িও ভরে গেল ওই বাড়িগুলো গত চার বছর ধরে খালি পড়ে আছে। লায়লা নাসিলি! আমরা দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে হাসলাম, কাঁদলাম। আমি কখনো আশা করিনি তাদের সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে। অথবা তারা আমাকে দেখতে পাবে। আমি জীবিত বের হয়ে আসতে পারব না এই ভয় সবার মধ্যে ছিল।

বিলাসী হট বাথ। আমার পায়ের নীচে কার্পেটিং। পরিস্কার, ঠাণ্ডা খাবার পানি। আমি দুইদিন দুই রাত ঘুমাইনি। মুক্তির সামান্য সময়ও আমি অপচয় করলাম না। মা সকাল সকাল বিছানায় গেলেন। আমি সারারাত সনমের সঙ্গে গল্প করে কাটালাম। ভোর পর্যন্ত। সনম বিছানায় গেল মা জেগে ওঠার পর। আমি অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সময় দিতে পারলাম না।

যে সময়টুকু আমার নিজের জন্য ছিল সেই সময়ে আমি নিউজউইক, টাইম, এশিয়া উইক ও ফার ইস্ট ইকোনোমিক রিভিউর পুরোনো ইস্যুগুলো নিয়ে মেতে রইলাম। আমার বেডরুমের দেয়াল ঘষামাজা করলাম। আমি লক্ষ্য করলাম শেষবার যখন শাসকের বাহিনী হানা দিয়েছিল তখন তারা মায়ের লেখা অনেকগুলো চিঠি নিয়ে গেছে। চিঠিগুলো আমি বাইরে পড়াশুনা করার সময় মা আমাকে লিখেছিলেন। এছাড়াও আমার ভাই, বোন এবং আমার বাধানো ছবিগুলো নিয়ে গেছে। আমার জুয়েলারিগুলোও নিয়েছে। এর মধ্যে ছিল দাদীর দেয়া আমার সবচেয়ে প্রিয় স্বর্ণ রাখার বাক্স। তারচেয়েবড় কথা বেডরুমের অবস্থা তারা এমন করেছে যেন এখানে যুদ্ধ হয়ে গেছে। এটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি মর্মাহত করল। আমি দেয়াল ঘষতেই থাকলাম। ওদের যে হাতের ছোয়া আছে তা তুলে ফেলতে

www.pathagar.com

চাইলাম। পাশাপাশি নিজেকে মনে করিয়ে দিলাম যে রুমটিতে ফিরে আসতে পেরেছি এজন্য আল্লাকে অশেষ মেহেরবানী। কয়েকমাস আগেও জানতাম না যে আদৌ এ রুমটিতে কোনোদিন ফিরে আসতে পারব। 'ওরা তো তোমাকে আর কারাগারে নেবে না, তাই না?' আমার চাচাতো ভাই আব্দুল হুসেইন জিজ্ঞেস করল। সে ভুলে গেছে যে সে এখন পাকিস্তানে আছে, সানফ্রান্সিসকোতে নয়। তার এই আশার কথায় আমি কান দিলাম না। যদিও তা ছিল কঠিন।

৭০ ক্লিফটনের সবকিছু স্বাভাবিক, জাকজমক, ঐতিহ্যবাহী। স্টাফরা চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বাগানে তাবুর নিচে খাবার টেবিল সাজাচ্ছে। অতিথিদের জন্য গদিওয়ালা চেয়ার পেতে দেয়া হচ্ছে। মেহেদি শীল্পি সানির হাতে মেহেদির কারুকাজ করেছে। সে ভেতরে এসেছে অন্যান্য মেয়েদের সুক্ষ কারুকাজ করে মেহেদি সাজিয়ে দিতে। মেহেদি শিল্পী একটি টুথপিক দিয়ে আমার বোনদের হাতে লতা পাতা একে দিয়ে লেবুর রস ও চিনি দিয়ে আটকে দিল।

পাকিস্তানি স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে সনমের বিয়ের আয়োজন ছিল ছোট। মাত্র ৫ শত অতিথী। সব বিয়ের রীতিও অনুরণ করা হয়নি। মেহেদি অনুষ্ঠানে বা বিয়ের অনুষ্ঠানে আমি সিল্কের সালোয়ার কামিজ পড়তে পারলাম না। বাড়ি লোকে লোকারণ্য। কিন্তু সেটা কোনো ব্যাপার না। আমি আলমারিতে কোনো কাপড় দেখলাম না। আমার আগের যে সালোয়ার কামিজ ছিল তা প্রায় নতুনই।

সানি আমার বেডরুমে এসে বলল, 'মা আমাকে সাজগোজ করতে বলছেন। তিনি জোর করছেন শাড়ি পড়ার জন্য। কিন্তু আমি জিন্স পড়ে বিয়ে করতে চাই। তুমি কিছু একটা কর।'

আমি বললাম, ' তুমিতো একবারই বিয়ে করবে। তাছাড়া মা অনেক কষ্ট করেছেন। তুমি তাকে খুশি করার জন্যই যা বলছেন তাই কর।'

আমি যেদিন প্রথম বড়িতে এলাম সেদিন গানের শব্দ ভরে উঠল বাড়ি , 'এই বধু চাঁদের চেয়ে সুন্দর, হ্যা সে তাই, হ্যাঁ সে তাই..' মেয়ে আত্মীয়রা সনমের বান্ধবীদের সঙ্গে মেহেদি অনুষ্ঠানে হাতে তালি দিল, নাচল। আমি সময়ের একটুও আমি নষ্ট করতে চাইলাম না। আমি জানি না এই মুক্তি কতক্ষনের জন্য। আমি আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় মশগুল থাকলাম। আমারে জগত এখন অনেক আলাদা। কিন্তু কোন জগতটা সত্যি? দু'বার আমি কারাবরণ করে জেলখানাকে ঘর বলে ধরে নিয়েছি। মেহেদি অনুষ্ঠানে সানিকে স্বামী হতে যাওয়া নাসেরের পাশে ভারী সুন্দর লাগছিল। যেহেতু এই বিয়ে না তাই তাদের মধ্যে টেনশন ছিল কম। কিন্তু সামাজিক প্রথাগুলো চলছিল ঠিক মতোই। সানি ওর দোপাট্টা যত্নের সঙ্গে মুখের ওপর ধরে রেখেছে যাতে বিয়ের আগে বর তার রুপ লাবন্য দেখে না ফেলে। যদিও আমি তার পাশে গিয়ে বসতেই সে দোপাট্টা তুলে আমার সঙ্গে অবলীলায় কথা বলছিল।

সনমের বন্ধু এবং আত্মীয়রা সামনে গাইতে থাকল, 'নাসেরজি, নাসেরজি, তুমি দুলহা হতে যাচ্ছ। সনম বধু হওয়ার আগে সাতটি শর্ত তোমাকে মেনে নিতে হবে। প্রথম শর্ত হল, সনম রান্না করতে পারবে না।'

নাসের উত্তরে বলল, 'আমি তার জন্য বাবুর্চি রাখব।'

www.pathagar.com

ন্যাক পক্ষ আবার গাইল, 'সনম কাপড় ধুতে পারবে না।'

প্রতিটি শর্তের সে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। এরপর তার পক্ষের সুযোগ আসবে উত্যক্ত করার। নাসের আবার গাইল, 'আমি কাপড় ধোপাখানায় নিয়ে যাব।'

দু'পক্ষ থেকেই কাড়ি কাড়ি সজ্জিত খাবার নিয়ে আসা হল। সেগুলো মোমের আলো দিয়ে পাতলা সিলভারের পাত্রে সাজানো। নাসেরের আত্মীয়রা একে একে পান সুপারির সঙ্গে মেহেদি দিয়ে সনসের হাতে দিল। এক চিমটি করে মিষ্টি খাওয়াল। মাথার উপর টাকা ঘুরিয়ে শয়তানের দৃষ্টি থেকে তাকে রক্ষার নিয়ম পালন করল। মায়ের নেতৃত্বে আমাদের পক্ষ থেকেও নাসেরকে তাই করা হল।

অনুষ্ঠানের আমেজ হঠাৎ বাধাগ্রস্থ হল একজন কর্মচারী এসে সামনে দাঁড়াতেই। সে বলল, গেটের কাছে পুলিশ এসেছে। সারা ঘর তখন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আমি বুঝলাম যে পুলিশ আমার জন্য এসেছে। কিন্তু আমাদের আরেকজন এসে জানালো, ওরা মা'কে যেতে বলছে। সবার জিহ্বা শুকিয়ে গেল। মা আরেকবার ডিটেনশনে গেলে আর বাঁচবেন না!

মা শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'দোস্ত মোহাম্মদ, ওদের ভেতরে আসতে বল। বাড়ি ভরা অতিথি। আমি চাই না এরমধ্যে পুলিশ গেট ভেঙে ফেলুক।' যে পুলিশরা ভেতরে আসল তাদেরকে বিব্রত মনে হল। মা তার দুর্বল শরীর নিয়েও দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, আমার কাছে কী চান আপনারা?'

তারা জড়োসড়ো হয়ে মা'র হাতে মার্শাল ল' অর্ডারের একটি কপি দিল। আল্লাহকে ধন্যবাদ, এটা তাকে আটকাদেশের কাগজ নয়। কিন্তু পাঞ্জাব থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। অর্থাৎ পাঞ্জাবে তিনি নিষিদ্ধ। পাঞ্জাব সফরের কোনো ইচ্ছা তার ছিল না। এটা জিয়াও ভাল করে জানেন। তিনি শুধু আমাদেরকে নাস্তানাবুদ করা এবং আমাদের শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য এ কাজটি করেছেন।

আমারে নাস্তানাবুদ করার কাজটি চলতে থাকল। পরদিন সকালে বিয়ের গানবাজনার দায়িত্বে নিয়োজিতরা খবর পাঠালো যে তারা আসতে পারবে না। কর্তৃপক্ষ তাদেরকে কোনো মাইক্রোফোন ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি বলে তারা জানালো। মার্শাল ল' আইনে লাউডস্পিকার ব্যবহার নিষিদ্ধ। আমরা বুঝতে পারলাম না যে সরকার হস্তক্ষেপ করেছে নাকি তারাই ভীত হয়ে পিছিয়ে গেছে।

নাস্তানাবুদ করার কাজ আরো বাড়ল। তারা গোয়েন্দা সংস্থার লোক বসিয়ে ৭০ ক্লিফটনের সামনে থেকে অতিথিদের গাড়ির প্লেট নাম্বার নোট করল। তারা আগেই অতিথিদের একটি তালিকা নিয়ে গেছে। মা'র সেক্রেটারি কাঁদতে কাঁদতে জানালো তারা হুমকী দিয়েছে যদি অতিথিদের তালিকা না দেয়া হয় তাহলে তাকে চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে।

এই বিয়ের ব্যাপারে দেশবাসীকে অন্ধকারে রাখা হল। ভুট্টো পরিবারের কোনো নেতিবাচক খবর ছাড়া কোনো খবর পত্রিকায় ছাপানো নিষিদ্ধ করা হল। পাকিস্তানের সাংবাদিকদের তখন কড়া নজরে রাখা হতো। সানির বাগদানের ব্যাপারে তারা লিখলো যে নাসেরের দাদাও জুনাগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। শিরোনামে বলা হল, 'জুনাগড় প্রদেশের সাবেক দুই মুখ্যমন্ত্রীর নাতি-নাতনির বিয়ে। সানির বিয়ে এবং আমার সাময়িক মুক্তি সম্পর্কে বলা হল, 'বোনের বিয়েতে বোনের উপস্থিতি।'

www.pathagar.com

৭০ ক্লিফটনের অন্দরমহলে আমরা সনমের বিয়েকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক বিষয় বলে বিবেচনা করলাম। আমার বোনকেও অনেক ভুগতে হল। তাকেও রাজনীতির মধ্যে জড়ানো হল শুধু তার নামের সঙ্গে ভুট্টো থাকার কারণে। বাবার মৃত্যুদণ্ডের দু'মাস পর সে হার্ভার্ড থেকে গ্র্যাজুয়েশন লাভ করে। এরপর সে অক্সফোর্ডে ভর্তি হল কিন্তু মনোনিবেশ করতে পারল না। সে পাকিস্তানে ফিরে এল। কিন্ত কেন? ক্লিফটনে একা বাস করে এক ধরণের বন্দীত্ব বরণ করার জন্য? তার মা এবং বোন জেলখানায় ঢুকছে, বের হচ্ছে। ভাইয়েরা নির্বাসিত। সে সব সময় তার বন্ধু সার্কেল ছোট রাখতে চেষ্টা করেছে। ভুট্টো পরিবারের সদস্য হিসাবে সে কোথাও উপস্থিত হতে চায়নি। সারাক্ষণ তার বাবার ব্যাপারে প্রশ্ন সে পছন্দ করতো না। সে অনেককালের পুরনো বন্ধু ও ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গেই শুধু চলাফেরা করতো। নাসেরকেও সে ছোটবেলা থেকেই চেনে। নাসের শাহনেওয়াজ এবং মীরের সঙ্গে স্কুলে যেত।

সনমকে বিয়ের কথা পরিবারকে জানালে নাসেরের চাচা তাকে বলেছেন, 'সনমকে বিয়ে করতে যেও না। ক্ষমতাসীনরা তোমাকে শেষ করে ফেলবে।' নাসের বলেছে, 'এটা আমার সিদ্ধান্ত, তোমাদের না। আমি তাকে ভালবাসি, সেজন্য যে মুল্য দিতে হয় তাই দেব।' সে তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে এবং সেজন্য তাকে মুল্য দিতে হয়। ক্ষমতাসীনরা তাকে শাস্তি দেয়ার সব ধরণের চেষ্টাই চালায়। তার বিরুদ্ধে কর তদন্ত করে, তার অনুমোদন তুলে নেয়, জমিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তানে নাসেরের টেলি কমিউনিকেশনের সফল ব্যবসার উপর আঘাত আসে। সরকারের কাছে স্টেট অব দি আর্ট ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। সরকারের সঙ্গে তার চুক্তিকে বাতিল করা হয়। যে কারণে তার ব্যবসার ৭৫ ভাগ বন্ধ হয়ে যায়। এখন সনম আর সে লণ্ডনে বসবাস করে। সেখানে নাসেরকে সবকিছু আবার নতুন করে শুরু করতে হয়েছে। সে যাই হোক, ওদের বিয়ের অনুষ্ঠানটি ছিল চমৎকার।

মাথার উপর কোরান শরীফ ধরে আমি আর মা তাকে বিয়ের মঞ্চে নিয়ে গেলাম। সনমের পরনে সবুজ রঙের শাড়ি। সবুজ হল সুখের প্রতীক। আমাদের চাচাতো ভাই আশিক আলী বিয়ের মঞ্চে তাকে প্রশ্ন করল, 'নাসিম আব্দুল কাদিরের ছেলে নাসের হুসেনকে আপনার স্বামী হিসাবে বিয়ে দেয়া হচ্ছে, আপনি কি রাজি আছেন?' সনম আমার আর মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসল। কোনো কথা বলল না। সে জানে আশিক আলী তাকে এই প্রশ্নটি আরো দুবার করবে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে। আবার প্রশ্ন করার পরও সনম নিরব রইল। ইসলাম নিশ্চিত করতে চায় যে নারী তার ইচ্ছা অনুযায়ী বিয়েতে মত দিতে পারে। তৃতীয়বার প্রশ্ন করার পর সনম মত দিল এবং বিয়ের কাবিনে স্বাক্ষর করল। আশিক আলী অন্য রুমে অপেক্ষারত পুরুষদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিল। মৌলভী নসেরকে বিয়ের দোয়া পড়ালেন। এবং সনম প্রথম ভুট্টো পরিবারের কোনো নারী হল যে নিজের পছন্দমত কাউকে বিয়ে করল। নাসেরের দুজন বন্ধুকে ডায়াসে নিয়ে আসা হল বিয়ে আনুষ্ঠানিকতায় যোগদানের জন্য। নাসেরের দুজন আত্মীয়া বর-কন্যার মাথার উপর একটি সিল্কের কাপড় ধরে রাখল চাদোয়ার মত। দুজনের মাঝে একটি আয়না ধরা হল। আমার চোখের পানি ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছিল যখন নাসের আর সনম আয়নার মধ্যে দিয়ে একে অপরকে দেখল। ঐতিহ্যগতভাবে বর এবং কনে প্রথমবারের মত সারা জীবন একত্রে

www.pathagar.com

বসবাসের প্রতিজ্ঞায় একে অপরকে দেখে থাকে।

ডায়াস ভরে উঠল গোলাপ, গাঁদা আর জেসমিন ফুলের মালায়। রাতের বাতাস মিষ্টি গন্ধে ভরে উঠল। সনম ও নাসের বসল একটি নীল রঙের ভেলভেটের চৌকির উপর। চারদিকে নানা ধরণের খাবার পরিবেষ্টিত। পেস্তা, বাদাম সোনালী রঙ করা ডিম ইত্যাদিসহ অনেক ধরণের ডিশ। ওদের দুজনের চারপাশে মোমদানীতে মোম জ্বলছে। দম্পতি যেন আলোকিত থাকে তার প্রতিকি হিসাবে। সনমদের মাথার উপর মিষ্টির মণ্ড ধরা হল যাতে ওদের জীবন মিষ্টি হয়ে থাকে। বিয়ের ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল। শুরু হল বিয়ের নানা অনুষ্ঠান।

অতিথিরা যখন ওদের অভিনন্দন জানাতে লাইন ধরে আসল তখন আমি আর মা সানি আর নাসেরের পাশে বসেছি। এদের মধ্যে অনেককেই কারাগারে বন্দি ছিলেন। তাদেরকে দেখলেও তা বোঝা যাচ্ছে। তাদের অনেকেই আমার উদ্দেশ্যে বলল, আপনাকে যথেষ্ট ভাল দেখা যাচ্ছে। তারা ঠিক বলছে বলেই আমি আশা করলাম। আমিও চাই বাবার মত অনড় থাকতে। বাবাকে সুপ্রিম কোর্টে আনা হলে তাকেও অবিচল দেখা যেত। আমি বিড়বিড় করে বললাম, কী ভাল লাগছে সবাইকে দেখে! এসব কারণেই আমি মাথা উচু করেছিলাম। কিন্তু আমার পায়ের তলা কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

আমাকে কী আবার কারাগারে ফিরে যেতে হবে? কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কিছুই বলেনি। ভীড়ের মধ্যে আমি আমার উকিল মুজিবকে দেখলাম। তিনি আমাকে জানালেন যে সিন্ধুর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে পরদিন সকালে তার সাক্ষাতের কথা রয়েছে। আমার ডিটেনশন শেষ হওয়ার সপ্তাহেরও কম সময় আগে জানিয়েছিলেন যে কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি আবেদন করেছেন বাকী সময়টা যাতে আমাকে ক্লিফটনে থাকতে দেয়া হয়।

বাড়ির অতিথিরা চলে যাওয়ার পর আমি ম্যাগাজিন এবং সংবাদপত্র জোগাড় করলাম। তরল সাবান এবং ইনসেক্ট কিলারের সঙ্গে লুকিয়ে জেলখানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। সারারাত জেগে থাকলাম সামিয়ার সঙ্গে। শেষ মুহূর্তে আমি পিটার গলব্রেথের কাছে একটি চিঠি লিখলাম। গলব্রেথ আমার অক্সফোর্ডের সহপাঠী। গলব্রেথ ইউএস সিনেটের ফরেন রিলেশন কমিটির দক্ষিন এশিয়া পোর্টফোলিও দেখতো। মা আমাকে জানিয়েছেন সে সম্প্রতি পাকিস্তান এসেছিল আমেরিকার নিরাপত্তা স্বার্থ বিষয়ক সফরে। মা এও জানালেন যে সে করাচি জেলখানায় আমার সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সরকার সে ব্যাপারে কর্নপাত করেনি। পরে সে আমাকে জানিয়েছে বিষয়টি কী ঘটেছিল।

পিটার গলব্রেথ আগষ্ট, ১৯৮১ :

> সিনেট ফরেইন রিলেশন কমিটির মাইনরিটি নেতা সিনেটর ক্লেবর্ন পেলের কাছ থেকে একটি চিঠি নিয়ে পাকিস্তান গিয়েছিলাম যাতে বেনজির ভুট্টোর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দেয়া হয়। পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় এবং যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। যারা তখন ভুট্টো পরিবারের প্রতি চরম বিদ্বেষ ভাবাপন্ন।
>
> সরকার আমার প্রতি বা সিনেটর পেলের অনুরোধের প্রতি কোনোরকম কর্নপাত করল

না। যদিও যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাস আমাকে নিরুৎসাহিত করল ভুট্টো পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যাপারে, তারপরও আমি ৭০ ক্লিফটনে গেলাম বেগম ভুট্টোর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। তাকে ভীষন বিমর্ষ এবং ক্লান্ত দেখা যাচ্ছিল। তিনি বেনজিরের প্রথমে সুক্কুর জেল এবং পরে পাঁচমাস ধরে করাচি জেলে থাকার ব্যাপারে ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন।

বেগম ভুট্টো সনম এবং ফাকরির সঙ্গে করাচি বোটক্লাবে যোগদানের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। আমরা যখন ৭০ ক্লিফটন থেকে বের হই তখন তিনি আমাকে হাসতে বললেন দূর থেকে নিরাপত্তা কর্মী যারা টেলিফটো লেন্সে ছবি তুলছেন তাদের উদ্দেশে। আমি রাজনীতিক সুলভ হাত নাড়লাম তাদের দিকে।

লাঞ্চের সময় পিঙ্কির কারাবাস নিয়ে আমার মনকে স্থির রাখতে পারছিলাম না। সর্বশেষ আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে ১৯৭৭ সালের জানুয়ারিতে অক্সফোর্ডে। পিঙ্কি তখন সবেমাত্র অক্সফোর্ড ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট অফিসের সামনে উল্লসিত আন্ডার গ্রাজুয়েটদের নিয়ে সে বসেছিল।

সে সময় থেকেই তার জীবন একটি অপ্রত্যাশিত গন্তব্যের দিকে চলে যাচ্ছিল। আমি ভাবতে থাকলাম তার দেশে ফিরে আসার কথা। তার বাবা সবে ক্ষমতা থেকে সরে গেছেন। তাকে বিচারের মঞ্চে দাঁড় করানো হয়েছে এবং পরে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে। তারপর পিঙ্কিকে এত দীর্ঘ সময় ধরে কারাগারে থাকতে হচ্ছে। এমন নিদারুণ কষ্টের মধ্যে। আমাকে মাঝে মাঝেই মানবাধিকার কেসগুলো দেখতে হয় এবং আমি এটা জানি কেমন বিষয়। কিন্তু তারপরও একজন বন্ধুর এই পরিস্থিতি আমার কাছে খুবই কস্টের। আমি যখন বোটক্লাব ত্যাগ করলাম তখন বেগম ভুট্টোর হাতে বেনজিরকে লেখা একটি তথ্যবহুল চিঠি দিলাম। চিঠিটা আমি গতরাতে লিখেছি একটি লিগ্যাল প্যাডের উপর।

যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আমি একটি রিপোর্ট তৈরি করলাম। পাকিস্তানে সহায়তা শুরুর বিষয় নিয়ে। রিপোর্টে উল্লেখ করলাম যুক্তরাষ্ট্রের একটি অজনপ্রিয় মিলিটারি স্বৈরশাসককে সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্রের সুনাম ক্ষুন্ন হওয়ার ঝুকি রয়েছে। আমি একটি শক্তিশালী মানবাধিকার নীতির প্রস্তাব করলাম। ইঙ্গিত দিলাম যে আমাদের সাহায্য শাসকের পাশাপাশি দেশকে সহায়তা করার জন্যও। ব্যক্তিগতভাবে আমি সিনেটর পেল এবং কমিটি প্রধান সিনেটর চার্লস পার্সিকেও ভুট্টো পরিবারের নারীদের ব্যাপারে ব্যাখ্যা করলাম। তারা দুজনই আমাকে সাহায্যের আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমি বেনজিরকে জানাতে চাইলাম যে তাকে ভুলে যাইনি।

পিটারের অন্তরঙ্গ চিঠি যখন আমি পড়ি তখন সবে করাচির আকাশে সূর্য উঠছে। ওর স্ত্রী আনে এবং সন্তানের খবরগুলো হৃদয় দিয়ে অনুভব করলাম। আমার ভেতর এই সময়ে পুরোনো স্মৃতি জেগে উঠল। আমি চিঠির উত্তর লিখলাম :

সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৮১

প্রিয় পিটার

শেষরাতে সানির বিয়ের অনুষ্ঠান থেমে গেছে। পুরো বাড়ি এখন ঘুমে। এখন সকাল ৬ টা বাজছে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আমি মুক্ত থাকব। আমি দ্রুত অল্পকথায় তোমাকে জানাতে চাই তোমার চিঠি পেয়ে আমি কত খুশি হয়েছি। তোমার কাছ থেকে বন্ধুদের খবর পেয়ে এবং তুমি কত উন্নতি করেছ জেনে খুশি হয়েছি। তোমার এবং তোমার ভাই জ্যারির উন্নয়ন কামনায়

www.pathagar.com

আমার প্রার্থনা রইল।

হার্ভার্ডের সেই পুরোনো দিনের কণ্ঠ, সেই সুমধুর সময় এখন অন্যরকম হয়ে গেছে। তারা কি আমাদের শিখিয়েছিল যে জীবন এমন ভয়াবহ হতে পারে, এত বিপদসঙ্কুল হতে পারে? আমরা পড়ি বা না পড়ি, শব্দগুলো কি এমন ছিল যে আমি এখন বলতে পারি যে আমি ধরতে পারিনি? মুক্ত এবং স্বাধীনতা নিয়ে আমরা রচনা লিখেছি গ্রেডের জন্য। আমরা কি জানতাম শব্দগুলো কত মূল্যবান? নিঃশ্বাসের মত মূল্যবান, পান করা পানির মত মুল্যবান। কিন্তু সেই সময় কঠিন বাস্তবতা বলতে আমাদের কাছে মনে হয়েছে ভারমোনট এবং হার্ভার্ডের উঠোনের বরফের মত।

সকালে আরো কিছু পরে আমি চা নিয়ে মা'র ঘরে ঢুকলাম। মা বললেন, 'আমার সঙ্গে থাক। হয়তো আমরা মুজিবের কাছ থেকে একসাথে বসে কোনো ভাল খবর পাব।' এর অল্পকিছুক্ষণ পর আমার আইনজীবী এসে হাজির হলেন। বললো, হোম সেক্রেটারি তার অনুরোধ রক্ষা করেননি। তাকে বলা হয়েছে, আমি যে পর্যন্ত রাজনীতি নিষেধাজ্ঞাকে অস্বীকার করব, সেপর্যন্ত আমাকে জেলখানায় থাকতে হবে।

সকাল ১০টার সময় পুলিশ এল। আমাকে বিদায় দিতে আত্মীয় এবং বাড়ির কর্মচারীরা সব উঠোনে জড়ো হল। গাড়ি ক্লিফটন থেকে বেরিয়ে ইরান দুতাবাস পার হল। তারপর ক্লিফটন গার্ডেন, যেখানে শিশুরা ঘুড়ি উড়াতে ভীড় করে। এরপর একে একে সোভিয়েত দুতাবাস, লিবিয়ান দুতাবাস, ইতালিয় দুতাবাস পার হল। প্রতিবারের মতই আমাকে দ্রুত গতিতে প্রায় ফাঁকা রাস্তা দিয়ে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হল।

জেলারের চাবির পরিচিত শব্দ আমাকে করাচি সেন্ট্রাল জেলে স্বাগত জানাচ্ছে। আমি হেঁটে উচু দেয়ালের সঙ্গে লাগানো ছোট লোহার গেট পার হলাম। আমার পিঠটা সোজা করে আমি জানালাহীন করিডোর দিয়ে ওয়ার্ডের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি চাই না কেউ ভাবুক জেল থেকে দু'দিন বাইরে থেকে নরম হয়ে পড়েছি। সঙ্গে আমি একথাও চিন্তা করছি তারা যেন আমাকে তল্লাশি না করে। ৭০ ক্লিফটন ছাড়ার আগে আমি ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রগুলো ব্যাগে ভরে ফেলেছি।

আমি যখন আমার সেলে প্রবেশ করলাম তখন যথারীতি বিদ্যুত নেই। আমি এমনিতেই অসুস্থ হয়ে পড়লাম। পরবর্তী দুদিন আমি অসুস্থ থাকলাম। মানসিক নাকি কোনো খাবারের থেকে সমস্যা হল বলতে পারি না। কিন্তু আমি ভীষন অসুস্থ ছিলাম।

তৃতীয় দিন, সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখ আমি সৌভাগ্যক্রমে বেশ সবল অনুভব করলাম। জেলার এল একটি হতাশ করার মত খবর নিয়ে জেলা মার্শাল ল' প্রশাসকের কাছ থেকে। যদিও সেটি অপ্রত্যাশিত আদেশ নয়। করাচি জেলখানায় আমার ডিটেনশন আরো তিনমাসের জন্য বর্ধিত করা হয়েছে।

সপ্তাহে একদিনের বদলে আমি বুধবারের প্রার্থনা প্রতিদিন করতে শুরু করলাম। এর আগে সবসময় প্রার্থনা কিছু না কিছু কাজে লেগেছে। হয়তো প্রতিদিনের প্রার্থনা দু সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহের আগে আমাকে স্থায়ী মুক্তি এনে দেবে। আমার প্রার্থনার টার্গেট ডেট তৃতীয় বুধবার,

www.pathagar.com

৩০ সেপ্টেম্বর। যদি ব্যর্থ হয় তাহলে পরবর্তী টার্গেট ডেট মার্গারেট থেচারের পাকিস্তান সফরের দিন, অক্টোবরে।

জিয়াকে হয়তো একদিন মুক্তি দিতে হবে। আমি মুক্ত হবার জন্য সবসময় একটি দিন ধার্য করি। আমি মার্গারেট থেচারকে চিনি। থেচার বিরোধীদলীয় নেতা থাকতে রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবণে বাবার সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাত করেছি তার অফিস হাউস অব কমনসে একটি চা চক্রে। তখন আমি অক্সফোর্ড ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। থেচারের সফরের সময় যদি মুক্ত না হই তাহলে হয়তো ঈদের সময় মুক্ত হবো। ঈদ ৯ অক্টোবর। সরকার সব সময় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতি সম্মান জানিয়ে কিছু বন্দিকে মুক্তি দিয়ে থাকে।

এর কোনো একটি দিনে আমার মুক্তি মিলল না। ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বরের ২৫ তারিখ, লাহোরে চৌধূরি জহুর এলাহিকে অ্যামবুশ করে হত্যা করা হয়েছে। জহুর এলাহি ছিলেন জেনারেল জিয়ার সামরিক কেবিনেটের একজন মন্ত্রী। জিয়া বাবার ফাঁসির আদেশে স্বাক্ষর করেছিলেন যে কলমটি দিয়ে সেটি উপহার দিয়েছিলেন এই জহুর এলাহিকে। বাবার ফাঁসির আদেশ কার্যকর করার পর এলাহি মিষ্টি বিতরণ করেছিলেন। যে গাড়িটিকে অ্যামবুশ করা হয়েছিল তাতে আরো ছিলেন লাহোর হাইকোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি মৌলভী মুশতাক হুসেইন। তিনি আহত হয়েছেন। এই মুশতাক হুসেইনই বাবার ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন। এছাড়াও গাড়িতে ছিলেন এম এ রেহমান। তিনি আমার বাবার মার্ডার কেসের পাবলিক প্রসিকিউটর। তিনি অল্প আহত হয়েছেন।

সংবাদপত্রে এলাহির হত্যার খবর পড়ে আমার মনে হল আল্লাহর বিচার আছে। এর নাম দৈব প্রতিশোধ। আমি ডায়েরিতে লিখলাম, 'এখন তার স্ত্রী, তার কন্যা, তার পরিবার শোক কি তা অনুভব করবে। আমি উল্লসিত হইনি। একজন মুসলমান কারো মৃত্যুতে উল্লসিত হতে পারে না। জীবন ও মৃত্যু একমাত্র আল্লাহর হাতে। কিন্তু শান্তনা একটা আছে, তা হল একজন খারাপ মানুষ কখনো শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে না।'

আমার সন্তোষলাভ ছিল অল্প সময়ের। ক্ষমতাসীনরা আবার অভিযোগ করল যে এই সহিংসতার জন্য আল জুলফিকার দায়ি। শুরু হল ধরপাকড়।

বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে মীর দাবি করল যে এই হত্যাকাণ্ড আল জুলফিকার ঘটিয়েছে। তার মৃত্যুতে এই বিতর্ক আসা উচিত ছিল যে বাবার মৃত্যুতে এলাহির অনৈতিক ভুমিকা তার মৃত্যুর জন্য দায়ি, তথাপি শাসকদের নজর পড়ল আল জুলফিকারকে সমূলে উৎখাতের দিকে।

সন্ত্রাসী! হত্যাকারী! রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা! এসব বলে সংবাদপত্রগুলো চিৎকার করল। আবারও রাজনৈতিক বিরোধীদের দমনে আল জুলফিকারের নামকে ক্ষমতাসীনরা কাজে লাগালো। একের পর এক পিপিপির তরুণ নেতা গ্রেফতার হতে থাকল। শতশত নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হল। চারজন তরুণকে ধরে হরিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে তাদেরকে ভয়ঙ্কর নির্যাতন করা হল। পড়ে আমি জেনেছি, একজনের পিতা, আহমেদ আলী সুমরো এসেছিলেন তার পিপিপি সদস্য ছেলেকে দেখতে। তিনি পুলিশকে অনেক টাকা ঘুষ দিয়েছিলেন শুধুমাত্র দূর থেকে ছেলেকে এক নজর দেখার জন্য। তিনি শুধু জানতে চেয়েছিলেন তার ছেলেটা জীবিত আছে কি না।

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে শুধুমাত্র হরিপুর জেলেই ১০৩ জন তরুণকে ধরে নেয়া হয়েছিল। আরো ২০০ ছিল কাছের একটি শহরে।

নারী কর্মীদেরও আবার গ্রেফতার করা হয়। নাসির রানা শওকতকেও আবার গ্রেফতার করে লাহোর দূর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। পিপিপি'র জেনারেল সেক্রেটারির স্ত্রীকে নিয়ে তারা বিদ্যুতের শক দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। ২৩ দিন তাকে ঘুমাতে দেয়নি। তাকে আদেশ দেয়া হয়, 'এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে তোমার স্বামীর জড়িত থাকার কথা স্বীকার কর। বেনজির এবং বেগম ভুট্টোর নাম বল।' কী দুর্বিসহ নির্যাতন এই সাহসী মহিলা সহ্য করেছে তা চিন্তা করা যায় না। তাকে পরবর্তী সাত মাস আটকে রাখা হয়েছিল এমন সেলে যেখানে টয়লেটের সুবিধা পর্যন্ত ছিল না। টয়লেট করার জন্য একটি পাত্র ছিল। সেটা সপ্তাহে দুবার বদলে দেয়া হত। সে গোটা শীতের সময় মেঝেতে শুয়ে কাটিয়েছে। এমনকি একটি সোয়েটারও ছিল না। কোনো বিছানা কোনো কম্বল ছিল না। নিউমোনিয়ায় প্রায় মরতে বসেছিল। তাকে যখন বাড়িতে পাঠিয়ে গৃহবন্দী রাখা হয় সে তখন হাঁটতে পারে না, কথা বলতে পারে না।

এই পাশবিক অত্যাচারের মাঝে মার্গারেট থেচার তার সফরে আসেন। দু'বছর আগে আমার বাবার ফাঁসি না দেয়ার ব্যাপারে সারা বিশ্ব অনুরোধ জানালে জিয়া তা বাতিল করে দিলে বিবিসির এক রিপোর্টে বলা হয়েছিল, পশ্চিমা কোনো দেশের সরকার প্রধানের জন্য পাকিস্তান সফর অচিন্তনীয়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান দখলের পরে পশ্চিমা দেশগুলোর এসব ধারণা দূর হয়ে যায়। বরং সেই বিবিসিই রিপোর্ট করে যে জিয়ার ভাবমুর্তি উজ্বল করার জন্য ব্রিটেন সব ধরণের চেষ্টা করে যাচ্ছে। একথা শুনতেও কষ্ট হয় যে বিশ্ব প্রচারমাধ্যম জানে জিয়া একজন নিন্দিত হত্যাকারী এবং ক্ষমতায় আছে বাইরের দেশগুলোর মদদে। আলো কষ্টের বিষয় হল পত্রিকায় সংবাদ বের হয়েছে, আফগান রিফিউজি ক্যাম্প পরিদর্শন করে মার্গারেট থেচার জিয়াকে উপাধি দিয়েছেন, 'স্বাধীন দুনিয়ার শেষ বুরুজ।'

আমি গভীরভাবে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম এই সংবাদ পড়ে যে রিগ্যান প্রশাসন কংগ্রেসের প্রচারের মাধ্যমে পাকিস্তানে সাহায্য দিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুলছে। সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রদুত রোন্যাল্ড স্পিয়ার সিনেট ফরেন রিলেশনস কমিটির কাছে প্রস্তাব করেন 'ভুট্টোর পরিবার হয়তো এই সাহায্যের বিরোধীতা করবে কিন্তু পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ বুঝতে পারছে সেকেলে ধরণের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাকিস্তান একটি হুমকীর মধ্যে আছে।' তার কথাটি ছিল পুরোপুরি ভুল। প্রথমত পিপিপি হল পাকিস্তানের জনগণের প্রধান কণ্ঠস্বর। দ্বিতীয়ত আমরা তখনো না, আজো না- পাকিস্তানে সাহায্যের ব্যাপারে বিরোধী নই। কিন্তু আমরা সেই সাহায্যের বিরোধী, যা সামরিক শাসনকে স্থায়ী করবে। অন্য একটি বিতর্কও ছিল। আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট জেমস বাকলি, যিনি পুরো প্যাকেজটি অর্গানাইজ করার দায়িত্বে ছিলেন- বললেন, পাকিস্তানের নিরাপত্তার স্বার্থেই নির্বাচন নয়। যেন স্বৈর শাসকের পরিবর্তে আমরা গণতান্ত্রিক দলগুলোই শত্রু।

সে সময় আমি জানতাম না যে এই খবরের পেছনে বেশ কিছু আমেরিকান রাজনীতিবিদ মি. বাকলির এই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। পিটার গলব্রেথ ওয়াশিংটন ফিরে গিয়েছেন দৃঢ় সংকল্প নিয়ে যে পাকিস্তানে মানবাধিকার লজ্ঘিত হচ্ছে তা উত্থাপন

www.pathagar.com

করবেন এবং আমার মুক্তি চাইবেন। সিনেটর পেলের সঙ্গে একত্রে পিটার একটি সোজা সাপটা পরিকল্পনা করেন। যতবার সিনেটে পাকিস্তান প্রশ্ন আসবে ততোবার মানবাধিকার পরিস্থিতি ও আমার মুক্তির প্রশ্ন তোলা হবে। তাহলে যুক্তরাস্ট্র প্রশাসন বা স্বৈরশাসক কেউ পাকিস্তানের রাজনৈতিক বন্দিদের কথা ভুলতে পারবে না। তারা আশা করলেন অব্যাহতভাবে চাপ প্রয়োগ করা হলে তারা দেখবে যে আমাকে এবং অন্যান্য বন্দিদের ব্যাপার নিয়ে দ্বন্দ্ব করার বদলে মুক্তি দিয়ে দেয়াটা সহজ।

আমি পরবর্তীতে পড়েছিলাম কীভাবে পাকিস্তানে সাহায্য বিরোধী সিনেটর পেল তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিলেন। ইন্ডিয়া টুডে উদ্ধৃতি করেছে, সিনেটর পেল আন্ডারসেক্রেটারি বাকলিকে বলেছেন, 'এফ ১৬ হল জিয়ার শাসনকে আমেরিকার সমর্থনের চাক্ষুষ প্রমান।' বাকলি যখন অস্পষ্ট উত্তর দিতে চেষ্টা করলেন তখন সিনেটর পেল তাকে সুনির্দিষ্ট করে বলেছেন, 'আমনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল মনে করছে মানবাধিকার লঙ্ঘন পাকিস্তানে স্থায়ী রুপ নিয়েছে, আপনি কি মনে করেন তারা সঠিক বলছে? 'সিনেটর পেল অভিযোগ করে বলেন, 'এটা পরিস্কার যে প্রেসিডেন্ট জিয়া মৃত্যুদণ্ড দেয়া, হত্যা করা সাবেক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর বিধবা স্ত্রী এবং কন্যার সঙ্গে শত্রুতামুলক আচরণ করে যাচ্ছেন। আমি বিস্মিত হচ্ছি পাকিস্তানের সরকারের কাছে ভুট্টো পরিবারের বন্দীত্ব নিয়ে প্রশাসনের কোনো প্রস্তাব নেই দেখে।' উত্তরে বাকলি প্রতিশ্রুতি দেন 'ব্যক্তিগত কুটনৈতিক' উদ্যোগের। এটা হল কিছুই না করার একটি প্রতিকী শব্দ। কিন্তু সিনেটর পেল অন্তত তার বক্তব্য তুলে ধরতে পেরেছেন।

•

করাচি সেন্ট্রল জেলেই ঈদ এল এবং চলে গেল। মুক্তি পেলাম না। পাঠান মেট্রন আমাকে জানালেন যে ঈদ উপলক্ষে যাদের মুক্তি দেয়া হয়েছে তার মধ্যে রাজনৈতিক নেতাও আছেন। শুনে আমার তাদের পরিবারের জন্য আনন্দ হল। জেলখানার অনেক কর্মচারীই ঈদ উপলক্ষে আমাকে উষ্ণ আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা জানালেন। একজন কারারক্ষীর স্ত্রী আমার কাছে একটি পোষাক চাইলেন যাতে সেটি অনুসারে আমার জন্য পোষাক বানাতে পারেন। অন্য একজন জেলার খবর পাঠালেন যে তিনি আমার সেল-ব্লকে বিদ্যুত না আসা পর্যন্ত ডেস্কে আছেন এবং কর্তৃপক্ষকে চাপ দিয়ে যাচ্ছেন বিদ্যুত দেয়ার জন্য। আমি আমার ডায়েরিতে লিখলাম, 'আশাকরি সুদিনে এই মানুষগুলোকে ভুলবো না।'

ঈদ উপলক্ষে বন্দিদের মুক্তি দেয়া হলেও আরো দশজনকে আটক করা হল। আমি প্রত্রিকায় পড়লাম ছাত্র নেতা লালা আসাদকে গ্রেফতারের জন্য খোঁজা হচ্ছে। সে এবার শিকারে পরিণত হয়েছে। লালা আসাদ পার্টির একজন একনিষ্ঠ সমর্থক। আমি প্রার্থনা করলাম সে যেন পুলিশের চোখ ফাকি দিতে পারে। ১৯৮১ সালে মুক্ত সময়ে আমি খায়েরপুর সফরে গিয়েছিলাম। যারা মার্শাল ল' এর সময় প্রতিবাদ করেছে তাদের সনদ প্রদানের উদ্দেশে। আমি লালা আসাদের ছেলে জুলফিকারের জন্মবার্ষিকী পালনের দাওয়াতে উপস্থিত হয়েছিলাম। ছেলেটির নাম রাখা হয়েছে আমার বাবার নামানুসারে। বাবাকে সমর্থন করার কারণে লালা আসাদ দুই বছর জেল খেটেছে। তার পিতা ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক মন্ত্রী। পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর

www.pathagar.com

সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করেছেন। আমার সফরের সময় তিনি আমাকে দেখতে চেয়েছেন। তিনি অসুস্থ এবং বিছানায় শয্যাশায়ী। বৃদ্ধ মানুষটি আমাকে সবিনয় অনুরোধ করলেন আমি যেন তার ছেলেকে রাজনীতি থেকে সরে যেতে বলি।

লালা আসাদের পিতা আমাকে বললেন, 'আমি আর বেশি দিন নেই। ভুট্টো যখন জেলে ছিলেন তখন আমি আমার ছেলের রাজনীতি করার ব্যাপারে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করিনি। এখন প্রধান মন্ত্রী মৃত। আমাকে দেখাশোনার জন্য, তার স্ত্রী ও শিশুদের দেখাশোনা করার জন্য এখন তাকে প্রয়োজন। আমি যখন থাকব না তখন সে তোমার জন্য তোমার দলের জন্য কাজ করতে পারবে। কিন্তু আমার মৃত্যুকালীন এই সময় আমার ছেলেটাকে পাশে দরকার।' আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে লালার সঙ্গে কথা বলব। কথা বলেছিলামও। কিন্তু আমি চলে আসার পর বলতে পারব না কী ঘটেছিল। এর একমাস পর আমি গ্রেফতার হলাম এবং আমাকে সুক্কুর কারাগারে নিয়ে যাওয়া হল। এখন এক বছর পর লালাকে আল-জুলফিকারের নেতা হিসাবে খোঁজা হচ্ছে। আমার কোনো ধারণাই নেই যে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্যি কি না।

সন্ত্রাস, সহিংসতা। এই চক্র কি শেষ হবে না? মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তিনজন প্রেসিডেন্টকে ঘাতকরা হত্যা করেছে। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, ইরানের প্রেসিডেন্ট রাজাই এবং সর্বশেষ ৬-অক্টোবর মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা'দাতকে হত্যা করা হয়েছে। আমার প্রেসিডেন্ট সা'দাত এর জন্য মায়া হচ্ছে। তার পরিবারের জন্য মায়া হচ্ছে। শিশু অবস্থায় আমি তার পুর্বসূরি গামাল আব্দুল নাসেরের সমর্থক ছিলাম। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা এবং আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার সুয়েজ যুদ্ধে আমি উচ্চকিত প্রশংসা করতাম। নাসের আমার দৃষ্টিতে ছিলেন বিরাট এ প্রতিমূর্তি। সেকেলে রাজা, রাজাধিরাজের ধ্বংসস্তুপ এবং ছাইয়ের উপর তিনি একটি নতুন সাম্যবাদী পৃথিবীর জন্ম দিতে চেয়েছিলেন। ৭০ ক্লিফটনে বাবার লাইব্রেরিতে আমি নাসেরের উপর যত বই পাওয়া গেছে তা পড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় অতিক্রম করেছি। এরমধ্যে তার ফিলোসফি অফ দি রেভ্যুলেশনও ছিল।

আমি সা'দাতের ততোটা ভক্ত ছিলাম না। তিনি ১৯৭০ সালে ক্ষমতায় এসে তার পরামর্শদাতাদের উপেক্ষা করে পলিসি পরিবর্তন করেছিলেন। কিন্তু সেলে বসে সা'দাতের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমার ভেতরে অপ্রত্যাশিতভাবে নাড়া দিয়ে গেল। যদিও বাবা সা'দাত এর ইসরাইলের সঙ্গে আলাদাভাবে শান্তি প্রচেষ্টার তীব্র সমালোচক ছিলেন, তথাপি সা'দাত আমার পিতার প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলেন। জনপ্রিয়তা নষ্টের ঝুঁকি নিয়েও সা'দাত ইরানের শাহ এবং তার পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। শাহ যখন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন তখন মিশরের প্রেসিডেন্ট সা'দাত পূর্ণ মর্যাদায় তাকে দাফনের আদেশ দিয়েছিলেন। এমন বদান্যতা বিশ্ব রাজনীতির বাস্তবতায় খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। তার চিন্তার সঙ্গে মতবিরোধের রাজনীতিকে তিনি ছুঁড়ে ফেলে দেননি। এখন তিনিও মৃতের খাতায় চলে গেলেন।

বিষন্নতা আমাকে চেপে ধরল। রাতের পর রাত এমব্রয়ডারি করেছি। আমার বমিসহ মাথাব্যাথা শুরু হলো। নভেম্বরের ২১ তারিখ, আমার ভাই শাহ'র জন্মদিনে হঠাৎ লক্ষ করলাম গলা কেমন যেন আটকে যাচ্ছে। চোখ দিয়ে অজস্র পানি বের হচ্ছে। আমি শুয়ে

www.pathagar.com

পড়তে চেষ্টা করলাম, কিন্তু চোখ দিয়ে যে পানি বের হচ্ছে তা নিয়ন্ত্রন করতে পারছি না। আমার ভাইয়েরা কোথায়? কেমন আছে তারা? শাহ এবং মীর দু'জনই ঈদের পর বিয়ে করেছে। তারা দুজনই দুই আফগান বোনকে বিয়ে করেছে। তাদের একজনের নাম ফাওজিয়া আরেকজন রেহানা। ওরা এক সাবেক সরকারি কর্মকর্তার মেয়ে। আমরা তাদের সম্পর্কে শুধু এটুকুই জানি। আমি খুবই খুশী হয়েছিলাম যে আমার ভাইয়েরা অন্তত ভালোবাসার মানুষ পেয়েছে। এই দুঃসময়ে উষ্ণ সান্নিধ্য এবং আবেগ তাদের খুবই প্রয়োজন। তাহলে আমার বিষন্ন হওয়ার কী আছে?

আমি অগভীর ঘুমে জড়িয়ে গেলাম। আমি পূনঃ পুনঃ স্বপ্ন দেখলাম মীর গোপনে পাকিস্তান ফিরে এসেছে। সে আফগানিস্তান থেকে হিন্দুকুশ হয়ে পাহার দিয়ে হেঁটে পাকিস্তানে এসেছে এবং ৭০ ক্লিফটনে একটা আলমারির ভেতর লুকিয়ে আছে। সেনাবাহিনী বাড়িটি ঘিরে ফেলেছে। ঠিক যখন তারা আলমারির কপাট খুলে তাকে দেখল তখনই আমার ঘুম ভেঙে গেল।

আমি ভুল লোককে গতরাতে স্বপ্নে দেখেছি। পত্রিকা খুলে দেখলাম লালা আসাদকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে। আমার মাথার যন্ত্রনা বাড়তে থাকল। সংবাদপত্রের ভাষ্যে বলা হয়েছে, 'করাচি ফেডারেল বি এলাকায় পুলিশের সঙ্গে এক বন্দুক যুদ্ধে লালা আসাদ মারা যায়। সে একজন পুলিশকে গুলি করে হত্যা করলে তাকে গুলি করে মারা হয়।' কয়েক মাস আমি প্রকৃত ঘটনা জানতে পারিনি। প্রকৃতপক্ষে লালা আসাদ তখন ছিল পুরোপুরি নিরস্ত্র। ক্রস ফায়ারের সময় ওই পুলিশ অন্য এক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। লালা আসাদ যখন অ্যামবুশের ভেতর থেকে পালাতে চেষ্টা করছিল তখন তাকে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়। লালা আসাদ মারা গেল। জেনারেল জিয়ার উর্দিতে এখন তার রক্তের ছাপ। লালার পিতার অনুভূতি কী? তাকে দেখাশোনার বদলে তার লাশই তাকে গ্রহণ করতে হল। এর শেষ কোথায়?

নভেম্বরের ২৬ তারিখে পত্রিকা রিপোর্ট করল, 'আল জুলফিকারের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ কয়েক শত লোককে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সারা দেশের এয়ারপোর্টে, হোস্টেলে বাড়িতে বাড়িতে হানা দিচ্ছে। করাচির পথে স্থল সমুদ্র আকাশি সর্বত্র চেক পয়েন্ট বসানো হয়েছে। প্রতিটি গাড়ির জানালা দিয়ে পুলিশ উঁকি মেরে তল্লাশি করছে।' মেকআপ নেয়া শিল্পীদেরও পুলিশ ছদ্মবেশে পলায়নকারী বলে আখ্যায়িত করল।

আমার উদ্বেগ গভীর থেকে গভীর হল। লালার মৃত্যু শোকে আমি ভেঙে পড়লাম। আমি লালার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলাম। তার সঙ্গে যে কঠিন আচরণ করেছি সে জন্য লালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। ৭০ ক্লিফটনে লালার যে ছবি রেখেছিলাম সে জন্য আমার ভেতরে যন্ত্রনা হতে থাকল। পুলিশ শেষবার বাড়িতে হানা দিয়ে ওই ছবিগুলো নিয়ে গেছে। তারা কী ওই ছবি দেখেই লালাকে শনাক্ত করেছে?

আমি আমার হাতের উল্টোপিঠে, চোখের কোনে গালে, কপালে অসংখ্য জালের মত রেখা দেখতে পেলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম ওগুলো সুক্কুর জেলে প্রচন্ড গরম এবং গরম বাতাসের কারনে হয়েছে। ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ওগুলো স্থায়ী রুপ নিল। দ্রুত আমার বয়স বেড়ে যেতে থাকল।

www.pathagar.com

ডিসেম্বর মাসের ১১ তারিখ আমার ডিটেনশনের দিন শেষ হল। আমি নতুন ডিটেনশন আদেশের জন্য প্রস্তুত হলাম। স্বাভাবিক সময়ের চাইতে একঘণ্টা আগে আমার খাবার এল। সঙ্গে আসল পুনরায় ডিটেনশন অর্ডার। কিন্তু সিনেটার পেলের বার্তার রেষ প্রতীয়মান হল পাকিস্তানে। দু'সপ্তাহ পরের এক দুপুরে অপ্রত্যাশিতভাবে জেলের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট এলেন আমাকে দেখতে। কোনো ভুমিকা না রেখে তিনি বললেন, আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন। আপনাকে আগামীকাল ভোর ৫.৪৫ এর সময় পুলিশ প্রহরায় লারকানায় পাঠানো হবে।

বিদায় বেলা মেট্রন কাঁদলেন। পাঠান মেট্রনও কাঁদলেন। তারা দু'জনই কোনো দুর্ব্যবহার করে থাকলে তার জন্য ক্ষমা চাইলেন। আমি নিজেও ভেতরে ভেতরে কাঁদলাম। যদিও আমি স্বপ্ন দেখেছি, কল্পনা করেছি আমাকে আমার বাড়ির সাবজেলে নেয়া হবে, কিন্তু আমি আতঙ্কিতও হলাম আমাকে করাচির সেন্ট্রাল জেলে যে গোপন নেটওয়ার্ক করা হয়েছে সেখানেও নেয়া হতে পারে। সযত্নে লুকিয়ে রাখা ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন, টাইম নিউজউইকের সংখ্যাগুলো সঙ্গে নিলাম। এগুলো সহৃদয় হয়ে জেলাররা আমাকে পাঠাতে দিয়েছিলেন। এছাড়া আমি এতদিন মা এবং বোনের কাছাকাছি ছিলাম। এখন আমাকে তাদের কাছ থেকে সরিয়ে আল মুর্তাজার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে পৃথক করা হচ্ছে।

২৭ ডিসেম্বর ভোরে পুলিশ আমাকে নিতে এল। আমি শেষবারের মত ভয়াবহ, সেঁতসেঁতে সেলটির দিকে তাকালাম। এই জায়গা ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হবে কেন? কিন্তু আমার একই রকম প্রতিক্রিয়া হল সুক্কুরের পরিচিত জেল খানা ছেড়ে আসার সময় যেমন হয়েছিল। বছরের পর বছর জেলে থাকার ফলে তার একটা প্রভাব পড়েছিল। আমি অপরিচিত যে কোনো কিছুতে ভয় পেতাম।

www.pathagar.com

১০

সাব জেলে একাকী আরো দুই বছর

স্বচ্ছন্দ আরামদায়ক। গৃহকোণ। আধাসামরিক ফ্রন্টিয়ার ফোর্সকে সাবজেল ঘোষিত আল মুর্তাজার কম্পাউন্ডের দেয়ালের ভেতরে আবার মোতায়েন করা হয়েছে এবং আমার আটকাবস্থার তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন একজন কারা কর্মী আসছে– এ বাস্তবতাকে পাশে সরিয়ে রেখে আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম আমার আপাতত সৌভাগ্যে। সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ আমাকে জানালো, গৃহকর্মীদের কয়েকজনকে আল-মুর্তাজায় দিনের বেলায় প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। আমি টেলিফোন ব্যবহার করতে পারব এবং সবচেয়ে যেটি আনন্দের, প্রতি ১৫ দিনে তিনজন সাক্ষাৎ প্রার্থীর সঙ্গে দেখা করতে পারবো। প্রায় দশ মাস নিঃসঙ্গ হাজত বাসের পর এসব সুবিধাদি পাঁচতারকা হোটেলে থাকার সমতুল্য মনে হচ্ছিল। নিজ বাড়িতে আমি প্রথম রাতটি উদযাপন করি উষ্ণ জলে দীর্ঘ সময় ধরে স্নান করে এবং আমার নখের পরিচর্যা করে।

তবে আমি খুব বেশি তাড়াতাড়িই উৎফুল্ল হয়েছিলাম। আমার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কথোপোকথনের মধ্যেই আমার টেলিফোন কল সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং আমাকে রাজনৈতিক বিষয়াদির ব্যাপারে আলাপ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। টেলিফোন কাজ করত কালে ভদ্রে। প্রায়ই আমার কলগুলোর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, নচেৎ দেখা যেত লাইনটিই ডেড। পরে আমি এর কারণ খুঁজে পাই। আমার ফোন লাইন দেয়ালের বাইরে অবস্থিত সামরিক যোগাযোগ ছাউনি হয়ে কাজ করত।

যে বছর সরকার আমাকে আল-মুর্তাজায় বন্দি করে, প্রতি ১৫ দিনে তিনজন দর্শন প্রার্থীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রতিশ্রুতিটিও অচিরেই কল্পনায় পরিণত হয়। শুধুমাত্র আমার মা, সনম ও আমার খালা মান্নাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেয়া হয়। প্রত্যেকেই করাচিতে থাকেন, বিমানযোগে এক ঘণ্টার পথ। তবে তাদের সফরকে আরো কঠিন করে তুলত মধ্য সিন্ধুতে যাওয়া বিমানের অনিয়মিত ফ্লাইট ও অসুবিধাজনক সময়ে যাত্রা করার কারণ। ঘর ও স্বামীর দেখভাল করার দায়িত্ব পালন করে সনম একবার বা দু'বার আসতে

www.pathagar.com

পারতো। ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারিনী আমার মা নিয়মিত আমাকে দেখতে না। লারকানায় আমার রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠজনেরা ছিলেন যারা সহজেই আ করতে পারেন, তবে জেল কর্তৃপক্ষ 'বদলি' কাউকে অনুমোদন দেয়নি। আমি আবার নিঃসঙ্গ কুঠুরিতে বন্দি হয়ে যাই। যখনই একজন দর্শণার্থী আমার কাছে আসতেন, তিনি চলে যাবার পর, কথা বলার অনভ্যস্ত কসরতের কারণে আমার চোয়ালগুলো ব্যথা করত। কথা বলার কেউ না থাকায় চোয়ালের এই ব্যবহার হতো না বললেই চলে। অবশ্য আমার দর্শণার্থীর তালিকায় কারা কর্মকর্তারাই বেশি ছিলেন। অন্য কোন কারণে না হলেও শুধু মানুষের কণ্ঠস্ব শোনার জন্য হলেও আমার সম্ভবত উচিত ছিল নিজের সঙ্গেই কথা বলা। তবে বিষয়টি আমার মাথায় এর আগে আসেনি।

যাহোক, প্রতি তিন মাস অন্তর আটকাদেশের নতুন অর্ডার আসত। অর্ডারের ওই শব্দগুলোর সঙ্গে এখন আমার অন্তরে পরিচয়। 'যেহেতু উপ-সামরিক আইন প্রশাসকের মতে সামরিক আইন যে উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে তার পরিপন্থি কোনো কার্যক্রম থেকে মিস বেনজির ভুট্টোকে বিরত রাখার উদ্দেশে, অথবা পাকিস্তানের নিরাপত্তার স্বার্থে, জনগণের নিরাপত্তা বা স্বার্থ, অথবা সামরিক আইন কার্যকর রাখতে বর্ণিত মিস বেনজির ভুট্টোকে আটক রাখা প্রয়োজন...'

পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে আটকাবস্থার সময়কে ভারী মনে হচ্ছিল। কোন সান্ধ্য পত্রিকা ছিল না, ছিল না ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন। টেলিভিশনে অনুষ্ঠান বলতে ছিল– আরবী ভাষা শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান, সিন্ধু, উর্দু ও ইংরেজিতে জিয়ার সংবাদ, সরকারের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিয়ে মগজ ধোলাইয়ের প্রামাণ্য চিত্র এবং আধ-ঘণ্টার গুটি কয়েক নাটিকা। এই যন্ত্রণাদায়ক বন্দিত্বের জন্য নিজের প্রতি করুণা হতো এসব ভাবতেই পার হয়ে যেত দীর্ঘক্ষণ। আবার নিজেকেই আমি তিরস্কার করতাম, আল্লাহর প্রতি তোমার অকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয়। তোমার নিজের ঘর আছে। তোমার খাবার ও পোশাক আছে। ভেবে দেখ ওইসব কম সৌভাগ্যবানদের কথা নয়। আমার আবেগ পেণ্ডুলামের মত একবার এদিক একবার ওইদিক দুলতে লাগল।

সময় কাটাতে আমি রান্না শিখেছি, রান্না ঘরে থেকে যাওয়া আমার মায়ের পুরনো রন্ধন বই থেকে রেসিপিগুলো নিয়ে চর্চা করি। ওভেনটি কাজ করছিল না এবং রান্নার আসবাবপত্র বা উপকরণও ছিল সীমিত। এমনকি ডিম ফেটানোর যন্ত্রও ছিল না। ঝোল, ভাত, ডাল– ওই সময় আমি যা-ই রান্না করছিলাম, তা-ই এক একটা ছোট বিজয়ের মতো মনে হচ্ছিল। ঠিক যেমনটা তিন বছর আগে আল-মুর্তাজায় আমাদের আটকাবস্থার সময় আমার মা ঢেড়স ও মরিচ গাছ অঙ্কুরিত করে বিজয় অনুভব করেছিলেন, এখন আমি যে খাবার তৈরি করছি তার আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। আমার রান্না করা এক বৌল ভাতের দিকে আমি তাকাই, এটা প্রকাশ করে আমার অস্তিত্ব। আমি একে ভক্ষণীয় করেছি। কোকিয়ো ইরগো সাম, আমি রান্না করি, কাজেই আমি অস্তিত্বশীল।

আমি আমার মা'কে নিয়ে সবসময় উদ্বিগ্ন ছিলাম। করাচি কেন্দ্রীয় কারাগারে তিনি আমাকে দেখে যাওয়ার পর চার মাস পার হয়ে গেছে। ওই সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন তার ফুসফুসে ক্যান্সার হয়েছে বলে তার চিকিৎসক সন্দেহ করছেন। যদি সত্যিই তার ক্যান্সার হয়ে থাকে, তাহলে তিনি সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন। ফুসফুসের ক্যান্সার শুরুতেই

www.pathagar.com

সনাক্ত ও চিকিৎসা করা গেলে এর বিস্তার বন্ধ করা যায়। চিকিৎসা করা না হলে, ফুসফুসের ক্যান্সার দ্রুত মৃত্যু ঘটাতে পারে। অধিকতর ডায়াগোনোস্টিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তৈরি হতে তার শক্তি বৃদ্ধিতে তাকে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন তার চিকিৎসক। সর্বশেষ পরীক্ষাগুলোর ফলাফল ছিল অধিকতর চূড়ান্ত। চিকিৎসকরা সিদ্ধান্ত দেন তার বাম ফুসফুসে যে ছায়া তা খুবই মারাত্মক। সরকারের কাছে তারা এক রিপোর্টে জানায়, তার ক্যাটস্ক্যান ও চিকিৎসা প্রযোজন যা পাকিস্তানে দেয়া সম্ভব নয়। চিকিৎসার প্রয়োজনে বিদেশ যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট ফেরত দেয়ার অনুরোধ করলেও আমার মায়ের আবেদন উপেক্ষিত হয়। শোনা যাচ্ছিলো যে অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কিছুই করার নেই, কারণ আমার মায়ের ফাইলটি জিয়া তার বেইজিং সফরে সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

একমাস পার হয়ে যায় এবং এ সময়ের মধ্যেও সরকার আমার মা'কে অনুমতি দেয় না পাকিস্তান ছাড়ার। তারপর আরো একটি মাস। আশা ছেড়ে দিয়ে করাচিতে আমার মায়ের চিকিৎসক কেমোথেরাপি শুরু করেন। ফোনে মা যখন প্রথম খবরটি দিলেন তখন আমি হতাশ হলাম এবং তার পরবর্তী কলগুলো আমার হতাশাকে গভীর করে তিক্ততায় রূপ নেয়। তার মাথার চুল পড়ে যাচ্ছিলো এবং তিনি ওজন হারাচ্ছিলেন। তিনি দুঃখের সঙ্গে জানান যে, তিনি হয়তো আমাকে দেখতে আসতে পারবেন না। মেয়ে হিসেবে আমি অক্ষমতা অনুভব করি যে আমি তার সঙ্গে থাকতে পারছি না বা সাহায্য করতে পারছি না।

সংবাদ মাধ্যমে সেন্সরশিপ সত্ত্বেও আমার মা'র বাঁচা মরার লড়াই সাড়া দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন মা'কে ভুলে যায়নি, সনম আমাকে টেলিফোনে জানায়। তার বিষয়ে খোঁজ-খবর জানতে চেয়ে লোকজনের ফোন পাচ্ছি এবং ফাখরিও তাই লিখেছে। কূটনৈতিক সম্বর্ধনা ও কফি পার্টি, বাস স্টপ ও সিনেমা– সর্বত্রই দৃশ্যত আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে তার স্বাস্থ্য।'

নিজেকে সামলাতে আশ্বস্ত করে আমি বলি, 'জিয়াকে অবশ্যই তাকে যেতে দিতে হবে।' কিন্তু জিয়ার ওপর চাপের কথাটি যখন চাউড় হয়ে যায়, এমনকি তখনো তিনি তাকে যেতে দেননি। পরিবর্তে, সম্ভাব্য ক্যান্সার নিয়ে চিকিৎসকরা রিপোর্ট দেয়ার তিন মাস পর জিয়া একটি ফেডারেল মেডিকেল বোর্ড গঠন করেন বিদেশে চিকিৎসা নেয়ার মতো আমার মা যথেষ্ট অসুস্থ্য কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য।

আবার ফেডারেল মেডিকেল বোর্ড। আরেকটি সংকীর্ণতা। আইয়ুব খানের শাসনামল থেকেই বিদেশ ভ্রমণে ছিল বিধি-নিষেধ। একটি পাসপোর্ট পেতে হলে পাকিস্তানের নাগরিকদের প্রয়োজন হতো একটি মেডিকেল বোর্ডের অনুমোদন। আমার বাবার শাসনামলে পাসপোর্ট পাবার অধিকার প্রত্যেক পাকিস্তানির জন্য মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং এর মাধ্যমে মুক্তভাবে ভ্রমণ করারও অধিকার দেয়া হয়। জিয়া সরকারের সদস্যদের জন্য এটি একটি ভিন্ন ব্যাপার ছিল। যে সকল ছোট-খাটো অসুস্থতার অজুহাতে তারা সরকারি খরচে বিদেশ গমন করে, এসব অসুখ পাকিস্তানে সহজেই চিকিৎসাকরা যায়। তবে নিজের রাজনৈতিক বিরোধীদের জন্য জিয়া মেডিকেল বোর্ড গঠনের বিষয়টি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। চিকিৎসার জন্য আমার মায়ের বিদেশ গমন একটি সাধারণ বিষয় ছিল, বিলম্বিত করতে এখন তিনি এটাকে ব্যবহার করছেন।

অবশেষে বোর্ড যখন গঠিত হল, তখন দেখা গেল যে এতে জিয়ার লোকজনের

www.pathagar.com

গাদাগাদি। আমার বাবার মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখতে সুপ্রিমকোর্টের রায় পেতে যেমন জুডিসিয়াল বেঞ্চের আকার ছোট করা হয়েছিল, ঠিক তেমনি সচরাচর তিনজনের পরিবর্তে সাত জন চিকিৎসক সমন্বয়ে বোর্ড গঠন করা হয়। জিয়া যে ধরনের সিদ্ধান্ত চান, তেমনটা পেতেই সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। সাত জনের সকলেই ছিলেন সরকারি চাকুরে। বোর্ডের প্রধান করা হয় একজন কর্মরত মেজর জেনারেলকে।

বোর্ডের প্রথম বৈঠক অল্পকাল পরেই এই জেনারেল দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো বলেন, 'বেগম সাহেবাকে আমার কাছে যথেষ্ট ভালই মনে হয়েছে।' মন গড়া বোর্ডের অন্য সদস্যরা দাবি করেন আমার মা'র ফুসফুসের আরো ১৪টি এক্সরে ও রক্ত পরীক্ষা করার; প্রক্রিয়াটি এতোটাই ক্লান্তিকর যে মা'র জ্বর এসে গেল, কাশির সঙ্গে রক্ত যেতে শুরু করল এবং কাশি থামার পর তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। যদিও পরীক্ষাগুলোতে দেখা যাচ্ছিল যে তার ফুসফুসের ওপর কালো ছায়াটি দীর্ঘ হয়েছে এবং তার রক্তে হিমোগ্লোবিন হ্রাস পেয়েছে, তথাপি বোর্ড প্রধান পরামর্শ দেন মা'র আরো একটি ব্রোঙ্কোস্কোপি করার। এটা শুধু অপ্রয়োজনীয়ই ছিল না, বরং এটি ক্ষতের বিস্তার ঘটাতে পারে। করাচিতে আমার মা'য়ের চিকিৎসক ডা. সাইদ বোর্ডের সদস্য ছিলেন এভং তিনি ক্ষুব্ধ হন ও বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অপারগতা প্রকাশ করেন। হাসপাতালে এনেসথেটিস্ট তাকে সমর্থন করেন, তিনি জোর দিয়ে বলেন, আমার মা তার ফুসফুসে ডায়াগোনোস্টিক টিউব ঢুকানোর জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ এনেসথেটিকের ধকল সহ্য করতে পারবেন না।

আল-মুর্তাজায় আমি আমার মা'র জন্য প্রার্থনা করি। আমার করার মতো আর কিছুই ছিল না। কিন্তু দেশের বিভিন্ন স্থানে এ শঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে যে জিয়া প্রকৃতপক্ষে চান আমার মা মারা যাক, আর এ শঙ্কাই লোকজনকে সক্রিয় করে। লোকজন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকে, 'আমরা ভুট্টোকে রক্ষা করতে পারিনি, বেগম ভুট্টো যখন বাঁচা-মরার লড়াই করছেন তখন আমরা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।' সরকারের হাতে আমার মা'র নির্মম 'চিকিৎসা'র প্রতি ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ পিপিপির ঐতিহ্যবাহী সমর্থকের তালিকায় অল্পতেই অন্তর্ভুক্ত করে সামরিক পরিবার ও জিয়ার আমলাতন্ত্রের উচ্চপদে আসীনদেরও।

ফাখরি টেলিফোনে উত্তেজিত স্বরে বলে, 'জানো কি হয়েছে! সিন্ধুর সামরিক আইন প্রশাসকের স্ত্রী ও বোনরা খালার জীবন বাঁচাতে নারীদের একটি প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিয়েছেন।'

আমি যা শুনছিলাম তা বিশ্বাস হচ্ছিল না, তাই প্রায় চিৎকার করে জানতে চাই, 'পুলিশ কি তাদের গ্রেফতার করেছে?' জেনারেল জিয়ার পর চার প্রাদেশিক সামরিক আইন প্রশাসক দেশে সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি।

ফাখরি বলে, 'তারা সাহস করেনি। তারা যখন এলো তখন সকল প্রতিবাদকারী দৌড়ে সামরিক আইন প্রশাসকের বাড়িতে যায় ও গেট বন্ধ করে দেয়।

আমার মা'র বাঁচা-মরার লড়াই বিদেশেও প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে, যা আমি পরবর্তীতে জানতে পারি। ইংল্যান্ডে অক্সফোর্ডের আমার পুরনো বন্ধুদের একটি গ্রুপ ড. নিয়াজি, আমিনা পিরাচা এবং কয়েকজন মানবাধিকার কর্মীর সঙ্গে যোগ দেন একটি প্রচারাভিযান গড়ে তুলতে যার নাম ছিল 'ভুট্টো নারীদের বাঁচান।' গ্রুপটি শুরুতে মনোযোগ নিবদ্ধ করে আমার মা'কে মুক্ত করার ওপর। এ জন্য তারা হাউস অব লর্ডস-এর সদস্য

www.pathagar.com

লর্ড এভবারির সহায়তায় পার্লামেন্টে দেন-দরবার করেন। দুইজন পার্লামেন্ট সদস্য, জন লেস্টর ও জোনাথান এটকেন দ্রুত সাড়া দেন এবং তাদের উদ্যোগে হাউস অব কমনস-এ বেগম ভুট্টোর চিকিৎসা নিরাময় শীর্ষক একটি আর্লিডে মোশন গৃহীত হয়। এতে বলা হয় এই হাউস পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে বেগম ভুট্টোকে তার ক্যান্সার নিরাময়ে চিকিৎসা গ্রহণের জন্য বিদেশ যাওয়ার অনুমতি প্রদানের। ৪ নভেম্বর লর্ড এভবারি হাউস অব লর্ডস-এ একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন, এতে একজন ব্রিটিশ চিকিৎসক আমার মা'র অবস্থার গুরুতর দিকটি তুলে ধরেন।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সদস্যরাও আমার মায়ের পক্ষে আবেদন জানিয়ে আসছিলেন। বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক সিনেট কমিটির সদস্য সিনেটর জন গ্লেন ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ইজাজ আজিমের কাছে এক চিঠিতে লিখেছেন, প্রিয় রাষ্ট্রদূত মহোদয়, দুই মাসের অধিক সময় আগে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর বিধবা স্ত্রী মিসেস নুসরাত ভুট্টো বিদেশ যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন তার ফুসফুসের সম্ভাব্য ক্ষত নিরাময়ে। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি আপনার সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি মিসেস ভুট্টোর আবেদন দ্রুততার সঙ্গে অনুমোদন করার জন্য। দ্রুত অনুমোদনকে এখানে দেখা হবে সহানুভূতিশীল কাজ হিসেবে এবং এটা আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে সহায়তা করবে।

যাহোক পশ্চিমা সরকারগুলো সহানুভূতি প্রদর্শন করার জন্য আহ্বান জানালেও জিয়া তার স্বভাবসুলভ ওইসব আহ্বান উপেক্ষা করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সফরের সময় তিনি এতোটাই আস্থাশীল ছিলেন যে বোর্ড তার প্রদর্শিত পথেই এগোচ্ছে এবং তিনি যে সিদ্ধান্ত কামনা করেন বোর্ড সে সিদ্ধান্তই দেবে। ১১ নভেম্বর কুয়ালালামপুরে তার দেয়া বক্তব্য উদ্ধৃত করে সংবাদ মাধ্যমে বলা হয় 'বেগম ভুট্টোর কোন কিছু হয়নি'। এদিনই বোর্ডের চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় নির্ধারিত ছিল। জিয়া বলেন, 'তিনি যদি কোথাও বেড়াতে বিদেশ যেতে চান, তাহলে তিনি এর জন্য আবেদন করতে পারেন এবং আমি বিষয়টি ভেবে দেখব।'

তবে জেনারেল জিয়া আমার মা'র চিকিৎসক ডা. সাইদকে গোনায় আনেননি। পরবর্তী এক সময় বোর্ডের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং রিপোর্টে স্বাক্ষর করার জন্য ডা. সাইদকে দেয়া হলে তিনি বোর্ড প্রধান মেজর জেনারেলকে বলেন, 'আমি আপনার রিপোর্টে স্বাক্ষর করব না। একজন চিকিৎসক হিসেবে আমার বিবেক আমাকে সায় দেয় না আমার রোগীর জীবন সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিতে।'

বোর্ডের আরেকজন সদস্য আকস্মিকভাবে ঘোষণা করেন, 'আমার বিবেকও সায় দেবে না।' একটি ফেডারেল বোর্ডের সকল সদস্যরা তাদের কমান্ডারের নেতৃত্ব অনুসরণ করবেন এই অলিখিত নিয়মের বত্যয় ঘটে।

দ্বিতীয় একজন বলেন, 'আমারও না'। এরপর তৃতীয় একজন। চিকিৎসকদের একের পর এক অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধীতা মেজর জেনারেলকে দেখছিলেন মর্মাহত হয়ে। আমার মায়ের দ্রুত মুক্তির আহ্বান জানিয়ে ডা. সাইদের তৈরি করা একটি বিবৃতিতে বোর্ড সদস্যরা একজনের পর আরেকজন স্বাক্ষর করেন। ডা. সাইদ এখন আনন্দের সঙ্গে তাকে বলেন, 'আপনাকেও অবশ্যই স্বাক্ষর করতে হবে।' যখন অন্য সকল বোর্ড সদস্য বিবৃতির বিষয়ে একমত, তখন জেনারেল কিভাবে প্রত্যাখ্যান করবেন? মেজর জেনারেলের এই আঘাত

www.pathagar.com

আরো তীব্র হয়ে ওঠে যখন তিনি সত্যিই তার স্বাক্ষর দেন নথিটিতে, এর অল্পকাল পরেই জিয়া নিয়মবহির্ভূতভাবে তাকে সামরিক ও বেসামরিক পদ থেকে সরিয়ে দেন।

বোর্ডের অবাক করে দেয়া ঘোষণার একদিন পর সরকার আমার মা'কে অনুমতি দেয় বিদেশে যাবার। সকালে সংবাদপত্রে খবরটি পড়ে আমি অতি আনন্দিত হয়ে উঠি এবং বিলম্ব না করেই কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাই মা বিদেশ যাবার আগে তাকে দেখে আসার অনুমতি দেয়ার। আল-মুর্তাজায় প্রায় এক বছর কারারুদ্ধ থাকার পর হঠাৎ করে আমাকে বলা হয় আমার জিনিসপত্র গোছানোর জন্য। পুলিশের ১২টি গাড়ি, ট্রাক ও জিপের এক বহর আমাকে নিয়ে গেল মহেঞ্জোদারো বিমানবন্দরে। ওইখানে পুলিশ প্রথমেই ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরা বাজেয়াপ্ত করে। এগার মাস পর জনসমক্ষে আমার প্রথম উপস্থিতি তারা রেকর্ডিং করছিলেন। স্টেনগান বহনকারী পুলিশ আমাকে প্লেন পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। করাচিতে আমি যখন পৌঁছি তখন আমার গাড়ি বহরের ওপর দিয়ে একটি হেলিকপ্টার চক্কর দিতে থাকে। গাড়ি বহরটির গন্তব্য ৭০ ক্লিফটন। আর এসবই ছিল এক মেয়ের তার মা'কে বিদায় জানানোর জন্য।

মা বিছানায় শুয়ে ছিলেন এবং তাকে ফ্যাকাশে ও দুর্বল দেখাচ্ছিল। বয়সের তুলনায় মাকে অনেক বেশি বৃদ্ধ মনে হচ্ছিল। আরেকবার ব্যক্তিগত সঙ্কট নিয়ে আমি বিদীর্ণ হলাম। মা'র ক্যান্সার নিরাময়ে বিদেশে চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলাম, কারণ এটা মায়ের জন্য জরুরি প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমি আতঙ্কিত ছিলাম কারাগারে একাকি থাকার ব্যাপারে। একাকিত্বের অনুভূতি নিয়ে চিন্তা না করার জন্য আমি নিজের সঙ্গেই লড়াই করি। সাব জেলে আবার একাকিত্বে আমাকে ফিরে যেতে হবে। আমি যখন চিন্তামগ্ন তখন ফাখরি দৌড়ে শোবার ঘরে ঢুকল এবং বেরিয়ে গেল, সে এমআরডির সেক্রেটারি জেনারেল এবং পার্টির অন্যান্য লোকজনের শেষ মুহূর্তের বার্তাটি বলে গেলে। 'বেগম ভুট্টো দেশ ত্যাগ করলে দলের কি হবে?' তবে মা'র অন্য কোন বিকল্প ছিল না।

বিদায়ী বিবৃতিতে মা লিখলেন, 'চিকিৎসার প্রয়োজনে আমি সাময়িক সময়ের জন্য আমাদের দেশ ও আমাদের জনগণকে ছেড়ে যাচ্ছি ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে।' 'আমার চিন্তা-চেতনা সব সময় আপনাদের সঙ্গে থাকবে, লড়াকু জনগণের সঙ্গে ক্ষুধার্থ ও নির্যাতিতদের সঙ্গে, শোষিতদের সঙ্গেও বৈষম্যের বিরুদ্ধে, প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধ পাকিস্তানের যারা কল্পনা করেন তাদের সকলের সঙ্গে থাকবে...।

লোকজনকে সমবেত হতে নিরুৎসাহিত করার জন্য সরকার আমার মায়ের দেশ ছাড়ার ভুল তারিখ ঘোষণা অব্যাহত রাখে সংবাদপত্রে। সরকারের প্রতারণার জবাবে বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে পিপিপির সমর্থকদের একটি অবিচল অংশ সব সময় ৭০ ক্লিফটনে ঘোরাফেরা করতে থাকে এবং সন্ধান করে মার আসন্ন দেশ ছাড়ার লক্ষণের। দেয়ালের ভিতর থেকেই আমরা তাদের শোরগোল শুনতে পারতাম। তারা উচ্চকণ্ঠে বলে, 'ভুট্টো বেঁচে থাকো', 'বেগম ভুট্টো জিন্দাবাদ!' 'বেগম ভুট্টো দীর্ঘজীবি হোক?'

১৯৮২ সালের ২০ নভেম্বর রাতে মাকে চুমু খেয়ে বিদায় জানাই এবং তাকে একটি লকেট দেই যাতে আমার বাবার কবরের মাটি দিয়ে ভরা ছিল। লকেটটি আমার ভাইদের

www.pathagar.com

দেয়ার জন্য মাকে বলি। আর আমার সদ্যোজাত ভাইঝিদের জন্যও লকেট ওয়ালা চেইন দেই, সুরক্ষার জন্য লকেটে ছিল কোরানের আয়াত। আমরা উভয়েই কাঁদলাম, জানি না ভবিষ্যতে আমাদের প্রত্যেকের জন্য কি অপেক্ষা করছে। মা আমাকে বললেন, নিজের যত্ন নিও।' এক সঙ্গে আমরা দু'জন হেঁটে ৭০ ক্লিফটনের খোদাই করা কাঠের দরজা পেরিয়ে আসি। ১৩ বছর আগে এখানেই তিনি আমার মাথায় পবিত্র কোরান ছুঁইয়ে দিয়েছিলেন আমার হার্ভার্ডে যাওয়ার আগে। গেটের বাইরে অপেক্ষমান জনতার ভিড় ঠেলে তিনি চলে গেলেন।

সামিয়া ওয়াহিদ :

দোস্ত মোহাম্মদ গাড়ি চালিয়ে বেগম ভুট্টোকে বিমান বন্দরে নিয়ে গেলেন, গাড়ির পেছনের সিটে ছিল সনম ও ফাখরি। ৭০ ক্লিফটন থেকে আমরা যখন বেরিয়ে এলাম তখন জনতার প্রচ ভিড় ছিল। সরকার চেষ্টা করেছিল তার দেশ ছাড়ার সময়টি গোপন রাখতে, সরকারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়ে বেগম ভুট্টো গাড়ির ভেতরকার লাইট জ্বালিয়ে দেন যাতে করে জনগণ তাকে দেখতে পায়। মিসেস নিয়াজি, আমিনা, আমার বোন সালমা ও আমি পেছনে গাড়ি নিয়ে অনুসরণ করি। রাস্তার প্রতিটি মোড়েই গাড়ি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে থাকে এবং শুভানুধ্যায়ীদের এক বিশাল শোভাযাত্রায় পরিণত হয়। আমরা যখন বিমানবন্দর ব্রিজ দিয়ে ওপরে উঠি তখন আমি পেছন ফিরে তাকাই। বেগম ভুট্টোকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দিতে যে গাড়ি বহর পিছু নিয়েছে তা হাইওয়ের সাতটি লেন দখল করে আছে। বিপরীত দিকে চলাচলকারী গাড়িগুলো বাধ্য হয়েছে একটি লেন ধরে চলতে।

বিমানবন্দরে তার জন্য অপেক্ষমান জনতা ছিল আরো বেশি। আমরা যখন টার্মিনালে উঠছিলাম তখন তারা আমাদের গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটছিল। গাড়ির জানালা দিয়ে আমি একজনের নগ্ন পা দেখি, সে আমাদের গাড়ির ছাদে উঠে পড়েছে। দলীয় সদস্যরা যখন ভিড় ঠেলে বেগম ভুট্টোকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে টার্মিনালের ভিতরে নিয়ে যেতে হিমশিম খাচ্ছিলেন তখন তিনি বেগম ভুট্টোর উদ্দেশ্যে বলেন, 'আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে আছেন।' তাদের অবশেষে তার হুইল চেয়ার জনতার মাথার ওপর দিয়ে ঠেলে দিতে হয়। এয়ার ফ্রান্সের ফ্লাইটের এয়ারলাইন ক্রুদের পক্ষেও জনতার ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে যাওয়া কঠিন। তাদের ফ্লাইট ব্যাগ একে অন্যের কাছে ছুড়ে মারতে হয়েছিল। তাদের ১০০ গজের লড়াইয়ের সমাপ্তিতে, তাদের ইউনিফরম দুমড়ে-মুচড়ে গেছে, তাদের মাথার টুপি পড়ে গেছে এবং ফ্লাইট এটেনডেন্টদের চুল গেল খুলে। পাকিস্তানের দেখা এটা ছিল সবচেয়ে আলোড়ণ তোলা বিদায়। লোকজন জানতো না তারা তাদের প্রধানমন্ত্রীর বিধবা স্ত্রী ও পিপিপি'র ভালবাসার নেত্রীকে আবার দেখতে পাবে কি না।'

মা'র ক্যাটস্ক্যান করা হল ও অধিকতর চিকিৎসা নেয়া হল পশ্চিম জার্মানিতে। তিনি ভালভাবে সাড়া দিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে ক্যান্সারের বিস্তার বন্ধ হল। এদিকে প্রহরীদের নজরদারির মধ্যে আমি রয়ে গেলাম ৭০ ক্লিফটনে। এগারজন জেল কর্মকর্তাকেও বাড়ির ভেতরে মোতায়েন করা হয়। বাইরে, ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সদস্যদের বাড়ির চতুর্দিকে প্রতি দুই ফিট অন্তর মোতায়েন করা হয়। বাগানের ও পেছনের গেট জুড়ে নিজেদের অবস্থান

www.pathagar.com

থেকে গোয়েন্দারা সবকিছুর ওপর নজর রাখেন। ৭০ ক্লিফটনে শত্রু পশ্চাতেই আমাকে আরো ১৪ মাস থাকতে হয়েছিল।

বিপুল আগ্রহ নিয়ে আমি পড়ি জ্যকব টিমারম্যান-এর প্রিজনার উ উইদাউট এ নাম্বার। এটি ছিল রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে এক সংবাদ আর্জেন্টিনায় আড়াই বছরের অন্তরীণ জীবনের দিনলিপি। আমি আমার ডা...রতে লিখি। 'এটা ছিল আমাদের আত্মার আয়না, ব্যথাপূর্ণ চোখ প্রতিফলতি হয় ব্যাথাপূর্ণ চোখে।' যখন তিনি বৈদ্যুতিক চেয়ারে নির্যাতনের কথা বলছেন, তখন বইয়ের পাতার শব্দগুলো যেন লাফ দিয়ে আমার উপরে পড়ছে। টিমারম্যান লিখেছেন দেহ বিদীর্ণ হয়ে গেছে, তথাপি অলৌকিকভাবে মাংসপেশিতে এর কোন লক্ষণ নেই, নেই কোন ক্ষতের চিহ্ন। চেয়ারে নির্যাতনের পর রাজনৈতিক বন্দিদের কিছু সময়ের জন্য ছুঁড়ে ফেলা হয় শক্তি সঞ্চয়ের জন্য, এরপর আবার নেয়া হয় নির্যাতনের জন্য। তিনি কি আর্জেন্টিনার কথা বলছিলেন, অথবা তিনি কি পাকিস্তানের সামরিক সরকারের জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রের কথা বলছিলেন?'

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার নং-৪ জারি করা হয়। বিশেষ সামরিক আদালতের বিচার এখন গোপনে অনুষ্ঠিত হতে পারে, বিচারপতির খাস কামরায়। কোন্ বিচার কখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, অভিযুক্ত কারা তাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ, অথবা বিচারের রায়ই বা কি! কারো জানার প্রয়োজন নেই। কোন তথ্য যাতে ফাঁস না হয়ে যায় তা নিশ্চিত করতে মামলা সংশ্লিষ্ট আইনজীবী বা অন্য সকলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। মামলা সংক্রান্ত কোন তথ্য ফাঁস হলে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী ও অন্যরা দোষী সাব্যস্ত হবে।

১৯৮২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর সামরিক আইন নং ৫৪ ধারা জারি করা হয়। এটিকে কার্যকরী ধরা হয় আমার বাবারে বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের দিন অর্থাৎ ১৯৭৭ সালের ৫ জুলাই থেকে। মৃত্যুদ এখন থেকে প্রযোজ্য করা হয় এমন সব অপরাধে জড়িত থাকার জন্য 'যদি কেউ জনগণের মধ্যে আতঙ্ক, নৈরাজ্য ও নিরাপত্তাহীনতার কারণ সৃষ্টির জন্য দায়ী হন।' মৃত্যুদণ্ড প্রযোজ্য করা হয় এমন ব্যক্তির ওপরই যিনি এ ধরনের অপরাধের ব্যাপারে জ্ঞাত এবং সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের কাছে ওই অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। অধিকন্তু, অধ্যাদেশে আরো বলা হয়, 'অভিযুক্ত ব্যক্তি এখন থেকে নিরপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে। বিপরীতটি প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত সামরিক আদালত... ধরে নিবে বা বিবেচনা রাখবে অভিযুক্ত ব্যক্তিই অপরাধ সংগঠন করেছে।'

অক্টোবরে দুই হাজার আইনজীবী করাচিতে মিলিত হয়ে নাগরিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য দাবি জানায়। সম্মেলন আয়োজকদের গ্রেফতার এবং প্রত্যেককে এক বছরের সশ্রম কারাদ দেয়া হয়। দুই সপ্তাহ পর, করাচি বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারির সঙ্গে আমার বাবার আইনজীবীদের একজন জনাব হাফিজ লাখো গ্রেফতার হন।

ডিসেম্বরে আমি সংবাদপত্র পড়ে জানতে পারি জিয়া ওয়াশিংটনে গেছেন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ও কংগ্রেসের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য। শুধুমাত্র ডিসেম্বর মাসেই বিশ জনের বেশি কারাবন্দির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় পাকিস্তানে। কংগ্রেসের সদস্যরা কি পাকিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে জ্ঞাত আছেন? বিষয়টিকে তারা কি গুরুত্ব দেন?

প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি তিন বছর পর টের পেয়েছিলাম। জিয়ার প্রত্যাশা ছিল

www.pathagar.com

ওয়াশিংটনে তার সফর হবে পাশ্চাত্যে তার নব আবিষ্কৃত সম্মানের বিশাল উদযাপন, কিন্তু সিনেট বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির সঙ্গে বৈঠকে তাকে পড়তে হয় সমালোচনার তোপের মুখে। জ্যাক এন্ডারসন ওয়াশিংটন পোস্টে লিখেছেন, যারা উপস্থিত ছিলেন তারা জানান যে, সিনেটর পেল পাকিস্তানের কয়েকজন রাজনৈতিক কারাবন্দির ব্যাপারে কমিটির উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি চিঠি হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত জেনারেল ছিলেন নিরাবেগ ও আস্থাশীল। তালিকার শীর্ষে ছিল বেনজির ভুট্টোর নাম।

সিনেটর পেল যখন আমার আটকাবস্থা নিয়ে তার ওপর চাপ প্রয়োগ করেন তখন জিয়া রাগে ফেটে পড়েন। আমি আইন ভঙ্গ করেছিলাম দাবি করে তিনি খটমট করে বলেন, 'সিনেটর, আমি আপনাকে এটা বলতে পারি, সে যে কোন সিনেটরের চেয়ে ভাল বাড়িতে বাস করছে।' জিয়া এরপর আরো দাবি করেন আমার সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের দেখা করার অনুমতি রয়েছে এবং এমনকি তিনি টেলিফোন ও ব্যবহার করেন।'

জিয়ার বক্তব্য শোনার পর পিটার গলব্রেথ সেগুলোর যাচাই করার জন্য ৭০ ক্লিফটনে ফোন করেন। একজন পুরুষের কণ্ঠ পেয়ে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

লোকটি উত্তর দেয়, 'আপনি তার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। তিনি কারাগারে আছেন।'

পিটার এরপর বলেন, 'আমি যুক্তরাষ্ট্র সিনেট থেকে ফোন করেছি, আপনাদের প্রেসিডেন্ট কিছুক্ষণ আগে এখানে ছিলেন এবং আমাদের বলেছেন, মিস ভুট্টো ফোন ব্যবহার করতে পারেন।'

লোকটি দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল, 'আপনি তার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। এটা নিষিদ্ধ। এই বলেই লোকটি সশব্দে ফোনটি রেখে দিল।

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতার জন্ম দিন ২৫ ডিসেম্বর আমি ৭০ ক্লিফটনে বন্দি অবস্থায় কাটাই। নববর্ষ ও আমার বাবার জন্মদিনেও আমি একাকি ছিলাম। ১৯৮৩ সালের সূচনাতে আমি উপলব্ধি করি ১৯৭৭ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত আমি একবার মাত্র মুক্ত অবস্থায় নববর্ষ উদযাপন করতে পেরেছি। রাতে আমি আমার দাঁত ব্রাশ করতে শুরু করলাম। সকালে ঘুম থেকে জেগে প্রায়শ আমি দেখি আমার আঙুলের গাটগুলো স্ফীত হয়ে গেছে এবং আমার আঙুলগুলো এতোটাই আঁটসাট হয়ে আঁকড়িয়ে ধরেছে যে আমি সেগুলো খুলতে পারছি না।

আমি আমার ডায়েরিতে লিখি, আল্লাহর কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ অনেক দিয়ে তিনি আমাকে সৌভাগ্যবান করেছেন। 'আমার নাম, আমার সম্মান, আমার ভাবমূর্তি, আমার জীবন, আমার বাবা, মা, ভাইরা, শিক্ষা, বাগ্মিতা, উভয় হাত ও পা, দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি, শরীরে কোন ক্ষতের দাগ না থাকা...। আর্শীবাদের তালিকাটি ক্রমেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল এবং আমার আত্মা দুঃখবোধ প্রশমিত হল। শীতের রাতে কারা কুঠুরিতে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিরা যতটা কষ্ট করেন তার চেয়ে আমি বহুগুণ ভাল আছি।

এক গৃহকর্মী উলের তৈরি নতুন এক স্কার্ফ নিয়ে একদিন বাড়িতে হাজির হল। সে আমাকে বলল, আফগান শরণার্থীরা কালোবাজারে অনেক কিছুই সস্তায় বিক্রি করে। আমি গোপনে একটি বার্তা পাঠালাম দলীয় এক কর্মীর কাছে, শেষ প্রান্তে পিপিপি'র লাল, সবুজ

www.pathagar.com

ও কালো রং দিয়ে অনেক স্কার্ফ তৈরির জন্য। সিন্দুর কারাগারগুলোতে আটক বন্দিদের জন্য আমরা কয়েক হাজার স্কার্ফ পাঠাই। এর সঙ্গে আরো পাঠাই মোজা ও সোয়েটার।

আমার দাঁত, আমার মাড়ি ও আমার অস্থিসন্ধির ব্যথার সাথে সাথে আমার কান আবার ব্যাথা করতে শুরু করল। নৌ হাসপাতালে সরকারি কানের চিকিৎসক আমাকে বলেন, 'আপনার কানে কোন সমস্যা নেই। দন্ত চিকিৎসকেও সমভাবে অযোগ্য মনে হল, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কোন দাঁত, আমি তাকে দিয়ে এক্সরে করাতে চাই। আমি তাকে বললাম, 'নির্দিষ্টভাবে আমি জানি না কোন দাঁত। আপনি দন্ত চিকিৎসক, আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন।' সাধারণভাবে ব্যাথাটা এই অংশে। সে বলল, 'আমরা এক্সরে'র অপচয় করতে পারি না।'

আমার স্বাস্থ্য নিয়ে বিভিন্ন খবর ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমে আসতে শুরু করল, এসবের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন পাকিস্তান দূতাবাসের মিনিস্টার অব ইনফরমেশন। কুতুবউদ্দিন আজিজ গার্ডিয়ান পত্রিকার কাছে পাঠানো চিঠিতে 'যখনই তিনি কোন প্রকার অসুস্থতার কথা বলেন, তখনই তাকে করাচির শ্রেষ্ঠ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।' 'অতিরিক্ত ধূমপানের কারণে তার মাড়িতে সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং তার পছন্দসই দেশের একজন প্রখ্যাত দন্ত চিকিৎসক তার চিকিৎসা করছেন।' সরকার কিভাবে মিথ্যাচার করে। কোন চিকিৎসকই আমার পছন্দ মতো দেয়া হয়নি। এবং আমি ধূমপান করি না।

আমি বঞ্চিত হচ্ছিলাম সংলাপ, যোগাযোগ অথবা কোন মতামত বিনিময় থেকে। আমি সৌভাগ্যবান ছিলাম আমার যে, বিড়ালগুলো ৭০ ক্লিফটনে ছিল, তবে এগুলো মানব সঙ্গের অভাব দূর করতে পারার কথা নয়। সরকার চেয়েছিল আমি যেন পুরোপুরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকি। এ কারণে আমি বিস্মিত হলাম যখন ১৯৮৩ সালের মার্চে জাম সাকি নামে এক লোকের বিচারে সাক্ষী দেয়ার জন্য আমাকে আদালত থেকে তলব করা হলো। জাম সাকি একজন কমিউনিস্ট, বিভিন্ন অভিযোগে যার বিচার চলছিল, এর মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানের আদর্শবিরোধী কাজ এবং সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছড়িয়ে দেয়া।

জাম সাকির সাথে আমার কখনোই দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমার পিতার রাজনৈতিক বিরোধী ছিলেন। পরে জানা গেল জাম সাকি কয়েকজন প্রথিতযশা রাজনীতিককে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ বিষয়ে সাফাই সাক্ষী দেয়ার জন্য কোর্টের কাছে নিজেই আবেদন করেছেন। সামরিক আইনের অবৈধতা নিয়ে আলোচনা করতে আমি ছিলাম খুবই উদগ্রীব, যদিও আমি নিশ্চিত ছিলাম না আমাকে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে অনুমতি দেয়ার পিছনে সরকারের কি উদ্দেশ্য ছিল। সম্ভবত তারা আমাকে চিত্রিত করতে চেয়েছিল 'কমিউনিস্টের প্রতি সহানুভূতিশীল' হিসেবে। তবে আমার কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল প্রত্যেক বিবাদির ন্যায্য ও মুক্ত বিচার পাবার অধিকার। তাছাড়া, আদালত আমাকে একটি সুযোগ এনে দিল প্রায় দুই বছ পর আমার নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত তুলে ধরার।

বিশেষ সামরিক আদালত থেকে ২৫ মার্চ যখন আদাললতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমার নামে প্রথম সমন এলো, জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আমি জানিয়ে দিলাম আমি

www.pathagar.com

একজন বন্দি এবং ইচ্ছা করলেই আমি নিজ থেকেই নির্ধারিত সময়ে আদালতে উপস্থিত হতে পারি না। আদালত যদি চায় আমি সাক্ষী দেই, তাহলে আদালতকেই সে বন্দোবস্ত করতে হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কালবিলম্ব না করেই এক বার্তা এলো, আগামীকাল সকাল ৭টায় তৈরি হয়ে থাকার জন্য। আমি তৈরি হয়েছিলাম। সকাল ১১টায় নতুন বার্তা এলো। আদালতে আমার উপস্থিতির তারিখ পুননির্ধারণ করা হয়েছে একই সময়ে পরবর্তী দিন। ২৭ মার্চ সকাল ৭টায় আমি তৈরি হয়ে রইলাম। আবার আমি চার ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করে রইলাম। এবং আবার তারা আমার উপস্থিতি ২৪ ঘণ্টা বিলম্বিত কার নোটিশ পাঠাল। আমি নিজেকে প্রবোধ দিলাম এটা চিন্তা করে যে সরকার চায় আমাকে দেখার জন্য অপেক্ষা করা সমর্থকদের বিভ্রান্ত করতে। তৃতীয় দিনে তারা যখন আমাকে নেয়ার জন্য এল, আমার চিন্তাই সঠিক, মানুষ যেন আমার কাছে-ধারে না থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করেই তারা এসেছে।

যে রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম তা ছিল পুরোপুরি জনশূন্য, আদালতে পৌঁছানোর গোটা পথ পুলিশ অবরোধ করে রেখেছে। কাশ্মির রোডে ঢোকার প্রত্যেকটি পয়েন্টে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করার পাশাপাশি পায়ে হাঁটার পথগুলোর মোড়ে মোড়ে কাঁটা তারে ক্রুশকারে রাখা হয়েছিল। ক্রীড়া কমপ্লেক্সে অস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত সামরিক আদালতে আমি যখন পৌঁছলাম, তখন আবিষ্কার করলাম আদালতটিও জনশূন্য। সাকি'র আত্মীয়-স্বজন এবং অন্যদের আত্মীয়-স্বজনদের শুধুমাত্র ওয়েটিং রুমে বসে থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছে তারা আমার সঙ্গে কথা বলবে না এ শর্তে। আমি বিষয়টি গায়ে মাখলাম না। গুটি কয়েক আইনজীবীকে দেখেই আমি খুব খুশি হলাম, তাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিল সামিয়া, সালমা ও আমার খালাতো বোন ফাখরি। পুলিশের অবরোধ অতিক্রম করে আদালতে পৌঁছতে তারা বিশেষ অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিল। তাদের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি উৎফুল্ল হলাম।

আদালত কক্ষটি ছিল ছোট, একটি টেবিলের পিছনে একজন কর্নেল বসে রয়েছেন তার দুই পাশে রয়েছেন একজন মেজর ও একজন ম্যাজিস্ট্রেট। আমরা তাদের সামনে রাখা তিন সারি চেয়ারে বসলাম– বিচারিক প্রক্রিয়ার পুরোটা সময় জুড়েই জাম সাকি'কে হাতকড়া পড়িয়ে রাখা হল। খুব দুঃখজনক যে এমনকি ছোট্ট এ কক্ষটিতেও সেনাবাহিনী মনে করে যে লোহার শেকল প্রয়োজন। সামরিক আদালতের বিবেচনায়ও লোহার শেকল প্রয়োজন। সামরিক আদারতে অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে আইনজীবীদের লড়ার সুযোগ নেই বলে জাম সাকি নিজেও প্রশ্ন করছিল।

আমাকে শুধু একদিন জেরা করার সময় নির্ধারিত থাকলেও জাম সাকির প্রশ্নের জবাবে আমি এতো দীর্ঘ উত্তর দিলাম যে আমার সওয়াল জবাব দুই দিন স্থায়ী হল। তার প্রশ্নের সহজ বা সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়া যেত না। 'আমরা পাকিস্তানের ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য অভিযুক্ত হয়েছি– পাকিস্তানের কি কোন ভাবাদর্শ আছে? ইরানি বিপ্লবের ব্যাপারে আপনার মতামত কি? ইসলামে কি সামরিক আইন বলে কিছু আছে?

আমি জনতাম আন্ডার গ্রাউন্ড সাহিত্যের একটি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ফটোকপি করা লিফলেট ও নিম্নমানের ছাপা পুস্তিকাগুলো বড় শহরগুলোর বুদ্ধিজীবী মহলে ছড়িয়ে পড়ছে

www.pathagar.com

গোপনে হাত থেকে হাত ঘুরে। কিছু প্রিন্টার পয়সার বিনিময়ে রাতের বেলায় তাদের প্রেস খোলা রাখে, গোপনে ছাপছে হালকা আলোয়, এরপর প্লেটগুলো ধ্বংস করে ফেলেছে। এটা ছিল আমার দলীয় অবস্থান তুলে ধরার একটি সুযোগ এবং সামরিক আইনকে হেয় করার। আমি সুযোগটি গ্রহণ করেছিলাম।

আমি তৃতীয় প্রশ্নের জবাবে বললাম, 'ইসলামে মার্শাল ল' এর স্থান আছে কি নেই তা স্বচ্ছতার সঙ্গে নির্ধারণে আমাদের জানা প্রয়োজন সামরিক আইনের ধারণা ও ইসলামের ধারণা। 'আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের নামই হচ্ছে ইসলাম, অন্যদিকে মার্শাল ল' হচ্ছে সেনা কমান্ডারের কাছে আত্মসমর্পণ। একজন মুসলমান শুধুমাত্র আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে পারেন।'

আমি খুব স্পষ্ট কর বলতে পারি, তাহলে সামরিক আইন বা মার্শাল ল' পদটি এসেছে বিসমার্ক ও প্রুশিয়ান সাম্রাজ্যের দিন থেকে। জয় করা ভূমি দখলে রাখতে বিসমার্ক ওইসব ভূখণ্ডে বিদ্যমান আইনকে পাস কাটিয়ে নিজের ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে তৈরি আইন চালু করেন। আর এসব আইন বলবৎ করেন বন্দুকের নল তাক করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সামরিক আইনকে দখলদার বাহিনীর বিধিবিধান হিসেবেও উল্লেখ করা হতো। দখলদার বাহিনীর কমান্ডারের কথাই বিদ্যমান আইনকে বাতিল করে নতুন আইন হিসেবে বিবেচিত হতো।

'ঔপনিবেশিক শাসনে সেই রাষ্ট্রের জনগণ হয়ে যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। নিজেদের পছন্দসই সরকার, নিজেদের প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও কর্মসূচী নির্ধারণের অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে এবং অধিকাংশ উপনিবেশ থেকে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রত্যাহারের পর সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের জনগণ ক্ষণকালের জন্য হলেও স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বাদ পায়। এটি ছিল সেই সময় যখন নাসের, নক্রুমা, নেহেরু ও সুকর্নোর মতো জাতীয়তাবাদী নেতারা জনগণের জন্য সামাজিক সমতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজ করছিলেন। আর ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের নিজ রাষ্ট্রে জনগণের কল্যাণ মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং সচেতনভাবে হোক বা অন্যভাবে তারা সমর্থন করে দাঁড়ায় সামরিক মোল্লাহতান্ত্রিক সরকারের প্রতি। সামরিক মোল্লাহতন্ত্রে জনগণের নিজেদের ভাগ্য গড়ার অধিকার এবং তা থেকে অর্জিত সুফল ভোগকরার অধিকার অস্বীকৃত হয়। পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে।

'নতুন স্বাধীন হওয়া অনেক দেশই এখন শাসিত হচ্ছে সামরিক প্রশাসনের কোন না কোন আকারে। যাহোক, যে প্রশাসনের ভিত্তি ঐক্যমত্য নয়, বরং বল প্রয়োগ, সে প্রশাসন ইসলামের মূল নীতির সঙ্গে মানানসই নয়। কেননা ইসলামে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে ঐক্যমত্যের ওপর। দ্বিতীয়ত, সামরিক শাসক সর্বদাই ক্ষমতায় আসে বন্দুকের নল তাক করে, অথবা বল প্রয়োগের হুমকি দিয়ে। অন্যদিকে, ইসলামে ক্ষমতার অপব্যবহারে কোন ধারণা নেই। এ কারণে, আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামে মার্শাল ল'র কোন স্থান নেই।' আমার শব্দমালার ফটোকপি পরবর্তীতে স্থান করে নেয় সংবাদপত্র, বার এসোসিয়েশন এবং এমনকি রাজনৈতিক কারাবন্দিদের কারা কক্ষ।

আদালত কক্ষটি সংবাদ মাধ্যমের জন্য বন্ধ থাকলেও একজন ব্রিটিশ সংবাদ প্রতিনিধি

প্রবেশাধিকার লাভ করতে সমর্থ হন। হঠাৎ করে একজন লোক প্রবেশ করে কর্নেলের কানে কিছু বলার আগ পর্যন্ত কেউ জানত না তার উপস্থিতি।

কর্নেল জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায়?' লোকটি কক্ষের পিছনের দিকে মাথা ঝুঁকালেন।

বিস্ফোরিত কণ্ঠে কর্নেল, 'আমার মনে হয় আপনি একজন সাংবাদিক। সাংবাদিকদের এখানে প্রবেশের অনুমতি নেই। আপনাকে অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করতে হবে।'

সালোয়ার কামিজ পরিহিত লোকটির দিকে আমার চকিত চোখ পড়ে, তাকে সবাই উজ্জ্বল ত্বকের পাঠান ভেবেছিল। প্রহরা দিয়ে তাকে আদালত কক্ষ থেকে বের করে দেয়া হলো। তবে একটি রিপোর্ট লেখার জন্য সেও কিছু পেয়ে যায়। 'গার্ডিয়ান'-এর এ সংবাদ প্রতিনিধি তৎপরবর্তীতে লেখেন, 'মিস ভুট্টো স্থির ও শান্ত ছিলেন এবং তার স্বাস্থ্যও ভাল দেখাচ্ছিল, এবং বিচারিক প্রক্রিয়ায় তিনি প্রদর্শন করেন যে, তিনি তার বাগ্মিতা এবং রসবোধ এতটুকুও হারাননি।

যাহোক, আমার স্বাস্থ্য যতোটা ভাল দেখাচ্ছিল আসলে ততোটা ছিল না। আমার মনের অবস্থাও তাই, অবস্থা আরো খারাপ হয়ে উঠে ১৯৮৩ সালের এপ্রিলে পিপিপি'র কয়েকজন নেতার অবিশ্বস্ততার দরুণ। রাজনৈতি ভিত্তি গড়ে তুলতে জিয়া তখন উদ্যোগী হন। অভ্যুত্থানের পর যে রাজনৈতিক ভিত্তি তিনি হারিয়েছেন, নতুন করে ভিন্ন পথে চেষ্টা করেন। দেশকে ইসলামিকরণের সর্বশেষ পদক্ষেপ ঘোষণার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে জিয়া সিন্ধু সফর করার সুযোগটি সাগ্রহে গ্রহণ করেন। আমার বাবাকে ক্ষমতাচ্যুত ও ১৯৭৩ সালের সংবিধান কবর দেয়ার পর এটাই সিন্ধুতে তার প্রথম সফর। স্বাভাবিকভাবেই লোকজন তার সফরে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

আমার বাবার সরকারের অধীনে সিন্ধিদের ভাগ্যের বিপুল উন্নতি সাধন হয়। তারা কাস্টমস, পুলিশ ও পিআইএ-তে সরকারি চাকরি লাভ করে। বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে তাদের জন্য কোটা প্রথার প্রচলন করা হয়, তাদের প্লট আকারে জমি দেয়া হয় এবং নবনির্মিত হাসপাতাল, চিনিকল ও সিমেন্ট কারখানাগুলোতে তারা পায় উচ্চ বেতন। জিয়ার অধীনে সবকিছু পাল্টে যায়। আবারো সিন্ধু শিকার হয় বৈষম্যের। সিন্ধুর সবচেয়ে ভাল কিছু জমি রাষ্ট্রের মালিকানায় ছিল। জিয়ার অধীনে এগুলো ভূমিহীন কৃষকদের দেয়ার পরিবর্তে বিক্রি করা হয় সেনা কর্মকর্তাদের কাছে। শিল্প কারখানার ব্যবস্থাপক পর্যায়ে উন্নীত সিন্ধিদের স্থলাভিষিক্ত করা হয় অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা দ্বারা। দেশের রাজস্ব আয়ের ৬৫ শতাংশ সিন্ধুর করাচি বন্দর থেকে আসা সত্ত্বেও প্রদেশের উন্নয়নে রাজস্বের অল্প অংশই সিন্ধু পেত। আমার বাবার হত্যাকাণ্ডের পর যে ক্রোধের আগুন জ্বলতে শুরু করেছিল সিন্ধুর অর্থনৈতিক দুর্দশাও এর একটি কারণ ছিল। প্রদেশের অনেকেই অনুভব করে যে তিনি যদি সিন্ধি না হতেন, তাহলে তাকে হয়তো ফাঁসিতে ঝুলানো হতো না।

১৯৭৯ সালে স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের পর বাদিন ও হায়দ্রাবাদের নির্বাচিত পিপিপি কাউন্সিলররা আমার বাবাকে ফাঁসিতে ঝুলানোর সমালোচনা করে প্রস্তাব পাস করে এবং তার প্রতি সম্মান জানান। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ জিয়া এর প্রতিশোধ নিতে সিন্ধুর সর্বত্র পিপিপি কাউন্সিলরদের অযোগ্য প্রমাণ করার প্রক্রিয়া শুরু করেন। এখন জিয়া, অবশিষ্ট গুটি কয়েকজন পিপিপি কাউন্সিলরের কাছ থেকে তার সিন্ধু সফরের আয়োজনে সহযোগিতা চান। প্রদেশে সফরকালে কাউন্সিলররা যেন জিয়াকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। সংবাদপত্রে

www.pathagar.com

খবর প্রকাশ হয় যে জিয়ার ইচ্ছার প্রতি তারা বশ্যতা স্বীকার করার কথা বিবেচনা করছেন। এ খবরটি আমাকে ভড়কে দেয়।

কিভাবে আমি একটি বার্তা বাইরে পাঠাতে পারি? ৭০ ক্লিফটনে ঢোকার সময় ও বের হবার সময় গৃহকর্মীদের তল্লাশি করা হয় এবং টুকিটাকি কাজের জন্য তারা যখন বাইরে যায় তখন মোটরসাইকেলে গোয়েন্দারা তাদের অনুসরণ করে। অবশেষে গৃহকর্মীদের একজনকে আমি কাছে অসুস্থতার কারণে ছুটি নিয়ে লারকানায় নিজ বাড়িতে ফিরে যাবার মিথ্যা কথা প্রহরীদের বলার জন্য বলি।

সিন্ধু পিপিপি প্রধানের কাছে আমার মৌখিক বার্তা ছিল, 'আমার প্রত্যাশা আপনার ছেলে জিয়াকে অভ্যর্থনা জানাতে যাবে না।' কাউন্সিলরদের একজন ছিল তার ছেলে। বার্তায় আমি আরো বলি, 'আপনি জানেন এটা দলের নীতিবিরোধী। অনুগ্রহ করে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন।'

এর সঙ্গে আমি আরেকটি বার্তা পাঠাই লারকানায় পিপিপি কাউন্সিলরের কাছে। আমি তাকে বলি, 'আপনি ও অন্যরা হাসপাতালে ভর্তি হতে পারেন অথবা লারকানা ত্যাগ করতে পারেন ও নিখোঁজ হয়ে যেতে পারেন। কোনভাবেই তাকে অভ্যর্থনা জানাতে ও দেখা করতে যাবেন না।'

টেলিভিশন চালু করার পর আমি ক্ষোভের সঙ্গে অসহায় বোধ করি যখন দেখি তাদের মধ্যে আমি বলার পরও কয়েকজন জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। মনে হয় তারা নিজেরা একটি বৈঠক করেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেন তাদের সকলের বিরুদ্ধে দল কোনো ব্যবস্থা নিতে না পারে। আমি গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হই। আরেকবার রাজনীতিকরা দলের নীতি ও ঐক্যকে বলি দিয়ে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রবৃত্ত হল। সম্ভবত আমি অতিরিক্ত আদর্শবাদী কিন্তু তাদের কাছে আমি আরো বেশি প্রত্যাশা করেছিলাম। আমার জন্য রাজনৈতিক ফোন নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এক পিপিপির সভাপতিকে ফোন করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। খুব দ্রুত আমি তাকে বলি, 'আমি চাই জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী পিপিপি কাউন্সিলরদের আপনি বহিষ্কার করুন। তারা দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছেন।' ফোনটি নজরদারির মধ্যে রয়েছে জানি বলেই আমি দ্রুত কথা বলি। সময়ের অপচয় করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি যা আশঙ্কা করেছিলাম, বিলম্ব না করেই ফোনটি ডেড হয়ে গেল। এটি আর কখনোই পুনঃসংযোগ দেয়া হয়নি।

আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে আমি আর কোন ফোন কল পাইনি। আমার সঙ্গে দেখা করার যে গুটি কয়েক দর্শণার্থীর অনুমোদন ছিল তা বন্ধ করা হয়। সদর ফটকের সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী হামলে পড়ে গৃহকর্মীদের ওপর। কম্পাউন্ডের ভেতরে ঢোকার সময় ও বের হবার কালে তাদের বাধ্য করা হয় জুতা ও মোজা খুলতে। এমনকি তাদের চুলেও তল্লাশি চালানো হয়। বাবুর্চি বাজার থেকে মাংস ও সবজির যে প্যাকেট নিয়ে আসত তা খুলে দেখা হত। এমনকি ময়লা আবর্জনাতেও তল্লাশি চালানো হতো।

আবার পুরোপুরি নিঃসঙ্গ হয়ে আমি অনুভব করি আমার অসুস্থতা বাড়ছে। আমার কানের ব্যাথা তীব্র হল। যখন আমি বাম গালে হাত বুলালাম, তখন আমি খুব কম সংবেদন অনুভব করলাম। এবং কানের ভেতর শব্দ হওয়া বাড়তে লাগল।

৭০ ক্লিফটনে এপ্রিলের এক সন্ধ্যায় আমি বাড়ির অভ্যর্থনা স্থান দিয়ে হাঁটছিলাম,

www.pathagar.com

আমার কাছে মনে হচ্ছিল মেঝে উঠে যাচ্ছে ছাদের দিকে। নিজেকে স্থির করতে আমি সোফার হাতল ধরি, মাথার ঝিম ঝিম ভাব কাটতে অপেক্ষা করি। পরিবর্তে অন্ধকারের একটি দেয়াল আমার দিকে অগ্রসর হল। আমি জ্ঞান হারিয়ে সোফার উপর পড়ে গেলাম।

ভাগ্যক্রমে কর্মচারিদের একজন আমার পড়ে যাওয়া দেখতে পায়। 'জলদি, জলদি মিস সাহেবার একজন ডাক্তার প্রয়োজন'। কারা কর্মকর্তাকে বলতে সে দৌড়ে গেল। এবং আরো একবার মনে হল আল্লাহ যেন আমাকে রক্ষা করছেন। চিকিৎসার প্রয়োজন হলে সাধারণত আমলতান্ত্রিক রুটিন রয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি লেখার, এরপর কয়েকদিন অপেক্ষা করার, ছাড়পত্র পেতে কখনো দুই সপ্তাহও লেগে যেত। কিন্তু এবার পুলিশ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মিডইস্ট হাসপাতালের জরুরি বিভাগ থেকে একজন ডাক্তার নিয়ে এলো। এবং আরো একবার আমার কানের ভেতরকার সংক্রমণ ভিতরের দিকের পরিবর্তে বাহিরের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমার কান পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, 'আপনার অবস্থা খুবই বিপজ্জনক।' আপনাকে অবশ্যই কর্ণ বিশেষজ্ঞ দেখাতে হবে।'

আমি তাকে বললাম, 'আপনি যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করেন যে আমার একজন বিশেষজ্ঞকে দেখানো প্রয়োজন তাহলে সরকার বলতেই থাকবে যে আমার কানের কোন সমস্যা নেই।

আমার একজন কর্ণ বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন লিখতে তরুণ চিকিৎসক সাহসী ছিল এবং সরকারের জন্য সুনির্দিষ্ট ভাষায় তিনি তা লিখলেন। সরকার নাক, কান ও গলার এক বিশেষজ্ঞকে পাঠালেন আমাকে দেখার জন্য, তিন বছর আগে তিনি আমার সাইন্যাসে অপারেশন করেছিলেন। তার নামটি এখানে উল্লেখ করা গেল না কারণ তিনি চান না তার নাম এ বইয়ে উল্লেখ করা হোক। তার চিকিৎসা আমাকে সুস্থ এবং সম্ভবত আমার জীবন রক্ষা করে।

চার বছর আগে আল-মুর্তাজায় আটক থাকাকালে সরকারি চিকিৎসকের ব্যাপারে আমার সন্দেহ নিশ্চিত করে। এই চিকিৎসক আমাকে বললেন, 'আপনার কানে একটি ছিদ্র আছে। এ ছিদ্রটিই মধ্যকর্ণ ও কর্ণের পশ্চাদস্থিত অস্থিতে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে।' আমার বর্তমান ক্ষত প্রতিদিনই পরিস্কার করতে হবে মুখের স্নায়ুর ওপর চাপ কিছুটা লাঘব করার জন্য। আর এ চাপই অসাড়তার কারণ হয়ে ছিল। ক্ষতটি শুকালে আমার প্রয়োজন হবে অপারেশনের। তিনি বললেন, 'মাইক্রোস্কোপিক সার্জারির জন্য আপনাকে বিদেশ যেতে হবে। আমাদের এখানে এই প্রযুক্তি নেই। আপনার খুলি উন্মুক্ত করার জন্য আমাদের করাত চালাতে হবে। এটা একটি বিপজ্জনক প্রক্রিয়া। আপনার নিরাপত্তা ও চিকিৎসার স্বার্থেই অনেক অনেক ভাল হবে বিদেশে যাওয়া।'

আমি ভাবলেশহীনভাবে তার দিকে তাকাই। পাকিস্তানে এ ধরনের শৈল্য চিকিৎসার স্বাভাবিক ঝুঁকির বাইরেও তিনি কিছু বুঝাতে চাইছেন? আমার আগের একটা কথা মনে পড়লো, আমার চিকিৎসকদের একজনকে সরকার ১৯৮০ সালে চেষ্টা চালায় এটা বলার জন্য যে মধ্যকর্ণের পরিবর্তে আমার সমস্যা রয়েছে অন্তকর্ণে– এবং আমার মানসিক চিকিৎসারও প্রয়োজন। তাকে বলা হয়েছিল, 'আপনার রোগ সনাক্তকরণকে যুক্তিযুক্ত করতে আমরা দশজনের একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করব।' একজন মানসিক রোগী হিসেবে

আমাকে বাতিল করে দিতে সরকার কি সুন্দর একটি পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু চিকিৎসক তা করতে অস্বীকার করেন। এখন এই চিকিৎসক নাছোরবান্দা যেন আমি পাকিস্তান ত্যাগ করি। তিনি বললেন, 'অপারেশন আমি এখানে করতে পারি, কিন্তু আমি শঙ্কিত এ্যানেসথেটিকের সময় কিছু করার জন্য তারা আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। এমনকি আমি যদি প্রত্যাখ্যানও করি, তারা অন্য কাউকে দিয়ে কাজটি করবে। যে কোন বিচারে সবচেয়ে ভাল হবে আপনার বিদেশ চলে যাওয়া।'

চিকিৎসার প্রয়োজনে দেশ ত্যাগের অনুমতি চেয়ে আমি সরকারের কাছে আবেদন করি। প্রথমে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। যাহোক আমার সময়ও প্রয়োজন ছিল। চিকিৎসক আমাকে বলেছিলেন, 'কয়েক মাসের মধ্যে সাধারণ এ্যানেসথেটিকের ধকল সইবার মতো শক্তিও আপনার নেই। আপনাকে অবশ্যই আপনার শারীরিক শক্তি গড়ে তুলতে হবে।' আমার মায়ের মতো আমাকেও দুধ, মাছ-মাংস, মুরগি ও ডিমের ন্যায় উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবার দেয়া হল।

তবে আমার কানের কোন উন্নতি হল না। আমি আমার মুখের বাম অংশে অনুভব শক্তি হারাতে শুরু করলাম। আমার মাথায় সর্বক্ষণ ব্যথা অনুভূত হত, কানের ভেতর টিক্ টিক্ শব্দ প্রায় অসম্ভব করে তুলল অন্য কিছু শোনা। প্রতি সপ্তাহে ৭০ ক্লিফটনে দেখার জন্য চিকিৎসক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি পেলেন এবং চেষ্টা করতেন ক্ষতটি পরিষ্কার করার। ভূট্টো পরিবারের একজন সদস্যের জন্য তার চিকিৎসার উদ্বেগ তার জন্য বয়ে আনে দুর্ভোগ।

সপ্তাহ অন্তর আমাকে দেখার অল্পকাল পরেই তার প্রতিবেশী পুলিশের একজন সুপারিনটেনডেন্ট তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি প্রায়ই হায়দ্রাবাদ যান, তাই নয় কি?' 'আপনি কি 'ডেথ উইল' ছবিটি দেখেছেন?' পরদিন ওই ছবির একটি ভিডিও ক্যাসেট বেনামে তার বাড়িতে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে শুরু হল টেলিফোনে হুমকি দেয়া, পাশাপাশি আয়কর কর্তৃপক্ষের নোটিশ এল যে তার আয় পরীক্ষা করে দেখা গেছে তিনি কৌশলে কর ফাঁকি দিয়েছেন। এমনকি সরকার তার পেশাগত সততাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে, তাকে কারণ দর্শাও নোটিশ পাঠানো হয় কেন তাকে হাসপাতাল থেকে বরখাস্ত করা হবে না। তারপরও চিকিৎসক আমাকে সারিয়ে তুলতে সাহস খুঁজে পান যা আমি গভীরবাবে উপলব্ধি করি। বাইরের জগতের তিনিই ছিলেন একমাত্র মানুষ যার সঙ্গে আমার কথা হতো। অবশ্য সরকার দাবি করেছিল অন্যকিছু, যা আমি পরবর্তীতে পিটার গলব্রেথের কাছ থেকে জানতে পারি।

পিটার গলব্রেথ :

সিনেটর পেল এবং অন্যান্য সিনেটর পাকিস্তানে আটক সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক বন্দিদের ব্যাপারে জানতে চেয়ে ডিসেম্বরে জিয়ার কাছে যে চিঠি দেয়, অবশেষে পাকিস্তান সরকার সে চিঠির উত্তর দিয়েছে জুনের শেষে। ওই সময় বেনজিরের আটকাবস্থা সম্পর্কে জিয়ার করা মন্তব্য প্রতিধ্বনিত হয় এই চিঠিতে।

'বর্তমানে তিনি করাচিতে তার বাসভবনে আটক রয়েছেন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত

হওয়া থেকে তাকে বিরত রাখতেই এ আটকাবস্থা, যেহেতু বর্তমানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ। যাহোক, তাকে সম্ভাব্য সকল আরামদায়ক উপকরণ দেয়া হয়েছে এবং যখন প্রয়োজন হয় তখনই তার পছন্দমত চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা ও চিকিৎসা দিতে পারেন। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের সাক্ষাৎ দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি অনুমতিপ্রাপ্ত। ঘনিষ্ঠ আট জন আত্মীয়ের দেখা করার অনুমতি রয়েছে এবং এক সাথে তিনজন করে তার সঙ্গে দেখা করবে। তার অনুমোদন রয়েছে পছন্দসই ২৪ জন ব্যক্তিগত কর্মচারি নিয়োগের এবং তার ব্যবহারের জন্য রয়েছে একটি টেলিফোন।

কিছুক্ষণ পরেই আমি বেনজিরের আত্মীয় সম্পর্কিত বোনের ফোন পাই। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি চিঠিতে উল্লেখিত তথ্যের ব্যাপারে।

তিনি ফেটে পড়ে বললেন, 'না, সত্য নয়।' কোন বন্ধু-বান্ধবই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হয়নি। তার বোন সনম গত তিন মাসে মাত্র একবার তার সঙ্গে দেখা করতে সমর্থ হয়েছেন। তার খালাতো বোন ফাখরিও বেনজিরের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না। তিনি এমনকি বাগানেও যেতে পারেন না। তিনি নিঃসঙ্গ ও অসুস্থ। আমি তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন।

আমি সিনেটর পেলকে একটি স্মারকলিপি পাঠাই। দৈবক্রমে এই সময় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়াকুব খান যুক্তরাষ্ট্র সফরে যিনি এক সময়ে ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ওয়াশিংটনে ইয়াকুবের অনেক বন্ধু ছিল, স্পষ্টবাদী হিসেবে তার পরিচিতি ছিল। আমার মনে হয় না যে ইয়াকুব বেনজিরের আটকাবস্থার ব্যাপারে কপটতার আশ্রয় নিবেন। যখন সিনেটর পেল পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বেনজিরের আটকাবস্থার ব্যাপারে সরকারি বিবরণ ও নিজেদের সংগ্রহ করা এইসব নতুন তথ্যের মধ্যে প্রতীয়মান অমিল নিয়ে প্রশ্ন করেন, তখন ইয়াকুব শক্ত হয়ে গেলেন। দৃশ্যত তিনি সত্যিকার অর্থেই আহত হলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি পাকিস্তানে ফিরে বিষয়টি দেখবেন।

১৯৮৩ সালের ২১ জুন। বছরের দীর্ঘতম দিন এবং আমার ৩০-তম জন্মদিন। প্রবল আশাবাদী হয়ে আমি স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে চিঠি লিখলাম। কয়েক মাস ধরে আমার কাছে কোনো দর্শনার্থী আসেনি এবং অনুমতি প্রার্থনা করছি আমার জন্মদিনে আমার স্কুল জীবনের বন্ধুরা আমাকে যেন দেখতে আসতে পারে। আমাকে বিস্মিত ও আনন্দিত করে দিয়ে সরকার সম্মত হল।

সন্ধ্যায় সামিয়া, তার বোন ও পরী একটি চকলেট কেক নিয়ে দল বেধে এলো। কেকটি তৈরি করতে পরী কয়েক ঘণ্টা ব্যয় করেছে। মহিলা পুলিশের কড়া নজরদারির মধ্যে আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম ও চুমু খেলাম। সামিয়া বলল, আল্লাহর রহমত যে কেকটি এখনো গোটা রয়েছে। সবকিছু তারা এতোটাই তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করছিল যে আমরা শঙ্কিত ছিলাম তারা হয়তো তোমার আগেই কেকটি কেটে ফেলবে।

ইংল্যান্ডে ভিক্টোরিয়া স্কোফিল্ড এবং আমার অন্য বন্ধুরাও আমাকে ভুলে যায়নি। পরে আমি জানতে পারি, আমার জন্মদিন সমাগত হলে ভিক্টোরিয়া অক্সফোর্ড ইউনিয়নের বর্তমান প্রেসিডেন্টের কাছে। লিখেছিলে যে আটকাবস্থায় এটা আমার তৃতীয় জন্মদিন। ২১ জুন অক্সফোর্ড ইউনিয়ন এক মিনিটের জন্য নীরবতা পালন করে। ইউনিয়নের সাবেক কোন প্রেসিডেন্টের প্রতি সাধারণত এভাবে সম্মান জানানো হয় যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আরেক পুরনো বন্ধু ও ক্যামব্রিজ ইউনিয়নের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডেভিড জনসন ওই সময়

www.pathagar.com

ছিলেন অক্সফোর্ড ইউনিয়নের ডিবেটিং চেম্বারে। তার উদ্যোগে পরের রোববার ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেই ও লন্ডনে সেইন্ট পলস ক্যাথিড্রালের সার্ভিসে আমার জন্য প্রার্থনার আয়োজন করে। দুটো উদ্যোগেই ছিল উদ্বেগ ও বন্ধুত্বের চমৎকার প্রকাশ।

আমার জন্মদিন নিয়ে সরকারের একজন সদস্যের উৎকণ্ঠা প্রকাশ ছিল অধিকতর সন্দেহজনক। কারা কর্মকর্তাদের একজন আমাকে বললেন, 'আজকে সন্ধ্যা ৭টায় অনুগ্রহ করে তৈরি হয়ে থাকবেন। আমরা আপনাকে সরকারি একটি রেস্ট হাউসে নিয়ে যাচ্ছি!'

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন?'

প্রায় বিজয়ের বেশ তিনি বললেন, 'কারণ সামরিক আইন প্রশাসক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।'

সামরিক আইন প্রশাসক? আমি বললাম, 'জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমি যাব না।'

কারা কর্মকর্তা মর্মাহত হলেন। তিনি বললেন, 'কিন্তু আপনাকে যেতে হবে। আপনি একজন বন্দি।'

আমি তাকে বললাম, 'আমি পরোয়া করি না। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব না। আমাকে সেখানে নিতে হলে টেনে হিঁচড়ে নিতে হবে, এবং তারপরো আমি চিৎকার চেঁচামেচি করব ও অপ্রীতিকর ঘটনার অবতারণা করব। আমাকে যে বন্দি করেছে তার কাছে আমি যাব না।'

কারা কর্মকর্তা হন হন করে চলে গেলেন, বির বির করলেন আমি অবিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছি যেন জেনারেল আব্বাসির সঙ্গে দেখা করতে আমার অস্বীকৃতি আমার জন্য ভাল হবে না। তবে, আমি পরোয়া করিনি। আমরা যারা জিয়ার বিরোধীতা করি, ঘৃণিত সামরিক শাসকের সঙ্গে যেকোন প্রকার যোগাযোগ বিবেচিত হতো নিজেকে বিক্রি করার সামিল। তাদের কাছে যাওয়ার অর্থ হবে তাদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়া ও নীরবে স্বীকৃতি দেয়া।

ওই রাতে আমি আমার স্যুটকেস গোছাতে শুরু করলাম এ বোধ থেকে যে আমাকে এর প্রতিশোধ হিসেবে আবার কারাগারে পাঠানো হতে পারে। একজন বন্দিকে তার কাছে রাখার অনুমোদিত জিনিসগুলো আমি সঙ্গে নেয়ার জন্য গুছালাম– কলম, ডায়েরি, পোকা-মাকড় বিতাড়ক স্প্রে, টয়লেট পেপার ইত্যাদি। তবে, আমাকে কারাগারে নেয়ার জন্য কেউ এলো না। অধিকন্তু, আমাকে পুরোপুরি বিস্মিত করে দিয়ে সামরিক আইন প্রশাসক আমার সঙ্গে দেখা করতে ৭০ ক্লিফটনে এলেন।

তলব করতে ও নির্দেশ দিতে অভ্যস্ত উদ্ধত সামরিক শাসকরা বিরোধীদলের একজন নেতার সঙ্গে দেখা করতে বাস্তবে তার বসবাসস্থলে এসেছেন– এমন কথা শোনা যায়নি। ৭০ ক্লিফটনে বসে থাকা খাঁকি ইউনিফরম পরিহিত পক্ক কেশের অধিকারী জেনারেলের দিকে আমি অবিশ্বাস মেশানো স্থির দৃষ্টিতে তাকালাম। তিনি কয়েকবার এসেছিলেন আর এটিই ছিল তার প্রথম। তার বার্তা ছিল সব সময় একই।

তিনি আমাকে বলে যেতে লাগলেন, আমি জানি আপনি অসুস্থ। আমি সেনাবাহিনীতে থাকার অর্থ– এটা নয় যে, আমি এ বিষয়ে নিরুদ্বিগ্ন। আপনি তো জানেন, আমাদের দু'ই পরিবারের মধ্যে জানাশোনা ও সম্পর্ক কয়েক প্রজন্মের। বিদেশে আপনি চিকিৎসা গ্রহণ করছেন এর চেয়ে ভাল আমি আর কি চাইতে পারি। তবে আমাদের কোনোভাবে

www.pathagar.com

রাজনৈতিক বিব্রত করাটা কিন্তু বরদাশত করবো না।

আমি অশোভন কিছু করতে চাইলাম না। মনে মনে বললাম, আপনার অভিপ্রায় প্রকাশে আমার কিছু যায় আসে না। আমি ধারণা করলাম জেনারেল আব্বাসি এসেছেন আমার মনোবল কেমন আছে এবং বুঝতে আমাকে বিদেশ যাবার অনুমতি দেয়া হলে আমি সেখানে যেয়ে কি করব। আমি তাকে বললাম, যে চিকিৎসার ব্যাপারে আমি আসলেই উদ্বিগ্ন এবং কালবিলম্ব না করেই দেশে ফিরে আসব। একদিক থেকে কথাটা সত্য, কারণ সে সময়ে আমার কোন ইচ্ছা ছিল না বিদেশে নির্বাসনে থাকার। যাহোক, সরকারের প্রকৃত রূপ তুলে ধরতে প্রাপ্ত সুযোগের প্রত্যেকটি কাজে লাগাতে আমি ছিলাম উদগ্রীব।

ওই সময় আমি একেবারেই বুঝতে পারিনি যে, সরকার যে বিভিন্ন দিক থেকে চাপও ছিল। চিকিৎসক তার রেকর্ডে লিখেছিলেন বিদেশে আমার চিকিৎসা প্রয়োজন এবং আটকাবস্থায় আমার যদি কিছু ঘটে তাহলে এর দায়-দায়িত্ব বর্তাবে সরকারের ওপর। চাপ যোগ হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর পেল ও সিনেট ফরেন রিলেশনস কমিটি এবং খুব সম্ভবত ইয়াকুব খানের দিক থেকেও। ১৯৮৩'র গ্রীষ্মে তখন আমার আটকাবস্থা শাসকদের জন্য বিব্রতকরই নয়, বরং তাদের বিরুদ্ধে উল্টো ফল দিচ্ছিলো। যা হোক, ৭০ ক্লিফটনে নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমি এসবের কিছুই জানতাম না। না জানার ফলে আমি আবার রাজনীতির বিষয়ে জড়িত হয়ে আমার সম্ভাব্য মুক্তিকেই ভ ুল করছিলাম।

জিয়ার সফরে সিন্ধুতে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল তা হ্রাস পায়নি। পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস ১৪ আগস্ট নিকটবর্তী হলে এমআরডি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দ্বিতীয় গণআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জিয়া এই তারিখটি বেছে নিয়েছিলেন আরেকটি ভুয়া নির্বাচনী সময়সূচি ঘোষণার। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে এমআরডির আহ্বান আমি ৭০ ক্লিফটন থেকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করছিলাম, সংবাদপত্র পড়ছিলাম গুরুত্ব দিয়ে এবং বিবিসির খবর শুনছিলাম গভীর মনোযোগে। নিকটবর্তী মিডইস্ট হাসপাতালে একটি গোপন সেল সংগঠিত করা পিপিপি নেতৃবৃন্দ এবং আমার নিজ জেলা লারকানার সঙ্গে আমি মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে বার্তার মাধ্যমে যোগাযোগ করতাম। রাজনৈতিক নির্দেশ পাঠানো এবং তহবিল সংগ্রহে আমি সহায়তা করতাম।

পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলো থেকে এমআরডি আন্দোলন ভিন্নভাবে গড়ে ওঠে। অতীতে, 'প্রতিবাদ আন্দোলন' শব্দটির শুধুমাত্র উল্লেখই রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর সরকারি দমন-পীড়ণ বয়ে আনতে যথেষ্ট ছিল, কোন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের আগেই হাজার হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করা হতো, ফলে জনতা হতো নেতৃত্বশূন্য। এখন এমআরডি নেতৃবৃন্দকেই আদালতে যেয়ে গ্রেফতার হতে বলা হলো– তারা তাই করলো। ফলে এখন, স্বেচ্ছায় কারাবরণ আন্দোলনে এমআরডি নেতৃবৃন্দকে উৎসাহ দিতে সমবেত হওয়া লোকজনকে বিরত রাখতেও এমনকি পুলিশ চেষ্টা করেনি। এমনকি সিন্ধুতে জমিদার শ্রেণী আন্দোলনে সামিল হয়। দলীয় সমর্থকদের পরিবহনে ট্র্যাক্টর ও ট্রাক সরবরাহ করে এবং তাদের ম্যানেজারদের মাধ্যমে উন্নত যোগাযোগের ব্যবস্থা করে।

যাহোক, পিপিপির কিছু নেতা আন্দোলনে যোগদানের ক্ষেত্রে শুরুতে ইতস্থতা প্রদর্শন

www.pathagar.com

করেন। এমন খবর ছিল যে পিপিপি নেতা জাতৌয়ের সঙ্গে আমেরিকান কর্মকর্তা ও সেনা কর্মকর্তাদের বৈঠক হয়েছে এবং জিয়ার পতন ঘটাতে তিনি তাদের সমর্থন পেয়েছেন; জাতৌই ক্ষমতায় গেলেও পিপিপি থাকবে বাইরে। আমি পিপিপি নেতৃত্বকে বোঝালাম সবকিছু অগ্রাহ্য করে আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্য, জোর দিয়ে বললাম জিয়া বিরোধী আন্দোলনের এই মুহূর্তে ঐক্য বজায় রাখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে জোট থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়টি পরে ভাবা যাবে।

আন্দোলন ধীরে ধীরে সংগঠিত হচ্ছিল, দলীয় কর্মকর্তাদের কাছে আমি কয়েকটি চিঠি পাচার করি, বিদেশী কূটনীতিকদের কি বলতে হবে এবং সংবাদ মাধ্যমকে কি বলতে হবে সে ব্যাপারে চিঠিতে আমি সংক্ষেপে তুলে ধরি, তাদের তাগিদ দেই আন্দোলনের গতি ধরে রাখার জন্য এবং আন্দোলন বানচাল করার সময় যেন সরকার হাতে না পায়। বার্তা পাঠানোর বিষয়টি যদি সরকার জানতে পারে আমি জানতাম বিদেশে পাঠানোর পরিবর্তে আমাকে কারাগারে পাঠাবে। তবে পাকিস্তানের মানুষের রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনের চেয়ে অন্য কোন কিছু আমার কাছে বড় নয়। কারা কর্মকর্তারা যখন পরিদর্শন করতে আসেন তাদের সন্দেহ দূর করতে আমি যতটা অনুভব করি তার চেয়ে অধিক দুর্বলতার ভান করি। তাদের সাপ্তাহিক পরিদর্শনের সময়টিতে আমি যতোই অসুস্থতা অনুভব করি না কেন সাধারণত তাদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ ও বিরোধীতা আমাকে সাময়িক শক্তি যোগাত। তবে, ১৯৮৩ সালে সিন্ধুর গণ অভ্যুত্থানের সময় আমি সচেতনভাবে আমার দৃষ্টি মাটির দিকে রাখতাম যাতে তারা আমার মানসিক শক্তির অনুমান না করতে পারে। এবং তারা বুঝবে আমি এতোটাই অসুস্থ যে অন্য কিছু ভাবতে পারি না।

ইতিমধ্যে জাতৌই আমার ওপর চাপ প্রয়োগ করছিল জনগণের উদ্দেশ্যে আমার মা'র একটি বার্তা এনে দেয়ার জন্য। অনেক কষ্ট করে কেউ একজন ফোনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করল। তিনি পাল্টা উত্তর দিলেন 'বেনজিরকে বলুন আমার নামে একটি বিবৃতি লিখে দিতে।' আমি ইলেকট্রিক টাইপরাইটারের সম্মুখে বসলাম এবং বিদ্যুতের আসা-যাওয়ার মাঝে দৈত্যের মত শক্তি নিয়ে দ্রুত টাইপ করলাম, শব্দগুলো আমার আঙুলের মধ্যে দিয়ে তীব্রবেগে ছুটে চলল এবং পাতাগুলো দ্রুত ভরে তুলল।

[আমার দেশপ্রেমিক ও বীর দেশবাসী, আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, আমার সাহসী পুত্র ও কন্যারা। (জাতির প্রতি আমার মায়ের আহ্বান আমি এভাবেই শুরু করি, এটা উর্দু ও সিন্ধি ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং প্রদেশগুলোতে গোপনে ছড়িয়ে দেয়া হয়)। এখন আমাদের আন্দোলনের পর্যায় হবে নাগরিক আইন অমান্যকরণ। দীর্ঘ ছয় বছর ধরে আমরা নির্যাতন ও দমন-পীড়নের মোকাবেলা করে আসছি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমাদের আহ্বান উপেক্ষিত হয়েছে, আমাদের কর্মীদের কারারুদ্ধ করা হয়েছে এবং মৃত্যুদ দেয়া হয়েছে। যথেষ্ট হয়েছে আর নয়। আমরা সকল বাস মালিকদের কাছে আবেদন রাখছি– তাদের বাসগুলো সড়ক থেকে উঠিয়ে নিতে, রেলের লোকজনের কাছে আবেদন রাখছি ট্রেন বন্ধ রাখার জন্য। পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের প্রতি আমরা বলছি, দাদুতে আপনার ভাইদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন এবং নিরপরাধ লোকজন যারা আপনাদের ভাই তাদের গুলি করবেন না। আমাদের এই অসহযোগ আন্দোলনে ভীত হবেন না। আমাদের এই আন্দোলন জনগণের জন্য, আমাদের দরিদ্র মানুষের জন্য। আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য যাতে তাদের দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগব্যাধির

www.pathagar.com

মধ্যে বাস করতে না হয়। আপনাদের পার্লামেন্ট, আপনাদের সরকার ও আপনাদের সংবিধানের জন্য লড়াই করুন, যাতে সরকারের সিদ্ধান্তগুলো হবে গণমুখী, জান্তা ও তার অধীনস্তনদের জন্য নয়... ।]

জিয়াউল হকের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র হয় ও ব্যাপকারে ছড়িয়ে পড়ে। রেলস্টেশন আক্রমণের মুখে পড়ল। ট্রাক ও বাসের চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। থানাগুলো জ্বলতে লাগল। কয়েক শ' লোক প্রাণ হারাল। জিয়া নিজে প্রায় হত্যার শিকার হয়েছিল ক্ষুব্ধ জনতার হাতে যাদের তিনি তার অনুরাগী মনে করেছিলেন। যে হেলিকপ্টরে তিনি ছিলেন বলে মনে করা হয়েছিল সেটি দাদুতে অবতরণের অল্পক্ষণ পরেই প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে পড়ে এবং আরোহীদের আক্রমণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে জিয়া ছিলেন দ্বিতীয় হেলিকপ্টারটিতে যেটি দিক পরিবর্তন করে অন্য কোথাও অবতরণ করে। পরে একটি রেস্ট হাউসে তাকে খুঁজে পাওয়া গেল, তিনি অল্পের জন্য পরিত্রাণ পান ক্ষুব্ধ জনতার হাতে নিহত হওয়া থেকে।

সিন্ধুর গণঅভ্যুত্থান দ্রুত অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সীমন্ত প্রদেশে কোয়েটা, বেলুচিস্তান ও পেশোয়ারের আইনজীবীদের সংগঠনগুলো রাজনৈতিক বিবৃতি প্রদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে আহ্বান জানায় নির্বাচনের। লাহোরে দাঙ্গা পুলিশ হাইকোর্টের সবগুলো ফটক বন্ধ করে রাখে যাতে আইনজীবীরা প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নিতে না পারে এবং তাদের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে না পারে। যেভাবেই হোক আইনজীবীরা জড়ো হলেন, এতে নেতৃত্ব দিলেন আমার বাবার সাবেক আইনজীবীদের একজন তালাত ইয়াকুব। লাহোর বার এসোসিয়েশনে পুরুষ আইনজীবী প্রভাবিত, তা সত্ত্বেও মহিলা আইনজীবী তালাত ইয়াকুব আইনজীবীদের উদ্দেশে চিৎকার করে বললেন, 'আপনারা যারা ঘরে বসে থাকতে চান, তারা এইসব হাতের চুরি নিয়ে যান।' তিনি তার হাতের কাঁচের চুরি ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং পাকিস্তানের পতাকা নাড়লেন। 'আমি মুক্তির আহ্বান জানাচ্ছি।' শত শত আইনজীবী তার সঙ্গে যোগ দিলেন। গণতন্ত্রের পক্ষে তারা স্লোগান দিলেন এবং পুলিশ কর্তৃক ঘিরে রাখা অবস্থায়ও দীপ্ত পদে এগিয়ে চললেন।

দেশব্যাপী বিদ্রোহ সেনাবাহিনীর বন্দুক ও ট্যাঙ্কের মাধ্যমে গুড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহের আগ পর্যন্ত। আন্দোলন স্তব্ধ করা সম্ভব হলেও এটি বিশেষত সিন্ধিদের হৃদয়ে রেখে যায় প্রচন্ড ক্ষোভ। এই আন্দোলনে খবর অনুযায়ী মারা যায় ৮০০ জন। গ্রামগুলো পুরোপুরি ধ্বংস করা হয় এবং পুড়িয়ে দেয়া হয় ক্ষেতের ফসল। নারীরা সেনাবাহিনীর সদস্য কর্তৃক উৎপীড়রণের শিকার হয় বলে খবর পাওয়া গেছে যা বাংলাদেশে বারো বছর আগে সেনাবাহিনীর ব্যাপক নির্যাতনের কালো অধ্যায়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্রোধের ছাইভস্মে জন্ম নেয় সিন্ধি জাতীয়তাবাদ। বিচ্ছিন্নতার দিকে পদক্ষেপ ত্বরান্বিত হয়ে উঠে প্রদেশগুলোর অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মধ্যেও। জিয়ার নির্মমতা ও ছয় বছরের সামরিক শাসনে দুর্বল ফেডারেশন রাষ্ট্র পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার অবস্থায় উপনীত হয়।

যা হোক, রিগ্যান প্রশাসন তাদের শিখণ্ডীর পাশে অবস্থান নেয়। নিউজ উইক এক রিপোর্টে উল্লেখ করে যে, ওয়াশিংটন জিয়াকে বিবেচনা করে তার বিশ্ব রাজনীতি কৌশলের ট্রাম্পকার্ড হিসেবে। আমি আমার দিনলিপিতে ২২ অক্টোবর নিউজ উইকের মন্তব্যটি লিখে

www.pathagar.com

রাখলাম। পশ্চিমা একটি গোয়েন্দা সূত্রকে উদ্ধৃত করে বলা হয় যে সিআইএ তার কার্যক্রম পাকিস্তানে 'তাৎপর্যপূর্ণভাবে' সম্প্রসারণ করেছে। গত সপ্তাহে নিউজউইক বলে যে জিয়ার টলায়মান সরকারকে ধরে রাখতে সিআইএ ব্যস্ত। তারা নিশ্চিত করতে চায় জিয়া যেন আরেকজন ইরানের শাহ না হন। গত দেড় বছরে মিসরে সক্রিয় আমেরিকার গোয়েন্দাদের বড় একটি অংশ কায়রো থেকে ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হয়েছে। রিপোর্টের উপসংহার টানা হয়েছে : 'এটা সুস্পষ্ট যে জিয়া তখনই ক্ষমতা ছাড়বেন যখন তাকে এটা করতে বাধ্য করা হবে।' এবং আমি ৭০ ক্লিফটনেই আটক রইলাম, এখন আমার আটকাবস্থার পঞ্চম বছরে।

অন্ধকার। আমার মাথায় গর্জন। ঢেউয়ের পর ঢেউ, অন্ধকারের। সিন্ধুতে গণঅভ্যুত্থানের অল্পকাল পর আমি আমার শোবার ঘরে জেগে উঠলাম, চিকিৎসকের হাত আমার পালসের ওপর এবং তার মুখে দেখা গেল বিরাট স্বস্তির ছাপ। তিনি আমাকে বললেন, আমার কান পরিস্কার করতে তিনি যে লোকাল এনেসথেটিক ব্যবহার করেছিলেন তাতে আমার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হয়। তবে জরুরি সহায়তা চাওয়ার মতো কোন পথ ছিল না। ৭০ ক্লিফটনে ফোন লাইনগুলো ছিল অচল। একমাস পর, আমি প্রচণ্ড মাথা ঝিমঝিমানিতে আক্রান্ত হই, ভারসাম্যের বোধ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলি এবং প্রচণ্ড বদ মেজাজি হয়ে উঠি। আবারো, চিকিৎসকের কোন পথ ছিল না। চিকিৎসা সহায়তা চাওয়ার।

আমার কানের চিকিৎসার পর কয়েকদিন ধরে আমার জ্বর জ্বর ভাব, কাশছিলাম ও ঘামছিলাম। আমার শ্রবণশক্তি পরিমাপ করে চিকিৎসক সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমি প্রায় ৪০ ডেসিবল শ্রবণশক্তি হারিয়েছি। চিকিৎসক নভেম্বরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানাল, 'আটকাবস্থায় তার চিকিৎসা যদি আমাকে অব্যাহত রাখতে হয়, তাহলে রোগীর শারীরিক অবস্থার কোন দায়-দায়িত্ব আমি নিতে পারি না।' তিনি আমার সুচিকিৎসার জন্য হাসপাতালে করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করলেন। 'শীতের মাস গুলোর শুরুতে নাক অথবা গলার এমনকি সামান্য ক্ষতও তার শ্রবণশক্তির অধিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। দ্রুত যদি শৈল্য চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে মুখের স্নায়ুসমূহের অসাড় হয়ে যাওয়া এবং বিদ্যমান ভারসাম্য ম্যাকানিজম হারিয়ে যাওয়ার মতো জটিলতার সম্ভাবনা রয়েছে।' হাসপাতালে চিকিৎসার অনুমতি অবশেষে পাওয়া গেল এবং অধিকতর চিকিৎসা সাবলীলভাবে এগিয়ে চলল। তবে, আমাকে দৈহিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হয়েছিল শৈল্য চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাবার সম্ভাবনার কারণে।

দীর্ঘদিন আটক থাকার কারণে আমি সবার ওপর ও সবকিছুতেই সন্দেহপ্রবণ হয়ে গিয়েছিলাম। এমনকি একজন ব্রিটিশ সার্জন হলেও। একজন অপরিচিত ব্যক্তির হাতে নিজের জীবন তুলে দেওয়ার চিন্তা আমাকে আতঙ্কিত করে তুলল। আমার অপারেশনের প্রয়োজন আছে কি নেই তা দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমি আমার চিকিৎসা রেকর্ডগুলো চুরি করে লন্ডনে ডা. নিয়াজির কাছে পাঠালাম। এখানকার ডাক্তারদের সঙ্গে তিনি একমত পোষণ করলেন।

তথাপি আমি গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতে লাগলাম। সারা পাকিস্তান জুড়ে কারাগারগুলোতে

www.pathagar.com

হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দি অকথ্য অবস্থায় সময় অতিবাহিত করছে, অনেকেই মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি। যদিও আমি কারারুদ্ধ, আমি অনুভব করি আমি ছিলাম তাদের কাছে অনুপ্রেরণা ও সান্ত্বনার উৎস। আমি তাদের দুর্দশা, তাদের ব্যাথা, তাদের প্রতিরোধের অংশীদার। তারা ছিল আমার জন্য এবং আমি ছিলাম তাদের জন্য। আমি যদি তাদের ছেড়ে যাই তাহলে কি তারা পিতৃ-মাতৃহীনতা অনুভব করব? তারা কি শূন্যতা অনুভব করবে?

ডিসেম্বর পার হবার সময়, আমি নিশ্চিত অনুভব করলাম যে সরকারকে হয়তো অচিরেই আমাকে মুক্তি দিতে হবে। সিন্ধুতে বিদ্রোহ চলাকালে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমি কিছুই জানিনি। আমি জানতাম সমস্যা যখন তুঙ্গে তখন আমাকে তারা মুক্তি দিবে না, কারণ সরকারের জানা আছে আমি সব খবর বিদেশে নিয়ে যাব। কিন্তু এখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা থিতিয়ে এসেছে। তাদের কাছে এখন আর কোন অজুহাত নেই।

চিকিৎসার প্রয়োজনে বিদেশে যাওয়ার জন্য আমি এখন শারীরিকভাবেও যথেষ্ট সুস্থ। যদিও চিকিৎসক পরিকল্পনা করেছিলেন উড়ার জন্য আমাকে অনুমতি দেয়ার আগে আমার কানে একটি ড্রেইনেজ টিউব প্রবেশ করাবেন। কিন্তু এখন তিনি বলছেন উড্ডয়ন ও অবতরণকালে আমার কোন সমস্যা হবে না ডিকনজেসট্যান্টস ওষুধ ব্যবহার ও চুইংগাম চিবালেই চলবে। আমার মানষিক চাপ ও দুঃশ্চিন্তার ফলে আমার-শারীরিক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ায় যে ভূমিকা রেখেছিল তা অনেকটাই এবার হ্রাস পায় প্রতিদিন আমাকে দেখতে আসার জন্য সনমকে অনুমতি প্রদানে সরকারি সিদ্ধান্তে। চিকিৎসক কর্তৃপক্ষকে জোর দিয়ে বলেছিলেন সরকার যদি আমাকে অব্যাহতভাবে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত রাখে তাহলে আমার পক্ষে সম্ভব হবে না সুস্থ হওয়া।

ডিসেম্বরের শেষে কর্তৃপক্ষ সনম ও আমার কাছে আমাদের পাসপোর্ট চায় এবং আমাদের ভিসা ফরম ও আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ফরম পূরণ করে দিতে বলে। আমাদের বলা হয়, 'রিজার্ভেশন রাখুন।' কিন্তু যখন আমাদের যাওয়ার দিন এল, কেউ আমাদের নিতে এল না। আমি সময়টি কাটালাম আমার ব্যক্তিগত বিষয়গুলো সেরে রাখতে, আমার অনুপস্থিতিতে বাড়ি দেখভাল করার বিষয়টির সুরাহা করলাম, করের নিষ্পত্তি করলাম। আরেকটি ফ্লাইট এল ও চলে গেল।

আমাদের পরবর্তী নির্ধারিত ফ্লাইট ছিল ১৯৮৪ সালের ১০ জানুয়ারির ভোরে। আগে থেকে সতর্ক না করেই ৭০ ক্লিফটনে কর্তৃপক্ষ হাজির হল রাত সাড়ে এগারটায়। তারা বললেন, 'আজ রাতে আপনারা দেশ ত্যাগ করছেন। গুছিয়ে নেয়ার জন্য আপনাদের অল্প কয়েক ঘণ্টা সময় রয়েছে।' অবিশ্বাস নিয়ে আমি তাদের কথা শুনলাম। জনগণের উদ্দেশে আমি দ্রুত একটি শেষ বার্তা টাইপ করলাম। আমি শুরু করলাম,' সাহসী কর্মী ও প্রিয় 'দেশবাসী। অসুস্থতার সঙ্গে সম্পর্কিত এ ভ্রমণে যেতে বিমানে ওঠার আগে, আমি আপনাদের অনুমতি, আপনাদের দোয়া ও আপনাদের আর্শীবাদ চাই...।' আমার জিনিসপত্র গুছানোর সময় আমি অসাড়তা অনুভব করলাম এবং আমার বিড়ালটিকে নিলাম একটি ভ্রমণ বাক্সে। বিগত সাত বছরে আমার সাথে যেসব আচরণ করা হয়েছে, এখন এমনকি ভাল কিছুও অবাস্তব মনে হয়।

সনম উঠানে একটি নাম্বারবিহীন এক গাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

www.pathagar.com

বিমানবন্দরে উদ্দেশে আমরা যখন দ্রুতগতিতে ছুটছিলাম তখন রাস্তায় কোন লোক ছিল না এবং বিমানবন্দরের এক পাশের কক্ষে আমরা নিজেরাই প্রবেশ করলাম। আমি বিন্দুমাত্র উত্তেজনা দেখালাম না। আমি এইমাত্র পড়ে শেষ করলাম ওরিয়ানা ফ্যালাসির 'দ্য ম্যান'। পড়ছিলাম, ফ্লাইট উড্ডয়নের পরপরই বিমান বাহিনীর বিমান পাঠানো হয়েছে গল্পের প্রধান চরিত্রটিকে বিমানবন্দরে ফিরিয়ে আনার জন্য।

পুলিশ আমাদের সুইস এয়ারের বিমানের কাছে নিয়ে গেল। আমি যখন হেঁটে যাত্রী সিঁড়ির কাছে এলাম, তখন আমি বিমানবালার মুখে স্মিত হাসি দেখলাম। আমি এটা কখনোই ভুলব না। এটা কোন পুলিশ অথবা সামরিক আইন প্রশাসক অথবা কারা কর্মকর্তার হাসি ছিল না। এটা ছিল একজন বেসামরিক নাগরিকের হাসি, আরেকজন মানুষের হাসি। বিমানের দরজা বন্ধ হল। রাত আড়াইটায় সনম ও আমি সুইজারল্যান্ডের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। কোন বিমান ফালাসি'ক গল্পের মত ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের অনুসরণ করল না। পরবর্তীতে পিটার গলব্রেথের সঙ্গে কথা বলার আগ পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল না সামরিক শাসনের সাত বছর পর জিয়া কেন এ মুহূর্তটিকে বেছে নিয়েছিলাম আমাকে মুক্তি দেয়ার জন্য।

পিটার গলব্রেথ :

ডিসেম্বরের শেষে ফরেন রিলেশনস কমিটি আমাকে বললো দক্ষিণ এশিয়া সফর করার জন্য এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয় কমিটির চেয়ারম্যান চার্লস পার্সিকে রিপোর্ট প্রস্তুত করতে। কমিটির চেয়ারম্যান চার্লস পার্সি ও সিনেটর পেল স্বাক্ষরিত একটি চিঠি আমার সঙ্গে করে নিয়ে যাই ইয়াকুব খানের কাছে, চিঠিতে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় তার সরকারের বিবৃতির ব্যাপারে যে বেনজিরের সঙ্গে বন্ধুদের দেখা করার অনুমতি রয়েছে। তাদের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, 'মি. গলব্রেথ মিস বেনজির ভুট্টোর ব্যক্তিগত বন্ধু এবং তাদের বন্ধুত্ব হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই।' সিনেটররা আহ্বান জানান, আমাকে যেন তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেয়া হয়।

আমি পাকিস্তান সফরের পরিকল্পনা করি এবং শেষ গন্তব্য নির্ধারণ করি করাচি। এবার যুক্তরাষ্ট্রে দূতাবাস ছিল খুবই সহায়তাকারী। আমাকে বলা হল, বেনজিরের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি আমাকে দেয়া হবে কি না সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন একমাত্র জেনারেল জিয়া।

৯ জানুয়ারি সন্ধ্যার কিছু পরে আমি করাচি পৌছাই। বেনজিরের সঙ্গে দেখা করার আমার অনুরোধের ব্যাপারে কোন সাড়া না পেয়ে আমি পরদিন সনমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করলাম। এবং আমি খুবই হতাশ হয়ে আবার বেনজিরকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলাম।

পরদিন সকালে আমি যুক্তরাষ্ট্র কনস্যুলেট থেকে একটি ফোনে কল পাই এক্ষুণি চলে আসার জন্য। আমি যখন পৌছলাম, তখন ডেপুটি কনসাল জেনারেল আমাকে বললেন মধ্যরাতের অল্পকাল পরেই বেনজিরকে বিমান বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সুইস এয়ারের একটি বিমানে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সনম তার সঙ্গে গিয়েছেন।

আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কনস্যুলেটের একটি গাড়ি আমাকে ৭০ ক্লিফটনে নিয়ে গেল। সেখানে পুলিশ প্রহরীদের কেউ নেই। বাড়িটি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। বেনজির মুক্ত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

স্বৈরাচার মোকাবেলায়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১১

নির্বাসনের বছরগুলো

'মা'!

'পিংকি! তুমি মুক্ত। এই দিনটির স্বপ্ন আমি কতোই না দেখেছি!

জেনেভা বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে আমি সীমাহীন দিগন্তের পানে তাকালাম। তিন বছর ধরে আমার দৃষ্টি দেয়ালে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে, মানিয়ে নিতে আমার চোখের কিছুটা সময় লাগল। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না, আমি মুক্ত।

আমরা যখন মায়ের ফ্লাটে এসে পৌঁছলাম, তখন ইতোমধ্যে টেলিফোন বেজে চলছিল। মীর ও শাহকে আমার মা ফোনে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে সত্যিই এখানে।' 'বিবিসি'তে তার মুক্তির ব্যাপারে তোমরা যা শুনেছ তা সত্য।'

মীর, শাহ নেওয়াজ। আমার ও আমার ভাইয়ের কণ্ঠ আমাদের উত্তেজনায় পরস্পরের শ্রবণে বিঘ্ন সৃষ্টি করল। রিসিভারটি আমার ভাল কানে চেপে ধরে আমি ফোনে চিৎকার করে বললাম, 'তুমি কেমন আছো?' মীর চিৎকরে করে জবাব দিল, 'আগামীকাল আমি তোমাকে দেখতে আসছি।' শাহ যোগ করল, 'এক সপ্তাহের জন্য থাকো, যাতে আমিও আসতে পারি। আমি তাকে বলি, 'ও শাহ, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ডাক্তার দেখানোর জন্য আমাকে লন্ডন যেতে হবে।' যত দ্রুত সম্ভব আমরা একে অন্যকে দেখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করি।

ফোন বেজেই চলল– লস এ্যাঞ্জেলস, লন্ডন, প্যারিস থেকে... আমার মা'র বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনরা ফোন করতে লাগলেন আমার মুক্তিতে তাকে অভিবাদন জানাতে। অন্য কারো সঙ্গে কথা বলতে আমি তখনো প্রস্তুত হইনি এবং শুধুমাত্র কথা বললাম, ইয়াসমিন ও লন্ডনে ডা. নিয়াজির সঙ্গে। যুক্তরাষ্ট্রে ইরানের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও আমার বাবা-মার বন্ধু আর্দেশির জাহিদি উপস্থিত হলেন ক্যাভিয়ার নিয়ে। মা, সানি ও আমি রাত জেগে গল্প করতে লাগলাম। এটা পুরোটাই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। গতকাল আমি ছিলাম একজন বন্দি। আজকে আমি মুক্ত, মা ও বোনের সঙ্গে। আমরা একত্রিত। আমরা সবাই জীবিত।

www.pathagar.com

মীর! বাদামী চুলের ছোট্ট একটি মেয়ে আমার কোট ধরে ফ্ল্যাটে দাঁড়িয়ে! মীর আমাকে বললো, এই যে তোমার ভাতিজি ফাখি।' সত্যিই কি আমার ভাই আমার সামনে দাঁড়িয়ে? আমি দেখলাম তার ঠোঁট নড়াচড়া করছে, আমি আমার কণ্ঠেরই উত্তর শুনতে পেলাম। আমাদের একত্রিত হওয়ার গুঞ্জন অবশ্যই আমাদেরকে বধির করে দিয়েছিল, আমরা কি বলেছিলাম তা আমার একটুও স্মরণ নেই। ২৯ বছর বয়সী মীরকে বেশ সুদর্শন দেখাচ্ছিল, তার কালো চোখে এক মিনিট ধরে দেখা গেল ঝিলিক, পরে শান্ত হয়ে এল যখন সে তার দেড় বছর বয়সী মেয়েকে তুলে ধরল আমাকে চুমু দিতে। মীর হেসে বলল, 'শাহকে দেখার আগ পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর।' আমি শেষবার যখন দেখছিলাম, শাহ তখন আঠারো বছর বয়সী, একটা বালক মাত্র। এখন সে পঁচিশ বছর বয়সী এবং তার রয়েছে দীর্ঘ গোঁফ।

আমি দেখলাম আল্পসের চূড়া বেয়ে উপরে উঠছে সূর্য, অনুভব করলাম ঠাণ্ডা বিশুদ্ধ বাতাস যা আমার মুখ ভিজিয়ে দিল। এটা চমৎকার অনুভূত হল, যদিও আমার কান বন্ধ ও অসাড় হয়ে ছিল। গাড়ি চলাচল সবে মাত্র শুরু হয়েছে এবং আমি নিচের রাস্তায় নজর দিলাম। ভবনটির কাছে গোয়েন্দাদের কোন গাড়ি পার্ক করা নাই, প্রবেশ পথে লুকিয়ে থাকা কোন গোয়েন্দাও আমার নজরে এলা না। এটা কি বাস্তবিকই সত্য? আমি কি সত্যই মুক্ত? আমি আমার চোখ রগরালাম। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল যখন আমার স্মরণে আসছিলো আমি কেন বিদেশে এসেছি।

ইতিমধ্যে আমার মুক্তির খবরটি ইউরোপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাক প্রবাসী পাকিস্তানিদের মধ্যে চাউর হয়ে গেল। শুধুমাত্র ইংল্যান্ডেই ৩৭৮,০০০ পাকিস্তানির বসবাস। ওইদিন বিকেলে যখন আমি ও সানি লন্ডনে উড়ে গেলাম, তখন হিথ্রো বিমানবন্দরে পাকিস্তানিরা ভিড় জমাল আমাকে স্বাগত জানাতে। চারপাশ রাজনৈতিক স্লোগানে মুখর হয়ে উঠল, আমি অনুভব করলাম যেন আমি করাচিতে ফিরে এসেছি।

ইয়াসমিন নিয়াজি, হিথ্রো বিমানবন্দর :

> ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমসহ বিমানবন্দরে এতো সংখ্যক লোক উপস্থিত হয়েছিল যে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, সবাই ধাক্কা-ধাক্কি ও ঠেলা- ঠেলি করছিল বেনজিরকে একনজর দেখার জন্য। মনে হচ্ছিল তিনি যেন মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছেন। কেউ কখনো কল্পনাও করেনি তাকে আবার দেখতে পাওয়ার। জনতার ভিড় সামলাতে হিমশিম খাওয়া এক ইংরেজ পুলিশ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি কে, চলচ্চিত্রের তারকা বা অন্য কিছু? এই পুলিশের সঙ্গে আরেকজন পুলিশ মিলে যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন ভিড় সামলানোর। আমি তাকে বললাম, 'তিনি আমাদের রাজনৈতিক নেতা।' বিস্মিত হয়ে তিনি বললেন, 'একজন রাজনীতিক?'
>
> অবশেষে বেনজির যখন গেট পার হয়ে বাইরে এলেন তখন সংবাদ মাধ্যম তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি নির্বাসনে এসেছেন?' তার উত্তর বিমানবন্দরে ভিড় জমানো পাকিস্তানিদের পাশাপাশি পরবর্তীতে রেডিওতে শ্রবণ করা অথবা সংবাদপত্রগুলোতে পাঠ করা লাখ লাখ মানুষের জন্য ছিল পরম স্বস্তিদায়ক। তিনি বললেন, 'নির্বাসন? আমি কেন নির্বাসনে যাব?' আমি ইংল্যান্ডে এসেছি শুধুমাত্র চিকিৎসা করাতে। আমি পাকিস্তানে জন্মেছি এবং পাকিস্তানেই মরবো। আমার পিতামহকে সেখানে কবর দেয়া হয়েছে। আমার পিতাকে

www.pathagar.com

সেখানে কবর দেয়া হয়েছে। আমি আমার দেশ কখনো ত্যাগ করব না।'

তার কথা তার দেশের সব মানুষ, বিশেষত দরিদ্রদের মনে বিরাট প্রত্যাশার জন্ম দেয়। তার বার্তায় বলা হয়, 'আমি আপনাদের ছেড়ে যাব না'। 'আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি আপনাদের পাশেই থাকব। ভুট্টোরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।

লন্ডনের কিংসব্রিজ এলাকায় বেহজাত আন্টির ছোট্ট ফ্ল্যাটটি ফুল ও ফলের ঝুরিতে ভরে গেল, এখানেই সানি ও আমি একটি অতিথি শয়নকক্ষে একসঙ্গে থাকলাম। দলীয় নেতৃবৃন্দ ও সমর্থকদের পাশাপাশি সাংবাদিক ও অক্সফোর্ডে আমার পুরনো বন্ধুরা আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ভিড় জমাল। প্রবাসে থাকা পিপিপি সদস্যদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল লন্ডন। আমার নিজ ভাইয়েরা এখানে বাস করে এবং অভ্যুত্থানের পর পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা অনেক পিপিপি নেতৃবৃন্দের ঘাঁটি ছিল এটি। সাক্ষাৎকারের অনুরোধ জানিয়ে ফোন বেজে চলল ক্রমাগত। ফ্ল্যাটে স্রোতের মতো লোকজন আসছে ও বেরিয়ে যাচ্ছে এবং একজনের পর একজন বলছেন, 'আমি আপনার সময় থেকে মাত্র দশ মিনিট নিব।' অন্যদের মধ্যে ইংল্যান্ডে বসবাস করা বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানের অনেকে- শুধুমাত্র সদর দরাজায় আসতেন, ঘন্টা বাজাতেন এবং বাইরের রাস্তায় ভিড় করতেন। আন্টি বেহজাত ও তার স্বামী আঙ্কেল করিম ছিলেন খুবই সদাশয়, কিন্তু পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠল। এটা আরো জটিল হয়ে উঠল যখন আন্টি বেহজাত লক্ষ্য করলেন ভবনের বাইরে পাকিস্তানি পুরুষ দিয়ে ঠাসা একটি গাড়ি সারাদিন পার্ক করা অবস্থায় রয়েছে। আমি যেখানেই যাই গাড়িটি আমাকে অনুসরণ করতে শুরু করলে আন্টি বেহজাত আমাকে বললেন, 'এটা একটি মুক্ত দেশ। তোমাকে এ উপদ্রব সহ্য করতে হবে না।' তিনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে ফোন করলেন এবং অলৌকিকভাবে গাড়িটি উধাও হল। আমাকে অনুসরণ না করতে জিয়ার গুপ্তচরদের বাধ্য করতে সমর্থ হওয়ায় আমরা ছোট আকারে বিজয় অনুভব করলাম। তবে আমার আশঙ্কা রয়েই গেল।

এতো কিছুর পর আমি মুক্ত হলেও, ফ্ল্যাটের বাইরে যেতে আমি ছিলাম আতঙ্কিত। যখনই আমি সদর দরজার বাইরে পা রাখতাম তখনই আমার পেট, আমার ঘাড় ও আমার কাধে চাপ অনুভূত হত। আমাকে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না তা দেখতে চারদিকে তাকানো ছাড়া আমি দুই কদমও হাঁটতে পারতাম না। কারাগারের দেয়ালগুলোর ভিতরে বছরের পর বছর কাটানোর ফলে লন্ডনের এমনকি ভিড়-ভাট্টা পূর্ণ ব্যস্ত রাস্তাও হুমকিজনক মনে হত। আমি মানুষজন, কলরব, কোলাহল কোনটাই সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার চিকিৎসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ভূগর্ভস্থ রেলপথ ব্যবহার না করে আমি এটা ট্যাক্সি দেখা মাত্রই উঠে পড়ি। গন্তব্যে পৌঁছেও গাড়ি থেকে বের হতে আমার সাহস হতো না, কিন্তু নামতে হতো, নামার সঙ্গে সঙ্গেই আমার হৃৎপিণ্ডে আবার দপ-দপানি শুরু হত এবং আমার শ্বাসের টান উঠে যেত। বাস্তব জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেয়া ছিল বেশ কঠিন।

আমি আত্মবিশ্বাসের পাতলা আবরণ দিয়ে নিজেকে জড়ালাম এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে আমার উদ্বেগ লুকিয়ে রাখলাম। আমার আটকাবস্থার বছরগুলো এবং আমার পরিবারের প্রতি সামরিক সরকারের আচরণ পাকিস্তানিদের অনেকের চোখে আমাকে নিয়ে

www.pathagar.com

গেছে অতি মানবীয় উচ্চতায়। ইংল্যান্ডে আমার আগমন ঘিরে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ আমাকে পাবলিক-ফিগারে পরিণত করেছে। সামরিক শাসনকে যিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তার পক্ষে হঠাৎ করে হাইডপার্ক কর্নার-এ বিষণ্নতায় নিমজ্জিত হওয়া কোনক্রমেই মানানসই নয় অথবা অনুপ্রেরণাদায়কও নয়। যখনই মনের জোর খাটিয়ে আমাকে বাইরে যেতে হত, আমি নিজেকে বলতাম, জোরে শ্বাস নাও। দৃপ্তপদে চল। আতঙ্কিত হয়ো না।

লন্ডনে পৌঁছার কয়েকদিন পর আমি একজন অপ্রত্যাশিত দর্শণার্থীর সাক্ষাৎ পাই। আন্টি বেহজাত আমাকে বললেন, পিটার গলব্রেথ সবেমাত্র করাচি থেকে এসে পৌঁছেছেন এবং আমার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে মিলিত হতে চান। আমার মুক্তিতে তিনি কি ভূমিকা রেখেছিলেন সে ব্যাপারে আমার কোন ধারণা ছিল না, আমি শুধুমাত্র উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম পুরনো একজন বন্ধুর দেখা পাব বলে। সাহসের উপর ভর করে, আমি ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং একটি ট্যাক্সিতে উঠে পড়লাম রিজ হোটেলের উদ্দেশ্যে।

পিটার গলব্রেথ :

তাকে ফোন করার সময় আমি খুব সহজ হতে পারিনি, জড়তা ছিল কথা বলার সময়। দীর্ঘ সাত বছর পর দেখা হতে যাচ্ছে তার সাথে। আবার আমাদের দু'জনের জীবনও ভিন্ন দুই খাতে প্রবাহিত। আমি রিজ হোটেলের লবিতে অস্থির ও আবেগ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। আর ওই স্থানে হোটেলের অন্যান্য অতিথিরা শান্তভাবে বসে চা-কফি খাচ্ছিলো।

সে যখন আসলো, তাকে বিস্ময়কর ভাবে ভাল দেখাচ্ছিলো। আমরা লাঞ্চ খেতে যাচ্ছি। অবশ্য তাকে অন্য কোনো বিশেষভাবে দেখার কল্পনাও করিনি। তবে তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে, সেটা সত্যি– নিজের প্রতি আস্থাশীল ভিন্ন একটা ব্যক্তিত্ব। ১৯৭৭ সালে অক্সফোর্ডে দেখার সময় থেকে এখন তাকে আরো আত্মমর্যাদাবান মানুষ মনে হচ্ছিলো।

অবশ্য সে সব সময়ই ছিল আকর্ষণীয়। এখন আরো বেশি চোখে পড়ার মত উজ্জ্বল। খেতে খেতে আমি তার ও পাকিস্তানের বিষয় নিয়ে ওয়াশিংটনের কর্তাদের মধ্যে কী কী বিষয় আলোচনা হয়েছে, সিনেটর পেল তার মুক্তির জন্য কী কী কাজ করেছেন সেগুলো বিস্তারিত বললাম। আমি আমার সাথে নিয়ে আসা আমাদের বন্ধুদের ও আমার ছেলের ছবি বেনজিরকে দেখলাম। সে ভীষণ মুগ্ধ হয়ে দেখলো এবং অতীত রোমন্থন করলো।

লাঞ্চ শেষে তার খালার বাসায় হেঁটে হাওয়ার সময় তাকে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার জন্য বললাম। তাকে বললাম, 'শুধু কারা নির্যাতন নয়, পাকিস্তানে রাজনৈতিক হত্যাও নিত্য ঘটনা।' আমি তাকে আরো বললাম, 'আমেরিকায় চলে আস না কেন? এমন কী চেষ্টা করলে হাভার্ডের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্সে একটা ফেলোশিপও পেতে পারো।'

'মন্দ হতো না, আমার সুযোগ হতো জানতে ও বুঝতে অন্যরা কীভাবে পাকিস্তানে ভুট্টোর সরকার এবং বর্তমান মিলিটারি শাসককে ব্যাখ্যা ও তুলনা করছে', বেনজির বললো, 'কিন্তু দলের প্রতি আমার দায়িত্ব রয়েছে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে থাকলেই ভাল। কারণ এখানে পাকিস্তানি লোকজনের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি এবং এখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তারা এক-একটা অঞ্চল ধরে এক সাথে থাকে।'

আমি যখন তাকে বললাম, ঠিক আছে, তবে রাজনৈতিক প্রচারণা ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে লবি ও কথা বলতে তো আসা যায়। মনে হলো কথাটি তার মনে ধরেছে শুধু নয়,

www.pathagar.com

উৎসাহিতও হলো। সে জানে রাজনৈতিক প্রচারণা ও যোগাযোগ পাকিস্তানের রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির বিষয়ে সাহায্য করবে। কিন্তু একটা সমস্যা যে, আমি ঠিক জানতাম না যে কোন কানটা দিয়ে সে শুনতে পায় না। আসলে আমি সে-ই কানের পাশ দিয়েই হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিলাম যেটাতে সে শুনতে পায় না।

জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে আমার কানের একটা সূক্ষ্ম অপারেশন হয়। শৈল্য চিকিৎসক মি. গ্রাহামের তত্ত্বাবধানে ৫ ঘন্টা ধরে এ অপারেশন চলে। জ্ঞান ফেরার পর চোখ মেলতেই গ্রাহামকে দেখতে পাই। তিনি আমাকে হাসতে বললেন। প্রথমে ভাবলাম আমাকে উৎফুল্ল রাখার চেষ্টা করছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আমার দিকে জুসের গ্লাস এগিয়ে দিলেন।

চুমুক দেয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন, 'স্বাদ কেমন?'

'বেশ সুস্বাদু'- জবাব দিলাম।

এরপর আমার মেডিক্যাল ফাইলে কিছু পরামর্শ লিখে ডাক্তার জানালেন, 'তোমার অপারেশন সফল হয়েছে, মুখের বা' দিকের পেশীগুলোর তেমন কোন ক্ষতি হয়নি এবং তোমার স্বাদ গ্রহন করার ক্ষমতাও অটুট রয়েছে।

অপারেশনের পর কলিংহাম গার্ডেনের বৃক্ষছায়া শোভিত মনোরম এলাকায় মা'য়ের অস্থায়ী ফ্ল্যাটে এসে উঠলাম। দশ মিনিটের বেশী বসে থাকতে পারতাম না। ঝিমুনী ও বমি পেত। মাথার ভেতরটা দপ দপ করতো ব্যাথায়। সারাক্ষণ শুয়ে থাকতাম। বিছানায় বসে থাকতেও খুব কষ্ট হত। মাথা বেশী নাড়াচাড়া করতে পারতামনা। কিছু লিখতে বা পড়তে গেলেই মাথাটা কেমন অসাড় হয়ে যেত। মি. গ্রাহামকে ফোন করলে তিনি জানান, এমন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তিনি আমাকে নিয়মিত কান পরীক্ষার পরামর্শ দিলেন।

অপারেশনের ছয় সপ্তাহ পর ডাক্তারের চেম্বারে যাই। তিনি কান পরীক্ষা করে জানালেন, নয় মাস পর সম্ভবত আরেকটি অপারেশনের প্রয়োজন হতে পারে। ডাক্তারের কথায় আমি খুব হতাশ হয়ে পড়ি। আরও নয়মাস আমাকে লন্ডন থাকতে হবে! কারন আমি শীগগিরই পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলাম। অবশ্য আমার মা, বেহজাদ খালা, সানি, ইয়াসমিন- সবাই চাচ্ছিলো আমি ইউরোপেই থেকে যাই। মার আশঙ্কা ছিল, পাকিস্তানে ফিরলে হয়তো জিয়া সরকার আমাকে গ্রেফতার করবে এবং আমি সেখান থেকে জীবিত ফিরতে পারবো না। মৃদু হেসে বলেছিলাম, আমি জেল থেকেই পাকিস্তানের দু:শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবো। সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলো, এখানে থেকেও তো ওই কাজ করা যায়। ডাক্তারের পরামর্শ তাদের যুক্তিকে আরও জোরালো করে তোলে। কিন্তু এরপরও লন্ডনে থাকতে আমার মন সায় দিচ্ছিলো না। অনেকটা বাধ্য হয়েই থেকে গেলাম। নয় মাস অনেক দীর্ঘ সময়। কিভাবে এ সময়টাকে কাজে লাগানো যায়, সে ভাবনা আমাকে পেয়ে বসলো।

ধীরে ধীরে অবসাদ কাটিয়ে সুস্থ্য হয়ে উঠি। সিদ্ধান্ত নিলাম পুরো সময়টাই দেশের কাজে লাগাতে হবে। জিয়াউল হকের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত তৈরী করতে হবে। পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলে অন্যায়ভাবে আটক চল্লিশ হাজার রাজনৈতিক কর্মীর ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন-নিপিড়নের চিত্র বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে।'

www.pathagar.com

পাকিস্তানে বন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে নির্বাসনে আসায় পশ্চিমা মহলে আমি মোটামুটি পরিচিত হয়ে উঠছিলাম। আমার মনে হল, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার বক্তব্যকে তারা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারবেনা। আর এটা যদি করতে পারি তাহলে হয়তো তারা জিয়া সরকারের নির্বিচারে গ্রেফতার, বিচার ছাড়াই দীর্ঘদিন কারাবাস এবং শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিরোধীতার কারনে নীরিহ লোকদের মৃত্যুদন্ড দেয়া বন্ধে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

সে সময় সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে রাওয়ালপিন্ডির সামরিক আদালতে কমপক্ষে ১৮ জন রাজবন্দীর বিচারের নামে প্রহসন চলছিল। আল-জুলফিকার নামক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে লাহোরের কোট লাখপত জেলে বন্দি আরও ৫৪ জনের বিচার চলছিল। করাচীতে বন্দি ছিল করাচী স্টিল মিলের শ্রমিক নেতা পিপিপি'র ত্যাগী কর্মী নাসের বেলুচ। অপর ৪ সহযোগীসহ তার বিরুদ্ধে ছিনতাই ও অপহরনের মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছিল। যে অভিযোগে তাদের মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত হতে পারে। জেনারেল জিয়ার বিচারের নামে এ প্রহসন এমন গোপনীয়ভাবে করা হত যে, কখন কোথায় কবে কি অভিযোগে কার বিরুদ্ধে রায় হলো তা অনেকেই জানতে পারতো না।

নাসের বেলুচ গ্রেফতার হওয়ার খবরটি আমি জানি ১৯৮১ সালে সুক্কুর কারাগারের সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছ থেকে। নাসের ও তার সহযোগীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করতে প্রায় ২ বছর চলে যায়। তাদের বিচার কাজ শুরু হলেও সিক্রেসি অফ প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারের অজুহাতে সে সম্পর্কে কোন তথ্যই জানা যায়নি। তবে ১৯৮৩ সালের মে মাসে করাচী সেন্ট্রাল জেলের এক কাররারক্ষীর মাধ্যমে নাসের আমাকে একটি চিরকুট পাঠাতে সক্ষম হলে– আমি পুরো বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারি।

চিরকুটে নাসের জানান, সামরিক আদালতে এতটাই পক্ষপাতদুষ্ট যে সেখানে আমাদের হাত-পা বেঁধে কবরে শুয়ে থাকা মরদেহ'র মতো করে রাখা হচ্ছে। প্রতিদিন ৮ ঘন্টা বিচার চলাকালে আমাদের পানি পান বা নামাজ, এমনকি টয়লেটে পর্যন্ত যেতে দেয়া হয়না। ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তাদের বিচার কাজ সম্পন্ন হয়নি বলে আমার কাছে খবর ছিল।

আমি অন্য শ্রমিক নেতা আয়াজ সামুকে নিয়েও খুব চিন্তিত ছিলাম। জেনারেল জিয়ার এক রাজনৈতিক সমর্থক হত্যাকান্ডের মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে তাকে গ্রেফতার করা হয়। শিল্প এলাকা করাচীতে শ্রমিক আন্দোলন দমান করার লক্ষ্যেই জিয়া সরকার বেলুচ, সামোর মতো নেতাদের গ্রেফতার করে। বেলুচ ও সামুর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিচারে তাদের মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। আমি উপলব্ধি করলাম আমাদের কিছু করতে হবে এবং তা খুব দ্রুত।

আমার বন্দি জীবনের যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক বন্দিদের সম্পর্কে পাকিস্তান থেকে পাঠানো তথ্য লিপিবদ্ধ করতে শুরু করলাম। সেই সময় আমার এ্যামিনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের কথা মনে পড়ে। জানুয়ারী মাসে লাহোরে প্রথিতযশা আইনজীবি রেজা করিমকে যখন গৃহবন্দি করা হয় তখন আমি দেখেছিলাম এই সংগঠনটি কিভাবে বিশ্বব্যাপী জনমত গঠন করে। রেজা করিমের পক্ষে এ্যামিনেষ্টির প্রতিবেদন 'আর্জেন্ট কল ফর একশন' পশ্চিমা গনমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।

সে সময় ইংরেজী দৈনিক দ্য নেশন পত্রিকায় বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লঙ্ঘনের বেশ কিছু প্রতিবেদন ছাপা হয়। সেখানে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, 'পাকিস্তানের প্রখ্যাত আইনজীবি রেজা করিমের গৃহবন্দি হওয়া একটি উদ্বেগজনক ঘটনা। এ ঘটনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাসীন মনোভাব দেখা যাচ্ছে। যেখানে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে প্রতিবছর ৫২৫ মিলিয়ন ডলার সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তারা পাকিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। অথচ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদেশী সাহায্য দেয়ার ব্যাপারে তার দেশের আইনে যে শর্ত দেয়া হয়েছে সেগুলো বেমালুম ভূলে গেছেন। এই আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট এমন কোন দেশকে সহায়তা দেবে না যেখানে অভিযোগ ছাড়াই বন্দিদের দীর্ঘদিন হাজতবাস অথবা মানুষের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও বাঁচার অধিকার লঙ্ঘিত হয়।'

এই প্রতিবেদনটি সঠিক সময়েই প্রকাশিত হয়। মার্চে আমি ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক শান্তির ওপর ভাষন দেয়ার জন্য 'কারনেজি এন্ডোমেন্টে' থেকে আমন্ত্রন পাই। রাজনৈতিক বন্দিদের সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য ও আমার পুরোনো এড্রেস বুক সঙ্গে নিয়ে আমি আর ইয়াসমিন আমেরিকার উদ্দেশে রওনা দিই।

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে এর আগেও আমি এসেছিলাম। এবার এর দীর্ঘ বারান্দা ধরে হাঁটার সময় হার্ভাডের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। সেখানে পড়ার সময় যে স্বাধীনতা ভোগ করতাম এবার নিজেকে সে রকম স্বাধীন মনে হচ্ছিল। ভিয়েতনামের ব্যাপারে আমেরিকার নাক গলানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য এর আগে যখন ওয়াশিংটনে আসি, তখন আমি গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করি। এবারও আমি সে রকম প্রতিবাদ জানাতেই এসেছি, তবে সেটি নিজের দেশের দু:শাসনের বিরুদ্ধে। প্রথম সফরের সময় আমি বেশ চুপচাপ ছিলাম। ভয় ছিল, বিদেশী হিসেবে সেখানে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করতে পারবো কিনা। দ্বিতীয়বার আমার সে ভয় ছিলনা।

পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও মানবাধিকার লংঘন বন্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে সেবার যুক্তরাস্ট্রের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করি। প্রথমেই আলাপ হয় সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী ও ক্লেইবর্ন পেলের সঙ্গে। বন্ধু পিটার গলব্রেথ ক্যাপিটাল হিলের আরো কয়েকজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ করে দেন। সেখানে আমি ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেটর এলান ক্র্যানস্টোন, নিউইয়র্কের কংগ্রেসম্যান স্টিফেন সোলার্জ ছাড়াও যুক্তরাস্ট্রের পররাস্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের কয়েকজন উর্ধতন কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করি। বেঠক হয় এটর্নি জেনারেল রামসে ক্লার্কের সঙ্গে– যিনি আমার বাবার বিচার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। হার্ভার্ডে আমার এক সময়ের সহপাঠি সিনেটর ম্যাক গভার্নের সঙ্গেও দেখা হল অনেকদিন পর। ছাত্র অবস্থায় তাকে অনেক সাহায্য করেছি এবং এখন আশা করছি যুক্তরাষ্ট্রে যে উদ্দেশে গিয়েছি সেসব কাজ করতে ম্যাক আমাকে সাহায্য করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রনেতারা পাকিস্তানের ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ১৯৮১ সালে সিনেটে পাকিস্তানের জন্য প্রায় সোয়া তিন বিলিয়ন ডলারের সাহায্য প্রস্তাব উত্থাপিত

www.pathagar.com

হয়। কিন্তু পাকিস্তানের পরমাণু কর্মসূচি এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ওই ইস্যু নিয়ে সিনেটে তুমুল বিতর্ক হয়। দীর্ঘদিন প্রস্তাবটি অমিমাংসিত অবস্থায় থাকে। তিনবছর পর ১৯৮৪ সালে, আমি যখন যুক্তরাষ্ট্রে, সিনেটর জন গ্লেন ও এলান ক্র্যানস্টোন একটি সংশোধনী প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবে বলা হয়, পরমাণু বোমা বা বোমা তৈরীর উপকরণ কিংবা বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রযুক্তি পাকিস্তানের রয়েছে কী-না সে ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট লিখিতভাবে নিশ্চিত করার পরই দেশটিতে সাহায্য পাঠানো হোক। ওই বছরই আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটিতে সংশোধনীটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আমি যুক্তরাষ্ট্রে দেশের পরমাণু ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে যাইনি, তাই বৈঠকে আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির প্রভাবশালী সদস্য চার্লস পার্সে যখন পরমাণু ইস্যুতে অর্থ সাহায্য কমিয়ে দেয়া সম্পর্কে আমার মতামত চাইলেন– আমি খুব ভেবে চিন্তে কথা বলি।

আমি বলেছিলাম, 'মিঃ সিনেটর সাহায্য কমিয়ে দিলে দুটি দেশের মধ্যে শুধুমাত্র ভূল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে। বরং গনতন্ত্র ও মানবাধিকার পুনরুদ্ধারের বিষয়টি যদি পূর্বশর্ত হিসেবে জুড়ে দেয়া যায়– তা দু'দেশের জন্যই মঙ্গলজনক।' সিনেটর পার্সি, যিনি আমার বাবার বেশ পরিচিত। আমার মতামতে মনে হলো তিনি খুশিই হলেন।

পার্সির সঙ্গে বৈঠকের পর পিটার গলব্রেথের সঙ্গে তার অফিসে দেখা করি। পিটার আমাকে বললেন,'তুমি খুব দ্রুত কথা বল, ধীরে কথা বলবে এবং একটি বিষয়ের ওপর জোর দেবে। তিনি ক্যাপিটল হিলে কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে আমার সংক্ষিপ্ত বৈঠকের ব্যবস্থা করে দিলেন। কার্লা হলের সঙ্গে বৈঠকের সময় আমি তার উপদেশ অনুসরন করে চলি। কার্লা হল এপ্রিলের শুরুতে ওয়াশিংটন পোষ্টে প্রকাশিত আমার একটি প্রোফাইলে লেখেন, 'বেনজির ভূট্টো এমনভাবে কথা বলেন যেন সময় নষ্ট না হয়। কিছুটা ব্রিটিশ উচ্চারণে হালকাভাবে প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দেন আর কথা বলার সময় কিছুক্ষণ পর পর চুলে আঙ্গুল চালান।'

কার্লা হল ঠিকই লিখেছিলেন। কারণ আমি সেই সময় অনেক বিচলিত ছিলাম। সময় নষ্ট করতে চাইছিলাম না। গ্রেফতার হওয়ার আগে আমার স্মরণশক্তি অনেক ভাল ছিল। কিন্তু এখন আমি অনেক কিছুই ভুলে যাই। প্রায়ই আমি আমার এড্রেস বুক খুলে জরুরী তারিখ ও পরিচিতদের নাম মিলিয়ে নেই। আমি বেশি মানুষের মাঝখানে অস্বস্তি বোধ করি। এরপরও আমি যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলি। একদিন যখন সিনেটর ক্রেনস্টোনের সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন হঠাৎ অনুভব করি আমার মধ্যে একটা অস্বস্তি কাজ করছে, আমার গাল লাল হয়ে যাচ্ছিল, আমার মাথা ঘামছিল। ক্রেনস্টোন উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চান, 'তুমি ঠিক আছো।' উত্তরে আমি বলি,'হ্যাঁ আমি ঠিক আছি।'

কারনেজি এনডোমেন্টে ভাষণ দেয়ার রাতেও আমি ওই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হই। সেখানে মার্কিন পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তা, কংগ্রেস সদস্য, সাবেক রাষ্ট্রদূত ও অনেক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমা গণমাধ্যমে সেই সময় জিয়াকে 'সহৃদয় শাসক' হিসেবে প্রচার করা হচ্ছিল এবং তাকে পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা রক্ষাকারী হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছিল। আমার ভাষণে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং দীর্ঘদিন সামরিক

www.pathagar.com

শাসনের কারনে পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে পড়তে পারে– এই বিষয়টি তুলে ধরি। এখানে উপস্থিত প্রভাবশালী সদস্যরা আমাদের রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং পাকিস্তানে গনতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে জিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারবে। জিয়া সরকারকে হঠাতে তাদের সহযোগিতা ও সমর্থন খুব প্রয়োজন ছিল। উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলি, 'জিয়ার অবৈধ শাসনব্যবস্থার প্রতি সমর্থন পাকিস্তাবাসীকে দ্বিধান্বিত ও হতাশ করেছে। আমরা আপনাদের উদ্বেগের কৌশলের প্রশংসা করি, কিন্তু আপনাদের এও বলি আপনারা পাকিস্তানের জনগণকে সমর্থন দিন। বক্তৃতার মাঝখানে শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করি। দেখলাম, পুরো হল রুম নিস্তব্ধ। আমি অনেক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমার বক্তব্য চালিয়ে গেলাম। বক্তব্যের মাধ্যমে মানবাধিকার পুনরুদ্ধারে মার্কিন সরকারী কর্মকর্তাদের প্রতি বিভিন্ন প্রশ্ন রাখলাম। প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর পর্বে আমার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানতে পারলাম। বক্তৃতা শেষে যখন আমি আমার আসনে ফিরে যাই তখন চারিদিকে করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

পাকিস্তানে মানবাধিকার ও গনতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আমি শুধু এই বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ ছিলাম না, বিভিন্ন গণমাধ্যমেরও সহায়তা নিই। ইয়াসমিন আর আমি যখন নিউইয়র্কে ফিরে যাই। সেখানে টাইম-লাইফ ভবনে টাইম ম্যাগাজিনের শীর্ষ সম্পাদকদের সঙ্গে বৈঠক করার অনুমতি পাই। এই ম্যাগাজিনের এক সম্পাদক ওয়াল্টার ইসাকসনই এই বৈঠকের ব্যবস্থা করে দেন। তার সঙ্গে আমার আগের থেকেই পরিচয় ছিল' আমরা এক সাথে হার্ভার্ডে পড়েছি। টাইম লাইফ ভবনের লিফটে ৪৭ তলায় উঠে একটু এগুতেই দেখি সম্পাদকরা আমার অপেক্ষায় দাড়িয়ে আছেন। তখন আমি কি করবো বুঝতে পারছিলামনা। প্রথমদিকে ভাবছিলাম, আমরা মনে হয় ভুল সভা কক্ষের দিকে যাচ্ছি।

সম্পাদকদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'লবিতে ওয়াল্টারের সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি? তিনি তো নিচ তলায় আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।'

'দেখা হয়নি তো!' –উত্তরে আমি বললাম।

তিনি বললেন, কিন্তু আপনি নিরাপত্তা কর্মীদের এড়িয়ে এখানে আসলেন কিভাবে?

আমি হেসে বললাম জিয়ার পাকিস্তান আপনাকেও কিভাবে নিরাপত্তাকর্মীদের চোখ ফাঁকি দিতে হয় তা শিখতে বাধ্য করবে।

মধ্যাহ্নভোজের সময় সম্পাদকরা আমাকে অনেক প্রশ্ন করেন। আমি সুস্বাদু ফলের সালাদ ও পনিরের তৈরী খাবার মজা করে খাওয়ার সময় পাচ্ছিলাম না। খাবারগুলোর মধ্যে একটি পছন্দের খাবার ছিল, যা হার্ভার্ডে থাকতে অনেক খেয়েছি। আমি তাদের বললাম, 'পাকিস্তানে সাহায্য পাঠানোর মাধ্যমে আসলে যুক্তরাষ্ট্র জেনারেল জিয়াকেই সহায়তা করছে, এ বিষয়ে অনেক পাকিস্তানী আমার সঙ্গে একমত। পাকিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘন পরিস্থিতি নিয়ে গণমাধ্যমে বাপক লেখালেখির মাধ্যমে এ বিষয়টি তুলে ধরতে পারেন আপনারাই। রাজনৈতিক বন্দিদের জন্য এই প্রচারনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

এপ্রিলের ৩-তারিখে সিনেটের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটি পাকিস্তানে মার্কিন সাহায্য পাঠানোর আগে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের শর্ত আরোপের ব্যাপারে তাদের পূর্বের অবস্থান থেকে সরে আসে। আগের সংশোধনীতে কিছু পরিবর্তন এনে নতুন একটি সংশোধনী পাস করে। যার মাধ্যমে পাকিস্তানে নিয়মিত সাহায্য পাঠানোর প্রস্তাবটি

www.pathagar.com

অনুমোদন দেয়া হয়। পূর্বশর্ত হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে পাকিস্তানে পরমাণু বোমা নেই- এমন একটি সনদ দিলেই চলবে; সত্যাসত্য নির্ধারনের বাধ্যবাধকতা শিথিল করে দেয়া হয়। সংশোধনীতে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়, সাহায্য অব্যাহত থাকলে হয়তো পারমাণবিক বোমা তৈরীর ঝুঁকি নেবেনা পাকিস্তান। সংশোধনী প্রস্তাবে পরিবর্তনের নেপথ্যে রিগান প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন চাপ ছিল বলে আমার ধারণা। তবে সিনেটর পার্সে এ ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত গ্রহনে আমি সহায়তা করেছি-স্বীকার করে সবার সামনে আমার প্রশংসা করেছিলেন।

আমি ও ইয়াসমিন যতটা আশা করেছিলাম যুক্তরাষ্ট্র সফর তার চেয়েও বেশী সফল হয়েছিল। দীর্ঘ দুই সপ্তাহ শেষে আমরা লন্ডনে ফিরে আসি। লন্ডনে ফিরে বারবিকানে সেন্ট পল'স ক্যাথিড্রেলের কাছে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিই। সেখানে আমি নিরাপত্তাবোধ করি। এই ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুব কড়াকড়ি ছিল। এখানে পাকিস্তানী গোয়েন্দাদের থেকে নিরাপদে ছিলাম। ড. নিয়াজি ও ইয়াসমিনও এখানে নির্বাসিত জীবন-যাপন করছিলেন। নির্বাসিত সময়ে আমরা সারাদিন একজন আরেকজনের কাছে যেতাম।

খুব তাড়াতাড়ি আমার ফ্ল্যাটটি পিপিপি'র অস্থায়ী কার্যালয়ে পরিণত হয়। এখান থেকেই সারা বিশ্বে পিপিপি'র কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ক্রমেই আমার ফ্ল্যাট পিপিপি'র যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, কানাডা, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, অষ্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব, অষ্ট্রেলিয়া, বাহরাইন ও আবুধাবি শাখার ফাইলে ভরে ওঠে। স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে বেশ কয়েকজন প্রবাসী পাকিস্তানী আমার সঙ্গে কাজ করা শুরু করে। এদের মধ্যে সুম্বলিনা চিঠিপত্র টাইপ করতো। নির্বাসিত পিপিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য ড: আশরাফ আব্বাসীর ছেলে আইনের ছাত্র সফদার আব্বাসী পাকিস্তান থেকে আসা বিভিন্ন চিঠির উত্তর লিখতো। এছাড়াও সাংবাদিক বশির রিয়াজ পিপিপি'র মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করতো।

এছাড়া আরও দু'জন নির্বাসিত কর্মী ড. নিয়াজি এবং সফদার হামদানী পাকিস্তানের সাবেক তথ্যমন্ত্রী নাসিম আহমেদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ এমপিদের কাছে আমাদের তথ্যাদি পৌছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করতো। এছাড়া ইয়াসমিন তো ছিলই। আমরা সবাই মিলে পাকিস্তানের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন ও চিঠি তৈরী করতাম। এভাবেই আমার অতিরিক্ত বেডরুমটি পিপিপি'র কার্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। পাকিস্তানে বন্দি রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ছবি ও তাদের মামলার নথিপত্র তৎকালীন জাতিসংঘ মহাসচিব, মার্কিন মানবাধিকার বিষয়ক মন্ত্রী, বিভিন্ন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী, আইনজীবি সমিতি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সংস্থার কাছে পৌছে দিতাম। আমরা বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ এমপি, এ্যামিনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি এবং ব্রিটেনে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক করি। আমরা নাসের বেলুচসহ অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্ত করতে প্রানান্ত চেষ্টা চালাই। কিন্তু আমরা তেমন সফল হইনি।

পাকিস্তানে বার কাউন্সিলে বিক্ষোভের অভিযোগে মিথ্যে মামলায় একটি বিশেষ সামরিক আদালতে তিন যুবককে ফাঁসি দেয়ার খবর পেলাম। এদের বিরুদ্ধে একজন পুলিশ হত্যার অভিযোগ আনা হয়। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার রাজনৈতিক মহল ও গণমাধ্যম

www.pathagar.com

তিন বছর ধরে বন্দি থাকা এই যুবকদের ব্যাপারে যদি আগ্রহ দেখাতো তাহলে সম্ভবত তারা প্রাণে বেঁচে যেত এবং তাদের সঙ্গে অন্য বন্দিরাও মুক্তি পেত। এসব বন্দিদের মৃত্যুদণ্ড থেকে রক্ষা করতে আমি বিভিন্ন দেশের সরকারী কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমগুলোর কাছে ই-মেইল পাঠাতে শুরু করি। মেইলে লিখি, 'পাকিস্তানের রাজনৈতিক বন্দিদের ফাঁসির কাষ্ট থেকে বাঁচাতে পাশ্চাত্য দেশগুলো তাদের প্রভাব খাটাতে পারে। দয়া করে এ ব্যাপারে খুব দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন"।

লন্ডন পার্লামেন্টের লেবার পার্টির সদস্য টনি বেন পাকিস্তানী দূতাবাসের কাছে এই তিন যুবকের ফাঁসির প্রতিবাদ জানিয়ে একটি চিঠি পাঠান। চিঠির একটি কপি তিনি আমাকেও পাঠিয়েছিলেন। পাকিস্তানের তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী ও সরকারী মুখপাত্র কতুবুদ্দিন আজিজ স্বাভাবিকভাবেই টনি বেনের চিঠির উত্তর দেন। তিনি লিখেন, 'পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলে ৪০ হাজারেরও বেশী বন্দি রয়েছে এবং তারা মানবেতর জীবন-যাপন করছে বলে মিস ভূট্টোর অভিযোগের কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় আমাদের কারাগারের পরিস্থিতি খুব একটা খারাপ না, আর এসব বন্দিদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো মামলায় অভিযুক্ত কিংবা সন্দেহভাজন অপরাধী। এদের মধ্যে যারা হত্যা এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত তাদের সঙ্গেই কিছুটা কঠোর আচরন করে সরকার। প্রত্যেকটি মামলার ক্ষেত্রেই আইনের এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে।' তবে পাকিস্তানে আইনের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আইনজীবিদের দেশজুড়ে চলমান আন্দোলন প্রসঙ্গে কতুবুদ্দিন আজিজ কোন মন্তব্য করেননি।

জিয়ার সামরিক আদালতগুলোর একটিতে পর পর বেশ কয়েকটি মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়া হলে– আমাদের কার্যক্রমের গতি আরও বাড়িয়ে দেই। পুরো ফ্ল্যাট জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের কর্মযজ্ঞ। খাম, স্ট্যাম্প আর চিঠিতে ভরে ওঠে সব ঘর। খামের ওপর ঠিকানা লেখা, মুখ আটকে স্ট্যাম্প লাগিয়ে পোস্ট করাই সে সময় আমাদের প্রধান কাজ হয়ে উঠেছিলো। পিপিপি'র নিয়মিত স্বেচ্ছাসেবী ছাড়াও এ কাজে আমাদের সঙ্গে ছিলেন পাকিস্তান আর্মির সাবেক এক মেজর এবং পুলিশের একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট। এর দু'জনেই এখন দেশের বাইরে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন। এতো আন্তরিকভাবে সবাই কাজ করতেন যে খাবারের কথাও মনে পড়তো না। শুধুমাত্র চা-কফি পান করেই সারাদিন কাটিয়ে দিতাম। পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক নিষিদ্ধ করে জিয়া তার কুকীর্তি বিশ্ববাসীর কাছে আড়াল করতে চাইছিলেন। তার এ মুখোশ উন্মোচন করে পাকিস্তানের রাজনৈতিক বন্দিদের পক্ষে বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করতে আমরা প্রাণান্ত চেষ্টা করছিলাম।

প্রত্যেক বন্দির গ্রেফতারের প্রেক্ষাপট, বিচারের সর্বশেষ অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য ও দলিল সংরক্ষন করা জরুরী ছিল। কিন্তু কঠোর সেন্সরশিপের কারণে পাকিস্তান থেকে তথ্য বের করে আনা প্রায়ই কঠিন হয়ে পড়তো। একমাত্র কারাবন্দিদের দেয়া তথ্যই নির্ভরযোগ্য ছিল। দীর্ঘদিন চেষ্টায় আমরা কয়েকজন বিশ্বস্ত মানুষের সহযোগিতায় পাকিস্তানে একটি গোপন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হই। যারা কারাগারের ভেতর থেকে নিয়মিত বন্দিদের দেয়া তথ্য সংগ্রহ করে লন্ডনে পাঠাতো। আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল কারারক্ষী, বিমান সংস্থার কর্মী ও নির্বাসিত পিপিপি নেতাকর্মীদের স্বজনরাও সহায়তা করে। চিঠি চালাচালির ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ঠিকানা

www.pathagar.com

ব্যবহার করতাম। জিয়া সরকারের চোখ এড়াতে অধিকাংশ সময় দুবাই কিংবা সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে চিঠি পোষ্ট করা হত। কয়েক দিনের মধ্যেই পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গা থেকে নির্যাতন-নিপিড়ণের তথ্য আসা শুরু হল।

হাতে লেখা প্রথম চিঠিটি পেলাম করাচী সেন্ট্রাল জেল থেকে। নাসের বালুচের মামলার বিবাদীদের একজন, লারকানার ২৩ বছরের যুবক সাইফুল্লাহ খালিদ। সে জানায়, রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে তাকে ১৯৮১ সালে গ্রেফতার করা হয়। অপহরনের ঘটনায় 'পিপলস পার্টি প্রধান' জড়িত-এ স্বীকারোক্তি আদায়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে তার ওপর চালানো হয় নারকীয় নির্যাতন। অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিদের মতো তাকেও এক জেল থেকে আরেক জেলে নিয়ে যাওয়া হয়; মাসের পর মাস যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কাটাতে হয়। খালিদের ভাষায় 'আমাকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় এরাজওয়ালী কোর্টে, সেখানে দুই দিন রাখার পর আমাকে তিনটি অজ্ঞাত স্থানে এক সপ্তাহ রাখা হয়। এরপর বালাইশর দূর্গে চারদিন ওয়ারশক ক্যান্টনমেন্টে দশদিন, পেশোয়ার সেন্ট্রাল জেলে একদিন, করাচীতে এফআইএ (ফেডারেল ইনভেষ্টিগেশন এজেন্সি) সেন্টারে ৬ দিন, সিআইএ (সেন্ট্রাল ইন্টিলিজেন্স এজেন্সি) সেন্টারে একমাস এবং বলদিয়া টর্চার সেলে এক মাস রেখে সর্বশেষ করাচী জেলে নিয়ে আসা হয়।'

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র খালিদ তিন বছর ধরে কারাগারে আটক এবং তার আশঙ্কা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতে পারে। চিঠিতে সে আরও জানায়, 'করাচী জেলের পানিশমেন্ট ওয়ার্ডে টানা দশ দিন রেখে, রুটিন করে প্রতিদিন তিনবার নির্যাতন করা হতো। জিজ্ঞাসাবাদের সময় মাথার সামনে ঝুলিয়ে দেয়া হতো হাই ভোল্টেজের কয়েকটি বাল্ব। উজ্জ্বল আলোর বিকিরনে চোখে ও মাথায় প্রচণ্ড ব্যাথা অনুভব করতাম এবং এক সময়ে আমার দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। লোহার তৈরী ডাণ্ডা-বেড়ী পড়ানোর ফলে অণ্ডকোষে প্রচণ্ড ব্যাথা পেয়েছিলাম। ওই দশদিনের অত্যাচারে আমি এতটাই অসুস্থ হই যে, কারা চিকিৎসক আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ওই ঘটনায় প্রায় তিন মাস পর হার্নিয়া অপারেশনের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়।'

শত শত রাজনৈতিক বন্দির মতোই সাইফুল্লাহ খালিদকে জান্তা সরকারের নির্মম নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। চিঠির শেষে করুন আর্তি প্রকাশ করে খালিদ সব রাজনৈতিক বন্দিদের বিচার জনসমক্ষে করার এবং কারাগারে নির্যাতনের ব্যাপারে এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানায়।

ব্রিটেনের পাকিস্তানী অভিবাসীদের মাঝে প্রচারনা চালানো ও সমর্থক বাড়ানোর লক্ষ্যে আমি নটিংহাম, গ্লাসগো, ম্যানচেষ্টার ও বেডফোর্ড সফরে যাই। ব্রিটেনের বাইরে জার্মানী, ডেনমার্ক ও সুইজারল্যান্ডেও যাই। পকিস্তানের রাজনৈতিক বন্দিদের তালিকা সব সময় আমার সঙ্গে থাকতো। তালিকায় আগস্টে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত তিন যুবকের নামের আগে গভীর শ্রদ্ধায় আমি 'শহীদ' শব্দটি যুক্ত করেছিলাম। সে সময় আমি ডেনমার্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী অঙ্কুর জরগেনসেন, ফ্রান্সের দ্য গ্যল পন্থিদের, জার্মানীর গ্রিন পার্টির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করি। ইংল্যাণ্ডে ফেরার সময় আমি প্রতিটি মুহূর্ত উৎকণ্ঠায় থাকতাম। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ যদি আমাকে বাঁধা দেয় এই ভয় আমাকে পেয়ে বসেছিল। সে সময় ব্রিটিশ ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ বিমানবন্দরেই পাকিস্তানীদের ভিসা দিত এবং তাতে মাত্র একবার প্রবেশের

www.pathagar.com

অনুমতি দেয়া হত। আমি প্রথমবার যখন ইংল্যাণ্ডে আসি, আমি কোথায় থাকবো, কি করবো-এ সব নিয়ে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ আমাকে দীর্ঘ পয়তাল্লিশ মিনিট আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। নিজেকে পর্যটক দাবী করে আমি তাদের আশ্বস্ত করি। পাসপোর্ট ভিসার সিল লাগার পর আমি যেন হাপ ছেড়ে বাঁচলাম। ঘন ঘন ভ্রমণের কারণে আমার পাসপোর্টের পাতা ফুরিয়ে যায়। আমি জানতাম জিয়া আমার নামে আর নতুন পাসপোর্টের অনুমতি দেবে না। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমি মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করতাম। তারা যখন ব্ল্যাক-বুকে আমার নাম খোঁজা শুরু করতো তখন আমার বুক ধড়ফড় করতো। এত প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক বন্দিদের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা কাজে আমরা অনেক সফল হয়েছিলাম।

১ নভেম্বর ব্রিটেনের হাউজ অফ কমন্সের সদস্য ম্যাক্স মেডেন আমাকে একটি চিঠি পাঠান। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, 'পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলোকে বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ পাকিস্তান পিপলস পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করতে জান্তা সরকার ব্যাপক অপপ্রচার চালাচ্ছে। এটা বন্ধে বিভিন্ন পার্লামেন্টারি সভায় ও অন্যান্য মাধ্যমে আমি ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।' যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার বিষয়ক সহকারীমন্ত্রী ইলিয়ট আব্রাহামও আমার চিঠির জবাব দিয়েছিলেন। নাসের বালুচ ও সাইফুল্লাহ খালিদের ওপর নির্যাতনের কথা আমি জানিয়েছিলাম। তিনি লিখেছেন, 'পাকিস্তানের সামরিক আদালতে সিভিলিয়ান মামলাগুলোর বিচারে নিরপেক্ষহীনতা এবং স্বীকারোক্তি আদায়ে নির্যাতনের ঘটনায় আমি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি।' পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন কূটনীতিকরা বিষয়টির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন বলে তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেন।

আমি প্রতিদিন সকাল ৭ টায় বিছানা ছাড়তাম। ফ্ল্যাট পরিস্কার করে, ধোয়ামোছার কাজ শেষে রান্নার আয়োজন করতাম। বশির রিয়াজ মুসলিম রীতিতে জবাই করা গরুর 'হালাল' মাংস ও মুরগী কিনে নিয়ে আসতেন। স্টোভে রান্না চড়িয়েই সংগঠনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তাম। আমি খেয়াল করি, প্রতিদিন এতো চিঠি পাঠানো আমাদের পক্ষে খুব ব্যয় বহুল হয়ে পড়েছে। আমার টাকার দুই-তৃতীয়াংশই চলে যেতো ফ্ল্যাটের ভাড়ায়। বাকিটা টেলিফোন বিল ও চিঠি বিতরণের কাজে খরচ করতাম। মা আমাকে ফ্ল্যাট সাজাতে কিছু টাকা দিয়েছিলেন। ওই টাকা দিয়ে একটি পুরোনো গালিচা, কয়েকটি ঝাড়বাতি ও কিছু তৈজসপত্র কিনেছিলাম। পরে মনে হলো, এগুলো না কিনলেও হতো। টাকাগুলো অফিস পরিচালনায় ব্যবহার করা যেত।

এত অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেও আমরা 'আমল' (এ্যাকশন) নামে একটি উর্দু সাময়িকীর প্রকাশনা শুরু করেছিলাম। ইংরেজী ভাষায় এ মাসিকটি আমরা নিয়মিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের অফিস, বিদেশী দূতাবাস ও ব্রিটেন প্রবাসী পাকিস্তানীদের মধ্যে বিতরণ করতাম। পাকিস্তানের সর্বশেষ ঘটনা প্রবাহ পাঠকের সামনে তুলে ধরাই ছিল সাময়িকীর পলিসি। বশির রিয়াজ সম্পাদনা ও বিজ্ঞাপনের কাজ করতেন। সার্কুলেশনের কাজ করতো নাহিদ। গোপনে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মাঝে বিতরণ করা হতো।

www.pathagar.com

এমনকি 'আমল' পাকিস্তানের জেলগুলোতেও পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানে নিজেদের কথা দেখে বন্দিদের মনোবল বেড়ে গিয়েছিল। তবে বন্দিদের মাঝে 'আমল' জনপ্রিয়তা পেলেও, সরকারী লোকজন এটিকে ভালো চোখে দেখতো না।

আমাদের ম্যাগাজিনের ক্যালীগ্রাফার হিসেবে যে ছেলেটি কাজ করতো, হঠাৎ একদিন বশিরকে ফোনে জানাল, সে আর আমল'র সঙ্গে কাজ করতে পারবে না। বশির কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে স্বীকার করে, আমাদের সঙ্গে কাজ না করার বিনিময়ে পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে তাকে মোটা অঙ্কের অর্থের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এ খবরে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ি। ক্যালিগ্রাফার ছাড়া 'আমল' বের করা সম্ভব নয়। কারণ সেই পুরোনো পদ্ধতিতেই তখনও উর্দু ছাপার কাজ হতো। যেখানে মোমের প্রলেপ দেয়া কাগজে ক্যালিগ্রাফাররা হাতে লিখে টেক্সট প্রস্তুত করতো। ক্যালিগ্রাফার চলে গেলে পত্রিকাটি বের করবো কিভাবে। ছাপাখানার মালিককে বিষয়টি জানালে, তিনিও হাইকমিশনারের চাপের কথা স্বীকার করলেন। তবে তিনি ইতোমধ্যেই পার্টির শুভানুধ্যায়ীতে পরিণত হওয়ায় সে সব গায়ে না মেখে আমাদের পাশে দাঁড়ালেন। এমনকি প্রয়োজনে রাতে ছাপাখানা খোলা রেখে 'আমল'র কাজ করবেন বলে জানালেন। এরই মধ্যে বশির লন্ডনে পাকিস্তানী পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে এমন একজন ক্যালীগ্রাফারকে 'ম্যানেজ' করে ফেলল। 'আমল' প্রকাশনা অব্যাহত রইল।

নাসের বালুচ ও তার সঙ্গীদের বিচারের নামে প্রহসন নিয়ে 'আমল'-এ একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর পরই পাকিস্তান থেকে উদ্বেগজনক খবর আসতে লাগলো। সাধারণ জনগনকে চাপের মধ্যে রাখতে, সামরিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর হতে যাচ্ছে জান্তা সরকার। আরেকটি উড়ো খবর পেলাম, নাসের বালুচদের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। ১৯৮৪ সালের ৫ নভেম্বর আমাদের আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করে করাচীর সামরিক আদালত নাসের বেলুচ মামলার রায় ঘোষনা করে। দু:খজনকভাবে ওই রায়ে ৩ সহযোগীসহ নাসের বালুচকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারার নির্দেশ দেয়া হয়। ওই একপেশে রায়ে আমাদের ভেতর যেন ক্ষোভের আগুন জলে ওঠে। বারবিকানে ব্যস্ততা আগের চেয়ে আরও বেড়ে যায়। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের জীবন রক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোতে একটার পর একটা আবেদন পাঠাতে থাকি। এরই মধ্যে ওই মৃত্যুদণ্ডাদেশ নিয়ে জিয়ার নিষ্ঠুরতার কিছু গোপন তথ্য প্রমনাদি আমাদের হাতে এসে পৌঁছে। নির্মমতার এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের ভেতরটা নাড়িয়ে দেয়।

পিপলস পার্টির একজন শুভানুধ্যায়ী পাকিস্তান থেকে জানায়, নাসের ও তার সঙ্গীদের মৃত্যুদণ্ডাদেশের নেপথ্যে কলকাঠি নেড়েছিলেন জিয়া। তার পাঠানো কাগজপত্রে দেখা যায়, সামরিক আদালত প্রকৃতপক্ষে শুধু নাসের বালুচের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছিল এবং সিন্ধুপ্রদেশের সামরিক প্রশাসকেরও এ রায়ে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করে অজ্ঞাত কারনে ওই প্রশাসক রায়টি পূর্ণবিচেনায় জন্য সামরিক আদালতকে নির্দেশনা দেয়। আর এর পেছনে ছিল জেনারেল জিয়া। যার প্রমান পাওয়া যায় ১৯৮৪ সালের ২৬ অক্টোবর জিয়ার সই করা একটি আদেশের কপিতে। জিয়ায় ওই আদেশের কপিও আমরা পেয়েছিলাম। প্রধান সামরিক প্রশাসকের নিজস্ব প্যাডে নাসের বালুচ ও তার অপর ৩

www.pathagar.com

সহযোগীর মৃত্যুদণ্ড চূড়ান্ত করেছিলো জিয়া। প্রকাশ্যে রায় ঘোষনার দশ দিন আগেই জিয়ার আদালতে ওই রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কি নির্মম পরিহাস। সামরিক প্রশাসক হিসেবে যে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড চূড়ান্ত করেছিলেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে ওই ব্যক্তির কাছেই অভিযুক্তদের প্রান ভিক্ষা চাইতে হবে। জিয়ার এ বর্বরতার নমুনা দেখে আমাদের অনেকেই চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। কিন্তু আমি খুবই ক্রোধান্বিত হই। পাকিস্তানের সামরিক আদালতের রায়গুলো আগেই ঠিক করে দিতেন জিয়া স্বয়ং– দীর্ঘদিনের এ অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেল। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই তথ্য প্রমানাদি বুকলেট আকারে ছাপানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। জিয়ার সামরিক আদালতগুলো যে তার নির্দেশের 'রাবার স্ট্যাম্প' হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এটি প্রমান করার অব্যর্থ হাতিয়ার হতে পারে ওই বুকলেট। বুকলেট ছাপা শেষ হলে সেটা প্রকাশ উপলক্ষে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি সংবাদ সম্মেলন করি। লর্ড অ্যাভেবারী আমাদের এ কাজে বেশ সহযোগীতা করেছিলেন। ক্রমেই আমাদের প্রচারনা ব্রিটেনজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

নাসের বালুচের অন্যায় রায়ে ব্রিটেনের মানবাধিকারকর্মী থেকে শুরু করে লেবার নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রভাবশালী ট্রেড ইউনিয়ন ম্যাগাজিন 'টিএন্ডজি রেকর্ড' এর সম্পাদক বরাবর একটি চিঠিতে নটিংহাম ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক লরেন্স প্লাট লিখেছিলেন, 'আমাদের দেশে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে আমরা যতটা সচেতন, অন্য দেশের ব্যাপারেও আমাদের ততটা সচেতনতা থাকা জরুরী। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শ্রমিক নেতা নাসের বালুচ ও তার ৩ সহযোগীর জীবন রক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়ার সময় এখনও রয়েছে। এ ব্যাপারে অবিলম্বে পাকিস্তান সরকার ও তাদের হাইকমিশনে কড়া প্রতিবাদ জানানো উচিত।"

প্রভাবশালী ব্রিটিশ আইনজীবিদের কয়েকজন পত্রপত্রিকায় যৌথ বিবৃতি পাঠান। সেখানে বলা হয়েছিল, 'পাকিস্তানে সামরিক আইন নিয়ন্ত্রিত একটি বিশেষ আদালতের বিচারে ওই ৪ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। যে আদালতের বিচারক ছিলেন সেনা কর্মকর্তারা; যাদের এ ব্যাপারে কোন প্রশিক্ষণ নেই এবং পুরো বিচার কার্যক্রম চলে গোপনে। এমনকি অভিযুক্তরা যথাযথ আইনী সহায়তা নেয়ারও সুযোগ পাননি।" বিবৃতিতে তারা পাকিস্তান সরকারকে বিচারের নামে এ ধরনের প্রহসন বন্ধ এবং অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বাতিল করার আহবান জানান। ব্রিটিশ সরকারকেও এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ জানান আইনজীবিরা।

রাজনৈতিক বন্দিদের জীবন রক্ষায় ভাবনাটি আমাদেরকে সবসময় আচ্ছন্ন করে রাখতো। কিন্তু স্বদেশে বিনা বিচারে মৃত্যুর প্রতিবাদে শুরু হওয়া 'প্রচারনা যুদ্ধ'র মধ্যেই- ব্রিটেনে নির্বাসিত পিপিপি'র কয়েকজন নেতা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার দিকেই বেশী ঝুঁকে পড়েছিলেন। তারা প্রায়ই আমার সঙ্গে পৃথক বৈঠক করতে চাইতেন। এসব নেতাদের বেশীরভাগই আমার বাবার আমলে মন্ত্রী ছিলেন। বারবিকানে জায়গা ও সময়ের অভাবে আমি প্রতিবারই পাঁচ বা ছয় জনের সাথে এক সাথেই বৈঠক সাড়তাম। বিরক্তিকর ওই বৈঠকগুলাতে আমি সবসময়ই অস্থির থাকতাম। সারাক্ষনই সামনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো নিয়ে ভাবতাম।

বিভিন্ন শ্রেনী ও পেশার মানুষদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল পাকিস্তান পিপলস পার্টি।

www.pathagar.com

সমাজতন্ত্রী, সামন্তবাদী জমির মালিক, ব্যবসায়ী ধর্মীয় মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল এ সংগঠনে। বাবা বেঁচে থাকতে তার জনপ্রিয়তা ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব্যের কারণে পার্টিতে উপদলীয় কোন্দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু লন্ডনে ও দেশের ভেতরে একশ্রেনীর নেতাকর্মী তাদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতায় যেন উঠে পড়ে লেগেছিলো- সর্বোপরী নেতৃত্ব নিয়ে অঘোষিত লড়াই তো আছেই। অনেক নেতাই আমাকে বলতো, 'কোন পক্ষে থাকবে এ সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে।' পরামর্শদাতা এসব নেতারা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত ছিলেন। দলে আরও ক্ষমতা কুক্ষিগত করা, এমনকি প্রধান নেতৃত্বে সমাসীন হওয়া আকাঙ্খাও এদের মধ্যে কাজ করতো।

'আমি কারও পক্ষে নই' তাদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলাম। দলাদলি বাদ দিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকলেই পিপিপি আরও বেশী কাজ করতে পারবে। আমার রাজনৈতিক অবস্থানের দূর্বলতা সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম। দলের বয়স্ক নেতাদের সন্মান করতাম। তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতাম। যদিও আমি যখন পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হয়ে লন্ডনে আসি, ওই সব নেতারা আমাকে সহজভাবে গ্রহন করেননি। আমি তখন নিতান্তই একজন তরুনী; তাদের মেয়ের বয়সী। সামরিক অভ্যূত্থানের সময় থেকেই তারা লন্ডনে পিপিপিকে সংগঠিত করে আসছিলেন। আমি সবেমাত্র পাকিস্তান থেকে এসেছি। তারা রাজনৈতিক অবস্থান তৈরী করতে অনেক সময় পেয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস ছিল, পুরোনো ঝগড়া-বিবাদ চুকিয়ে ফেলে, নেতৃবৃন্দের মাঝে ক্ষমতার ভারসাম্য আনাই পার্টির জন্য সর্বাপেক্ষ মঙ্গলজনক হবে।

যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে লন্ডনে ফেরার পর দলের সমাজতন্ত্রী অংশটি এ সফর নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলে আমাকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করছিল। তাদের বক্তব্য আমার আমেরিকায় যাওয়া ঠিক হয়নি। কারন তারা জিয়ার মিত্র। আমাদের উচিৎ হবে রাশিয়ার (তৎকালীন সোভিযেত ইউনিয়ন) সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করা।

আমি তাদের পাল্টা জবাব দেই। 'রুশ-মার্কিনীরা কারও মিত্র হতে পারেনা। মার্কিনীরা কৌশলগত কারনে জিয়াকে সহায়তা করছে। বর্তমান বাস্তবতায় হয়তো সোভিযেত ইউনিয়ন আমাদের সহায়তা দিতে চাইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি তারা তাদের কৌশলগত অবস্থান পরিবর্তন করে; তখন আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে। দুই সুপারপাওয়ারের স্নায়ুযুদ্ধে আমাদের জড়ানো উচিত হবেনা। আমাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় কাজ করতে হবে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক লড়াইয়ে অংশগ্রহন করার সামর্থ্যও নেই আমাদের।'

আমার নিজ প্রদেশের নেতারাও পিছিয়ে ছিলেননা। তারা সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি একজন সিন্ধী। তোমার প্রদেশের জন্য বিশেষ কিছু করা উচিত। এটা না হলে তারা তোমাকে কোনদিন ক্ষমা করবে না।" আমি প্রতিবাদ করে বলেছিলাম, 'সামরিক শাসনের মধ্যে আমাদের এমন কিছু করা উচিত হবেনা, যা বিচ্ছিন্নবাদী ধ্যান ধারনাকে উস্কে দেয়।' তাছাড়া অধিকাংশ পাকিস্তানীই গনতন্ত্রে বিশ্বাস করে। কোন একটি প্রদেশকে বেশী গুরুত্ব দিলে– তা অনৈক্যের সৃষ্টি করবে। জান্তা সরকারের হাতে হাতিয়ার তুলে দেয়ার মত আত্মঘাতী ব্যাপার হবে সেটা। আমাদের সম্মিলিত শক্তি পাকিস্তানের শত্রুদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে হবে।"

পিপিপি'র একশ্রেনীর সুযোগসন্ধানী উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষায়

www.pathagar.com

জিয়ার সঙ্গে আপোষ রক্ষার চেষ্টা করছিলেন। আমাদের সমর্থকদের প্রান বাঁচাতে স্বেচ্ছাসেবীরা যেখানে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে– সেখানে আত্মকেন্দ্রিক নেতারা দেশবাসীর জন্য নয়, নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থে আমাকে ব্যবহার করতে চাইতেন। এসব দেখে আমি আরও হতাশ হয়ে পড়ি। পরের ঘটনা আরও ভয়াবহ। একদিন বারবিকানে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন লণ্ডনে নির্বাসিত পিপিপি'র একজন প্রবীণ নেতা। সোফায় হেলান দিয়ে বসে বেশ আয়েসী ভঙ্গীতে পাঞ্জাব পিপিপি'র সভাপতি পদে তার নাম প্রস্তাব করার দাবি জানালেন। আমি বেশ অবাক হলাম। তিনি পাঞ্জাবে খুব একটা জনপ্রিয় নন। তাছাড়া তিনি দীর্ঘদিন ধরে লণ্ডনে নিরাপদ জীবন-যাপন করছিলেন। দেশের সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগও নেই। আমি একটুও দ্বিধা না করে বলেছিলাম, "এ মুহূর্তে আপনাকে ওই পদে নিয়োগ দেয়া সম্ভব নয়। এটা করলে পার্টির ভেতর ক্ষোভের সৃষ্টি হতে পারে। ঐক্যমত্য ও মেধার ভিত্তিতে পার্টি নেতা নির্বাচনের গনতান্ত্রিক নীতিমালা লঙ্ঘন করা যাবেনা।' তিনি উপদেশের সুরে বলেছিলেন, 'তোমার জন্য খুব বেশী পথ খোলা নেই। সমাজতন্ত্রীরা তোমার ওপর ক্ষিপ্ত, আঞ্চলিক নেতারাও তাদের নিজেদের সংগঠন নিয়ে ব্যস্ত। সেক্ষেত্রে আমাকেই বেছে নেয়া উচিৎ হবে।' 'কিন্তু এটা পিপিপির গঠনতন্ত্রবিরোধী"-আমি জবাব দিয়েছিলাম। তিনি বেশ হালকা স্বরে বললেন, গঠনতন্ত্র অবশ্যই মেনে চলা উচিত। কিন্তু রাজনীতিতে মানুষ ক্ষমতা চায়।' এবার তার কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন গুমকি,'তুমি যদি আমাকে সভাপতি না করো, বাধ্য হয়ে আমাকে বিকল্প উপায় খুঁজতে হবে। এমনকি আমি নতুন দল গঠনেও পিছপা হবোনা। আর সেটা হলে আমিই হব তোমার সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ।'

এমনিতেই সুবিধাবাদীদের ওপর আমি কিছুটা ক্ষুব্ধ ছিলাম। তাদের গুরুত্বহীন কথা-বার্তায় আমার মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছিল। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এটা নতুন কোন ঘটনা নয়। নিজের আখের গোছাতে হবে। নিজের প্রভাব চারদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে ব্ল্যাকমেইলিং কিংবা গুমকি দিয়ে হলেও। আমি লম্বা শ্বাস টেনে সামনের দিকে ঝুঁকে তাকে বলেছিলাম, 'চাচা, আপনি ভাল করেই জানেন পিপিপি ত্যাগ করলে পার্লামেন্টে একটি আসন পাওয়াও আপনার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে।' তিনি আশ্চর্য হয়ে যাওয়ার ভঙ্গী করে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'সত্যিই?' এবং জবাব শোনার অপেক্ষা না করে ধীর পায়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত পার্টি থেকেও? পার্টি থেকে কেউ চলে গেলে আমার খুব খারাপ লাগতো। কিন্তু আমি অনুধাবন করেছিলাম, রাজনীতিতে কোন কিছু স্থায়ী নয়। কেউ আসবে কেউ যাবে-এটাই স্বাভাবিক। প্রজন্মের আকাঙ্খাকে লালন করে তা বাস্তবায়ন যে কোন রাজনৈতিক দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। লন্ডনে আমাদের প্রধান কাজ ছিল জনগণের নীতিবোধক জাগানো ও দেশের অভ্যন্তরে দলকে শক্তিশালী করা। আমরা সেটাই করছিলাম। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরের শুরুতে আমরা বুঝে গিয়েছিলাম, পিপিপি'র সমস্ত শক্তি একত্রিত করার সময় আসছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত চাপের মুখে ১৯৮৫ সালের মার্চে জিয়া সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে প্রথমে ১৯৮৪ সালের ২০ ডিসেম্বর গনভোট অনুষ্ঠানের ঘোষনা দেয়া হয়েছিল। যা পরবর্তীকালে 'ইসলামী গনভোট' নামে পরিচিতি পায় এবং

www.pathagar.com

হাস্যকর ও অবিবেচনাপ্রসূত বলে প্রমানিত হয়। গণভোটের সরকারী ঘোষনায় বলা হয়েছিল, 'দেশে কোরন ও সুন্নাহ'র আইন প্রতিষ্টায় লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোহাম্মদ জিয়াউল হকের এ যুগান্তকারী উদ্যোগকে পাকিস্তানবাসী স্বাগত জানিয়েছে।' যে দেশের ৯৫ ভাগ মানুষ মুসলমান, সেখানে এর বিরুদ্ধে কে ভোট দিতে যাবে? জিয়া ঘোষনা দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ ভোট তাকে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সংবিধানিক বৈধতা দেবে।" জিয়ার ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে গনভোটের পুরো প্রক্রিয়াটিই ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। ভারতীয় উপমহাদেশে এমন কোন একনায়ক পাওয়া যাবে না- যিনি গণভোটের সহায়তা নেননি। তাই জিয়াও এ ব্যাপারে কোন ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। 'না' ভোটের পক্ষে প্রচারনাকে শাস্তিমূলক অপরাধ হিসেবে ঘোষনা দিলেন। যে অপরাধে সর্ব্বোচ্চ ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩৫ হাজার ডলার জরিমানা হতে পারে। এছাড়া সেনাবাহিনীকে গোপনে ভোট গননা করার ক্ষমতা দেয়া হয় এবং ভোটের ফলাফলের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

পিপিপি গনভোট বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। 'আমল' এ প্রবন্ধ লিখে, সংবাদ সম্মেলনে, বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতায় গনভোটের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারনা চালিয়েছিলাম। দেশের দুইটি ইসলামপন্থী দল একে 'ইসলামের নামে রাজনৈতিক প্রতারনা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। সরকার ভোটের প্রচারনা চালাতে করাচীর প্রতিটি রাস্তায় লাউড স্পিকার বসিয়েছিল। 'ভোট দিন- এ জন্য আপনাদের পরিচয়পত্র দেখানোরও প্রয়োজন নেই' দিন-রাত ২৪ ঘন্টা ভাঙ্গা রেকর্ডের মতো এ সব প্রচারনা চলেছিল। ভোটের দিন বালুচিস্তান থেকে খবর আসে, বাস ভর্তি করে আফগান শরণার্থীদের ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় গ্রামশুদ্ধ লোককে একাধিক পোলিং স্টেশনে নিয়ে ভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছে। ভোটাভুটির পর সরকার নিয়ন্ত্রিত গনমাধ্যমে দাবী করা হয়, মোট ৬৪ ভাগ ভোট পড়েছে এবং এর ৯৬ ভাগই 'হ্যাঁ' ভোট। কিন্তু রয়টার্স, গার্ডিয়ানসহ বিভিন্ন আন্ত র্জাতিক গনমাধ্যমে ভোট গ্রহনের হার ১০ ভাগেরও কম বলে খবর প্রকাশিত হয়। ভোটের নামে ওই প্রহসনের বিরুদ্ধে আমাদের প্রচারনা সফল হয়েছিল। ১২ ডিসেম্বর লণ্ডন টাইমস' তার সম্পাদকীয়তে ভবিষ্যবাণী করেছিল, 'জেনারেল জিয়া যদি ধর্মীয় লেবাস ছেড়ে নির্বাচন পরীক্ষায় অবতীর্ন হন, সম্ভবত তার পক্ষে জেতা কঠিন হয়ে পড়বে'।

পিপিপি'র নির্বাসিত নেতাদের নিয়ে আমি দেশে ফেরার উপযুক্ত সময়ের আপেক্ষায় ছিলাম। ওই সময়টা আমার কাছে সঠিক বলে মনে হল। গনভোটের কল্যানে সারা বিশ্বে জিয়ার অজনপ্রিয়তার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। জিয়ার বিরুদ্ধের আন্দোলন শুরু করার এটাই মোক্ষম সময়। সিদ্ধান্ত নিতে উত্তর লণ্ডনে পিপিপি'র সাবেক একমন্ত্রীর বাড়ীতে সভায় মিলিত হই। পার্টির একজন উপদেষ্টা আমাকে সমর্থন করেন। অন্যরা সরকার বাঁধা দিতে পারে বলে আপত্তি জানান। পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি পাল্টা যুক্তি চলছিল। এক পর্যায়ে বর্ষিয়ান এ নেতা প্রস্তাব দিলেন,' আমাদের সকলকে সাহসী করার জন্য মিস বেনজির ভূট্টোকে পাকিস্তানে পাঠানো যায়।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে, আমার দেশে ফেরাটা যদি রাজনৈতিকভাবে সঠিক হয়, তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রে কেন হবেনা। আমরা একসঙ্গে না গিয়ে পৃথক দিনে একজন একজন করে যেতে পারি।' আমার প্রস্তাবে পুরো সভা কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেল। এরপর একের পর এক নেতা আপত্তি জানাতে শুরু করলেন। এদের

www.pathagar.com

প্রত্যেকের নামেই কোন না কোন মামলা আছে। কারও কারও মামলার রায়ে যাবজ্জীবন থেকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। তারা দেশে গেলে জিয়া সরকারের কোপানলে পড়তে পারেন। এসব শুনে আমি প্রথমে কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু আমার জেদ চেপে গেল। 'আমরা হয় কাজটি ভালভালে সম্পন্ন করবো, নতুবা করবই না-এই বলে আমি আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম।

জিয়ার গনভোট বিরোধী কর্মকাণ্ডের কারনে আমাদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হয়েছিল। ১৯৮৫ সালের ৫ জানুয়ারী বাবার জন্মবার্ষিকীতে গনতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পিপিপি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিজয় র‍্যালী বের করেছিল। লন্ডন শহরে আমরা একটি সেমিনার ও শেষে 'মুশায়েরিয়া'র (কবিতা পাঠের অনুষ্টান) আয়োজন করেছিলাম। সেখানে ইংরেজী, উর্দু ও সিন্ধী-এই তিন ভাষায় আমাকে বক্তৃতা করতে হয়েছিল। সেমিনারে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। এক বিপ্লবী কবির কবিতাংশ পাঠের মধ্য দিয়ে আমি বক্তৃতা শেষ করেছিলাম। করতালিতে ফেটে পরেছিল পুরো সেমিনারকক্ষ। সেমিনার চলাকালে মা আমাকে ফোন করে আমার বোন সনমের মেয়ে সন্তান হওয়ার খবরটি দেন। আমি সেমিনারে উপস্থিত পিপিপি'র সমর্থকদের সুখবরটি জানিয়ে বলি, 'আজকে শহীদ ভূট্টোর জন্মদিনে আর আমার বোনের সন্তান হয়েছে আজকেই। আমাদের এই নতুন অতিথির নাম দিলাম 'আজাদী'-যার অর্থ স্বাধীনতা।' পুরো হলরুম উল্লাসে ফেটে পড়লো। পুরো অনুষ্ঠানটি ভিডিও রেকর্ড করে একটি কপি পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিলাম।

জেনারেল জিয়া যখন ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের ঘোষনা দেয় তখন আমি মা ও সনমের সঙ্গে ছিলাম। নির্বাচন বয়কট করা আমাদের কাছে গনভোটের চেয়েও বড়সমস্যা হয়ে দাড়ায়। পাকিস্তানে সামরিক আইন তখনও বলবৎ ছিল এবং এই আইনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ছিল। আমাদের প্রার্থীরা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারবে, কোন দলের সদস্য হিসেবে নয়। ১৯৭৭ সালে সেনা অভ্যুত্থানের পর জেনারেল জিয়ার এটিই প্রথম নির্বাচন । আমরা কি এতে অংশগ্রহন করবো? পিপিপি'র নির্বাচনে অংশ নেয়া উচিত হবে কিনা-এ নিয়ে লন্ডন ও পাকিস্তানে নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ দেখা দেয়। 'প্রতিপক্ষের জন্য কখনো খালি মাঠ ছেড়ে দেয়া যাবে না'-বাবা প্রায়ই বলতেন। আমি বুঝতে পারছিলামনা, আমার কি করা উচিত। পাকিস্তানে এমআরডি'র প্রতিক্রিয়াও জানতে পারছিলামনা। ইউরোপে বসে আমি অবসাদে ভুগছিলাম। দেশে অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে। অথচ আমি কিছু করতে পারছি না। এর মধ্যে জিয়া কিছু আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেয়। ১২ জানুয়ারী জিয়া জাতির উদ্দেশ্যে ভাষনে ইঙ্গিত দেন, পিপিপি ও এমআরডি'র প্রথম সারির নেতারা নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষনা হতে পারেন। এর তিনদিন পরেই তার সুর পাল্টে যায়। তিনি বলেন, এই দুই দলের অনেকেই প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে, তবে আমি নই।

আমি ভাবছিলাম আমার দেশে ফিরে যাওয়া উচিৎ। মা'কেও ব্যাপারটা জানালাম। এই নির্বাচন নিয়ে দলের কেন্দ্রিয় নির্বাহী কমিটির সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে নির্বাচনে অংশগ্রহন নেয়া, না বিরত থাকা-কোনটা দলের জন্য বেশী মঙ্গলজনক। আমার আশঙ্কা ছিল মা দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত সমর্থন করবেন না। কয়েক মিনিট চিন্তা করার পরে মা রাজী হলেন। 'তোমার পরিকল্পনা ঠিকই আছে'-মা বলেছিলেন।'

www.pathagar.com

পাকিস্তানে পার্টি নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার এটি উপযুক্ত সময়।'

আমি ও মা মিলে এক ঘন্টা চেষ্টা করেও পাকিস্তানে পার্টির এক নেতার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হই। পরে আমার খালাতো বোন ফাখরিকে ফোন করি। আমি তাকে বলি তিন চারদিনের মধ্যে আমরা ফিরছি। ৭০ ক্লিফটন রোডের বাড়িটি গুছিয়ে রাখতে বলি। আমরা বিমানের টিকিট সংগ্রহের জন্য স্থানীয় একটি এয়ারলাইন্সে যাই। বাসায় ফেরা মাত্রই টেলিফোন বেজে উঠলো। ওপাশে ড. নিয়াজি। উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, 'করাচী থেকে এই মাত্র খবর পেলাম ৭০ ক্লিফটনের বাড়িটি সৈন্যরা ঘিরে ফেলেছে। আপনি ও আপনার মা'র বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করেছে জিয়া সরকার। সারা দেশের বিমানবন্দরগুলোতে সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। লন্ডন ও ফ্রান্স থেকে আসা বোরকা পরা সব মহিলাদের তল্লাশী করা হচ্ছে।'

তার মানে পাকিস্তানে ফিরলেই আমাকে গ্রেফতার করা হবে। নির্বাচন নিয়ে হয়তো আলোচনার সুযোগ হবে না। তার চেয়ে ইউরোপে থেকে অন্তত টেলিফোনে দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবো। নিয়াজির খবরে আমি দ্রুত চিন্তা করলাম। নির্বাচনে জিয়া বিরোধীদের সহায়তা করা উচিৎ হবে বলে আমার মনে হল। এ ব্যাপারে এমআরডি'র সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। দ্রুত পাকিস্তানে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে থাকি। কিছুক্ষণ পরে আমার ফোনটি বেজে উঠে।

'মিস বেনজির ভূট্টো বলছেন?' ওপাশে এমআরডি'র এক নেতা।

আমি ব্যগ্র কণ্ঠে বললাম, 'জি বলছি। নির্বাচন নিয়ে কি কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?' প্রশ্ন করলাম।

জবাব এলো, 'হ্যাঁ।'

আমি লম্বা শ্বাস টেনে জানতে চাইলাম,' কি?'

তিনি বললেন, 'বয়কট করবো'!

পিপিপি নেতারা বয়কটের পক্ষে। এমআরডিও একই কথা বলছে। আমি দ্রুত লন্ডনে ফিরে এলাম। নির্বাচন বয়কটের আহবান জানিয়ে উর্দু ও সিন্ধি ভাষায় দুটো বক্তৃতা রেকর্ড করে গোপনে দেশে পাঠিয়ে দিই। সিন্ধি, পাঞ্জাবসহ দেশের সব এলাকায় পিপিপি'র ওই বার্তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ২৫ ফেব্রুয়ারী সকাল থেকেই নির্বাচনের খবর পেতে টিভির সঙ্গে সেটে রইলাম। পাকিস্তানের সব সময়ই নির্বাচন একটি উৎসবমুখর ব্যাপার। এ সময় রাস্তার মোড়ে মোড়ে মানুষের ভিড় থাকে। পোলিং স্টেশনগুলো ঘিরে যেন মানুষের হাট বসে যায়। কে জিতবে, কে হারবে– তা নিয়ে চলে বিতর্কের ঝড়। কে কার আগে ভোট দিবে– তা নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলে। কিন্তু টিভিতে সে সব চিত্র দেখা গেলনা। বার বার পোলিং স্টেশনেরও ওই একই ধরনের ছবি দেখাতে লাগলো। সেখানে সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাড়িয়ে সম্ভবত সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ভোট দিচ্ছেন। বোঝাই যায় এগুলো সরকারের সরবরাহ করা ফুটেজ। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে কমপক্ষে ৩ হাজার বিরোধী নেতাকর্মীকে গ্রেফতার অথবা গৃহবন্দি করা হয়। যাদেরকে ভোট গ্রহন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটক থাকতে হবে বা আরো বেশি।

নির্বাচনের মাধ্যমে জিয়ার শাসন ও মৌলবাদী নীতিকে জনগণ আরেক দফা প্রত্যাখান করে। মাত্র ১০ থেকে ২৪ শতাংশ পাকিস্তানী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। অবশ্য

www.pathagar.com

সরকারের পক্ষ থেকে এ হার ৫৩ শতাংশ বলে দাবী করা হয়। জাতীয় পরিষদে মৌলবাদী ইসলামপন্থী দলগুলো সুবিধা করতে পারিনি। ৬১টি আসনে প্রার্থী দিয়ে মাত্র ৬টিতে জয়ী হয় জামায়াতে ইসলামী। পক্ষান্তরে পিপিপির সমর্থক দাবীদার দলগুলো ৫২ আসনে প্রার্থী দিয়ে ৫০ টিতেই বিজয় ছিনিয়ে নেয়। নির্বাচনের ফল ঘোষনার পর কেউ কেউ আশা করছিল, জিয়া হয়তো গনতন্ত্রের পথেই অগ্রসর হবেন। কিন্তু নতুন জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসার আগেই জিয়া সংবিধানে ব্যাপক সংশোধনী এনে অধ্যাদেশ জারি করে। এই সংশোধনীর ফলে আরও ৫ বছর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে জিয়ার থাকা নিশ্চিত হয়। শুধু তাই নয় প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোর প্রধান এবং ৪টি প্রাদেশিক সরকার গঠনে এবং প্রয়োজনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙ্গে দেয়ায় একচ্ছত্র ক্ষমতা পান জিয়া।

সাধারন মানুষের আকাঙ্খাকে পায়ে মাড়িয়ে একটি আজ্ঞাবহ সরকার গঠন করেন জিয়া। পশ্চিমা দেশগুলোর চাপে লোক দেখানো 'সিভিলিয়ান' সরকার গঠন করলেও নিজের নিয়ন্ত্রন অটুট রাখেন। নির্বাচন হলেও সামরিক আইন তুলে নেয়া হয়নি। জিয়া একই সঙ্গে দেশের প্রেসিডেন্ট এবং সেনাবাহিনী চিফ অফ স্টাফ। ফলে নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সেনাবাহিনীর অবৈধ প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। কিছুদিন পর শোনা গেল জিয়া সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং সেনাপ্রধানের পদ ছেড়ে দেবেন। টাইম'র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল জিয়া ঘোষনা করেন, মার্চের ২৩ তারিখে তিনি বেসামরিক প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিবেন। জিয়া ভেবেছিলেন, উর্দি ছেড়ে দিয়ে পাকিস্তানীদের বোকা বানাবেন। কিন্তু তিনি তা পারেননি। অজ্ঞাত কারনে আর্মির চীফ অফ স্টাফ পদে থেকেই ফের শপথ নিলেন জিয়া এবং সামরিক শাসন আগের মতোই চলতে থাকলো।

মার্চের শুরুতেই পর পর দুটি দু:সংবাদে বেশ মুষড়ে পড়ি। ১ তারিখে খবর পাই আয়াজ সামুকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে সামরিক আদালত। এ ঘটনার চারদিন পর ৫ মার্চ করাচী জেলে নাসের বালুচের ফাঁসির রায় কার্যকর হয়। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের ৯ সদস্য নাসেরের প্রান ভিক্ষা চেয়ে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু জিয়া সে আবেদন উপেক্ষা করেন। ফাঁসি কার্যকরের দিন করাচী জেলে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিরা বিক্ষোভ করলে সরকার তাদেরকে বিভিন্ন জেলে স্থানান্তর করে। তবে নাসেরের অন্য ৩ সহযোগিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া থেকে বিরত থাকে সরকার। আমাদের অব্যাহত প্রচারনা ও আর্ন্তজাতিক চাপে তাদের শাস্তি কমিয়ে দিতে বাধ্য হন জিয়া। কিন্তু নাসের বলুচের কালো তালিকাভুক্ত হওয়ায় নমনীয় হয়নি জান্তা সরকার। নাসের বেলুচের ফাঁসির খবর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গনমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার হয়। গার্ডিয়ান লেখে, 'ভূট্টো দীর্ঘজীবি হও, সামরিক শাসন নিপাত যাক-শ্লোগান দিতে দিতে ফাঁসির দড়ি মাথায় পরে নিয়েছেন এই বীর শ্রমিক নেতা।"

দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে অফিস কক্ষে ঢুকে র‍্যাক থেকে নাসের বেলুচে সংক্রান্ত ফাইলটি টেনে নিলাম। জেল থেকে আমাকে লেখা তার চিরকুটটি পড়তে পড়তে আমার দু'চোখ আদ্র হয়ে উঠলো। সিগারেট প্যাকেটের এ্যালুমুনিয়াম ফয়েলের সাদা অংশে গোটা গোটা অক্ষরে নাসের লিখেছিলেন, 'চেয়ারম্যান শহীদ ভূট্টোর হত্যাকারী সামরিক জান্তার কাছে কখনো প্রান ভিক্ষা চাইবো না। আমাদের জীবন দিয়ে হলেও পার্টির সন্মান অক্ষুন্ন রাখবো।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, পাকিস্তানের দরিদ্র জনগনের সেবা করার জন্য যেন বেগম সাহেবা (আমার মা) এবং আপনাকে দীর্ঘ জীবন দান করেন। আপনার সাফল্য কামনা করছি। আল্লাহ আপনার সহায় হোন।"

আমিও কয়েক মাস ধরে নাসের বালুচের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করছিলাম। তার মৃত্যুর কয়েকদিন পর লণ্ডনে নির্বাসিত পিপিপি'র এক নেতার বাড়ীতে নাসেরের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে শোক সভা ও মিলাদে অন্যান্য নেতাকর্মীদের সঙ্গে আমিও অংশ নেই। সে ছিল আমার ভাইয়ের মতো। ভাই হারানোর কষ্ট আমার ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে ফেলছিল। নাসের করাচীর দারিদ্র পীড়িত এলাকা মালিরে বসবাস করতেন। ছোট একটা বাড়ীতে মা-বাবা ও ভাইয়ের সঙ্গে স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতেন। মেয়েদের নিয়ে বেশ গর্ব অনুভব করতেন। প্রায়ই মেয়েদের কথা বলতেন। ১৯৮৩ সালে আমি তখন ৭০ ক্লিফটন রোডের সাবজেলে বন্দি নাসেরের একটি মেয়ের বিয়ে হয়। বিয়ের খরচের জন্য কিছু টাকা ফখরীর মাধ্যমে পাঠিয়েছিলাম। স্বজন হারানোর বেদনা যে কতটা কষ্টদায়ক তা আমি অনুভব করতে পারি। নাসেরর পরিবারেরকে সমবেদনা জানিয়ে একটি চিঠি লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম।

নেতাকর্মীদের মাঝ বেশ জনপ্রিয় ছিলেন নাসের। কারাগারে অন্যান্য বন্দিরাও তাকে খুব ভালোবাসত। মৃত্যুদণ্ডের রাতে করাচী জেলের বাইরে ভক্ত-শুভানুধ্যায়ীদের ভীড় ঠেকাতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করেছিল জেল কর্তৃপক্ষ। তার পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তরের পর শোকার্ত মানুষগুলো বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। জনতার সম্মিলিত শক্তিকে ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাস ছুড়ে পুলিশ। এভাবে হাতে রক্তের দাগ নিয়েই যাত্রা শুরু করে জিয়ার নতুন 'গনতান্ত্রিক' সরকার। সম্ভবত তাদের পরবর্তী শিকার আয়াজ সামু।

'পাকিস্তানের নয়া দাউর মটর্স এর শ্রমিক আয়াজ সামু- যাকে ১৯৮৫ সালের পহেলা মার্চ সামরিক আদালতে গোপন বিচারে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, তার প্রান রক্ষার জন্য আপনাদের সহায়তা কামনা করে এ চিঠি লিখছি'- পিপিপি'র হিউম্যান রাইটস কমিটির পক্ষে এ রকম একটি চিঠি তৈরী করি। অফিসে সংরক্ষিত বৃটেনের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ঠিকানায় চিঠিটি পাঠাতে শুরু করি। নির্বাসিত নেতাকর্মীদের সমন্বয়কারী সফদার হামদানি বৃটেনসহ অন্যান্য দেশে পিপিপি'র শাখাগুলোতে একটি সংগঠনিক নির্দেশ পাঠান। সেখানে আয়াজ সামুর প্রহসনমূলক রায়ের প্রতিবাদে নেতাকর্মীদের বেশ কিছু কর্মসূচী দেয়া হয়। কর্মসূচীগুলো হচ্ছে, স্থানীয় এমপি বা আইন প্রণেতাদের সঙ্গে বৈঠক, রায়ের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ, মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, গনমাধ্যমে ব্যাপক প্রচরনা ইত্যাদি।

আয়াজ সামুর মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আমাদের প্রচারনা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। এক শুভ্যানুধ্যায়ী পাকিস্তান থেকে আয়াজের মামলার পুলিশ প্রতিবেদনটির একটি কপি পাঠালে-তাতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। ১৯৮২ সালে করাচীতে নিজের অফিসে খুন হয়েছিলেন জহুর উল হাসান ভূপালি নামে সামরিক সরকারের এক সমর্থক।

হত্যাকাণ্ডের সময় আততায়ীদের একজন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। অপর আততায়ী হিসেবে আয়াজকে অভিযুক্ত করে পুলিশ। অথচ পুলিশ প্রতিবেদনে বর্ণিত আততায়ীর চেহারা, গায়ের রং, বয়সের সঙ্গে কোনভাবেই মেলানো যায়না আয়াজকে। প্রতিবেদনে এক সাক্ষীর বরাত দিয়ে বলা হয়, 'বেঁচে যাওয়া আততায়ীর বয়স ২৫ থেকে ৩০, লম্বা,

www.pathagar.com

পেশীবহুল শরীর, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামলা এবং তার কাঁধ থেকে রক্ত
আয়াজের বয়স ২২-এর বেশী নয়, উচ্চতা মাত্র ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, গায়ের রং ... গ্রেফতারের সময় তার কাঁধে কোন আঘাতের চিহ্ন ছিলনা। এ বিষয়টিকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যায় জান্তা সরকার। সংশ্লিষ্ট আরেকটি খবর জানিয়েছিলেন ওই শুভানুধ্যায়ী। ভূপালি হত্যার ঘটনায় ৩টি মামলা দায়ের করা হয়। পৃথক ৩টি সামরিক আদালতে মামলাগুলোর বিচার চলে। মামলাগুলোতে অভিযুক্তরাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। একই ঘটনায় একটি মামলায় আয়াজ এবং অন্য দুটি মামলার অপর ২ ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় দেয় জিয়ার 'রাবার স্ট্যাম্প' আদালত।

প্রতিবেদনটি পেয়ে যারপর নাই আমরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠি। কিন্তু আয়াজের নিরপরাধের পক্ষে আরও অব্যর্থ প্রমান খুঁজছিলাম, পেয়েও গেলাম। আয়াজ আইনজীবির মাধ্যমে আমাদের কাছে এক টুকরো কাপড়ে তার রক্তের নমুনা পাঠিয়েছিল। ভূপালী হত্যার পর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়া ঘাতকের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেছিল পুলিশ। ওই রক্ত পরীক্ষা করেন ড.শেরওয়ানী নামের এক ফরেনসিক এক্সপার্ট, যা পুলিশ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আততায়ীর রক্তের সঙ্গে আয়াজের রক্তের মিল আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি পুলিশ। আমরা লন্ডনের এক প্যাথলজিষ্টের কাছে আয়াজের রক্ত পরীক্ষা করাই। রিপোর্ট হাতে পেয়ে আততায়ীর রক্তের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি-দুটোর গ্রুপই আলাদা। অর্থাৎ পুলিশ প্রতিবেদন অনুযায়ী আয়াজ ভূপালীর ঘাতক হতে পারে না। এ তথ্যটি আমরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেই। কিন্তু এরপরও আয়াজের মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করেনি আদালত।

২৩ মার্চ করাচী জেল থেকে আয়াজের একটি চিঠি বারবিকানে পৌঁছে। আয়াজ লিখেছে, 'প্রিয় আপা! আপনাকে চিঠি লিখার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। হিমালয়ের চেয়েও উঁচু ও শক্তিশালী আমাদের অঙ্গীকার। বিপ্লবীরা কখনো অত্যাচারী শাসকের রক্তচক্ষুকে পরোয়া করেনা। জীবনের মালিক আল্লাহ, জিয়া নয়। সামরিক জান্তার কাছে মাথা নত করার চেয়ে মৃত্যুকেই আমি শ্রেয় মনে করছি। প্রিয় আপা, আপনার এই ভাই আয়াজ সামু আপনাকে কথা দিচ্ছে, সন্ত্রাসী জিয়াউল হয়তো আমার মাথাটা কেটে ফেলতে পারবে; কিন্তু কখনো এটিকে নোয়াতে পারবে না... আমরা দেশের জনগণের মুক্তির জন্য বুকের রক্ত ঢালতে পিছপা হবনা। এমন একদিন আসবে যেদিন আমাদের এ আত্মত্যাগের খবর দেশের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে যাবে। ইনশাল্লাহ... মানুষের হৃদয়ে আমরা চিরদিন বেঁচে থাকবো। আপনার ভাই আয়াজ সামু।'

আয়াজ সামুর মামলার কাগজ পত্রগুলো আমি সবসময় সঙ্গে রাখতাম। এপ্রিলের দিকে রমা মেহেতো স্মারক বক্তৃতা দেয়ার জন্য হার্ভার্ড থেকে আমন্ত্রন পাই। হার্ভার্ডে বক্তৃতা দেয়ার পর নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক কাউন্সিলে একটি সেমিনারে অংশ নেই। এরপর জুনের শেষের দিকে স্ট্রসবার্গে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে বৈঠক করি। বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলনে আয়াজ সামুর মামলার বিচারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরি। সেখানে আমি বলি,'পাকিস্তান পিপলস পার্টির সদস্য শ্রমিক নেতা আয়াজ সামু এই মুহূর্তে করাচী জেলের একটি ডেথ সেলে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। কোন অপরাধ না করেই তার বিরুদ্ধে হত্যা মামলায় ফাঁসির রায় দিয়েছে সামরিক আদালত। বিভিন্ন স্থানে বর্ণবৈষম্যবাদ

ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে যখন সারা বিশ্বের মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে তখন পশ্চিমা সাহায্যপুষ্ট দেশ পাকিস্তানের সামরিক আদালতে বিচারের নামে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় চুপ করে থাকা অন্যায়।' কথাগুলো বলতে গিয়ে আমার কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর পরই আমার জন্য অপেক্ষা করছিল আরেকটি দু:সংবাদ। 'আল জুলফিকার'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে লাহোরে ৫৪ জন রাজনৈতিক বন্দিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। একই অভিযোগে অনুপস্থিত আরও ৪০ জনের বিরুদ্ধে একই রায় ঘোষনা করা হয়। এদের মধ্যে আমার ভাই মীর ও শাহ'র নামও ছিল। দীর্ঘদিন ধরেই জান্তা সরকার আল-জুলফিকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ আনছিল। এ রকম কিছু হবে আমি আগেই আঁচ করেছিলাম। এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালও তাদের কয়েকটি প্রতিবেদনে উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখেছিল, 'রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী কিছু নিরীহ লোককে আল-জুলফিকার'র সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার মিথ্যা অভিযোগ এনে জেল-জরিমানা করা হতে পারে।" ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত ওই সংগঠনের আরেকটি প্রতিবেদন পড়ে জানতে পারি, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শতাধীক রাজনৈতিক বন্দির মধ্যে ইতোমধ্যে ৭০ জনের ফাঁসি কার্যকর করেছে জিয়া সরকার।

রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ওপর জান্তা সরকারের পৈশাচিক আচরনে বেশ উদ্বিগ্ন ছিলাম। আয়াজ সামুর জন্য আরও কিছু করার তাগিদ অনুভব করলাম। সবার সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত একটি চিঠি ড্রাফট করি।

পাকিস্তান পিপলস পার্টি
১১১ লডেরডেল টাওয়ারস
বারবিকান
লণ্ডন ই সি-২
১৮ জুন, ১৯৮৫

আয়াজ সামুর জীবন বাঁচান

প্রিয় সাথী, পাকিস্তানের ২২ বছর বয়সী নির্দোষ তরুন আয়াজ সামুর জীবন বাঁচাতে যত দ্রুত সম্ভব আপনার সর্ব্বোচ্চ চেষ্টাটুকু কাজে লাগান। পরিচিত প্রত্যেকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আয়াজের প্রান ভিক্ষা চেয়ে আবেদন জানানো হবে আজই। সময় খুবই কম। নিজ নিজ অবস্থান থেকে এই অন্যায় রায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান।

চিঠি চূড়ান্ত করে এর কপি পিপিপি'র সব সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের (যাদের ঠিকানা রয়েছে) কাছে পাঠিয়ে দিলাম। জিয়ার কাছেও একটি কপি পাঠালাম। ব্রিটেনের সব বিদেশী দূতাবাস ও হাইকমিশনেও আয়াজ সামুর প্রাণরক্ষার আবেদন জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠালাম। কিন্তু আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ১৯৮৫ সালের ২৬ জুন রাতে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয় অবরুদ্ধ পাকিস্তানের অকুতোভয় সন্তান আয়াজ সামুকে।

www.pathagar.com

রান্নাঘরে কিছু একটা ভেঙ্গে পড়ার শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। যে রাতে আয়াজকে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল- সেই রাতের কথা বলছি। ভাবলাম জানালা বোধ হয় খুলে রেখে গেছে কেউ। বাতাসের ধাক্কায় কিছু একটা মেঝেতে পড়ে গেছে। কিন্তু রান্নাঘরে ঢুকে অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, মেঝেতে কিছু পড়ে নেই। ক্যাবিনেটে সব কিছু সুন্দর করে সাজানো গোছানো। জানালাও বন্ধ। আমি কিছুটা বিস্মিত হলাম। তবে কি আয়াজ সামু'র আত্মা এসেছিল বারবিকানে? তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে তখনই কয়েক রাকাত নামাজ আদায় করলাম।

পরদিন সকালে নাহিদ, বশির রিয়াজ, সফদার, সুমলিনা, ইয়াসমিন এবং মিসেস নিয়াজিকে নিয়ে অফিস কক্ষে আলাপ করছিলাম। আয়াজ সামুর মৃত্যুর পর যারা সমবেদনা জানিয়েছিলেন এবং তার মৃত্যুদণ্ড রহিতের চেষ্টা করেছিলেন-তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লেখা উচিত বলে মনে করলাম। এদের মধ্যে রয়েছেন, ব্রিটেনের লর্ড সভার সদস্য এভেবারী, যুক্তরাষ্ট্রের ইলিয়ট আব্রাহাম এবং ব্রাসেলসের ক্যারেল ভ্যান মিরেট। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সমাজতন্ত্রী সদস্যদের নিয়ে মিরেট পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত অর্থনৈতিক সহায়তা চুক্তি বাতিলের প্রস্তাব পর্যন্ত করেছিলেন। 'মি আয়াজ সামুর মৃত্যুতে আমি খুবই শোকাহত; যদিও অবাক হইনি'-লিখেছিলেন লর্ড এভেবারী। 'এ ঘটনায় এটাই প্রমান হয় যে, জিয়া মানবিক আবেদনগুলো সচেতনভাবেই উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু আমি ভীত হচ্ছি এ জন্য যে, জিয়া ভাল করেই জানতেন এসব ঘটনায় পাকিস্তানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র তথা রিগ্যান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর একটুও পরিবর্তন হবেনা।'

আমরা যখন এসব চিঠি জবাব তৈরী করেছিলাম, হঠাৎ হলরুম থেকে ধুপ ধাপ শব্দে পেলাম। হলরুমের টেবিলে সেখানে বিভিন্ন ফাইলপত্র, চিঠি, খাম ও অন্যান্য জরুরী কাগজ স্তুপ করে রাখা ছিল। শব্দের উৎস সেখানেই। আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। বশির হল রুমের দিকে যেতে যেতে বলল, 'বোধহয় টেবিল থেকে কোন ফাইল পড়ে গেছে।' চকিতে গত রাতের কথা মনে পড়লো। বললাম, 'কোন কিছুই পড়েনি।' আমার কথায় সে থমকে গেল। 'তুমি ঠিক বলেছো তো'-ফিরে আসতে আসতে প্রশ্ন করলো। আমি তখন রাতের ঘটনা বিস্তারিত শুনিয়ে সকলের উদ্দেশ্যে বললাম,' আপনারা কি বিশ্বাস করেন-এটা আয়াজের আত্মা? আকস্মিক নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে। 'আল্লাহ তার সহায় হোন'- আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধর্মভীরু মিসেস নিয়াজী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন। 'আয়াজের আত্মার শান্তি কামনায় এই ফ্লাটে কোরানখানি আয়োজন করা উচিৎ'-প্রস্তাব দিলেন তিনি। আমরা বিনাবাক্যে রাজী হয়ে গেলাম। বিকেলেই নাহিদ একদল পাকিস্তানী মহিলাকে বারবিকানে নিয়ে এলো। আমরা সবাই মিলে বেশ কয়েকবার কোরান শরীফ খতম দেই। আয়াজের আত্মা আর ফিরে অসেনি বাবরিকানে।

আমার মা ও পরিবারের সদস্যদের দেখতে মন চাইছিল। ওরা তখন ফ্রান্সে। ১ জুলাই ফ্রান্সে যাবো ভাবলাম। কিন্তু বারবিকানে একটার পর একটা কাজে সে সুযোগ পাচ্ছিলাম না। পিপিপি'র সভা, পাকিস্তান থেকে আসা নেতাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করতে করতে– কথা বলতে বলতে কিছুটা হাপিয়ে উঠছিলাম। জুলাইয়ের ১ তারিখ পেরিয়ে গেল। মা ফোনে জানালেন, আমি না যাওয়ায় শাহ নেওয়াজ খুব কষ্ট পেয়েছে। সে আমার জন্য কাবার তৈরী

www.pathagar.com

করে রেখেছিল। পাকিস্তানে জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর পারিবারের সঙ্গ আমি খুব কমই পেয়েছি। ওদের কথা আমি সব সময় ভাবতাম। মীর, শাহ-ওদের ছোট মেয়ে ফাতি ও শাসি এবং আফগান স্ত্রী ফৌজিয়া ও রেহানার চেহারা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। অবশেষে জুলায়ের মাঝামাঝিতে সুযোগ এল।

১৭ জুলাই সকালে কাপড়-চোপড় ও প্রয়োজনীয় বই স্যুটকেসে ভরে এয়ারপোর্টের দিকে রওয়ানা দিলাম। উফ! যেন মুক্তির স্বাদ পেলাম। সমস্ত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও ক্লান্তি ছাপিয়ে আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছিল ফ্রান্সের ছবির মত শহর কান। যেখানে ২ সপ্তাহেরও বেশী সময় আমি পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাবো। নাসের ও আয়াজের মৃত্যু আমার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। এত মৃত্যু, এতো পৈশাচিক নির্যাতন, এত অবমাননা সহ্য করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল।

www.pathagar.com

১২

আমার ভাইয়ের মৃত্যু

সবাই কোথায়? ওর কি আমার আসার কথা ভুলে গেছে ? ফ্রান্সের নাইস বিমানবন্দরে নেমে আমি চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম । এরপর আস্তে আস্তে হেঁটে ইমিগ্রেশন পার হলাম।

হঠাৎ সিড়ির আড়াল থেকে বের হয়ে শাহনেওয়াজ আমাকে জড়িয়ে ধরলো। বিস্ময়ভরা চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো । মা হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে আমার কপালে চুমু খেলেন । বললেন, লুকিয়ে থাকার বুদ্ধিটা শাহ'র ।

শাহ্ নেওয়াজ আমার ব্যাগগুলো তুলে নিতে নিতে দুষ্টুমি করে বললো–

উফ! এত ভারী, তুমি এসব কী এনেছো? সোনা?

ওর কথা শুনে সবাই হাসতে হাসতে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে এলাম ।

ফ্রান্সের রিভিয়েরার রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধ পাম গাছ। মৃদু বাতাসে পাতাগুলো দুলছিল। গত কয়েক মাসের উত্তেজনা-উদ্বিগ্নতার পর পরিবারের সবাইকে কাছে পেয়ে আমার প্রচণ্ড ভালো লাগছিল। বিশেষ করে দুষ্টু ছোট ভাই শাহ'কে কাছে পেয়ে এ ভালোলাগা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল ।

শাহনেওয়াজ সবসময় খুব হাসিখুশী থাকতো। ওর মনটাও ছিল খুব কোমল। ছোটদের মধ্যে শাহ্ ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় । আমাদের মধ্যে আলাদা একটা বন্ধন ছিল। শাহ্ ছিল সবার ছোট আর আমি সবার বড় ।

আমি ভালো করে শাহ'র দিকে তাকালাম । সে ছিল স্লিম এবং পেটানো শরীরের। বিভিন্ন সময় রাস্তায় ওর সঙ্গে চলার সময় আমি খুব ভালোভাবে খেয়াল করতাম, পথচারীরা শাহ'র দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো ।

শাহনেওয়াজের সঙ্গে মা বসেছিল গাড়ির সামনের সিটে । আমি পেছনে । গাড়ির মধ্যে শাহ্ অনবরত কথা বলছিল । রিয়ার ভিউ (পেছনে দেখার জন্য চালকের আয়না) দিয়ে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছিল । আমাকে পেয়ে শাহ্ প্রচণ্ড খুশী হয়েছে তা ওর চোখ মুখ

www.pathagar.com

দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। বাতাসে শাহনেওয়াজের চুল উড়ছিল সোনালী ঢেউয়ের মতো। ওর পোশাকও ছিল চমৎকার। সাদা শার্ট আর ট্রাউজার। ওই পোশাকে শাহকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। সব মিলিয়ে বেশ হ্যাণ্ডসাম লাগছিল শাহনেওয়াজকে। আমি মুগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। প্রায় দেড় বছর আগে শাহ'র সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল ইংল্যন্ডে। তখনকার তুলনায় তাকে আরো বেশী হ্যান্ডসাম লাগছিল।

আমি যখন পাকিস্তানে বন্দি ছিলাম তখন শাহ আমার জন্য তেমন উদ্বিগ্ন হয়নি। মীর বা শাহকে নিয়ে আমারও তেমন উদ্বেগ ছিল না। আর শাহনেওয়াজের সংগঠন 'আল জুলফিকার'ও দীর্ঘদিন থেকে তেমন সক্রিয় ছিল না। তাই আমি ভাবছিলাম আপাতত আমাদের পরিবারের কোন বিপদ-আপদের সম্ভাবনা নেই। আর জিয়া কান শহর থেকে অনেক দুরে। সে শাহ'র তেমন কিছু করতে পারবে না। শাহ তার স্ত্রীকে নিয়ে অনেকদিন থেকেই ওখানে বাস করতো।

গাড়িতে আমাদের আলোচনার বিষয় রাজনীতি ছিল না। আমরা আম নিয়ে কথা বলছিলাম। শাহ রিয়ার ভিউ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমাদের জন্য তুমি কী আম নিয়ে এসেছে? প্রায় দুই সপ্তাহ থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

উত্তরে বললাম, তোমাদের জন্য সিন্ধরি জাতের আম নিয়ে এসেছি। আমি কিন্তু চসার জাতের আম পছন্দ করি। ওগুলো ছোট হলেও ভারী মিষ্টি।

শুনে শাহ আমাকে ভেংচি কেটে বললো, সিন্ধুতে জন্ম নিয়েও সিন্ধরি আম পছন্দ করোনা? তুমি কি সত্যিই সিন্ধুর মেয়ে ম্যাডাম? আর রাজনীতি করার সময়ও তুমি কি সবসময় এভাবেই সবকিছু অস্বীকার করো?

আমি প্রচণ্ড হাসলাম। শাহ সবসময় আমাকে খুব হাসিখুশী রাখতো। পরিবারের সবাইকে সে মাতিয়ে রাখতো নানা কথায়। বিমান ভ্রমণ করে আমি বেশ ক্লান্ত ছিলাম। তবে আমার প্রতি শাহ'র প্রবল উৎসাহ আর আমুদে স্বভাবে সব ভুলে গেলাম।

আমাদের পরিবার যখন রাজনীতি নিয়ে প্রচন্ড ব্যস্ত তখন শাহ ছিল খুবই ছোট। বাবা প্রধানমন্ত্রী হবার পর পরই শাহনেওয়াজের জন্ম হয়। ওই সময় মা'কেও বাবার সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতে হতো। আমাদের দাদা-দাদীও তখন বেঁচে ছিলেন না। তাই আমরাই শাহ'র দেখাশুনা করতাম। এ কারণেই শাহ'র সঙ্গে আমার আলাদা একটি বন্ধন গড়ে ওঠে। আমি যখন হার্ভার্ডে পড়তাম শাহ কাঁচা হাতে আমার কাছে চিঠি লিখতো। আস্তে আস্তে সে বড় হতে থাকলো। পড়াশুনার চেয়ে খেলার প্রতিই ওর বেশী ঝোঁক ছিল। স্কোয়াশ খেলার প্রতি শাহ'র বিশেষ দুর্বলতা ছিল। নিজের স্কুলের বাস্কেটবল দলেরও মূল খেলোয়াড় ছিল শাহ। শরীরের প্রতিও আলাদা নজর ছিল ওর। খেলাধুলার পাশাপাশি শরীর ঠিক রাখতে বাসায় নিয়মিত ব্যায়াম করতো শাহনেওয়াজ।

তবে শাহ'র পড়াশুনার প্রতি উদাসীনতা আর খেলাধুলার প্রতি এ ঝোঁক বাবার পছন্দ ছিল না। তাই শাহকে ভর্তি করে দেয়া হলো সামরিক ক্যাডেট স্কুলে। সেখানে হাসান আবদাল নামে এক শিক্ষক শাহকে নিয়ম কানুনের মধ্যে আনার চেষ্টা করেন। স্কুলের ছাত্ররা শাহকে দেখে অবাক হতো। প্রধানমন্ত্রীর ছেলে খেলাধুলা বা শরীর গঠনের প্রতি এত মনোযোগী- এটা তাদের অবাক করতো। সামরিক স্কুলের নিয়ম কানুন শাহ'র ভালো লাগেনি। তাই ভুলিয়ে-ভালিয়ে মাকে দিয়ে বাবাকে রাজী করিয়ে ফেলে সে। ক্যাডেট স্কুল

www.pathagar.com

ছেড়ে চলে আসে শাহ । আবারও আমাদের সাথে 'প্রাইম মিনিস্টার হাউসে' থাকা শুরু করে। ওকে ভর্তি করে দেয়া হয় ইসলামাবাদ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে।

উর্দুতে 'শাহনেওয়াজ' এর মানে 'দয়ার রাজা'। শাহ ছিল বেশ উদার। সে অনেক সময় এমন কাণ্ড করতো যা ধারণারও বাইরে। একদিন প্যারিসে একটি ক্যাফেতে আমি ও শাহ বসে ছিলাম। আমি শাহকে একটি হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকা কিনে আনতে দুইবার পাঠালাম। কিন্তু দু'বারই সে রাস্তার দরিদ্রদের টাকা দিয়ে খালি হাতে ফিরে এসেছিল। মাঝে মাঝে সে নিজের পরনের জামা খুলে গরীবদের দিয়ে দিত। একবার পছন্দ করে মা'র কিনে দেয়া নতুন ব্লেজার এক দরিদ্রকে দিয়ে দেয় শাহ।

ছোট বেলা থেকেই শাহ গরীবদের আলাদা গুরুত্ব দিত। সে ৭০ ক্লিফটন রোডে বাগানের ভেতর খড়কুটো দিয়ে একটি কুঁড়েঘর তৈরি করেছিল। মাঝেই মাঝেই ওই ঘরে সে টানা কয়েক সপ্তাহ কাটাতো। গরীবদের জীবন সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা জানতে সে এসব করতো।

আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে শুধু শাহনেওয়াজই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েনি। তবে সে সুইজারল্যাণ্ডের লেসিনে অবস্থিত আমেরিকান কলেজের ছাত্র ছিল। সেখানে পড়ার সময় ইয়াসমীন নামে এক তুর্কী মেয়ের সঙ্গে ওর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠেছিল। কলেজে প্রচুর বন্ধু-বান্ধবও জুটিয়ে ফেলে শাহ। ১৯৮৪ সালে ফ্রান্সের একটি বিখ্যাত ক্লাবে ইয়াসমীনকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় সে।

আমি সবসময়ই ভাবতাম আমাদের সবার মধ্যে শাহনেওয়াজই সবচেয়ে মেধাবী। ভাইবোনদের চেয়ে ওর রাজনৈতিক পরিচিতিও বেশী ছিল। বাবা বিভিন্ন সভা ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে শা'হকে সঙ্গে নিতেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে শাহনেওয়াজ প্রথম সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেয়। শাহ'র রাজনৈতিক দূরদর্শিতাও ছিল প্রখর। জনগণ কী চায়, কী ভাবছে এবং কীভাবে তাদের আরো কাছে যাওয়া যায় এসব বিষয় খুব ভালো বুঝতো সে।

কানে এটা ছিল আমাদের পরিবারের দ্বিতীয়বার একত্রিত হওয়া। মা আমাদের সবার উদ্দেশ্যে বললেন, আমি চাই জুলাই মাসটা সবাই আমার সঙ্গে থাকবো। এর পর সবাই যার যার মতো কাজে যেও। সেবার কানে বেহজাদ আন্টির বাসায় পরিবারের সবাই একত্রিত হয়েছিলাম। কিন্তু সময়ের অভাবে একত্রিত হওয়াটা ভালোমতো উপভোগ করতে পারিনি।

জিয়াকে ক্ষমতা থেকে সরানো প্রসঙ্গে মীর ও আমার প্রায়ই আলোচনা হতো।

মীর বলতো, জিয়া পাকিস্তানকে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চলেছে। ওকে থামাতে সন্ত্রাসের মাধ্যমেই এর মোকাবেলা করতে হবে।

আমি প্রতিবাদ করে বলেছিলাম, সন্ত্রাস সন্ত্রাসের জন্ম দেয়। এর মাধ্যমে জনগণের স্থায়ী কল্যাণ সম্ভব নয়। জনগণের কল্যাণের জন্য স্থায়ী পরিবর্তন আনতে চাই রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন। নির্বাচনে জনগণের ম্যাণ্ডেট নিয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেলেই এটা করা সম্ভব।

নির্বাচন? কিসের নির্বাচন? তুমি কি মনে করো জিয়া নির্বাচন দেবে? ওকে অস্ত্র দিয়েই ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে। বেশ জোর দিয়েই কথাগুলো বলে মীর।

www.pathagar.com

প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, গেরিলা গ্রুপের চেয়ে যে কোন দেশের সেনাবাহিনীর হাতে অনেক বেশী অস্ত্র থাকে। আর একটি দেশের স্বার্থ অবশ্যই কোন গ্রুপের স্বার্থের চেয়ে অনেক বড়। আলোচনার এক পর্যায়ে আমাদের গলার স্বর বেশ উচুতে উঠে যেত। তবে এসব আলোচনার সময় শাহ্ নেওয়াজ আমাদের আশেপাশে থাকতো না। পরে সে আমাকে বলেছিল, তোমরা যখন রাজনীতি নিয়ে কথা বলবে তখন আমি সেখানে থাকবো না। এ কথা শুনে আমি ও মীর রাজনীতি বিষয়ে কোন কথা না বলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলাম।

কিন্তু শাহ্ রাজনীতি পছন্দ করতো। সে পাকিস্তানে রাজনীতি করতে চাইতো। জিয়ার চাপে পাকিস্তান ত্যাগের পর বিভিন্ন সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে সে বাস করে। খুব কাছ থেকে দেখা সিরিয়া, লিবিয়া ও লেবাননের জটিল রাজনীতি তাকে আকৃষ্ট করে। শাহ্ আমাকে প্রায়ই ঠাট্টা করে বলতো মার্গারেট থ্যাচারের প্রতি তোমার বিশেষ কোন দুর্বলতা আছে।

আমি বলতাম, না, তার প্রতি আমার দুর্বলতা নেই। মার্গারেট ছিলেন ডানপন্থী, আমি তা নই। এছাড়াও ব্রিটেনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতাম।

সে ইচ্ছা করেই না বোঝার ভান করে আমাকে বলতো, মার্গারেটের প্রতি তোমার দুর্বলতা আছেই। এর কারণ তুমিও নারী, সেও নারী।

ঘটনাচক্রে বিপজ্জনকভাবে শাহ্ 'আল-জুলফিকার' সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে পরে। কাবুলে থাকার সময় শাহ্'র মুল কাজ ছিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে যোগ দেয়া 'আল-জুলফিকার' সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া। সে কারো কোন ক্ষতি না করে প্রবল উৎসাহ নিয়ে এ কাজ করতো। ওই সময় একবার সোভিয়েত বাহিনী কাবুলে কারফিউ জারি করে। এমন এক সকালে শাহকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। মীর প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন হয়ে চারিদিকে খোঁজ- খবর লাগালো। পরে শাহ্ ফিরে এলে মীর জিজ্ঞাসা করলো কোথায় গিয়েছিলে?

শাহ্ খুব শান্তভাবে জবাব দেয়, আল জুলফিকারের সদস্যদের সঙ্গে সকালের নাস্তা সারতে। শুনে মীর প্রচণ্ড রেগে যায়। তখন শাহ্ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, আমি যাদের শিক্ষা দেই, তাদের ত্যাগ করি কিভাবে?

পাকিস্তানে সামরিক বাহীনি ক্যু এবং প্রহসনের বিচারে বাবাকে ফাঁসি দেয়ার পর আমাদের সবার মতো শাহ্'র ভবিষ্যতও লক্ষচ্যুত হয়। ওর দীর্ঘদিনের ভালোবাসা- তুর্কী মেয়ে ইয়াসমিনের পরিবার যখন জানতে পারে শাহ্ আল-জুলফিকার এর সঙ্গে জড়িত, তখন তারা এ সম্পর্ক ভেঙ্গে দেয়। শাহ্ ওর রিয়েল এস্টেট ব্যবসা করার পরিকল্পনাও বাদ দেয়। যদিও প্যারিসে অ্যাপার্টমেন্ট তৈরির জন্য মূলধনের কথা ভাবছিল সে।

একবার আমরা চার ভাইবোন একত্রিত হলে শাহ্ আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, তুমি আর মীর রাজনীতি করো। আমি পরিবারের জন্য রোজগার করবো।

গোয়েন্দা কৌশলের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল শাহনেওয়াজের। তাই ওই বিষয়ে ব্যাপক পড়াশুনা করতো সে। শাহ্ আমাকে বলতো, তুমি আর মীর যখন পাকিস্তানের রাজনীতিতে জড়িয়ে যাবে তখন মনে রাখবে তোমাদের সাহায্য করার জন্য এক ছোট ভাই আছে। তোমরা গোয়েন্দা সংস্থায় আমাকে একটা পদ দিও।

সে বলতে থাক- নেতারা সমাজের সব অংশে, সবশ্রেনীর মানুষের কাছে পৌছতে পারে না। আর আধুনিক সমাজ অনেক বেশী বিস্তৃত এবং জটিল। রাজনীতি করার সময়

www.pathagar.com

তাই এমন একজনকে প্রয়োজন হয়, যার ওপর নির্ভর করা যায়। সমাজের তৃণমূলে কী হচ্ছে, জনগণ কী ভাবছে এসব বিষয় সেই তোমাদের জানাবে। তাই তোমরা মনে রেখ, যখন সময় আসবে আমি তোমাদের পাশে থাকবো।

শাহ গাড়ীতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো-

কানে তুমি কতদিন থাকবে?

বললাম, ৩০ জুলাই পর্যন্ত।

সঙ্গে সঙ্গে সে প্রতিবাদ করে বললো, না! না! তোমাকে অবশ্যই আরো বেশি দিন থাকতে হবে। মীর ৩০ তারিখ পর্যন্ত থাকবে। কিন্তু তোমাকে যেতে দিচ্ছি না। তুমি কমপক্ষে আরো এক সপ্তাহ আমার সঙ্গে থাকবে।

আমি ওকে বললাম, আমাকে তো অস্ট্রেলিয়ায় যেতে হবে।

উত্তরে সে বললো- তুমি যেখানে খুশি যেও, তবে সেটা আমার সঙ্গে থাকার পর।

বললাম, ঠিক আছে তাই হবে।

যদিও জানতাম ৩০ জুলাইয়ের পর আমার পক্ষে থাকা সম্ভব হবে না। কিন্তু শাহ'র প্রবল উৎসাহকে আমি থামিয়ে দিতে চাইনি।

কানে পুরোটা সময় এবং প্যারিস ঘুরে পাকিস্তানে না ফেরা পর্যন্ত সে আমার সাথে সাথে ছিল। প্যারিসে আমি যে হোটেলে ছিলাম, সেই হোটেলের অভ্যার্থনাকারী একদিন আমাকে জানালেন, 'রেড স্টার' এর সম্পাদক আমার সাক্ষাৎকার নিতে চান। আমি এর আগে কখেনোই রেড স্টারের নামই শুনিনি। রেড স্টারে সাক্ষাতকার দেয়ার জন্য অনেকেই আমাকে ফোনে অনুরোধ করে। রেড স্টারের সম্পাদক তৃতীয়বার ফোন করলে আমি নিজেই ফোন রিসিভ করি।

এসব দেখে শাহ হাসতে হাসতে বললো, তোমার চেয়ে একজন রাষ্ট্রপ্রধানকে পাওয়া সহজ। শাহ'র হাসি যেন থামছিল না। সে বলে চললো– বেনজির ভুট্টোকে পাওয়ার চেয়ে বৈরুতে দ্রুজ হেড কোয়ার্টারের ওয়ালিদ জামব্লেটকে পাওয়াও অনেক সহজ।

প্যরিসে হোটেলে থাকার সময় প্রতিদিন সকাল ছয়টায় শাহ আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিত। একদিন সকালে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বললো, এখনো ঘুমুচ্ছ? তাড়াতাড়ি ওঠো, নাস্তা করতে হবে।

প্যারিসে প্রথম রাতেই আমার সঙ্গে সাবেক তথ্যমন্ত্রী নাসিম আহমেদের বৈঠক ছিল। হোটেলে নির্ধারিত সময়েই দেখি লম্বা ও আকর্ষণীয় ফিগারের একজন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। উনিই ছিলেন নাসিম আহমেদ। বৈঠকে তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আমার আলোচনা হয়। ওই সময় শাহ আমাদের সঙ্গে ছিল। শাহ শুধু একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ছেলেই ছিলনা, আল জুলফিকারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় সন্ত্রাসী হিসেবেও ওর নাম ছড়িয়ে পরে। নাসিম আহমেদের সামনে ও সিগারেট ধরালো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সঙ্গে শাহর বেশ জমে গেল।

ডিনার শেষে প্যারিসের বসন্তের কোমল পরশ পেতে শাহ, ইয়াসমীন ও আমি বেরিয়ে পড়লাম। কথা বলতে বলতে রাস্তার এক পাশ দিয়ে তিনজনই হাঁটতে থাকলাম। পরে এক ক্যাফেতে ঢুকে কফি খেলাম, গল্প করলাম ভোর তিনটা পর্যন্ত। পরে হোটেলে ফিরলাম।

শাহ মার জন্য এক মাসের ভাড়ায় ক্রোয়শেট-এ দুই বেডের ফ্ল্যাট নিয়েছিল। সেখানে

www.pathagar.com

মা এবং আমাকে নামিয়ে দিয়ে শাহ্ বললো, আমি সন্ধ্যা সাতটায় তোমাদের তুলে নেব। প্রথমে তোমরা আমার বাসায় যাবে, পরে সবাই মিলে সমুদ্র সৈকতে যাবো। আমি সব প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। সেখানে বারবিকিউয়েরও ব্যবস্থা থাকবে। সবাই যার যার মতো উপভোগ করবে।

আমি শাহ্কে জিজ্ঞাসা করলাম, রেহেনা কি সেখানে থাকবে। সে বলল, থাকবে।

সনম, ওর স্বামী নাসের, সন্তান আজাদেহ ও আমি মার সঙ্গে ছিলাম। লস এঞ্জেলস থেকে ১৫ বছরের এক কাজিনও আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আমাদের উপমহাদেশে পরিবারের সবাই একসঙ্গে থাকতে চায়। তাই দুই বেডের ওই ফ্ল্যাটে জায়গা একটু কম হলেও কোন সমস্যা হচ্ছিল না। মীর ওর পরিবার নিয়ে শাহ্ সহ আরেক ফ্ল্যাটে ছিল। সেও তার কন্যা ফাতিকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

আমি ফাতির জন্য প্লাস্টিকের কয়েকটি বই এনেছিলাম। সময় পেলে ওগুলো পড়ে ওকে শুনাতাম। ওই ফ্ল্যাটে শীতাতপ যন্ত্র ছিল না, তাই প্রচণ্ড গরম লাগতো। একটা ছোট্ট ব্যালকনি ছিল। বিকেলে সবাই সেখানে বসে গল্প করতাম। ওখানে সকাল, বিকেল, সন্ধ্যাগুলো বেশ উপভোগ্য ছিল। ওখানেই আমি প্রথম জানতে পারি চার বছর আগে এই ভগ্নীদের চার বছর আগে কাবুলে থাকতেই আমার ভাইয়েরা বিয়ে করেছে।

মীরকে দেখে মনে হলো ওর স্ত্রী ফাউজিয়াকে নিয়ে খুব সুখে আছে। কিন্তু শাহ্ ও রেহানাকে দেখে ঠিক তার উল্টোটাই মনে হলো আমার।

এর আগে যেবার ফ্রান্সে আসি,শাহ্ একদিন আমাকে বলেছিল, তোমাকে একটা কথা বলবো। তার আগে তুমি আমাকে কথা দাও আমার সঙ্গে দ্বিমত করবে না।

বললাম, চেষ্টা করবো।

–আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে যাচ্ছি।

শাহর কথা শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। বললাম, মাথা খারাপ করো না গগি। গগি ছিল শাহর পারিবারিক নাম। এ নামে আমরা ওকে ডাকতাম।

বললাম, তুমি এটা করতে পারো না। আমাদের পরিবারে কখনো স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ঘটনা ঘটেনি। আর তোমার বিয়েটা পারিবারিক সিদ্ধান্তও ছিল না। তুমি নিজে পছন্দ করে রেহেনাকে বিয়ে করেছিলে। তোমাকে অবশ্যই ওর সঙ্গেই থাকতে হবে।

এসব শুনে শাহ্ বললো, তুমি আমার চেয়ে তালাকের বিষয়টি নিয়েই বেশী উদ্বিগ্ন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? তোমাদের মধ্যে কি বড় ধরনের কোন সমস্যা হয়েছে?

আশা করছিলাম সবকিছু শুনে হয়তো আমি একটা সমাধানের পথ বলে দিতে পারবো।

কিন্তু সে যা বললো তা খুব দুঃখজনক।

শাহ্ জানালো– বিয়ের কিছুদিন যেতে না যেতেই রেহেনা বদলে যেতে শুরু করে। বিয়ের পর প্রথমদিকে ও আমার প্রতি বেশ মনোযোগী ছিল। আমি বাড়ি ফিরলে আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তো। খাবর গরম করে দিতো। গোসলের জন্য ঠাণ্ডা পানি প্রস্তুত রাখতো। কিন্তু কিছুদিন পর তার মধ্যে পরিবর্তন আসতে থাকে। শেষদিকে আমাকে এককাপ চা এনে দিতেও ওর অনীহা ছিল। একসময় আমাকে ছেড়ে নিজ থেকেই চলে যায় রেহানা। আমি এখন নিঃসঙ্গ।

শাহ্ করুণ স্বরে বললো, নিঃসঙ্গতা আমাকে গ্রাস করেছে। আমার কোন পরিবার

www.pathagar.com

নেই। কোন বাসা নেই। আমি কথা বলার মতোও কাউকে পাইনা। কাজ শেষে বাসায় ফিরে টিভি দেখে সময় কাটাই। শাহ্ বলতে থাকলো- ভেবেছিলাম সন্তান হলে বোধহয় জীবনটা আরেকটু ভালোভাবে কাটাতে পারবো। কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি। এক পর্যায়ে রেহানা আলাদা থাকা শুরু করলো। সে অনেকবার রেহেনার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছে। তাদের মেয়ে ছোট্ট সাসি'র কথা বলেছে। শাহ্ আশা করছিল, রেহানা আবার আগের মতো হয়ে যাবে। সে বললো, এরপরও রেহানা বদলায়নি। মত পাল্টায়নি। তাই আমি ওকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নেই।

শাহকে বললাম, রেহানাও তো নিঃসঙ্গ। তোমরা বিয়ে করার পর বেশ কয়েকটি আরব দেশে থেকেছো। সে তোমার সঙ্গে এমনও দেশে থেকেছে যেখানে ওর কোন বন্ধু বা আত্মীয় স্বজন ছিলনা। এমনকি ওই দেশের ভাষাও বুঝতো না। ভাষা না জানার জন্য টিভি দেখেও কোন মজা পেত না। সেখানে রেহানার সিনেমা-থিয়েটার দেখা, কেনাকাটা করার সুযোগ কিছুই ছিলনা। এমন মানসিক চাপে থাকার পরও সে একটি বাচ্চার জন্ম দিয়েছে।

শাহ'র মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, রেহানার সমস্যাগুলো সম্পর্কে আমার ব্যাখ্যা সে বুঝতে পারছে। শাহ্ বললো, রেহানা চায় আমি আমেরিকা গিয়ে ব্যবসা করি। সে এটাও দাবি করে আমেরিকার 'কালো তালিকা' থেকে সে আমার নাম বাদ দিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু আমেরিকা প্রবাসীর জীবন আমার পছন্দ নয়।

আমি শাহকে প্রস্তাব দিলাম, ইউরোপে থেকে গেলে কেমন হয়? ধরো পাকিস্তান ফেরার আগ পর্যন্ত তুমি এনে থেকে গেলে। শাহকে বুঝালাম, রেহানাসহ তোমরা দুজনে যদি ইউরোপের কোন দেশে থাকো তাহলে ওর সমস্যাগুলো কেটে যাবে। কারণ এখানকার সমাজ রক্ষণশীল নয়। যদি ফ্রান্সে থাকো তাহলে অনেকের সাথে দেখা হবে। রেহানার অনেক বন্ধু হবে। সে একা নিজেও কেনাকাটা বা সিনেমা-থিয়েটার দেখে সময় কাটানোর সুযোগ পাবে। এতে ওর বিষন্নতা কেটে যাবে। সে আগে যেমন ছিল আবারও তেমন হয়ে যাবে। অথবা তুমি মীরের সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডেও থাকতে পারো। আর যদি মনে করো ফ্রান্সে থাকবে তাহলে আমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলি। দেখি তোমাকে ফ্রান্সে স্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করা যায় কি-না।

এসব আলোচনা শেষে শাহকে বেশ রাজী রাজী মনে হলো। কিছুক্ষণ পরে সে আমাকে বললো, ফ্রান্স খুব বিপজ্জনক। এখানে থাকতে হলে আমাকে অবশ্যই অস্ত্রের লাইসেন্স করতে হবে। আমি ওকে আশ্বস্ত করলাম, এটা এখন বলতে পারছি না, তবে চেষ্টা করে দেখবো।

শাহকে বেশ হালকা মনে হলো। সে আমাকে বলল, এখন আমার বুলেট প্রুফ পোশাক প্রয়োজন। এরপর এক দোকানে গিয়ে সে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট কিনল। আমার জন্য নিল আরেকটা। যদিও আমি আমার নিরাপত্তা নিয়ে ততটা উদ্বিগ্ন ছিলাম না।

সে আমাকে বললো, জিয়া কখন আমাকে আক্রমণ করে বসবে এটা তুমি বলতে পারো না। আমি ওকে শান্ত হতে বললাম। সে বললো, আমার কাছে তথ্য আছে, জিয়া আমাকে হত্যা করতে চায়।

আমি শাহকে বললাম, দেখো গগি আল-জুলফিকার অনেক দিন সক্রিয় নয়। তাই জিয়া আপাতত তোমাকে আক্রমণ করবে না বলেই আমার মনে হয়।

www.pathagar.com

উত্তরে শাহ শুধু হাসলো। শান্তভাবে বললো, আমার কাছে এ বিষয়ে তথ্য আছে।

আমি সক্কুর কারাগারে থাকার সময় শাহ ও মীরের জীবন নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম। আমার সব সময় ভয় হতো ওদের কখন কী ঘটে।প্রহসনের বিচারে বাবাকে ফাঁসী দেয়ার পর পরিবারের সবার নিরাপত্তা নিয়ে আমার উদ্বেগ বেড়ে গিয়েছিল। আর এমন পরিস্থিতিতে বাস্তবে ওদের জীবন বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল।

মুক্তির পরে কাবুলে শুনলাম, মীরের স্ত্রী ফাউজিয়ার বাবার বাড়ির এক পুরনো ভৃত্য শাহ ও মীরকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে চেয়েছিল। ওদের সৌভাগ্য যে ওরা মারা যায়নি। শাহ ও মীরের খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু খাবারগুলো কুকুরকে খাওয়ানো হলে কুকুরটি মারা যায়। পরে গৃহভৃত্য এ অপরাধের কথা স্বীকার করে। সে মীর ও শাহর কাছে জীবন ভিক্ষা চায়। ওই ভৃত্য বলেছিল, মুজাহিদেন নামে একটি সংগঠন আমাকে অনেক টাকা দিয়েছিল। তারা জিয়াকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল। পরে শাহ ও মীর ওই ভৃত্যকে ক্ষমা করে দিয়েছিল।

এরপর মীর ও শাহকে আরো একবার মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ওরা দুই ভাই মিলে গাড়িতে করে যাচ্ছিল। হঠাৎ শাহ'র কোন জিনিস গাড়ি থেকে রাস্তায় পড়ে যায়। মীর ও শাহ দুজনেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। শাহ ওটা তুলে নেয়ার মুহূর্তে আততায়ীরা গুলি চালায়। ওদের দুজনের সৌভাগ্য যে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আততায়ীরা মীরকে নয় টার্গেট করেছিল শাহকে।

শাহ এবং মীর কাবুলে থাকার সময় পাকিস্তানের এক পাঠান আদিবাসী ওদের কাছে যায়। সে শাহ ও মীরকে জানায়, জিয়া মীরকে নয় প্রথমে শাহকে হত্যা করতে চায়। জিয়ার নির্দেশ প্রথমে শাহনেওয়াজকে পরে মুর্তাজাকে হত্যা করতে হবে। আর এটা যে সত্যি মীর সেটা আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

মীর ব্যাখ্যা দিল এভাবে- যদিও আমি শাহর চেয়ে অনেক বেশী রাজনীতিতে যুক্ত। কিন্তু শাহ গেরিলাদের নেতৃত্ব দেয়। সামরিক বিষয়েও শাহর অনেক ধারণা। তাই জিয়া আমার চেয়ে শাহকেই ওর জন্য বড় হুমকি বলে মনে করে। এজন্য সে শাহকেই প্রথম টার্গেট করেছে।

এসব শুনে আমি শাহকে বললাম, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তুমি আর মীর কখনো পাকিস্তানের আশেপাশের রুটের কোন বিমানে ওঠবে না। জিয়া বিমান ছিনতাই করে হলেও তোমাদের ধরে ফেলবে। আমার কথা শুনে শাহ হেসে ওঠলো। বললো তুমি আমাদের কথা ভাবছো? তোমার জীবনও নিরাপদ নয়। সে জোর দিয়েই বললো, জিয়া কখনোই আমাকে আর মীরকে ধরতে পারবে না। আমরা যেখাইে যাই সবসময় সঙ্গে বিষ রাখি। জিয়ার হাতে ধরা পড়লে এটা আমি নিজেই খেয়ে নেব। আর এটা করবো ধরা পড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই। আমি অপমানের চেয়ে মৃত্যু পছন্দ করি।

কানে সেদিনের সন্ধ্যাটা বেশ ভালোই কেটেছিল। বাসা থেকে বের হয়ে আমরা প্রথমেই শাহ'র নতুন ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। ওর ফ্ল্যাট ছিল হিলি রোডের ফ্যাশনেবল এলাকা ক্যালিফোর্নিতে। ওই ফ্ল্যাটে শাহ ওর স্ত্রী রেহানাকে নিয়ে ছয় মাস ধরে বাস করছে। আমি

www.pathagar.com

শাহকে স্থায়ীভাবে ফ্রান্সে থাকার অনুমতি দিয়ে দেয়ার পর সে প্রচণ্ড খুশি হয়েছিল। শাহ ও রেহানার সম্পর্ক আবারও ভালো হয়ে এসেছিল। তারা একসঙ্গে পুরো ফ্রান্স ঘুরে দেখেছে। কানে আসার আগে ওরা বসবাসের জন্য মন্টে কার্লো পছন্দ করেছিল। শাহ বেশ উৎফুল্লভাবে আমাদের সবাইকে ওর বাসায় নিয়ে গেল। প্রথমে আমি ওদের মেয়ে সাসীর রুমে ঢুকলাম। বেশ সাজানো গোছানো রুম। বইয়ের তাকে সুন্দরভাবে গোছানো প্রচুর বই। পুতুল ও খেলনা দিয়ে রুমটি ভরা। তবে সব ছিল, পরিপাটি করে গোছানো। ডাইনিং রুম এবং বেডরুম চমৎকারভাবে সাজানো ছিল। বাড়ি থেকে সমুদ্র সৈকত দেখা যায়। এক কথায় বাসাটি ছিল চমৎকার। সব মিলিয়ে ছবির মতো।

আমি রেহানার সঙ্গে যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম। আশা করেছিলাম এর মাধ্যমে সে আমাদের সবার সঙ্গে স্বাভাবিক হয়ে আসবে। রেহানা বেশ ফ্যাশনেবল পোশাক পরেছিল। যদিও ওই পোশাক সমুদ্র সৈকতে যাওয়ার চেয়ে কোন হোটেলে যাওয়ার জন্য অনেক বেশি মানানসই ছিল। আমাদের পরিবারের লোকজন স্বাভাবিক পোশাকই পছন্দ করতো।

শাহ আমাদের সবার জন্য কোল্ড ড্রিংকস বের করতে পাশের রুমে গেল। আমি রেহেনার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু, কেন জানি না, সে আমার সঙ্গে সাচ্ছন্দ্যে কথা বলতে পারছিল না। একটু পর রেহানা ওর ছোটবোনের সঙ্গে কথা বলতে পাশের রুমে চলে গেল। ওরা দুজনেই যথেষ্ট সুন্দরী ছিল। ওরা কেন এমন করছে সেটা আমি বুঝে ওঠতে পারলাম না। আমি শাহ'র মেয়ে ছোট্ট সাসিকে কোলে নিলাম। ওর জন্য আনা উপহারগুলো দিয়ে কিছুক্ষণ সাসির সঙ্গে খেললাম। এ সময় শাহ রান্নাঘরে পিকনিকের বিভিন্ন সরঞ্জাম গুছিয়ে নিচ্ছিল।

এর মধ্যেই বেহজাদ আন্টি ও করিম আংকেল আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। পরিবারের সবাই যখন বেডরুমে গল্প করতে ব্যস্ত, তখন আমি শাহর লেখালেখির ডেস্কে গেলাম। ডেস্কে লাল রংয়ের চমৎকার একটি ফোল্ডার, পাশে তাজা ফুলে ভরা চমৎকার ফুলদানি। শাহ'র সাজানো গোছানো এমন সুন্দর সংসার দেখে আমার মন ভরে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে শাহ নিঃশব্দে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। আস্তে করে বলল, আমাকে এখন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ মনে হয়ে। সব কিছুই আমার মনমতো চলছে।

শাহর ফ্ল্যাট থেকে সবাই সরাসরি সমুদ্র সৈকতে চলে গেলাম। সৈকতে নেমে আমার দুই ভাতিজী সাসি ও ফাতি এদিক সেদিক দৌড়াতে লাগলো। ওরা চিৎকার করে আমাকে বলছিল, ফুপি আমাদের ধরো, আমাদের ধরো। আমিও ওদের পেছনে এমনভাবে দৌড়াচ্ছিলাম যাতে ওদের ধরা না যায়। ওরা বেশ মজা পাচ্ছিল। শাহ চুলা ঠিক করে রান্নার আয়োজন করতে লাগলো। এর মধ্যে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। অবশেষে রান্না হয়ে গেলে শাহ মুরগীর অর্ধেক নিয়ে এসে আমাকে বললো, তুমি প্রথম টুকরোটা খাবে। আমি বললাম, ও গোগি! আমি এতটা খেতে পারবো না।

শাহ বললো না!না! তোমাকে অবশ্যই খেতে হবে। পুরোটা খেয়ে ফেল। পরিবারের সবাই গল্প করছিল আর শাহ ও আমার এমন কাণ্ড দেখে মজা পাচ্ছিল।

www.pathagar.com

অনেকদিন আগে করাচীর বাইরে সমুদ্র সৈকতে আমরা পরিবারের সবাই মিলে পিকনিক করেছিলাম। আমরা সেখানে তাড়াতাড়ি খাবার শেষ করতে ব্যস্ত ছিলাম। কারণ আমাদের মাথার ওপর বড় বড় সামুদ্রিক পাখি উড়ছিল আর ওরা ছোঁ মেরে খাবার তুলে নেয়ার চেষ্টা করছিল।

তখন কে চিন্তা করেছিল, আমরা ফ্রান্সের রিভিয়েরার সমুদ্র সৈকতে আবারও পরিবারের সবাই মিলে এমন পিকনিকে অংশ নিতে পারবো? তবে এবার একত্রিত হওয়াটা সবাই খুব উপভোগ করছিলাম। ওই সময়টায় আমরা সবাই মোটমুটি দুঃশ্চিন্তা মুক্ত ছিলাম।

আমি আমার দুই ভাই-বৌ-এর দিকে খেয়াল করলাম। ওর একটু আলাদা করে এক জায়গায় বসেছিল। ওদের দুজনের এবারই প্রথম সাক্ষাত। মীর সুইজারল্যান্ডে আর শাহ ফ্রান্সে বাস করতো।

খাওয়া শেষে বিশ্রামের জন্য সবাই বাসায় ফিরতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। করিম আংকেল বললেন ,চলো ফিরে যাই। আমিও বেশ ক্লান্তবোধ করছিলাম।

ফিরে যাওয়ার সময় শাহ্ আমাকে বলল, আজ সারারাত একসঙ্গে গল্প করবো। আমি বললাম ঠিক আছে। ক্লান্ত হলেও শাহকে আমি না করতে পারিনি। শাহ্ সব সময় আমাকে হাসিখুশি দেখতে চায়।

সে আমার জন্মদিনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললো, আগামীকালের কথা ভুলো না। আমি কাল তোমাদের শপিংয়ে সহায্য করবো।

আরো কিছু পরিকল্পনার কথা জানালো সে। শেষে রেহানাকে নিয়ে ওদের বাসায় চলে গেল।

বেহজাদ আন্টি ও করিম আংকেলকে লিফট দিতে গেল সনম ও নাসের। আমি, মা, মীর ও ফাউজিয়া বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। মীর আমাদের নামিয়ে দিয়ে ফাউজিয়াকে নিয়ে নিজের ফ্লাটে যাওয়ার সময় বলল, দেড় ঘন্টার মধ্যে আমি ও শাহ্ তোমাকে তুলে নেওয়ার জন্য আসছি। আমি বললাম, ঠিক আছে। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে মীর একাই ফিরে আসলো। সে আমাকে বললো, শাহ্র বাসায় গিয়েছিলাম। কিন্তু শাহ্কে প্রচণ্ড রাগান্বিত দেখলাম।

মীর বলতে থাকলো- আমি শাহ্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম কি ব্যাপার? কিন্তু শাহ্ কোন উত্তর দেয়ার আগেই ওর স্ত্রী রেহানা চিৎকার করে বললো, বেরিয়ে যান! বেরিয়ে যান! এটা আমার বাসা। রেহানাকে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ মনে হলো। সে রাগে কাঁপছিল। শাহ্ আমাকে থাকতে বলেছিল। কিন্তু ভাবলাম, আমি আর ফাউজিয়া চলে এলে রেহানা হয়তো কিছুটা শান্ত হবে। তাই শাহকে রেখেই চলে এলাম।

এসব শুনে মা মীরকে জিজ্ঞেস করলো, ফাউজিয়া কোথায়? মীর জানালো, ফাউজিয়া বাইরে গাড়িতেই বসে আছে। সে কাঁদছে। আর এখনই জেনেভায় ফিরে যেতে চাইছে। মীর বললো, আমি ফাউজিয়াকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে মানতে চাইছে না।

তখন আমি মীর, সনম ও নাসেরকে বললাম তোমরা সবাই নিজ নিজ বাসায় চলে যাও। আমি এখানেই আছি।

ফাতি আমার সঙ্গেই ছিল। পরদিন সকালে সে আমাকে বলছিল, আন্টি আমাকে পড়াও। তখন সকাল ছয়টা বাজে। সনম, নাসের, মীর কেউই বাসায় এসে পৌঁছেনি।

www.pathagar.com

সেদিন অবশ্য সবাই দেরি করে ঘুমিয়েছিলাম। পরে দুপুর একটার সময় কলিংবেল বাজলো। আমি বেল শুনে ভাবলাম শাহ বোধ হয় এসেছে। ছোট্ট ফাতিকে বললাম, তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নাও আমরা কেনাকাটা করতে যাবো।

সনম দ্রুতবেগে ঘরে ঢুকে ওর বাচ্চাকে আমার কাছে দিয়ে বললো, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি বের হও!

আমি বললাম, ব্যাপার কী? কী হয়েছে?

সনম পাশের রুমে ঢুকতে ঢুকতে বলল, রেহানা ওকে জানিয়েছে শাহ বিষ খেয়েছে।

এ কথা শুনে আমার পা যেন নড়ছিল না। আমি স্বাভাবিক হওয়ার জন্য জোরে জোরে গভীর নিঃশ্বাস নিলাম। ওখানে দাঁড়িয়েই সনমকে জিজ্ঞেস করলাম, শাহর অবস্থা কি খুব খারাপ?

- সেটা বলতে পারছি না। আমরা ওর বাসায় যাচ্ছি। বলতে বলতে সনম মা'কে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলাম।

আমার মনে হলো পুলিশকে খবর দেয়া দরকার। আমি ফোন বুকে নাম্বার খুঁজতে থাকলাম। আমি হাসপাতালের নাম্বারও খোজার চেষ্টা করলাম। এমন সময় মা ও সনম ফিরে এলো। ওরা রাস্তায় কোন ট্যক্সি পায়নি। তবে অন্য একটিতে নাসের ও মীর রেহানাকে নিয়ে শাহ'র বাসায় চলে যায়।

আমি মা'কে বললাম, ফ্রান্স আমার জন্য বিপজ্জনক নয়। আমি পুলিশ বা হাসপাতালে ফোন করছি।

মা বললেন, তার চেয়ে তুমি শাহর বাসায় যাও। ওখানে গিয়ে দেখ ওর কি অবস্থা।

আমি তাকে বুঝালাম, আগে হাসপাতালে যোগাযোগ করাই ভালো।

মা আমার হাত থেকে ফোনবুক নিলেন। পর পর তিনটি হাসপাতালে ডায়াল করলেন। তৃতীয় হাসপাতালটি থেকে তিনি রেসপন্স পেলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মীর বাসায় এসে ঢুকলো। মীরকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। তার মুখ থেকে কথা সরছিল না। আস্তে আস্তে বলল, শাহ মারা গেছে। ওর কথা শোনা গেলনা। আমি ওর ঠোটের নড়াচড়া দেখেই বুঝে ফেললাম।

আমি চিৎকার করে ওঠলাম। না!

মা'র হাত থেকে ফোন সেট নীচে পড়ে গেল। মীর মাকে বলল, গোগি আর নেই। আমি ওর মৃতদেহ দেখে এলাম। ওর শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এ কথা শুনে মা হু হু করে কেঁদে উঠলেন।

আমি চিৎকার করে মীরকে বললাম, তুমি অ্যাম্বুলেন্স ডাকো। শাহ বেঁচে থাকতে পারে। ওকে অবশ্যই হাসপাতালে নিতে হবে।

মা কাঁদতে কাঁদতে টেলিফোন সেটটি নীচ থেকে তুলে নিলেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তখনও লাইনে ছিল। অপর প্রান্ত থেকে অপারেটর বলছিল, বলুন কোথায় যেতে হবে। আমরা দ্রুত শাহ'র বাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

শা'হর বাসায় গিয়ে দেখলাম,তার দেহ বেডরুমে কার্পেটের ওপর পড়ে আছে। গত রাতে যে পোশাক পরেছিল তাই আছে। ওকে দেখে মনে হলো, ঘুমিয়ে আছে।

www.pathagar.com

গোগি! গোগি! বলে চিৎকার করে আমি ওকে জাগানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলাম।

ইতোমধ্যে অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছেছে। আমি ওদের একজনকে শাহ'র নাকে অক্সিজেন লাগাতে বললাম। ওদের একজন শাহ'র পাল্‌স দেখছিল। আরেকজন কৃত্রিম শ্বাস দেয়ার চেষ্টা করছিল।

ওদের একজন শান্ত গলায় বলল, সে মারা গেছে।

আমি চিৎকার করে বললাম, না! আপনারা চেষ্টা চালিয়ে যান।

মীর আমাকে বললো, ওর দেহ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কয়েক ঘন্টা আগেই শাহ মারা গছে।

আমি ঘরের চারিদিকে তাকালাম। দেখলাম টেবিলে একটি ছোট্ট কাপে বাদামী রংয়ের কিছু তরল পদার্থ রাখা। ফুলদানি নিচে পড়ে আছে। বিছানাও এলোমেলো। আমি ওর লেখালেখির ডেস্কের দিকে তাকালাম। দেখলাম ওর ফাইলগুলো খোলা, এলোমেলো।

আমার মনে হলো এখানে ভয়ংকর কিছু ঘটেছে। একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানেন কখন থেকে শাহর মৃতদেহ এখানে পড়ে আছে। কিন্তু কেউ টের পায়নি!

আমি ধারণা করলাম, কেউ শাহ'র ফোল্ডার থেকে বেশ কিছু কাগজপত্র সরিয়ে ফেলেছে।

আমি রেহানার দিকে তাকালাম, ওকে দেখে মনেই হচ্ছিল না একটু আগেই স্বামীকে হারিয়েছে। ওর চুল পরিপাটি করে সাজানো। পরনের জ্যাকেটে কোন ভাঁজ নেই।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার ভাই কতক্ষণ আগে মারা গেছে? রেহানা আমার দিকে তাকালো। আমি ওর চোখে পানি দেখলাম না। উত্তরে ওর শুধু ঠোঁট নড়তে দেখলাম। কিছু শুনতে পেলাম না। পাশে দাড়িয়ে থাকা রেহানার বোন ফাউজিয়া বলল, বিষ পান করেছে।

আমি চিৎকার করে বললাম, শাহ বিষ পান করেছে? এটা আমি বিশ্বাস করিনা। কেউ এটা বিশ্বাস করবে না। শাহনেওয়াজ কেন বিষ খাবে!

গত রাতে আমি শাহকে যেমন উৎফুল্ল দেখেছি, এমন উৎফুল্লতা খুব কম সময়েই তাকে দেখেছি। সে তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা করে রেখেছিল। আগস্টেই তার আফগানিস্তানে ফেরার কথা ছিল।

আমার চিন্তা হলো, জিয়া কি শাহ'র পরিকল্পনা বুঝতে পেরেছিল? তাই সে শাহকে কৌশলে হত্যা করলো? কিংবা সিআইএ তাদের বন্ধু স্বৈরশাসক জিয়াকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে শাহকে হত্যা করলো?

সনম শান্ত গলায় বলল, শাহকে কোন কিছু দিয়ে ঢেকে দেয়া উচিত। কেউ একজন সাদা প্লাস্টিক নিয়ে এসে শাহ'র নিথর দেহ ঢেকে দিল।

ছোট ফাতি আমার শার্ট টেনে ধরে জিজ্ঞাসা করলো, ফুপি! ফুপি ! কী হয়েছে? আমি বললাম, না মা তেমন কিছু নয়। শাহ'র মেয়ে তিন বছরের সাসিকে খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। ওকে খুব উদ্বিগ্নও মনে হলো। সে বাবার মৃতদেহের পাশে চুপটি করে বসে ছিল।

মা বললেন, শিশুদের এখান থেকে নিয়ে যাও। আমি সাসি ও ফাতিকে নিয়ে পাশের রুমে গেলাম। সেখানে ওদের খেলনা দিলাম। আবারও এ রুমে ফিরে এলাম।

একটু পর পুলিশ আসলে মীর আমাকে পাশের ঘরে যেতে বললো। আমি রান্নাঘরে ঢুকলাম। সেখানে দেখলাম, চুলা জ্বালানো। ডিম ও টমেটো রান্না হচ্ছে। প্রচণ্ড অবাক

www.pathagar.com

হলাম। কে রান্না করছে? কার জন্য রান্না হচ্ছে? পাশেই ফ্রিজ থেকে বের করা এক বোতল দুধও দেখলাম।

কিছুক্ষণ পরেই মীর রান্নাঘরে এসে বলল, পুলিশ শাহ'র মৃতদেহ নিয়ে যেতে চাইছে। তারা বলছে, এটা হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে। মীরকে প্রচণ্ডভাবে কাঁদতে দেখলাম। পরে মীর আমাকে জানিয়েছিল, ওই দিন চোখের পানি মুছে রান্নাঘরের ময়লার পাত্রে টিস্যু ফেলার সময় সে খালি বিষের বোতল পড়ে থাকতে দেখেছিল।

ফ্রান্সের পুলিশ বেশ কয়েক সপ্তাহ শাহনেওয়াজের দেহ আটকে রাখলো। পুলিশ শাহ'র দেহ নিয়ে যাওয়ার পর থেকেই সবাই মা'র ফ্ল্যাটে থাকছিলাম। সেখানে চরম যন্ত্রণাদায়কভাবে দিনগুলি কাটছিল। আমরা মুসলমানরা সাধারণত ২৪ ঘন্টার মধ্যে মৃত ব্যাক্তিকে দাফনের চেষ্টা করি। কিন্তু পুলিশ শাহ'র দেহে পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালাতে থাকলো। আমরা বুঝতে পারছিলাম না আমাদের কী করা উচিত। কেঁদে-কেটে, বসে-শুয়ে আমরা চরম বিষণ্ন সময় কাটাচ্ছিলাম। খাবারের প্রতি কারও কোন আগ্রহ ছিল না।

শাহ'র মেয়ে সাসি ওর খালা ফাউজিয়ার কাছে ছিল। তদন্ত কাজে সহায়তার জন্য ওর মা রেহানাকে প্রতিদিন পুলিশের কাছে যেতে হতো। সনম এবং মীরের মেয়ে আমাকে ধরলো, ওরা বেড়াতে যাবে। শিশুদের আবদারে আমি ওদের সঙ্গে করে পার্কে গেলাম। ওই সময় আমি মাঝে মাঝেই ওদের পার্কে নিয়ে যেতাম। কখনো কখনো মীর আমাদের সঙ্গে থাকতো। একদিন ওদের সঙ্গে শাহর মেয়ে সাসিকেও সঙ্গে নিলাম। ওরা যখন খেলা করেতো, আমি ও মীর চুপ করে বসে থাকতাম। সাসির জন্য আমার প্রচণ্ড খারাপ লাগতো। শাহ যতক্ষণ বাসায় থাকতো, সে বাবার পাশে পাশেই থাকতো। শাহ ওকে সকালে ঘুম থেকে জাগাতো, নাস্তা খাওয়াতো, গল্প শোনাতো। ওই বয়সেই সাসি বুঝতে পেরেছিল ওর বাবা নেই। একদিন পার্কে খেলা শেষে মীরের মেয়ে ফাতি যখন ওর বাবার হাত ধরলো, সাসি খুব করুণভাবে বলে উঠলো, আমার বাবা নেই। পার্ক থেকে ফেরার পথে গাড়ী থেকেই সেদিনের পিকনিক স্পট দেখিয়ে দিতে দিতে সাসি বলে ওঠলো, বাবা শাহ! বাবা শাহ!

বাসায় যে কার্পেটের ওপর শাহ'র মৃতদেহ পড়ে ছিল, পুলিশ তদন্তের স্বার্থে কার্পেটের সেই অংশটুকু কেটে নিয়েছিল। রেহানা পরে আরেকটি কার্পেট দিয়ে ওই জায়গা ঢেকে দেয়। সাসি তার বাবার মৃতদেহ পড়ে থাকার জায়গাটুকু চিহ্নিত করে রেখেছিল। পার্ক থেকে গাড়িতে করে ফেরার পথে সে আরো কয়েকবার বলল, পাপ শাহ! বাবা শাহ!

আমি সাসিকে ওদের বাসায় দিতে গেলাম। সাসির খালা ফাউজিয়ার কোলে দেয়ার সময় সে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। সাসি আমার সঙ্গেই আসতে চাচ্ছিল। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে শান্ত করে ওকে সেখানে রেখে মার ফ্ল্যাটে ফিরলাম।

কানে'র দিনগুলো ক্রমেই দুঃসহ হয়ে উঠছিল। পুলিশ শাহ'র দেহ কবে ফেরত দেবে তারও ঠিক নেই। শাহ'র সঙ্গে আমার স্মৃতি গুলো সব সময় ভেসে উঠতে লাগলো। যেখানেই যেতাম চোখের সামনে ভেসে উঠতো সেই স্মৃতিগুলো।

শাহকে হারানোর কষ্টটা আরো তীব্র হতো যখন দেখতাম, পাকিস্তানের মিডিয়ায় ওর

www.pathagar.com

মৃত্যুর ঘটনাকে বাজেভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। বিশেষ করে সরকারি মিডিয়ায় শাহকে জুয়াড়ি, মদ্যপ বলে অভিহিত করা হয়। রিপোর্টে সে বিষাদগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে চালিয়ে দেয়া হয়। পরীক্ষাগারের রিপোর্টে মদ খাওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত না হলেও পাকিস্তানী মিডিয়া এটা লিখেই যাচ্ছিল। ভাবতাম, শাহ নেওয়াজ এখন নেই। তাই শত্রুরা ওর সম্মান নষ্ট করতে এসব করে যাচ্ছে।

এক বিকেলে পরিবারের সবাইকে জানালাম, শাহকে আমি পাকিস্তানে দাফন করতে চাই। মা সঙ্গে সঙ্গে এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমি এক ছেলেকে হারিয়েছি, মেয়েকে হারাতে চাই না। আমি তখন মাকে বোঝাতে থাকলাম, শাহ সবসময় বলতো বাবাকে কোথায় কবর দেয়া হয়েছে? কবরের ছবি দেখতে চাইতো। তাই লারাকানায় বাবার কবরের পাশেই ওকে সমাহিত করতে চাই আমি। তারপরও মা রাজী হননি।

মা মীরকে বললেন, ওকে বোঝাও। ও যেন এমনটা না করে।

মীর কী করবে!

সে আমাকে বললো, তুমি পাকিস্তানে গেলে আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। এটা বলে সে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। কারণ আমরা সবাই জানতাম, জিয়া মীরকে হত্যার জন্য ওত পেতে আছে।

বেহজাদ আন্টি বললেন, তোমাদের কারও যাওয়ার দরকার নেই। আমি যাবো। সনম এবং নাসেরও যেতে চাইলো।

আমি বললাম, ঠিক আছে সবাই পাকিস্তানে যাবে। তবে আপাতত আমি শাহকে দাফনের জন্য দেশে যাব। আমি চাইনা শাহর দাফন লুকিয়ে লুকিয়ে হোক। সম্মান ও মর্যাদার সাথে আমি ওকে চিরবিদায় জানাতে চাই।

ফ্রান্সে শাহ'র ময়না তদন্তের সময় আমি লণ্ডনে আমাদের বাসার খোজ খবর নিলাম। সেখানে পার্টি অফিসে এসে অনেকেই সমবেদনা জানিয়েছে। অনেকেই এর পেছনে জিয়ার হাত আছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করলো।

শাহ'র মৃত্যুর পর পাকিস্তানেও শোক ছড়িয়ে পড়েছিল। করাচীতে ৭০ ক্লিফটন রোডের বাসার সামনে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক জড়ো হতো। তারা শাহ'র আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া চাইতো। যে পত্রিকাগুলোতে শাহকে বাজেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল এমন কিছু পত্রিকাও পুড়িয়ে ফেলার ঘটনা ঘটেছিল। সিন্ধুতে ব্যবসায়ীরা দোকান-পাট বন্ধ করে শোক প্রকাশ করেছিল।

জুলাইয়ের প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে লারাকানায়ও প্রচুর মানুষ উপস্থিত হচ্ছিল প্রতিদিন। তারা শাহ নেওয়াজের দাফনে শরীক হতে সেখানে আসছিল। কোথাও জায়গা না পেয়ে ফুটপাতে, রেলস্টেশনে রাত কাটাচ্ছিল কেউ কেউ। পাকিস্তানে আমার বন্ধুরা এসব বিষয় আমাকে জানাতো।

শাহ'র ময়না তদন্ত শেষ হয়েছে। ওকে দেশে নিতে তাই আমি করাচী ও লন্ডনে যোগাযোগ করতে লাগলাম। পাকিস্তানে সরকারি মিডিয়া শাহ'র মৃতদেহ দেশে পৌছার

www.pathagar.com

বিষয়ে জনগণকে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিচ্ছিল। আমি বন্ধুদের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য দেশের মানুষকে জানাতাম। কানে পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে আমি কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। কারণ জিয়ার অনুচররা যদি শাহকে হত্যা করে থাকে তাহলে ওরা আমাদের অন্য কাউকে হত্যা করবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে? আমি বিষয়টি ফ্রান্স পুলিশকে জানালে তারা আমাদের নিরাপত্তা ব্যাবস্থা নেয়।

ময়না তদন্ত শেষে পুলিশ শাহ'র দেহ আমাদের কাছে হস্তান্তর করে। আমরা শাহ জন্য দোয়া করলাম। শাহ'র স্মৃতিগুলো ভেসে ওঠলে লাগলো। ছোট্ট, খুব ছোট্ট শাহ, যাকে আমি সব সময় আগলে রাখতাম। সেই শাহ আমি হার্ভার্ডে পড়ার সময় যে কাঁচা হাতে চিঠি লিখতো। সেই শাহ, যে হ্যাণ্ডসাম শাহকে কানে এসেই আমি দেখতে পেয়েছিলাম।

শাহ'র মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে দেখলাম, ওর মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেছে। ময়না তদন্তের সময় কাটাছেড়া করায় ওর মুখে সাদা রং জাতীয় কিছু লাগিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে ওই দাগগুলো দেখা না যায়। এ দৃশ্য ছিল চরম হৃদয় বিদারক।

ওহ্ গোগি! তোমার এ কি অবস্থা! সবাই বিলাপ করতে থাকলো। আমি নিজের অজান্তেই আমার মুখে আঘাত করতে থাকলাম। বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠলো। এ পরিস্থিতিতেও আমরা সবাই নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলাম। গাড়িতে করে শাহর মৃতদেহ বাইরে নিয়ে গেলাম। সেখানে ফটোসাংবাদিকরা অপেক্ষা করছিলেন।

১৯৮৫ সালের ২১ আগস্ট শাহকে পাকিস্তানে নিয়ে গেলাম। সরকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও লারাকানায় শাহকে দাফনের অনুমতি দেয়। তবে তারা চেষ্টা করেছিল দেশের বাইরেই যাতে শাহকে দাফন করা হয়। কিন্তু ভুট্টো পরিবারের প্রতি জনগণের আবেগের ভয়ে সরকার এ সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হয়।

সরকার শাহ'র মৃতদেহ করাচী থেকে বিমান যোগে মহেঞ্জোদারো এবং সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে লারাকানায় আমাদের পারিবারিক কবরস্থানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। লারাকানায় সরকার হ্যালিপ্যাডও তৈরি করে। জনগণের হৃদয় থেকে শাহকে মুছে ফেলতে সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাফন কাজ শেষ করতে চাইছিল। কিন্তু আমি সেটা প্রত্যাখ্যান করি। শাহ আট বছর পর দেশের মাটিতে ফিরেছে। আমি চেয়েছিলাম ওকে করাচির ৭০ ক্লিফটন রোডের বাসায় নিতে -যেখানে ওর জন্ম। সেখান থেকে লারাকানার আল- মুর্তাজা এলাকায়। আমি চাচ্ছিলাম পাকিস্তানের এ সাহসী সন্তানের শেষ বিদায়ে জনগণ তাকে শ্রদ্ধা জানাবে।

পরে সরকারের সাথে আমার সমঝোতা হয়। শাহ'কে করাচীর ক্লিফটন রোডের বাসায় নেয়া হয়নি। তবে তাকে লারাকানায় আল-মুর্তার্জা এলাকায় নেয়া হয়। লারাকানায় আমাদের বাড়ি ছিল একেবারেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ওপরে রিপোর্ট পাঠায় সেখানে উপস্থিত লোকজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হবে। আর কোন কারণে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তা সামাল দেয়া সম্ভব হবে না। রিপোর্ট পেয়ে সেনাবাহিনী সিন্ধুর প্রধান প্রধান অনেক সড়ক বন্ধ এবং বিভিন্ন পয়েন্টে বাস, ট্রাক, ট্রেনে তল্লাশী চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এছাড়া কারাগারে এবং গৃহবন্দী পিপলস পার্টির নেতাদের ব্যাপারে সতর্কাবস্থা জারি করে

www.pathagar.com

সরকার। আর এ সময় যাতে কোন অসন্তোষ না ঘটে সেজন্য সামরিক শাসন তুলে নেয়ারও ঘোষণা দেয় সেনাবাহিনী।

আমি শাহ'র মৃতদেহ নিয়ে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়ার আগে জানতে পারি, জিয়া প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ খান জুনেজো'র সঙ্গে বৈঠকের পর ঘোষণা করেছেন ডিসেম্বরে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে।

শাহ'র কফিন নিয়ে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে করে আমরা করাচী পৌঁছলাম। দেখলাম সবাই কালো ব্যজ পরেছে। কালো পোশাক পরেছে। সেখান থেকে মহেঞ্জোদারোয় যাওয়ার জন্য শাহকে আরেকটি ছোট বিমানে তোলা হলো। পিপলস পার্টির পতাকা দিয়ে শাহ'র দেহ ঢেকে দেয়া হলো। করাচীতে আমাদের সঙ্গে স্থানীয় আত্মীয় স্বজনরা যোগ দিলেন। ৭০ ক্লীফটন রোডের বাসা যারা দেখাশুনা করতেন তারাও এসে বিলাপ করতে থাকলেন।

'চলো, চলো সবাই যাই। লারাকানায় যাই। তোমরা কি জানোনা আজ শাহনেওয়াজ আসছে? শাহনেওয়াজ, জুলফিকার আলী ভুট্টোর ছেলে শাহনেওয়াজ। যোদ্ধা শাহনেওয়াজ, যে তোমার -আমার জন্য জীবন দিয়েছে। আসো, আসো, সবাই আসো। চলো, চলো সবাই যাই, এক নায়ককে স্বাগত জানাই।"

এ সুন্দর গানটি লেখা হয় আমার ভাই শাহকে উদ্দেশ্য করে। পাকিস্তান জুড়ে গানটি গাওয়া হচ্ছিল। সরকারি ভীতি উপেক্ষা করে লারাকানায় ছুটছিল হাজার হাজার মানুষ। শাহনেওয়াজের দাফনে অংশ নেয়ার জন্য অনেকেই কয়েকদিন আগে থেকে সেখানে অবস্থান করছিল।

সকাল দশটার দিকে মহেঞ্জোদারোয় এসে বিমান থামলো। সেখানে কালো ব্যাজ পরা হাজার হাজার লোক শাহর জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা সরকারের ভয়ে ভীত হয়নি। রাস্তায় রাস্তায় সেনাবাহিনীর তল্লাশী, সড়ক অবরোধ কিছুই দমিয়ে রাখতে পারেনি শোকার্ত মানুষের ঢল। পরে বিভিন্ন পত্রিকায় দেখেছিলাম শাহ'র দাফনে দশ লাখেরও বেশি মানুষ অংশ নেয়।

শাহ'র কফিন বিমান থেকে নামিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময় সমবেত জনগণ, 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিতে থাকলো। কফিন নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স চলা শুরু করলে দোয়া পড়তে থাকলো শোকার্ত জনতা।

শাহ মাত্র ২৭ বছর বয়সে মারা যাবার পর শেষ বিদায়ে যে সম্মান পেল বোধ হয় অনেক দেশের সরকার প্রধানরাও তা পান না। কার, মোটর বাইক সহ প্রায় দুই হাজার গাড়ী শাহ'র কফিনবাহী অ্যাম্বুলেন্সকে অভিভাবাদন জানিয়ে এগিয়ে নিতে থাকে। মহেঞ্জোদারো বিমানবন্দর থেকে লারাকানা পর্যন্ত প্রায় পুরো রাস্তায় জনতা কফিনবাহী গাড়িতে ফুলের পাপড়ি ছিটাতে থাকে। টুপি খুলে, মাথা দুলিয়ে যার যার মতো করে শাহনেওয়াজকে শেষ বিদায় জানান তারা।

আমি ভাবতে থাকলাম, শাহকে সন্ধ্যার আগেই সমাহিত করতে হবে। তার আগে ওকে আমাদের পুর্বপুরুষের ভিটা আল-মুর্তাজা এলাকায় নিতে হবে। শেষ গোসল করিয়ে কাফন

www.pathagar.com

পরাতে হবে। আত্মীয় স্বজনরা শেষ বারের মতো ওকে এক নজর দেখবে। নারীরা যেহেতু কবরস্থানে যেতে পারবে না, তারা এখানেই শাহ'র জন্য দোয়া করবেন। লারাকানায় বাবার পাশে ওকে সমাহিত করতে হবে। আবার সমাধি তৈরির জন্য স্থান নির্ধারণ করতে হবে। ভাবতে ভাবতে আমরা আল-মুর্তাজা এলাকার কাছে এসে পড়লাম। জনগণ সেখানে মানব দেয়াল তৈরি করেছে। আমি চালককে গারহি দিকে যাবার নির্দেশ দিলাম, 'সোজা গারহিতে যাও।'

সেখানে আমাদের পারিবারিক কবরস্থানে দাদা ও বাবার পাশে শাহ'কে কবর দেয়ার জায়গা চিহ্নিত করলাম সনম ও আমি। তারপর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলাম। আত্মীয় স্বজন এবং পিপলস পার্টির নারী কর্মীরা সেখানে শাহকে এক নজর দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল। প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামিয়ে কফিন রাখা হলো ড্রয়িং রুমে। রুমে শোকার্ত মানুষের ভীড় এতটাই বেড়ে গেল যে তাদের সামলানোর জন্য কোন উপায় না দেখে আমি হাতজোড় করে তাদের বেরিয়ে যেতে বললাম। শাহ'কে শেষ গোসল ও কাফন পরানোর জন্য দাদার রুমে মৌলভী অপেক্ষা করছিলেন। আমি চাইলাম সেখানে নেয়ার আগেই নিকট আত্মীয়রা শেষবারের মতো শাহ'র মুখ দেখুক।

ওর মুখ থেকে কাপড় সরানোর সঙ্গে সঙ্গে শোকের মাতম ছড়িয়ে পড়লো। অনেকে কফিনে নিজের মাথা ঠুকে রক্ত বের করে ফেলল। আমি কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে বললাম, আপনারা থামুন! দয়া করে এমন করবেন না। পরিস্থিতি সামাল দিতে কফিন দ্রুত দাদার রুমে নেয়া হলো। শাহকে ইসলামী বিধান মতে গোসল করানো শুরু হলো। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে একজন বেরিয়ে এসে আমাকে বলল, ওহ বাবা! ওর সারা দেহই তো কাটা ছেড়া করা। সে বলতেই থাকলো, নাক কাটা, পেট কাটা..... । আমি চিৎকার করে বললাম চুপ! অনেক হয়েছে!

একটু পরে সনমের স্বামী নাসের এসে বলল, মনে হয় দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সব কাজ আরও দ্রুত করা উচিত। গোসল শেষে কাফন পরানোর সময় আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম কাফনে জড়িয়ে শাহ'র দেহ শক্ত কাঠের বাক্সের মধ্যে নিয়ে কবরের দিকে যেতে হবে। ময়না তদন্তের সময় ওর শরীর খুব বেশি কাটাছেড়া করা হয়েছে। তাই এ সিদ্ধান্ত। শাহকে কাফনে জড়িয়ে আবার ড্রয়িং রুমে আনতে বললাম। সেখানে মহিলা আত্মীয় স্বজনরা তার জন্য দোয়া করবেন। কিন্তু কাফন পরানোর পর শাহ'র দেহ সরাসরি অ্যাম্বুলেন্সে নেয়া হলো। নাসের কফিনের পেছনে ছিল। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলাম আমার প্রিয় ভাইকে কবর দেয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গাড়ি চলা শুরু করলে আমার বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠলো। এটা ছিল আমার জীবনের চরম হৃদয় বিদারক দৃশ্য। মনে হলো আমি দৌড়ে গিয়ে গাড়ি থামিয়ে দিই। যাতে আমার কাছ থেকে শাহকে কেউ নিতে যেতে না পারে। আমি বলতে থাকলাম, যেওনা, গোগি! যেওনা। আমার সঙ্গে থাকো। শাহ'র কফিন নিয়ে গাড়ি ধীরে ধীরে এগুতে থাকলো।

পাকিস্তানের জনগণ ভুট্টো পরিবারের এই ট্রাজেডিকে ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় কারবালার ট্র্যাজেডির সঙ্গে তুলনা করলো। লাখ লাখ জনতা শোকের মাতম তুলে কবরস্থানের দিকে যেতে থাকলো।

www.pathagar.com

পরে আমরাও আমাদের পারিবারিক কবরস্থানের দিকে রওয়ানা হলাম। কবরস্থানে লাখ লাখ শোকার্ত মানুষের ঢলে চারপাশে উপচে পড়েছে। সেখানে ঢোকার মতো কোন অবস্থা ছিলনা। অনেক কষ্টে সেখানে পৌছলাম। শাহর কফিন গাড়ি থেকে নামিয়ে আনা হলো। আমি কফিনের সামনের অংশ ধরলাম। ধীরে ধীরে কবরের দিকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছিল শাহকে। কবরের খুব কাছে গিয়ে আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। কেউ একজন আমাকে তুললো। শোকার্ত মানুষের চাপে শাহর দেহ কফিন থেকে বের করার মতোও কোন জায়গা ছিল না। অবশেষ শাহকে বের করা হলো। কেউ কেউ শাহকে শেষবারের মতো দেখতে মুখের কাপড় সরাতে বলল। কিন্তু আমি তা নাকচ করেছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে লাখ লাখ শোকার্ত মানুষের দোয়া, ভালোবাসায় শেষ শয্যায় শায়িত করা হলো আমার প্রিয় গোগি, জুলফিকার আলী ভুট্টোর ছেলে শাহ নেওয়াজকে।

এর পাঁচদিন পর করাচীতে আমাকে গ্রেফতার করলো সামরিক সরকার। আমি এতে এতটুকু অবাক হইনি। এর আগে জিয়া বিভিন্ন মিডিয়ায় বলেছিল শাহকে দাফনের জন্য বেনজির দেশে ফিরলে তাকে গ্রেফতার করা হবে না। সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রীও এমন কথা বলেছিল।

শাহ'র দাফনে অংশ নিতে লারাকানায় যারা সেনাবাহিনীর ব্যারিকেড ভেঙ্গেছিল তাদেরও হয়রানি করা শুরু করে সামরিক সরকার। আমি নিশ্চিত, শাহ'র দাফনে লাখ লাখ জনতার অংশগ্রহণ দেখে ভীত জিয়া আমাকে গ্রেফতার করে। শাহ'র মৃত্যুর কারনেই সামরিক আইন প্রত্যাহারের তারিখ ঘোষণা দিতে বাধ্য হয় জিয়া। আমার মনে হলো এর প্রতিশোধ নিতেই সে হাজার হাজার মানুষকে হয়রানি করতে থাকে।

শাহকে দাফন করার পর ওইদিন সন্ধ্যায় এক সভায় পিপিপি'র অনেক নেতাই জিয়ার বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠা জনগণের আক্রোশকে কাজে লাগানোর প্রস্তাব দেন। আবার অনেকের মতে এটা করলে সরকার সামরিক আইন প্রত্যাহার নাও করতে পারে। তারা মত দেন, এমন কিছু করা যাবে না যাতে সরকার মার্শাল ল' প্রত্যাহার থেকে সরে আসে।

সভায় আমি বললাম, সামরিক আইন দেশের জন্য অভিশাপ। আমাদের এমন কাজ করতে হবে যাতে জিয়া এটা তাড়াতাড়ি প্রত্যাহার করে। শাহ' দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে। এখন কোন অস্থিরতা সৃষ্টি করলে সরকার এটাকে অজুহাত হিসেবে নেবে এবং মার্শাল ল' প্রত্যাহার থেকে বিরত থাকবে। আমাদের অবশ্যই এ বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে।

শাহকে দাফনের তিনদিন পরে 'কুলখানি' অনুষ্ঠিত হলো। মুসলমানদের রীতি অনুযায়ী দাফনের চল্লিশ দিন পর 'চেহলাম' অনুষ্ঠানের কথা। কিন্তু আমি জানতাম পাকিস্তানে এত দীর্ঘ সময় জিয়া আমাকে মুক্ত রাখবে না। তাই আমি আগে থেকেই সতর্ক ছিলাম।

মৌলভীদের সাথে কথা বলে ফ্রান্সে শাহ'র মৃত্যুর পর থেকে চল্লিশ দিন হিসাব করে 'চেহলাম'র তারিখ ঠিক করলাম।

বেশ ভালোভাবেই 'কুলখানি' শেষ হলো। আমি বিকেলের দিকে ফুল নিয়ে শাহ'র কবরে গেলাম। সেখানে প্রচুর লোক শাহ'র আত্মার মাগফেরাত কামনায় মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া করছিল। আমি কবরের ওপরে ফুল দিলাম। দোয়া করলাম। আমার প্রচণ্ড কষ্ট

www.pathagar.com

হচ্ছিল। হায় শাহনেওয়াজ!

কুলখানির পরের রাতে সনম করাচী ফিরতে চাইলো। আমিও আল মুর্তাজায় একা না থেকে ওদের সঙ্গে করাচী ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই ভেবে সান্ত্বনা পেলাম যে পরিবারের অন্ততঃ একজনের সঙ্গে থাকতে পারছি। আল-মুর্তাজা থেকে আমরা দুই বোন করাচীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

করাচী বিমানবন্দরে হাজার হাজার মানুষ আমাদের স্বাগত জানায়। বিমানবন্দরে নেমে জনতার চাপে আমরা গাড়িতে উঠার মতো জায়গা পাচ্ছিলাম না। পরে পিপলস পার্টির নেতাকর্মীরা আমাদের গাড়িতে ওঠতে সহায়তা করে। চারিদিকে জনতার ঢেউ যেন উপচে পড়ছিল। সেদিন বিমানবন্দর থেকে ৭০ ক্লিফটন রোডের বাসায় পৌঁছতে আমাদের কয়েকঘন্টা সময় লেগেছিল। গাড়ির চারিদিকে দলীয় নেতা কর্মীদের মোটর বাইক কর্ডন করে আমাদেরকে বাড়ির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পথে তারা রাজনৈতিক শ্লোগান দেয়। শ্লোগানে শাহনেওয়াজের প্রতি শোকও প্রকাশ পায়।

আমাদের বাড়ির চারিদিকে জনতা ভীড় করছিল। আমি গাড়ি থেকে নেমে তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিলাম। তাদের ধন্যবাদ জানালাম। সেখানে দলীয় অনেক চেনামুখ দেখতে পেলাম। তারা জিয়ার প্রতিহিংসার শিকার হয়ে বিভিন্ন মেয়াদে কারাবাস করেছে। জনতার উদ্দেশ্যে আমি বললাম, আমার ছোট ভাই শাহনেওয়াজ যে মতবাদে বিশ্বাসী ছিল, অনেকেই সেই মতবাদের সঙ্গে একমত নাও হতে পারে। তবে সে ছিল স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে। জনগণের পক্ষে। পাকিস্তান যখন সামরিক শাসনের যাতাকলে পিষ্ঠ তখন সে চুপ থাকতে পারেনি। তার নীতি সেটা ছিল না।

বক্তব্যে শাহ'র দাফনে অংশ নেয়া সহ সার্বিক সহযোগিতার জন্য পাকিস্তানের জনগণকে আমি ধন্যবাদ জানালাম।

বক্তব্য শেষে পিপলস পার্টির দুই কর্মীর কথা আমার মনে পড়ে গেল। নাসের বালুচ এবং আয়াজ সামু। পাকিস্তানের গণতন্ত্রের জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করেছে। বলি হয়েছে সামরিক সন্ত্রাসের। আমি তাদের নিজের ভাইদের মতো দেখতাম। বিভিন্ন সভায় আমার নিরাপত্তায় তারা আমাকে ঘিরে রাখত। এরা আমাকে নিজের বোন মনে করত। আমি ওদের বাড়ি গিয়ে পরিবারের কাছে সমবেদনা জানিয়েছিলাম। দুঃখ ভাগাভাগি করে নিয়েছিলাম।

২৭ আগস্ট খুব সকালে পুলিশ আমাদের ক্লিফটন রোডের বাড়ি ঘিরে ফেলে। তারা অস্ত্র ও টিয়ার গ্যাস নিয়ে বাড়ির চারদিকে অবস্থান নেয়। সরকার এ বাড়িকে সাব জেল ঘোষণা করে আমাকে ৯০ দিনের আটকাদেশ দেয়। আমাকে আটকের কারণ হিসেবে সামরিক সরকার ব্যাখ্যায় বলে– সরকারের সতর্কতা সত্ত্বেও দেশের ঝুঁকি ও সন্ত্রাসপ্রবণ এলাকাগুলোতে আমি যাচ্ছি। এ কারনেই আমার বিরুদ্ধে আটকাদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমি এধরনের কোন সতর্কতা সরকারের কাছে পাইনি। সামরিক সরকার 'মালির' ও 'লেয়ারি' এ দুই অঞ্চলকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে ঘোষণা করে। করাচীর ওই দুই এলাকার বাসিন্দা ছিলেন জিয়ার সামরিক শাসনের বলি নাসের বালুচ ও আয়াজ সামু। পরে বিভিন্ন সময়ে নাসের ও আয়াজের পরিবারকে দারুণ হয়রানি করেছিল জিয়া সরকার। সরকারের ওই দুই এলাকাকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা আমাকে বিস্মিত করেনি।

আমাকে বন্দী করার পর মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক মুখপাত্র বলেন, সাংবিধানিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পাকিস্তান অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে......... কিন্তু বেনজিরকে গৃহবন্দী করার ফলে এ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দুই এমপি আরও কঠিন মন্তব্য করেছিলেন। এমপি ম্যাক্স মাদেন ও লর্ড আভেবারি আমার মুক্তির জন্য জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতও করেছিলেন।

বন্দী থাকার সময় বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের কোন সুযোগ আমাকে দেয়া হয়নি। ছোট বোন সনম ও ওর স্বামী নাসের প্রথম কয়েকদিন আমার সঙ্গে ছিল। কাজিন লালেহ শুধু রাতের বেলায় আমার সঙ্গে থাকতো। কিন্তু ২ সেপ্টেম্বর সবাইকে বের করে দেয় সামরিক সরকার। পুরো বাড়িতে আমি নিঃসঙ্গ হয়ে যাই। পরে আমার কাজিন লালেহকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করে সরকার। বন্দী থাকাকালে আমি শাহ'র মৃত্যু নিয়ে প্রচণ্ড ভাবতাম। বাসার পুরনো ম্যাগাজিনগুলো পড়তাম। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখাগুলো বার বার পড়তাম। আর বিবিসির প্রতিটি খবর শুনতাম। বন্দী অবস্থায় প্রচণ্ড হতাশা আর শোক আমাকে গ্রাস করেছিল।

তারপরও যতদিন পাকিস্তানে থাকি আমি তার সুফল নেয়ার চেষ্টা করেছিলাম। জিয়ার ঘোষণা অনুযায়ী তখন সামরিক শাসন প্রত্যাহারের সময় তিন মাসেরও কম ছিল। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী জিয়া এ সময়ের মধ্যে নিজেকে সংগঠিত করার চেষ্টা করবে। গ্রেফতার হওয়ার আগে চার প্রদেশের নেতা কর্মীদের সঙ্গে আমারও সভা করার কথা ছিল। আমাকে গ্রেফতারের পরে তা বাতিল করা হয়।

সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন কিছু পত্রিকা সামরিক আইন প্রত্যাহারের কথা বলা শুরু করে। পরে ঘোষণা করা হয় ৩১ ডিসেম্বর সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে। এর মধ্যে আমার মুক্তির দাবিতে লাহোরে কয়েকটি সমাবেশ বাতিল করে দেয় জিয়া সরকার। এমআরডি নেতারা করাচীতে ২১ অক্টোবর এক সভার আয়োজন করে। সরকার সেই সভাও বন্ধ করে দেয়। বেশ কিছু নেতাকে গ্রেফতারও করে সামরিক সরকার। তারপরও জিয়া দাবি করতে থাকেন, তিনিই পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

করাচীর বাড়িতে বন্দী থাকার সময় রাজনৈতিক নেতৃত্ব দুর্বহ মনে হচ্ছিল। বার বার মনে হচ্ছিল, রাজনীতিই আমাকে পরিবার থেকে দুরে সরিয়ে রেখেছে। রাজনীতিই আমাদের পরিবারকে এলামেলো করে দিয়েছে। এর কারণেই আমার প্রিয় ভাই আজ লারাকানায় কবরে শুয়ে আছে। রাজনীতিই আমার বাবার জীবন কেড়ে নিয়েছে।

আমি লন্ডনে থাকার সময় শাহ মাঝেই মাঝেই আমার কাছে ফোন করতো। সে অনুযোগ করে বলতো তুমি আমাকে দেখতে আসোনা কেন? তোমার এত ব্যস্ততা কেন? আমি শুধু বলতাম আসছি, আসব।

ক্লিফটন রোডের বাসায় শাহ'র রুম আগের মতোই সাজানো ছিল। আট বছর আগে সে এ বাড়ি থেকে চলে যায়। তারপরও তার রুমে বইয়ের শেলফে ইসলামাবাদ স্কুলে পড়ার সময়ের বই ছিল। সে যে উপন্যাসগুলো পছন্দ করত তাও ছিল বেশ সাজানো। একপাশে ছিল পবিত্র কোরান শরীফ। বাবা শাহকে এটা দিয়েছিলেন।

এখানে মীরের রুমটিও আগের মতোই চমৎকারভাবে সাজানো ছিল। মীরের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বইগুলো ছিল সাজানো। চে গুয়েভারার একটি বড় পোস্টার ছিল তার

www.pathagar.com

রুমে। সেটিও আগের মতোই আছে।

সামরিক সরবকার আমাকে বন্দী করে এ বাড়িকে সাবজেল ঘোষণা করার পর শাহ, মীর, সনম ও বাবা-মার রুম বন্ধ থাকতো। এত বড় বাড়িতে শুধু আমার রুমেই বিদ্যুত সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। বাকীগুলো বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিল সরকার।

শাহর মেয়ে সাসিকে দেখার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠলো। আমি ওকে ওর পরিবার সম্পর্কে, পবিবারের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানাতে অস্থির হয়ে পড়েছিলাম।

সাসি কখেনোই জানতে পারবে না ওর বাবার মৃত্যুর কারণ কী? কিন্তু ওকে আমি জানাতে চেয়েছিলাম ওর বাবা দেশের জন্য শহীদ হয়েছে। সাসির পরিবাবের গর্ব করার মতো ঐতিহ্য আছে, আছে কিছু ট্র্যাজেডিও। এসব সম্পর্কে আমি ওকে স্পষ্ট ধারণা দিতে চেয়েছিলাম।

শাহ কেন ওর মেয়ের নাম সাসি রেখেছে? একদিন আমি ড. আব্বাসীসহ হায়দারাবাদ যাচ্ছিলাম। পথে তিনি আমার কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, এ নামের সঙ্গে দুঃখের ইতিহাস আছে। তিনি জানালেন, নামটি নিয়ে একটি লোক-কাহিনী আছে। তিনি আমাকে শোনাতে লাগলেন, সাসি পান্নু নামের এক যুবককে খুব ভালোবাসতো। কিন্তু কোন কারণে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু সাসি পান্নুকে ভুলতে পারেনি। সে মরুভুমি, পাহাড়, পর্বত খুঁজে ফেরে পান্নুকে। একদিন মরুভুমির পাশে সাসি পান্নুকে খুজছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেল মরুভুমির মাঝখান থেকে পান্নু তার নাম ধরে ডাকছে। সে মরুভুমির দিকে ছুটতে লাগলো। মাঝখানে পৌঁছলে মাটি দুই ভাগ হয়ে যায। ডুবে যায় সাসি।

আসলে শাহ ওর মেয়েকে প্রচণ্ড ভালোবাসতো বলেই এ নাম দিয়েছিল।

শাহ'র মৃত্যুর জন্য কে দায়ি ছিল? আমরা কি কখনো তা জানতে পারবো ? পাকিস্তানে করাচী বিমানবন্দরে নেমে শাহ'র কফিন নিয়ে মহেঞ্জোদারো যাওয়ার সময় বিমানে আমার সঙ্গে থাকা সামিয়া আমাকে একটি বিষয় জানিয়েছিল। শাহ'র মৃত্যুর মাসখানেক আগে পাকিস্তানের বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে শাহ'র সাম্প্রতিক ছবির জন্য এক লোক বেশ খোঁজ খবর করে।

২২ অক্টোবর সকালে বিবিসির খবর শুনে আমি চমকে ওঠলাম। ফ্রান্স পুলিশ শাহ'র স্ত্রী রেহানাকে আটক করেছে। পুলিশের ভাষায় 'সংকটাপন্ন ব্যাক্তির জীবন বাঁচাতে সাহায্য না করায়' রেহানাকে আটক করা হয়েছে। সংবাদে এর বিস্তারিত কিছু বলেনি।

কয়েকদিন পর রেহানা প্রসঙ্গে বিবিসিতে আরও সংবাদ শুনলাম। স্থানীয় পত্রিকা পড়ে জানলাম, শাহ'র মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্তে আমার ওপর সমন জারি করা হয়েছে, কারণ এর আগে আমাকে তদন্তের কারণে ডাকা হলেও আমি নাকি যাইনি। এর আগে আমি কখনোই এ ধরনের সমন পাইনি এবং জানি না এটা কী? এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি লিখলাম আমি তদন্ত কাজে সাহায়তা করতে চাই। কিন্তু এখন এটা আপনাদের হাতে। দয়া করে ফ্রান্সের আদালত বরাবর বলে দিন, আমি আদালতে উপস্থিত হতে চাই। কিন্তু আপনারাই (পাকিস্তান সরকার) আমাকে বাধা দিচ্ছেন।

৩-রা নভেম্বর আমি ছাড়া পেলাম। সমর্থকদের উদ্দেশ্যে এক বিবৃতিতে লিখলাম, আজ আমি এক কঠিন ভ্রমণ শুরু করছি। আমার প্রিয় ভাই শাহনেওয়াজের মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে আমাকে বিদেশের আদালতে যেতে হচ্ছে। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে আবার দেশে ফিরে আসব।

www.pathagar.com

বিবৃতির শেষে লিখলাম যাই ঘটুক না কেন , আমি অবশ্যই তিন মাসের মধ্যে দেশে ফিরে আসব ।

ফ্রান্সে শাহ'র মৃত্যু এবং রেহানাকে গ্রেফতার বিষয়ে আমি বিস্তারিত জানলাম । সব শুনে আমি আরো বিধ্বস্ত হয়ে পরলাম ।

রেহানা ২২ অক্টোবর ওর পাসপোর্ট নেয়ার জন্য পুলিশের কাছে যায় । শাহর মৃত্যুর কয়েকদিনের মধ্যেই ফ্রান্স পুলিশ রেহানার পাসপোর্ট জব্দ করেছিল । ফ্রান্স পুলিশ এবং ইন্টারপোলের কাছে জিজ্ঞাসাবাদে রেহানা জানিয়েছিল শাহ'র মৃত্যুর সময় সে কোন সাড়াশব্দ পায়নি । কিভাবে শাহ মারা গেছে তাও সে জানে না । রেহানার আইনজীবি খুব সফলতার সাথে আদালতে যুক্তি তর্ক তুলে ধরে তার পাসপোর্ট ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল । রেহানা যখন ফ্রান্স ছাড়ার প্রস্তুতি নেয় তখন আবারও পুলিশ তাকে ডেকে পাঠায় । এবার রেহানা পুলিশের কাছে 'বিস্ময়কর তথ্য' দেয় । শাহ'র মৃত্যুর ব্যাপারে পুলিশকে আগে দেয়া সব তথ্য সঠিক ছিল না এবং পুলিশের ময়নাতদন্তের রিপোর্টের সপক্ষে ঘটনার বর্ণনা করে রেহানা । রেহানা জানতো, তদন্ত রিপোর্টে পুলিশ শুধু এটুকুই নিশ্চিত হতে পেরেছে যে তাৎক্ষনিকভাবে শাহ'র মৃত্যু হয়নি । তার মৃত্যু ছিল যন্ত্রণাময় এবং দীর্ঘ সময় তাকে এ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে । পুলিশ তাকে আরো জেরা করে । বক্তব্যে সন্তুষ্ট না হওয়ায় পুলিশ 'সংকটাপন্ন ব্যাক্তির জীবন বাঁচাতে সাহায্য না করায়' রেহানার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র গঠন করে । তাকে গ্রেফতার করে নিস সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয় ।

শাহ'র মৃত্যু নিয়ে সর্বশেষ তথ্য পাওয়ার পর আমাদের পরিবার একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায় । শাহ বেঁচে থাকতে আমাকে জানিয়েছিল, সে এবং মীর সব সময় সঙ্গে বিষ রাখে । জিয়া যদি কোনভাবে তাদের ধরে ফেলে তাহলে তারা ওই বিষ পান করবে । এতে ওদের তাৎক্ষনিক মৃত্যু হবে । কারণ শাহ মনে করত অপমানের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয় ।

পরে মীরের কাছে থাকা ওই বিষের নমুনা ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের পুলিশ পরীক্ষা করে দেখেছে । পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় শাহ'র দাবিই ঠিক । এতে আমিও নিশ্চিত হয়েছিলাম শাহ আত্মহত্যা করেনি ।

একরাতে শাহকে নিয়ে আমি দুঃস্বপ্ন দেখলাম । দেখি শাহ প্রচণ্ড শীতে কাতরাচ্ছে । চিৎকার করে সাহায্য চাইছে । আর আমি তাকে কম্বল দেয়ার চেষ্টা করছি ।

সব সময় আমি চিন্তা করতাম শাহ'র মৃত্যুর সময় রেহানা কেন তাকে সাহায্য করেনি? কেনই বা সে শাহ'র মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে দাবী করছে?

মুসলিমদের বিশ্বাস আল্লাহ ছাড়া কেউ জীবন দিতে বা নিতে পারে না । আল্লাহর ওপর শাহ'র বিশ্বাসের কথা আমরা জানতাম । সে কখনো আত্মহত্যা করতে পারেনা । আর কেউই এমন কঠিন যন্ত্রণাময় মৃত্যু কামনা করে না ।

কার্লটনে আমি অনানুষ্ঠানিকভাবে এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা করে শাহর মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত করতে বলেছিলাম । তিনি আমাকে বললেন, শাহ ও মীর যে বিষ সবসময় সঙ্গে রাখতো সে সম্পর্কে কিছু তথ্য কি আমাকে দিতে পারবেন? আমি তখন হন্যে হয়ে

www.pathagar.com

ওই বিষ সম্পর্কে তথ্য যোগাড়ে ব্যস্ত হলাম। কিছুদিনের মধ্যে যোগাড়ও করে ফেললাম নানা তথ্য। পরে ওই বিষ পরীক্ষাগারে নিয়ে তিনি আমাকে রিপোর্ট দিলেন। রিপোর্টে যা ছিল তা এখনও আমি তাড়া করে ফেরে। রিপোর্টে ছিল–

ওই বিষ তরল করে না খেলে সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হবে। কিন্তু তরল করলে এর প্রকৃতি পুরোপুরি পাল্টে যাবে। পান করার আধাঘন্টার মধ্যে সে শরীরের ভারসাম্য হারাবে। প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হবে তার। পিপাসা হবে প্রচণ্ড। এক ঘন্টার মধ্যে সে তার দেহের নিয়ন্ত্রণ হারাবে। হৃদপিণ্ড ও দেহে প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করবে সে। এক সময় ঠাণ্ডা অনুভব করবে। এসব প্রক্রিয়ায় চার থেকে ১৬ ঘন্টার মধ্যে চরম যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হবে তার।

শাহর মুত্য সম্পর্কে এমন বিভিন্ন কাহিনী আমাদের পরিবারকে এলোমেলো করে দেয়। ফাউজিয়া ও মীরের সংসার ভেঙ্গে যায়।

শাহ'র স্ত্রী রেহানা জেলে থাকার ফলে সাসি তার খালা ফাউজিয়ার কাছে থাকতো। আমরা সাসিকে চাইলে ফাউজিয়া তাকে দিতে অস্বীকার করে। বিষয়টি আমাকে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়েছিল। সাসি ছিল আমাদের রক্তে -মাংসের। কিন্তু তাকে আমরা পাচ্ছিলাম না। পরে আমরা আদালতের শরনাপন্ন হলাম। আদালতের রায়ে সাসিকে আমরা তিন মাস ও ওদের কাছে নয় মাস রাখার সিদ্ধান্ত হয়। আমরা ওর লেখাপড়া ও ভরণপোষণের খরচ দিতে রাজী ছিলাম। কিন্তু রেহানা তাতেও রাজী হয়নি। তাই আমরা আবারও আদালতের শরণাপন্ন হলাম। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। আদালত আমাদের আবেগকে কোন প্রশয় দেয়নি।

১৯৮৮ সালে ফেব্রুয়ারিতে আদালত সপ্তাহে একদিন সাসিকে দেখতে আমার মাকে অনুমতি দেয়। তবে এ রায়ও বাস্তবায়িত হয়নি। রেহানা সাসিকে ওর নানা নানীর সঙ্গে থাকার জন্য ক্যালির্ফোনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়। সে কেমন আছে তাও আমরা জানতাম না।

সাসির অবস্থা জানার জন্য পরিবারের সবাই ব্যকুল হয়ে উঠেছিল। আমি যদি নিশ্চিত হতাম সে ভালো আছে সুস্থ আছে, সুখী আছে। তাও একটু ভালো লাগা কাজ করতো আমাদের মধ্যে।

তবে আমি স্বপ্ন দেখতাম একদিন সে আমাদের কাছে চলে আসবে । কিংবদন্তীর সাসির মতো পাহাড় পর্বত, মরুভুমি পেরিয়ে আমাদের কাছে আসবে। কারণ আমরা তাকে ভালোবাসি। সেও আমাদের ভালোবাসে, তার পরিবারকে ভালোবাসে।

১৯৮৮ সালের জুন মাসে আইনী প্রক্রিয়ার দুই বছর পর ফ্রান্স আদালত রেহানার বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেম করে 'সংকটাপন্ন ব্যাক্তির জীবন বাঁচাতে সাহায্য না করায়।' রেহানার এক থেকে পাঁচ বছর জেল হতে পারে। তবে কোর্ট যথেষ্ট প্রমাণ ও স্বাক্ষী না থাকার কারণে আমাদের দায়েরকৃত নির্দিষ্ট আসামি বিহীন খুনের মামলা নাকচ করে দেয়।

তবে শাহ আত্মহত্যা করেনি এ বিষয়টি এখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

একবার বিবিসি'র রিপোর্টে জানতে পারি রেহানার আইনজীবী বলেছে, রেহানা মনে করে যে শাহ খুন হয়েছে।

সাসি হয়তো কখেনোই জানবে না ওর বাবা কিভাবে মারা গেছে।

১৯৮৮ সালের জুলাইয়ে জানতে পারি রেহানা ফ্রান্স থেকে আমেরিকা চলে গেছে। সেখানে তার পরিবার ও সাসি বসবাস করছিল। ফ্রান্স আদালত 'মানবিক কারণ' দেখিয়ে তাকে পাসপোর্ট দিয়ে দেয়। আমাদের আইনজীবী জানায় এ কারনেই মার্সেলি কনস্যুলেট

থেকে মার্কিন ভিসা পেতে তার কোন সমস্যা হয়নি।

আমাদের আইনজীবীরা জানিয়েছে যে, রেহানার বিচার আদৌ হয়, তাহলে সেটা ১৯৮৯-এর আগে হবে না। আর যদি হয়ও তাহলেও রেহানার ফিরে এসে বিচারের সম্মুখীন হওয়ার আশা ক্ষীণ।

আরেক ভুট্টো মারা গেল। মারা গেল তার রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে। শোক, দুঃখ আমাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে এবং গণতন্ত্রের পথ থেকে সরাতে পারবে না।

আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি এবং ন্যায় বিচারের ভার তার হাতেই ছেড়ে দিয়েছি।

www.pathagar.com

১৩

লাহোরে ফিরে আসা এবং আগস্ট ১৯৮৬ গণহত্যা

১৯৮৫ সালের ৩০ ডিসেম্বরে সামরিক আইন উঠে যায়, আমি তখন ইউরোপে, সেখানে হোটেলে বসে খবরটি পাই। এতে উৎফুল্ল হবার কিছুই ছিল না। এটা খুবই স্পষ্ট যে, পশ্চিমা দুনিয়াকে বোঝানোর জন্যই সামরিক শাসন তুলে নেয়া, এতে সত্যিকারের গণতন্ত্রে ফিরে আসার বিষয় ছিল না। কারণ জিয়া তখনও সেনাপ্রধান এবং প্রেসিডেন্ট দুই পদই দখল করে আছেন। তাই এটা কোনভাবেই বলা যাবে না যে, সামরিক বাহিনী শাসন ক্ষমতায় নাই। রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কোন পরিবেশই ছিল না। জিয়ার নতুন 'সিভিলিয়ন গভর্নমেন্ট' ছিল একটা ভনিতা মাত্র। তার রাবার স্ট্যাম্প মার্কা পুতুল সংসদ সেই কলঙ্কিত ৮ম সংশোধনী বিল পাস করে।

এটা একটা ইনডেমনিটি বিল, এই বিল পাস করার ফলে সামরিক শাসনামলের সকল অপকর্মকে বৈধতা দেওয়া হয়। এর ফলে সামরিক শাসনামলে যে অসংখ্য ভিন্নমতাবলম্বিকে গ্রেফতার করে সামরিক আইনে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয় বা রাজনীতিকদের যে নির্যাতন করা হয় তার জন্য কোন কিছুই করা যাবে না।

সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলেও বর্তমান সরকার তার পূর্বেকার সামরিক আইনের ধারাবাহিকতাই রক্ষা করে চলেছে। ১৯৭৭ সাল থেকে জিয়ার সামরিক সরকার একদম নিয়মতান্ত্রিকভাবেই আমার বাবার আমলে তৈরি করা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করতে থাকে। যেমন– ১৯৭৩ সালের সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীন বিচার বিভাগ, অর্থনৈতিক কাঠামো, সংসদীয় গণতন্ত্র, স্বাধীন প্রচার মাধ্যম, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা ইত্যাদি।

সামরিক শাসনামলে ঘুষ এবং অপরাধ জাতীয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ করে। অনেক মেধাবী যুবকরা তাদের চাকরি হারায়। চোরাকারবারীদের একটা সংঘবদ্ধ চক্র তৈরি হতে

www.pathagar.com

থাকে, যারা এয়ারকন্ডিশনার থেকে শুরু করে ভিডিও যন্ত্রপাতি পর্যন্ত সবকিছু কালোবাজারে বিক্রি করত। সম্প্রতি পাকিস্তান স্টেটব্যাংক এক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, তাতে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের অর্থনীতির এক ষষ্টমাংশ এখন কালোবাজারী অর্থনীতি। সেখান থেকে রাষ্ট্র কোন কর বা শুল্ক পায় না।

আফগানিস্তানে সোভিয়েতের হস্তক্ষেপ এ অঞ্চলে একটি দীর্ঘস্থায়ী বাজে প্রভাব রেখে গেছে। মার্কিন বাহিনী তাদের সৃষ্ট মোজাহিদিনদের জন্য পাকিস্তানকে বেছে নিয়েছিল অস্ত্রের বাজার হিসেবে। পাকিস্তানের কালোবাজারে অস্ত্র এতটাই সহজপ্রাপ্য ছিল যে, সোভিয়েত মডেলের 'কালাসনিকভ' নামের এক আগ্নেয়াস্ত্র অনেক পাকিস্তানিদের হাতে হাতে থাকতো। কালোবাজারে এ ধরনের একটি অস্ত্রের দাম পড়তো মাত্র ৪০ ডলার।

তখন বলা হতো যে, করাচিতে 'কালাসনিকভ' ঘন্টা হিসেবে ভাড়া পাওয়া যায়। সিন্ধুর লোকেরা সন্ধ্যার পর রাস্তায় বেরুত না, কারণ রাতে রাস্তাঘাট চলে যেত সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের দখলে। তাদের হাতে থাকতো অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্র, এমনকি রকেট লাঞ্চার পর্যন্ত। পাকিস্তানের বড় বড় জোতদার, জমিদার এবং শিল্পপতিরা নিজেদের রক্ষার জন্য প্রাইভেট বাহিনী গড়ে তুলেতো। আধিপত্য প্রমাণের জন্য তারা আবার নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। এর সব কিছুই হত জিয়ার শাসনামলে। এ সময়ে শাসক জান্তাও উপজাতি সর্দারদের জন্য এ ধরনের বাহিনী গড়ে তুলতে সাহায্য করতো। তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করতো। পোশাক-আশাক, নিয়োগ এবং বেতন পর্যন্ত সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করতো সামরিক জান্তা।

এই ধরনের প্রাইভেট বাহিনী পিপিপি'র কর্মীদের নানা ভয়ভীতি দেখাত এবং তাদের কাজে বাঁধা হয়ে দাঁড়াত। কোন কোন সময় তারা পুরো একটি গ্রাম তছনছ করে ফেলতো, এতে সেই গ্রামের মসজিদও বাদ পড়তো না। আফগানিস্তানে দখলদারিত্বের ফলে পাকিস্তান হয়ে ওঠে মাদক চোরাচালানের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র।

পাকিস্তানে আফগান শরণার্থী আসার আগে সেখানে ছিল মাদকমুক্ত সমাজ। কিন্তু বর্তমানে ১০ লক্ষাধিক পাকিস্তানি নাগরিক এখন মাদকাশক্ত। যখন লাখ লাখ মাদকাশক্ত লোক সমাজে থাকে তখন নিশ্চয়ই কোটি ডলারের হেরোইন, আফিমসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য দেশে বেচা কেনা হয়। ১৯৮৩ সালে সারাবিশ্বে হেরোইন সরবরাহের প্রধান দেশ হিসেবে পাকিস্তান ছিল অন্যতম। চোরাকারবারির কালো টাকায় সয়লাব হয়ে যায় করাচি, লাহোর এবং উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা। এই টাকায় গড়ে ওঠে বড় বড় প্রাসাদোপম অট্টালিকা। সামরিক জান্তা এসব কিছু দেখেও না দেখার ভান করে থাকতো। বলা হত, তখন করাচি সমুদ্রবন্দরে অস্ত্র বোঝাই অনেক জাহাজের চালান আসত, যেগুলো খাইবাব পাস দিয়ে মোজাহিদদের কাছে চলে যেত।

যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোতে মাদক চোরাচালানের দায়ে অনেক সময় জান্তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং মন্ত্রীসভার সদস্যদের সুপুত্ররা ইন্টারপোলের হাতে ধরা পড়তো। লোকমুখে একথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো যে, সীমান্ত প্রদেশের সামরিক গভর্ণর একজন মাদক পাচারের গডফাদার। জিয়ার সামরিক সরকার অন্যান্য প্রদেশের গভর্ণরদের না সরানো পর্যন্ত টানা ৭ বছরই ওই গডফাদার গভর্ণর হিসেবেই দায়িত্ব পালন করেছেন। আবদুল্লাহ ভাট্টি ছিলো আরেকজন মাদক চোরাকারবারি গডফাদার। জিয়ার সামরিক

শাসনের শুরুতে সে একবার গ্রেফতার হয়, সামরিক আদালতে তার কারাদণ্ডও হয়। আবার ছাড়াও পেয়ে যান যথারীতি। ৭ বছর পর পুনরায় গ্রেফতার হয় সে। এবার দেখা গেল ভিন্ন ঘটনা, জেনারেল জিয়া স্বয়ং তার প্রেসিডেন্টসিয়াল ক্ষমতাবলে আব্দুল্লাহ ভাট্টিকে ক্ষমা করে দেন। একজন মাদক সম্রাটের প্রতি তার যে ক্ষমা পরায়ণতা তা কখনো রাজনৈতিক নেতার প্রতি লক্ষ্য করা যায় নি। জিয়ার 'ইসলামিকরণ' পাকিস্তানকে বিভক্ত ও ভেতরে ভেতরে ক্ষয় করে ফেলেছে। আমার বাবার শাসনামলে যেখানে ছিলো ধর্মীয় সহনশীলতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সেখানে এখন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর চলছে নির্যাতন।

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৭ সালে সংবিধান পরিষদের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে এক বক্তব্যে বলেছিলেন, 'তোমাদের মন্দিরে উপাসনা করার স্বাধীনতা আছে, তোমাদের মসজিদে যাবার স্বাধীনতা আছে অথবা পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে যে কোন উপাসনালয়ে ধর্ম চর্চার স্বাধীনতা তোমাদের রয়েছে, তোমাদের যেকোন ধর্মমত গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে, সেখানে রাষ্ট্র কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না।'

পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ সুন্নী মুসলমান এবং হানাফি মাযহাবের অনুসারি। এছাড়া রয়েছে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের লোক যাদের প্রধান নেতা থাকেন ইংল্যান্ডে। আরো রয়েছে হিন্দু, খ্রিষ্টান ও পার্সি সম্প্রদায়ের লোক। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি পাকিস্তানিদের ছিল সাম্প্রদায়িক সহনশীলতা, সমঝোতা এবং ঐক্য। জেনারেল জিয়া ক্ষমতা দখলের পর থেকেই 'ওহাবী' ধারাকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে থাকেন। ওহাবীরা হল সৌদি আরবের এক সংস্কারবাদি ইসলামী আন্দোলনের ধারা, অন্য ধর্মমতের ক্ষেত্রে তারা ছিল অসহিষ্ণু, দক্ষিণপন্থি জামায়াতে ইসলামির মতো এরাও হিংসাত্মক কার্যকলাপে বিশ্বাসী। জিয়ার ইসলামিকরণ এমন সময়ে শুরু হয় যখন থেকে বিভিন্ন উগ্র মৌলবাদিরা পাকিস্তান জুড়ে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। হিন্দু খ্রিষ্টান এবং পার্সি সম্প্রদায়ের লোকেরা ওই সময় ঘুম থেকে উঠেই দরজা খুলে দেখতে পেত, কে বা কারা যেন সেখানে লিখে রেখে গেছে, 'তোমরা চলে যাও, তোমাদের এখানে থাকার কোন প্রয়োজন নেই'। অনেক সংখ্যালঘু পরিবার তাদের বাপদাদার ভিটেমাটি বেঁচে দেশ ছেড়ে চলে যেত। যারা ভিটে কামড়ে পড়ে ছিল, তাদের অবস্থাও শোচনীয়। আমার বাবার আমলে একজন পার্সি নারী যেখানে জিন্সের প্যান্ট শার্ট পড়ত সে এখন সালোয়ার কামিজ পড়তে বাধ্য হচ্ছে। জিয়ার সময়ে মোল্লারা ছিল তার ইসলামিকরণের প্রধান হাতিয়ার। মোল্লাদের তখন রমরমা অবস্থা, ইসলামের নামে বিভিন্ন আইন-কানুন তারাই বাস্তবায়ন করতো।

ইসলামি ট্যাক্সের বা জাকাতের প্রচলন করা হয় তার সময়কাল থেকেই। মোট সম্পদের আড়াই শতাংশ জমা দিতে হতো এবং তা মোল্লারাই বন্টন করতো। এতে দেখা যেত এই যাকাতের অর্থ মোল্লাদেরই পকেটে যেত। যাদের প্রাপ্য তারা কিছুই পেত না।

প্রতি শুক্রবার জুম্মা নামাজের পর বিভিন্ন ঘটনার বিচার হতো মসজিদেই। সেখানে মোল্লারাই বিচার করতো, তারাই ফতোয়া দিতো। একবার ১৯৮৪ সালে ফতোয়ার ব্যাপারে এক কৌতুককর ঘটনা ঘটালো মোল্লারা। টেলিভিশনে একজন অভিনেতা-অভিনেত্রী এক নাটকের অভিনয়ে তালাক দিয়েছিলো, বাস্তব জীবনে তারা ছিলো আবার স্বামী-স্ত্রী। নাটকটি প্রদর্শনের পর মোল্লারা ফতোয়া দিলো, তাদের মধ্যে তালাক হয়ে গেছে, এখন আর এক সঙ্গে বসবাস করতে পারবে না। বিবাহিত জীবন-যাপন করলে ওই অভিনেতা-অভিনেত্রীকে

www.pathagar.com

পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে হবে। তাদের উস্কানিতে উচ্ছৃঙ্খল জনতা রাতের অন্ধকারে তাদের বাড়িতে পাথর ছুঁড়তে থাকে। ওই দম্পতি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে, মৌলবাদীদের মোকাবেলা করার ব্যাপারে বড়ই অসহায় হয়ে পড়ে তারা। চোখের সামনে এতো বড় ঘটনা ঘটলো সম্পূর্ণ বিনা বাধায়, কেউই এগিয়ে এলো না।

জিয়া তার দমনপীড়ণকে বৈধতা দিতে গিয়ে সমাজকে সহিংসতার দিকে ঠেলে দেয় এবং ইসলামিকরণের তকমা ব্যবহার করে। ১৯৭৯ সালে খোমেনি ইরানে ফিরে আসার পর জিয়ার শরিয়াহ আদালত এক কুখ্যাত 'হুদদ' অধ্যাদেশ জারি করে। সেই অধ্যাদেশে চুরি, ব্যাভিচার ও ধর্ষণের বিচার শরিয়তের বিধান মোতাবেক হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

হুদদ অধ্যাদেশে হাদিস কোরানের বিধান মোতাবেক একজন নারী ধর্ষিত হলে সেটা প্রমাণ করার জন্য ৪ জন প্রত্যক্ষদর্শী মুসলমানের সাক্ষীর দরকার। এরকম সাক্ষী ছাড়া কোন ধর্ষণের ঘটনা প্রমাণ করা যাবে না। এতে ধর্ষিতা প্রমাণ করতে পারতো না, কে তাকে ধর্ষণ করেছে।

সুফিয়া বিবি নামে একজন অন্ধ গৃহপরিচারিকার ক্ষেত্রে যেমনটা ঘটেছে। সুফিয়া বিবিকে গৃহকর্তা এবং তার ছেলে দু'জনেই ধর্ষণ করে। এতে সে অন্তঃস্বত্তা হয়। একটি সন্তানও প্রসব করে সে, সুফিয়া বিবি ধর্ষিত হয়েছিলো ঠিক কিন্তু সেটা প্রমাণ করা যায়নি, কারণ সেখানে ৪ জোড়া মুসলমানের চোখ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেনি।

ধর্ষণ কি কখনো জানান দিয়ে হয়? কোন সময় চার জোড়া চোখ কি তা প্রত্যক্ষ করে? সুফিয়া বিবির মামলায় শরীয়াহ আইনে ধর্ষক গৃহকর্তা ও তার ছেলে মুক্তিলাভ করলো, উপরন্তু ব্যাভিচারের দায়ে জেলের ঘানি টানছে সুফিয়া বিবি। শরীয়াহ আইনে সুফিয়া বিবিকে ৩ বছর কারাদণ্ড ও বেত্রাঘাতের দণ্ড দেয়া হয়েছিল। আন্তর্জাতিকভাবে ঘটনাটি প্রচারে চলে আসায় সে যাত্রায় সুফিয়া বিবি রক্ষা পেয়েছিলো, কারণ মাত্র ১৩ বছরের বালিকা কুলাঙ্গার পিতা-পুত্রের দ্বারা ধর্ষিত হবার ফলে অন্তঃস্বত্তা হয় আর উল্টো ধর্ষিতাকে দেয়া হয় মধ্যযুগীয় বিধানের শাস্তি। আন্তর্জাতিকভাবে ঘটনাটি প্রচার পাওয়ায় সামরিক জান্তা বিব্রত হয় ফলে আদালত এতটুকুই বিবেচনা চেয়ে যে, নবজাতকের বয়স দুই বছর হলেই এই শাস্তি কার্যকর করা হবে।

অথচ আমার বাবার আমলে প্রণীত ১৯৭৩ সালের সংবিধানের ২৫(২) ধারায় বলা হয়েছে, 'শুধুমাত্র লৈঙ্গিক কারণে কারো প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করা যাবে না'। সেখানে জিয়ার রাজনৈতিক পলিসি যত বৈষম্য সৃষ্টির উৎস। তার ইসলামিকরণ নীতি নারীর প্রতি শুধু যে বৈষম্য আরোপ করে তাই নয় তারা সেটা বাস্তবায়নেরও দায়িত্ব গ্রহণ করে।

করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে জামায়াতের ছাত্র সংগঠন সেখানে অস্ত্রের ঘাটি তৈরি করে রেখেছে। তারা দাবি তুলেছে নারী পুরুষের একসঙ্গে লেখাপড়া করা চলবে না, কারণ তাদের ভাষায় নারীরা পুরুষের কাছে নিরাপদ নয়। নারী ছাত্রদের বোরখা পড়তে বাধ্য করে তারা। যারা তাদের কথামত চলাফেরা করতো না তাদেরকে নানাভাবে উপহাস করতো নির্যাতন করতো এমনকি এসিডও ছুঁড়ে মারা হতো অনেক সময়। এসিড নিক্ষেপের বহু ঘটনা করাচি ক্যাম্পাসে ঘটলেও সেখানে এর জন্য কাউকে শাস্তি পেতে হয়নি।

সমাজের সকল আচার অনুষ্ঠানে নারীদের আলাদা করে রাখা হতো, এমনকি উচ্চপদস্থ নারীদেরও তাদের পুরুষ সহকর্মীদের থেকে আলাদা করে রাখা হতো, টেলিভিশনের সংবাদ

www.pathagar.com

পাঠিকাকেও মাথায় দোপাট্টা পড়তে হতো। যারা অস্বীকার করতো তাদেরই ছাঁটাই করা হতো।

একবার আন্তর্জাতিক মহিলা হকি টুর্নামেন্টে পাকিস্তান থেকে একটি টিম গিয়েছিলো, 'টিমের খেলোয়াড়দের পা ঢাকা থাকতে হবে, নচেৎ তাদের খেলতে দেয়া হবে না', এই ধরনের নির্দেশনা আসতে থাকে সামরিক জান্তার তরফ থেকে।

১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে জিয়া শাহী শরীয়াহ আদালতের বিধান জারি করলে পাকিস্তানের নারীরা এর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। শরীয়াহ বিধানে বলা হয়েছে যে কোন মামলার সাক্ষী হিসেবে দুইজন নারীর মর্যাদা একজন পুরুষের সমান। লাহোরে এই অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে নারীরা বিক্ষোভ শুরু করে দেয়। পুলিশ শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বিক্ষোভে অংশ নেয়া নারীদের সম্পর্কে মোল্লারা ফতোয়া দিতে থাকে যে, মিছিল করা নারীদের স্বামী তালাক হয়ে গেছে এবং যারা এই বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে। নারীরা মোল্লাদের অগ্রাহ্য করতে পারে কিন্তু সামরিক জান্তাকে নয়। জিয়া শাহী তার পার্লামেন্টে ১৯৮৪ সালে 'ল অফ ইভিডেন্স' নামে একটি বিল পাস করে।

এই বিলের মর্মকথা হল, কোন হত্যা মামলায় একজন প্রত্যক্ষদর্শী নারীর সাক্ষী গ্রহণীয় নয়। শুধু তাই নয় হত্যার ক্ষতিপূরণ পুরুষের চেয়ে একজন নারীর অনেক কম হবে। সেখানেও একজন নারীর মর্যাদা একজন পুরুষের মর্যাদার অর্ধেক। জিয়ার পাকিস্তান চললো 'ভাগকর শাসন কর' এই নীতিতে। সেখানে গরিবরা আরো গরিব হতে থাকে, নারীরা তাদের স্বকীয়তা এবং মর্যাদা হারায় এবং শান্তিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার অধিকার হারায় সবাই।

বিভিন্ন দুর্বৃত্তরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। অপহরণ বন্দুকযুদ্ধ যেন নিত্য ঘটনায় পরিণত হয়। সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্তপ্রদেশের মত সংখ্যালঘুদের অঞ্চলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়লো।

শুরু থেকেই জিয়া রাজনীতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ এবং পাশাপাশি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করার নীতি গ্রহণ করে। এমনকি তাদের বক্তব্য প্রচার মাধ্যমে তুলে ধরার সুযোগ করে দেয়। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ব্যবহার করে জিয়া সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহ এবং পাঞ্জাবের মধ্যে একটা অবিশ্বাসের বীজ বপন করে দেয়। লোকের মুখে একটি কথা প্রচার করা হয় যে, দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সামরিক শাসনের দরকার আছে। উপরন্তু জান্তার অদলীয় নির্বাচন দেশকে বিভাজনের দিকে ঠেলে দেয়। তারা ঘোষণা করে রাজনৈতিক দলের ব্যানারে কোন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। ফলে জাতিগত, ভাষাগত, আঞ্চলিক ও সম্প্রদায়গত পরিচয়েই প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে।

শিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে সেই সম্প্রদায়ের প্রার্থী গিয়ে বলে আমি একজন শিয়া সুতরাং আমাকে ভোট দাও। পাঞ্জাবিদের কাছে গিয়ে কেউ বলে, আমি পাঞ্জাবি আমাকে ভোট দাও। এভাবে জাতিকে বিভক্ত করার বহুত খেসারত দিতে হয়েছে দেশকে। পাঠান এবং মোহাজেরদের মধ্যে জাতিগত সংঘাত বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। করাচিত প্রথম সংঘাত শুরু হয় ১৯৮৫ সালে। ঐ সহিংস সংঘাতে অর্ধশতাধিক লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং শতাধিক লোক আহত হয়।

www.pathagar.com

এক অতি তুচ্ছ ঘটনা থেকে এতবড় সহিংস সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। একজন মোহাজের বালিকা একটি বাসের সঙ্গে ধাক্কা খায়। বাস চালক ছিলো পাঠান। আর যায় কোথায়, বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়লো মোহাজের-পাঠান সংঘর্ষ। নিমিষেই শতাধিক গাড়ি ভাঙচুর হয় এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। শেষে কারফিউ দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয় সরকারকে। পরিস্থিতি আপাত শান্ত করা গেলেও সংঘাতের মূল কারণ কিন্তু থেকেই গেল। এত প্রাণহানি, এত ক্ষয়ক্ষতি– তার কোনই কুলকিনারা করলো না সরকার, ফলে জাতিগত বিভেদটা চিরস্থায়ী হয়ে রইল। জাতিগত পরিচয় এবং জাতিগত জনপ্রিয়তা নিয়ে নতুন নতুন রাজনৈতিক দল খাড়া করা শুরু হলো।

আমি ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডে ফিরে আসি ১৯৮৬ সালের জানুয়ারিতে। সেখানে বারবিকান ফ্লাটের বাসায় পিপিপি'র নেতাদের সঙ্গে মিলিত হই। নেতাদের বলি আমি পাকিস্তান ফিরে যেতে চাই। এ কথায় তারা খুব আশান্বিত হয়। আমি বলি, খুব সম্ভব লাহোর কিংবা পেশোয়ারেই পয়লা নামবো। সেই পরিকল্পনা থেকে শুরু হয় জিয়াশাহীর বিরুদ্ধে পিপিপি'র রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ। দেশে ফিরবো, দেশ মানে তো মুক্তভাবে নিঃশ্বাস নেবার মুক্ত স্বাধীন ভূমি।

পিপিপি নেতা নাহিদ এবং সাফদার আব্বাসী বললেন, আমরাও আপনার সঙ্গে যাব, বশির রিয়াজও যোগ দিলো তাতে। আমি তাদের থামিয়ে দিয়ে বললাম, হঠকারি সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। নাহিদ এবং বশিরের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। সুতরাং স্বল্পসংখ্যক কর্মীবাহিনী নিয়েই আমি যাত্রা শুরু করবো।

মনে হলো দেশে ফেরার জন্য সঠিক সময়ই বেছে নিয়েছি। জিয়ার সামরিক আইন তুলে নেবার ফাঁকা দম্ভ চূর্ণ করার এটাই মোক্ষম সময়। আমরা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য চাপ সৃষ্টি করবো। এতে জিয়া সরকার যদি আমাকে গ্রেফতার করে তাহলে তার ফাঁকা গণতন্ত্রের মুখোশ খুলে যাবে। আর যদি তা না করে তবে নয় বছরের মধ্যে এই পয়লা পিপিপির রাজনীতিকে পাকিস্তানের জনগণের কাছে নিয়ে যাবার একটা সুযোগ পাব। মনস্তাত্ত্বিকভাবে সময়টা খুবই সঠিক বলেই মনে হলো।

সম্প্রতি সময়ে দুইজন একনায়কের পতন হয়েছে, একজন হলেন ফিলিপাইনের ফার্দিন্যান্দ মার্কোস এবং হাইতির 'পাপাডক' দুভালিয়ার। এখন তৃতীয় ব্যক্তির পালা, তার সময়ও ঘনিয়ে এসেছে।

বন্দি জীবনে কিংবা নির্বাসিত জীবনে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সরাসরি অনুধাবন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং এতবড় সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে কিনা তা বোঝার জন্য পিপিপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির বৈঠক আহ্বান করি লন্ডনে।

বৈঠকে পিপিপি নেতাদেরকে বলি, 'দেশে যাওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়, কিন্তু সেটা নির্ভর করছে আপনাদের সিদ্ধান্তের ওপর। আমি মনে করি সেখানে আমার জন্য ভালো সুযোগ অপেক্ষা করছে। পূর্ণ গণতন্ত্রের জন্য এবং জিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য এটাই উপযুক্ত সময়। তারা যদি আমাকে আটক করে তাহলে আপনাদের করণীয় কী হবে, কিংবা আমার যাওয়া আরও দেরি করা উচিত কিনা– তা আপনারাই সিদ্ধান্ত নেবেন।'

নেতারা বললো, 'আপনার এখনই ফেরা উচিত, আমরা আপনার পাশে আছি'। তারা আরও বললো, 'যদি জিয়া আপনার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয় সেটা আমাদের সকলের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে নেয়ার সামিল হবে ।, তাদের কথায় খুব আশান্বিত হলাম । আমার সম্ভাব্য সফরসূচী ঠিক করলাম, পাঞ্জাব সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধুতে সফর করবো আমি ।

আমাদের কৌশল হবে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক তাতে কোন সহিংসতা থাকবে না । আমাকে গ্রেফতার করার কোনো অজুহাত জান্তাকে দিতে চাই না । সারা পাকিস্তান জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই । আগামী ১৯৮৬ সালের হেমন্তের আগেই দেশে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকারকে বাধ্য করতে চাই । যুগপৎভাবে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ সমাবেশের চেয়ে বড় বড় প্রধান শহরে সফর করার চিন্তা ঠিক করলাম ।

আমি চেয়েছিলাম এ সময় জুড়েই পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে পিপিপি'র নেতারা যেন গণসমাবেশ চালিয়ে যায় । যাতে জনমনে আস্থা ফিরে আসে । লাঠি গুলি আর নির্যাতনের মধ্যেমে জিয়ার সরকার দেশজুড়ে যে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে, সেটা ভেঙ্গে ফেলাটাই আসল কথা । নেতারা আমাকে বললো, 'এতে আপনার জন্য বেশি চাপ হবে না তো' । আমি বললাম, 'আমি পারবো' । খাবার টেবিলে বসে খেতে খেতে কর্মসূচী ঠিক করে ফেললাম । সবাই একমত হলাম, আমি লাহোর হয়েই পাকিস্তানে ঢুকবো । কারণ লাহোর হলো পাঞ্জাবের রাজধানী, সামরিক প্রভাবাধীন এলাকা এবং পিপিপিরও শক্ত ঘাঁটি । বাকি সফরসূচিও ঐ খাবার টেবিলে বসেই ঠিক করে ফেললাম ।

পিপিপির অনেক নেতাই দেশে ফিরে কাজ শুরু করে দিলো । শুধু আমার ফেরার তারিখটা গোপন রাখলাম । কারণ সেটা প্রকাশ করে সরকারকে প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ দিতে চাই না ।। এতে আমাদের বাড়তি সুবিধাও হলো । জনমনে কৌতুহল বেড়ে গেল, কেউ বললো, ২৩ মার্চেই বেনজির আসবেন, কারণ সেদিন পাকিস্তান দিবস । কেউ বললো, না সে আসবে ৪ এপ্রিল সেদিন তার বাবার মৃত্যুবার্ষিকী । মানুষের এই আগ্রহ নিয়ে পত্রিকাগুলোও নিবন্ধ লেখা শুরু করে দিলো । একদিকে সাজ সাজ রব, অন্যদিকে শুরু হলো আমার জীবনের ওপর হুমকির আরেক অধ্যায় ।

সিন্ধু প্রদেশের চারজন সামরিক কর্মকর্তা আমার সম্পর্কে পিপিপির এক সমর্থককে এক বার্তায় বলে যে তাকে আসতে বারণ কর, নচেৎ আমরা তাকে হত্যা করবো । পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আমাকে হত্যার হুমকি সংবলিত বার্তা আসতে থাকলো । বার্তায় বলা হলো, 'পাকিস্তানের মতো জায়গায় একজন নারীর পক্ষে রাজনীতি করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, সেটা ভালো করেই জান, তাই ফিরে আসার চেষ্টা করো না ।' আমার ব্যক্তিগত টেলিফোনটি সময় অসময়ে বাজতে শুরু করলো । দেখা গেল খুব ভোরে নয়তো শেষ রাতে টেলিফোন বাজছে, রিসিভার তুললে ওপার থেকে কোন আওয়াজ পাওয়া যায় না । আমার এক বন্ধু টেলিফোনে জানালো, একজন পাকিস্তানি মেজর আমার ছবি নিয়ে হিথ্রো বিমানবন্দরে এসেছিলো আমার যাত্রায় বাধা সৃষ্টি করার জন্য । পরে সে ফিরে গেছে ।

আমি বুঝতে পারছিলাম না, এই হুমকি কী সত্যি সত্যিই আমাকে মেরে ফেলার জন্য নাকি ভয় দেখিয়ে দেশে ফেরা থেকে বিরত রাখার জন্য ।

নূর মোহাম্মদ নামে আমার বাবার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন । জানুয়ারিতে করাচি শহরে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় । নূর মোহাম্মদকে দেখভাল করার জন্য শাহনাজ নামের তার এক ভাতিজি ছিলো । নূর মোহাম্মদ মারা যাবার আগে শাহনাজ আমাকে বলেছিলো, 'চাচাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, সে আপনাকে কিছু বলতে চায়, আপনি যেন তাকে

www.pathagar.com

টেলিফোন করেন।'

জান্তার ভেতরের অনেক কথাই সে জানতো যা আমাকে বলতে চেয়েছিলো। আমি লন্ডন থেকে তাকে টেলিফোন করি, কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। শুধু নূর মোহাম্মদ নয় তার কিশোরী ভাতিজি শাহনাজকেও হত্যা করা হয় নৃশংসভাবে।

এই ঘটনার পর পরই আমি নূর মোহাম্মদের পাঠানো একটি চিঠি পাই। চিঠিটি সে মারা যাবার আগেই পোস্ট করেছিলো। চিঠিতে সে একই অনুরোধ করেছেন, যেন আমি তাকে টেলিফোন করি। সে কি বলতে চেয়েছিলো, আমার আর শোনার সুযোগ হলো না। আসন্ন পাকিস্তান সফর সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এরপর আমি ওয়াশিংটনে চলে আসি।

গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের জন্য পাকিস্তানের জনগণ নয় বছর ধরে উন্মুখ হয়ে আছে। আমি দেশে ফিরলে তারা কিভাবে গ্রহণ করবে তা কে বলবে। জিয়ার প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ খান জুনেজো অবশ্য আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলো যে, আমাকে গ্রেফতার করা হবে না। কিন্তু জিয়া কখন কী করে তা কে বলতে পারে!

আমি ওয়াশিংটনে সিনেটর পেল, সিনেটর কেনেডি এবং কংগ্রেসম্যান স্টেফেন সোলার্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তারা আমার ব্যক্তিগত বন্ধু খুবই করিৎকর্মা ও প্রাণবন্ত মানুষ। সম্প্রতি ফিলিপাইনের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে তারা সেখানে গিয়েছিলেন। সে নির্বাচনে একুইনো কোরাজন বিজয়ী হতে পেরেছিলেন। আমার পাকিস্তানে ফিরে যাওয়াটাকে সমর্থন জানালেন তারা। পাকিস্তানে একটি অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে রাজি হলেন। তারা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, পাকিস্তানে ফেরার পর পরিস্থিতিকে খুব গভীরভাবে তারা পর্যবেক্ষণ করবেন।

মার্ক সেগেল নামের একজন রাজনৈতিক পরামর্শকের (Political Consultant) সঙ্গে ১৯৮৪ সালে ওয়াশিংটনে গিয়ে দেখা করি। তিনি খুবই হেল্পফুল লোক, নির্বাচিত মার্কিন জনপ্রতিনিধি ও প্রভাবশালীদের বোঝালেন যে, তারা যেন পাকিস্তানের শাসকদের এই মর্মে সতর্ক করে দেন যেন, আমার ওপর কোন অন্যায় পদক্ষেপ নিলে তারা পরিণতি ভালো হবে না। এছাড়া বাড়তি সতর্কতা স্বরূপ তিনি আমাকে একটা বুলেট প্রুফ জ্যাকেট কিনে দেন।

আমেরিকায় সাংবাদিকরা আমার এবং ফিলিপাইনের কোরাজন একুইনোর মধ্যে অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পান। আমি এক নায়ক জিয়ার বিরুদ্ধে লড়ছি, কোরাজন ফার্দিন্যান্দ মার্কোসের বিরুদ্ধে লড়েছেন। তাদের মতে আমরা দু'জনেই বেশ রোমান্টিক। দু'জনেই নারী, ভূস্বামী পরিবার থেকে আসা, উভয়ই আমেরিকায় পড়ালেখা করা এবং একনায়কের হাতে উভয়ই প্রিয়জনকে হারিয়েছি। আমি হারিয়েছি আমরা বাবা এবং ভাইকে একুইনো কোরাজন হারিয়েছেন তার স্বামীকে। কোরাজন জনগণের হাতে ক্ষমতা দেবার জন্য শান্তিপূর্ণ বিপ্লব ঘটিয়েছেন, আর আমি পাকিস্তানে তাই করতে যাচ্ছি, দু'জনের সাদৃশ্য এ পর্যন্তই।

আবার আমাদের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্যও কম নয়।

মার্কোসকে উচ্ছেদ করতে কোরাজন একুইনো ফিলিপাইনের সামরিক বাহিনীর সমর্থন লাভ করেছিলেন, পাশাপাশি চার্চেরও সমর্থন ছিলো তার প্রতি। কিন্তু পাকিস্তানে এর

www.pathagar.com

কোনটিরই সমর্থন ছিলো না আমার প্রতি। পাকিস্তানের জেনারেলরা আমাকে মেনে নিতে পারতো না, কারণ আমি তাদের সৃষ্ট দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থাকে বিরোধীতা করতাম। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থার ফলে জেনারেলরা হ্রাসকৃত মূল্যে জমি পেত, ফ্রি গাড়ি পেত এবং শুল্কমুক্ত পণ্য কিনতে পারতো। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কেউ কেউ আমাকে সমর্থন দিলেও মৌলবাদীরা সমর্থন দিত এক নায়ক জিয়ার সরকারকেই।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মার্কোস ও জিয়ার প্রতি মার্কিনীদের সমর্থনের প্রশ্ন।

মার্কোসকে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে সহায়তা করেছিলো আমেরিকা। জিয়ার সরকারকেও নানাভাবে সহায়তা করত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তৎকালীন রিগ্যান সরকার-পাকিস্তানের অর্থনীতি ও সামরিক খাতে সাহায্য বাবদ ৪.২ বিলিয়ন ডলার দিয়েছিল জিয়াকে। জিয়ার পেছনে হোয়াইট হাউসের শক্ত সমর্থন ছিল। সে তুলনায় আমেরিকার তরফ থেকে আমি প্রকৃত সহায়তা পেয়েছি সামান্যই। মার্কিন সরকারের মধ্যে আমার কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী আছে, প্রচার মাধ্যমেও সেরকম কিছু লোকজন আছে, এদের ছাড়া তেমন সহায়তা আমি মার্কিনীদের তরফ থেকে পাইনি। আমেরিকায় অনেক সাংবাদিক আমার সঙ্গে পাকিস্তানে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে বলেছিলো, 'বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে রাখাটাই বড় ইনসুরেন্স'। আমি তাদের ধন্যবাদ দিলাম, আর মনে মনে ভাবলাম, ফিলিপাইনের বেনিগনো একুইনোর পেছনেও এরকম অনেক বিদেশী সাংবাদিক ছিলো, তারপরও তাকে আততায়ীর গুলিতে নিহত হতে হয়েছিলো নিজ দেশের মাটিতে।

ব্রিটেনের বারবিকানের বাড়িতে কে বা কারা যেন আমার সদর দরজার নিচে একটা চিরকুট রেখে যেত তাতে লেখা থাকত (Remember Aquino) 'একুইনোর কথা স্মরণ কর'।

পাকিস্তানে ফিরলে আমি মরবো, না বাঁচবো, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। এ নিয়ে যেন আর চিন্তাও করতে পারছিলাম না। কপালে যা লেখা আছে, তাই হবে। আমি কি করি না করি তাতে কিছু যায় আসে না। আমার প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করে চলবো। বাবার নামে ওমরাহ করার মনস্থ করলাম। তাই ওয়াশিংটন থেকে ফিরেই কিছু সহযাত্রীদের সঙ্গে মক্কায় চলে গেলাম ওমরাহ করার জন্য। ১৯৭৮ সাল থেকেই আমার বড়ো ইচ্ছা বাবার নামে ওমরাহ করবো। দু'দুবার উদ্যোগও নিয়েছিলাম কিন্তু তথাকথিত ইসলামিক সরকার আমাকে মক্কা যেতে অনুমতি দেয়নি। আমি জানি না সামনের দিনে আমার ভাগ্যে কি ঘটবে, হয়ত ওমরাহ করার এটাই শেষ সুযোগ।

মক্কায় ওমরাহ করার সময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম, হে আল্লাহ তুমি শান্তিদাতা, তুমি শান্তিময়, তুমি আমাদের শান্তি দাও।

আমরা কাবা শরীফ ৭ বার প্রদক্ষিণ করলাম, মসজিদে নামাজ আদায় করলাম। নামাযান্তে দোয়া করলাম আমার বাবার জন্য, সামরিক সরকারের হাতে নিহত সকল শহীদদের জন্য, আমার ভাই শাহ নেওয়াজ এবং যারা এখনো সামরিক জান্তার বন্দি কারাগারে দিন কাটাচ্ছেন তাদের সবার জন্য।

এরপর আরও একদিন আমি মক্কায় অবস্থান করলাম দ্বিতীয়বারের জন্য ওমরাহ করার জন্য। এবার ওমরাহ করলাম নিজের জন্য। খোদার কাছে মাগফেরাত চেয়ে, আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ হয়ে আবার ফিরলাম রাজনীতির জগতে। মক্কা থেকে চলে গেলাম সোভিয়েত

www.pathagar.com

ইউনিয়নে, সেখানে একটি নারী সংগঠনের নিমন্ত্রণ ছিলো আমার।

রাশিয়াতে যাওয়ায় আমাকে আমেরিকাপন্থি বলে পিপিপি'র এক শ্রেণীর নেতাকর্মীরা যে অভিযোগ করে, আশা রাখি এখন তার নিরসন হবে। পাকিস্তানে ফিরে যেতে যথাসম্ভব সকল তরফের সহযোগিতা আমার দরকার।

মার্চের ২৫ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিলাম যে, আমি পাকিস্তানে ফিরছি এপ্রিলের ১০ তারিখে। এই খবর প্রচারিত হবার পর আন্তর্জাতিক মিডিয়া লন্ডনে এসে ভিড় জমাতে শুরু করলো। ভাবলাম, আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি, যে কারণে ওরা এসে ভীড় করছে। কিন্তু মিডিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্যখানে। তারা বিষয়টি দেখছে একজন তরুণীর সঙ্গে একজন সামরিক একনায়কের বেদনাদায়ক এবং নাটকীয়ময় সংঘাত হিসাবে। আমেরিকার সিবিএস নিউজ সার্ভিস আমাকে নিয়ে ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠান প্রচার করল। 'ভ্যানিটি ফেয়ার' ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে আমার ছবি ছাপলো, লন্ডনের ব্রেকফাস্ট টেলিভিশনে এবং আমেরিকার স্যাটেলাইট টেলিভিশনগুলি আমাকে নিয়ে সংবাদ প্রচার করা শুরু করলো। বিবিসির ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে ইংরেজিতে আমার সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করলো। পাশাপাশি বিবিসির উর্দু বিভাগ উর্দুতে সাক্ষাৎকার নিয়ে তা সম্প্রচার করলো। এছাড়া এসোসিয়েটেড প্রেস (এপি), ইউপিআই, চ্যানেল ফোর, ব্রিটিশ সংবাদপত্রসমূহ সবাই আমার সাক্ষাৎকার প্রচার করলো। আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে আমি ব্যাপক কভারেজ পেলাম, এক্ষেত্রে পিপিপি জিয়ার চ্যালেঞ্জকে সফলভাবেই মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু পাকিস্তানে কী ঘটে চলেছে তা বোঝা যাচ্ছিলো না।

অনেক বছরের শোষণ নির্যাতনে চাপা পড়া মানুষ কি প্রতিবাদী হয়ে উঠবে। জেকব টিযারম্যানের জেলের ডাইরি। ইন প্রিজন উইথ আইউ এ নৈম সেল উইদাউট নাম্বারে লিখেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার লোকেরা শ্বেতাঙ্গদের পাশবিক শাসনে শাসকদের প্রতি তাঁদের ঘৃণা, ভীতি এবং নির্লিপ্ততা এই তিনটিই ছিল। পাকিস্তানের নির্যাতিত মানুষ তাদের ক্ষোভ ঘৃণা আর ভীতি নিয়ে কি উঠে দাঁড়াবে। মানুষ কি পিপিপির ডাকে সাড়া দেবে নাকি নীরব থেকে নিজেদের রক্ষা করবে? কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না, পাকিস্তানের প্রায় সকল প্রজন্মই সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠেছে, ১৯৭৭ সালের জুলাইয়ে যে শিশুটির বয়স ছিল ১০ বছর, সে এখন সে এখন ১৯ বছরের পরিপূর্ণ যুবক। সে তার অধিকার সম্পর্কে কিছুই জানে না, যা সে কখনোই পায় নাই তার জন্য সে কি লড়াই করবে?

ঘোষণা দেবার পর পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া এখন অপরিহার্য। সারা দুনিয়ার দৃষ্টি এখন আমাদের দিকে। আমি পাঞ্জাবের পিপিপি সভাপতি জাহাঙ্গীর বাবরকে জিজ্ঞেস করি, 'লাহোরে আমাদের জমায়েতে কত লোক হতে পারে?' সে জবাব দেয় ৫ লাখ লোক জমায়েত হবে। আমি তাকে বলি, এটা তো অনেক বেশি বলে ফেলেন। তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, অবশ্যই ৫ লাখ লোক জমায়েত হবে। আপনি লন্ডন ত্যাগ না করার আগেই কিল বিল করে অসংখ্য জনতা লাহোরের দিকে ছুটবে।

আমি তাকে বললাম, আমি আশ্বস্ত হতে পারছি না, তবে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তুমি জবাব দেবেন এক লাখ লোকের কথা, কখনোই পাঁচ লাখের কথা বলবেন না তাছাড়া জনসমুদ্রে লোকসংখ্যা অনুমান করাও কঠিন।

www.pathagar.com

এপ্রিলের ১০ তারিখে লন্ডন থেকে লাহোর যাবার কোন ফ্লাইট ছিলো না, তাই ৯ তারিখে পিআইএ'র সঙ্গে সংযুক্ত ফ্লাইটে লন্ডন থেকে সৌদি আরব যেতে হবে, সেখানে পিআইএ ফ্লাইটে লাহোর যেতে হবে। আমার সফরসঙ্গী হিসেবে থাকছে বশির, রিয়াজ, নাহিদ, সফদার এবং আমার স্কুল জীবনের বান্ধবী হুমায়রা, এছাড়া লন্ডন থেকে আসা আরো অনেক পাকিস্তানি। পিআইএ ফ্লাইটের ক্রুরা খুব অমায়িক। তারা আমাদের পার্টি কর্মীদের সঙ্গে আনা ফেস্টুন ব্যানার স্টিকার, পতাকা কোন কিছুতেই বাধা দিলেন না। নয় বছর যাবত মানুষ এগুলো ভুলেই গিয়েছিলো। বিমানে যাত্রীদের ৩০ জনই ছিল পিপিপির সদস্য এবং আমাদের সঙ্গে আসা সাংবাদিক। মনে হচ্ছিল আমরা একটা বহর নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের নিয়ে সেখানে একটা উৎসবের আমেজ বিরাজ করছিল। যদিও বিপদ সংকুল পথে যাচ্ছি আমরা। সৌদি আরবের দাহরানে যাত্রা বিরতির সময় সৌদি কর্তৃপক্ষ আমাকে একটি স্পেশাল রেস্ট হাউসে নিয়ে গেল। আমি সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। সেখানে আমি একা একা অপেক্ষা করছি। পরে জানতে পারলাম, পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতও একই সময় প্লেনে করে দাহরানে এসে হাজির। সৌদি কর্তৃপক্ষ নাকি আমার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

পাকিস্তান থেকে অব্যাহতভাবে হুমকি আশা শুরু করলো। পার্টির নেতা নাহিদ, বশির এবং আরেকজন সম্পর্কে বলা হলো, গ্রেফতারের তালিকায় তাদের নাম রয়েছে। আমাকে না ফেরার জন্য তাদের উপর এতো চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

মন থেকে সকল ভীতি ঝেড়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করলাম এবং প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কাজ শুরু করলাম। সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তান থেকে আসা পিপিপির কর্মী বোঝাই বাস চলাচলে বাঁধা সৃষ্টি করলো সরকার। পাকিস্তানে পৌঁছানোর পর সেখানে আমাদের জন্য কী ধরনের সম্বর্ধনা অপেক্ষা করছে, এখানে বসে আমাদের কারো সে বিষয়ে ধারণা ছিল না।

লাহোর, ৯ এপ্রিল, আমিলা পিরাচা :

> বেনজির লাহোরে আসার আগের রাতে শহরে যেন বড় কোন উৎসব শুরু হয়ে যায়। মিসেস নিয়াজি, আমার স্বামী সেলিম এবং আমি সে রাতে ইসলামাবাদ থেকে লাহোরে চলে আসি বেনজিরকে সংবর্ধনা জানাতে। আমাদের কেউই সে রাতের মতন উৎসবমুখর দৃশ্য ও আনন্দ জীবনে আর কখনো দেখিনি। শহর জুড়ে বিভিন্ন স্থানে তাবু পোতা হয়েছে সেখানে খাবার দাবার চলছে, এয়ারপোর্ট থেকে আসার রাস্তায় স্থানে স্থানে খাবারের স্টল তৈরি করা হয়েছে, সারা শহরটি যেন জনগণের হাতে চলে গেছে।
>
> সুজুকী ভ্যানে ছাত্রেরা রাস্তা দিয়ে টহল দিচ্ছে, তারা ভুট্টোকে নিয়ে নানা ধরনের গান গাইছে, নাচছে। পাঞ্জাবী ভাষায় ওই গানের অর্থ দাঁড়ায়, 'আজকের দিন শুধুই ভুট্টো ভুট্টো'। লোকজন কেউ গাড়িতে, বাসে, ট্রাকে, কেউবা পায়ে হেঁটে আসছে। আমি দেখলাম বাসের বহরে প্রতিটি বাসেই মানুষে ঠাসা। বাসে ব্যানারগুলো হাওয়ায় দুলছে, বিভিন্ন স্থানের নাম লেখা আছে ব্যানারে। লেখা ছিল দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত শোষণ নির্যাতন নিপীড়ণের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান।
>
> সারা রাত জুড়ে কেউ ঘুমায়নি, আমরা শহরময় ঘুড়ে বেড়িয়েছি পায়ে হেঁটে, আমাদের সঙ্গে এক বৃদ্ধলোক হাঁটছিলো, তার চোখে ছিল জল। আরেক বৃদ্ধাও এসে যোগ দিলো, সে

www.pathagar.com

ফুপিয়ে কাঁদছিলো। তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন, ভুট্টোর জন্য কাঁদে নাই এমন লোক খুঁজে পাওয়া ভার, আর এখন বেনজির ফেরার সংবাদে উল্লসিত হয় নাই এমন লোকও খুঁজে পাওয়া ভার। লাহোরে সে রাত আমাদের জীবনের সবচাইতে সুন্দরতম অভিজ্ঞতার রাত।

ড. আশরাফ আব্বাসী

এটা যেন আরেক ঈদ, লোকেদের মাঝে ভাত গোশত এবং ফলমূল বিলিয়ে দেয়া হচ্ছে, সবখানেই লোকজন নাচছে, গাইছে, ড্রাম এবং করতালির শব্দে উৎসবমুখর সারা শহর। ক্যাসেট প্লেয়ারে ভুট্টোকে নিয়ে উচ্চ শব্দে গান বাজছে যেগুলো ছিল খুবই জনপ্রিয় সঙ্গীত। অনেকগুলো বেনজির ও পিপিপিকে নিয়ে গাওয়া গান, পিপিপি'র পতাকা ভবনের বারান্দায় বারান্দায় এবং লাইটপোস্টগুলোতে শোভা পাচ্ছিলো, লোকেরা লাল সবুজ এবং কালো কাপড় বেঁধে জমায়েত হচ্ছিলো। এমনকি পিপিপির প্রতিপক্ষ মৌলবাদী জামাতে ইসলামির সমর্থকরাও বেনজিরের ব্যানার স্টাকার ও ছবি বিক্রি করা শুরু করে দিয়েছিলো রাস্তায় রাস্তায়, আমাদের জনসমর্থনকে কাজে লাগিয়ে তারাও টু পাইস কামিয়ে নিচ্ছিলো।

মিসেস নিয়াজি

লাহোরের সে রাতের দৃশ্য ছিল দেখার মত। এ জন্য আমার স্বামী ও কন্যা ইয়াসমিনকে যারপর নাই সাধুবাদ জানাই। বেনজির যাতে না ফিরতে পারে, সেজন্য ইসরামাবাদে সামরিক জান্তা পিপিপির নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেও লাহোরের জনতা এখন উৎসবের জ্বরে ভুগছে।

একবার একজন মহিলা আমাকে বলেছিলেন, পাকিস্তান পিপলস পার্টির দিন শেষ, মানুষ আর ভুট্টোর নাম ভুলেও মুখে আনবে না, আজকের এই অবস্থা দেখে সেই মহিলাকে বলতে ইচ্ছা করছে পিপিপি নিঃশেষ হবার নয়, কারণ জনগণই তার পার্টি। এমনদিন আসবে যেদিন স্বাধীনভাবে ভুট্টোর নাম লেখা যাবে। এখন সেই দিন এসে গেছে, জনতা তাদের আবেগ আর ধরে রাখতে পারছে না।

সামিয়া

জনতার ভীড় ঠেকাতে এয়ারপোর্টে কাঁটাতার এবং লোহার তৈরি অসংখ্য ব্যারিকেড স্থাপন করেছে কর্তৃপক্ষ। এমনকি এয়ারপোর্টের এন্ট্রি রুটে ও ডিপারর্চার রুটে সৃষ্টি করেছে খুব কড়াকড়ি। এয়ারপোর্টে মাত্র ২শ জনকে ঢোকার অনুমতি দেয়। আমরা ঢোকার পাশ পেলাম। ওরা আমাদের পেছনের পথ দিয়ে এয়ারপোর্টের ভিতরে নিয়ে গেল। আমাদের কপালে কি ঘটবে তা বুঝতে পারছিলাম না, তবুও নিজেদের খুব সুখী মনে হল।

ড. আব্বাসী

আমাদের আনন্দ ছিল ভীতি মিশ্রিত, বেনজিরের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা বেনজিরের চারপাশে ঘিরে অবস্থান করবো এবং একটা মানব প্রাচীর গড়ে তুলবো। জনতার এই মহাসমুদ্রে কোনখানে কে কী উদ্দেশ্যে লুকিয়ে- তা কে বলবে।

www.pathagar.com

সকাল ৭টার আগে বিমানে পাইলটের কণ্ঠ ভেসে আসলো। তার ঘোষণা যেন জনসভায় দেওয়া ভাষণের মতো শোনাচ্ছিলো। তিনি বলছিলেন, 'আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই লাহোরে এসে পৌঁছাবো। পাকিস্তানে ফেরার জন্য আমরা বেনজিরকে স্বাগত জানাই।'

বিমানের এটেন্টডেন্ট আমার আসনের কাছে চলে এসে বলল, 'পাইলট গ্রাউন্ড থেকে একটি বার্তা এসেছে তাতে বলা হয়েছে আপনার জন্য বিমানবন্দরে দশ লক্ষাধিক লোক অপেক্ষা করছে। দশ লক্ষাধিক মানুষ! আমি জানালার কাছে গেলাম, পাঞ্জাবের সবুজ শস্যক্ষেত ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। পেছন থেকে এটেনডেন্ট বলল, 'বিমানের ককপিঠে এসে দেখুন' সেখান থেকেও কিছুই দেখা গেল না। দৃষ্টি সীমানায় রানওয়ে এবং তার চারপাশ ও এয়ারপোর্টের ভবনের ছাদে কিছু আবছা ছায়ামূর্তির মত দেখা গেল। বিমান অবতরণ করার পর দেখলাম তারা সবাই নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য। সেখানে নিরাপত্তার কড়াকড়ি এতটাই ব্যাপক ছিল যে, অন্যান্য ফ্লাইটের অবতরণও বাতিল করে দেয়া হয়।

আমি নাহিদ বশির এবং দারাকে আমার কাছাকাছি থাকতে বললাম, কারণ তাদেরকে আটক করতে পারে জিয়া জান্তা। উল্টো তারা আমার চারপাশে এসে দাঁড়ালো আমার নিরাপত্তার জন্য। সাংবাদিকরা বললো, আপনার নিরাপত্তার জন্য আমরা আছি। বিমানবন্দরের বাইরে লোকে লোকারণ্য। ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা তাদের আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত শেষ করলেন। আমাকে নিয়ে তারাও খুব উদ্বিগ্ন ছিল। কি করে আমাকে বিমান বন্দর থেকে দ্রুত বাইরে পাঠাবে।

আমি পাকিস্তানের মাটিতে পা রাখলাম, মনে হল যেন আমার পায়ের নিচে গোটা পৃথিবীটাই চলে এসেছে, আমি বুক ভরে শ্বাস নিলাম। লাহোর! এই নগরে আমার অনেক আনন্দময় সময় কেটেছে, এখানে আমি বহুবার এসেছি। আর এখানেই আমার বাবার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এখন সেখানে আমি আসছি বাবার হত্যাকারী সেই জেনারেলের চ্যালেঞ্জ হয়ে।

বিমান থেকে নামার পর সামিয়া আমার গলায় গোলাপের মালা পরিয়ে দিলো। বিমানবন্দরের বাইরে লোকে লোকারণ্য, আমি বললাম– 'এত লোকের ভীড়ে কিভাবে যেতে হবে!

জাহাঙ্গীর বললো, আপনাকে নেবার জন্য বিশেষ ট্রাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ট্রাকে ওঠার জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা করেছে, সিঁড়িটি নড়বড়ে। মাঝে মাঝে সিঁড়ি নিয়ে আমি দুঃস্বপ্ন দেখতাম। আর হঠাৎ করে সেই সিঁড়ি আমার সামনে, এই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে চাচ্ছি না। কিন্তু আমাকে উঠতেই হবে। আমার দিকে হাজার চোখের দৃষ্টি। লন্ডনে বসেই আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম বিমানবন্দর থেকে প্রথমে যাব মিনার-ই-পাকিস্তানে, এটা একটি স্মৃতিসৌধ, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী স্মরণে আমার বাবার আমলে লাহোরে এটা নির্মিত হয়েছিল। লন্ডনের সেই পরিকল্পনা এখন আর বাতিল করা যাবে না।

বিমানবন্দরের বাইরে লাখ লাখ লোক আমার জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। বুক ভরে শ্বাস নিলাম এবং বিসমিল্লাহ বলে সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখলাম।

জীবনে কিছু কিছু মুহূর্ত রয়েছে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, আমার লাহোরে ফেরা তার মধ্যে একটি।

রাস্তাজুড়ে মানুষ মানুষ আর মানুষ। বাড়িঘরের বেলকোনীতে, ছাদে, রাস্তার পাশের

www.pathagar.com

গাছে, লাইটপোস্টে, রাস্তায় নিচের মাঠে– যেখানেই দৃষ্টি যায় শুধু মানুষ, জনতার মহাসমুদ্র বললেও যেন কম বলা হবে। বিমান বন্দর থেকে ইকবাল পার্কে অবস্থিত মিনার-ই-পাকিস্তানের দূরত্ব মাত্র আট মাইল। গাড়িতে যেতে বড় জোর পনের মিনিট সময় লাগার কথা। কিন্তু ১৯৮৬ সালের ১০ এপ্রিলের সেই স্মরণীয় দিনে, আট মাইল পথ যেতে আমার সময় লেগেছিল টানা দশ ঘণ্টা।

বিমানবন্দরে লোক সমাগম হয়েছিল প্রায় দশ লক্ষাধিক। এরপর সেটা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। যখন আমি মিনার-ই-পাকিস্তান স্মৃতিসৌধে পৌঁছলাম তখন মনে হল লোক সমাগম হয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষাধিকেরও বেশি। বিমান বন্দরের গেট দিয়ে বের হবার পর জনতা হাজার হাজার লাল-নীল রঙিন বেলুন আকাশে উড়িয়ে দিলো। আমাকে গোলাপ ছুড়ে দিতে লাগলো, চারদিকে শুধু ফুলের পাপড়ি ছড়াচ্ছে তারা।

এক মেয়ে আমার দিকে গোলাপ ফুলের মালা ছুঁড়ে দিচ্ছিলো। পরে জেনেছি জিয়াজান্তা ওই মেয়েটির ভাইকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে।

আমিও মেয়েটির দিকে একটা গোলাপ ছুড়ে দিলাম। জনতার ছুড়ে দেয়া গোলাপ এবং ফুলের মালা দিয়ে আমার ট্রাকটি ভরে যাচ্ছিলো। গোলাপ ছাড়াও জনতা ট্রাকের দিকে হাতে তৈরি দোপাট্টা এবং রুমাল ছুড়ে দিচ্ছিল। আমি তার একটা দোপাট্টা ধরে কাঁধে রাখলাম অন্য আরেকটি মাথায় রাখলাম। জিয়া শাহীর আমলে যারা নিহত কিংবা নির্যাতিত হয়েছেন, আমি তাদের দিকে ফুলের মালা, দোপাট্টা এবং নকশা করা রুমালগুলো ছুড়ে দেই। পিপিপির কর্মীরা জনসমুদ্রের মধ্যে লাল কালো এবং সবুজ রঙের পোশাক পড়ে এসেছিলো। তাতে মনে হচ্ছিলো, সেদিনের লাহোর নতুন রঙে যেন মেতে উঠেছে। সারা শহর জুড়ে দুলছিলো পিপিপি'র পতাকা ও ব্যানার।

মানুষজন কালো সবুজ এবং লাল রঙের জ্যাকেট, দোপাট্টা, সালোয়ার কামিজ এবং টুপি পড়ে এসেছিলেন। অনেকের হাতে ছিল আমার বাবা, মা, ভাই এবং আমার ছবি। জনতা শ্লোগান দিচ্ছিলো– 'ভুট্টো অমর হোক' 'আমার বোন তোমার বোন বেনজির বেনজির' 'বিপ্লব আসছে, বেনজির স্বাগতম। জনতা উর্দু পশতু এবং সিন্ধি ভাষায় শ্লোগান দেয়। আমি যখন জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ি জনতা তখন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো দুলে ওঠে। আমি যখন মাথার ওপর দু'হাত তুলে করতালি দেই, যেটা আমার বাবাও করতেন, জবাবে জনতাও দু'হাত তুলে তুমুল করতালি দিত, যেন ভরা শস্যক্ষেতে মাতাল বাতাস বইছে।

দশ ঘণ্টার ভ্রমণের পুরো সময়টাই আমি ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের আট মাইলের যাত্রাপথেই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন 'গভর্নর হাউস' পড়ে। আমরা এক পর্যায়ে তার সামনে দিয়ে যাই। যেখানে আমাদের পরিবার মাঝে মাঝে বসবাস করতো, আর এখন থাকে আমার বাবার ঘাতক জেনারেল জিয়াউল হক। যিনি এখন সেখানে বিনিদ্র রজনী কাটান। যিনি হয়তো সেক্সপিয়ারের লেডি ম্যাকবেথের মতো অপরাধ আতঙ্কে করিডোর দিয়ে শুধু পায়চারী করেন।

এরপর আমরা একটি ক্যানোপি অতিক্রম করি যেখানে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একটি

www.pathagar.com

মুর্তি ছিল। মৌলবাদীরা যেটাকে ভেঙে ফেলেছে। এরপর জনজমায় কিমগান, বিখ্যাত ইংলিশ লেখক রুডায়ার্ড কিপলিংয়ের স্মৃতিধন্য এলাকা এটি। আমি যেন নিয়তই আলোর পরশ পাচ্ছি। আমি ঠিক উপলব্ধি করছি– গণতন্ত্রের জন্য যারা শহীদ হয়েছিলেন এই জনতার ভীড়ে তারাও অবস্থান করছেন। এই শোভাযাত্রায় বিজয়ের পরিবেশ ছিল। জিয়ার মিথ্যা মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত নির্যাতিত এবং ভুক্তভোগীরা যেন জনসমাগমে চিৎকার করে বলছে, 'জিয়াউল হক, আমরা তোমাকে চাই না, তোমার পুতুল মিথ্যা সংসদ চাই না, মিথ্যা সংবিধান চাই না, তোমার একনায়ক শাসন থেকে মুক্তি চাই তোমার লাঠি, গুলি টিয়ার গ্যাসের চেয়েও আমাদের চেতনা আরও শক্তিশালী। আমরা একনায়কত্ব চাই না, আমরা নির্বাচন চাই।'

যদিও আমি খোলা ট্রাকে তবুও আমার ভয়ের কিছু ছিল না। লাখ লাখ মানুষের সামনে আমাকে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। করার চেষ্টা করলে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। সেনাবাহিনী এবং পুলিশের তরফ থেকে এখন আর ভয়ের কিছু নেই। আমরা যখন মিনার-ই-পাকিস্তানে চলে এলাম তখন সূর্য ডুবিডুবি। জনতার ভীড়ে মাটিতে এক ইঞ্চি জায়গাও ফাঁকা নেই। ভীড়ের চাপে সিকিউরিটি গার্ড পর্যন্ত ছিলো না।

এই ভীড়ের মধ্যে ট্রাক থেকে নেমে মিনার-ই-পাকিস্তানের বেদিতে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। মাত্র চার থেকে পাঁচজন সহকর্মী আমার চারপাশে ঘিরে রেখে ভিড় ঠেলে পথ করে দিল। জনতার ভীড় মানে কোনো অনিষ্টকর কিছু নয়– হয়তো কিছু বিড়ম্বনা এই যা। মানুষ কেবলি আমার দিকে আসতে চাইছে, আর আমার চারপাশে বৃত্তের মত থাকা সহকর্মীরা তাদের ঠেকিয়ে আমাকে জায়গা করে দিচ্ছে। এতো ভীড় ঠেলে যাওয়াটা ছিলো প্রায় দুঃসাধ্য, মনে হলো– এবার বুঝি নির্ঘাত মৃত্যু। নয়তো আধামরা হবার দশা হবে। অনেকেতো সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমাকে কর্ডন করে নেয়ার সময় ভীড় ঠেলে জায়গা করতে গিয়ে একজন স্থানীয় পিপিপি নেতাও সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কোনো প্রকারে আমরা তাকে ভীড়ের বাইরে পাঠাতে পারি। এভাবে প্রাণান্ত প্রচেষ্টার পর আমি কোনো প্রকারে স্মৃতিসৌধের বেদীতে পৌঁছাতে সক্ষম হই। সেখানে পাঞ্জাবের পিপিপি'র সভাপতি বেদী থেকে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে আমাদের জায়গা করে দেয়। পাশের জনকে বললাম, 'নিরাপত্তার বিষয়ে আমাদের ভাবা উচিত নয় কি।'

ইকবাল পার্কে যা দেখলাম, সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। রাস্তাজুড়ে লোকে লোকারণ্য। সেখান থেকে লাল মার্বেল পাথরে নির্মিত বাদশাহী মসজিদ দেখা যাচ্ছে, এটি পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বড় মসজিদ। সূর্যাস্তের লাল আভায় মসজিদ থেকে লাল আলোর বিকিরণ ছড়াচ্ছে। দিনের আলো নিভে যাবার পরেও চোখে পড়ছিলো লাহোর দুর্গ। মোঘল আমলে নির্মিত এই দুর্গের অন্ধকার কারাকক্ষে, জিয়াজান্তা তার পেটোয়া বাহিনী দিয়ে পিপিপির অসংখ্য সমর্থকের উপর চালাত অকথ্য নির্যাতন এবং অনেকের মৃত্যুও হয়েছে সেখানে। চারদিকে মানুষজন আমাকে দেশে ফিরে আসায় স্বাগত জানাচ্ছিল। অনেক সময় কেউ কেউ আমাকে রাজনীতি ছেড়ে দেয়ার জন্যও পরামর্শ দিতো, তারা আমাকে বলতো, 'আপনার পিতা এবং ভাইয়ের ভাগ্যবরণ করবেন আপনি'। অনেকে বলতো, মেয়েদের রাজনীতি করার জন্য পাকিস্তান এখনো উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি।

আমি তাদের সাফ জবাব দিতাম, 'আমার পার্টিই আমাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা

করবে' । আমি আরও বলতাম, নিজ জ্ঞানেই এই কণ্টকিত পথ বেছে নিয়েছি এবং মৃত্যু উপত্যকার উপর দিয়ে হাঁটছি ।

সমাবেশে মাইকের ব্যবস্থা তেমন ভালো ছিল না, তাছাড়া এত লোকের যে সমাগম হবে তা কারো ধারণাই ছিল না । জনসমুদ্রের মাত্র দশ ভাগের এক ভাগের কাছেই মাইকের আওয়াজ পৌঁছাতে পারে ।

তাছাড়া জনতা আমার মুখভঙ্গী দেখেই বুঝতে পারছে, আমি কি বলতে চাইছি । আমি ভাষণ দেয়া শুরু করলাম । বললাম, এখন থেকে মানুষের অধিকার সুরক্ষার জন্য আমার জীবনকেই উৎসর্গ করবো' । আমি জনতার উদ্দেশ্যে বললাম, 'আপনারা কী স্বাধীনতা চান, আপনারা কি গণতন্ত্র চান আপনারা কি দেশে একটা বিপ্লব চান', ত্রিশলক্ষ কণ্ঠ একসাথে গর্জে উঠলো হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ বলে । আমি বলতে শুরু করলাম 'আমি দেশে ফিরে এসেছি গণমানুষের কাজ করার জন্য, কোনো প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নয় । প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধের রাজনীতির কবর দিয়ে গেলাম, আমি পাকিস্তানকে গড়ে তুলতে চাই । এখন আপনাদের কাছে সম্মতি চাই, আপনারা কি চান জিয়ার সরকার ক্ষমতায় থাকুক? লাখ লাখ কণ্ঠের প্রতিধ্বনি হলো– 'না না না' । আমি বললাম, তাহলে জনতার বিচারে সিদ্ধান্ত হলো জিয়াকে বিদায় নিতে হবে । জনতাকে আবার বললাম– আপনারা কি চান জিয়াকে অবশ্যই চলে যেতে হবে । লাখ কণ্ঠ আকাশ বাতাস বিদির্ন করে উচ্চারিত হল 'হ্যাঁ তুমি জিয়া চলে যাও' ।

এতো লোকের সমাগম, ভর দিনব্যাপী কর্মসূচি অথচ কোনো সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি সেদিন । জনগণ খুব দায়িত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে । কেউ কেউ আশঙ্কা করেছিলো সরকার কোনো অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করতে পারে । কিন্তু সেদিন আমার একটি মাত্র নির্দেশে জনতা মুহূর্তেই ভেঙে তছনছ করে দিতে পারতো পাঞ্জাবের মিনিস্টারস হাউস, পাঞ্জাব এসেম্বলী এবং লাহোর হাইকোর্ট । যে হাইকোর্টে জিয়া আমার বাবাকে ফাঁসী দিয়ে হত্যা করেছে । কিন্তু আমরা রক্তাক্ত সহিংস পথে ক্ষমতায় আসতে চাই না । আমরা শান্তিপূর্ণ পথে বৈধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে চাই এবং দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই'। সহিংসতার পথ ব্যবহার করে এই সরকার নিজেদেরই সমাধী খুড়ছে ।

গত আটচল্লিশ ঘণ্টার একটানা উত্তেজনাময় সময়ের পর রাতে কেবলি এসে বিছানায় শুয়েছি ঘুমাবো বলে, এমন সময় আমার দরজায় কে একজন এসে কড়া নাড়লো । খুলে দেখি, আমার নিরাপত্তা কর্মী সে জানালো, খালেদ আহমদের বাসা সামরিক বাহিনীর সদস্যরা তছনছ করেছে । আমার নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় দলীয় নেতারা আমার থাকার জন্য তিনটা স্থানের ব্যবস্থা করেছিল । এই বাড়িগুলোর মধ্যে একটি ছিল খালিদ আহমেদের পরিবারের । মিনারে পাকিস্তান থেকে ফিরে প্রথমে খালিদ আহমেদের বাসায় বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রেস ব্রিফিংয়ে মিলিত হই । সেই বাড়িতে আমি অবস্থান করছি সন্দেহে সামরিক বাহিনীর একজন মেজর আমাকে খুঁজতে আসে এবং সারাবাড়ি তছনছ করে ।

www.pathagar.com

আজরা খালিদ

আমি তখন ঘুমুচ্ছিলাম, আমার এক গৃহকর্মী আমাকে জাগিয়ে দেয়, দেখি তার শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছে। পরে জানা গেল, চৌদ্দ-পনের জনের সামরিক সদস্যদের একটি দল আমার বাড়ির সীমানা প্রাচীর টপকিয়ে ভেতরে চলে আসে। সদর দরজা তালাবদ্ধ থাকায় তারা পেছনের দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ে। ফুলদানীগুলো জানালা দিয়ে ফেলে দেয়। তাদের দল নেতা মেজর কাইয়ুম হাতে পিস্তল ঘুড়াতে ঘুড়াতে বলে বেনজির কোথায়? পেছন থেকে একজন গৃহকর্মী তার ছেলের খেলার জন্য রাখা ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে মেজরের মাথায় সজোরে আঘাত হানে, তখন মেজর সাহেব চিৎকার করে নিজের পরিচয় দিয়ে বলে, আমি গোয়েন্দা কর্মকর্তা, একজন কমান্ডো।

আমি পুলিশকে খবর দেই পুলিশের গাড়ি বাড়ির গেটের সামনে আসার আগেই মেজর সাহেব তার দলবল নিয়ে পালাবার সময় পুলিশ তাদের আটক করে। পুলিশ মেজর কাইয়ুমের গাড়ি থেকে অনেকগুলো মদের বোতল উদ্ধার করে। ধারণা করা হচ্ছে, আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্যই এগুলো আনা হয়েছিলো। তার ফোন বইয়ে সরকারের পদস্থ মন্ত্রী ও জেনারেলদের নাম্বার ছিলো।

পরে সরকার তরফ থেকে বলা হয়– মেজর কাইয়ুম মানষিকভাবে অসুস্থ সে যা করেছে, সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু আমরা জানি কাইয়ুম পাগল ছিল না বরং বেনজিরের অবিশ্বাস্য জনসমর্থনে সরকারের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সেইজন্যই জান্তার তরফ থেকেই কাইয়ুমকে পাঠানো হয়েছে, হয় বেনজিরকে হত্যা করার জন্য কিংবা তাকে কর্মসূচী থেকে বিরত রাখার জন্য হুমকি দিতে।

মেজর কাইয়ুমকে জেলে পোড়া হয়। জেল থেকে মুক্ত হবার পর কে বা কারা যেন তাকে গুলি করে হত্যা করে। আমরা মনে করি শাসক জান্তাই তাকে হত্যা করেছে, কারণ অপরাধের প্রমাণ পৃথিবীতে রাখতে চায় না তারা।

আমাদের সমালোচকরা বলতে শুরু করলো যে, বেনজির লাহোরের মতো সংবর্ধনা আর অন্য কোথাও পাবেন না, অনেক সংবাদপত্রও একই ধরনের কথা বলতে শুরু করলো।

আমাদের পরবর্তী সফরসূচী ছিলো গুজরানয়ালা, ফয়সালাবাদ, সারগোধা, ঝিলাম এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে। কিন্তু আমাদের পরবর্তী সফরসূচীগুলোর অবস্থা, সমালোচকদের বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করে ছাড়লো।

এপ্রিলের ১২ তারিখে আমরা ঠিক করলাম দিনের মাঝামাঝি সময়ে লাহোর থেকে রওনা দেব গুজরানওয়ালার উদ্দেশ্যে। অনুমান করেছিলাম সেখানে পৌঁছাতে বড়জোর বিকেল পাঁচটা বাজবে। পৌঁছানোর পর সেখানে জনসমাবেশে যোগ দেব।

কিন্তু রাস্তায় গিয়ে দেখি পুরো রাস্তাজুড়ে লোকে লোকারণ্য। আমাদের ট্রাকের চারপাশে তারা ভীড় করে মাইলের পর মাইল হাঁটছে। যেখানে বিকেল পাঁচটায় পৌঁছানোর কথা চিন্তা করেছিলাম। সেখানে আমরা পৌঁছালাম পরের দিন ভোর পাঁচটায়। ভাবলাম মিটিং বুঝি আর হলো না, কারণ ততোক্ষণে আর লোক পাব কোথায়? কিন্তু সভাস্থলের খবর পেলাম লোকজনে ঠাসা পুরো ময়দান, কেউই বাড়ি ফিরে যায়নি, আমার অপেক্ষায় বিনিদ্র বসে ছিলো সারারাত। আমি বললাম, 'আমাদের দ্রুত যাওয়া উচিত' আমার একজন

www.pathagar.com

স্বেচ্ছাসেবক নিরাপত্তা কর্মী বললেন, এটা অসম্ভব, রাস্তা জুড়ে শুধুই মানুষ। গুজরানওয়ালা থেকে ফয়সালাবাদ দূরত্ব মাত্র আশি কিলোমিটার। এই পথটুকু অতিক্রম করতে আমাদের সময় লেগেছিল ষোল ঘন্টা। আমাদের সঙ্গে বাস, ট্রাক, রিকশা ও মোটর সাইকেল নিয়ে অনেকেই যোগ দিতে গিয়েছিলো জনসভায়। তারা আমাদের কাফেলাকে রাস্তার একদিক দিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলো। হাজার হাজার লোক সারারাত জুড়ে আমাদের সঙ্গে হেঁটেছে। আমি সারারাত ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে, জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছি লোকেরা সমস্বরে আমাকে নিয়ে গান গাইছে। সেই গানগুলোর কথা হলো, 'বেনজির আসছে, তাকে ফুল দিয়ে বরণ কর, তার পথে মুক্তা বিছিয়ে দাও।' আরেকটি গানের কথা হলো, 'হে খোদা, মানুষের সুখের সেই দিনগুলো আবার ফিরিয়ে দাও'। আমার এবং পিপিপি'র নেতাদের জন্য এই অভিজ্ঞতাটা ছিলো বিনয় ও মহানুভবতার। আমরা ট্রাকের ওপর আল্লাহর কাছে মোনাজাত করলাম, 'হে আল্লাহ, জনগণের স্বপ্ন পূরণের জন্য তুমি আমাদের সাহস দাও, শক্তি দাও'।

ফয়সালাবাদে আমরা পৌঁছানোর আগেই সূর্য উঠে গেল, আবারও এক দিন দেরি হয়ে গেল জনসভায় যোগ দিতে। এবারও ভাবলাম লোকজন আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু সভাস্থলে গিয়ে দেখা গেল একই চিত্র, পুরো ময়দানজুড়ে লোকে ঠাসা। আমাদের আগমনে হাজার হাজার কণ্ঠে উচ্চারিত হলো, 'কওউম কি তাকদির বেনজির বেনজির'। মানে জনগণের ভাগ্যের প্রতিক বেনজির বেনজির। কারখানায় শ্রমিকরাও পার্টির কথা ভুলে যাননি, যে পার্টি তাদের দিয়েছিলো মর্যাদা এবং কাজের নিশ্চয়তা। কারখানা মালিকেরা গেট বন্ধ করে রেখেছিলো যাতে শ্রমিকেরা মিটিংয়ে যেতে না পারে। কিন্তু শ্রমিকরা সীমানা প্রাচীর টপকিয়ে বের হয়ে জনসভায় যোগ দেয়।

ঝিলাম থেকে অসংখ্য লোক সামরিক বাহিনীতে রয়েছে। রাওয়ালপিণ্ডিকে সরকারি চাকরিজীবীদের শহর বলা হয়। এই শহরগুলোতে এতো জনসমাগম হওয়ায় জিয়ার প্রতি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল পিপিপি। সরকারের লোকজন এসে জমায়েত হচ্ছে পিপিপি'র ছাতার নিচে। পাকিস্তানে ফেরার পর আমাকে ঘিরে যে এতো জনসমাগম, বিপুল জনসংবর্ধনা অথচ সেখানে আমার কোনো ছবিই রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত হলো না। আর বলা হয়ে থাকে সামরিক শাসন উঠে গেছে।

যেখানে বিদেশী সাংবাদিকরা পর্যন্ত এতো জনসমাগম দেখে বিস্ময়ে হতবাক। তারা সেগুলো নিজ দেশে প্রচার করার সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিলো যথাযথভাবে।

এতো যে জনসমাবেশ, পার্টি মিটিং শোকসভা সংবাদ সম্মেলন করলাম, এগুলো করার এতো শক্তি যে কোথা থেকে পাচ্ছিলাম তা আমি বুঝি না। জনগণের এই বিপুল সাড়াই হয়তো আমাকে জাগিয়ে তোলে, শক্তি যোগায় টনিকের মত। আবার কোনো কোনো সময় বেদনায় মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে যায়, যখন কল্পনায় আমার বাবা ও ভাইয়ের মৃত্যুর দৃশ্য ভেসে ওঠে। তখন ভাবি, আহা! তারা যদি একটি বারের জন্য দেখতে পেতেন, এতো লোকের জনসমর্থন রয়েছে আমার পেছনে। বাবার সন্তান হিসেবে এই দেশের প্রতি আমার ঋণ আমি কোনদিনই শোধ করতে পারবো না। একইভাবে আমার পরিবারে প্রতি আমার ঋণও অনেক বেশি। নিজেকে আরও সহজ করার চেষ্টা করি। রাওয়ালপিণ্ডিতে যাওয়ার সময় কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে চাইলাম না। কারণ সেখানেই আমার

www.pathagar.com

বাবাকে এই জান্তা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে। কিন্তু আমি সেই বিয়োগান্তক ঘটনা এড়িয়ে যেতে পারি না।

গুজরানওয়ালায় পারভেজ ইয়াকুবের কবর জিয়ারত করলাম। যিনি প্রথম আমার বাবার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন। ১৯৮৪ সালের আগস্ট ট্রাজেডিতে যে তিনজন তরুণকে একসঙ্গে ফাঁসিতে হত্যা করা হয়েছিল, আমি তাদের জন্য দোয়া করলাম। সামরিক জান্তার হাতে যারাই শহীদ হয়েছিলেন আমি তাদের সবার জন্য দোয়া করলাম। তিন শহীদ তরুণের মা আমার কাছে এসে বললেন– 'এমন একদিন ছিল যখন লোকজন ভয়ে কোনো কথা বলতে পারতো না, অথচ আজ দেখ এখন জিয়া জান্তার বিরুদ্ধে কতো লোকের সমাগম হয়েছে।

এরপর আমরা পেশোয়ারের দিকে রওনা দিলাম। সীমান্ত প্রদেশের বর্ডারের কাছে পাঞ্জাবের সভাপতি আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব সীমান্ত প্রদেশের সভাপতির কাছে সমর্পণ করলেন।

সেখানেও একইভাবে সারাপথ জুড়ে লোকজনের ভিড়, আমাদের পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। সরকারের প্রশাসন সেখানকার রাস্তায় বাতি নিভিয়ে দিল। কিন্তু জনগণ অন্ধকারে তাদের হাতের টর্চ এবং ভিডিও লাইট দিয়ে আমাকে দেখার ব্যবস্থা করলো।

আমার নিরাপত্তার প্রধান ব্যক্তি আমাকে নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। আমরা খুব ধীর গতিতে সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে পার হচ্ছিলাম। আফগানিস্তানের খাইবার পাস থেকে সামান্য দুরত্বেই ছিলাম আমরা যেখানে ত্রিশ লাখ আফগান উদ্বাস্তু বসবাস করে।

এই আফগান উদ্বাস্তুরা জিয়ার সমর্থক। সেখানে একটা গুজব ছিল যে, সরকার আফগান মুজাহিদদের দিয়ে আমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে। কিন্তু আমি সেটা জানতাম না। আমার নিরাপত্তা প্রধান তার নিজ স্ত্রীসহ ট্রাকের অপর এক মহিলাকে নিয়ে আমার চারপাশে এমনভাবে ঘিরে থাকলো যে, যাতে আমাকে টার্গেট করা আততায়ীর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। আমি খুব ঝুকি মাথায় নিয়েই যাচ্ছিলাম। কিন্তু সেখানে কোনো হামলার ঘটনা ঘটেনি।

সমাবেশে আমাদের কর্মীরা নিজস্ব জেনারেটরে আলোর ব্যবস্থা করে রেখেছিলো। পেশোয়ার একটি অনগ্রসর এলাকা। এটা খুব রক্ষণশীল ও পুরুষশাসিত সমাজ। আমার এক সহযোগী আমার আলোচনার নোট পেপারটি হারিয়ে ফেলেছিলো। সেখানে গুছিয়ে কথা বলা খুবই কঠিন। কারণ তারা পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন পাখতুনিস্তান গড়ার লড়াই করছে। একজন নারী হয়ে সেখানে নেতৃত্ব দেয়াটা কঠিন তাই বক্তৃতা দিতে হবে খুব মেপে মেপে।

জনসভায় আমি বলতে শুরু করলাম, 'আমি সাহসী পাখতুন জাতিকে সম্মান জানাই, যেমন আমার বাবা জানাতেন।' জনতা ব্যাপক হর্ষধ্বণী ও করতালি দিতে লাগলো। আমি বলতে লাগলাম, 'লোকজন ভাবে আমি খুব দুর্বল কারণ আমি নারী।' জনসভায় উপস্থিত ৯৯ শতাংশই ছিলো পুরুষ। আমি তাদের মধ্যেই বললাম, 'তোমরা কি জান আমার পরিচয় কি? আমি একজন মুসলিম নারী, এজন্য আমার গর্বের শেষ নেই। আমি বিবি খাদিজার মতো সহিষ্ণু এবং বিবি আয়েশার মতো সাহসী হতে চাই। যে দু'জনই ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী। আমি বিবি জয়নবের মতো ধৈর্য্যশীল

www.pathagar.com

হতে চাই, যিনি ইমাম হোসেনের বোন। আমি শহীদ জুলফিকার আলী ভুট্টোর কন্যা। আমি শাহ নেওয়াজ খান ভুট্টোর বোন এবং সেই সঙ্গে তোমাদেরও বোন। আমার প্রতিপক্ষের প্রতি আমি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছি, যদি সাহস থাকে তো গণতান্ত্রিক নির্বাচনে আমাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন।' জনতার তুমুল করতালির পর এবার তারা গর্জে উঠলো পাখতুন ভাষায় 'জিয়া যা'। যার অর্থ দাঁড়ায় 'জিয়া চলে যাও' 'জিয়া চলে যাও'।

পরদিন পেশোয়ার বার এসোসিয়েশনের এক মিটিংয়ে বক্তৃতা দেয়ার পর আমরা পাঞ্জাবে ফিরে যাই। পাঞ্জাবের লাহোর, ওকারা, পাকপাত্তান, ভেহারি এবং মুলতানে সফর করি। মুলতানে' শহীদদের গণকবর জিয়ারত করি, সেখানে আট বছর আগে একটি টেক্সটাইল মিলের শত শত শ্রমিককে সামরিক জান্তা হত্যা করেছিল। এরপর নিজ ভূমি সিন্ধুতে যাই, সেখানে করাচির নিজ বাসভবনে ফিরি। করাচিতে জনতা ঠিক লাহোরের মতোই আমাকে সংবর্ধনা দিলো। এরপর সিন্ধুর থাট্টা বাডিন ও হায়দ্রাবাদ সফর করি। সবশেষে যাই নিজ শহর লারকানায়, সেদিন ছিল ১লা রমজান। লোকজন স্থানীয় এক লোকগাঁথা দিয়ে আমাকে নিয়ে নানা গান গাইতে লাগলো। যে লোকগাঁথার প্রধান চরিত্র ছিল একজন বীর নারী যিনি তার রাজ প্রাসাদ ছেড়ে জনতার পক্ষ হয়ে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, এর জন্য শত নীপিড়ন নির্যাতন সহ্য করেছেন তবুও তিনি লড়াই থেকে সরে দাঁড়াননি এবং জনগণের ভালোবাসা থেকে বিচ্যুত হননি।

স্টেডিয়ামে জনসভায় ভাষণ দেই, দশ মাস আগে যেখানে আমার ভাইয়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অসংখ্য মানুষ জমায়েত হয়েছিল।

লারকানায় তখন প্রচণ্ড গরম। মাথার ওপর এবং কাঁধে আইস কিউব দিয়ে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি। পিপিপির কর্মীদের দেয়া লবণ-লেবুর সরবত পান করছিলাম ঘন ঘন। গরমে সবাই অতিষ্ঠ। তবুও সবাইকে বললাম, এতে দুর্বল হওয়া যাবে না, জনসভা করেই আমাদের শত্রুদের মোকাবেলা করতে হবে।

আমি যেখানেই জনসভা করেছি, সেখানেই একটি গুজব রটে যেত যে, আমাকে হত্যা করা হবে এবং আমার জনসভা ভণ্ডুল করে দেয়া হবে। যে উনিশটি শহরে জনসভা করেছি, সবখানেই এই গুজব শুনেছি বেশি শুনেছি বেলুচিস্তানে জনসভা করতে গিয়ে। সেখানে তো সভার সামনে থেকে তিনজন আফগান মুজাহিদকে আমার নিরাপত্তা রক্ষীরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রসহ হাতেনাতে ধরেই ফেলেছিলো। বেলুচিস্তান এমন এক জায়গা, যেখানে অধিকাংশ মানুষ প্রকাশ্যে অস্ত্র বহন করে। প্রথমে নিরাপত্তা কর্মীরা আমাকে এসব কিছুই জানায়নি।

জনসভায় যাতে সবাই আমাকে দেখতে পায়, আমি সেদিকেই নজর দিচ্ছিলাম। আমি দেখছিলাম, বেলুচিস্তানের অধিকাংশ মানুষ খুবই গরীব। পাকিস্তানের সবচাইতে পশ্চাৎপদ এবং দরিদ্র পীড়িত এলাকা এটি। উপজাতীয় জনগোষ্ঠী কোন প্রগতিকে মেনে নেয় না। তাই এদের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ বেশ শিথিল। আমার বাবার আমল শুরু হবার আগে বেলুচিস্তানে কোনো বিদ্যুৎ ছিলো না। বিশুদ্ধ খাবার পানির তেমন ব্যবস্থা ছিল না। জমিতে ফলন হতো সামান্যই, সেখানে জলসেচের বালাই ছিলো না। বংশানুক্রমেই চলতো সেখানকার জীবনধারা। মানুষেরা শুধু পশুর মত পরিশ্রমই করে যেত তাদের দুর্দশার কিছুই বেরিয়ে আসতো না প্রকাশ্যে।

ছোটবেলায় একবার মায়ের সঙ্গে বেলুচিস্তানে গিয়েছিলাম। পথে দেখেছিলাম গাছের

www.pathagar.com

নিচে বিশ্রামরত কয়েকজন মহিলা তাদের ছেলেপুলে নিয়ে বসে আছে। তারা আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছিলো। নিরাপত্তা রক্ষীরা বাঁধা দিলে মা তাদের থামিয়ে দিয়ে ওদের আসার অনুমতি দিয়েছিলেন।

তারা আমার মায়ের মসৃণ ও সাদা চুল দেখে অবাক হলো। তাদের চুলগুলো ছিল নোংরা ও রুক্ষ। চিরুণীর ব্যবহারই হয়তো জানতো না তারা।

বাবার শাসনামল থেকে তাদের উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয় কিন্তু উপজাতি জঙ্গিরা পিপিপি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে।

সেখানে জনসভায় বলতে শুরু করলাম– 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি বিশ্বাস করে দেশের উন্নতি মানে হল জনগণের উন্নতি। যদি সকল নাগরিকের কাজের নিশ্চয়তা থাকে, যদি তাদের স্বাস্থ্যের অধিকার থাকে, যদি তাদের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষার অধিকার থাকে, তবেই বুঝতে হবে দেশ এগিয়ে চলেছে। আমাদের দেশ গরিব কিন্তু আল্লাহ আমাদের গরীব করেনি। বস্তিতে বসবাস করা আমাদের নিয়তি নয়। দেশের সম্পদকে কাজে লাগাতে আমাদের সকল শক্তি যদি নিয়োগ করি, তাহলে অবশ্যই আমরা এ দূরাবস্থা থেকে উত্তরন ঘটাতে পারবো। জনতা তুমুল করতালি দিয়ে আমাকে সমর্থন করতে থাকলো। এমনকি আমার সামনে বসা সেই তিন আফগান মুজাহিদ যাদের কাছে অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল তারাও করতালি দিয়ে সমর্থন করলো আমাকে। মনে হলো বিপদ কেটে গেছে। কিন্তু বিপদ কেটে যায়নি বরং বিপদ সবেমাত্র শুরু।

এরপর করাচিতে ফেরার সপ্তাহ দুয়েকেরও কম সময়ের পর একটা খবর পেলাম, তারিখটা ছিল ৩০ মে। হায়দ্রাবাদে একটি হোটেলে পুলিশ ঢুকে পিপিপি'র সিন্ধু শাখার ছাত্র সংগঠন সিন্ধু স্টুডেন্ট পিপলস ফেডারেশনের সভাপতি ইকবাল হিজবানি এবং আমাদের দলের সিন্ধুর নিরাপত্তা প্রধানকে নৃশংসভাবে খুন করেছে। ওই সময় তাদের সঙ্গে থাকা জাহাঙ্গীর পাঠান মারাত্মকভাবে জখম হয়। দোস্ত মোহাম্মদ ভোরে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে ইকবাল হিজবানী হত্যার খবর দেয়।

আবারও শোকসভা, আবারও কালো পতাকা, আবারও কালো দোপাট্টা, আবারও মাথায় কালো ব্যান্ড, আবারও এক যুবকের জানাজা ও দাফন– এ যেন আমাদের নিয়তি। যে যুবক ছিলো আমার খুব বিশ্বস্ত, শোকসভায় দোয়া লেখা একটা কাগজ তার মা আমাকে দিয়েছিল এবং বলেছিল, ইকবালের তরফ থেকে এটা আপনার জন্য। সেই থেকে ওটি আমি নিজের হাতব্যাগে বয়ে বেড়াচ্ছি। আর কত রক্ত দরকার জিয়া শাহীর জন্য? আর কত লাশ হলে সে শান্ত হবে!'

ইকবাল হিজবানির খূনের প্রতিবাদে সারা পাকিস্তান জুড়ে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো। কিন্তু জান্তার লোকেরা সেখানে সহিংসতা সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাতে থাকে। কাশ্মিরে এই ধরনের একটি সমাবেশে জিয়ার প্রাদেশিক পরিষদের একজন সদস্য জনসভা ভণ্ডুল করার জন্য প্রকাশ্যে গুলি চালায়। সেবার সৌভাগ্যক্রমে কেউ মারা যায়নি। জান্তা তাদের লোকদের নির্দেশনা দিয়েছে যে, 'তোমাদের এলাকা তোমরা নিয়ন্ত্রণ করবে'। তা, বুলেট কিংবা খুন যেভাবেই হোক।

এক সপ্তাহের মধ্যে পিপিপির দুইজন সদস্য খুন হলো। অপরজন হলেন মোহাম্মদ খান, যিনি পিপিপি ডকরি অঞ্চলের সভাপতি। টানডোতে যাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

www.pathagar.com

প্রথমজনকে হত্যা করে জিয়ার প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এবং দ্বিতীয়জনকে হত্যা করে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর। ওই পুলিশের অস্ত্রটি ইস্যু করা ছিল না। স্থানীয় একটি হোটেলে চা খাওয়ার সময় ওই পুলিশ কর্মকর্তা বলেছিল, সিন্ধু ক্যাবিনেটের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী এই অস্ত্রটি দিয়েছিল তার ভাষায় পিপিপির কুকুরদের হত্যা করার জন্য। সরকার তার অধীনস্থদের এবং নষ্ট রাজনীতিকদের নিজেদের নোংরা কাজে ব্যবহার করতো। রাজনীতির ময়দানে জিয়া এবং আমরা এখন মুখোমুখি। একথা তারও জানে, আমরাও জানি। তাদের সকল শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করছে।

সরকার যখন জুন মাসে তাদের বাজেট পেশ করে বিপরীতে আমরাও জনগণের বাজেট উপস্থাপন করেছিলাম। এতে তারা ভেবেছিল আমরা একটা বড় ধরনের আন্দোলনে যাব। ফলে রমজানের শেষে সিন্ধুতে তারা জরুরি আইন জারি করে বসে। কিন্তু যখন দেখা গেল কার্যত আমরা কোন আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছি না, তখন তারা জরুরি অবস্থা থেকে সরে আসলো। এখন আমরা আন্দোলনের দ্বিতীয় ধাপে উন্নীত হলাম। এখনকার আন্দোলন হলো জিয়ার ওপর সামনে হেমন্তের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য চাপ সৃষ্টি করা।

১৯৮৬ সালের ৫ জুলাই ছিলো সামরিক অভ্যুত্থানের নবম বার্ষিকী। আমরা একে 'কালো দিবস' বলে ঘোষণা করলাম। চীন সংলগ্ন খাইবার পাস থেকে শুরু করে আরব সাগর পর্যন্ত সমগ্র পাকিস্তান জুড়ে সকল জেলা শহরে একযোগে এই 'কালো দিবস' পালন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলো এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক পার্টিকে সেই মোতাবেক নির্দেশনা দেয়া হল। ওই দিন আমরা ব্যাপক গণপ্রতিরোধ ও আন্দোলন গড়ে তুলবো। সামনের হেমন্তেই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য জান্তার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাই। এ ধরনের একটি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হলে অন্ততঃ লাখ খানেক কর্মী বাহিনীর প্রয়োজন। পিপিপির শুভ্যানুধ্যায়ীরা এগিয়ে এলো এই কাজে। যারা স্বেচ্ছায় কারাবরণ এবং গণঅনশনেও রাজি। প্রত্যেক কর্মসূচির সবকিছুই আমরার আগেভাগেই ঠিকঠাক করে রাখতাম। ৫ জুলাই ঘনিয়ে এল। আমি সারাদেশ চষে বেড়ালাম। সংগঠনের কাছে কর্মসূচীর বিস্তারিত বিষয় তুলে ধরলাম- ব্যাখ্যা করলাম। আমাদের ধারণাকে উপচিয়ে 'কালো দিবসে' করাচিতে জমায়েত হয়েছিল পিপিপির দেড় লাখ সমর্থক এবং লাহোরে জমায়েত হয়েছিল দুই লক্ষাধিক।

১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। আমাদের জন্য ছিল আরেকটি পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ দিন। লাহোরের জনতা আমাকে যে অভূতপূর্ব সংবর্ধনা দিয়েছিল এবং সেখানে জনতার যে ঢল নেমেছিল তার বিপরীতে আরেকটি সমাবেশের কথা ঘোষণা করল জিয়ার পকেট প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ খান জুনেজো। তিনি ঘোষণা করলেন, আগামী ১৪ আগস্ট ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মিনার-ই-পাকিস্তানে একটি গণসমাবেশ করবে। আমরাও পাল্টা ঘোষণা করলাম- লাহোরে আমরাও স্বাধীনতা দিবসে গণসমাবেশ করবো। আমরা জানি যে, আমাদের সমাবেশ সরকারি সমাবেশ থেকে অনেক বড় হবে। বিষয়টি আঁচ করে তারা পাঞ্জাবের সকল বাস-ট্রাক-যানবাহন জিয়ার রিকুইজিশন করল তাদের সভায় লোক বহনের জন্য। আমরা আমাদের সমর্থকদের বললাম, সরকার গাড়িতে লাহোরে এসে পায়ে পায়ে হেঁটে আমাদের সভায় চলে আসবেন। পাঞ্জাবের লোকজন বলতে থাকলো সরকারের বাসে

www.pathagar.com

লাহোর যাব কিন্তু যোগ দেব পিপিপি'র সমাবেশে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জান্তার ডাকে সাড়া দেয়া লোকের চেয়ে আমাদের সভায় অনেকগুণ বেশি লোক হবে।

এদিকে মুভমেন্ট টু রিস্টোর ডেমোক্রেসি (এমআরডি) দলের লোকজন আমাদের সঙ্গে যৌথভাবে আন্দোলন করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। আমি পাকিস্তানে ফেরার পর থেকেই তারা আমাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আগস্টের দশ তারিখে করাচির ৭০ ক্লিফটন বাসভবনে তাদের সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়। ১৯৮১ সালের আগেও তাদের সঙ্গে জোট করার জন্য একবার আলোচনা হয়েছিল। জিয়ার সরকার একবার হজ করতে যাওয়ার সময় এম আর ডির নেতাকে বিমান বন্দরে আটকে দিয়েছিল। তাকে হজ করতে দেয়নি।

এদিকে স্বাধীনতা দিবসে জনসমাবেশের তেমন সাড়া না পেয়ে এবং পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে জিয়া পরিবার পরিজনসহ দেশ ছেড়ে চলে গেল। আগস্টের ৭ তারিখে সে তিনটি বিমান বোঝাই আসবাবপত্র সাজ সরঞ্জাম এবং স্বর্ণখচিত রোলস রয়েস গাড়ি নিয়ে সৌদি আরবেব যাত্রা করলেন। সঙ্কট আরও ঘনীভূত হতে শুরু করলো। এম আর ডি নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো প্রচলিত আইন মেনেই দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকারকে চাপ দিয়ে যাব। এ নিয়ে যৌথভাবে সকল কর্মসূচী সফল করতে আমলাদের সমঝোতা হলো।

যৌথ বৈঠকের পর পরবর্তী দিন এমআরডি নেতা ঘোষণা করলেন পিপিপি এবং অন্য সকল বিরোধী রাজনৈতিক গ্রুপ স্বাধীনতা দিবসে লাহোর এবং করাচিতে যৌথভাবে গণসমাবেশ করবে। ঐ ঘোষণায় ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়। এই দাবি উত্থাপনের পর প্রধানমন্ত্রী জুনেজো ভেতের ভেতরে ভয় পেয়ে যায়। আগস্টের ১২ তারিখে সাংবাদিক এবং দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে একটি বৈঠক করি। সেখানে আমি বলি, প্রধানমন্ত্রী জুনেজো অনানুষ্ঠানিকভাবে রেডিও টেলিভিশনে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তাদের ঘোষিত জনসভায় কর্মসূচী বাতিল করে দিয়েছে। একইদিনে সরকারিদল এবং বিরোধীদলের কর্মসূচীর কারণে সংঘর্ষ হতে পারে এ ধরনের ছুতো দিয়ে নিজেদের জনসভা বাতিল ঘোষণা করে বিরোধীদের প্রতিও অনুরূপ ঘোষণার আহ্বান জানায়।

কিন্তু জনসভা বন্ধ করার জন্য কোন আনুষ্ঠানিক নির্দেশ দিতে পারে না। জুনেজোর এমন উদ্যোগের জন্য আমি অবাক হইনি তবে ক্ষুব্ধ হয়েছি এই কারণে যে এতে সে নিজের আসল চেহারা লুকাতে চেয়েছে।

আমরা যেখানে শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করতে চাই, সরকার সেখানে প্রতিহিংসতাকে উসকিয়ে দেয়। এমনকি আমার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরাও যেখানে অস্ত্র বহন করে না, সেখানেও আমাদের ওপর নানা বিধি নিষেধ আরোপ করা হতো। অথচ বলা হতো, সামরিক আইন উঠে গেছে। এতে তার আসল চেহারাই বেরিয়ে যেত।

জুনেজো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফর করেছেন। তদানিন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান পাকিস্তানের সামরিক শাসন তুলে নেয়ার জন্য জুনেজোকে বাহবা দিয়ে বলেছিলেন এটা গণতন্ত্রের পথে একটি বড় পদক্ষেপ। জুনেজোও সেখানকার টাইম ম্যাগাজিনে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সামরিক আইন তুলে নেয়া ও গণতন্ত্রে ফিরে আসা সম্পর্কে বলেছিলেন,

www.pathagar.com

'আমরা সামরিক আইন তুলে নিয়েছি, এখন বাকী শুধু নির্বাচন করা।'

আমি পার্টি কর্মীদের সমাবেশে বললাম, 'জুনেজো যদি তার ঘোষিত সমাবেশ বাতিল করে দেয় তাহলে সেটা আমাদের জন্য বিজয় হবে। জনগণ দেখবে তারা মাঠ থেকে পালিয়ে গেল। আর যদি জনসভা করেও সেখানে আমাদের চেয়ে কম লোক হবে এতে তার মুখ থাকবে না এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার জনসমর্থন প্রমাণিত হবে না।' আমাদের এক কর্মী বলে উঠলেন– ১৪ আগস্টের সমাবেশ আমরা করবো না, তার মোটেই আর প্রয়োজন নেই। কারণ ইতোমধ্যেই এ ব্যাপারে আমাদের জয় হয়ে গেছে। অপর এক কর্মী বললেন– 'কিন্তু আমাদের সমাবেশ করা উচিত– ১৪ তারিখ না হলে ১৫ তারিখে করলে ক্ষতি কি?' আরেকজন জবাব দিলেন, 'ঐ দিনতো ভারতের স্বাধীনতা দিবস।'

আরেকজন বললেন, তাহলে ১৬ আগস্ট।

আমি তাদের বললাম, আগামীকাল ফয়সালাবাদ যাব সেখানে মিটিং করতে। তারপরেই আমরা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব।

করাচির ৭০ ক্লিফটনের বাসায় এই অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের পর আমি এমআরডির ডাকা জরুরি বৈঠকে যোগ দিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি তাদের মানসিকতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের নেতারা আমার ওপর ক্ষেপে আছেন। তারা আমাকে এও পরামর্শ দিলো যে, ১৪ আগস্টের জনসভার তারিখ পুনঃনির্ধারণের ব্যাপারে পিপিপির নেতাদের সঙ্গে যেন শলাপরামর্শ করি।' তারা ক্ষুব্ধ হয়ে বললো, 'আপনি রাজনীতির কিছুই বোঝেন না, ১৪ আগস্টের জনসভা অবশ্যই করা উচিত। আমাদের পিছিয়ে গেলে চলবে না। সামনে এগিয়ে যাবার এটাই সবচেয়ে ভালো সময়।

আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে বললাম, এ ধরনের শোডাউন করার জন্য আমাদের দল মোটেই প্রস্তুত নয়। সবেমাত্র 'কালো দিবসের' কর্মসূচী সফল করলাম আমরা। এরপর দ্রুত আরেকটি জনসভা সফল করার জন্য জনগণকে প্রস্তুত করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে না; আরেকটি কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হলো– সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইটা এখনি সরাসরি বিরোধাত্মক পর্যায়ে নয়। কিন্তু সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য ব্যাপক রাজনৈতিক চাপ গড়ে তুলতে চাই। আর যদি এখনি হরতাল ধর্মঘট ডেকে বসি তাতে সরকার আপাতত অকার্যকর হবে ঠিক তবে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জাতীয় জীবনে এর খারাপ প্রভাব পড়বে। এ ধরনের মুখোমুখি সংঘাত হিতে বিপরীতই হবে। দলের নেতাকর্মীরা গ্রেফতার হবে। এমনকি আমাদের দলের শুভাকাঙ্ক্ষীরা আটক হতে পারে এবং পুরো গতিটাই থমকে যাবে।

কিন্তু এমআরডি'র নেতারা তাদের জায়গায় অনড়। তারা বললেন, আমাদের অবশ্যই এগিয়ে যাওয়া উচিত। তাদের এ মনোভাবে আমি উভয় সঙ্কটে পড়ে গেলাম। আমি কি এমআরডি'র সঙ্গে জোটের রাজনীতিকেকেই অগ্রাধিকার দেব নাকি আমি যেটাকে সঠিক সঠিক মনে করি তাকেই গুরত্ব দেব। ভোটাভুটির পর সিদ্ধান্ত হল আমরা জনসভায় যোগ দেব, আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা এগিয়েই যাব, তবে আল্লার দোহাই এই পরিকল্পনা আজকেই ফাঁস করে দেবেন না। আগামীকাল পর্যন্ত অন্তত অপেক্ষা করুন। গ্রেফতার এড়ানোর জন্য আমাদের গা ঢাকা দিতে হবে, এজন্য পিপিপির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আমার কিছু সময় দরকার। এমআরডির নেতারা যেভাবেই হোক তারা

জনসভায় ঘোষণাটা দিয়ে দেবে। আমাদের নেতারা গ্রেফতার হলে হেমন্তের নির্বাচনে আমরা তেমন কিছুই করতে পারবো না।

১৩ আগস্ট ১৯৮৬

পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক এই দিন আমি বিমান বন্দরে যাই। বিমানে ফয়সালাবাদ যাব সেখানে মিটিং করার জন্য। বিমানবন্দরে পুলিশ আমাকে ঠেকালো, তারা আমায় বললো– উপর থেকে নির্দেশনা আছে আপনাকে পাঞ্জাব ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া নিষেধ। এরপরও যদি আপনি যেতে চান তো যেতে পারেন।

আমি উপলব্ধি করলাম তারা নতুন কৌশল হাতে নিয়েছে। মনে হলো সরকারের নির্দেশনা অমান্য করার জন্য আমাকে উস্কানি দেয়া হচ্ছে। যাতে তারা বলতে পারে, বেনজির সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, সুতরাং তাকে বাধা দাও। আমি তাদের পাতানো খেলা থেকে নিজেকে বিরত রাখলাম। বিমানবন্দরে তাৎক্ষণিকভাবে পিপিপি'র নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলাম। ততক্ষণ পর্যন্ত পুলিশও সেখানে ছিল। আমার সঙ্গে থাকা পিপিপির নেতাদের নির্দেশ দিলাম, আমাকে গ্রেফতার করা হলে কিভাবে আমাদের কাজের সমন্বয় করতে হবে।

এরপর আমি ফিরে আসলাম করাচির ৭০ ক্লিফটন বাসভবনে। অথচ সেখানে কোন পুলিশ ছিল না। কিন্তু ভারত থেকে সম্প্রচারিত সংবাদ নিয়ে আরেক কাণ্ড ঘটে গেল। ভারতের এক রেডিও নিউজে ভুলক্রমে প্রচার করা হলো আমাকে নাকি সরকার গ্রেফতার করেছে। আর যাই কোথায়? টেলিফোনের পর টেলিফোন আসতে শুরু করলো। আমার গ্রেফতারের প্রতিবাদ করতে এসে নাইয়োরিতে রীতিমতো দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। ফয়সালাবাদ বিমানবন্দরে আমাকে সংবর্ধনা জানাতে আসা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুড়লো। লাঠিচার্জ করলো জনতাকে। এটাই হলো জান্তার গণতন্ত্রের নমুনা।

আমি গ্রেফতারের জন্য পুলিশের অপেক্ষায় বসে আছি। কিন্তু কেউ এলো না। উপরন্তু গ্রেফতার হওয়া শুরু হল পিপিপি এবং এমআরডি'র সকল নেতৃবৃন্দকে। এই পয়লা আমাদের নেতারা কারাগারে অন্তরীণ থাকলেন এবং আমি বাইরে থাকলাম। আমাকে আটক না করেই পার্টিকে অকার্যকর করতে চাইছে সরকার। আমাকে গ্রেফতার করার দায় থেকে রেহাই পেতে জান্তার এই কৌশল। তারা বিশ্বকে বোঝাতে চাইছে এটা, বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝাতে চাইছে। সামনেই আছে যুক্তরাষ্ট্রের একটা অর্থনৈতিক সাহায্যের প্যাকেজ। আগামী হেমন্তেই এই বিষয়ে সেখানে ভোট হবে। আমি ভাবলাম, গ্রেফতার এড়ানোর আমার কিছু সুযোগ রয়েছে। কিছুটা সময় নিয়ে সরকারের মোকাবেলায় নামতে পারি। আমি আমাদের সুবিধামত সময়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার সুযোগটি গ্রহণ করলাম।

করাচির ৭০ ক্লিফটন বাসভবনে আমি সংবাদ সম্মেলনের ডাক দিলাম। সেখানে টাইমস ম্যাগাজিনের রোস মুনরো আসলেন, বিবিসির ক্যামেরাম্যান আসলেন, এ্যানা ফাদিম্যান আসলেন লাইফ পত্রিকা থেকে, রেডক্লিফের করাচির আলোকচিত্র মেরি ইলেন। ডন ও জং পত্রিকায় প্রখ্যাত সাংবাদিক মাহমুদ সাম এবং হারুন শাহসহ অনেক স্বনামধন্য

www.pathagar.com

সাংবাদিক চলে এলেন। তাদের অনেকেই আমায় পুরাতন বন্ধু। আমি তাদের জানালাম পিপিপি এবং এমআরডির সকল নেতাই জেলে কেবল আমিই বাইরে।

করাচি প্রেসক্লাব থেকে একজন রিপোর্টার এসেছিলো, সে জানালো এমআরডি'র নেতারা জানিয়েছেন তাদের পূর্ব নির্ধারিত করাচির জনসভা বহাল থাকবে এবং আগামীকালের সে সভায় আমি অংশগ্রহণ করবো। এ সংবাদে আমি হকচকিয়ে যাই। কারণ এভাবে পরিকল্পনা পরিবর্তন করা হলো কিন্তু আমার সঙ্গে কেউ পরামর্শ পর্যন্ত করলো না। অথচ সে সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে গেল আর বিবিসি এই সংবাদ সম্প্রচার করেছে তিন তিন বার। আমি সরকার বা এমআরডি কারো কাছ থেকে এরকম চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্তের বলি হতে চাই না। এই মুহূর্তে আমার কি করার আছে, আমি যদি সেখানে না যাই, তবে বিরোধীরাই বলবে আমি ভয় পেয়েছি গেছি। আমাদের পার্টির কয়েকজনকে ডেকে পাঠিয়ে বললাম, তোমরা খোঁজখবর নিয়ে দেখ কারা এ ধরনের কূটচালের সিদ্ধান্ত নেয়, তাদেরকে আগামীকাল সকালে ৭০ ক্লিফটনের বাসভবনে নিয়ে এস। তারা আসলেই আমি আগামীকালের জনসভায় যোগ দেব।

১৪ আগস্ট ১৯৮৬, পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস

জনতার কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গে গেল। জেগে উঠে দেখি বাসার বাইরে লোকজনের ভিড়, তারা শ্লোগান দিচ্ছে 'আমার বোন, তোমার বোন, বেনজির বেনজির।' হাজার হাজার লোকজন এসেছে তারা পার্টির নেতাদের কাছ থেকেও বিবিসির সংবাদ শুনে যে আমি এমআরডির জনসভায় যাচ্ছি। এমআরডি'র জনসভা ঘোষণার পরপরই। এর মধ্যে সংবাদ আসলো যে, সরকারের লোকজন জিয়ার কাছে টেলেক্স করে জানতে চেয়েছে আমার সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেবে তারা। জিয়া তখন সৌদি আরবে অবস্থান করছিল এবং তার উত্তর পরদিন ১৪ আগস্ট সকাল ৯টায় এসে পৌঁছালো। বার্তায় জিয়া বলেছেন আমাকে গ্রেফতার করার জন্য। ততক্ষণে আমার বাসার চারপাশে হাজার হাজার মানুষ। এই লোকজন সরিয়ে আমাকে গ্রেফতার করা পুলিশের জন্য দুঃসাধ্য। তাছাড়া আমাদের ৭০ ক্লিফটনের বাড়িটি যে এলাকায় সেখানে বিভিন্ন দেশের বিদেশী কূটনীতিক এবং পদস্থ কর্মকর্তারা বসবাস করেন। তাদেরকে বিব্রত করে প্রশাসন কোন ঘটনাও ঘটাতে চাইছে না।

তাছাড়া পুলিশও আমার অবস্থান নিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলো। কারণ ভোর বেলা বাসা থেকে আমার বন্ধু পুচি গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যায়। রাতে পুচি ৭০ ক্লিফটনে ছিল। গোয়েন্দারা নিশ্চিত হতে পারেনি, গাড়িতে কে ছিলো। তারা সন্দেহ করছিলো, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আমিই হয়তো ফয়সালাবাদে সটকে পড়েছি। বাড়িতে আমি আছি কি নাই, সে সম্পর্কে তাদের কোন তথ্য ছিলো না। তবে শিগগিরই তারা আমাকে খুঁজে পাবে।

ইতোমধ্যে এমআরডি'র একজন প্রতিনিধি আমাকে টেলিফোন করে বললেন, জনসভাতে কোন সময়ে যাব। উত্তরে বললাম, আমি দুপুর ২টায় বাসা থেকে বের হবো। এই টেলিফোন করার ঠিক অল্পক্ষণ পরেই সংবাদ পেলাম পুলিশ দুইটার দিকে আমাকে গ্রেফতার করবে। যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সে দিনের জনসভা নিষিদ্ধ করেনি। আর আমাকে গ্রেফতার করার কোন যৌক্তিক কারণ নেই।

www.pathagar.com

আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, বাসা থেকে বের হবো ঠিক দুপুর একটায়। ঐ সময় সাংবাদিকরা এসে ভিড় করলো। বেশ নামকরা কয়েকজন সাংবাদিক আমার বাসভবনে চলে এসেছেন, অথচ আমরা কেউ জানি না, বাসা থেকে বের হওয়ার পর আমার ভাগ্যে কি হতে পারে?

মনে পড়ে, হার্ভার্ডে থাকার সময় লাইফ ম্যাগাজিনে একটা লেখা পড়েছিলাম, সেখানে বলা হয়েছিলো, জীবন শুধু বয়ে চলার জন্য, অথচ এখন আমার ক্ষেত্রে জীবন পুলিশের সঙ্গে সংঘাতের এবং সম্ভাব্য গ্রেফতারের আশঙ্কার জন্য। সুরা ইখলাস থেকে পাঠ করলাম, কুল হু আল্লাহু আহাদ, আল্লাহু সামাদ... তারপর বাড়ির দরজা দিয়ে বের হলাম। এ্যান ফেদিম্যান, রোম মুনরো, বিবিসির ক্যামেরাম্যান, পিপিপির কয়েকজন সদস্য এবং আমার বন্ধু পুচি মিলে একটা পাজেরো জিপে উঠলেন, আমি উঠলাম অন্য একটি গাড়িতে। আমার গাড়িতে পিপিপির নানা শ্লোগানের স্টিকার এবং গাড়ির বনেটে পতাকা ছিলো ও মাইকে বাজছিলো পিপিপির গান। জনসভায় যোগ দিতে যাওয়া নেতাদের এভাবেই যেতে হয়, এটাই পাকিস্তানের রেওয়াজ।

আমার সঙ্গে ছিলো সুমাইয়া, কয়েকজন রাজনৈতিক সহকর্মী এবং আলোকচিত্র মেরি ইলেন মার্ক। আমি গাড়ির পেছনের সিটে পা রেখে 'সান রুফের' ভেতর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমাদের সঙ্গে থাকা জনতা শ্লোগান দিতে লাগলো, যার অর্থ আমরা মরবো, আমরা মারবো, তবুও বেনজিরকে ফিরিয়ে আনবো।

আমাদের সঙ্গে তখন প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক সমর্থক গাড়ির চারপাশে অবস্থান করছিলো। আমরা যখন মিডউস্ট হাসপাতালের কাছে আসি, তখন পুলিশ বিনা উস্কানিতে হঠাৎ করেই টিয়ার গ্যাস ছুড়ে দেয়। ক্লিফটনের গলিতেই সেদিন প্রায় শ'তিনেক টিয়ার সেল ছুড়েছিলো। আমাকে আটক করতে চারদিক থেকে পুলিশ ঘিরে ধরলো। পুলিশ জনতায় ওপর বেধড়ক লাঠিপেটা শুরু করলো। তারা আমাদের পাজেরোর কাছে আসার জন্য বার বার টিয়ার সেল ছোড়া শুরু করলো। পাজেরোর ভেতরে থাকা কেউ একজন আমাকে টেনে নিচে নামিয়ে সানরুফ বন্ধ করে দিল।

টিয়ার সেলের গ্যাসে আমাদের চোখ জ্বালাপোড়া করতে শুরু হল, সঙ্গে সঙ্গে কাশি। চোখ মুখ ভিজা তোয়ালে দিয়ে মুছতে লাগলাম। অন্য গাড়িতে আসা পিপিপির সদস্য এবং সাংবাদিকদের জন্য খুব চিন্তায় ছিলাম।

এ্যান ফেদিম্যান

আমরা গাড়ির জানালা দিয়ে টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় কিছুই দেখতে পারছিলাম না। আমাদের পাজেরোর সানরুফটি অনেক চেষ্টার পর বন্ধ করে দিলাম। এখান দিয়েই টিয়ার গ্যাসের ধোয়া ভেতর আসছিলো। আমরা বেনজিরকে টেনে নিচে নামিয়ে আনলাম। ভয়ে সবাই চিৎকার করছিলো। পরিস্থিতি খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছিলো। টিয়ার গ্যাসের ঝাঁঝে তাকাতে পারছিলাম না। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিলাম, ভেজা রুমাল দিয়ে চোখ মুছলাম বার বার।

টিয়ার সেলের মোড়ক পরদিন দেখলাম সেটা আমেরিকার তৈরি। বেনজিরের বান্ধবী পুচির আবার এ্যাজমা ছিলো। সৌভাগ্যক্রমে সে টিয়ার গ্যাস ছোড়ার আগেই গাড়ি থেকে

www.pathagar.com

নেমে গিয়েছিলো। বাকিরা সবাই প্রায় পরবর্তী সপ্তাহ জুড়েই বিছানাতে অসুস্থ হয়ে ছিলাম। আমাকে ডাক্তার ইনহেলাশন ডোস দিয়েছিলেন কিন্তু বশির রিয়াজকে বেশ কয়েক মাস বিছানাতে থাকতে হয়েছিলো অসুস্থ হয়ে।

এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে গাড়ির ড্রাইভার সিদ্ধান্ত নিল, জনসভায় যাওয়ার জন্য গাড়িগুলো ভিন্ন ভিন্ন পথে যাবে।

এতে পুলিশ খুব বিভ্রান্তিতে পড়ে গেল, আমাদের গাড়ি গেল এমন পথে যে অঞ্চলে করাচির খুব গরিব জনসাধারণ থাকে, তারা সবাই পিপিপির শক্ত সমর্থক। কিন্তু পুলিশ আমাদের অবস্থান ঠিকই নির্ণয় করতে পেরেছিলো। তবে আমাদের গাড়ির শোভাযাত্রায় অনেকগুলো ট্রাক বাস গাড়ি ছিলো।

সিদ্ধান্ত নিলাম অন্যান্য পথে যাওয়া আমাদের গাড়িগুলোর সঙ্গে আমরা মিলিত হব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সমাধির পাশে। আমরা রাস্তা ব্লক করেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এতে কেউ গাড়ির বহর ওভারটেক করতে পারছিলো না।

আমরা যেন পুলিশের সঙ্গে জীবন নিয়ে লুকোচুরি খেলছিলাম। ইতোমধ্যেই আমাদের গাড়ির টায়ার নষ্ট হয়ে গেল। টায়ার নষ্ট হওয়ার আর সময় পেল না। আমরা গাড়ির টায়ার ঠিক করতে নিলে জনতার ভিড় চলে আসবে গাড়ির কাছে আমরা আবারও পুলিশের খপ্পরে পড়ে যাব।

রোজ মুনরো

আমরা যখন গাড়ির বহর নিয়ে লাইয়োরির চাকিয়ারা চকের সভাস্থলে পৌঁছলাম তখন আমাদের গাড়ির বহরের চারপাশেই ছিলো প্রায় দশ সহস্রাধিক মানুষের ঢল।

সে যাত্রায় বেনজির তার প্রতীকী বিজয় অর্জন করেছিলো। কয়েক মিনিটের জন্য হলেও বেনজির মঞ্চে উঠতে পেরেছিলেন। বক্তৃতায় তিনি উর্দুতে বলতে শুরু করলেন 'তোমরা সবাই আমার ভাই এবং বোন' তিনি উচ্চকিত কণ্ঠে বললেন, 'জিয়াকে অবশ্যই ক্ষমতা ছেড়ে চলে যেতে হবে, এই স্বাধীনতা দিবসেও, পাকিস্তানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নাই। এখানে মুক্তভাবে সভা সমাবেশ করা যায় না,' তিনি যখন তার বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তার দু'শ' গজ দুরেই গাড়ি পুড়ছিলো, তার কালো ধোয়ায় ঢেকে যাচ্ছিলো আকাশ।

এ্যান ফাদিমান

পিপিপির কর্মীদের কোন সহিংস ঘটনা একটাও নজরে আসেনি। প্রতিটি সহিংসতা এসেছে পুলিশের পক্ষ থেকে। তারা জনতাকে পেটাচ্ছিলো। লাঠিপেটা খেয়ে কিছুসংখ্যক যুবক দৌড়াচ্ছিলো, যখন তারা বেনজিরের পাজেরো দেখতে পেল, তারা তাদের রক্তাক্ত শরীর বেনজিরকে দেখাচ্ছিলো, মনে হচ্ছিলো, তারা বলছে, তোমার জন্য আমরা জীবন উৎসর্গ করতে পারি। হঠাৎ করেই দেখলাম বিবিসির প্রতিনিধি ইকবাল জাফরি, জনতার ভীড়ের পাশ দিয়ে দৌড়াচ্ছে। আমার সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন, সবখানেই সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে, একটি শিশুর কথা বললেন তিনি, শিশুটির বয়স বড় জোর দশ বছর হবে পিপিপির স্টিকার ব্যবহার করার অপরাধে পুলিশ তাকে বেধড়ক পিটিয়ে মাটিতে শুইয়ে রেখেছে।

www.pathagar.com

বেনজিরকে দেখেই পুলিশ অসংখ্য টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করেছে।

চিৎকার করে কারা যেন আমাকে মাথা নিচু করতে বলছে। কারা যেন আমাকে টেনে নিচে নামিয়ে আনলো, ঠিক তার পরপরই আমার মাথার ওপর দিয়ে কতগুলো টিয়ারসেল উড়ে চলে গেল। গাদ্দাফী স্টেডিয়ামে একবার আমার এবং আমার মায়ের উপর এমন আক্রমণ শুরু হয়েছিলো।

পুলিশ তাদের টিয়ার সেল যেন অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। কিন্তু জনতাকে উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে ঠেলে দিতে পারেনি। টিয়ার সেল ছিলো সেদিনের পুলিশের অস্ত্র, অসংখ্য পুলিশের গাড়ি আসতে থাকলো। পিপিপির একজন সদস্য চিৎকার করে বলতে লাগলেন, রাস্তা থেকে যেন একজনও পিপিপির নেতা আটক করা না হয়। সবাই চিৎকার করে বলছে, পুলিশ তোমার নির্যাতন থামাও।

পুলিশের ব্যারিকেড জনতার ভিড়ের চাপে উধাও হয়ে গেল। চারদিকে টায়ারে আগুন জ্বলছিলো। টিয়ার গ্যাসে আমার চোখ এবং গলা জ্বালাপোড়া করছিলো, লোকজন পুলিশের গাড়িতে ভিন্ন পথ থেকে ঢিল ছুড়ে বোঝাতে চাইছিলো, বেনজির এই পথে গেছে। আমাদেরকে বাঁচাতে তারা পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। যখন আমরা পুলিশকে বোকা বানাতে তখন পাজেরো থেকে নেমে একটি ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলাম। সেখানে কোন পতাকা কিংবা পার্টির কোন স্টিকার ছিলো না। পাজেরোতে সুমাইয়াকে আমার জায়গায় বসিয়ে তার মাথায় আমার দোপাট্টাটি পরিয়ে দিলাম। যাতে সেই পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার খুব চটপটে এবং বুদ্ধিমান, সে আগে থেকেই গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দরজা খোলাই রেখেছিলো। আমি উঠতেই সে গাড়ি ছেড়ে দিল। সরু গলি দিয়ে খুব দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছিলো সে। কিন্তু সেখানেও দেখি মোটর সাইকেলে একজন পুলিশ আমাকে অনুসরণ করছে। আমার গাড়িতে থাকা পিপিপির নেতাদের সঙ্গে ঐ সময়ই আমি পরামর্শ করলাম। আমি তাদের বললাম, একটা সংবাদ সম্মেলন করা দরকার কিন্তু সেটা কোথায় করবো? তাদের অনেকে বিভিন্ন স্থানের পরামর্শ দিলো। কিন্তু শেষমেশ আমি ৭০ ক্লিফটনে ফেরার ওপরই গুরুত্ব দিলাম। যদিও আমি পুলিশের গ্রেফতার আতংকের ওপর দিয়েই হাঁটছি।

নিজ বাসার ঠিকানাই দিতে বললাম সাংবাদিকদের। গ্রেফতার হলে সেখানেই হব। কিন্তু পুলিশের মোটরসাইকেলটি তখনও আমাদের পেছনে পেছনে অনুসরণ করছিলো। হঠাৎ আমি ড্রাইভারকে ডানে মোড় নিতে বললাম, আমরা তখন মেট্রোপল হোটেল অতিক্রম করছিলাম। ড্রাইভার ডানে মোড় নিয়ে হোটেলটা ঘুরে ভিন্ন পথ ধরলো, পুলিশ আর আমাদের পথের দিশা খুঁজে পেল না।

আমরা যখন ক্লিফটনের কাছাকাছি চলে এসেছি, সেখানে দেখি পুরো এলাকা পুলিশ দিয়ে ছেয়ে গেছে। ড্রাইভার হঠাৎ করে গাড়ি থামিয়ে তা ঘুরিয়ে এমনভাবে চালাতে থাকলো যেন সবকিছু স্বাভাবিক। খুব স্বাভাবিক গতিতে গাড়ির চালাতে বললাম। সুমাইয়ার দোপাট্টা আমার মাথায়। পুলিশ সহজেই আমাকে চিনতে পারবে না। আমরা ঘুরপথে চলে এলাম ৭০ ক্লিফটনের বাসায়। ভিতরে গিয়ে ড্রাইভারকে বললাম তোমার ভাড়া কত। ওয়ালেট থেকে টাকা বের করতে করতে জিজ্ঞেস করলাম তাকে। সে জবাব দিলো, আমি কোন

www.pathagar.com

ট্যাক্সি ড্রাইভার নই। এটা আমার নিজস্ব গাড়ি। 'তুমি তাহলে ট্যাক্সি ড্রাইভার নও' আমি অবিশ্বাসের সুরে বললাম। সে উত্তর দিলো, 'আমি একজন পিপিপি কর্মী। সে আমার কাছ থেকে কোন টাকা না নিয়েই চলে গেল।

৭০ ক্লিফটনে যখন ঢুকি, দেখি সাংবাদিকরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কাজ শুরু হল। সংবাদ সম্মেলনের এক পর্যায়ে খবর পেলাম, পুলিশ বাসার চারপাশ ঘিরে ফেলেছে এবং তারা ভিতরে আসতে চায়। আমি বললাম, তাদের আসতে দাও। তিনজন মহিলা পুলিশ আমার রুমে প্রবেশ করলো। দেশী বিদেশী সাংবাদিকদের চোখের সামনে থেকে তারা আমাকে আটক করে নিয়ে গেল। অবৈধভাবে সমাবেশ করার দায়ে আমাকে ৩০ দিনের আটকাদেশ দেখিয়ে গ্রেফতার করা হলো। দরকারি জামা কাপড় এবং টুথব্রাশ সঙ্গে নিয়ে পুলিশের সঙ্গে চলে গেলাম। আমাকে একটি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হলো। অসংখ্য পুলিশের গাড়ি আনা হয়েছে আমাকে নিয়ে যেতে। সঙ্গে সঙ্গে সমানসংখ্যক পিপিপির কর্মী সমর্থকদের গাড়িও ছিলো সেই বহরে। পুলিশ স্টেশনে গিয়ে খবর পেলাম, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে লাহোরের সমাবেশে ছয় জনকে হত্যা করা হয়েছে আহত হয়েছে সহস্রাধিক। সরকার তার অনুগত পেটোয়া গুণ্ডাপাণ্ডাদের লেলিয়ে দিয়েছিল সমাবেশে আক্রমণ করার জন্য। এমনকি স্থানীয় সংসদ সদস্যরা কালাসিকভ রাইফেল দিয়ে গুলি করে এ সমাবেশে। অথচ সেই এমপিদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই আনা হয়নি। ডন পত্রিকায় এক রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছিল যে, হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগে গিয়ে পুলিশ সেখানে ভর্তি হওয়া আহতদের পিটিয়েছে। মসজিদের ভিতরে এক মুসল্লি টিয়ার গ্যাসের ঝাঝ ধোঁয়ার জন্য চোখে জলের ছিটা দিচ্ছিলো, পুলিশ তাকেও বেধড়ক পিছিয়েছে।

মৃতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল সিন্ধুতে সেখানে মারা গেছে ১৬ জন। আহত শতাধিক। পুলিশ সবখানেই শান্তিপূর্ণ সমাবেশ আক্রমণ চালায়।

আমাকে লানধি বোরস্টাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ অসংখ্য রাজনীতিকে গ্রেফতার করেছে। তাদের অনেকেই করাচির কেন্দ্রীয় কারাগারে আমার সঙ্গে ছিলো।

আমাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে জনতা সিন্ধুর পুলিশ স্টেশন জ্বালিয়ে দিলো। লাইরির সরকারি রেলওয়ে স্টেশনেও আগুন লাগিয়ে দিলো। সপ্তাহব্যাপী পিপিপির সমর্থকরা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে রইলো।

সহিংস বিক্ষোভ দমাতে সেনা নামাতে হল। আমাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সহিংস বিক্ষোভে সেখানে ত্রিশ জনেরও বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটে। সহিংস দাঙ্গার ওপর মেরি ইলেন মার্ক একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু সরকার সেটা বাজেয়াপ্ত করে দেয়।

বিরোধীদের প্রতি সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতি আন্তর্জাতিক মহল প্রত্যাখ্যান করলেন। তাৎক্ষণিকভাবে ইংল্যান্ড এবং জার্মানি এর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসম্যান সোলার্জ এবং তিনি এশিয়া প্যাসিফিক হাউসের সাবকমিটিরও

www.pathagar.com

প্রধান, তিনিসহ সিনেটর কেনেডি ও সিনেটর পেল এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। সোলার্জ হুশিয়ারি দিয়ে বললো, সরকার যদি এভাবে বিরোধীদের আটক করতে থাকে এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশে বাধা দিতে থাকে তাহলে আগামীতে তাদেরকে দেয়া সাহায্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে দাতাদেশগুলো। কিন্তু রিগ্যান সরকার দাঁড়ালো জিয়ার পেছনেই। তাদের সমর্থন থাকলো জিয়ার কথিত সিভিল প্রধানমন্ত্রী জুনেজোর সরকারের প্রতি। জুনেজো সম্পর্কে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন সদস্য বলেছেন, 'বিরোধীদলের দমন করতে বিদেশীদের সমালোচনা সে তোয়াক্কাই করতো না।'

আগস্টের শেষে জিয়া মক্কা থেকে ফিরলেন। মার্কিন কংগ্রেসের সমালোচনার জবাব দিলেন তিনি। গত ২৬ অক্টোবরে তিনি নিউইয়র্ক টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, মিস ভুট্টো আমার জন্য কোন সমস্যা নয়। আসলে মিস ভুট্টো অবাস্তব এবং অপ্রয়োজনীয় উচ্চাভিলাষী তার মনোভাব ক্ষমতা দখলের দিকে, সেটা খুবই আপত্তিকর।

সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখে আমার মামলা সিন্ধু হাইকোর্টে চলে গেল। আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গঠন করা হয়নি। স্বাধীনতা দিবসের সমাবেশ ছিলো বৈধ। জনতা একদিন আগে ৯ তারিখ থেকেই সিন্ধুর হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে জমায়েত হওয়া শুরু করলো। এতে সরকার বিপাকে পড়ে যায়। হঠাৎ করে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জেল সুপার এসে আমাকে বললো, আপনার জন্য সারপ্রাইজ আছে, আজ আপনি মুক্ত। কিন্তু আমি এতে কোনাভাবেই অবাক হইনি। আমি জানতাম আমি মুক্তি পাবই।

আমি ছাড়া পাবার পর পিপিপি কী ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করবে তা নিয়ে খুবই উত্তেজনা ছিল দলের মধ্যে। কেউ কেউ বলছিলো, জান্তা আমাদের সহকর্মীদের হত্যা করেছে, রক্তের বদলা নিতে হবে। কিন্তু জিয়া এমনিতেই ডিগবাজী খেয়ে চলেছে, সেখানে আমরা অন্য কিছু করতে চাই না।

আমি তাদের বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু সরকার তার বল প্রয়োগের নীতিই গ্রহণ করে চলেছে। সে যতই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস চালাক আগস্টের আন্দোলনে আমাদের নৈতিক বিজয় হয়ে গেছে। সে বিজয় ধরে রাখতে চাই। এই বৈঠকের পর আমি আবার পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে সফর শুরু করলাম।

১৯৮৭ সালের শুরু থেকেই আমি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছিলাম। আমি সব সময় আশাবাদী ছিলাম বিগত বছরের চেয়ে আগামী বছরগুলো শুভ হবে। আশাবাদী হওয়ার মত তেমন কিছু কারণ ঘটছিলো। ছয় বছরের মধ্যে এই প্রথম আমি পাকিস্তানে মুক্তভাবে থাকতে পারছি। এ বছরেই পিপিপিকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছি। চার মাসের মধ্যে পিপিপির দশ লক্ষাধিক নতুন সদস্য সংগ্রহ করেছি। পাঞ্জাবে দলের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছি। সেখানে হাজার হাজার পার্টি সদস্যরা ভোট দিয়ে তাদের নেতৃত্ব নির্বাচন করেছিলেন। উপমহাদেশে এ ধরনের ঘটনার উদাহরণ বিরল।

www.pathagar.com

আমরা পার্লামেন্টে মুসলিম লীগের প্রতি বিরোধীদের সঙ্গে 'মানবাধিকারের লংঘন' বিষয়ে বিতর্কের আহ্বান জানিয়েছিলাম। জিয়া সব সময় আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতো, বিশেষত: সামরিক বাহিনীদের বৈঠকে সে বলতো প্রতিহিংসার রাজনীতির কারণেই আমি নাকি কোনঠাসা হয়ে যাচ্ছি। সে সেনাবাহিনীকে ভয় দেখিয়ে বলতো, পিপিপি ক্ষমতায় আসবে। কিন্তু আমি কখনো প্রতিশোধের প্রতিহিংসার রাজনীতি করি না। পিপিপির রাজনীতি হল দেশ গড়ার রাজনীতি, একথা সবাই জানে। আমি একথা সবসময়ই বলে আসছি পাকিস্তানের জন্য রাজনীতিমুক্ত একটি নিয়মিত সেনাবাহিনীর প্রয়োজন রয়েছে। আমি সব সময় সমালোচনা করে আসছি যে, জিয়া গত তিন বছরে সিয়াচিন গ্লাসিয়ার নিয়ে ভারতের সঙ্গে সংঘাত করে আসছে, সেখানে মোট ১৪ হাজার বর্গ মাইল এলাকা ছেড়ে দিয়েছে ভারতকে। ডিসেম্বর মাসে আমি সফর করলাম লাল ামুসাতে, সেখানে স্বাধীনতা দিবসের জনসভায় জান্তার হাতে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম।

আমরা যখন পাঞ্জাবের ওই অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিলাম অসংখ্য সেনা সদস্যরা খোলাখুশিভাবে আমাদের বিজয় চিহ্ন দেখিয়ে হাত নাড়ছিলেন। আবারও মনে হলো জিয়ার পায়ের নীচেকার মাটি আমি সরাতে পেরেছি। আমি যখন বাবার জন্মদিনে লারকানায় অবস্থান করছিলাম তখন একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার এবং পিপিপির সমর্থক আমাকে জানালো, সরকার আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পরিকল্পনা করছে। সে আমাকে আরও বললো, আমরা আপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে চাই। ৫ই জানুয়ারিতে আমার বাবার জন্ম বার্ষিকীতে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। খুব নির্বিঘ্নে কেটে গেল জন্মদিনের কর্মসূচী। আমি কোন নিরাপত্তাহীনতা উপলব্ধি করিনি। আমি ব্রিগেডিয়ারকে বললাম, আল-মুর্তাজায় নিরাপত্তা পরিস্থিতি বেশ ভালো। আমি কোন হুমকির মধ্যে নেই।

রাওয়ালপিণ্ডি এবং লাহোর থেকে সতর্কতা আসতে থাকে। প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা যিনি পিপিপির শুভ্যানুধ্যায়ী, তিনি আমাকে বললেন, সরকার আমাকে হত্যা করবে। আপনার খুব কাছাকাছি যারা অবস্থান করে, তাদের মধ্য থেকে ঘাতকের সন্ধানে আছে তারা বা ঘাতক আপনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে আপনার কাছাকাছি বলয়ে চলে আসবে। 'ঘাতক খুব শিগগিরই তার কাজ করবে।

আমি তার কথায় খুব একটা সতর্ক থাকার চেষ্টা করিনি। একজনের জীবনে মৃত্যু সব সময়ই অনিবার্য। তারচেয়ে রাজনৈতিক বিষয়গুলিকেই বেশি গুরুত্ব দেই, পার্টির শুভানুধ্যায়ীরা আমার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোড়দার করলো, সীমান্ত প্রদেশের একজন পার্টি সংগঠক আমার নিরাপত্তায় ছয় জন গানম্যান দিতে চাইলো, যাদের হাতে থাকবে অত্যাধুনিক কালাসিনকভ। কিন্তু আমি তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। অস্ত্রসস্ত্র দিয়ে নিরাপত্তা আমার পছন্দ নয়। আমার নিরাপত্তা কর্মীদের অস্ত্র বহন করাই নিষিদ্ধ করেছি আমি। জানুয়ারি মাসে মাত্র এক সপ্তাহেই আমার নিজের লোকের ওপর আক্রমণ হয়েছিল দুই দুইবার।

প্রথমবার আমার নিরাপত্তাকর্মী মনোয়ার সহরোয়ার্দীর ওপর আক্রমণটি আসে।

তার গাড়িকে করাচির এক সরু গলির ভেতরে নিয়ে যাবার জন্য বাধ্য করে। যে গলিটি থেকে অন্য কোথাও বের হয়ে যাওয়ার পথ নেই। কিন্তু সে যাত্রায় মনোয়ার সহরোয়ার্দী

www.pathagar.com

বেঁচে যায়, তার সঙ্গেও সশস্ত্র লোকজন ছিলো, তারা আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করতে পাল্টা গুলি ছোড়ে। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে জানুয়ারির ১১ তারিখে, সেবার আক্রমণ হয় এমআরডি নেতা ফজিল রাহুর ওপর। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য আক্রমণকারীদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি তিনি। নিজ গ্রামেই আততায়ীর গুলিতে মৃত্যু হয় তার।

লন্ডন থেকে প্রকাশিত (দৈনিক 'আমল)-এর সম্পাদক এবং আমার প্রেস সচিব বশির রিয়াজকেও হত্যার হুমকি দেয়া হচ্ছে অহরহ। রাত বিরাতে তার টেলিফোন বেজে ওঠে এবং টেলিফোনে প্রায়শই তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। এ সকল হুমকিসমূহ সামরিক জান্তার তরফ থেকেই দেয়া হচ্ছে এবং সেগুলো আমাকেই দেয়া হচ্ছে।

আমার আইনজীবীকে বলেছি, কর্তৃপক্ষকে একটা উচিত জবাব দেয়া দরকার, তাদের জানিয়ে দিতে হবে যে, আমার কোন কিছু হলে তার দায় এই সরকারকেই বহন করতে হবে। কর্তৃপক্ষকে আগাম সতর্কতা করে দিতে চাই। আরেকটি আক্রমণ আসে জানুয়ারির ৩০ তারিখে। আমি তখন নিজ এলাকা লারকানা যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম।

সাধারণত আমি করাচি থেকে পাজেরোতেই লারকানা যাই। সড়ক পথে গেলেও আমি বিমানে আসা-যাওয়ার রিটার্ন টিকিট কেটে রাখি, যদি প্রয়োজন হয়। সেদিন যাওয়াটা দেরি হয়ে গেল শেষ মুহূর্তের একটি কাজে। একাধিক ট্রাভেল প্ল্যান যাত্রার নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্য খুবই ভাল। ওই রুটে একাধিক বিমান চলাচল করে। আমি একাধিক সিট রিজার্ভ করি, কিংবা অনেক সময় বিমানের টিকেট কিনেও বিমানে না গিয়ে অন্যভাবে চলে যাই। কারণ আমি জিয়ার গোয়েন্দাদের একটা বিভ্রান্তির মধ্যে রাখতে চাই। সাধারণত আমার ভ্রমণ সিডিউল নিজের লোকদেরই বলি না। সুতরাং সফরসূচির খবর বাইরে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। বৈঠকের মাঝামাঝি সময়ে উরস এসে বললো, 'বিবি সাহেবা, আপনিতো লারকানা যাবেন, তো দেরি হয়ে যাচ্ছে না, সন্ধ্যার আগে পৌঁছতে হলে এখনই রওয়ানা হতে হবে।' আমি বললাম, আপনারা সবাই রওনা হয়ে যান, আমি একটি 'জরুরি বৈঠকে বসেছি, আমি পরে আসছি'। কিন্তু গাড়িগুলো লারকানা অবধি আর যেতে পারেনি। মিটিং তখনও চলছিলো, কে একজন একটি চিরকুট ধরিয়ে দিল আমাকে। সেখানে শুধু দুইটি শব্দ লেখা ছিলো, তা হল 'Shots' (গুলি) এবং `Pajero' (পাজেরো)।

ঠিক সেই সময়েই আমার নিরাপত্তারক্ষীদের ওপর আক্রমণ এবং এমআরডি'র নেতার মৃত্যুর ঘটনাই আলোচনা করছিলাম। বৈঠকে আগত অতিথিদের কাছ থেকে কিছু সময় চেয়ে উঠে পরলাম। তাদেরকেও বিষয়টি জানালাম যে, আমার গাড়ি বহরে আক্রমণ হয়েছে। আমি বৈঠক থেকে উঠে এসে আমার বিষয়ে স্টাফদের কী করতে হবে সে বিষয়ে নির্দেশ দিলাম। পুলিশকে খবর দিতে বললাম, আমার আইনজীবীকে জানাতে বললাম, এরপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে পুনরায় বৈঠকে যোগ দিলাম। কয়েকদিন পর ঘটনাটি জানাজানি হবার পর আসল কাহিনী বেরিয়ে আসলো।

সেটা খুবই নোংরা এবং কুৎসিত। আমাদের দুটি পাজেরো লারকানা যাবার পথে মানজহান্তের কাছে যেতেই দেখা গেল একজন লোক রাস্তার মাঝে এসে গাড়ি থামাতে বলে। প্রথম গাড়িটি তখন ৭০ মাইল বেগে চলছিল। লোকটার সিগন্যাল দেয়ার পরপরই কোথা থেকে চার জন সশস্ত্র লোক এসে আমাদের গাড়িটিকে লক্ষ্য করে এলাপাথারি গুলি করতে থাকে। গোলাগুলির মধ্য দিয়েই আমাদের প্রথম পাজেরোটি ঘটনাস্থল পার করে

www.pathagar.com

চলে যায়। এরপর দ্বিতীয় পাজেরোটি ঘটনাস্থলে গেলে আক্রমণকারিরা সেটাকে থামিয়ে তাকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে চলে যায়।

ঘাতকেরা ঠাণ্ডা মাথায় এ ঘটনাটি ঘটিয়েছিলো। অথচ সরকার একে সড়ক পথে ডাকাতি বলে দায় এড়াতে চেয়েছে। কিন্তু মোটেই তা ছিলো না, এটা একটা পরিকল্পিত হত্যা প্রচেষ্টা। কারণ দুপুর ৩-৩০ মিনিটে একদম দিনে দুপুরে কখনো সড়কে ডাকাতি হয় না। আর ডাকাতরা গাড়ি থামিয়ে মালামাল লুটপাট করে; ওভাবে এলোপাথারি গুলি ছোঁড়ে না।

আমাকে হত্যা প্রচেষ্টার খবর সারাদেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়লো, সারাদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। গণরোষে বাধ্য হয়ে সরকার ঘটনাটি তদন্ত করতে এবং আমার অপহৃত সহকর্মীদের উদ্ধার করতে সম্মত হল এবং সেখানে ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশকে দায়িত্ব দিলো।

এর মধ্যে থলের বেড়াল বেরিয়ে আসলো। একজন সংবাদ দিল, আমার বাসভবন থেকে ঘটনাস্থলে থাকা লোকদের ওয়্যারলেসযোগে সংবাদ দেয়া হয়েছে, ঘটনাটি সে প্রত্যক্ষ করেছেন। ওয়্যারলেস সংবাদে বলা হয়েছে যে, 'জিপ ছেড়ে দেয়া হল'। গাড়ির জানালার কালো কাঁচের জন্য তার বাইরে থেকে দেখতে পায়নি আসলেই ভেতরে আমি আছি কি না। এটা কোনক্রমেই সড়ক পথের সাধারণ ডাকাতি ছিলো না। কোনো হিসেবেই সেটা বলা যায় না।

এ ব্যাপারে আরো তথ্য বের হচ্ছিল, যেদিন আমার গাড়ির ওপর আক্রমণ হল আর আগের দিন একজন ডাকাত সর্দার তার গোপন ঘাঁটিতে তার সাঙ্গপাঙ্গদের বলেছিলো, 'আগামীকাল আমাদের ওপর একটা বড় দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেটা পালন করতে হবে'। এ সম্পর্কিত অন্যান্য সকল তথ্যই ধীরে ধীরে বের হতে লাগলো। জনগণও বুঝলো, সরকার তারা হীন স্বার্থ হাসিলের জন্য ডাকাতদের নোংরা কাজে ব্যবহার করছে। এটা মোটেই সাধারণ অপহরণ নয়। কারণ কিছুদিন পর আমাদের অপহৃত লোকজন মুক্তি পাবার পর– সবকিছু খোলাশা হয়ে যায়।

তারা অক্ষত অবস্থায় ছিলেন, তাদের যখন অপহরণ করা হয়, তারা অপহরণকারীদের কাছে নিজেদের 'বেনজিরের লোক' বলে পরিচয় দেয়। উপরন্ত গাড়িতে পিপিপির স্টিকার, পতাকা, লাউড স্পিকার এসবই ছিলো। এ সময় অপহরণকারীরা নিজেদের 'জিয়ার লোক' বলে পরিচয় দিয়েছিল। অথচ এই ঘটনায় জড়িত কোন অপরাধীকে সরকার এ পর্যন্ত আটক করেনি। পাকিস্তানের সহিংসপ্রবণ সমাজে সরকার সামরিক সহিংসতা ছড়িয়ে দেয়ার নানা পথ গ্রহণ করছে।

সরকার পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী, মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনের কর্মী, মুজাহিদ এবং মুসলিম লীগের কর্মীদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দেয় জিয়াবিরোধী রাজনীতিকদের হত্যা করতে এবং গোপন সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে। ১৯৮৭ সালের আগেও পিপিপির কর্মীদের জেলে পুড়ে নির্যাতন করা হতো। যদিও বলা হতো সামরিক শাসন তুলে নেয়া হয়েছে, তথাপিও বিরোধী রাজনীতিকদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা কমে যায়নি। সরকারের এই অব্যাহত নির্যাতনের কারণে পিপিপির তরুণ কর্মীদের সহিংস পথ থেকে সামলানো সত্যিকার অর্থেই খুব কঠিন হতো।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের পরিস্থিতি প্রতিদিনই বিশৃঙ্খল হয়ে উঠছিলো। ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে লন্ডন ভিত্তিক ম্যাগাজিন সাউথ-এ এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, 'পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী তাদের গ্রহণযোগ্যতা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছে,' সেখানে আরও বলা হয়েছে, 'সরকার প্রশাসনেরও কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন, সামরিক বাহিনী, পুলিশ প্রশাসন, আইন বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগসমূহ যেন অদৃশ্য সুতার টানে কাজ করে। পুরোদেশ জাতিগত সম্প্রদায়গত নানাভাগে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত। দৃশ্যতঃ আইন-শৃঙ্খলা সেখানে ভেঙে পড়েছে। অস্ত্র ব্যবসায়ী ও মাদক ব্যবসায়ীরা এখন পাকিস্তানের জনগণের জীবনের নিয়ন্ত্রক।

পাকিস্তান নিজেই যখন নৈরাজ্যের পাদপিঠ তখন বাইরের শত্রুর কি প্রয়োজন। দেশকে শুরু থেকেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে সরকার। ১৯৯০ সালে সাধারণ নির্বাচনের ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা থাকলেও, খুব অল্প লোকই বিশ্বাস করে যে, এই সরকার একটি অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে পারবে।

স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে আরেক দুঃখজনক পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। প্রাদেশিক গভর্নমেন্টকে সরকার এমন এক ক্ষমতা দিয়েছে সে যে কোনো অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাকে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধির আসনে বসাতে পারেন। ঘোষণাটি সরকারের পক্ষ থেকে আসে ঠিক স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আগ মুহূর্তে। যেখানে সরকারি দলের প্রার্থীদের ৬০ শতাংশই প্রাথমিক বাছাইয়ে বাদ পড়ে গেছে। ৪০ শতাংশ মুসলিম লীগের প্রার্থীতা বাতিল হয়ে গেল এবং তৃণমূল পর্যায়ের বাকি প্রার্থীদের গোপনে মনোনীত করা হলো যাতে তাদের প্রার্থীতা বাতিল না হয়। তদুপরি সরকারি কর্মকর্তাদের গোপনে গোপনে এই মর্মে ভীতি প্রদর্শন করা হলো যে, এটা না করলে তাদের ফোর্স রিটায়ার্মেন্টে পাঠিয়ে দেয়া হবে। তার শাসনামলে অবসরপ্রাপ্ত যে কোনো সরকারি কর্মকর্তাকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। যাতে বাকি ৬০ শতাংশ প্রার্থীদের বৈধতার ব্যাপারে কেউ কোনো আপত্তি তুলতে না পারে।

ভোটার লিস্ট ছিলো ভুলে ভরা, সংশোধন করার কোনই উদ্যোগ ছিলো না বরং ভোটের আগের দিন পর্যন্ত পরিবর্তনের নামে কল্পিত ভোটারের নাম যুক্ত করা হলো। নির্বাচনী এলাকা পুনবিন্যাস করা হলো জনসংখ্যা বিচারে। ছয়শ থেকে এক হাজার ছয়শ পর্যন্ত জনসংখ্যার জন্য একটি স্থানীয় সরকারের নির্বাচনী এলাকা। এটি করা হলো মুসলিম লীগ অধ্যুষিত এলাকাকে বিশেষভাবে বিবেচনা করে।

প্রার্থীদের প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিন বেঁধে দেয়া হলো ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত। হঠাৎ করে ১৯ নভেম্বরের রাতে ঘোষণা করা হলো যে, এই তারিখ ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। জান্তার প্রশাসন আরও ছয় দিন সময় পেল। এই ছয় দিন তারা বিরোধী প্রার্থীদের ভয় এবং লোভ দুই দেখিয়ে অনেককে বসিয়ে দেয়া হল এবং সেখানে মুসলিম লীগ প্রার্থীদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বিজয় দেখানো হল। পোলিং স্টেশনগুলো সবসময় জনবহুল গ্রাম কিংবা শহরে রাখার বিধান অথচ সরকার সেগুলোকে স্থানান্তরিত করে মুসলিম লীগের প্রভাবাধীন এলাকায় নিয়ে যায়। এই ঘোষণা আসে ঠিক নির্বাচনের আগের মুহূর্তে। যেখানে মানুষ যেতেই ভয় পেত, এবং কোনো অভিযোগ উত্থাপন করার পরিবেশই থাকতো না।

www.pathagar.com

অনেক জায়গায় বিরোধীদের কোনো প্রকার তোয়াক্কা না করে তাদের না জানিয়েই পোলিং স্টেশন তাদের সুবিধামত স্থানে নিয়ে যায়, সেখানে বিরোধীদের ভোট গণনার কোনো পরিবেশই থাকতো না। নির্বাচনের দুইদিন আগে থেকে পিপিপির সমর্থকদের জিপ, কার, অন্যান্য যানবাহনগুলোর রিকুইজিশন করে নেয়া হলো। পিপিপির সমর্থকরা যে সকল গাড়িতে করে নির্বাচনে যাবে সেগুলোও নিয়ে যাওয়া হলো। অথচ মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীদের কোনো যানবাহনকে তারা স্পর্শ পর্যন্ত করলো না।

নির্লজ্জভাবে এতো ভোট কারচুপি করেও মুসলিম লীগ তার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আনতে পারলো না। লারাকানার আমাদের নির্বাচনী এলাকাতে দেখা গেল সেখানে প্রধানমন্ত্রী জুনেজোর এক আত্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছিলেন। মুসলিম লীগের সাঙ্গাৎরা উঠে পড়ে লেগে গেল তাকে জিতিয়ে আনতে। তারা এটাই প্রমাণ করতে চাইলো দেখ, বেনজির তার নিজ এলাকাতেই জিতলো না।

তারা আমাদের প্রার্থীকে ভয় দেখালো, ঘুষ সাধলো, তাতেও কাজ হলো না। তারা আমাদের ছয়শ' সাচ্চা ভোট নিজেদের বাক্সে পুরলো, এতো কিছু করার পরও দেখা গেল, আমরা জিতেছি। প্রথম পর্যায়ের ভোটে যে সকল কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন, দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে তারা মিউনিসিপ্যালিটি এবং জেলাগুলোর চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন।

এই দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনেও তারা নানা কুটকৌশল ব্যবহার করল নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। সেখানেও দেখা গেল আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়েছি, এখন সরকার তার নির্বাচন কমিশনকেই গালমন্দ শুরু করে দিলো। নির্বাচন কমিশন আমাদের বিজয়ী প্রার্থীদের বাতিল ঘোষণা শুরু করলো। এ ধরনের বহু ঘটনা ঘটেছে বিভিন্ন স্থানে।

লারকানাতে একবার ডিসট্রিক কমিশনার তার কার্যালয়ে ভোট গণনার পর দেখলেন সেখানে পিপিপির প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন, কমিশনার এক পর্যায়ে রুম ত্যাগ করলেন, পুনরায় ফিরে আসার পর হঠাৎ করে পুনরায় ভোট গণনার নির্দেশ দিলেন, এবার দেখা গেল রহস্যজনকভাবে মুসলিম লীগের প্রার্থী বিজয়ী হলেন এবং তাকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হলো। যখন ডিসট্রিক কমিশনারকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয় তিনি সরাসরি ক্ষমা চেয়ে বলেন, আমার কিছুই করার নেই, আমি অসহায়।

শাহদৎকোট মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে সরকার ভিন্ন ধরনের এক চাল চেলেছিল। দেখা গেল ঠিক নির্বাচনের আগে আমাদের দুজন কাউন্সিলরকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে তারা চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে না পারে। এরপর মুসলিম লীগের প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হয়ে যায়, আর পিপিপি'র প্রার্থীরা নমিনেশন পেপারই সাবমিট করতে পারে না। আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা আমাদের কাউন্সিলরদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিয়ে এসে বলেছে, 'তোমাদের কেউ যদি মুসলিম লীগের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে নমিনেশন পেপার সাবমিট কর তাহলে তোমাদের অপহরণ করা হবে। বেনজিরের সাধ্য নাই তোমাদের ছাড়িয়ে আনা। এভাবে বিজয়ী হয়ে জান্তা তাদের ব্যাপক নির্বাচনী সাফল্যের কথা ফলাও করে প্রচার করছিলো। যখন আমরা ভোট কারচুপির প্রসঙ্গ তুলি, তারা জবাব দেয়, 'আঙ্গুর ফল বড় টক'।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে যখন ঢাকার পতন হচ্ছিল তখন আমার বাবা জাতিসংঘে এক ভাষণে বলেছিলেন 'বাস্তবতা পাল্টাচ্ছে'।

নাৎসিরা যখন মস্কোর দ্বারপ্রান্তে, ফ্রান্স ছিলো জার্মানির দখলে, চীন জাপানের দখলে, ইথিওপিয়ায় ফ্যাসিস্টরা রাজত্ব করছে। তিনি বলেছিলেন এসকল বাস্তবতা সত্ত্বেও মানুষেরা ঘুড়ে দাঁড়াচ্ছে, তারা লড়াই করছে এবং ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলে বাবা যখন এ সকল কথা তার বক্তৃতায় বলেন, তখন আমি আঠারো বছরের তরুণী। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি। তার এই ভাষণ আমার জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এরপর যখন জিয়ায় স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে লড়ছি তখন আমার কানে বাজছে বাবার সেই উক্তি 'বাস্তবতা পাল্টাচ্ছে'। সূদুরপ্রসারী চিন্তা স্বপ্ন হতে পারে। যা হতে পারে ভবিষ্যদ্বানী।

যারা সমৃদ্ধ পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখে এবং জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে, এজন্য তাদের অবশ্যই দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।

একবিংশ শতকের প্রারম্ভে পাকিস্তানের জনসংখ্যা হবে সাড়ে ১৫ কোটি যা বর্তমানে রয়েছে ১০ কোটির মতো। তার মধ্যে কর্মক্ষম, মানুষের সংখ্যা ৪৪ শতাংশ। এখনকার চেয়ে শহুরে বাসিন্দাদের সংখ্যা তখন তিনগুণ বেড়ে যাবে।

'৮০-এর দশকের এই সময়ে পাকিস্তানে ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ মানুষ নিরাপদ পানি পান করতে পারে না। একই সংখ্যক মানুষের সেনিটেশন সুবিধা নেই। বড় অংশ বস্তিতে বসবাস করে। বেলুচিস্তান এবং সীমান্ত প্রদেশেও একই চিত্র সেখানে এখনো মানুষেরা পাহাড়ের গুহায় বসবাস করে। সামরিক জান্তা বাজেটের মাত্র ৫ শতাংশ গৃহায়ণ খাতে বরাদ্দ করে থাকে। এসব লোকদের শিক্ষার জন্য সরকারের কোনো মাথাব্যথাই নেই। আন্তর্জাতিকভাবে স্বিকৃত শিক্ষার সংজ্ঞা অনুযায়ী পাকিস্তানে প্রায় ৯০ শাতংশ মানুষই অশিক্ষিত।

অপরদিকে শিক্ষার অন্য সংজ্ঞা অনুযায়ী যেখানে শুধুমাত্র নিজের নাম লিখতে পারে এমন লোকের সংখ্যা মোট ৭৩ শতাংশ। ৫ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের মাত্র ৪৫ শতাংশ স্কুলে যেতে পারে।

স্কুলগামী শিশুদের ৫ জনের ৪ জনই তাদের বয়স ১০ বছর হওয়ার আগেই ঝরে পড়ে।

এই পরিসংখ্যান শুধু বেদনাদায়কই নয় এটা আশঙ্কাজনকও বটে। প্রতি বছর ১৫ লাখ নিরক্ষর মানুষ পাকিস্তানে মোট জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। জিয়া জান্তার শাসনামল শিক্ষার হার বাড়ছে তো নয়ই বরং আরো কমছে।

জিয়ার শাসনামলে জাতীয়ভাবে খুবই দুর্ভাগ্যজনকভাবে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে সামরিক খাতকে। তার শাসনমালে সামরিক ব্যায় আগের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে।

সামরিক বাহিনীতে মাথাপিছু ব্যয় দক্ষিণ এশিয়ার যেকোনো দেশের চেয়ে অনেক বেশি। অথচ পাকিস্তানের শিক্ষা স্বাস্থ্য গৃহায়ণ খাতে মাথা পিছু বরাদ্দ অসম্ভব নিচে। জাতিসংঘের শিশু তহবিলের হিসাব অনুযায়ী পাকিস্তানে প্রতিবছর জন্ম নেয়া ৪০ লাখ শিশুর মধ্যে ৬ লাখ শিশুই মারা যায়, তাদের বয়স ১ বছর হবার আগেই। ৫ বছর হবার আগেই মারা যায় সাড়ে ৭ লাখ শিশু।

প্রতিবছর সাড়ে ৭ লাখ শিশুর মৃত্যু হয় অথচ এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য নেই।

www.pathagar.com

একটি অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আগামী দিনে পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরে আসবে। এর জন্য আমার বাবা তার জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তিনি ধনী- গরীব, নারী-পুরুষ এবং সকল ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সাংবিধানিক অধিকার দিয়ে গেছেন। শিক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে তিনি দেশকে উপকৃত করেছেন। জনগণের কাছে তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের কণ্ঠস্বর, মানুষেরা এখনো তার জন্য প্রার্থনা করে। তিনি তার চিন্তা স্বপ্ন ও বিশ্বাসের মূল্য দিয়ে গেছেন।

'দি আমেরিকান ক্রাইসিস ইন ১৭৭৬' নামের এক পুস্তকে থোমাস পেইন বলেছেন, ' 'স্বৈরশাসন হলে নরকতুল্য, সহজে এটা জয় করা যায় না, তার সঙ্গে সংঘাতটা খুবই শক্ত, কিন্তু বিজয়টা আনন্দদায়ক'। পাকিস্তানে আমরা একটা নরকের মধ্যে আছি। সকল ধরনের নির্যাতনের জন্য আমরা প্রস্তুত। আমরা ভুক্তভোগী, আমরা আত্মউৎসর্গ করেছি, অন্য পরিবারের সদস্যদের জন্য আমার পরিবারের সদস্যরা নিজের জীবন দান করেছেন। প্রয়োজনে আবারও জীবন উৎসর্গ করবো, তবুও গণতন্ত্রের মশাল প্রজ্জ্বলন রাখবো।

শেষ লড়াইয়ে স্বৈরশাসন পরাজিত হবে, গণতন্ত্রের স্বপ্ন আবারও পাকিস্তানে বাস্তবতা হয়ে ফিরে আসবে। সেই বিজয়ই হবে সবচেয়ে মহান বিজয়।

www.pathagar.com

১৪

পিত্রালয়ে বিয়ে

১৯৮৭ সালের ২৯ জুলাই। এই তারিখে আমার জীবন এক নাটকীয় মোড় নেয়। যখন আমার পরিবারের পছন্দের বিয়েতে আমি রাজি হই।

সম্বন্ধের বিয়েতেও নিজের পছন্দের মূল্য দিয়েছি। যেহেতু রাজনীতি তার পথে আমার জীবনকে টেনে এনেছে।

পাকিস্তানে আমার যে সামাজিক অবস্থান সেখানে কোন লোকের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করা, তাকে জানা বোঝা, এরপর একটা সমঝোতা করে বিয়ে করাটা অসম্ভব। খুবই গোপন ও সতর্ক সম্পর্ক নিয়েও চারদিকে কানাঘুষা চলত। এগুলো নিয়ে অনেক গুজব ছড়িয়ে পড়ত চারদিকে। আমার প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়েই এগুলো হতো।

প্রাচ্যের নিয়ম অনুযায়ী সমন্ধের বিয়েটা স্বাভাবিক প্রথা, এটা কোন ব্যতিক্রম নয়।

যদিও আমার বাবা মা ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন। আমিও ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতাম, আমি যখন বড় হব তারপর প্রেমে পড়ব এবং সেই পছন্দের পাত্রকেই বিয়ে করবো। আমি এখনো বিয়ের জন্য সেই পরিকল্পনার কথাই বলি। আমি পাকিস্তানের সবচেয়ে পরিচিত এবং সবচেয়ে পুরনো পরিবারের একজন সদস্য, তদুপরি প্রধানমন্ত্রীর কন্যা।

আমেরিকাতে লেখাপড়া করার সময় আমি একবার নারী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ি। সেখানে আমার ধারণা হয়েছিল বিয়ে এবং ক্যারিয়ার এই দুইয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। অন্য কিছুকে এরা বাধা সৃষ্টি করে না। আমি এটা বিশ্বাস করি এবং বাস্তবেও তাই করি। একটি সুখী জীবন, ছেলেপুলে নিয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন, সন্তোষজনক পেশাগত জীবন– একজন নারী হিসাবে আমি তাই চাই, এটাই আমার লক্ষ্য। যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, তারও একটা চাওয়া থাকা দরকার, যেমনটা আমি চেয়েছি।

ইতিমধ্যে দেশের সামরিক অভ্যুত্থান আমার সব স্বপ্ন ভেঙে তছনছ করে দিয়ে যায়। সামরিক শাসনামলের পয়লা বছরে আমার জন্য যেসব বিয়ের প্রস্তাব আসতো আমি

www.pathagar.com

সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে দিতাম। আমার বাবা তখন জেলে, তার জীবন তখন ভয়াবহ বিপদের মধ্যে, ওই সময় কি করে আমি নিজেকে ঠিক রাখি, কি করে আমি নিজের বিয়ের কথা ভাবি। এরপর বাবাকে যখন হত্যা করা হয় তখন বিয়ের চিন্তা মাথা থেকে আরো দূরে চলে যায়।

ঐতিহ্যগতভাবেই ভুট্টো পরিবারের কেউ মারা গেলে অন্তত এক বছরের মধ্যে কেউ বিয়ে করে না কিন্তু বাবার মৃত্যুতে আমি এতটাই আঘাত পেয়েছিলাম যে, এটাকে সামাল দেওয়ার জন্য ১৯৮০ সালের দিকে আমার মা আবারও বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। এবারও আমি সরাসরি না বলে দেই, তাদেরকে বলে দেই আমি আরো দু' বছর অপেক্ষা করতে চাই।

এখন আমি পিতৃ শোকে বিহ্বল। তার প্রতি আমার নিজস্ব শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই। এটা কোন সুখের নয় যে আমি বিয়ে করতে যাব।

আমার বিয়ে নিয়ে বাবা যে সকল কথা বলতো তা আমার মনের মুকুরে ভেসে উঠতে লাগলো। আমার ছোটবেলায় বাবা বলতেন, আমি কখনোই তোমাকে বিয়ে দেব না, তবে তোমাকে অবশ্যই বিয়ে করতে হবে। সনম এবং আমাকে বাবা প্রায়ই এসব কথা বলতেন। বাবা আমাদের সঙ্গে তামাশা করে বলতেন, বিয়ের পর যদি তোমার চোখে এক ফোঁটা জল দেখি, যদি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর শুনি, সঙ্গে সঙ্গেই আমি তোমার স্বামীর কাছে চলে যাব, চাবকে তার পিঠের চামড়া তুলে নেব এবং তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো।

বিয়ের কথা মনে উঠলেই, ছোটবেলায় অনেক দুঃখজনক স্মৃতি এসে ভিড় করে, নিজেকে ঠিক রাখা যায় না।

এরপর দু' বছর পার হয়ে গেল, আমি তখন জেলে। এ সময়তো বিয়ের প্রশ্নই আসে না। তিন বছর পর যখন আমি ছাড়া পাই। তখন ১৯৮৪ সাল। আমি ইংল্যান্ডে নির্বাসনে চলে যাই। এ সময় আবার বিয়ের কথা চালাচালি হতে শুরু করে, মাকে আবারও না বলে দিলাম। বললাম, জেলের নির্জনতা থেকে এবার মানুষজনের সঙ্গে থেকে একটু স্বাভাবিক হতে চাই এখনই স্বামীর সঙ্গে একাকী জীবন নয়।

এ সম্পর্কিত যে কোন আলাপ আলোচনা যেন আমার বুকে শেল মেরে দিতো। যেন আমার দম বন্ধ হয়ে যেতে। অবস্থা এমন হল যে, একটা আওয়াজ হলেই আমি চমকে উঠতাম।

মাকে বললাম, বিয়ের আগে নিজেকে একটু গুছিয়ে নিতে চাই। একটু শান্তি চাই, নিজেকে আরেকটু ঠিকঠাক করে নিতে চাই। এজন্য আমার কিছু সময় দরকার। ইংল্যান্ডে ধীরে ধীরে আরেকটি বছর কেটে গেল, আমি আগের চেয়ে আরেকটু স্বাভাবিক হলাম। এই সময়ের মধ্যেও কিন্তু বিয়ের কথাবার্তা বন্ধ ছিল না।

বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রস্তাব আসতে থাকলো। আমার মা এবং মান্না খালা আমার কাছে একটি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসলো।

পাত্র পাকিস্তানের ভূস্বামী জারদারি পরিবারের ছেলে। গোপনে খোঁজখবর নিয়ে, পাত্রের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা এবং শখ ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে নিলাম।

পাত্রের রিয়েল এস্টেট এবং কনস্ট্রাকশন ব্যবসা ছাড়া সে ভূস্বামী পরিবারের সদস্য, দি লন্ডন সেন্টার অফ ইকোনোমিক এন্ড পলিটিক্যাল স্টাডিসের ওপর লেখাপড়া করেছে

www.pathagar.com

পেটারো ক্যাডেট কলেজ থেকে। তার সখ সাঁতার কাটা বই পড়া। তার বাবা হাকিম আলী ছিলেন জাতীয় পরিষদের সাবেক সদস্য। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং এম আর ডি'র সদস্য, আমার সঙ্গে আসিফের বিয়ে প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, বেনজিরের সঙ্গে আসিফের কোনো কিছুতেই তুলনা চলে না, তবে ওদের বিয়ে হলে সেটা আমি পছন্দই করবো।

আমাদের মান্না খালা আবার আসিফদের পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠজন। সে এ বিয়ের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন। খালা আসিফকে নিজ বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসতেন। সবদিক থেকেই খালার খুব পছন্দ ছিল। শেষে লন্ডনে এ ব্যাপারে মার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এর মধ্যে আমাদের পরিবারে আরেক ট্রাজেডি শুরু হল। আমার ভাই শাহ নেওয়াজকে হত্যা করা হলো। তার খুনের ঘটনায় আমি খুব ভেঙে পড়লাম, আমাদের পুরো পরিবারও এলোমেলো হয়ে গেল। আমার মা এবং খালাকে ডেকে বললাম অন্তত এক বছরের মধ্যে বিয়ের বিষয়ে আমি চিন্তাও করতে পারবো না।

এমনকি আমিও কাউকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করিনি কিন্তু মান্না খালা ছিলেন নাছোরবান্দা, যেভাবেই হোক পাত্রকে রাজি করিয়েছে সে। ১৯৮৬ সালের এপ্রিলে যখন আমি পাকিস্তানে ফিরি তখন মান্না খালা এত কিছুর মধ্যেও আমার পিছু ছাড়েনি। সে কেবলিই জারদারি পরিবারের গুণ কীর্তন গাইতো। তিনি বলতেন, জারদারিরা ইরানিয়ান বেলুচ। তারা নবাব শাহের বংশধর। কয়েক শতাব্দী ধরে তারা সিন্ধু প্রদেশে বসবাস করছে। আসিফ এখন তার বাবার জমিদারি দেখাশোনা করে। সে খুব চমৎকার ছেলে, বয়সও মানান সই হবে। জমিদার পরিবারের ছেলে তার ওপর পলিটিক্যাল পরিবার। পেশোয়ারে এবং লাহোরে তাদের ব্যবসা রয়েছে। খালা আমায় আরো বুঝাতেন, 'দেখ এরপরও আমি মনে করি না যে সে তোমার উপযুক্ত। কিন্তু যেহেতু তোমাকে বিয়ে করতেই হবে, তাহলে তোমাকে সিন্ধুর কাউকেই বিয়ে করা ভালো, কারণ সে তোমাদের স্থানীয় আচার ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত।

তিনি এসব বলেই যেতেন কিন্তু আমি তেমন উৎসাহী হতেম না। নয় বছরের পর মুক্তভাবে দেশের মাটিতে বসে নিঃশ্বাস নিতে পারছি। ঘুরে বেড়াচ্ছি, বন্ধুদের কাছে যাচ্ছি, তাদেরকে বলছি, 'তোমরা আমাকে অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করতে দাও। কিন্তু মান্না খালা আমার পিছু ছাড়েনি, আমাকে কোন কিছু না জানিয়েই সে আমার খালাত বোন ফাখরিকে দিয়ে একটি ডিনার পার্টির আয়োজন করেছেন, সেখানে আসিফকে দাওয়াত দিয়ে রেখেছেন। সময়টা ছিল ১৯৮৬ সালের নভেম্বরে। অর্থাৎ পাকিস্তানে ফেরার ৭ মাস পরের ঘটনা। ডিনার পার্টিতে আসিফ ধোপ দুরস্থ স্যুট-কোট পরে এসেছিল। নিজেকে সে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করছিল। যদিও সে বেলুচদের প্রথাগত আলখাল্লা পোশাক পড়তে পছন্দ করতো বেশি। এমনকি লন্ডনের রাস্তা দিয়েও সে ওই পোশাক পরেই চলাফেরা করতো।

ডিনার পার্টিতে মান্না খালা এক পর্যায়ে কিছু লোকের সঙ্গে তাকে আমার কাছে পাঠালো।

আমি যখন আসিফের নাম শুনলাম, এতে আমার কোন ভাবোদয় হল না। তার সম্পর্কে আমার ধারণা নেই শুধু এতটুকুই স্মরণ করতে পারছি যে, তার ব্যাপারে আমাকে

www.pathagar.com

নিয়ে কথাবার্তা চলছে। মান্না খালা চিন্তিত ছিলেন যে সে হয়ত দীর্ঘসময় ধরে আমার সঙ্গে আলাপ করতে থাকবে। কিছুক্ষণ পর তাকে ডেকে পাঠালেন খালা, আমি স্বস্তি পেলাম।

একই সঙ্গে আমার চিন্তা হলো হবু স্বামী কিভাবে আমার এই জীবন মেনে নেবে। দেখা যায় প্রায় সময় বাড়িতে মিটিং করতে হয়, হয়ত মিটিং চলে রাত অবধি। বাইরেই কাটাতে হয় বেশির ভাগ সময়, দেশের বিভিন্ন এলাকা সফর করতে হয় একটানা, এতে আমার নিজস্ব সময় বলে তেমন কিছুই থাকে না, তাতে স্বামী সংসারে সময় দেওয়ায় পর্যাপ্ত সময় কোথায়? এসব কিছু বিবেচনা করা সেই লোক আমি কোথায় পাব, যে প্রথাগত নিয়ম কানুন ভেঙে এগুলো মেনে নেবে। আমার প্রথম প্রতিশ্রুতি পাকিস্তানের জনগণের প্রতি স্বামীর প্রতি নয়। আমার এই পরিস্থিতি কে মেনে নেবে।

জনগণের মনোভাব নিয়েও আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম, তারাও চাইতো আমি বিয়ে করি। কারণ বয়সে আমি তরুণী। জীবনে অনেক বিয়োগাত্মক ঘটনা আছে, অনেক বছর জেল খেটেছি। আমার বন্ধুরা আমাকে বলতো, জনগণ আমাকে সন্তের মতো জ্ঞান করে। কারণ পাকিস্তানের গণতন্ত্রের জন্য আমাদের পরিবারের আত্মোৎসর্গ আমাকে একা করে ফেলেছে, আমাদের পরিবার নিয়ে তাদের চিন্তার অন্ত নেই। তারা মনে করে আমাকে দেখাশোনা করার জন্য আমার বাবা নেই মা নেই, এমনকি ভাইটিও নেই। জনগণের নির্ভর করার একমাত্র দল হল পিপিপি, আর পিপিপি তাকিয়ে আছে আমার দিকে। সুতরাং আমি যদি বিয়ে করি তাহলে তাদের সুবিধে হবে।

অপরদিকে নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়া করি। আমি যদি বিয়ে না করে- একা থাকায় সিদ্ধান্ত নেই তাহলে কি হবে। এই পুরুষ শাসিত সমাজে নানা প্রশ্ন উঠবে আমাকে নিয়ে। সেটা উঠবে পাকিস্তানের ভেতর বাহির উভয় দিক থেকে। যদি একজন পুরুষ বিয়ে না করে থাকে, তাহলে তাকে নিয়ে সামান্যই সমালোচনা হবে কিন্তু একজন নারী যদি অবিবাহিত থাকে, তাকে নিয়ে নানা গুঞ্জন শুরু হয়ে যাবে। অনেক সময় সাংবাদিকরা আমাকে প্রশ্ন করে বসত, কেন আমি বিয়ে করছি না। আমি উল্টো তাদের বলতে চেয়েছি, এ প্রশ্ন কোন পুরুষের ক্ষেত্রে করছেন না কেন? কিন্তু আমি তাদেরকে সে প্রশ্ন করিনি। কারণ কোন সাংবাদিক প্রথাগত মুসলিম পরিবারের কোন নারীকে এভাবে দেখতে অভ্যস্ত নয়। সেক্ষেত্রে আমি তাদেরকে সে প্রশ্ন করতে পারিনি।

সকল পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাটাই এমন কোন নারী বিয়ে না করলেই ধরে নেওয়া হয় যে, মেয়েটার জীবনে কোন একটা দুর্ঘটনা নিশ্চয় ঘটে গেছে। তারা যদি জেনেও থাকে যে, মেয়েটি একটি রাজনৈতিক নেত্রী, সে ক্ষেত্রেও তার করার কিছু নেই। আমি যে উচ্চ শিক্ষিতা নারী, আমার শক্তিশালী পার্টি প্লাটফরম রয়েছে, সেখানেও আমি কোন আনুকূল্যতা পাব না। সেখানেও অলিখিতভাবে একটা মনোভাব কাজ করবে যে, একজন অবিবাহিতা নারী যথেষ্ট সাহসী হতে পারে না, তার আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি থাকবে, সে ভীতু প্রকৃতির হবে, নতুবা খুব আক্রমণাত্মক হবে যেটা দেশ শাসনে সহায়ক নয়। মুসলিম সমাজে বিয়ে হল একজন নারী ও একজন পুরুষের স্বাভাবিক পরিণতি। তাদের ছেলেপুলে হবে, তাদের চিন্তা ও পরিকল্পনাও একটা সফলতা পাবে।

www.pathagar.com

আসিফ জারদারি! আসিফ জারদারি! আসিফ জারদারি! হায় আসিফ জারদারি! ইতিমধ্যে দু'বছর পার হয়ে গেল, সে এবং তার পরিবার আমায় পিছু ছাড়লো না। আমার কৌশল ছিলো, বিয়ের যতগুলো প্রস্তাব এসেছে সে বিষয়ে নির্বিকার থাকা এতে পাত্র পক্ষের সকলেই তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলতো না হয় ধরেই নিত যে আমাদের পক্ষের কোন আগ্রহ নাই।

সবাই আগ্রহ হারিয়ে ফেললেও জারদারি পরিবারের তরফ থেকে সেটা অক্ষুণ্ন ছিল।

১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, আমি তখন লন্ডনে। আফগানিস্তানের বিষয়ে সেখানকার টেলিভিশনে আয়োজিত একটা আলোচনাতে অংশ নিয়েছিলাম। ঠিক সেই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে লন্ডনে এসে হাজির হয়েছিলেন আসিফের সৎ মা।

সে তার স্কুল জীবনের পুরানো বন্ধু বেহজাত নামের এক ভদ্র মহিলাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আবার সম্পর্কে আমার খালা হন। বেহজাত খালাকে ডেকে নিয়ে তিনি আসিফের ব্যাপারে বোঝালেন যে, আসিফ খুব বিনয়ী, ভদ্র ও নম্র প্রকৃতির মানুষ। তাদের মধ্যেকার আলাপচারিতা আবার আমার কাছে এসে বলতো বেহজাত খালা, সেখানে মান্না খালাও যোগ দিতেন। সেও আমাকে বোঝাতেন, দেখ আসিফের জন্য তুমিই উপযুক্ত পাত্রী, এটা খুবই সত্য, কোন কল্পনা নয়। সে সত্যিই তোমাকে বিয়ে করতে চায়।

তাদের কথায় উৎসাহ যোগাতে এসে মাও যোগ দিতেন, তিনি বলেতেন, দেখ আমরা তাদের পরিবারের খোঁজ খবর নিয়েছি। তোমার সাথে বয়সেও সে মানান সই। তারা সিন্ধু প্রদেশের লোক, সুতরাং নিয়মকানুন আচার ব্যবহারেও একটা মিল থাকবে। সে গ্রামীণ সমাজ থেকে উঠে আসা মানুষ, শহুরেদের মত শিকড় ছাড়া মানুষ নয়। সে তার সমাজ ও গোত্রের প্রতি দায়বদ্ধ, সে তোমাকেও বুঝতে পারবে। তোমার প্রতিশ্রুতিকে সে উপলব্ধি করবে। আমার মায়ের বুঝটা ছিল ভিন্ন ধরনের। তিনি মানুষের দরকারি বৈশিষ্টটাই তুলে ধরতেন। তিনি মনে করতেন, স্বামীকে ভক্তি করতে হবে। তার ভালোটাই চাইতে হবে। যারা চাকচিক্যটাই প্রাধান্য দেয় তাদেরকে পছন্দ করতেন না তিনি।

আমি জানি আমার বিয়েতে কোন শান্তি আসবে না।

বেহজাত খালা একবার এসে প্রস্তাব দিলেন, আসিফের সৎ মায়ের সঙ্গে চা চক্রে মিলিত হতে। আমি তাতে রাজী হলাম না। আমার মনে হল, ঐ বৈঠকে আমার সম্মতি নেওয়া হবে। নিজেকে মানসিকভাবে আবার গুছিয়ে নিতে আমি পরিবারের কাছে আরো সময় চাইলাম। আমি তাদের কাছে অনুরোধ করলাম অন্তত জুন পর্যন্ত সময় চাই। পাকিস্তানে যখন ফিরেছিলাম, লাহোরে এক বান্ধবীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিভাবে একজন অপরিচিত মানুষকে বিয়ে করবো। সে আমাকে বলেছিলো, বিয়ে করার পর তাকে তুমি অন্য চোখে দেখবে। একই প্রশ্ন করেছিলাম অপর এক বান্ধবীকে সে আমাকে বলেছিলো, তুমি কি শোনে নাই, 'আগে আসে বিয়ে; পরে আসে ভালোবাসা।'

আমি গোপনে আসিফের ব্যাপারে কিছু খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছি। কেউ আমাকে বলেছে, আসিফ খুব উড়নচন্ডি লোক, বাজে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পোলো খেলে, আড্ডা দেয়। তাতে করে বাকী জীবন তাকে পস্তাতে হবে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল কথাটি আদৌ সত্য নয়। সুতরাং এ্ অভিযোগ আমাকে বিব্রত করবে না।

আসিফের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমাকে বলেছিলো, আসিফের আসল দোষ হল সে খুব উদার, বন্ধু-বান্ধবরা আর্থিক সংকটে পড়লে সে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় দু'হাতে টাকা

বিলায়।

আরেকজন বলেছিলো, আসিফের রয়েছে দৃঢ় মনোবল এবং একই সঙ্গে আনুগত্যতা। একথা তার বন্ধু এবং শত্রু সবাই বলবে।

এ সকল বর্ণনা শুনে আমার ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। এক ধরনের বৈশিষ্টের লোক ছিলেন তিনি।

ওই সময় আমি অমানুষিক পরিশ্রম করে যাচ্ছি, ৭০ ক্লিফটন অনেক বড় বাড়ি। এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছিলো যে ভুট্টো পরিবারের কয়েক প্রজন্মের সদস্যরা সেখানে বসবাস করতে পারে। এত বড় বাড়িতে আমি যে রুমে থাকি কেবল সেই রুমেই আলো জ্বলে। একা থাকতে আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগি এতবড় বাড়ির মালিক আমি একা নই। আমার ভাই মীর নিশ্চয় আবার বিয়ে করেছে, হয়তো পাকিস্তানে ফিরে আসবে শিগগিরই। আমার ভাই এবং তার নতুন বউ আসার পরে এ বাড়িতে আমার পরিস্থিতি হবে কি। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার আলাদা বাড়ি দরকার।

আমার আলাদা পরিবার দরকার, আমার বোনের বিয়ে হয়েছে, তার বাচ্চাকাচ্চা হয়েছে, তারও আলাদা পরিবার আছে। আমার ভাইয়েরও একই অবস্থা। এক সময় আমরা সবাই ছিলাম এককেন্দ্রীক পরিবারে। হঠাৎ করে সবকিছু ঘুরে গেল, এই সব নতুন পরিবার গড়ে উঠল, আমাকে একা করে ফেললো। মৃত্যু আমাকে তাড়িয়ে কেরে। শাহ নেওয়াজ ভুট্টোর মৃত্যুর আগেও মনে করতাম আমাদের পরিবার অনেক বড়। যখন আমরা তিনজনে নেমে আসলাম তখন আর বড় নই, আমরা ছোট ফ্যামিলী হয়ে গেছি।

এখন আমার নিজের সন্তান সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠছে, তারাই যেন আমার প্রাণাধিক প্রিয়। আমার পরিবারকে কথা দিয়েছিলাম জুন মাসে ইংল্যান্ডে বসে আসিফের সঙ্গে দেখা করবো।

কিন্তু ইসলামাবাদে সংসদীয় বিরোধীদলীয় বৈঠকের জন্য দেরি হয়ে গেল।

যখন ইসলামাবাদ থেকে করাচি যাই এখন আসিফের সৎ মায়ের হাতে লেখা একটি চিঠি পাই।

চিঠিটি হাতে পেয়ে আমার খালাত বোন ফাখরিকে ফোন করে বললাম 'ফাখরি এখন বল আমি কী করতে পারি।' সে বললো, তার সঙ্গে দেখা কর, তুমি যদি চাও তবে আমিও থাকবো তোমার পাশে।

সে আর বললো, এ ব্যাপারে আমাদের যা যা বলতে তাকেও সে সব কথা খুলে বল।

৭০ ক্লিফটনের বাসভবনে আসিফের সৎ মা আসলেন ধোপদুরস্থ পোশাক পড়ে, তিনি ক্যামব্রিজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি নিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, বিয়ে তোমার জীবনে এক নতুন মাত্রা এনে দেবে।

আমি বলতে চাইলাম, একজন নারীর জন্য বিয়ে করে নতুন মাত্রা যোগ করার কোনই প্রয়োজন নাই। আসিফের সৎ মা যা যা বলেছিলো তার বিপরীতে আমি যুক্তি দেখাতে চাইলাম, কেন আমার কোন বিয়ের দরকার নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে একজন পুরুষের কাছে সম্মানিত হওয়াটা একটা দুঃস্বপ্ন।

www.pathagar.com

কিন্তু এসব কিছুই বলিনি, নিজেকে সংযত রেখেছি।

আমি তাকে বললাম, আমার জীবনটা অন্য সাধারণের মত নয়, আমি রাজনীতি করি। শুধু পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন করার মৌসুমী রাজনীতি আমার নয়। আমার রাজনীতি হল স্বাধীনতার প্রতি দায়বদ্ধ। আমার জীবনের মানেটাও তাই। সেক্ষেত্রে একজন স্বামী সেটা কীভাবে মেনে নেবে, যেখানে সে দেখবে তার নিজের জীবনকে ঘিরে তার স্ত্রীর জীবন আবর্তিত হচ্ছে না। আসিফের সৎ মা আমাকে নিশ্চয়তায় সরে বললেন, মাইডিয়ার, আসিফ খুবই আত্মবিশ্বাসী যুবক। সে এসব জেনে শুনেই পা বাড়াচ্ছে।

আমি বললাম, আমাকে অনেক সময় সফর করতে হয়, সব সময় স্বামীকে সাথে নিয়ে চলাফেরা করা যায় না। তিনি বললেন, আসিফের নিজেরই অনেক কাজ কর্ম আছে, সব সময় তোমার সঙ্গে ঘোরার তারই বা সময় কোথায়। আমি বললাম, শুনেছি সে নাকি প্রায়ই বাইরে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যায়, পার্টিতে যায়; আমার নিজের সময়তো খুব সামান্যই থাকবে, তাছাড়া বাড়িতে আমার কিছু বান্ধবী মাঝে মাঝে থাকে, আমি এটাকে অগ্রাধিকার দিতে চাই। তিনি বললেন, একজন স্বামী যখন বাড়িতে তার স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকবে তারাই সেটা ঠিক করে নেবে। এটা কোনো সমস্যাই নয়। মনে একটু সাহস পেলাম, বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। মনে হলো একটা কঠিন পরীক্ষা দিচ্ছি আমি।

এরপর আমি বললাম, 'প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীকে তো শ্বশুরবাড়িতে থাকতে হবে। কিন্তু আমার পক্ষে এটা সম্ভব নয়।

কারণ বাড়িতে দলের লোকজন আসা যাওয়া করবে, রাতদিন মিটিং চলবে। সে কারণে বাড়ির ডাইনিং রুম, লিভিং রুম হয়ত তাদের ছেড়ে দিতে হতে পারে এতে তারা বিবৃত বোধ করবেন।

এ কারণে আমার নিজস্ব বাড়ি দরকার। এ কথায় তিনি বলে উঠলেন, 'আমি রাজী এবং আসিফও এতে রাজি হবে। কারণ আসিফের মা ও বোনেদেরও একটা নির্ঝঞ্ঝাট জীবন দরকার। আলাদা থাকলেই তারা পাবে রাজনীতির কোলাহল মুক্ত নিজস্ব জীবন'। ভাবলাম আমার সকল সমস্যা একবাক্যে মেনে নেবে কে সেই মহান মানব, আমি তার সঙ্গে লন্ডনে সাক্ষাৎ করার কর্মসূচি পুনঃ নির্ধারণ করলাম। এ সব কিছুই জিয়ায় গোয়েন্দা এবং তার লোকজনের শকুনী দৃষ্টির আড়ালেই চললো।

আসিফের সঙ্গে যে দিন লন্ডনে দেখা করার কথা সেদিনটি ছিলো ১৯৮৭ সালের ২২ জুলাই। সেদিন পুরোদিনব্যাপী আমার রাজনৈতিক মিটিং ছিলো। এ জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া যে অন্ততঃ একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত আছি। সন্ধ্যা হবার পর পরই আমার উদ্বেগটা আরো বেড়ে গেল, পাকস্থলী শুদ্ধ ভেতরটা মোচড়াতে শুরু করলো। আসিফের সঙ্গে বৈঠক হবে, এ থেকে পালাবার কোনো পথ নাই। আসিফ এবং তার সৎ মা আমার কাজিন তারেকদের ফ্লাটে এসে কলিং বেল টিপলো, মান্না খালা তখন কফি খাচ্ছিলেন। আমিও সেখানে ছিলাম, নিরাপত্তা কর্মী দরজা খুলে দিলো, আমি আড় চোখে দেখে নিলাম। আসিফ ড্রয়িং রুমে আমাদের দিকে আসতে লাগলো, তার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন ভেতরে সেল মারতে শুরু করলো। তাদের এই পদক্ষেপগুলো ছিলো আমার জন্য খুবই যন্ত্রণাদায়ক।

www.pathagar.com

যদিও আসিফকে এক নজর দেখেই খুব আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিলো। আমরা বসে আলোচনা করলাম, সেখানে কোনো বিয়ে সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো না। কোন ব্যক্তিকে নিয়েও না। খুব সাদামাটাভাবে কথাবার্তা চললো। আসিফ এবং আমার আলাদা কোনো আলোচনা হলো না।

পুরো আলোচনা পর্বে শেষ হলো সন্ধ্যার মধ্যেই। তাকে নিয়ে আমার মধ্যে কোনো ভাবোদয় হলো না।

পরদিন আমার কাছে এক ডজন গোলাপ পাঠালো সে, তার সঙ্গে এক কার্টুন আম, আমার পছন্দের মিষ্টি এবং এক কার্টন চেরিফলও পাঠালো।

আমার মা এসে জিজ্ঞেস করলেন,

ওরা কি বলে গেল?

আমার খালা বেহজাদ এবং মান্না দুজনেও ছিলেন সেই সকালে। আমি শুধু বললাম, আমি এখনও কিছু জানি না।

আমার খুব কান্না পেল।

আমি জানি, পাশ্চাত্যের আমার বন্ধুরা যারা আছে, তারা বুঝতেই পারবে না এই উদ্ভট সংস্কৃতির কথা। আমি বোঝাতেই পারবো না আমার রাজনীতিই আমাকে সম্বন্ধ করা বিয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সেখানে ধর্ম এবং পরিবারের চাওয়া পাওয়াই মূল কথা। সেখানে ব্যক্তিগত প্রশ্নেরও একটা জায়গা আছে, আমার ক্ষেত্রে বলা চলে। আমি পাকিস্তানের প্রধান বিরোধীদলীয় নেত্রী। আমি কোনো বাগদত্তার প্রতিশ্রুতি ভাংগার ঝুকি নিতে পারি না। তেমনি তালাক দেবার ঝুকিও নিতে পারি না। আমি নিজেকেই শক্ত করে গড়ে তুলি, কারণ একটা লোকের সঙ্গে আমাকে বসবাস করতে হবে বাকী জীবন, যার সঙ্গে মাত্র তিনদিন আগে পরিচয় হয়েছে। তিনিই এখন আমাদের পরিবারের সার্বক্ষণিক সহযাত্রী হবেন।

আমি অক্সফোর্ডে আমার বন্ধুদের সঙ্গে আসিফকে আলাপ করিয়ে দেই। পরে পাকিস্তানি স্কুল জীবনের বন্ধুদের সঙ্গেও তাকে পরিচয় করিয়ে দেই। তারা সবাই এক বাক্যে বলে দেয়, সে বেশ চমৎকার ছেলে, তাকে বিয়ে করা চলে। আসিফ একদিন আমাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাইরে ডিনার করতে গিয়েছিলো। এর পরের দিন, আমার কাজিন তারিক তার সঙ্গে একান্ত বৈঠক মিলিত হলো। তারিক তাকে বলেছিল, 'আপনি যদি বেনজিরকে বিয়ে করেন তাহলে আপনি সবার আলোচনার মধ্যে চলে আসবেন। এমনকি আপনার ছোটখাট বিষয় যাই করুন না কেন, এমনকি বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে আড্ডা দিলেও। এসব কিছু নিয়ে লেখালেখি হবে, তার প্রভাব পড়বে বেনজিরের ওপর'। আসিফ তারিকের কথা মেনে নিল।

তারিক আমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বললো, আসিফ পরিস্থিতি উপলব্ধি করেছে। সে এক বছর হলো তোমার পেছনে লেগে আছে। 'সত্যিকার অর্থেই সে বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছে'।

প্রতি সকালে সানি এবং মাম্মী আমার পাশে বসে চা খেতে খেতে আলাপ জুড়ে দিত। তারা আমায় বলতো, 'এখন বিয়েতে সমস্যাটা কোথায়? এর জন্য এত সময় নিচ্ছ কেন'? ইয়াসমিনও আমায় চাপ দিয়ে বলতো, তোমার মতামত জানাও?

আমি তখন বলতাম, 'আমি জানি না'।

www.pathagar.com

ভাগ্য দেবী একটা মৌমাছি হয়ে আমার সামনে এসে হাজির হলো। জারদারির দেখা করার চারদিন পর ভাতিজি ফাতির সঙ্গে উইন্ডস পার্কে গিয়েছিলাম, সেখানে জারদারির পোলো খেলার ম্যাচ ছিলো। কোত্থেকে একটি মৌমাছি এসে আমার হাতে হুল ফুটিয়ে চলে গেল। ডিনারের সময় দেখি হাত ফুলে গেছে। পরদিন সকালে হাত আরো ফুলে গিয়েছিলো। হঠাৎ দেখি জারদারি এসে হাজির। আমার ফোলা হাত দেখে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে গাড়ি ডাকলো, আমার কোন বারণই শুনলো না সে। হাসপাতালে ডাক্তার ডেকে প্রেসকিপশন করালো, ঔষধ আনলো, আমাকে কোনটারই বিল দিতে দিলো না। তখন ভাবলাম আমি যেন কারো দায়িত্বে রয়েছি। অনাবিল একটি অনুভূতি আমাকে আবিষ্ঠ করে রাখলো।

ভাগ্য দেবী আবার এসে হানা দিলো। পরের দিন আমরা ডিনারে যাচ্ছিলাম একটি পছন্দের পাকিস্তানি বেস্টুরেন্টে। গাড়িতে সনম, মা আর আমি ছিলাম সঙ্গে আমার কয়েকজন পাকিস্তানি বান্ধবী এবং আসিফও ছিলো সেখানে। হঠাৎ আমরা পথ ভুলে যাই। এতে সবারই দুঃশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্ন হবার কথা, কিন্তু আসিফ আমাদের সবাইকে মাতিয়ে রাখলো। তার কথায় গাড়ির সবাই হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলো। পরিস্থিতিকে সে একদম স্বাভাবিক রাখলো। এই ঘটনার পরের দিন মা আবার এসে আমায় বললেন– এখন তোমার মতামত জানাও। আমি একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়লাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললাম, ঠিক আছে, আমি রাজী, সামনে সপ্তাহে আমাদের বাগদানের কাজ সারবো।

এরপর মিডিয়াতে প্রেসরিলিজ পাঠালাম। সেখানে লিখলাম,

ধর্ম এবং আমার পরিবারের চাওয়া পাওয়ার প্রতি সচেতন থেকে আমার মায়ের পছন্দের একটি বিয়ের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছি।

আরও লিখলাম।

আমার রাজনীতির ওপর আমায় বিয়ে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। পাকিস্তানের জনগণের কল্যাণের স্বার্থে, তাদের নিরাপদ ভবিষ্যতের স্বার্থে আমি তাদের সঙ্গে থাকবো।

আমার বিবৃতি নিয়ে পাকিস্তানে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। সরকারের দালালরা আমাকে নিয়ে গুজব ছড়াতে থাকে। হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে বাস থামাত পারে পিপিপির পোষ্টার সব ছিড়ে ফেলে দিত। আমাদের কর্মীদের বলতো, এখন আর কেউ নেই, বেনজির তোমাদের ছেড়ে চলে গেছে, সে এখন বিয়ে করেছে। এখনও কেন আর পিপির পতাকা ধরে আছ ইত্যাদি ইত্যাদি।

সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রে আসিফের মায়ের ভুয়া সাক্ষাৎকার ছাপলো। সেখানে নাকি তিনি বলেছেন, বেনজিরের বিয়েতে জিয়াকে দাওয়াত দিতে যাবেন তিনি। কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষই বেজায় খুশী হলো। আমি যে একটা স্বাভাবিক নতুন জীবন বেছে নিতে চলেছি এতে খুশী হয়ে মিষ্টি বিলাতে শুরু করে দিলো। নিমিষেই শহরের মিষ্টির দোকানগুলো খালি হয়ে যায়। মানুষ বলতে শুরু করলো, দশ বছরের শোকাবহ রাতের পর এই প্রথম যেন ভোর হলো। এখন আমরা আনন্দ করতে পারি। জারদারির প্রজারা

আসিফকে সংবর্ধনা দিতে জমায়েত হলো। প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ পিপিপির পতাকা হাতে নেচে গেয়ে সংবর্ধনা দিতে লাগলো।

যখন আমি পাকিস্তানে সফর করি জনগণকে বলি, আমি আগেও তোমাদের বোন ছিলাম, এখনও তোমাদের বোনই আছি। আমার বিয়ে আমাকে রাজনীতি থেকে সরাবে না। আসিফ প্রতি রাতেই আমাকে টেলিফোন করে। আমি একটু একটু করে তাকে জানতে থাকি। আমি তাকে নিয়ে যতটুকু চিন্তা করেছি, তার চাইতেও আমাদের মধ্যে মিল রয়েছে বেশি।

. তার পরিবারও সামরিক শাসনের যাতাকলে পিষ্ঠ হয়েছে। তার বাবা হাকিম আলীকে রাজনীতিতে অযোগ্য ঘোষণা করেছে সামরিক আদালত। তাদের আঠারশ' একর জমির ফসল ধ্বংস করেছে। জল সেচের লাইন কেটে দিয়েছে সরকার। আমাদের বাগদানের পর সবচেয়ে বড় দুর্যোগ নেমে আসে জারদারির পরিবারের ওপর। হাকিম আলির কনস্ট্রাকশন ব্যাবসার ব্যাংক লোক হঠাৎ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বন্ধ করে দেয়, ফলে পুরো ব্যবসাটি দেউলিয়া হয়ে যায়। লোকজন বলতো, আপনি ভুল করেছেন, আপনার ছেলে বেনজিরকে বিয়ে করায় সামরিক শাসক এবং আমলারা আপনার বিরুদ্ধে চলে গেছে। হাকিম আলী বলতেন, আমি এসব কিছুই পরোয়া করি না, এসব ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে আমার ছেলের সুখই আমার কাছে বড়।

দলীয় রাজনীতির প্রতি আসিফের কোনো আগ্রহই ছিলো না। লন্ডনে একবার সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, একটি পরিবারে একজন রাজনীতিকই যথেষ্ঠ। তবে আগেকার আমলের ভুস্বামীদের মত তিনিও স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকতেন। ১৯৮৫ সালের এক নির্বাচনে তিনি মনোয়ন পত্র দাখিল করেছিলেন এমআরডি'র টিকেটে। আবার এমআরডি'র আহ্বানে তিনি নির্বাচন বয়কটও করেছিলেন তিনি।

একবার আসিফকে গভীর রাতে তার বাড়ি থেকে সামরিক বাহিনীর লোকেরা আটক করে নিয়ে যায়। দু'রাত জেলও খটেছেন তিনি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো, তার গাড়িতে নাকি লাইসেন্সবিহীন অস্ত্র পাওয়া গেছে। সামরিক আদালতে সে বানানো গল্প ধোপে টেকেনি। দু'রাত জেল খাটার অভিজ্ঞতার কথা আমার বান্ধবীদের জানিয়ে তিনি বলেছিলেন, জেল খাটার ধকল বেনজিরের ওপর যে কীভাবে গিয়েছিলো সেটা আমি উপলব্ধি করেছি।

তিনি আমাকে একটি হীরের আংটি দিয়েছিলেন। প্রতিদিনই গোলাপ পাঠাতেন। প্রতিদিনই কথা হতো। তিনি আমাকে বলতোনআসলে আমাদের বিয়েটা হবে কোনো অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে নয়। আসিফ জানালো, যখন আমি কিশোরী ছিলাম, তখন থেকে তিনি আমাকে দেখে আসছেন।

দুই দশক পর তার ধারণা হলো তিনি আমাকে বিয়ে করবেন।

তবে এটা তার বাবা-মার ধারণা নয়। এখন থেকে পাঁচ বছর আগে তিনি তার বাবাকে বলেছিলেন, তোমরা যদি আমাকে বিয়ে করাতে চাও তাহলে বেনজিরের কাছে গিয়ে প্রস্তাব পাঠাও। সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেছিলো।

তার সঙ্গে (বেনজির) কি আপনার ভালোবাসা ছিলো?

এটা কি সেরকমই নয়। তিনি উত্তর দিয়েছিলো।

www.pathagar.com

যদিও আমরা পরস্পরকে ভালোবাসিনি তবু মা বলতেন, ভালোবাসা বিয়ের পরে আসবে। ভালোবাসার বদলে আমাদের পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে। সব সময়ের জন্য, সম্পূর্ণভাবে আমরা পরস্পরকে স্বামী স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছি। এভাবেই আমি উপলব্ধি করি, আমাদের বন্ধন ভালোবাসার চেয়েও শক্তিশালী। যদিও আমি কোনো সময়ের জন্যও এই সম্বন্ধের বিয়েতে রাজি ছিলাম না, এখন আমি মনে করি, পরস্পরকে মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে যে সম্পর্ক সেখানে নিশ্চয় কিছু একটা আছে।

আমাদের এই বিয়ের ব্যাপারে আমাদের কারোরই কোন পূর্ব ধারণা ছিলো না।

মর্যাদাবোধ এবং সদিচ্ছা ছাড়া পরস্পরের প্রতি কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিলো না।

প্রেমের বিয়েতে পরস্পরের প্রতি এই আকাঙ্ক্ষাটা অনেক বেশি থাকে। সে কোনোভাবে সেটা পেতে চায়। সেখানে ভালোবাসার মৃত্যু হবার খুব সম্ভাবনা থাকে। সাথে সাথে বিয়েটিও। আর আমাদের ক্ষেত্রে ভালোবাসা কেবল শুরু হতে থাকলো।

আমাদের বিয়ের তারিখ ঠিক হলো ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে। বিয়ের এক সপ্তাহ আগে থেকেই করাচির ৭০ ক্লিফটন বাড়ির পাশে লোকজন জড়ো হতে শুরু করলো। নানা উপঢৌকন আসা শুরু হলো। উপঢৌকনগুলো ছিলো খুব সাধারণ, হাতে তৈরি সিন্ধুর সালোয়ার কামিজ, পাঞ্জাবের নকসা আঁকা দোপাট্টা, ফলমূল, মিষ্টি, সেই সাথে আসিফ এবং আমার আদলে তৈরি করা বর কনের সাজে বিয়ের পুতুল ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মধ্যে আমাদের এক আত্মীয় জনতার মধ্যে গিয়ে নাচতে শুরু করে দেয়।

এতে পুরো এলাকায় আনন্দের ঢেউ খেলে যায়, সবাই নাচতে থাকে। নারী ও শিশুরা এসে বাড়ির ভেতরের বাগানে বসার জায়গা করে নেয়।

বিয়ের নিয়ম অনুযায়ী কনেকে এক থেকে দুই সপ্তাহ ধরে সব মানুষ থেকে আলাদা রাখা হয়। ওই সময় সে খুব সাধারণ হলুদ শাড়ি পড়ে থাকে, কোনো সাজগোজ করে না। খুব সাদাসিদে থাকে যাতে তার ওপর কোনো শয়তানী নজর না লাগে। এই পুরোনো নিয়ম মানার সময় আমার ছিলো না। বিয়ের দুসপ্তাহ আগে থেকে সকল কাজ কর্ম বাদ দিয়ে বসে থাকার সময় আমার নাই। বিয়ের পর আমি হানিমুন করতেও যাইনি কখনো।

আমি এ ধরনের অনেক পুরানো নিয়ম ভেঙে ফেলেছি। দেশের সামনে একটা উদহরণ রেখে যেতে চেয়েছি যে, বিয়ে হবে খুব সাদাসিধে ভাবে। পাকিস্তানের অনেক পরিবার আছে যারা বিয়ের নানা প্রথা এবং নানা আয়োজন করে থাকে এবং জাকজমক করতে গিয়ে নিজেদের নাভিশ্বাস তুলে ফেলে, এসব করতে গিয়ে অনেকে ঋণগ্রস্থ হয়ে যায়। পাকিস্তানের নিয়ম অনুযায়ী একুশ থেকে একান্নটি পোশাকের সেট কনেকে দেওয়ায়-নিয়ম। সেখানে আমি জারদারি পরিবারের কাছে শুধু দুই সেট পোশাক চেয়েছি, প্রথমটি বিয়ের দিন এবং দ্বিতীয়টি বিয়ের পর বৌভাতের দিন। বিয়ের শাড়িটিতে স্বর্ণের পাত বসানো থাকে নকসার মাঝে মাঝে। আমি তাদের অনুরোধ করেছি, শুধু ওপরের অংশে কিংবা নিচের অংশেই শুধু যেন সোনার পাত বসানো থাকে। পুরো শাড়ি জুড়ে নয়।

আমাদের প্রথা অনুযায়ী কনেকে সাত সেট সোনার গহনা দিতে হয়।

আমি আসিফকে শুধু দুই সেট গহনার কথা বলেছি। এতো এতো গহনা আমার পছন্দ নয়।

www.pathagar.com

আমি আসিফকে বলেছি, ডায়মন্ডের নেকলেস কতদিন পড়ে অফিসে যাওয়া যায়। তোমার জীবনটাই আমাকে দিয়েছ এটাই বড় জুয়েলারি। অনেকে আমাকে স্বর্ণের অনেক গহনা দিতে চেয়েছে, দামী দামী গহনাগুলো আমি পড়তে পারতাম। কিন্তু যে গহনাগুলো আমি পড়বো, অন্যের বিয়েতে সেগুলো পড়ার একটা রেওয়াজ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি আমায় সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে চাই। আমি বেনজির ভুট্টো, আমার পরিচয়, আমার স্বকীয়তাকে আমি খোয়াতে পারবো না।

১৭ ডিসেম্বর ছিল মেহেদী উৎসব, উৎসবকে ঘিরে সবাই আমাকে নিয়ে গাইতে লাগলো। আমার বান্ধীবীরা, কাজিন সবাই চলে এল ৭১ ক্লিফটনের বাড়িতে। সেখানে মেহেদী উৎসবে বর পক্ষ এবং কনে পক্ষের মধ্যে গানের প্রতিযোগিতা হয়। সুমাইয়া সালমা, পুচি, আমিনা এসে হাজির হলো। ইয়াসমিন এল লন্ডন থেকে। প্রতিদিন বিদেশী বন্ধুরা আসতে লাগলো। অক্সফোর্ডে পড়ার সময় আমার সহপাঠিরা, আমার রুমমেট, অনেকেই চলে আসলো। আমেরিকায় সাংবাদিক আন্না ফেদিম্যান লাইফ ম্যাগাজিনে আমাকে নিয়ে একটা গল্প ছাপলো। আমি তাকে তামাশা করে বলেছিলাম, ১৯৮৬ সালে এসে টিয়ারগ্যাস খেয়েছ এবার এসে বিয়ের উৎসবে নেচে গেয়ে যাও। একথায় হেসে উঠলাম দু'জনেই।

আমার বাবার আইনজীবী যিনি বার বার জেল খেটেছেন। ডাঃ নিয়াজী ছিলেন আমার বাবার দাঁতের ডাক্তার, যিনি ছয় বছর নির্বাসন জীবনযাপন করেছেন। করাচিতে তিনি নিরাপদ থাকলেও ইসলামাবাদে যেতে পারে না।

আমার মা সবার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেরকে নিয়ে এসেছেন। বিয়ের উৎসব যেন অপ্রত্যাশিতভাবে সবাইকে আবার এক করে দিলো। এই মিলন হয়ত সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এটা বড় শক্তি যোগাবে। আমরা দলের পনের হাজার নেতাকর্মীদের দাওয়াত দিয়েছিলাম যারা স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে জেল খেটেছেন নির্যাতিত হয়েছেন, কিংবা যে পরিবারের সদস্যকে সামরিক জান্তা হত্যা করেছে, তাদের সবাইকে দাওয়াত দিয়েছিলাম। আমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবরা ৭০ ক্লিফটনের বাসায় জড়ো হল। বাইরে প্রচুর লোকের ভীড়। আমরা অনুষ্ঠানকে দুই অংশে ভাগ করলাম।

প্রথম অংশ বাড়ির ভেতরে সেখানে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে। দ্বিতীয় অংশ বাইরে। সেখানে হাজার হাজার মানুষ অভ্যর্থনার আয়োজন করেছেন। গণ অভ্যর্থনাটি হয় করাচির কাকরি মাঠে, যেখানে আমার বাবা প্রথম দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের সামনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। যেখানে ১৪ আগস্টের সমাবেশে হয়েছিলো। যে সমাবেশে হামলা করে ছয়জনকে হত্যা করেছিলো জিয়া জান্তা। কাকরির মাঠে বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ৫০ ফুট দৈর্ঘ এবং ৪০ ফুট চওড়া বিশাল স্টেজ নির্মাণ করা হয়। স্টেজটি সম্পূর্ণ কাঠ দিয়ে তৈরি, আশি টন স্টিলের কাজ ছিলো তাতে। আলোকসজ্জার জন্য জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো, কারণ স্বৈরজান্তা কারণে অকারণে বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে।

মাঠের চার পাশে বিশটি বড় টেলিভিশনের পর্দা বসানো হলো। স্টেজের ওপর আমাদের বসার উভয়দিকে জুই গোলাপ চামেলিসহ নানা রঙের ফুল দিয়ে সাজানো।

www.pathagar.com

আমাকে ও আসিফকে মাঝে রেখে দুইপক্ষের পরিবারের লোকজনদের বসার জায়গা করে দেওয়া হলো।

পাঁচতলা বাড়ি ঘিরে আলোক মালায় সাজানো, পিপিপির রংয়ে লাল সবুজ আলো জ্বালানো হলো। আমার বাবাকে নিয়ে আকা ছবি শোভা পাচ্ছিলো লোকজনের হাতে। অগনিত মানুষ সেদিন জমায়েত হয়েছিলো কাকরির মাঠে। সিন্ধুয় প্রত্যান্ত অঞ্চল থেকে সাইকেলে চড়ে অনেকে চলে এসেছেন। যেন তাদের কোনো দাওয়াতের দরকার নেই। যেন তারা আমার ভাই, তারা আমার বোন।

ড্রামের শব্দ, মেয়েরা গাইছে, স্বজনেরা উলুধ্বনি দিচ্ছে এরই মধ্যে বর পক্ষের শোভাযাত্রা ৭০ ক্লিফটনে এসে পৌছালো। আসিফের আত্মীয়রা বড় থালার ওপর মেহেদী দিয়ে আস্ত একটি মোরগ বানিয়ে, জারদারিকে সঙ্গে করে চলে আসলো। কনে পক্ষের মেয়েরা আসিফের গলায় গোলাপের মালা পড়িয়ে দিলো। আসিফ শোভাযাত্রার মাঝখানে ছিল, তার বোনেরা মাথার উপর চাদোয়া ধরে রাখলো হাত দিয়ে। এভাবে তাকে এনে আমার পাশে একটি আসনে বসিয়ে দিলো।

আমাদের একপাশে বরপক্ষ অন্য পাশে কনেপক্ষ।

ক'নে পক্ষের মেয়েরা আসিফকে নিয়ে গাইতে লাগলো। গানের অর্থ হল, আমি যখন রাজনৈতিক প্রচারণায় থাকবো আসিফ তখন বাচ্চাকাচ্চা লালন পালন করবে। আমাকে জেলে যেতে সে বাধা দেবে না, ইত্যাদি। ইয়াসমিন, সনম, লালেহ গাইলো, তোমাকে অবশ্যই রাজি হতে হবে যে বেনজির দেশ সেবায় থাকবে। এর জবাবে আসিফ বললো। আমি এ সবের সঙ্গে একমত, আমি বেনজিরের সেবা করেই দেশের সেবা করবো।

শ'দুয়েক ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন করতালি দিয়ে অনুষ্ঠান মাতিয়ে রাখলো। এরপর আমরা খাবারের টেবিলের কাছে গেলাম। এ সময় মাকে দেখি তার চোখে জল। এ কি আনন্দ অশ্রু নাকি অজানা কোনো আশঙ্কায়। মেহেদী উৎসব ছিল একান্তই পারিবারিক উৎসব, অথচ সেই উৎসবেই অনেক বিদেশী ফটোগ্রাফার এসে ভীড় জমালো। আরব দেশসমূহে জার্মানি ফ্রান্স, ইনডিয়া, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকায় ছবিসহ সংবাদ ছাপা হলো। সেখানে দুই দিনব্যাপী বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে দেশের এবং উপমহাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় কভারেজ দেওয়া হলো।

এই অনুষ্ঠানে সবাই আসলেও আমার ভাই মীর উপস্থিত হতে পারলেন না। এমনকি সে সনমের বিয়েতেও থাকতে পারেননি। তার বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিলো আফগানিস্তানে সেখানেও আমরা যেতে পারিনি।

দেশে ফেরা তার জন্যও খুব ঝুকিপূর্ণ, যখন তখন গ্রেফতার হতে পারে স্বৈরজান্তার হাতে।

'এত দ্রুত হাঁটছ কেন, মিটিংয়ে যেতে কি দেরি হয়ে যাচ্ছে'। কানের কাছে ফিসফিস করে বললো সনি। আমার মুখের সামনে হাল্কা গোলাপী রংয়ের পাতলা নেকাব। বাগানের

www.pathagar.com

ভেতরে তৈরি বিয়ের স্টেজের কাছে মা এবং সনি আমাকে নিয়ে গেলেন। বেহজাদ খালা আমায় মাথার ওপর পবিত্র কোরআন রেখে ধরে থাকলেন। আমি মাটির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমার কাজিন সাদ চলে আসলো। তার মুখে হাসি।

আমি বললাম, এতো সময় ধরে তারা কি করে? আর আসিফদের দিকে কি ঘটছে?

আমাদের পারিবারিক মসজিদের মৌলভী বিয়ের দোয়া পড়ছে। সাদ এসে সিন্ধি ভাষায় আমাকে বললো, 'তুমি কি রাজী।'

আমি ভাবলাম সে হয়তো তামাশা করে আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমি রাজি কি না? আমি জবাব দিলাম, হ্যা আমিতো রাজি কিন্তু তারা কোথায়? সে হেসে ফেললো এবং পুনরায় বললো, তুমি কি রাজি?

আমি আবার একই উত্তর দিলাম, পরে আমি বুঝতে পারলাম এটা বিয়ের একটা আনুষ্ঠানিকতা, যেখানে পুরুষ এবং বিবাহিত মেয়েদের স্বাক্ষী রেখে কনেকে কবুল বলতে বলা হয়। এবং তিনবার কবুল বললে কনের বিয়ে হয়ে যায়।

সিন্ধি ভাষায় এস অক্ষর দিয়ে শুরু এরকম সাত ধরনের বস্তু যেমন মিষ্টি, নারকেল, রূপা, স্বর্ণ, ইত্যাদি নিয়ে আসা হলো। হাজার হাজার বৈদ্যুতিক বাতি লাগানো হয়েছে আমাদের বাগানে। ছোট ছোট বাল্বগুলোর জ্বলা-নেভা যেন নৃত্যরত জোনাকি। ডায়াসটি সুদৃশ্য রূপালী কাগজে মোড়ানো। কনে পক্ষের মেয়েরা সবুজ এবং সোনালী রংয়ের চওড়া কাপড় আমার মাথার ওপর মেলে তুলে ধরলো এর পর পরই আসিফকে আমার পাশে বসানো হলো।

আমাদের সামনে একটি বড় আয়না রাখা হয়েছে, সেখানে দু'জন দু'জনকেই দেখলাম, সবাই উলুধ্বনি দিতে থাকলো, উলুধ্বনীর শব্দে সারা বাড়ি মেতে উঠলো।

মা এবং খালা আখ দিয়ে মৃদু টোকা দিলো আমার এবং আসিফের মাথায়, যেন দু'জনের বন্ধন মধুর হয় এবং অটুট থাকে।

বিয়ের উৎসবে সে রাতে করাচি মাতাল হয়ে উঠেছিলো। হাজার হাজার সাংবাদিক এসে ভিড় করেছিলো। বাগানের ভেতরে যখন আমাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা চলে তখন বাড়ির বাইরে এতটাই ভীড় ছিলো যে, অতিথিরা কয়েকশ' গজ দুরেই আটকে গিয়েছিলেন, পিপিপির কর্মীরা সহজে তাদের পথ করে দিতে পারছিলো না।

কিছুক্ষণ পর যখন গণসংবর্ধনায় যোগ দিতে লাইয়োরির কাকরি মাঠে যাই। পুরো রাস্তা জুড়ে শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভীড়। গাড়িতে বাজছে বিয়ের গান, এগুলো গীত হয়েছিলো আমাদের বিয়েকে নিয়েই। আলোক মালায় সাজানো সংবর্ধনা মাঠ, ফেস্টুন শোভা পাচ্ছে চারদিকে।

বছরখানেক আগেই যেখানে সামরিক জান্তার টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় আমাদের জনসভা ছত্রভঙ্গ হয়েছিলো।

কাকড়ি মাঠে দুই লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছিলো, মাঠ উপছে রাস্তার ওপরও দাঁড়ানোর ঠাঁয় ছিলো না কারো। আসিফ এই পয়লা লক্ষ লক্ষ জনতার সমর্থন ও ভালোবাসা অনুভব করলো। পাশাপাশি নিরাপত্তা নিয়ে তার মধ্যে উদ্বেগও বেড়ে গেল। কারণ খোলা জিপে আমরা যাচ্ছি। মাঠে তিল ধারণের জায়গা নাই। রাস্তার পাশের ভবনগুলোর

www.pathagar.com

বারান্দাতেও লোকজনে ঠাসা।

পিপিপি'র নারী সদস্যরা দলের প্রতিকী রংয়ের বাক্সে মোড়ানো বিয়ের মিষ্টি জনতার উদ্দেশ্যে ছুড়ে দিতে লাগলো। চল্লিশ হাজার মিষ্টির প্যাকেট এক ঘন্টায় নিঃশেষ হয়ে গেল।

লোক সঙ্গীতের সুরে আমাদের বিয়ে নিয়ে গীত হচ্ছিলো, তার সঙ্গে আনন্দে নৃত্যে মেতে উঠেছিলো সবাই। অসংখ্য রঙিন বেলুন উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো, আতশবাজী ছোড়া হলো রাতের আকাশে। নানা রঙের আলোর ঝলকানিতে আকাশ অপরূপ সাজে সেজে উঠলো। জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়াচ্ছি, প্রতিউত্তরে তারাও দুলে উঠছিলো।

জিয়ায় গোয়েন্দারা সেদিন আশা করেছিলো, তারা জনগণকে বলবে তোমাদের বেনজির বিয়ে করছে, রাজনীতি থেকে বিদেয় হবে, তাকে আর সমর্থনের দরকার নাই। তাদের সে আশায় গুড়েবালি হয়ে গেল। জনতার এই বিয়ের সংবর্ধনার পর সুমাইয়া তামাশা করে বলতো, বেনজির তার পারিবারিক জীবন শুরুর আগে জিয়া আর নির্বাচন দেবে না।

সেদিন সবার মুখেই হাসি। বিবাহিত জীবনে পরস্পরের সমন্বয়ের জন্য আমাদের কিছু সময় দরকার। বিয়ের পরের দিন এক বিবৃতি পাঠালাম সংবাদপত্রে, সেখানে লিখলাম,

আজকের এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানটি ব্যক্তিগত হলেও এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি পাকিস্তানের জনগণের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি এবং দায়বদ্ধতার কথা পুনর্ব্যক্ত করছি। স্বৈরশাসনের হাত থেকে পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিকের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির জন্য আমার জীবনকে সপে দিচ্ছি'। আমি আরও লিখেছিলাম, 'এর জন্য জীবন উৎসর্গ করতে আমি এতটুকুও দ্বিধা করবো না, পাকিস্তানের জনগণ আমার ভাই, আমার বোন, তাদের কাধে কাধ মিলিয়ে স্বৈরশাসনমুক্ত সমঅধিকারভিত্তিক পাকিস্তান গড়ে তুলবো। যেখানে সহিংসতা দুর্নীতি থাকবে না। এটাই আমার লক্ষ্য, আমার স্বপ্ন। সবার সঙ্গে মিলে আমি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবো'।

www.pathagar.com

১৫

গণতন্ত্রের জন্য নতুন স্বপ্ন

১৯৮৮ সালের ২৯ মে তারিখে জিয়া আকস্মিকভাবে সংসদ ভেঙ্গে দিল। তার পকেট প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে দিলো। আমি সবেমাত্র লারকানা থেকে ফিরে করাচির ৭০ ক্লিফটনের বাসভবনে পার্টি নেতাদের নিয়ে বৈঠক করছি। সেই সময় অনেকের কাছ থেকে এই সংবাদ পেলাম। আমি তাদের বললাম, আপনারা ভুল শুনেছেন, জিয়া কখনোই নির্বাচন দেবে না। সে সব সময় নির্বাচন এড়িয়ে যেতে চাইবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিনন্দন জানিয়ে ফোন আসতে থাকলো। সংবাদপত্রগুলো থেকে টেলিফোন আসতে থাকলো, তারাও সংবাদটি কনফার্ম করলো। আমাদের পার্টির নেতৃবৃন্দ জানালেন রাত ৭.১৫ মি. জিয়া রেডিও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। এই সময় নির্বাচনের ঘোষণায় আমি সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেলাম।

এর চারদিন আগে করাচির এক সংবাদপত্র সংবাদ ছাপে যে, আমি মা হতে চলেছি। মনে পড়ে সুমাইয়া একবার আমাকে বলেছিল, তুমি সংসার জীবন শুরু করার পর দেখবে জেনারেল জিয়া নির্বাচনের ঘোষণা দেবেন, কথাচ্ছলে সুমাইয়ার উক্তিটি সাংবাদিকদের জানিয়েছিলাম। এই কারণেই হয়ত সংবাদপত্র খবরটি ছেপেছিল। জিয়ার ঘোষণার পেছনে সংবাদপত্রের ওই খবরটিই মূল কারণ কিনা জানি না, তবে তার ঘোষণাটি আমরা আশা করেছিলাম। যদিও আসিফ এবং আমি এখনো সংসার জীবন শুরুই করিনি, তবে জিয়ায় এ ঘোষণায় খুশি হয়েছি। জিয়ায় এই নাটকীয় ঘোষণার কারণে এখন তার ওপর চলতি বছরের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায় পড়ে আছে। এই ঘোষণার আগে সে কথা জিয়া ছাড়া আর কেউই জানতো না। এমনকি তার পক্ষে প্রধানমন্ত্রী জুনেজোও না।

জুনেজো সেদিন দূরপ্রাচ্য সফর শেষ করে দেশে ফিরেছিলেন, সেদিনই সন্ধ্যা ৬টায় তার সংবাদ সম্মেলন করার কথা, তার ঠিক ঘণ্টাখানেক আগে কর্মকর্তারা জুনেজোকে জানালো জিয়ার ঘোষণার কথা যে, আপনার প্রধানমন্ত্রীত্ব আর নেই।

সংসদ বাতিল করার জন্য জিয়া চারটি কারণ দেখিয়েছেন। তার মধ্যে একটি হল

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী জুনেজোর সরকার সময়মত ইসলামিক শরিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। দ্বিতীয় কারণ হল, এপ্রিলে পাকিস্তানের 'ওজরি'তে গোলবারুদের গুদামে আগুন লেগে ব্যাপক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সেখানে জনসাধারণের অনেক ক্ষয়ক্ষতিও হয়। সেই ঘটনার তদন্ত কাজে গাফিলতি এবং হস্তক্ষেপ। তৃতীয় কারণটি ছিল প্রশাসনের ব্যাপক দুর্নীতি এবং শেষ কারণটি হলো সারা দেশ জুড়ে আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতি।

জিয়া যখন জুনেজোকে নির্দয়ভাবে বরখাস্ত করেছিল এতে জুনেজোর প্রতি আমার একটু দয়ার উদ্রেক হয়, কিন্তু ভেবে দেখলাম জুনেজো এ যাবৎ কি কাজটা করেছে, সে জিয়ায় সংবিধানকে অনুমোদন করেছে, তার সকল অপকর্মকে বৈধতা দিয়েছে। তার সরকার জিয়াকে প্রেসিডেন্ট ও সেনাপ্রধান হিসাবে দুই পদেই বহাল রেখেছে। সুতরাং তার প্রতি দয়া বা করুণা করার কোন স্থান নেই। অনেক লোককে মন্তব্য করতে শুনেছি তারা বলেছে, জুনেজোর স্মৃতি স্তম্ভে উৎকীর্ণ থাকবে 'এই ব্যক্তি ইতিহাসে যে ভূমিকা রেখেছে, ইতিহাসও তার সমুচিত জবাব দিয়েছে'।

জিয়ায় এই ঘোষণায় সারাদেশ জুড়ে জনগণের মনোভাব খুবই চাঙ্গা হয়ে ওঠে। জিয়ার সংবিধান অনুযায়ী সংসদ বাতিল করার নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন দিতে হবে। এতে অনেকেই মনে করল বিজয় আমাদের সন্নিকটে, পিপিপির কর্মীরা একে অপরকে বলতে শুরু করলো, এবার আমাদের ঠেকায় কে? আমি তাদের থামাতে চাইতাম, সতর্ক করতে চাইতাম কিন্তু এতে কোন কাজ হতো না। যদিও আমি প্রকাশ্যে বলতাম, সরকার এই ঘোষণা শর্তসহ ইতিবাচক।

আমি বলতাম, 'যদি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন নব্বই দিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয় তাহলে একে আমরা স্বাগত জানাই, কিন্তু ভেতরে ভেতরে নেতাকর্মীদের কাছে সংশয় সন্দেহের কথা বলি। অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন মানেই পিপিপি এবং বেনজিরের ক্ষমতায় ফিরে আসা। যদিও জিয়া প্রায়ই বলত, তার ক্ষমতায় থাকার কোনই ইচ্ছা নেই। কিন্তু এটা তো বিশ্বাস করা শক্ত। যে ব্যক্তি এক সাথে ঘর করা জুনেজোকে বরখাস্ত করতে পারে সেই লোক কি করে জেনে শুনে এমন কাউকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মেনে নেবে যার বাবাকে সে হত্যা করেছে। আমি অতি উৎসাহী সমর্থকদের বলতাম, জিয়া পিপিপিকে ক্ষমতায় আনার জন্য জুনেজোকে বরখাস্ত করে নেই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এবং অনিবার্যভাবে আমার আশংকাই সত্যে প্রমাণিত করল জিয়া তার এক ঘোষণায়।

জুনের ১৫ তারিখে জিয়া শরীয়াহ আইন জারি করলেন। জিয়া এই আইনকে দেশের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে ঘোষণা করলেন। টেলিভিশনে দেয়া ভাষণে তিনি ব্যাখ্যা করলেন না যে এই আইনে কি করা যাবে এবং কি করা যাবে না। কেউই এর ফলে কি হবে বুঝে উঠতে পরলো না। এর মানে কি বিভিন্ন মুদ্রা থেকে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি তুলে নেয়া হবে। কারণ যে কোন ছবি ইসলামের রীতি অনুযায়ী নিষিদ্ধ। কিংবা বাজারে ছাড়া সরকারের বন্ডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে, কারণ বন্ডের ওপর যে ইন্টারেস্ট থাকে তাকে সুদ হিসাবে গণ্য করা হবে। এ সকল বিষয়ে কোন দিক নির্দেশও দেয়া হলো না ওই ভাষণে। জনমনে একটি চিন্তা তোলপাড় করতে শুরু করলো যে, কোন নাগরিক কি হাই কোর্টের কোন আইনকে অনৈসলামিক বলে চ্যালেঞ্জ করতে পারে যদি তারা দেখে যে ইসলামের সঙ্গে এই আইনটির বিরোধ রয়েছে। বিচারক কি সেই আইন বাতিল

www.pathagar.com

করতে পারবে?

জিয়া কেন এই শরিয়াহ আইন জারি করতে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অনেকে মনে করলেন, জিয়ার অতিসম্প্রতি ইসলাম নিয়ে এত দরদের মূল কারণ হলাম আমি। দি উর্দু প্রেস এক নিবন্ধে লিখেছে, একজন নারী হিসেবে হয়তো আমি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে না পারি, ব্যাপক সম্ভাবনা সত্ত্বেও যাতে জাতীয় পরিষদে বিজয়ী দল হিসেবে আসতে না পারি- সেই কারণে আমার বিরুদ্ধে সে মোল্লাদের ধর্মীয় উন্মাদনাকে উস্কে দিচ্ছে। সেই কারণেই তার এই শরীয়াহ আইন। ১৯৭৩ সালের সংবিধান যা কিনা দেশের ধর্মীয় দলগুলো দ্বারাও অনুমোদন করা ছিলো। সেখানে একজন নারীকে সরকারের প্রধান হওয়ায় ক্ষেত্রে কোন বাধা ছিলো না। কিন্তু ১৯৮৫ সালে জিয়া সেই বিষয়টি সংবিধান থেকে স্থগিত করে দেয়।

সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রশ্নে আমাদের মধ্যে জোরালো সন্দেহ ছিলো। কোনো দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে কি না, কোন সময় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, এ সম্পর্কে আমাদের কোনই ধারণা ছিলো না, তথাপিও পিপিপি নির্বাচনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলো। ইতোমধ্যেই জিয়া ঘোষণা করলো যে, শরীয়াহ আইন আনুষ্ঠানিকভাবে জারি করার পরপরই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে। মূলত নির্বাচনের কোন তারিখ ঘোষণা করা হলো না। অর্থাৎ সেই পুরনো কৌশল যাতে পিপিপি কোন নির্বাচনী প্রচারণায় না নামতে পারে। কিন্তু আমরা নিজেদের মত করে ধারণা করে নিয়েছিলাম যে জিয়া কোন সময় তারিখ ঘোষণা করতে পারে।

ফেব্রুয়ারিতে আমরা সুপ্রিম কোর্টে যাই জিয়ার ১৯৮৫ সালের ভোটার রেজিস্ট্রেশনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করতে। যেখানে নিয়ম ছিলো সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ সাপেক্ষে ভোটার রেজিস্ট্রেশনের। সকল দলই চেয়েছিলো জিয়ায় পছন্দের নির্বাচন কমিশনের কাছে তাদের প্রার্থীদের সকল তথ্যসহ তালিকা দাখিল করতে। কিন্তু পরে জানলাম, ইসলামী ভাবাদর্শের বিরুদ্ধ কথিত অভিযোগের ছুতোয় ইলেকশন কমিশন যে কোন পার্টিকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার রাখে। সেই ইসলামী ভাবাদর্শটা কি এবং তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ থাকলে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে সে সম্পর্কে কিছুই জানানো হলো না। নির্বাচন কমিশনার ইচ্ছা করলে কোন প্রার্থীকে চৌদ্দ বছরের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করাকে অযোগ্য ঘোষণা করতে পারত। এমনকি সাত বছর পর্যন্ত জেল দেয়ার ক্ষমতাও রাখতো।

এ সবই হল পিপিপিকে নির্বাচন থেকে বিরত রাখার নীলনকশা হিসেবে। এই পরিকল্পনায় নাগরিকদের সংগঠিত হবার স্বাধীনতা এবং মৌলিক মানবাধিকার যে ক্ষুণ্ন হয়েছে শুধু তাই নয়, বরং জিয়ার প্রার্থীদের পছন্দ অপছন্দ অনুযায়ী কোন কোন পার্টি নির্বাচনে আসতে পারবে তা তারা ঠিক করে দিতে পারতো। সৌভাগ্যক্রমে ইয়াহিয়া বখতিয়ার নামের একজন সাবেক এটর্নি জেনারেল যিনি আমার বাবার আমলে আপিল বিভাগের প্রধান ছিলেন, তিনি একবার সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে এই আইনগুলোকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং এই আইনগুলোর ওপর শুনানির আহ্বান জানান তিনি। এই আইনগুলোর ওপর শুনানির জন্য এগার জন বিচারপতি নিয়ে একটি বেঞ্চ গঠন করা হয়। পাকিস্তানের আদালতের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় বেঞ্চ। ১৯৮৮ সালের ২০ জুন তারা সবাই এই

www.pathagar.com

আইনকে বাতিল করার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ মতামত জানালেন। এতে জনগণের নৈতিক ও আইনি বিজয় সূচিত হল। রেজিস্ট্রেশন আইনটি সম্পূর্ণভাবে বাতিল বলে গণ্য হল।

প্রধান বিচারপতি তার এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, 'সংসদীয় সরকার হলো একটা দলেরই সরকার এবং দলীয় সরকার হলো সরকারের মৌলনীতির প্রতিনিধিত্বকারী।'

আমি প্রতিনিয়তই পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করতে থাকি। লারকানার জ্যাকোবাবাদ ও নওয়াব শাহ। এরপর করাচি, সবখানেই মুসলিম লীগের বড় বড় পার্লামেন্টারিয়ানরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে থাকে। পিপিপির পক্ষে যেন এতে আরও জোয়ার চলে আসে। এই সব বড় বড় রাজনীতিকরা তাদের ভোটে জেতার জন্য পিপিপিকেই নির্ভরযোগ্য দল মনে করতে থাকে।

জিয়া তার প্রতিটি পদক্ষেপেই ধরা খেয়ে যেত। পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশ করা হল, তাতে বলা হয়, জিয়া সবসময় ঠান্ডা মাথার লোক বলে বিবেচিত, তার আচরণে মনে হয় সেসব বৈশিষ্ট্য হারাতে বসেছে সে। একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক আমাকে বলেছে, জিয়া সব সময় হিসাব নিকাশ করেই ঝুঁকি নেয় অথচ প্রতিটি পদক্ষেপেই সে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। তার কাজের কোন পরিকল্পনা থাকে না, তাকে খুব অস্থির লোক বলে মনে হয়।

পিপিপির জনসভায় যখন রোদবৃষ্টি শীত গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত হয় তখনই জিয়া নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। জিয়া তার তালজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। পিপিপির প্রতি অনুগত এক ব্যক্তি আমাকে সংবাদ দিলো যে, জিয়ার ঘনিষ্ঠ এক লোক তাকে বলেছে, জিয়াকে মনে হয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, মনোবল হারানো এবং সংশয়বাদী মানুষ। কোন পথে যেতে হবে সে বুঝতে পারে না। ঐ ব্যক্তি আমাকে আরও বললো, জিয়ার সেই ঘনিষ্ঠ লোক জিয়াকে নির্বাচন দিয়ে জনগণের দাবি মেনে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে, এ ব্যাপারে আমার মনোভাব জানতে চেয়েছে তারা। জিয়ায় এই প্রস্তাব পরবর্তীতে আরো অনেকের কাছ থেকে পেয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, জিয়া পিপিপির সঙ্গে একথা সমঝোতায় আসতে চায়। সে নির্বাচন দিয়ে জনগণের হাতে ক্ষমতা দিয়ে চলে যাবে তবে তার এবং পরিবারের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না এই মর্মে একটা মুচলেকা চায় সে, কোন নির্দিষ্ট একটি দেশকে এ ব্যাপারে গ্যারান্টার রাখতে চায়।

আমি তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। তার এই প্রস্তাব দেয়ার মধ্যে যে দুরভিসন্ধি রয়েছে এ কারণে শুধু নয়, আসলে এই প্রস্তাবই যৌক্তিক নয়। আমি বলেছি, জিয়া এই প্রস্তাব করার নামে আমার ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করতে চায়। আমি আরও বলেছি, আমি বুঝতে পারি না সে এত ভয় পাচ্ছে কেন? গ্যারান্টারেরই বা কেন এত প্রয়োজন। সে যদি নির্বাচনই দেয় সেজন্য এত আয়োজনেরই বা কেন প্রয়োজন? কোনরকম পরিণতি ছাড়াই প্রস্তাব আলোচনা শেষ হয়ে গেল, আমি আবার সফর শুরু করলাম।

আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি পরিশ্রম করায় প্রচুর শক্তি পেতাম। পথে আমার সঙ্গে থাকা একজন মহিলা ডাক্তার বললেন, 'আমরা কিন্তু বুঝতে পারিনি যে আপনি সত্যকার অর্থেই মা হতে চলেছেন, আমরা ভেবেছি যে, জিয়াকে ইলেকশনে নামানোর জন্য এই কৌশল নিয়েছিলেন।' অনেকেই আমাকে এই সময়ে লম্বা জার্নি করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিতো। আসলে ফাকরির কথাই সত্য হল। জিয়া যদি আগস্টের মধ্যেই নির্বাচন দেয় তাহলে বিশ্রামের জন্য আমি প্রচুর সময় পাব।

২০ জুলাই ৭০ ক্লিফটনে যখন অস্ট্রেলিয়ায় হাইকমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করছি, তখন আমার কাছে একটা বার্তা চলে আসলো, সেখানে লেখা আছে, জিয়া নভেম্বরের ১৬ তারিখে নির্বাচনের দিন ধার্য করেছেন। সংবিধান অনুযায়ী সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার নব্বই দিনের মধ্যেই নির্বাচন দিতে হবে। সে অনুযায়ী অনেক দেরি করে নির্বাচনের তারিখ দেয়া হল। জিয়া হজ এবং মোহররম উপলক্ষে নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার কথা বললেন।

আসলে জিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানকে অসম্ভব করতে চাইছে। জিয়া যুক্তি দাঁড় করালেন হজের সময় প্রতিবছর পাকিস্তান থেকে নব্বই হাজার লোক হজ করতে যায়। সুতরাং ঐ সময় তারা ভোট দেয়ার সুযোগ পাবেন না। সে আরও যুক্তি খাড়া করলো যে, সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হলে ঐ সময় দেশের কিছু কিছু অংশে ব্যাপক বন্যা দেখা দেয়। তার ছুতোর মধ্যে কিছু বাস্তবতা রয়েছে তবে আমার শারীরিক অবস্থার কারণটাই সবচাইতে বেশি কাজ করেছে তার নির্বাচন পেছানোর জন্য। যাতে ঐ সময় আমি নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে না পারি।

যাহোক দিন তো ধার্য হল। মানসিকভাবে একটা স্বস্তি পেলাম। যদিও সে নিজের কথাই ঠিক রাখে না। জিয়া সংবিধান বহির্ভূতভাবে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করলেন নভেম্বরে। আবার নভেম্বর থেকে আবার পেছাবে না তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। আমরা এখন পর্যন্ত জানতে পারিনি যে, জিয়ার নির্বাচনটি দলীয় ভিত্তিতে হবে নাকি অদলীয় ভিত্তিতে হবে। জিয়া সম্পর্কে এ ধরনের গুজব আগেই ছড়িয়ে গিয়েছিলো।

মুসলিম লীগও ভেঙ্গে যায় জুনেজোকে বরখাস্ত করার পর। জিয়া ভাঙ্গা মুসলিম লীগকে জোড়া লাগালো, সকল দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের আবার দলে ভেড়াল, এর মধ্যে তার বরখাস্ত করা প্রধানমন্ত্রী জুনেজোও আছে। জিয়ায় অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে জুনেজোর ক্যাবিনেটের নয় জন মন্ত্রীকে নিয়োগ। সব মিলে সতের জন নতুন মন্ত্রী নিয়োগ দিল, যার মধ্যে সাত দেওয়া হলজনই ছিলো আগের বরখাস্ত করা। দুর্নীতিবাজমন্ত্রীদের আবার নিয়োগ দেয়ার পর জনগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করেছে সে। কারণ মাত্র দু'মাস আগে যাদের দুর্নীতির দায়ে বরখাস্ত করা হয়েছে তাদেরকেই আবার মন্ত্রিপরিষদে ঠাঁই দিলেন। এত জলজ্যান্ত অনিয়ম তো ঢেকে রাখা যায় না।

পিপিপির অব্যাহত শক্তি বৃদ্ধির ফলে জিয়ার নির্বাচন কমিশনও খুব আতঙ্কের মধ্যে পড়ে যায়।

একবার নির্বাচন কমিশনে এক প্রতিনিধিকে পাঠিয়েছিলাম লারকানার ভোটার লিস্ট আনার জন্য। কমিশনের কর্মকর্তা তাকে পরের দিন আসতে বলেন। পরের দিন গেলে বলেন, তার পরের দিন, এভাবে কয়েকদিন ঘোরানোর পর আসল মতলবের কথা জিজ্ঞেস করাতে সেই কর্মকর্তা জড়তা নিয়ে উত্তর দেয় যে, ইসলামাবাদ থেকে অনুমতি চাওয়া হয়েছে আপনাকে ভোটার লিস্ট দেব কি না কিন্তু এখনও উত্তর আসেনি।

২১ জুলাইতেই জিয়ার মতলব পরিষ্কার হয়ে যায়। জিয়া আবার সংবিধান ও আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখালো। সে ঘোষণা করল, দলগতভাবে কোন নির্বাচন হবে না, কারণ দলভিত্তিক নির্বাচন নাকি ইসলাম বিরুদ্ধ। কারণ পার্টির সিদ্ধান্ত অনেক সময় ব্যক্তির বিবেককে পদদলিত করে, এতে অনেক লোকই এই সস্তা দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে। জিয়া ঘোষণা করে দলীয় প্রতীকও কেউ নির্বাচনে গ্রহণ করতে পারবে না।

www.pathagar.com

জিয়ার ঘোষণা অনুযায়ী একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির চেয়ে সাধারণ একজন পার্টি কর্মী পার্টির জোরেই জিতে যায়। জিয়া আবারও সংবিধানকে জলাঞ্জলি দিলো, দেশের সর্বোচ্চ আদালতকেও সে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখালো।

এর আগে জিয়া চারটি প্রদেশের সচিবদেরকে ডেকে পাঠালেন ইসলামাবাদে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও যোগ দিলো ঐ বৈঠকে।

জিয়া আলোচনা করলেন, নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে হবে নাকি অদলীয় ভিত্তিতে হবে এইসব নিয়ে। কারণ মুসলিম লীগ বুঝতে পেরেছে সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং বেলুচিস্তানের সবখানেই পিপিপির জয়জয়াকার। নির্বাচনে তাদের ঠেকানো সম্ভব নয়। সীমান্ত প্রদেশ থেকে রিপোর্ট দিলো, বেনজির এককভাবেই সেখানে নিরঙ্কুশভাবে জয়ী হবে। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই নির্দলীয় নির্বাচনের ঘোষণা আসলো।

পার্টি ছাড়া নির্বাচনকে সাংবিধানিক উল্লেখ করায় আমরা আদালতে একে চ্যালেঞ্জ করে পিটিশন দায়ের করলাম। রায় আমাদের পক্ষেই আসবে এটা ধরাবাধা কথা, কারণ সংবিধানেই জমায়েত হবার স্বাধীনতার কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এসব তোয়াক্কা কে করে? তার হাতে রয়েছে অসম্ভব ক্ষমতা। সুপ্রিম কোর্ট যদি আমাদের পক্ষে রায় দেয় তাহলে জিয়া দেশে আবার জরুরি অবস্থা জারি করে বসবে।

৪ আগস্টে পেশোয়ারে একজন শিয়া নেতা খুন হল। বিরোধীরা সন্দেহ করলো এর পেছনে জান্তার হাত রয়েছে। কারণ নানা অপঘটনা দিয়ে দেশে জরুরি আইন জারি করাকে অনিবার্য করে তুলতে চায় সে।

জিয়া নিজেকে রক্ষার জন্য আরেক স্তরের কৌশল গ্রহণ করেছে। এটা একটা গুজব ছিলো যে, জয় লাভের পরও যদি কোন প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে সে একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থনে জয়লাভ করেছে। তাহলে তার বিজয়কে বাতিল বলে গণ্য করা হবে। জানা গেল, এই আইন অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে বলবৎ করা হবে। আমরা আদালতে গেলাম এই আইনটিকে চ্যালেঞ্জ করতে।

প্রতিটি স্বৈরশাসকেরই চরিত্র বুঝি একই ধরনের। তারা দলবিহীন নির্বাচনের নামে নির্বাচনকেই প্রভাবিত করতে চায়। এর জন্য নির্বাচনী আইনকে তোয়াক্কা পর্যন্ত করে না।

নভেম্বরের নির্বাচনে স্বৈরতন্ত্র এবং গণতন্ত্র সম্মুখ সমরে। পাকিস্তানের জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াই করছে। তাদের মুখপাত্র হল পাকিস্তান পিপলস পার্টি সেটা জিয়া খুব ভালো করেই জানে। ক্ষমতা দখলের সাড়ে এগার বছর পরেও তারা পিপিপির ভয়ে নির্বাচন দিতে সাহস পায় না।

জিয়ার অদলীয় নির্বাচনেও আমরা সম্ভাব্য প্রার্থীর কথা চিন্তা করেছি। আমি আশা রাখি, আমার মাকেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার জন্য রাজি করাতে পারবো। আমার বোন সনম দাঁড়াবে। যদিও এটা দেখতে খারাপ দেখাবে তবুও জিয়ার চ্যালেঞ্জকে শান্তিপূর্ণভাবে মোকাবিলা করতে আমাদের গণতান্ত্রিকভাবেও আইনগত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই যেতে হবে। সভ্য জগতের এটাই নিয়ম।

বন্দুক এবং টিয়ার শেল দিয়ে মানুষকে দমন করা যায়। তাদের বরখাস্ত করা যায় কিন্তু তাদের হৃদয়কে জয় করা যায় না। জিয়া ভালো করেই জানে সে জনগণের সমর্থন ও ভালোবাসা নিয়ে শাসন ক্ষমতায় টিকে নেই। সে শাসন করছে সন্ত্রাস এবং ভয়ভীতি

www.pathagar.com

দেখিয়ে। উষর মরুতে কখনো ফুলের গাছ জন্মায় না তেমনি একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে একনায়কত্ব হবার সুযোগ নেই। রাজনৈতিক দলের পক্ষে নিষ্ঠুর এবং কঠোর পদক্ষেপ নেবার সুযোগ নেই। তারা জনগণের মন জয় করেই টিকে থাকে। তারা শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি দায়বদ্ধ যারা গণতন্ত্রের জন্য আত্মাহুতি দিয়েছে। একটি রাজনৈতিক দল স্বৈর জান্তার নির্যাতনের মধ্যেও এগার বছর ধরে টিকে থাকে শুধু তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসবে। আবার মানুষের অধিকার কায়েম হবে এবং একটি পার্টি তাদেরকে সুরক্ষা করবে। আমরাই সেই দল, আগেও ছিলাম এখনো আছি, আমরাই জাতির বিবেক এবং ভবিষ্যতের আশা স্বপ্ন।

www.pathagar.com

১৬

জনগণের জয়

জীবনে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত, এমন অবাক করা কিছু সময় আসে যা হজম করা কঠিন। এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ আমি শেষ করেছিলাম, জেনারেল জিয়াউল হকের নিষ্ঠুর সামরিক শাসনের রেকর্ড সন্নিবেশ করে । আর, তখনি এলো সেই মুহূর্ত।

জেনারেল জিয়া ১৯৮৮ সালের ১৭ আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন পাকিস্তানের পূর্বাংশের বাহওয়ালপুরের এক সামরিক ঘাঁটি থেকে ফেরার পথে। তার সঙ্গে আরও তের জন নিহত হন, যাদের মধ্যে জয়েন্ট চীফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান, আর্মি স্টাফের ভাইস চীফ, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর উর্ধ্বতন আট কর্মকর্তা, পাকিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর্নল্ড র‍্যাফেল এবং একজন আমেরিকান ব্রিগেডিয়ার।

খবরটি ছড়ায় খুব ধীরে ধীরে। দলীয় কর্মীদের বৈকালিক বৈঠক চলাকালে আমার সেক্রেটারি ফরিদা আমাকে জানায় যে, 'একটি ভিভিআইপি প্লেন অদৃশ্য হয়েছে। এ সংবাদটি জানানোর জন্য একজন সাংবাদিক এখনি ফোন করেছিল।'

বললাম, 'এর অর্থ কি?' ভিভিআইপি সাধারণত রাষ্ট্রের প্রধানকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

'এটা জেনারেল জিয়ার প্লেন।' ফরিদা এমনভাবে ফিস ফিস করে বললো, যেন সে জোরে সশব্দে উচ্চারণ করতে খুব ভয় পাচ্ছে।

জিয়া যে সত্যি সত্যি মারা যাবে সে কথা আমার মনে হয়নি। বরঞ্চ, মাত্র মাসখানেক আগে তার ও তার পরিবারের দায়মুক্তির বিনিময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাবের কথা স্মরণ করে আমি ভেবেছিলাম তিনি পালিয়ে গেছেন। আমি এটা বিশ্বাস করতে পারিনি। জিয়ার যুগ কি চিরতরে শেষ?

আমার সেক্রেটারিকে বললাম, 'সাংবাদিককে ফোন লাগাও।'

সাংবাদিক ভীত-সন্ত্রস্তভাবে তার দেওয়া খবরটি পুনর্ব্যক্ত করলো।

'জিয়ার প্লেন নিখোঁজ হয়েছে', সে বললো। 'রেডিও সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।'

www.pathagar.com

'নিখোঁজ' বলতে কি বুঝাতে চাও? তাকে আমি চাপ দিলাম। ' প্লেন কি ইরান, ভারত, আফগানিস্তান গেছে?' জিয়া কি স্বেচ্ছায় গেছে নাকি প্লেন ছিনতাই হয়েছে? আসল ঘটনা কি?

বেচারা সাংবাদিক এতই ভীত ছিল যে তার পক্ষে সেই হেঁয়ালি কথা ছাড়া আর কিছু বলার ছিল না।

প্লেনটি এই বিকেল পর্যন্ত ইসলামাবাদে ফিরে আসেনি। তিন ঘণ্টা আগে উড্ডয়নের পর থেকে কোন রেডিও যোগাযোগ হয়নি।

পরক্ষণেই আরেকটি ফোন এলো। এই ফোন সাবেক একজন জেনারেল, যিনি সীমান্ত প্রদেশের পিপিপি'র লোক। তিনি বললেন, 'কিছু একটা ঘটেছে। সেনাবাহিনী তৎপর হয়েছে।'

জিয়া পালিয়ে যাবার আগে সেনাবাহিনীর কাছে ক্ষমতা দিয়ে গেছে অথবা সেখানে থেকেই সেনাবাহিনীকে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য বলেছেন, এমন সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে আমি তাকে বললাম, 'তাদের তৎপরতায় 'বন্ধুত্বের' নাকি 'বৈরিতা'র গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে?'

দলের ওই কর্মকর্তা বললেন, 'সেটা এখনি বলা যাচ্ছে না।'

আরো একটি টেলিফোন এলো একজন দলীয় কর্মীর কাছ থেকে। 'একটা বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে', তিনি বললেন। জিয়া মারা গেছেন এবং বিমানের আরোহী জেনারেল সবাই মারা গেছেন।

এই ধারণা গ্রহণ করে নিতে তখনও আমি অক্ষম ছিলাম। বছরের পর বছর সন্ত্রাস আর দুর্দশায় এটা ভাবা অসম্ভব মনে হয়েছিল যে, জিয়ার মৃত্যু এই সাধারণভাবে হবে। সকল সময়ই এরূপ সম্ভাবনা থাকলেও, তার এই পরিণতির কথা আমি আগে ভাবিনি। এই গোটা অঞ্চল সহিংসতাপূর্ণ। তার নিজের শাসনামল শুরু হয়েছিল সহিংসতার মধ্য দিয়ে। সুতরাং তা সহিংসতার মধ্য দিয়ে শেষ হবে না কেন ?

এখনও এটা আত্মস্থ করা কঠিন। আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাই জিয়া পালিয়ে যাচ্ছে। আর, তার এক নায়কত্বের অবসান আমি এভাবেই কল্পনা করে এসেছি। মার্কোস ফিলিপাইনের বাইরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। শাহ্ চলে গিয়েছিলেন ইরানের বাইরে। হাইতি ছেড়ে গিয়েছিলেন দুভেলিয়ার। আমি সব সময় ভেবেছি, যখন জিয়ার সময় আসবে, তিনিও এমনি করেই একটা প্লেনে চড়ে পালিয়ে যাবেন দেশের বাইরে।

'আমি এই মাত্র আর্মির একজন কর্পস কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি', জানালেন পরবর্তী ফোন কলার। 'বাহওয়ালপুর থেকে উড্ডয়নের পরপরই বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। কেউ জীবিত নেই।'

অবশেষে আমি সেকথা বিশ্বাস করলাম। যারা জেলের ঘানি টেনেছে অথবা যারা প্রহৃত হয়েছে, যাদের পরিবার কাজ হারিয়েছে অথবা যারা তাদের স্বজনদের লাশ দাফন করেছে না দেখেই, ৭০ ক্লিফটনের ড্রইংরুমে জড়ো হওয়া সেইসব পার্টি সমর্থকরাও শেষ পর্যন্ত সেটাই বিশ্বাস করে নিল। আমার সেক্রেটারিকে পার্টি সদস্য, যারা কোর্টে নির্বাচন সংক্রান্ত রুলিং-এর ওপর সাপ্লিমেন্টারি ব্রিফিং শোনার জন্য অবস্থান করছেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সম্মিলিত বিরোধী এমআর ডি'র সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ

www.pathagar.com

দিয়ে লন্ডনে আমার বোনকে ফোন করার জন্য উপরতলায় চলে গেলাম। সনম বাইরে ছিল। মেসেজটা দিতে গিয়ে আমার গলায় কথা সরছিল না। 'তাকে বলো', আমি বললাম, 'সেই জেনারেল জিয়া মৃত।'

সেই কথাটি বলার সময় মনে হলো আমার কাঁধ থেকে বিরাট একটা বোঝা দূর হয়ে গেল। দীর্ঘ এগার বছরের নির্যাতন ও হয়রানির কবল থেকে আমরা মুক্ত হলাম। সে আর নেই। জিয়া আর কখনও আমাদের আঘাত করতে পারবে না।

একটা দেশে, যেখানে বন্যার তোড়ের চেয়েও দ্রুত সংকীর্ণ পথে পথে এবং বাজারগুলোতে খবর ছড়িয়ে গেছে, জনগণও ইতোমধ্যে তা উদযাপন করতে শুরু করেছে। লাহোরের মিষ্টির দোকানগুলোর সব মিষ্টি বিক্রি হয়ে যায়। করাচিতে পানের দোকানগুলোতে উল্লসিত দোকানদাররা বিনামূল্যে পান বিতরণ করেছে । ৭০ ক্লিফটনে খবর আসার আধা ঘন্টার মধ্যে গেটের বাইরে শ' শ' মানুষ জড়ো হয়ে আনন্দ উল্লাস আর রাজনৈতিক শ্লোগানে মুখরিত করে তুললো। আমি তাদের শুধালাম, 'তোমরা প্লেন-ক্রাশের খবর পেলে কিভাবে?' একজন বললো, 'সংবাদপত্রের হকাররা চিৎকার করে বলছে, 'জিয়া মারা গেছে, জিয়া মারা গেছে।' আরেকজন বললো, 'মোটর গাড়ির যাত্রীরা গাড়ির জানালা খুলে 'জিয়া মারা গেছে' চিৎকার করে একথা বলছে আর হর্ন বাজাচ্ছে।'

আমি চিন্তিত যে, এ ব্যাপারে আনন্দ প্রকাশের জাতীয় চেতনা বেমানান। জিয়ার চেয়ে ভিন্ন আচরণই আমি শুধু চাইনি, একজন মুসলিম হিসেবে মৃত্যুকে নিয়ে আনন্দ করা আমাদের চলে না। আরো অনেকে সেই বিমানে নিহত হয়েছেন। তাদের পরিবারের কথা ভেবেই এ ব্যাপারে আনন্দ প্রকাশ করা ঠিক নয়। অ্যাম্বাসাডর র‍্যাফেলের স্ত্রী ন্যান্সির জন্য আমার দুঃখ হয়, যে আমার মতই সদ্য বিবাহিত। তার স্বামী, যার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, এবং যাকে আমার কাছে খুব আন্তরিক এবং পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার ধারণায় অঙ্গীকারাবদ্ধ বলেই মনে হয়েছে, এখন সে মৃত। সারাদেশের পিপিপি নেতাদের কাছে একটা বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে সবাইকে ধৈর্য ধারণ করার জন্য। কোন অবস্থাতেই আমরা কেউই এমন কিছু করতে চাই না যাতে সেনাবাহিনী সামরিক আইন জারির অজুহাত খুঁজে পায়।

প্রথম আমরা খবরটা পাই সন্ধ্যা ৬-টার দিকে। কিন্তু রেডিও কিংবা টেলিভিশনে সরকারিভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। প্রথম এক ঘন্টা পার হয়ে গেল, তারপরে আরো এক ঘন্টা, তবুও কোন সরকারি কনফার্মেশন না থাকায় আমি মার্শাল ল' প্রত্যাবর্তনের ভয় পাচ্ছিলাম। মুখ্যমন্ত্রীরা সবাই জিয়ার লোক। তারা নির্ধারিত ১৬ নভেম্বরের নির্বাচন বাতিল করতে অথবা অন্তত পক্ষে স্থগিত করতে চাচ্ছিলেন। জিয়ার মৃত্যুর প্রাক্কালে এবং জাতীয়ভাবে একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে তারা সেনাবাহিনীকে মুভ করতে রাজি করার পক্ষে ছিলেন।

৭০ ক্লিফটনের চাপা উত্তেজনা ছিল প্রবল। সকল বিরোধী নেতাদের ওই রাতেই গ্রেফতার করা হবে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার স্বামী তাৎক্ষণিকভাবে নিজেকে 'নিরাপত্তা প্রধান' ঘোষণা করে আমাকে পরবর্তী কয়েকদিন ঘরে থাকার আদেশ দিলেন। আমি যখন বাইরে যাবার জন্য জেদ ধরলাম, তখন অসংখ্য আতশবাজি পোড়ানো হলো। পরদিন, রাগ বা অভিমান করে তার সেই নিরাপত্তা প্রধানের পদ ছেড়ে দিল।

www.pathagar.com

রাত ৮টার আগে সেই স্বস্তিদায়ক খবরটা আমরা জানতে পারিনি যে, বেসামরিক পন্থাই অনুসরণ করা হবে। রেডিও পাকিস্তান ঘোষণা করলো, সিনেটের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম ইসহাক খান সংবিধান মোতাবেক প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন। গোলাম ইসহাক খান নিজে যখন নির্দিষ্ট সময়েই পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে– এ কথা বলার জন্য টেলিভিশনে দেখা দিলেন আমরা তখন আরো বেশি স্বস্তি পেলাম। দেশে গণতন্ত্র পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্য সেনাবাহিনী যে অঙ্গীকারাবদ্ধ, এটাই ছিল তার প্রথম ইঙ্গিত। সাবেক আমলা ইসহাক, যিনি আবার জিয়ার ঘনিষ্ঠজন, কখনোই নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারতেন না, যদি না সেনাবাহিনী সেই সিদ্ধান্তের পিছনে না থাকতো।

আমার সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণের ভয় একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। জিয়ার মৃত্যুর পর মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে তিন বাহিনীর প্রধানদের এক জরুরি বৈঠকে সামরিক আইন জারির জন্য সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল বলে জানা যায়। এটা তাদের চিরস্থায়ী গৌরব যে, সামরিক কর্মকর্তারা সেনাবাহিনীর কাঁধে মুখ্যমন্ত্রীদের রাজনৈতিক বন্দুক রেখে ফায়ার করার অনুমতি দিতে দৃশ্যত অস্বীকার করে। মুখ্যমন্ত্রীরা সামরিক লোকদের হুশিয়ার করে এই বলে যে, 'নির্বাচন যদি অনুষ্ঠিত হয়, আর বেনজির যদি জয়লাভ করেন, তাহলে তিনি সকল সিনিয়র অফিসারকে ফাঁসিতে লটকাবেন।' অফিসাররা তাৎক্ষণিক উত্তর দেন, 'তার পিতা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, সুতরাং তিনি তা করতে যাবেন কেন?'

জিয়ার মৃত্যু বস্তুত হতভম্ব লোকগুলোর মাঝে এক ধরনের স্বস্তির অনুভূতি এনে দিয়েছিল। খারিয়ান ও ওয়াজিরাবাদের মতো সামরিক অঞ্চল থেকে টেলিফোন আসছিল এই খবর দিতে যে, জিয়া যুগের সমাপ্তির জন্য অভিনন্দন জানাতে বহু দূর-দুরান্ত থেকে জনগণ হেঁটে আসছে পিপিপি কর্মকর্তাদের বাড়িতে। আমার কাছে স্পষ্টতই এটা প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, জিয়া যদিও 'আর্মি চীফ অব স্টাফ' ছিলেন এবং সেনাবাহিনীকে তার 'নির্বাচনী এলাকা'রূপে বর্ণনা করতেন, কিন্তু কেবলমাত্র তার পদের সুবাদেই আর্মি ছিল তার 'নির্বাচক'।

যদিও জিয়া পিপিপি বিরোধী প্রচারণার মাধ্যমে আর্মির আনুগত্য ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন, আমাদের সমন্বয়ের বার্তাও তিনি অবশ্যই শুনেছেন। সেনাবাহিনী বামপন্থী বা ডানপন্থী কোনটাই নয়। এটা জেনারেল জিয়া কিংবা বেনজির ভুট্টো কারোরই নয়, অসংখ্য জনসমাবেশে আমি একথা বলেছি। 'সেনাবাহিনী পাকিস্তানের জনগণের।'

কিন্তু জিয়া মনে করতেন সেনাবাহিনী তার মালিকানাধীন এবং মূলত, মুঠোর মধ্যে বন্দি করে রেখেছিলেন।

এটা এমন ছিল না যে তিনি সেনাবাহিনীর ভেতরে গণভোট অনুষ্ঠান করে প্রশ্ন রাখতেন, আমি যা করছি তা কি তোমরা সমর্থন করো? তোমরা কি রাজনীতিতে জড়াতে চাও এবং জনগণের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাও? আমি জিয়ার মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্তও উপলব্ধি করতে পারিনি আর্মির র‍্যাংক অ্যান্ড ফাইলের চাপ কতটা গভীর ছিল। সেনাবাহিনীকে জিয়া তার শাসনের একটি রাজনৈতিক হাতিয়াররূপে তৈরি করে তাদের গৌরব ও পেশাদারিত্ব ধ্বংস করে ফেলেছিলেন। ওই রাতে এক এমআরডি সদস্য আমাকে বলেন যে, করাচির আর্মি মেসের রুমগুলোতে তেমন কোনও দুঃখের প্রকাশ ছিল না। অপরদিকে, আমার

www.pathagar.com

পিতাকে হত্যর পর জানা যায় যে, খারিয়ান, কোয়েটা ও অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টের সেনারা এমন শোকাভিভূত হয়ে পড়ে যে, তারা তিন দিন ধরে অনশন করে।

১৭ আগস্ট সন্ধ্যা ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিয়ার প্লেন বিধ্বস্ত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে বহুরকম গুজব ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিকভাবে সবচেয়ে জনপ্রিয় গুজব ছিল ভারতীয় সীমান্ত থেকে একটি ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া সংক্রান্ত। বাহওয়ালপুরের সামরিক ঘাঁটি ভারতীয় সীমান্ত থেকে মাত্র ৮০ মাইল দূরে। আর সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ভারতের সঙ্গে উত্তেজনাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, পাঞ্জাবে শিখ উপগ্রপন্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়া ও তাদেরকে সীমান্তে পাঠানোর জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ১৫ আগস্ট এক ভাষণে ঘোষণা করেন, পাকিস্তান যদি সদাচরণ না করে তাহলে তিনি আমাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবেন। আমাদের সীমান্ত প্রতিরক্ষা ও সামরিক পাহারার ব্যবস্থা খুব শক্তিশালী জেনে আমি মিসাইল থিওরিকে বাদ দেয়ার পক্ষপাতী কিন্তু এ ব্যাপারে বাইরের হাতকে আমি একেবারে বাতিল করে দিতে পারিনি। আফগান প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অব্যাহত সমর্থন দেয়ায় পাকিস্তানকে চড়া মূল্য দিতে হতে পারে, এমন একটা হুমকি সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফ থেকে থাকার প্রেক্ষাপটে জিয়ার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটা বোঝাপড়া ছিল। কূটনীতিকরা এবং বিদেশী পত্রপত্রিকা অনুমান করছিল যে জিয়ার প্লেন কাবুলে সোভিয়েতের পৃষ্ঠপোষকতার সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা 'খাদ' কর্তৃক ভূপাতিত হয়েছে। জিয়ার অনুপস্থিতির কারণে গোটা পাকিস্তানে আমেরিকান পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। যা ঘটার ঘটে গেছে, কিন্তু এরপর কি হবে? 'বাইরের হাত' বা বহিঃশক্তির থিওরি যদি সত্য হয় তাহলে মিসাইল আক্রমণের চেয়েও বেশকিছু ঘটার পূর্ব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

এই মুহূর্তে দেশ অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায়। এই মুহূর্তে পার্লামেন্ট নেই। এখন কোন প্রধানমন্ত্রী নেই। প্রেসিডেন্ট মৃত। সামরিক বাহিনীর শীর্ষ ব্যক্তিরা মৃত। দেশ এখন একটা শূন্যের ওপর চলছে এবং এই মুহূর্তটা ভেতর বাহির সব দিক থেকেই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের উপযুক্ত সময়। বাস্তবিকই, ওইরাতে এমআরডিতে আমাদের কিছু সহকর্মী পরামর্শ দেন যে, এখনি আঘাত হানার সময়, জিয়ার বাহিনী নিজেদেরকে গুছিয়ে ওঠার আগেই। কিন্তু আমি তাদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করি। এটা গণতন্ত্রের প্রশ্ন নয়, এটা দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন। তৎপরিবর্তে, আমি পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল টিক্কা খানের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কাছে এক কনফিডেন্সিয়াল মেসেজ পাঠালাম এই বলে যে, পিপিপি একটি দেশপ্রেমিক দল। দেশের বিরুদ্ধে এহেন একটি ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনার প্রেক্ষাপটে পিপিপি দেশের অভ্যন্তরে এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে না যাতে আরো বেশি অনিশ্চিত অবস্থার কারণ হতে পারে।

স্যাবোটেজ থিওরির দ্বারা মিসাইল অ্যাটক থিওরি দ্রুতই অপসারিত হয়ে গেল। হঠাৎ করেই গোটা দেশের নজর পড়লো গিয়ে সেনাবাহিনীর ওপর। বিমান বিধ্বস্তের ঘটনা যদি স্যাবোটাজ হয়, তাহলে সেনাবাহিনী ব্যতীয় আর কে এই কাণ্ড করতে পারে? ঘটনা ঘটেছে একটি সামরিক বিমানে একটি সামরিক এয়ারফিল্ডে সামরিক নিরাপত্তার আওতায়। সামরিক বাহিনী ছাড়া কেউ জানে না জিয়া বাহওয়ালপুর উড়াল দিচ্ছে। পরবর্তী কয়েক দিন ধরে এই থিওরি সারাদেশে আলোচিত করলো। এমন কি ঐতিহ্যগত সামরিক এলাকাতেও একটি কথাই প্রচলিত ছিল 'ভেতরের কাজ।'

www.pathagar.com

আমার কাছে এই গুজবকে ভয়াবহ বলে মনে হয়েছে। আমি চাইনি সেনাবাহিনী পুনরায় বিতর্কিত বিষয় হোক। আমি চেয়েছি তারা যেভাবে রাজনীতির বাইরে থেকে কাজ করছিল তেমনটাই থাকুক। প্রথম প্রথম প্রেসের সঙ্গে কথা বলে আমি দুস্কর বোধ করেছি। তারা চেয়েছে আমি বলি যে, আমি খুব আনন্দিত হয়েছি আমার শত্রু নিহত হওয়ায়। তারা এও বলাতে চেয়েছে যে, সেনাবাহিনী দায়িত্বশীল। এটা যদি সত্য না হয়, কি করে আমি তা বলতে পারি।

জিয়ার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গুজব ধীরে ধীরে নানা ডালপালায় বিস্ফারিত হলো যা ছিল প্রমাণ অযোগ্য ও অবিশ্বাস্য। এমন গুজবও ছিল যে, প্লেনের পাইলট দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে বাহওয়ালপুরে উপহার হিসেবে দেয়া একটি আমের ঝুড়িতে গোপনে রাখা বিস্ফোরকের মাধ্যমে প্লেনটিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজেকে দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে উৎসর্গ করেছে। কিন্তু অন্যান্য জিনিসের মতো আমগুলোও নিরাপত্তাকর্মীদের মাধ্যমেই গিয়েছিল। আর সেই পাইলট, যে জিয়াকে বাহওয়ালপুরে উড়িয়ে নিয়ে গেছে, এমন কোন গ্যারান্টি ছিল না যে জিয়া তার প্লেনেই আবার ফিরবেন। জিয়ার ভ্রমণকালে সব সময় দুটো প্লেন ব্যবহৃত হয়।

প্লেনের অপারেশনাল সিস্টেমের মধ্যে যান্ত্রিক ত্রুটি থাকার বিষয়টিও সহজে উড়িয়ে দেয়া যায় না। যদিও সি-১৩০ বিমান এ যাবৎ নির্মিত সবচেয়ে স্থিতিশীল ও বিশ্বস্ত বিমানগুলোর একটি, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছে যে বিমানটি খাড়া হয়ে ভূপাতিত হওয়ার আগে দুই মিনিটেরও বেশি সময় শূন্যে থাকার জন্য সংগ্রাম করেছে। এতেই বিমানটির যান্ত্রিক ত্রুটির প্রমাণ মেলে। বিধ্বস্ত হওয়ার পর আসিফের এয়ারফোর্সের এক বন্ধু তাকে ফোন করে জানায় যে, এরকম লাখে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। মনে হচ্ছে, সেটাই হয়েছে। কিন্তু তবুও তা প্রমাণ করা যাবে না। শেষ পর্যন্ত আমেরিকান ও পাকিস্তানি উভয় তদন্ত টীম দুর্ঘটনার কোন নিশ্চিত কারণ খুঁজে পায়নি। আমিসহ অধিকাংশ পাকিস্তানির শেষ সিদ্ধান্ত হলো, জিয়ার মৃত্যু অবশ্যই একটি দৈব ঘটনা।

মুসলিম ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে ওঠে গুণাহর কাজ করলে আল্লাহর গজবের বিশ্বাস নিয়ে। এই গজব অজান্তে যখন তখন নেমে আসতে পারে। পাকিস্তানের অনেক লোকই জিয়ার মৃত্যুকে আল্লাহর গজব হিসেবেই দেখেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত এমন রোষের উদাহরণের মুখোমুখি হওয়া নিতান্তই ভীতিকর।

বিধ্বস্ত বিমানটি পাঁচ ঘন্টা ধরে প্রচণ্ডরূপে পুড়তে পুড়তে শেষ হয়েছে। জিয়া এমন মাত্রায় 'ইসলাম' এর নাম ব্যবহার করেছেন যে, তিনি যখন মারা গেলেন, খোদা তার এতটুকু চিহ্নও রাখলো না। জনগণ একথাই বলাবলি করছে। মুসলিমদের সর্বশেষ ধর্মীয় আচার হলো মৃতদেহের গোসল এবং শেষ প্রার্থনা উচ্চারণ করার সময় মাথা মক্কার দিকে ঘোরানো হয়। কিন্তু তার ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয়নি। শাহ ফয়সল মসজিদ চত্বরে যে কবরস্থ করা হয়েছে তা জিয়ার অবশেষ আর কিছু নয়।

জিয়ার মৃত্যু পরদিন পিপিপির সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভের এক সভায় পার্টির হাই কমান্ডের মধ্যে ঐকমত্য ছিল যে, প্রেসিডেন্ট ইসহাক খানের কথা সাধারণভাবে পিপিপির গ্রহণ করা উচিত, এবং মত পোষণ করা হয় যে, তার কাজকর্ম অনুসরণ করতে হবে। তিনি যদি সাংবিধানিক পথে অগ্রসর তাহলে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে সমর্থন জানাতে পারি, যাতে

www.pathagar.com

করে পাকিস্তানে আমরা এগার বছরের মধ্যে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারি।

ইসহাক খান যখন জিয়ার একান্ত ঘনিষ্ঠজন এবং অন্ধ সমর্থকদের সমন্বয়ে তার তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করলেন, এতে আমরা দুঃখ পেয়েছিলাম। একটা নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন মন্ত্রিসভার পরিবর্তে এটা ছিল জিয়ার সেই দুর্নীতিবাজ ব্যবস্থারই প্রতিনিধি, পক্ষপাতহীন নির্বচন হলে, তারা নিজেই ক্ষমতা ও পৃষ্ঠপোষকতা হারান। আমরা তাদেরকে অপসারণের আহ্বান জানালাম। অন্যান্য দলগুলোও একই দাবি জানালো। কিন্তু কোন ফল হলো না।

কেয়ারটেকার সরকারের প্রাথমিক কাজের মধ্যে একটি ছিল সারাদেশের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং তাদেরকে জিয়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেওয়ার জন্য বিনামূল্যে যাতায়াতের টিকিট দিয়ে আসা ও বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা করা। আশ্চর্যজনকভাবে মাত্র কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধান এসেছিল। সঙ্গত কারণেই খুব বেশি পাকিস্তানির উপস্থিতি ছিল না। জিয়া প্রকৃতপক্ষে শোকহীনভাবেই চলে গেলেন। জিয়ার মৃত্যুর ৪০ দিন পর চেহলাম অনুষ্ঠানে মাত্র তিন হাজার মানুষ উপস্থিত ছিল বলে জানা যায়।

অনেকের মূল্যায়ন ছিল বিশেষ করে বিদেশী পত্রপত্রিকায় যে, জিয়ার মৃত্যুর কারণে আমার রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং এমন কি, পিপিপির প্রতি জনগণের সমর্থন হ্রাস পেতে পারে। বছরের পর বছর ধরে জনগণের উপলব্ধি করানো হয়েছে পিতৃহত্যার প্রতিশোধের প্লাটফরম হিসেবে জিয়ার প্রতি আমার রাজনৈতিক বিরোধিতা। কিন্তু সেটা মূল বিষয় হতে পারে না। তিক্ততার দ্বারা আপনি পুড়তে পারেন না। এটা আপনাকে নিঃশেষ করে দিতে পারে কিন্তু চালনা করতে পারে না। আমার কর্ম, আমার প্রেরণা ও উদ্দীপনা একই রয়েছে। তা হলো , সুষ্ঠু ও পক্ষপাতহীন নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানকে গণতন্ত্রে ফিরিয়ে আনা।

জিয়ার মৃত্যুর পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে নির্বাচনী গতিবেগ ক্রমশ বাড়ছিল। আমি দিনের দশ ঘণ্টাই মিটিং-সিটিংএ ব্যস্ত ছিলাম।

প্রেসের সঙ্গে মিটিং, ১৬ নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের ২০৭টি আসন এবং ১৯ নভেম্বরের প্রাদেশিক নির্বাচনে ৪৮৩টি আসনে কোন কোন প্রার্থীকে মাঠে নামানো হবে তা আলোচনার জন্য পার্টি কর্মকর্তা ও এমআরডি'র বিভিন্ন অংশের সঙ্গে মিটিং। কার্যকরভাবে আমাদেরকে চার স্তরে প্রস্তুত থাকতে হয়েছে। যদি সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত নেন যে নির্বাচন হবে দলীয় ভিত্তিক, তাহলে আমরা স্বল্প পরিচিত প্রার্থী নির্বাচন করতে পারি, যারা পার্টির প্রতীকের মাধ্যমে জোরদার হবে। যদি নির্বাচন দলবিহীন হয়, তাহলে আমাদের দরকার হবে অতি উচ্চপর্যায়ের স্বীকৃত প্রার্থী।

পিপিপি টিকেটে প্রার্থী হবার প্রত্যাশা নিয়ে দলের যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তারা করাচিতে এসে ভিড় জমালো। শহরে হোটেলের কোন রুম খালি ছিল না। ৭০০ জাতীয় ও প্রাদেশিক টিকেট পাওয়ার জন্য প্রায় ১৮০০০ লোক দরখাস্ত করে। জিয়ার রাজনৈতিক মেশিনারির অবসান ঘটানোর জন্য পিপিপি সাবেক মুসলিম লীগ সদস্যদের প্রতি তার দরজা খুলে দিল। আমাদের দলের বহু সাবেক সদস্য যারা ১৯৮৫ সালের নির্বাচনের সময় পার্টি থেকে দূরে

www.pathagar.com

সরে গিয়েছিল, তারা আবার ফিরে এলো মূল স্রোতে। দল থেকে আমাকে বলা হলো লারকানা, লাহোর এবং করাচি– এই তিন আসনে দাঁড়ানোর জন্য। আমার মা, যিনি আমার সন্তান প্রসবকাল থেকে সেরে না ওঠা পর্যন্ত আমার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর জন্য পাকিস্তানে ফিরে আসবেন, তার জন্য দুই আসনে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত হয়েছে, একটি লারকানা থেকে, এবং অন্যটি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের চিত্রল থেকে।

আগস্টের শেষ দিকে, এমআরডির সঙ্গে বিশেষ এক দীর্ঘ বৈঠকের পর আমি অসুস্থ বোধ করি এবং অবস্টেট্রিশিয়ান শিশুর অবস্থা জানার জন্য আমার আল্ট্রাসাউন্ড করে। আমার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য বোধ হয়েছে যে, আমার গোটা গর্ভকালীন সময়ে আমি শিশুর নড়াচাড়া অনুভব করেছি খুব কম। একথা আমার এক বন্ধুকে জানালেন তিনি বলেন, সে যে বালক, এটা তারই প্রমাণ। পুরুষ সন্তানরা নড়াচড়া করে না। আমার হতবুদ্ধিকর অবস্থার কথা ডাক্তারকেও জানালাম। কারণ বন্ধুদের কাছে শুনেছি যে শিশুরা সব সময় নড়াচড়া করে। 'আপনি আপনার কাজের মধ্যে এত ব্যস্ত যে, শিশু নড়াচড়া করছে, কিন্তু আপনি অনুভব করছেন না', বললেন ডাক্তার।

পরীক্ষায় ভিন্ন বিষয় প্রমাণিত হলো। তাতে দেখা গেল আমার অ্যামনিওটিক ফ্লুইড রয়েছে খুব কম এবং শিশু নড়াচড়া প্রায় করছেই না। কারণ, আমি অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছি মিটিংএ বসে বসে। ডাক্তার আমাকে বললেন, আমার রক্ত ঠিকমতো চলাচল হচ্ছে না। এর ফলে শিশুর পুষ্টির ঘাটতি হচ্ছে। ডাক্তারের নির্দেশে পরবর্তী টানা চার দিন আমি বিছানায় কাটালাম। আসিফের কাছে উর্দু অক্ষর থেকে শিশুর নাম পড়ে পড়েই সময় কাটালাম। ডাক্তার আমাকে বলেছেন, এরপর থেকে আমাকে বিরক্তির শিকার না হয়ে প্রত্যেকদিন সকালে এবং রাত্রে এক ঘণ্টা শুয়ে থাকতে হবে এবং শিশুর নড়াচড়ার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। যদি তা না পারি তাহলে অতি সত্বর আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে। প্রত্যেক চতুর্থ দিন আমাকে ক্লিনিকে আসতে হতো 'ফিটাল স্ট্রেস' পরীক্ষার জন্য। আপনার কাপড় চোপড় কি গোছানো আছে? সতর্ক করলেন ডাক্তার। কারণ যে কোন সময় সিজারিয়ান সেকশনের মাধ্যমে আমাকে ডেলিভারি করানো হতে পারে। আমি চিন্তিত ছিলাম এ কারণে যে, তারা ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিল এবং সনমের মাধ্যমে আমার মায়ের কাছে তারা এসওএস পাঠিয়েছে। মাম্মীও ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং দুই সপ্তাহ পরই এসে পৌঁছান।

শিশুর অবস্থা আমাকে খিঁচ ধরাতে লাগল, যা একটা উত্তেজক সময়। প্রতি চতুর্থ দিনে আসিফের সঙ্গে আমি ক্লিনিকে গিয়েছি। যেতাম রাতের শেষ দিকে, যখন সবকিছু শান্ত থাকতো। আমার রুটিনের সবচেয়ে বাজে বিষয়টা অচিরেই আমার জন্য যথাযথ হয়ে পড়লো। কিন্তু টেকনিশিয়ানরা কখনোই বিপদের আশঙ্কা খুঁজে না পাওয়ায় আমি বাড়ি ফিরে এলাম। তিন সপ্তাহ আমি আমার সিডিউল মোতাবেক স্বাভাবিক কাজকর্ম করেছি। এর মধ্যে পার্লামেন্টারি প্রার্থীদের তালিকা সম্পন্ন করেছি, আর আমাদের নতুন বাসায়ও উঠে এসেছি।

আমি অনেকটা স্বস্তি পেলাম যে, প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। কিন্তু ডাক্তারদের সিদ্ধান্তের আকস্মিকতা এবং সেটা গভীর রাতে হওয়ায় আমার আত্মীয়দের জানানো কঠিন হলো। আমার বান্ধবী পুচিও আমাদের সঙ্গেই ক্লিনিকে এসেছিল, সে আমার মাকে সতর্ক

www.pathagar.com

করার জন্য এবং আমার বেবি-কেসটা আনার জন্য করাচির নির্জন রাস্তায় নেমে পড়লো। নিরাপদে যাতে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তার জন্য বিশেষ মোনাজাত করেছে ইয়াসমীন।

পুচিও 'মেরিয়াম পানজা'ও নিয়ে এসেছে। এটা একটা শুকনো ফুল। অপারেটিং রুমে যাবার আগে এক গামলা পানিতে রাখার জন্য আসিফের এক বন্ধু আমাকে ফুলটা দিয়েছিল। অনেক মুসলমানের বিশ্বাস, পানিতে এই ফুল যতই স্ফীত বা প্রসারিত হবে ততই ব্যথা কমতে থাকবে। এবং আরাম বোধ হবে। আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন আসিফ সারারাত ধরে করিডরে ঘুর ঘুর করে কাটিয়েছে।

পরদিন ভোরে ডা. সেটনা এলেন আমার জন্যে। 'খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে হবে আমাদের', বললেন তিনি। হাসপাতালের বাইরে ইতোমধ্যেই লোকজন জড়ো হতে শুরু করেছে। কী করে জানলো তারা? আমি করাচির অতি ব্যয়বহুল ফেন্সি হাসপাতালের পরিবর্তে লাইয়োরির এই লেডি ডুফেরিন হাসপাতালেই আমার সন্তানের জন্ম দিতে চেয়েছিলাম। সেখানকার ডাক্তারদের আমি পছন্দ করি। তাছাড়া আমার জন্য লিয়ারি প্রভৃত ব্যক্তিগত গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের হাসি-কান্নার অনেক স্মৃতি রয়েছে এখানে। আমার পিতার জীবনের রাজনৈতিক লড়াইয়ের শেষ কথা এখানেই বলেছিলেন। আমাকে এখানে কাঁদানে গ্যাস মারা হয়েছিল। আমার এবং আসিফের বিয়ের গণসংবর্ধনা হয়েছিল এখানেই। জিয়ার অধীনে লাইয়োরির গরিব জনগণ অনেক কষ্ট করেছে। আমরা তাদের কষ্টের অনেকটাই ভাগাভাগি করে নিয়েছি। আমি এও ভেবেছি যে, আমার সন্তানের জন্ম যদি সেখানে হয়, তাহলে লাইয়োরির জনগণ সেই হাসপাতালের ডাক্তার ও স্টাফদের প্রতি আরো বেশি আস্থাবান হবে। তারা চিকিৎসা সেবা নেয়ার জন্য এই হাসপাতালে ছুটে আসবে। কিন্তু তারা কিভাবে জানলো যে আমি এই হাসপাতালে আছি? তাহলে কি এখনো আমাকে অনুসরণরত গোয়েন্দা ভ্যানগুলো বিভিন্ন সরকারি সংস্থাগুলোকে জানিয়ে দিয়েছে? নার্সরা আমাকে মুখে একটা শিট দিয়ে ঢেকে দিল। সুতরাং কেউ আমাকে চিনতে পারলো না। তারা হুইলিং করে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেল। পরবর্তী অন্যঘরে আসিফের মা এবং অন্য কয়েকজন আত্মীয় কোরানের 'সুরা মরিয়ম' পড়ছিল। বেদনা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রচলিত সুরা। আসিফ একটা পুত্র সন্তান পেতে ভীষণ উদগ্রীব ছিল। গত আট মাসে আমি যার সঙ্গেই মিশেছি তাদের প্রায় প্রত্যেকেই বলেছে আমার ছেলে হবে। আমিও তাই চাই, কারণ পাকিস্তানের মানুষ একটি পুত্রসন্তানকে সুলক্ষণ বলে মনে করি। আমার পিতার তিনটি নাতনি ছিল কিন্তু এ পর্যন্ত তার কোন নাতি হয়নি। আমার সন্তানই হবে পাকিস্তানের এই পরিবারের আমাদের শাখার প্রথম 'ভুট্টো নাতি'। এ পর্যন্ত আমি ছেলে হওয়ার যুক্তিতে বাধা দিয়ে এসেছি। আমি তাদের প্রতিরোধ করেছি, 'মেয়ে হলে দোষের কি?' কিন্তু কথা চলছেই।

কয়েক মাস আগে আমার কাজিন ফাখরির বাড়িতে একবার কোরানখানির পর অনুভব করলাম আমার মাথায় কিছু একটা ছিটিয়ে দিল কে যেন। আমার মুখ মুছে আমি শুধালাম, 'এটা কি?'

মহিলারা শোরগোল করে উঠলো, 'অভিনন্দন, তুমি একটা পুত্রসন্তান পেতে যাচ্ছো।'

'তোমরা কিভাবে জানলে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আমরা পিছন থেকে তোমার মাথায় লবণ ছিটিয়ে দিয়েছি', তারা আমাকে বললো।

www.pathagar.com

'তুমি ঠোঁটে– হাতে দিয়েছো, তার অর্থ একটি গোঁফ এবং একটি বালক। তুমি যদি চোখ কিংবা তোমার কপাল স্পর্শ করতে তাহলে তার অর্থ দাঁড়াতো তোমার কন্যা সন্তান।'

সমস্ত জল্পনা-কল্পনার সমাপ্তি ঘটলো ২১ সেপ্টেম্বর সকালে। 'আমাদের ছেলে হয়েছে', স্বল্প সময়ের অনুভূতিহীন অবস্থা থেকে ফেরার পর আমার স্বামীর মুখে শুনলাম। একথা সে অত্যন্ত গর্ব ও আত্মতৃপ্তির সঙ্গেই বললো। তাকেও ঠিক আমার মতোই দেখাচ্ছিল। আমি ঘুমিয়ে গেলাম এবং হাসপাতালের বাইরে অভিনন্দন সূচক বন্দুকের আওয়াজ, ড্রামের বাজনা এবং 'জিয়ে ভুট্টো' শ্লোগানের শব্দে জেগে উঠলাম। পাকিস্তানের ইতিহাসে সবচেয়ে খ্যাতিমান এবং রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত শিশুর জন্ম হলো।

সন্তান প্রসবের কারণে আমি যখন বাইরে বেরোতে পারবো না, জিয়া ঠিক সেই সময়ের কাছাকাছি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে পারেন, এরকম একটা আগাম চিন্তা করে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই শিশুর আগমনের সম্ভাব্য তারিখ গোপন রাখা হয়েছিল। সুনির্দিষ্ট তারিখ চিহ্নিত করতে সরকারের গোয়েন্দারা আমার মেডিকেল রেকর্ড জানার চেষ্টা করে বলে জানা যায়। কিন্তু সেগুলো আমার নিজের কাছেই রেখেছিলাম। শিশুর জন্ম ১৭ নভেম্বর হবে বলে সরকারের গোয়েন্দারা ভুলভাবে হিসাব করার ২৪ ঘণ্টা আগে জিয়া নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলেন ১৬ নভেম্বর।

কিন্তু নবাগত শিশু আমাদের সবার হিসাব-নিকাশ ব্যর্থ করে দিয়েছে। এক মাস কাল শুধু জিয়াহীনই নয়, শিশুটির প্রকৃতপক্ষে ভূমিষ্ঠ হবার কথা ছিল অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে। কিন্তু তাকে পাঁচ সপ্তাহ আগে পৃথিবীতে এনে খোদা আমাদের প্রতি অশেষ দয়া প্রদর্শন করেছেন। এর ফলে মধ্য অক্টোবরে শুরু হতে যাওয়া নির্বাচনী প্রচারণার আগে আমার শক্তি ফিরিয়ে আনতে প্রায় এক মাস সময় দিল আমাকে।

জন্মের সময় আমার এবং আমার ভাইদের চেয়ে যদিও ছোট হয়ে জন্মেছে, তবু খোদাকে ধন্যবাদ, শিশুটি বেশ শক্তিমান ও স্বাস্থ্যবান। আসিফ শিশুর কানে ফিসফিস করে আযান শোনালো। শিশুর দ্বারা আসিফ বাধা পড়ে গিয়েছিল, কক্ষ ত্যাগ করতে পারছিল না। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, শিশুটি আমার মতোই পিতার ভালবাসায় বড় হবে।

৭০ ক্লিফটন হাজার হাজার অভিনন্দন বার্তার টেলিগ্রাম, চিঠি ও কার্ডে প্লাবিত হলো। ফুল আর কেকের সবগুলো দোকানের মাল বিক্রি হয়ে গেছে। এই বাড়িতে পাঠানো শ' শ' কেকের অনেকগুলো পিপিপি'র লাল-সবুজ ও কালো রঙের করে জমাট বাঁধানো। অধিকাংশ কেক এবং ফুল আমি করাচির জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দিদের কাছে, হাসপাতালের রোগী ও নার্সিং স্টাফদের কাছে এবং শহীদদের পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। অন্যগুলো আসিফ রেসকোর্সের কাছের এতিমখানায় পাঠিয়ে দিল। রেসকোর্সে সে প্রায়ই পোলো খেলতো। শিশুকে নিয়ে পত্রপত্রিকায় গল্প ও কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে– যে শিশু প্রেসিডেন্টকে বোকা বানিয়েছে।' আমি তার জন্যে একটা 'বেবি-বুক'এ সব রেখে দিয়েছি।

বিদেশী প্রেসসহ প্রত্যেকেই শিশুর ফটো চেয়েছে। কিন্তু আমাদের জীবনে কোন প্রাইভেট বা একান্ত নিজস্ব বলে কিছু না থাকার প্রতিবাদে আসিফ এসব ব্যাপারে উদাসীন ছিল এবং তাদের অনুরোধ রক্ষা করেনি। বিশ্বের সর্বত্র থেকে যখন অনুরোধ আসা অব্যাহত রইল, শেষ পর্যন্ত আসিফ হার মানতে বাধ্য হলো এবং আমরা একটা অফিসিয়াল ফটো তুললাম। প্রথমবারের মতো আমি যখন লারকানায় উড়ে যাই, একজন যাত্রী আমার কাছে

www.pathagar.com

এলো শিশুটির ব্যাপারে সে কতটা রোমাঞ্চিত ছিল সেই কথাটি বলতে। সে তার থলিটা বের করলো, আর তার মধ্যেই রয়েছে আমার সন্তানের একটি ছবি।

নির্দিষ্ট সময়ের আগে শিশুর জন্ম হওয়ায় তখনও আমরা তার নাম ঠিক করিনি। আমার পাওয়া অনেক চিঠিতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে আমি যেন আমার পিতার নামানুসারে নাম রাখি। কিন্তু পাকিস্তানে শিশুকে ডাকার অধিকার বর্তায় পিতার নামের দ্বারা। পিতার নাম পরিবারের সন্তানদের উপর বর্তায়। আমি ও পাকিস্তানি পরিবারের ধারাকে সম্মান দেখাতে এবং তা অব্যাহত রাখতে চেয়েছি।

শুরুতেই, যদি ছেলে হয়, তাহলে আমি তাকে শাহনওয়াজ বলে ডাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যখন কে যেন আমাকে বললো, পরবর্তীতে আমি তোমার মধ্যে একজন শাহনেওয়াজের জন্ম হতে দেখবো– আমার অন্তর থেমে গেল। আমার সামনে আমার মৃত ভাইয়ের মেঝেতে পড়ে থাকার ছবি ভেসে উঠলো। আমি বুঝতে পারলাম, সারাজীবন ধরে সব সময় কেউ আমার ছেলের নাম ধরে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্মৃতি স্মরণ না করে পারবে না। আসিফ এলো একটা নাম নিয়ে। তার এবং আমার মাও এলেন আরো দুটো নাম নিয়ে। আমি তাদের কারো প্রস্তাবেই আপত্তি করিনি। আমি বললাম, ঠিক আছে, একজন ধর্মীয় পণ্ডিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করো, যেটা শুভলক্ষণ যুক্ত হয় সেই নামেই আমরা ডাকবো। কিন্তু ধর্মীয় সেই পণ্ডিত বললেন, তিনটিই শুভলক্ষণপূর্ণ এবং গুরুত্ব সমান।

অতঃপর হঠাৎ করে আমার মাথায় একটি নাম এলো– বিলওয়াল, যা এসেছে বিল আওয়াল নাম থেকে এবং যার অর্থ সমতাহীন একজন। সিন্ধুতে মখদুম বিলাওয়াল নামে একজন দরবেশ ছিলেন, যিনি তার সময়ে নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এই নাম আমার নিজের নামেরও প্রতিধ্বনি, যার অর্থ তুলনাহীন। সুতরাং একটি নামই ছিল যা মা, বাবা এবং দেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে স্পর্শ করে। প্রত্যেকেই সেটা মেনে নিল এবং আমরা তার নাম রাখলাম বিলাওয়াল। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য পাঁচদিন অবসরের পর আমি আবার কাজে ফিরে গেলাম। একটা চেয়ারে বসে আমাকে এতলা, ওতলা ওঠা-নামা করতে হয়েছে। ক্রমশ আমাদের সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছিল যে, নির্বাচন নির্ধারিত সময়ে হবে কিনা কিংবা আদৌ হবে কি না।

কোনরূপ আগাম সঙ্কেত না দিয়েই ধ্বংসাত্মক বন্যা ২৭ সেপ্টেম্বর লাহোরের একটি উপকণ্ঠে আঘাত হেনে মানুষ গবাদি পশু বাড়িঘর ভাসিয়ে নিয়ে গেল। চতুর্দিকে বিক্ষোভ ছড়িয়ে গেল যখন প্রকাশ পেল যে, জিয়ার কেয়ারটেকার প্রাদেশিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন আগাম সতর্কতা না দিয়েই লাহোরের অল্প বসতিপূর্ণ অথচ বেশি স্রোত প্রবণ একটি অঞ্চলকে বাঁচাতে ঘনবসতিপূর্ণ একটি দরিদ্র অঞ্চল রক্ষাকারী বাঁধ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার কারণেই এই ধ্বংসযজ্ঞ।

পানি বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়ে লাহোর এবং পাঞ্জাবের অন্যান্য শহর ও গ্রামগুলোকে প্রায় দুই সপ্তাহ বিচ্ছিন্ন করে রাখলো। ধ্বংস হলো ১৪টি জেলার দুই লক্ষ গবাদি পশু এবং পাঁচ লক্ষ একর জমির ফসল। বন্যায় সর্বস্ব হারানো হাজার হাজার মানুষের জন্য জরুরি ভিত্তিতে আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন ও খাদ্য সরবরাহ করলো পাঞ্জাব পিপিপি। কর্তৃপক্ষের এবং বিপর্যয়ের নিজের এইরূপ অবহেলার মুখে এটাই অনুভূত হচ্ছিল যে, হয় নির্বাচন স্থগিত হবে অথবা সামরিক আইন ঘোষণা করা হবে। কিন্তু সেনাবাহিনী জিয়ার নিয়োগকৃতদের

রাজনৈতিক প্রত্যাশা ভণ্ডুল করে দিল এবং সামরিক বাহিনী নির্দিষ্ট সময়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে দৃঢ়তা প্রদর্শন করে।

নির্বাচনের বাস্তবতা আবার হ্রাস পেল যখন সন্ত্রাসীরা অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করার উদ্যোগে কোনরূপ উস্কানি ছাড়াই হায়দরাবাদ ও করাচিতে হামলা চালালো। হায়দরাবাদে সাব মেশিনগান এবং একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেলে সজ্জিত তিরিশজন সশস্ত্র গুণ্ডা এক সঙ্গে শহরের মুহাজির অধ্যুষিত অঞ্চলের নিরীহ নাগরিকদের ওপর বেপরোয়া গুলি চালায়। মুহাজির-সিন্ধি, পাঠান এবং পাঞ্জাবি- সকলেরই লাশ পড়েছে রাস্তায়। বন্দুকধারীরা কাকে হত্যা করছে এতা দেখারও গরজ করেনি। এর নয় ঘণ্টা পর জাতিগত উত্তেজনা সৃষ্টির লক্ষ্যে অতি সতর্কভাবে এক জোটে সন্ত্রাসী অভিযান চালনা করে করাচিতে, যেখানে হত্যাকারীরা শহরের সিন্ধি বসতি এলাকায় গুলি চালিয়ে বাসিন্দাদের হত্যা করে। এক জায়গায় তারা একটা বাসে প্রবেশ করে এবং সিটের উপরই যাত্রীদের হত্যা করে। হত্যাযজ্ঞে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪০, আর আহত ৩০০। হায়দরাবাদ এবং করাচিতে সান্ধ্য আইন জারির ফলে স্কুল, বাজার এবং দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়।

এ খবর পাওয়ার পর আমি পীড়িত বোধ করলাম। কারা ছিল এর পিছনে? পাকিস্তান বহু বিদেশী চক্রান্তের শিকার, সে কারণে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করতে বিদেশী প্রভাবের কথা কেউ উড়িয়ে দিতে পারে না। আবার, এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ প্ররোচনার কথাও কেউ অবজ্ঞা করতে পারে না। এক্ষেত্রে আমরা অনুভব করলাম, প্রবল একটা সম্ভাবনা রয়েছে যে, নির্বাচনে পরাজয়ের মুখে পড়ে তত্ত্বাবধায়ক বা কেয়ারটেকার প্রশাসন এইরূপ আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর নিমিত্তে ডাকাত ভাড়া করে, যাতে করে সেনাবাহিনী সামরিক আইন জারি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেনাবহিনী যথেষ্ট ধৈর্য প্রদর্শন করে। তারা দুটো শহরেই পুনরায় কোনরূপ হত্যাকাণ্ড বা প্রতিশোধমূলক প্রতিআক্রমণ এবং বিশৃঙ্খলা যাতে ছড়াতে না পারে তার জন্য পাহারা দিতে থাকে।

৫ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন দলহীনভাবে অনুষ্ঠিত হবে বলে জিয়ার নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা আমার সাংবিধানিক আবেদন সমর্থন করে। বারজন বিচারপতির ফুলবেঞ্চের রায় ঘোষণাকালে রাওয়ালপিন্ডির কোর্ট রুম ছিল লোকে লোকারণ্য। বিচারপতিগণ রায় দেন যে, নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করার যোগ্য সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং দলসমূহের নির্বাচনের স্থানে রাজনৈতিক প্রতীক বরাদ্দ করা হবে, ব্যক্তিগত প্রার্থীদের কাছে নয়। আদালতের সিদ্ধান্ত কেয়ারটেকার প্রশাসন মেনে নেয়। জিয়ার লোকেরা এখন আর কী করতে পারে আর যখন গোটা বিশ্ব আমাদের দিকে নজর রাখছে। এদিকে সারাদেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়লে।

জিয়ার মৃত্যুর পর আমরা নিরাপত্তাজনিত আরেক বিষয় আবির্ভাব ঘটলো। একটা চিঠি আটক করা হয়েছে, ধারণা করা হচ্ছে চিঠিটি আফগান মুজাহিদ নেতা গুলবাদিন হেকমতিয়ারের লেখা, যাতে তার অনুসারীদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে বেনজির ভুট্টোকে খতম করার। হেকমতিয়ার পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের খুব ঘনিষ্ঠ এবং হয়তো বা তাদেরই চাপাচাপিতে হত্যার নির্দেশ জারি করা হতে পারে। অপরদিকে, চিঠিটি বিদ্রোহী বিরোধী শক্তির দ্বারা লিখিত, যারা মনে করে আমাকে হত্যা করে মুজাহিদিনদের উদ্দেশ্য বানচাল

www.pathagar.com

করবে হত্যার দায় হেকমতিয়ারের ওপর চাপিয়ে।

এখন পাকিস্তানের ভেতর থেকেও হুমকি আসছে। আমরা খবর পেয়েছি যে, পাঞ্জাবের ভারপ্রাপ্ত কেয়ারটেকার প্রশাসন এবং সেই সঙ্গে তাদের সিন্ধুর ঘনিষ্ঠ মিত্ররাও আমাকে হত্যা পরিকল্পনা করছে। আমি মনে করি, জিয়ার অনুপস্থিতির অর্থ এই নয় যে, হুমকি শেষ হয়ে গেছে। পিপিপি এখন বিজয়ের নিশ্চিত অবস্থায়। জিয়ার মন্ত্রীরা চাচ্ছেন পিপিপি এবং আমাকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে।

নমিনেশন পেপার জমা দেয়ার নির্দিষ্ট দিন ঘনিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে নতুন রাজনৈতিক জোটগুলোর প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভাঙ্গাগড়া হচ্ছে। হইচই আর লড়াই, যা পাকিস্তানি রাজনীতির ঐতিহ্যগত নিয়ম, আমাদের সবচেয়ে বড় বিরোধীদল জিয়ার মুসলিম লীগকে আরও বিভক্ত করে ফেললো। জিয়ার বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার চারদিন আগে ১৩ আগস্ট মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নির্বাচিত করার জন্য ইসলামাবাদে মিলিত হয়। কিন্তু ভোট দেয়ার পরিবর্তে তারা পরস্পরকে গালিগালাজ, একে অপরের প্রতি নানা রকম কুৎসা করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার মোহে আসবাবপত্র ও চিনামাটির বাসন ছোঁড়াছুড়ির মধ্য দিয়ে অধিবেশন শেষ করে।

দুই সপ্তাহ পরে মুসলিম লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। এর একটা শাখার নেতৃত্বে থাকেন জিয়ার নিরয়োজিত দুই ব্যক্তি, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একজন সাবেক গভর্নর এবং পাঞ্জাবের ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ এবং তিনি জিয়াপন্থী অপর শাখার নেতৃত্বে ছিলেন জিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মেদ খান জুনেজো এবং তিনি জিয়াবিরোধী। শক্তিধর বিরোধীদলটি বিভক্ত হওয়ায় নির্বাচনে আমাদের বিজয় প্রায় নিশ্চিত ছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে, এমআরডি এবং পিপিপি'র মধ্যে জোট ভেঙ্গে গেল। কোন কোন প্রার্থীকে চূড়ান্ত করা হবে তার সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে ক্রমশ প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, অনেক এমআরডি প্রার্থী তাদের মুসলিম লীগের প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার পক্ষে খুব দুর্বল। এছাড়া এমআরডি নির্বাচনের পরে আমাদের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে অস্বীকার করে। তারা তাদের অপশন খোলা রাখার জন্য জিদ ধরে। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই এমআরডি থেকে আলাদা হয়ে যাই। এরপরও আমরা এমআরডিকে নিশ্চয়তা দিয়েছি যে, নীতিগতভাবে এমআরডি নেতাদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকায় আমরা কোন প্রার্থী দেব না। আমাদের এই নীতি কোন শর্ত বা বিনিময়ে নয়।

ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী পিপিপিকে মোকাবিলা করতে গিয়ে দ্রুত রাজনৈতিক কৌশল ত্বরান্বিত হচ্ছিল। মুসলিম লীগের জিয়াপন্থী শাখা অন্যান্য সাতটি ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি জোট গঠন করলো একটা একক ব্যানার ও নির্বাচনী প্রতীকে নির্বাচন করার জন্য, যার নাম 'ইসলামী জমহুরি ইত্তেহাদ'।

১৫ অক্টোবর প্রার্থিতা জমা দেয়ার জন্য নির্ধারিত দিনের আগের দিন শেষ মুহূর্তে জুনেজো এবং মুসলিম লীগের তার শাখা ইসলামী জমহুরি ইত্তেহাদে যোগ দেয়। এখন আমাদের নয়টি রাজনৈতিক দলের কোয়ালিশনের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

www.pathagar.com

আমাদের কাছে এটা পরিহাস বলেই মনে হলো যে, পিপিপিকে মোকাবিলা করতে দলগুলো এক সঙ্গে জোট বাঁধার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো। সচরাচর কোয়ালিশন বা জোট গঠিত হয় ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে। এই প্রথম ক্ষমতাসীন দল জোট গঠন করলো আমাদের বিরুদ্ধে, বিরোধীদলের বিরুদ্ধে, সম্ভাব্য সব ভোটারদের দরজায় ধর্না দিয়ে যতটা পারে ভোট সংগ্রহ করার জন্য।

তবুও তা যথেষ্ট ছিল না। আমাদের বিরুদ্ধে অস্বাভাবিক আরো কিছু জড়ো করার জন্য অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট তার একক সিদ্ধান্তে এবং অসাংবিধানিকভাবে আমাদের সমর্থকদের অযোগ্য ঘোষণা ও ভোট না দেওয়ার জন্য নির্বাচনী আইন পরিবর্তন করে এক ডিক্রি জারি করেন। ডিক্রিতে ঘোষণা করা হয় যে, প্রথমবারের মতো, সমস্ত ভোটারকে ভোট দেয়ার সময় জাতীয় পরিচয়পত্র দেখাতে হবে। আমরা প্রতিবাদ করায় প্রশাসন দাবি করলো যে, পাকিস্তানি ভোটারদের শতকরা '১০৩' জনেরই পরিচয়পত্র রয়েছে।

এর পেছনে শুভঙ্করের ফাঁকি আমরা ভাল করেই জানি। গ্রাম্য ভোটাররাই পিপিপির মূল শক্তি, তাদের মধ্যে মাত্র ৫ ভাগ নারী ও ৩০ ভাগ পুরুষের পরিচয়পত্র রয়েছে। নতুন অথবা কার্ড পরিবর্তনের দরখাস্তের জন্য শুধু ফরম এর ঘাটতিই ছিল না, গ্রাম এলাকার একজন রেজিস্ট্রেশন অফিসার আমাদেরকে বলেছেন, যে, তিনি প্রতিদিন খুব বেশি হলে মাত্র ৩০০ কার্ডের প্রক্রিয়া সমাপ্ত করতে পারেন। এর অর্থ হলো, নির্বাচনের আগে মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে মাত্র ৪০০০ কার্ড ইস্যু করা যাবে। আবার তার মধ্যে অনেকগুলোই হবে অকেজো। কিছু রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত নির্বাচন কর্মকর্তা পিপিপি সমর্থকদের কার্ডকে বৈধ করছে যা নির্বাচনের পরে কার্যকর হবে।

আইডি কার্ডের জন্য কেয়ারটেকার প্রশাসনের এই জেদ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত আমাদের আশা ভরসাকে ম্লান করে দিল। ১৯৮৪ সালের গণভোটে, ১৯৮৫ সালের দলবিহীন নির্বাচনে অথবা ১৯৮৭ সালের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে আইডি কার্ডের প্রয়োজন হয়নি। সেই সময়ে প্রত্যেক প্রদেশের রেজিস্টার্ড ভোটারদের তালিকাই যথেষ্ট ছিল। নির্বাচনে পিপিপি'র পক্ষে ব্যাপক সংখ্যক ভোট যে আশা করা হচ্ছে তা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যই যদি না হবে, তাহলে এখন আইডি কার্ডের দাবি উঠছে কেন? পূর্বে জিয়ার সময় জনগণের রায় নিয়ন্ত্রিত হতো রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে। বর্তমানে ওই কাজটিই হচ্ছে ভোটারদের ভোট না দিতে দিয়ে। জিয়ার জীবদ্দশায় রাজনৈতিক প্রার্থীরা ছিলেন অযোগ্য ঘোষিত। তার একান্ত ভৃত্যদের অধীনে এখন ভোটাররা অযোগ্য।

আমরা আবার কোর্টে গেলাম আইডি কার্ডের প্রয়োজনীয়তায় সাংবিধানিকতার চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত পিটিশন নিয়ে। আমি এর পক্ষে প্রচারণার ওপর মনোযোগ দিলাম। আমার পিতা পিপিপি'র জন্যে ট্রেনে চড়ে প্রচারণা চালাতেন। আর আমি এখন তাই করছি খাইবার মেইলে করাচি থেকে লাহোর পর্যন্ত। নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচনী লড়াইয়ের জন্য আমাদের প্রচলিত ও সুপরিচিত দলীয় প্রতীক 'তরবারি'র অনুমতি না দেয়ায় আমরা নতুন একটা অস্ত্র পছন্দ করলাম– 'তীর'।

কেয়ারটেকার প্রশাসন নির্বাচনের সকল প্রার্থীর জন্য নির্বাচনের পূর্বে রেডিও ও টেলিভিশনে স্পট ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। সুতরাং আমি ট্রেনের নির্দিষ্ট স্থানগুলো ব্যবহার

www.pathagar.com

করেছি সমর্থকদের ভোট কেন্দ্রে আসার জন্য। দুই স্টেশনের মাঝখানে আমি পিপিপি নেতাদের সঙ্গে মিলিত হতাম যারা এক স্টেশনে উঠে পরের স্টেশনে নেমে যেতেন। 'জালেমো কি দিল মে তীর, বেনজির, বেনজির'। অর্থাৎ অত্যাচারীর আত্মায় তীর, বেনজির, বেনজির!'– উচ্ছ্বসিত জনতা গোলাপের পাঁপড়ি আর মালা ছিটিয়ে ট্রেন ভরে তুলছে, আর আনন্দে চিৎকার করছে, গাড়ির মধ্যে জমা হওয়া দলীয় কর্মীদের হাতে তারা খাদ্য ও পানি এনে দিচ্ছে। প্রত্যেক স্টপের পর আমি চা পান করছিলাম আর ওষুধ খাচ্ছিলাম। কারণ, আমি কিডনি ইনফেকশনে ভুগছিলাম, যা আমাকে প্রচারণার শুরু থেকেই বিপদে ফেলেছে। আসিফ কখনো আমার ভ্রমণসঙ্গী হয়নি, নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর প্রথম ধাপে আমার সঙ্গী হলো, যেমনটা সঙ্গী হয়েছে অতি উৎসাহী পিপিপি সমর্থকরা, যারা ট্রেনের ছাদে চড়ে কিংবা আমাদের সঙ্গে একত্রে ভ্রমণ করছে। তাদের নেচে নেচে গান গাওয়ার ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম পাঞ্জাবের সবুজ মাঠের রোদের ছায়ায়। মিয়া চান্নুর রাতের স্টপ। এটা একটা কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এখানে আমি প্লাটফর্মে প্রায় থেকেই যাচ্ছিলাম, যখন ট্রেনের ইঞ্জিন আগেভাগেই স্টেশন ত্যাগ করছিল। জনতা পথে শুয়ে পড়ে আমাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে।

আমাদের ট্রেন যখন সিন্ধুতে ট্যুর করছে, তার সপ্তাহখানেক পরে যেদিন ৪০ জনের বেশি পিপিপি ভ্রমণ সঙ্গী আসিফের নওয়াবশাহীর বাড়িতে রাত কাটায়, আর তার পরদিনকার খবর আমাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দিয়েছে। ৮ নভেম্বর লাহোর হাইকোর্ট আইডি কার্ডের প্রয়োজনীয়তা বাতিল করে ২১ বছরের উর্ধ্বে সকল পাকিস্তানি ভোটারের সাংবিধানিক অধিকার সমর্থন করে। কোর্ট উল্লেখ করে, লাহোরের একটি নির্বাচনী এলাকায়, সরকারিভাবে আইডি কার্ডের সংখ্যা রেজিস্টার্ড ভোটারের চেয়ে দ্বিগুণ ইস্যু করা হয়েছে। অধিকন্তু মহিলাদের জন্য ইস্যুকৃত আইডি কার্ডে ফটো কিংবা স্বাক্ষর নেই, যার ফলে ভোটে প্রতারণার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে এবং এইসব অনিয়মের কারণে কোর্ট রায় দেয় আইডি কার্ড ব্যবহার না করতে এবং তার পরিবর্তে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে। জিয়ার লোকেরা তাৎক্ষণিকভাবে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে।

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য লাহোর হাইকোর্টের রায়ে বিজয় লাভের প্রেক্ষিতে জনগণের প্রত্যাশা নতুন এক মাত্র পায়। ১০ নভেম্বর লারকানার এক জনসভায় উল্লসিত জনতার উদ্দেশ্যে আমার মা বলেন, 'আলি বাবা চলে যেতে পারে, কিন্তু চল্লিশ চোর রয়ে গেছে। আপনারা জানেন তারা কারা। ১৬ নভেম্বর আপনারা তীর মার্কায় ভোট দিন।' ওই দিনই রাওয়ালপিন্ডিতে আমার ১৯৮৬ সালে পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের সময়ের রেকর্ড ভঙ্গ করা বিশাল জনতা আমাকে অভিনন্দিত করে। হাজার হাজার সমর্থক পিপিপির মিছিলে যোগ দিয়ে নগরীর পথঘাট ভরে ফেলে এবং ট্রাফিক ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম করে। এর ফলে মাত্র এক কিলোমিটার রাস্তা পার হতে আমাদের প্রায় তিন ঘণ্টা লেগে যায়। শেষ পর্যন্ত জনসভাস্থলে পৌঁছে অগণিত জনতার উদ্দেশ্যে আমি বললাম, যারা একনায়কত্ব সমর্থন করে এবং যারা গণতন্ত্র সমর্থন করে তাদের মধ্যে একটিকে আপনাদের সমর্থন করতে হবে। আপনাদের বেছে নিতে হবে প্রতিক্রিয়াশীল, যারা জনগণকে নিষ্পেষণ করতে চায় এবং পিপিপি, যে নিষ্পেষণের নিগড় ভেঙ্গে ফেলতে চায় এর মধ্যে যেকোন

www.pathagar.com

একটিকে।

প্রচারণার শেষ কয়েকদিন আমরা যখন পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম তখনই জনগণের উত্তেজনা অনুভব কচ্ছিলাম। একচল্লিশ বছর আগে জন্মলাভের পর এ পর্যন্ত পাকিস্তানে মাত্র দুইবার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম নির্বাচন আমার পিতা ও পিপিপিকে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্বে এনেছিল। ১৯৭৭ সালে পিপিপি সরকার পুনর্নির্বাচিত হয়। এই নির্বাচন ছিল তৃতীয় এবং অত্যন্ত কঠিনতম।

১৬ নভেম্বরের নির্বাচনের ফলাফল বিবেচনা না করেই জিয়ার মুসলিম লীগ নেতারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, তারা সরকারের নেতৃত্বে কোন 'ভুট্টো'কে মেনে নেবে না।

মৌলবাদী জামায়াত-ই-ইসলামী তীব্র প্রচারণা চালায়, নারী নেতৃত্বে অনৈসলামিক। যদিও জিয়ার ১৯৮৫'র সংবিধানে তারা একে ইসলামিক বলে ঘোষণা করেছিল। এমন কি, আহমেদ রেজা কাসুরি, নিম্নস্তরের একজন রাজনীতিক, যিনি নয় বছর আগে আমার পিতার বিচারিক হত্যাকাণ্ডে জিয়ার সাথে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, জেনারেল জিয়ার বড় ছেলে ইজাজুল হকের সঙ্গে হাত মেলালেন। অবিশ্বাস্যরূপে ইজাজুল হক পত্রপত্রিকায় দাবি করেন, লন্ডনের একটি ইহুদি কোম্পানির পরামর্শক্রমে পিপিপি'র নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালিত হচ্ছে।

ইতোমধ্যে সুপ্রিমকোর্ট আইডেন্টিটি কার্ড বা পরিচয়পত্রের সাংবিধানিকতা সম্পর্কে তার সুচিন্তিত মতামত দেয়া শুরু করেছে। দেশের প্রায় ৫৫ শতাংশ রেজিস্টার্ড ভোটারের ভোটদানের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেয় আইডি কার্ড। দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাদের অশুভ। শুনানির প্রাক্কালে সুপ্রিমকোর্টের একজন বিচারক আমাদের এক আইনজীবীকে বিশ্বাস করে বলেন যে, রাওয়ালপিণ্ডিতে আমরা আপনাদের সমাবেশের আয়তন দেখেছি। আমরা পিপিপিকে বিপুল ভোটে বিজয়ী হতে দিতে পারি না। ১৯৮৮ সালের ১২ নভেম্বর আইনের প্রক্রিয়া যখন শেষ হলো, সকল পাকিস্তানি ভোটারদের আগামী নির্বাচনে ভোট দেয়ার সময় আইডি কার্ড দেখানোর আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ালো।

চার প্রদেশের সবগুলোতে নির্বাচনী প্রচারণা শেষ করার পর জনগণ আমাকে বলা শুরু করলো ওয়াজির-ই আজম, বেনজির! প্রধানমন্ত্রী বেনজির। ভুট্টো পরিবার হিরো, হিরো, বাকি সবাই জিরো, জিরো। সর্দিগর্মি ও জ্বর নিয়েও আমার মাকে তার নির্বাচনী কর্মসূচী চালাতে দেখে জনগণ আমার মায়ের উদ্দেশে এ স্লোগান দেয়। ১৬ নভেম্বরের ভোট দেয়ার জন্য আমাদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকা লারকানার আল-মুরতাজায় গেলাম একসঙ্গে। ভোটদানের পর আমি আমার পিতার কবরে জেয়ারত করলাম, যিনি পাকিস্তানের ইতিহাসে এ যাবৎ জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত একমাত্র প্রধানমন্ত্রী। ভোট দেওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন অর্ধেকেরও বেশি সংখ্যক লোক ভোট দিতে না পারলেও ১৬ নভেম্বরে পাকিস্তান পিপলস পার্টি জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে। সিন্ধু প্রদেশে পিপিপি'র জয় জয়কার এবং সবগুলো আসন পেয়েছে বিরোধীরা। এখানে তারা 'ইসলামি জমহুরি ইত্তেহাদের জোটের পক্ষে একটি আসনও দেয়নি জনগণ। পিপিপি পাঞ্জাবে পরিষ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। চার প্রদেশের নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দল হিসেবে পিপিপি ৯২টি আসনে জয়ী হয়। উপজাতীয় এবং সংখ্যালঘু আসনে পিপিপি'র বিজয়ী সদস্যসহ জাতীয় পরিষদে মোট আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৮টি। পক্ষান্তরে ইসলামি জমহুরি ইত্তেহাদ জোট মাত্র ৫৪টি আসন দখল করতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

মৃত জেনারেল জিয়াউল হকের সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট সব শীর্ষ নেতাই ভোটারদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। তার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীত্বের খায়েশ পোষণকারী মোহাম্মদ খান জুনেজো, আইজেআই-এর চেয়ারম্যান গুলাম মুস্তাফা জাতোই রয়েছেন। সেই সঙ্গে ধর্মীয় নেতা পীর পাগারা'ও পরাজিত হয়েছেন। পাঞ্জাবের অস্থায়ী গভর্নর চারটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুইটিতে পরাজিত হয়েছেন। আমার মা এবং আমি সিন্ধু, পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পাঁচটিতেই জয়লাভ করি– পাকিস্তানের ইতিহাসে যে কোন একক প্রার্থীর চেয়ে সর্বাধিক ভোটের ব্যবধানে।

১৯ নভেম্বর পিপিপি একইভাবে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনেও জয়লাভ করে আই জে আইজেআই-এর প্রাপ্ত ১৪৫ আসনের স্থলে ১৮৪টি আসন পেয়ে। জিয়ার সাবেক মন্ত্রী এবং পরিষদ সদস্যগণ সারা পাকিস্তানেই ধরাশায়ী হয়।

সুস্পষ্টরূপেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে আমাকে ডাকার প্রয়োজন পড়ে সরকার গঠনের জন্য। পাকিস্তানের সর্বত্র এবং বিশ্বের বিস্তৃত অঞ্চল থেকে আমার কাছে অভিনন্দনের পর অভিনন্দন আসতে থাকলেও প্রেসিডেন্ট হাউজের তরফ থেকে ছিল বোবা নীরবতা। সেখান থেকে কোন অভিনন্দনবার্তা ছিল না। তাছাড়াও সরকার গঠন করার জন্য প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খানের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত টেলিফোন কলও পাওয়া গেল না। তার পরিবর্তে আমার দলের সদস্যদের কাছে জেনারেলরা দৌড়াদৌড়ি করা শুরু করলো। তাদের বললো, দলত্যাগ করতে। সদস্যদের কাছে তারা অঙ্গীকার করলো তারা যদি পিপিপির দশজন সদস্যকে ভাগিয়ে আনতে পারে তাহলে তাদেরকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে।

পক্ষকালব্যাপী ঝুঁকিপূর্ণ জুজু উন্মোচিত হতে যাচ্ছিল প্রায়। গোলাম ইসহাক খান যুক্তি দেখাচ্ছিলেন যে, সরকার গঠনের জন্য বৃহত্তম দলের নেতাদের ডাকার তার প্রয়োজন পড়ে না, তা সত্ত্বেও আমি জানি, আমার সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। আমি সেটা প্রমাণ করে দিলাম যখন পার্লামেন্টের মহিলা সদস্যদের পরোক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। পিপিপি ২০টি আসনের মধ্যে ১৪টিতে জয়ী হলো। অন্য যেকোন ধরনের গণতন্ত্রে বিজয়ীরাই সরকার গঠন করে এবং ক্ষমতায় যায়। কিন্তু এটা পকিস্তান, এখানে রয়েছে ভিন্ন নিয়ম, খেলার মতো ভিন্ন ভিন্ন শক্তি।

আমার নির্বাচনী বিজয় এবং সাংবিধানিক সঙ্কট বৃদ্ধির মুখে দিনের পর দিন গড়িয়ে যাবার প্রেক্ষাপটে আমি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে একটা বিস্তৃত চিঠি লিখলাম। আমার লক্ষ্য ছিল প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খানের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। আমার বন্ধু মার্ক সিগেলের দ্বারা আমার চিঠি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্যদের কাছে পাঠানো হলো। আমার দলের কর্মীরা উক্ত চিঠি যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের এমপিদের কাছে এবং ইসলামাবাদে মুসলিম ডিপ্লোমেটিক মিশনসমূহে পৌঁছে দিল। পিপিপি নির্বাচনে জয়ী হয়েছে। শাসন ক্ষমতা ছাড়া অন্য কিছুতে আমাকে নিবৃত করা যাবে না। গণতান্ত্রিক বিশ্ব সাড়া দিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য রাষ্ট্রে ইসহাককে চাপ দিতে থাকলো বৃহত্তম দল হিসেবে পিপিপিকে সরকার গঠনে ডাকার জন্য। এক অশোভনীয় বিলম্বের পর এবং আমার পার্লামেন্টারি দলের মধ্যে ভাঙন ধরাতে ব্যর্থ হয়ে প্রেসিডেন্ট ইসহাক জনগণের ইচ্ছাকে মেনে নিলেন।

www.pathagar.com

১৭

প্রধানমন্ত্রী এবং তারপর

১৯৮৮ সালের ২ ডিসেম্বর মুসলিম বিশ্বের প্রথম নির্বাচিত মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করি। পাকিস্তানি পতাকার সাদা ও সবুজ রঙের পোশাক পরে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে উজ্জ্বল ঝাড়বাতির নিচে লাল কার্পেটের ওপর দিয়ে আমি যখন হেঁটে যাই, এ অবিস্মরণীয় মুহূর্তটা আমার ছিল না, এ মুহূর্ত স্মরণীয় ছিল তাদের, যারা গণতন্ত্রের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছেন।

পাকিস্তানের মানুষ গোঁড়ামি ও কুসংস্কার প্রত্যাখ্যান করে একজন মহিলা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেছে। এটা এক বিশাল সম্মান এবং সমভাবে অসীম দায়িত্ব। আমার কাছে, প্রধানমন্ত্রীত্বের জন্য আমার শপথ গ্রহণ ছিল একটা যাদুর মতো, অধিবাস্তব মুহূর্ত। আমাকে এই সময়ে, এইখানে, এই পদে নিয়ে আসার জন্য আমার ভাগ্যকে স্মরণ করা ছাড়া আর সেদিন কিছু করতে পারি না। আমি আজ তাদের সবাইকে স্মরণ করি, যারা আমার সঙ্গে ছিল, দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে, মার খেয়েছে, নির্বাসনে গেছে, এবং অনেকে যারা এই গণতন্ত্রের জন্য নিহত হয়েছেন। বিশেষভাবে আমার পিতাকে স্মরণ করি।

আমি এইরূপ ভূমিকা চাইনি, আমি এই বিপুল বৈভব আশা করিনি, কিন্তু আমার ভাগ্য ও ইতিহাসের শক্তিই আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আমি নিজেকে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ও শঙ্কিত বোধ করছি। আমার নির্বাচন মুসলিম বিশ্বে বিরাট প্রভাব পড়বে। কুসংস্কারগ্রস্ত পশ্চাৎমুখী ব্যক্তিরা যারা প্রচার করে যে, নারীর ভূমিকা শুধু চার দেয়ালের অন্তরালে, তারা দারুণভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। পাকিস্তান এবং সেই সঙ্গে গোটা মুসলিম বিশ্ব নতুন এক সাহসী ব্যবস্থার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যেখানে লিঙ্গ সমতার নীতি বাস্তবতায় রূপ নিচ্ছে।

মাত্র এক বছর আগে আমার এক পুরনো বন্ধুকে জিয়া বলেছিলেন যে, বেনজিরকে বাঁচতে দেওয়াই তার জীবনের বড় ভুল– একথা স্মরণ করে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার পদবী বা অবস্থান এবং আমার জীবনের এই অগ্রগতি আমার ভাগ্যেরই একটা অংশ।

www.pathagar.com

আমার নির্বাচন সকল নারীকে ক্ষমতায়ন করেছে, ইসলামের উদারনৈতিক ভাবমূর্তিকে আরো জোরদার করেছে এবং পাকিস্তানের জনগণকে আরো উন্নত জীবনের আশা জাগিয়ে দিয়েছে। আমার সাফল্যের পাশাপাশি একই সময়ে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েতের প্রত্যাহার এবং এই মহাদেশব্যাপী আরো কিছু গণআন্দোলনের ফলে অনেক একনায়কের পতন ঘটলো। পরবর্তীতে থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, নাইজেরিয়া ও মরক্কো নেতাদেরসহ অন্য আরো নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি, যারা আমাকে বলেছেন, আমার কাহিনী তারা জেলখানায় বসে কিংবা আন্দোলনের সময় পড়েছেন এবং সেগুলো তাদের প্রেরণা যুগিয়েছে। পাকিস্তানের ভেতরেও বাইরে অনেকেই জনগণের ক্ষমতাকে এবং তাদের আগ্নেয়ৎপাত অপেক্ষায় চাপা পড়া শক্তিকে অবমূল্যায়ন করেছে, যা দশক দশক ধরে একনায়কত্বের জাতাকলে নিষ্পেষিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে আমি মনে করি সরকার এখন বাধাহীনভাবে জনগণের, সমস্যাগুলোর সমাধানে মনোযোগ দিতে পারবে। কিন্তু খুব শিগগিরই আমি বুঝতে পারলাম, আমার ধারণা ভুল। প্রেসিডেন্টসহ যারা আমার বিরোধীতা করেছে তারা আমাকে অস্থিতিশীল করার জন্য মুখিয়ে আছে। একটা ঘটনাতেই তার স্বরূপ জানা যাবে। শপথ অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট এক বিশেষ ভঙ্গিমায় শপথবাক্য পড়তে শুরু করলেন– কখনও দ্রুত, কখনও ধীরে এবং কমাগুলোতে না থেমেই। তিনি যেন আমাকে ল্যাং মারার চেষ্টা করছেন, বিশ্বের সমগ্র দর্শকদের সামনে আমাকে বিব্রত করার জন্য। তিনি কি করতে চান সেটা উপলব্ধি করে আমি আমার শপথ বাক্য পাঠ করলাম অত্যন্ত মর্যাদা, গর্ব এবং দৃঢ়তার সঙ্গে, যাতে পাকিস্তানের জনগণ আমার কাঁধে যে দাঁয়ভার তুলে দিয়েছে তা পূরণের জন্য আমার অঙ্গীকার তারা শুনতে পায়।

আমার শপথ সমাপ্ত হওয়ার পর আমি দেখলাম সামরিক বাহিনীর জেনারেলদের শুকনো মুখ আর পুরনো ও নতুন ব্যবস্থায় আক্রান্ত বেসামরিক আমলাদের শঙ্কিত চেহারা। কিন্তু অন্য্য কিছুও দেখতে পেলাম। সেই বিশাল কক্ষে আমি দেখলাম আমার মায়ের মুখ, পিপিপি ক্যাডার এবং কর্মীদের মুখ উজ্জ্বল আলোয় দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে আনন্দ ও গর্বে। শপথ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'ভুট্টো দীর্ঘজীবি হোক', 'ভুট্টো দীর্ঘজীবী হোক' ধ্বণিতে ভরে গেল ঝারবাতিতে আলোকোজ্জ্বল সেই হলঘর। ওই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম, আমার পিতার জীবন বিসর্জন দেয়া বৃথা যায়নি। আমার মতো এক অনভিজ্ঞ মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের মহিলাকে ভোট দিয়ে পাকিস্তানের জনগণ তার পাশেই দাঁড়িয়েছেন। এই ভালবাসা আর আনুগত্যের কারণেই আমি বিশ্বের কনিষ্ঠতম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীরূপে গণ্য হলাম।

তুলনামূলক রাজনীতির ওপর পড়াশোনা করে এটা উপলব্ধি করেছি যে, সরকারের প্রথম দিনগুলো থেকেই পরিবর্তনের আঁচ ও ইঙ্গিত থাকা চাই এবং সেই হিসেবে আমি পাকিস্তান ও বাইরের দুনিয়াকে– বস্তুগত ও প্রতীকিভাবে সুস্পষ্ট জানাবার উদ্যোগ নিলাম। ১৯৮৯ সালে আমার সরকারের একেবারে প্রথম সপ্তাহেই আমি যা যা অঙ্গীকার করছিলাম সেগুলোরই চর্চায় এগিয়ে গেলাম। আমি অতি শিগগিরই ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ফিরিয়ে দিলাম, যা জিয়ার সামরিক জান্তা নিষিদ্ধ করেছিল। আমি স্টুডেন্ট ইউনিয়নের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলাম। নারীর অধিকার ও মানবাধিকারের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ গ্রুপসহ এনজিওদের কার্যক্রম মুক্ত করার লক্ষ্যে সকল প্রতিবন্ধকতা ও শর্ত তুলে দিলাম (এনজিওদের কার্যক্রমে সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার বিরোধীতার মাত্রা দেখে আমি

www.pathagar.com

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।) কিছু এনজিও 'পশ্চিমাদের চর' হতে পারে তারা ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিল। আমি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়াকে সেন্সরহীন করে পুনরুজ্জীবিত করলাম। আমি পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম রাষ্ট্রীয় মিডিয়াকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে উন্মুক্ত করলাম। সেন্সরবিহীন খবর পরিবেশন ও রাজনৈতিক বিরোধীদের খবর পরিবেশনেরও সুযোগ করে দিলাম।

শান্তি স্থাপনের জন্য, অন্ততপক্ষে তার শুরুটা করার জন্য আমার সরকারের কার্যকালে পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারে প্রত্যয়ী হলাম। ১৯৯৮ সালের মে মাসে আমি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলাম ওই মাসেই আমি ইসলামাবাদে স্বাগত জানালাম ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধী এবং তার স্ত্রী সোনিয়া গান্ধীকে। আইএসআই বলে বেড়াচ্ছিল যে, আমি ভারতের ব্যাপারে নরম ভাবাপন্ন, যার সাথে কাশ্মীর নিয়ে আমাদের তীব্র বিরোধ রয়েছে। কিন্তু আমি তো তাদের খেলা খেলতে পারি না। আমার করার মতো কাজ আছে। প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধী এবং সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে অব রিজিওনাল কান্ট্রিস (সার্ক) কনফারেন্সের অন্যান্য নেতাদের একটা নিবিড় কার্যকরী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে আমি মনোনিবেশ করলাম।

ইসলামাবাদের সুদৃশ্য পাহাড়ি সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি স্থানে যখন সার্ক নেতৃবৃন্দ একত্রে মিলিত হলো আমি তাদের বললাম, ইউরোপীয় কমন মার্কেট এবং অতঃপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাধ্যমে তারা কত অর্জন করেছে। আমি প্রস্তাব করলাম, আমরা সবাই মিলে সার্ককে সাংস্কৃতিক সংগঠন থেকে একটা অর্থনৈতিক সংগঠনে রূপান্তরিত করার। যদিও সার্কের মধ্যে আমি ছিলাম নতুন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, সবচেয়ে তরুণ এবং একমাত্র নারী। তবু, আমি লাজুক ছিলাম না। আমি আমার মতামত জোরের সাথেই তুলে ধরেছি। নেতাদের সবাই ছিলেন উদ্যমী। অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য আমি প্রস্তাব করলাম, আমরা আমাদের দেশগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট গ্রুপ, যেমন পার্লামেন্টারিয়ান এবং বিচারকগণের জন্য ভিসামুক্ত ভ্রমণের সুযোগ করে দিতে পারি। আমাদের অধিবেশন শেষ হলো 'সাউথ এশিয়ান প্রেফারেন্সিয়াল ট্যারিফ এগ্রিমেন্ট' এর প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে। (আমার দ্বিতীয় মেয়াদের সরকারের সময় আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই এগ্রিমেন্ট অনুমোদনের)।

আমি রাজীব গান্ধীকে বললাম যে, তার মা প্রধানমন্ত্রী গান্ধী এবং আমার পিতা এসকল অগ্রগতিতে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবেন। তারা ১৯৭২ সালে অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, আমি তার এক কিশোরী সাক্ষী। রাজীব এবং আমি উভয়েই রাজনৈতিক বংশের সন্তান, যাদের পিতা বা মাতা আততায়ী কর্তৃক নিহত হয়েছেন। আমরা উভয়েই ছিলাম তরুণ এবং উপমহাদেশ বিভক্তির পরবর্তী প্রজন্মের সন্তান। রাজীব এবং সোনিয়ার সাথে কথা বলা আমার এবং আসিফের জন্য খুব সহজ ছিল। রাজীব যখন নিহত হন, আমি প্রচণ্ড দুঃখ ও আঘাত পেয়েছিলাম। আমি তাকে সম্মান জানাতে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় গিয়েছিলাম।

সার্ক শীর্ষ বৈঠকের পর রাজীব ও আমার মধ্যে একান্তে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়েছিল। আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম যে, ভারত একটি বৃহৎ দেশ এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দ্য সম্পর্ক করতে হলে তাকে আরো বড় আত্মার পরিচয় দতে হবে। আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম, কিভাবে তার মা ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভারতের কাছে পাকিস্তানের হারানো

www.pathagar.com

মাটি থেকে শর্তহীনভাবে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার মেনে নিয়ে সিমলায় সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কাজটি করেছিলেন। সিমলার সেই প্রেরণা চিরঞ্জীব থাকবে। উত্তেজনা ও উস্কানি সত্ত্বেও ১৯৭২ সালের সেই চুক্তির পর ভারত কিংবা পাকিস্তান কেউই আর সর্বাত্মক যুদ্ধের দিকে যায়নি।

জিয়ার সময়কালে পাকিস্তান ভারতের কাছে সিয়াচেন হিমবাহ হারায়। জিয়া যদিও এই ক্ষতিকে বাতিল করতে চেয়েছে এই দাবি করে যে, সিয়াচেনে কিছুই জন্মায় না, কিন্তু এটা জনগণ বিশেষ করে সেনাবাহিনীর মর্যাদাকে আহত করে। আমাদের সেনারা, যাদেরকে আমরা বলি 'জওয়ান', আমার নির্বাচনী প্রচারণার সময় আমাকে বিজয় চিহ্ন দেখাতো, যার প্রতিফলন হলো তাদের সামাজিক ভিত্তি তাদের জেনারেলদের ধ্যান-ধারণার চেয়ে অনেক অনেক গুণে বেশি। আমি জানতাম, আমাদের সেনাবাহিনী এবং সমগ্র পাকিস্তান চায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার বিদ্যমান ইস্যুগুলোর ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সমাধান। রাজীব স্বীকার করেন যে, আমাদের মধ্যে আস্থা গড়ে তোলার কর্মসূচী প্রয়োজন। আমরা কয়েকটি কমিটি গঠন করলাম এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম পরমাণু আস্থা স্থাপন চুক্তি স্বাক্ষর করলাম। এই চুক্তির শর্ত কেউ কারো পরমাণু স্থাপনায় আক্রমণ করবে না। আমরা অবশ্য একটা চুক্তিতে স্বাক্ষর করলাম সেনা পুনঃমোতায়েন এবং সেনা হ্রাসের। এবং দুই দেশের মধ্যে সীমিতকরা বাণিজ্য পুনরায় চালু করার জন্য। পরবর্তীতে, আমরা একটা চুক্তির খসড়ায় স্বাক্ষর করলাম হিমবাহের ওপর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিগত কুসংস্কার ছাড়াই কারগিলের উভয় পাশ থেকে সেনা প্রত্যাহারের জন্য। যদিও দুই জনের কেউই পরবর্তীতে এই চুক্তির চূড়ান্ত দলিলে স্বাক্ষর করার জন্য ক্ষমতায় ছিলাম না। মাঝে মাঝে আমি ভাবি যে, দক্ষিণ এশিয়া এবং সম্ভবত গোটা বিশ্ব একটা ভিন্নতর স্থান হতে পারতো যদি রাজীব বেঁচে থাকতেন এবং আমি আমার মেয়াদ শেষ করতে পারতাম। আমরা যদি পরস্পরকে উপলব্ধি এবং একসাথে কাজ করতে পারতাম।

আমার প্রথম সরকারের শুরুর দিকেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম পাকিস্তানকে পুনরায় ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে নিয়ে যেতে। আফগান যুদ্ধের সময় এবং পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে পাকিস্তানকে ব্রিটেনের সমর্থন আমার দলকে এই সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করে। আমাদের আলোচনা অব্যাহত রাখার জন্য রাজিব এবং আমার মিলিত হবার কথা ছিল ১৯৮৯ সালে মালয়েশিয়ার লাংকাইতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে। কিন্তু ভারতে আগাম নির্বাচন আহ্বান করা হলো এবং রাজীব দুঃখজনকভাবে নিহত হলেন। রাজীবের খুন হওয়ার পর ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক ক্রমেই খারাপের দিকে চলে যায়।

ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিং-এর কাছে ভারতের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার আমার ইচ্ছার কথা জানিয়ে একজন দূতকে পাঠালাম। যাই হোক, প্রধানমন্ত্রী অসৌজন্যমূলকভাবে ভারত অধ্যুষিত কাশ্মিরে বিদ্রোহের জন্য পাকিস্তানকে দোষারোপ করা শুরু করেন। যদিও কাশ্মিরী জনগণের প্রতি পাকিস্তানিরা সহানুভূতিশীল কিন্তু এই সময়ে তাদের উত্থান ছিল সহজাত এবং বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে সময় বার্লিন ওয়াল পতন সে সময় স্বাধীনতার শক্তিসমূহ সামনের দিকে অগ্রসরমান। আত্মনিয়নাধিকার আন্দোলন যদি পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি এবং পূর্ব জার্মানিতে এগিযে চলে, তাহলে কাশ্মিরেও উত্থান ঘটলে কেউ অবাক হবেন কেন?

www.pathagar.com

আমি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলেছি, পাকিস্তান এর জন্য দায়ী নয়। আমি যা উল্লেখ করিনি তা হলো ১৯৯০ সালে আফগান আরব এবং পাকিস্তানি জঙ্গিদের কাছ থেকে পাওয়া প্রস্তাবের কথা। আইএসআই-এর মাধ্যমে তারা আমাকে জানায় যে, একলাখ দুধর্ষ 'মুজাহিদিন' (এই শব্দটার সাথে আমি আগেই পরিচিত) যোদ্ধা কাশ্মিরী স্বাধীনতা আন্দোলনে সহায়তা দেয়ার জন্য কাশ্মিরে যেতে চায়। তারা বৃহৎ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করার ব্যাপারে আশাবাদী। এই বহুজাতিক সমর্থন কাশ্মিরি জনগণের আন্দোলনের সহায়ক না হয়ে বরং ক্ষতি করবে– এটা আমি মনে করি বলেই এই ধারণায় ভেটো দিলাম। অধিকন্তু আমি আমাদের সেনাবাহিনী এবং আইএসআই উভয়কে বিভক্ত কাশ্মিরকে বিভক্তকারী লাইন অব কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর সৈন্য পাঠাতে বললাম, যাতে পাকিস্তান থেকে কোন আফগান মুজাহিদিন কাশ্মিরে যেতে না পারে।

আমার রাজবন্দিদের মুক্তির উদ্যোগের প্রভাব আমার পরিবারের মধ্যেও ছিল। সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির নির্দেশের পাশাপাশি আমি প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খানকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণারও পরামর্শ দেই। কিন্তু ওই সাধারণ ক্ষমায় হাজার হাজার রাজবন্দিদের শাস্তি মওকুফ ও মুক্তির ফলে আমার ভাই মীর মুর্তাজা ভুট্টোও রেহাই পেয়ে যাবে- তা বুঝতে পেরে প্রেসিডেন্ট ইসহাক আমাদের পরিবারে বিদ্বেষের বীজ বপনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরিবর্তে শর্তযুক্ত ক্ষমা ঘোষণা করেন। এর ফলে যে কোনো সময় আমার ভাইকে আবারও গ্রেফতার করার সুযোগ থেকে যায়। এ রকম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নওয়াজ শরিফের হাতে বন্দির আশঙ্কা এড়িয়ে মুর্তাজা দেশে ফিরতে পারছিল না। (পাঞ্জাব নওয়াজ শরিফের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং তিনিই সেনাবাহিনীকে হুকুম দিতেন)। আমার পক্ষে যা সম্ভব তা আমি করেছি, আমার ভাইকে একটি পাকিস্তান পাসপোর্ট দেই– তার পাকিস্তানে ফিরে আসা ছিল ভয়ঙ্কর ঝুঁকিপূর্ণ।

আমি মুর্তাজাকে জানালাম যে, তার ব্যাপারে আমি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের সঙ্গে আলাপ করেছি। একটি রৌদ্রজ্জোল দিনে– চিকার্সের বাগান তখন ফুলে ফুলে ভরা। প্রধানমন্ত্রী থ্যাচারের সঙ্গে সেখানে হেঁটে বাড়ানোর সময় মুর্তাজার লন্ডনে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করি। প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার দয়াপরবশ হয়ে আমার অনুরোধ রাখেন। কিন্তু লন্ডনে যেতে মুর্তাজা ইতস্তত করে। সে আমাকে বলে, 'সেনাবাহিনীর ভেতরের মৌলবাদী মোল্লারা তোমাকে কতদিন ক্ষমতায় থাকতে দেবে তা আমি জানি না, আমার জন্য মধ্যপ্রাচ্যেই থাকা শ্রেয়।' আমার বিশ্বাস ক্ষমতা গ্রহণের শুরুতেই মুর্তাজা পাকিস্তানে ফেরার অনুমতি পেলে পরবর্তীতে পিপিপি'র দুই অংশের মধ্যে যে অভ্যন্তরীণ বিবাদ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তা এড়ানো যেত।

আমি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন- আমরা গণতন্ত্রের বীজ বপন করেছি এবং গণতন্ত্রকে বিকশিত করেছি– প্রথমেই ভেঙে পড়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্থায়ীভাবে কার্যক্ষম করে তোলার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা এবং পরিচর্যায় মনোযোগী হই। আমি জানতাম, সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য- এটা ইসলামের শিক্ষা। তাই আমি আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগ পৃথকীকরণের নির্দেশ দেই- এর মাধ্যমে আমি স্বাধীন বিচার বিভাগের ভিত্তি স্থাপন করি।

www.pathagar.com

কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য ছিল নজিরবিহীন এবং বৈপ্লবিক। ইংল্যান্ডে আমার নির্বাসনের সময় আমি দেখেছিলাম প্রধানমন্ত্রী থ্যাচারের নীতি কিভাবে একটি নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়েছিল। দক্ষিণ এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে পাকিস্তানেই প্রথম- আমার সরকার পাবলিক সেক্টরের শিল্পগুলোকে ব্যক্তিমালিকানাধীন করার নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিল। আমরা আমাদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোরও সংস্কার করি। আমরা অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ শুরু করি এবং অর্থনীতিকে আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার দৌরাত্ম থেকে মুক্ত করি। আমার সরকারের আগ পর্যন্ত পাঁচ হাজার ডলারের বেশি ঋণের জন্য অর্থমন্ত্রীর অনুমোদন লাগত।

আমরা যখন দেখলাম বছরে মাত্র দুইশ' ষাটটি গ্রাম বিদ্যুতায়নের আওতায় আনা হচ্ছিল- অথচ দেশে প্রায় আশি হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না- এটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি এবং আমরা গ্রামে দ্রুত বিদ্যুতায়নের জন্য আমরা বরাদ্দ দিয়েছি। রাস্তা-ঘাট নির্মাণ এবং সাধারণ মানুষের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ এবং পানযোগ্য পানির ব্যবস্থাও করেছি। একজন সাধারণ মানুষকে একটি টেলিফোন সংযোগ পাওয়ার জন্য বিশ বছর অপেক্ষা করতে হতো। এই অব্যবস্থা দেখে আমি বিচলিত হয়েছিলাম- ঋণ, টেলিফোন এবং বিদ্যুৎ ছাড়া মানুষ কীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে? এই অব্যবস্থা সমাধানের উপায় বের করার জন্য আমি মন্ত্রীসভাকে নির্দেশ দেই। ১৯৮৯ সালে আমরা ফাইবার-অপটিক ক্যাবলের সংযোগ স্থাপন করি। আমরা মোবাইল ফোন চালু করি। দেশের মানুষকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত করার জন্য আমরা পাকিস্তানে সিএনএন-এর সম্প্রচার চালু করি। সে সময় অন্যান্য দেশের বড় বড় হোটেলেই শুধুমাত্র সিএনএন-এর সম্প্রচার দেখা যেত। পাকিস্তানকে আধুনিক যুগে প্রবেশ করানোর লক্ষ্যেই আমি এসব পদক্ষেপ নিচ্ছিলাম।

আমাদের সংস্কার কার্যক্রম বিশ্বের দৃষ্টিগোচর হলো। বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ আমাদের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানায়। সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মহামান্য বাদশাহ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহইয়ান মুলতানে তেলশোধনাগার নির্মাণে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেন। আমরা বেলুচিস্তানে গোয়াদর বন্দর স্থাপন, মাকরান উপকূলের মধ্য দিয়ে আরসিডি হাইওয়ে নির্মাণ, ওরমারা নৌবন্দর নির্মাণ, পাসনি এবং গাজী বারোদা ড্যাম নির্মাণ এবং সেইনডাক স্বর্ণ ও তাম্র প্রকল্পের মতো উন্নয়নমূলক কাজও করেছি। আমরা দেশে পর্যটন শিল্প চালু করি এবং দেশের রপ্তানি বাড়ানোর জন্য মূল্যবান পাথরের খনিগুলো ব্যক্তিমালিকানায় দিয়ে দেই।

দেশে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য আমরা দ্রুত ওয়ান উইনডো বিনিয়োগ কার্যক্রম চালু করি। আমরা ব্যক্তিমালিকানায় বিনিয়োগ ব্যাংক, ব্যাংক এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি করার অনুমোদন দেই। আমি অত্যন্ত গর্ববোধ করি এই জন্য যে, আমাদের অর্থনৈতিক সংস্কারে দেশে সামাজিক খাতে নাটকীয়ভাবে বিনিয়োগ বেড়ে গিয়েছিল। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হলো- আমার প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রথম মেয়াদে আঠারো হাজার বেসরকারি প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মিত হয়।

অর্থনৈতিক সাফল্যও ছিল নাটকীয় এবং তুলনামূলক দ্রুত। পাকিস্তানে বিদেশি এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বেড়েছিল। অপ্রচলিত সামগ্রীর রপ্তানি পঁচিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

www.pathagar.com

আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের টেক্সটাইল চুক্তি পরিবর্তন করেছিলাম এর ফলে পাকিস্তানের তুলা রপ্তানি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় দীর্ঘকাল থেকে উপেক্ষিত এবং নির্যাতিত মহিলা এবং মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমরা যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করেছি সম্ভবত তার কারণেই আমি সবচেয়ে বেশি গর্ববোধ করি। আমার মন্ত্রীসভায় বেশ কয়েকজন মহিলাকে নিয়োগ দিয়েছিলাম এবং নারী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা বিষয়ক পড়াশুনা চালু করি। কারাবন্দি মহিলাদের উন্নততর আইনি সহায়তা এবং পরামর্শ পাওয়ার বিষয়টিও আমরা নিশ্চিত করেছিলাম।

সাধারণ ব্যাংকগুলো থেকে মহিলারা ঋণ গ্রহণের সুবিধা পেলেও তাদের জন্য বাড়তি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে মহিলাদের জন্য ঋণপ্রাপ্তির অধিক সুযোগ সৃষ্টি করেছি আমরা। পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টিজ্ঞান, শিশুর পরিচর্যা এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে মহিলাদের প্রশিক্ষিত করার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করেছি। এছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে মেয়েদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছি- যা স্বৈরাচারী জিয়ার শাসনামলে নিষিদ্ধ ছিল। পাকিস্তানের মৌলবাদীরা ইসলামের নামে সমাজে মহিলাদেরকে নিগৃহিত ও গৃহবন্দি করে রাখার যেই অন্ধকার যুগের সৃষ্টি করেছিল তার বিরুদ্ধে চরম আঘাত করা হয় আমাদের সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে।

ব্যাপক রাজনৈতিক এবং বস্তুগত প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও আমরা আমাদের সংস্কার সম্পন্ন করতে সফল হই। প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর আমি দেখলাম একজন ডেপুটি সেক্রেটারি ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সরিয়ে নেয়া হয়েছে। কাজেই আমার অফিসকে সুষ্ঠু-সুশৃঙ্খল ও কার্যক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য লন্ডনে একটি টিম পাঠাই- ১০, ডাউনিং স্ট্রিটে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে। উপরন্তু আমি লক্ষ্য করলাম- আমার কাছে কয়েকদিন ধরে কোনো ফাইল-ই পাঠানো হচ্ছে না। ক্যাবিনেট সেক্রেটারি সব ফাইল সরাসরি প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

আমার প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম মেয়াদে প্রতিবেশী আফগানিস্তানের পরিস্থিতি মোকাবেলা করাই ছিল সম্ভবতঃ সবচেয়ে জটিল এবং সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জ। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান দখলের পর থেকে আফগান মোজাহিদদের সাহায্য করার কাজে যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদার হিসেবে কাজ করে আসছিল পাকিস্তান। শীতল যুদ্ধের কৌশল হিসেবেই যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করেছিল। আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবৈধ সামরিক আক্রমণের সুযোগ কাজে লাগিয়ে শীতল যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাস্ত করার মোক্ষম চাল দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র- আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তি ও সামর্থ্য নিঃশেষ করার মাধ্যমে। আফগান, পাকিস্তানি আইএসআই এবং সেনাবাহিনীকে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র। পরোক্ষভাবে আফগানিস্তানে একটি রক্তাক্ত যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করেছিল। এবং এই পরাজয়ই ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের প্রধান কারণ হয়েছিল।

আফগানিস্তানের যুদ্ধে পাকিস্তানের স্বার্থ ছিল আরো বেশি জটিল, আরো বেশি কঠিন

www.pathagar.com

এবং বহুমুখী। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী দুরান্দলাইন নামক সীমান্ত নিয়ে দীর্ঘকালের বিরোধ রয়েছে। উপরোক্ত, ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার সময় উল্লেখযোগ্য পস্তু (অথবা পাখতুন) নেতারা পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিল। আফগানিস্তানের এলিট সম্প্রদায় ছিল ভারতের পক্ষে- তারা পাকিস্তানিদের অবিশ্বাস এবং সন্দেহের চোখে দেখত। ১৯৭০-এর দশকে পাকিস্তানের আদিবাসী অঞ্চলে দুরান্দলাইনে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে মদদ দিয়েছিলেন আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট দাউদ। পাকিস্তানও পাল্টা আক্রমণে তা প্রতিহত করে। দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ অমিমাংসীতই থেকে যায়।

১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের প্রাক্কালে একটি অন্তবর্তীকালীন আফগান সরকার গঠনে সহায়তা করে পাকিস্তান। জেনারেলরা আফগান নেতা সায়াফকে প্রেসিডেন্ট এবং হেকমতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রী করার পরামর্শ দেন। আমি তাদের পরামর্শে রাজি হইনি। আমি সেনাবাহিনীকে বললাম, 'সরকার এবং সেনাবাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি সমঝোতা হওয়া বাঞ্ছনীয়। একজন উদারপন্থি নেতাকে আমি প্রেসিডেন্ট করতে চাই এবং আপনাদের পছন্দের প্রার্থীকে আপনারা প্রধানমন্ত্রী করতে পারেন।" আমাদের প্রচেষ্টায় আফগানিস্তানের গ্রুপগুলো আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মোজাদ্দেদি এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সায়াফকে মেনে নেয়।

এই কাজ মোটেই সহজ ছিল না। একটি 'পিপলস এসেম্বিলি' করার লক্ষ্যে আফগান গ্রুপগুলোকে ঐকমত্যে আনার জন্য প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে গ্রুপগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করতে হয়েছে। আলোচনা চলাকালীন সময়ে আযান হলে সকলেই নামাজ পড়তে চলে যেতেন, আমাকে একা বসে থাকতে হতো। আমার কাছে আশ্চর্য মনে হয়েছে- তাদের সঙ্গে নামাজে আমাকে শরিক হতে দিত না- আমি মহিলা বলে। অথচ মুসলমানদের পবিত্রতম স্থান সৌদি আরবের কাবা শরিফে এমনকি মদিনায় মহানবীর মসজিদেও নারী-পুরুষ একসঙ্গে নামাজ পড়ে।

সৌদি গোয়েন্দা প্রধান প্রিন্স তুর্কি বিন ফায়সাল এবং ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হরহামেশাই পাকিস্তান সফরে আসতেন। আমি যতবারই একটি ঐকমত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি আমার গোয়েন্দা এজেন্সিগুলো আমাকে বলেছে যে, সৌদি এটা মেনে নেবে না কারণ এতে শিয়াদের অনানুপাতিক হারে প্রাধান্য বেশি দেয়া হয়েছে। অথবা ইরান এটা মেনে নেবে না কারণ এতে সুন্নীদের অনানুপাতিক হারে প্রাধান্য বেশি দেয়া হয়েছে। আফগান রাজা রোমে নির্বাসনে ছিলেন। আমি এবং আমার সহকর্মীরা তাকে একজন প্রকৃতই নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবে মনে করছিলাম কিন্তু ইরান তাকে মানতে রাজি হয়নি। আফগানের গ্রুপগুলোর সঙ্গে আলোচনায় আমি প্রচুর সময় ব্যয় করি। আমার কাছে প্রায়শই মনে হয়েছে আলোচনায় গ্রুপগুলো গোয়েন্দাদের শেখানো কথাই বলছে, কাজেই এভাবে সমঝোতা হতে পারে না। অন্যদিকে গোয়েন্দা সার্ভিস চাপ দিতে লাগল- আফগান এবং আমাদের সবাইকে আগুন নিয়ে খেলতে হচ্ছে- এটা গ্রহণীয় নয়। আফগানদের প্রতি আমার করুণা হলো। তারা যদি তাদের পরামর্শদাতাদের পরামর্শ থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে শক্তিশালী বিদেশি বাহিনীদের চাপে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনী প্রত্যাহারের পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায়

www.pathagar.com

পাকিস্তান এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন যৌথভাবে একটি রাজনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী শোভার্ডনাডজ পাকিস্তানে আসতে চান। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরাপদ এবং সম্মানজনক প্রত্যাগমনের জন্য প্রেসিডেন্ট নাজিবকে প্রয়োজনীয় সময় দেওয়ার বিষয়ে তারা পাকিস্তানের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আসতে আগ্রহী।

এতে আফগান সীমান্তে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন– পাকিস্তান সীমান্তে অবস্থানরত ত্রিশ লক্ষ আফগান শরণার্থীর সুষ্ঠু প্রত্যাগমনের সুযোগ সৃষ্টি করত- এর ফলে শরণার্থীরা নতুন করে তাদের জীবন শুরু করার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করারও সুযোগ পেত। আমি এই প্রস্তাবটি সোভেয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে আগ্রহী হই। কিন্তু সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা বিভাগ কেউই এই প্রস্তাবে আগ্রহী ছিল না। আমার গোয়েন্দা প্রধান আমাকে জানান, 'এক সপ্তাহের মধ্যে কাবুল দখল হয়ে যাবে।' প্রেসিডেন্ট নাজিবের হাত থেকে আফগান ইন্টেরিম গভার্নমেন্টের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিনিময়ে পাকিস্তানের পক্ষে দুরান্দ লাইনের স্বীকৃতির দাবি জানাই আমি। আমাকে বলা হলো, 'আমরা দুরান্দ লাইনের স্বীকৃতি চাই না। আফগানের জনগণ আমাদের মুসলমান ভাই, এবং আমাদের দুই দেশের মধ্যে কোনো সীমান্ত থাকা উচিত নয়।'

কাবুলে সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেভার্ডনাডজের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে আমি যখন চাপ দিলাম তখন আমার গোয়েন্দা প্রধান আমাকে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী, আপনার সৈন্য এবং আফগান মোজাহিদরা যে কঠিন ত্যাগ স্বীকার করেছেন তার বিনিময়ে কাবুল জয় করে সেখানে মসজিদে শুকরানা নামাজ আদায় করার অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করতে চান?' তাদের এই আবেগপূর্ণ আবেদনকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি। সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে কত অসংখ্য মানুষ প্রাণ দিয়েছে নারী ও শিশুরা কি চরম মূল্য দিয়েছে- আমি সে ভাবনায় ভাবিত হই। কাবুল দখল করে আফগান মোজাহিদ এবং আমাদের সেনাবাহিনীর জোয়ানরা তাদের চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করবে– এটা তো তাদের ন্যায্য প্রাপ্য- এবং কয়েকদিনের মধ্যেই কাবুল দখল করে তারা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করবে বলে আমাকে আশ্বাস্ত করা হয়।

কিন্তু প্রতিশ্রুত সময়ে কাবুল দখল করা গেল না। এক সপ্তাহ তো দূরের কথা একমাসেও তারা কাবুলে ঢুকতে পারেনি। তখন 'গোয়েন্দা বালক'রা আবার আমার কাছে এলো। কাবুল যুদ্ধে এআইজি বাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে যোগ দেওয়ার অনুমতির প্রত্যাশায়- আমি কঠোরভাবে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। 'তোমরা আমাকে বলেছ যে এক সপ্তাহের মধ্যে কাবুল দখল করবে, আফগানিস্তানে আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সম্পৃক্ত করতে পারি না। পাকিস্তান আর্মি সম্পৃক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আফগানরা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। এখানে পাকিস্তান আর্মির সম্পৃক্ততার প্রশ্নই ওঠে না।'

'প্রধানমন্ত্রী, আফগানরা পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের মধ্যে একটি কনফেডারেশন গঠনের চুক্তি করতে আগ্রহী। কমিউনিস্ট শাসনকে উৎখাত করতে তারা কনফেডারেশন চুক্তি অনুযায়ীই আমাদের সামরিক সাহায্যের আহ্বান জানাবে। দু'দেশের মধ্যে কোনো

www.pathagar.com

সীমানা থাকবে না।'

আফগানিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশনের প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করি। 'এতে ভারত আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপের অজুহাত পেয়ে যাবে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব এবং ইরানের সমর্থন ছাড়া আমরা আরো বড় সমস্যার সম্মুখীন হব।' আমি উত্তর দিলাম। আমার জেনারেল বলল, 'কিন্তু এআইজি একটি কনফেডারেশন চায় এবং আগামীকালই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে।'

আমি বললাম, 'আমি তা করতে পারি না।' আমি নিশ্চিত জানতাম যে, এর কারণে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। আমাদের সম্প্রসারণশীল ভূমিকায় অবশিষ্ট বিশ্ব আতঙ্কিত হয়ে উঠবে যা আমাদেরকে অস্থিতিশীল করে তুলবে।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত একটি ভয়াবহ হুঁশিয়ারি দেন- যে শীঘ্রই অস্ত্র এবং অর্থ সহায়তা বন্ধ করে দেওয়া হবে, সেই সঙ্গে শরণার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক মানবিক সাহায্য- রিলিফও বন্ধ হবে- এতে মোজাহিদরা দারুণ হতাশ হয়ে পড়ে। শরণার্থী সমস্যা ছিল বড় একটি সমস্যা কিন্তু তা সত্ত্বেও আফগান ইন্টেরিম গভার্নমেন্ট (এআইজি) এবং তাদের সেনাবাহিনীর মিত্ররা কাবুল বিজয়াভিযান থেকে পিছিয়ে আসতে রাজি ছিল না। উপরোক্ত, একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নাজিবকে উৎখাত করার প্রচেষ্টা হওয়ার পরও কাবুলে তিনি তার ক্ষমতা সুসংহত করছিলেন।

আফগান ইন্টেরিম গভার্নমেন্টকে সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বিষয়টি সেনাবাহিনীর সামরিক কর্তৃপক্ষের সামনে যৌক্তিক প্রমাণ করা এবং জনসমর্থন আদায় করা সেনাবাহিনীর জন্য জরুরি ছিল। আর তখনই 'কৌশলগত আলোচনা' (স্ট্রেটিজিক ডেপ্থ)-এর ধারণা জন্ম নেয়। কমিউনিস্ট সরকারকে উৎখাত করে এআইজিকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই যে লড়াইয়ের সীমাবদ্ধতা ছিল- নতুন এই ধারণার কারণেই সেটা পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থের পরিসীমায় নতুন করে নির্ধারিত হলো। বলা হলো আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের 'কৌশলগত আলোচনা' প্রয়োজন।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, সোভিয়েত সাম্রাজ্য এবং পশ্চিমা শরিকদের মধ্যে আফগানিস্তান সবসময়ই নিরপেক্ষতা বজায় রাখার দরুন পাকিস্তানের সঙ্গে দেশটির কখনওই গভীর কৌশলগত আলোচনা হয়নি। কিন্তু এবারও ইতিহাসকে উপেক্ষা করা হয় এবং শীঘ্রই 'কৌশলগত আলোচনা'র ধারণা সর্বত্রই প্রচারিত হলো।

১৯৮০-এর দশকে জেনারেল জিয়া যখন লৌহ মুষ্টিতে পাকিস্তান শাসন করছিল তখন সে একই সঙ্গে আমেরিকার সাথেও খেলছিল। সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের যতদিন পাকিস্তানকে (নির্দিষ্ট করে বললে আইএসআই'র সহযোগিতা) দরকার ছিল ততদিন পর্যন্ত স্বৈরাচারী জিয়াউল হককে গণতন্ত্রায়নের জন্য তারা কোনো চাপ দেয়নি। কিন্তু ১৯৮৮ সালে আফগানিস্তানে যখনই যুদ্ধের দামামা থামতে শুরু করল, তখনই আমেরিকার গণতন্ত্রায়নের প্রতি ভালোবাসা জেগে উঠল। কিন্তু ততদিনে ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়েছিল- এই ক্ষতি শুধু একা পাকিস্তানের হয়নি, এতে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত স্বার্থও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এবং বাকি আন্তর্জাতিক

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়া মওলানা মওদুদির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। মওলানা মওদুদি জামাত-ই-ইসলামের আদর্শিক দিক নির্দেশক এবং আন্তর্জাতিক মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন আফগানিস্তানে হামলা চালায় তখন জেনারেল জিয়া জামাত-ই-ইসলামির প্রতি মনোযোগী হয় এবং তাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মুসলিম ব্রাদারহুডের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। জিয়া সেনাবাহিনীর পাঠ্যক্রমে মওলানা মওদুদির পুস্তক অন্তর্ভুক্ত করেন এবং সেনাবাহিনী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উদারপন্থিদের অপসারিত করেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই আইজেএ পাকিস্তানে হেডকোয়ার্টার এবং তথাকথিত 'থিঙ্ক ট্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠার জন্য টাকার বন্যা বইয়ে দেয়। এবং শিক্ষার নামে শরণার্থী ছেলেমেয়েদের আকৃষ্ট করে চরমপন্থি স্কুল প্রতিষ্ঠায় অর্থ ব্যয় হতে লাগল। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব থেকে তহবিল সংগ্রহ কর্মসূচি শুরু করা হল। যাতে দরিদ্র এবং অভাবী মানুষের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং খাদ্যের জন্য বিশ্বাসীরা অনুদান দিতে পারে। সংগৃহীত অর্থ চরমপন্থি মাদ্রাসাগুলোতে ব্যয় করা হয়। এবং তারা দাবি করে যে শরণার্থী শিবিরের অনাথ শিশুদের শিক্ষাদান এবং ভরণ-পোষণ করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ওই মাদ্রাসাগুলোতে তারা তাদের ঘৃণিত মতবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের দীক্ষা দিতে থাকে।

আন্তর্জাতিক অনুদান যা আসত তা আইএসআই হেডকোয়ার্টারে চলে যেত। জিয়া জোর দাবি করে যে, সিআইএ এবং অন্যান্য সংস্থা ও রাষ্ট্রসমূহের প্রদত্ত অর্থ তার সামরিক জান্তা সরকারকে দিতে হবে এবং তার সরকারই মুজাহিদদের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেবে। যুক্তরাষ্ট্র বাধ্য হলো। এর ফলে পাকিস্তানের সামরিক সরকার চরমপন্থি ধর্মীয় মৌলবাদী এবং রক্তপিপাসু গ্রুপগুলোকে প্রশিক্ষণ, অর্থ এবং অস্ত্র দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করতে শুরু করে। এবং এর ফলে সিআইএও তার স্বাধীন গোয়েন্দা কার্যক্রম ছাড়তে বাধ্য হলো।

এই সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিক লক্ষ্য অর্জনে সফল হলেও এর দীর্ঘমেয়াদী পরিণতি বিশ্বকে সন্ত্রাসের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করে।

১৯৮৯ সালের জুন মাসে আমি যখন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাই তখন প্রেসিডেন্ট সিনিয়ার বুশ এবং মিসেস বুশ আমার সম্মানে হোয়াইট হাউসে রাজকীয় নৈশভোজের আয়োজন করেন– আমার ওই সফরের প্রতি অধিকাংশ মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। মার্কিন কংগ্রেসের জয়েন্ট সেশনে আমাকে যে গভীর শ্রদ্ধায় অভ্যর্থনা জানায় সেটা ছিল আমার জন্য এবং আমার দেশের জন্য দুর্লভ সম্মান। হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডাব্লিউ বুশ এবং আমার মধ্যে একান্ত বৈঠকে আমার গভীর উদ্বেগের কথা তাকে জানাই। আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের অভিন্ন উদ্দেশ্যের বিজয়ের কথা উল্লেখ করে বলেছিলাম, মোজাহিদদের মধ্যে উগ্র মৌলবাদ বিস্তারের যে কৌশলগত পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি ভবিষ্যতে তা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। আমি দুঃখের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট বুশকে বলেছিলাম, 'মি. প্রেসিডেন্ট, আমার ভয় হয়- আমরা যে দানবরূপী ফ্রাঙ্কেন্সটাইন তৈরি করেছি- ভবিষ্যতে তা আমাদের উপরেই আঘাত হানবে।'

আমি সেদিন এক করুণ পরিণতির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম। সোভিয়েত ইউনিয়নকে

www.pathagar.com

পরাস্ত করার তাৎক্ষণিক লক্ষ্য অর্জনের পর যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যায়। আফগানিস্তানে গণতন্ত্র হয়তো একটা সুযোগ পেত- কিন্তু তা টিকিয়ে রাখার জন্য সামরিক বাহিনীর অপতৎপরতার বিরুদ্ধে যে আন্তর্জাতিক সমর্থনের প্রয়োজন ছিল- তা পাওয়া যায়নি। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনী যখন চলে গেল তখন-বার্লিন প্রাচীর ভাঙার মধ্যদিয়ে ইউরোপে নাটকীয় এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তন চলছিল বিশ্বের দৃষ্টি তখন ইউরোপে নিবদ্ধ।

তারপরও সে সময়ে কিছু লোক জানতো, আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত দখলদারিত্ব শেষ হওয়ার পর পরই সেখানে চরমপন্থিদের বিরুদ্ধে আরও একটি নতুন যুদ্ধ দানা বেঁধে উঠছিল। সে সময় চরমপন্থিরা ধর্মের নামে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলছিল। মুসলিম বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মানুযের ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে চরমপন্থিরা যে বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছিল- তা অর্জনের পথে উদারপন্থি পিপিপি এবং আমাকে তারা প্রধান হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে আফগানিস্তান থেকে বিতাড়ন এবং সেই সঙ্গে পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙে পড়া চরমপন্থিদের উন্মাদিত করেছিল। তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্মে যে তারা সত্যি সত্যিই পশ্চিমাদের পরাস্ত করতে পারবে।

পশ্চিমা গোয়েন্দা প্রধানরা আমার চেয়ে আমার জেনারেলদের সঙ্গেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। আমাকে তারা দেখতেন ভিন্নভাবে, কারণ আমি একজন তুখোড় সমাজতান্ত্রিক নেতা এবং পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তির জনক জুলফিকার আলী ভুট্টোর মেয়ে। আবার, আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদারিত্বের সময় আমার দু'ভাই সেখানে আল-জুলফিকার নামের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিল।

একজন পাকিস্তানি জেনারেল, সম্ভবতঃ তিনি পশ্চিমা সমর্থক, আমাকে বলেছিলেন, 'আপনার সেনাবাহিনী সোভিয়েতকে পরাস্ত করেছে এবং আপনি আদেশ দিলে আমরা যুক্তরাষ্ট্রকেও হারাতে পারব।' আমি জেনারেলের কথা শুনে হতভম্ব হই এবং আমার এক রাষ্ট্রদূতের কাছে আমি এ কথা আলাপ করি। তিনি তখনই মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছে গিয়ে সে কথা জানান। মার্কিন রাষ্ট্রদূত তাকে বলেন, তিনি এটা কী করে বলেন, নিশ্চয়ই জেনারেল সাহেব তখন বেশি মদ খেয়েছিলেন। আমি বুঝলাম, ইসলামিক ঘারানার কারো অবস্থান নির্ধারণের জন্য পশ্চিমারা মাতাল থাকা অবস্থানকেই মাপকাঠি হিসেবে ধরে।

আমার সরকারের প্রথম সপ্তাহে আমি যখন লাহোরে যাই। সেখানে ফুলের টবে একটি বোমা পাওয়া গেল- ওই টবের পাশ কাটিয়েই আমাকে যাওয়ার কথা। জনসাধারণকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য রাস্তায় লোক নামিয়ে আমার সম্পর্কে মিথ্যে গুজব ছড়ানোর পুনঃ পুনঃ চেষ্টা চলে। পাকিস্তানের দরিদ্র মানুষ যখন খেতে পায় না তখন আমি প্যারিস থেকে দামি শিফন চাদর কিনছি– এমনই হাস্যকর অভিযোগ তারা আনতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে করাচির একটি বাজার থেকে আমি ওই চাদর কিনেছিলাম এবং দেশবাসীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ– তারা ওই সকল মিথ্যে গুজব বিশ্বাস করেনি এবং পাকিস্তানের সামাজিক ক্ষেত্রে আমি যে পরিবর্তনগুলো বাস্তবায়ন করছিলাম তাতে তারা আমাকে সমর্থন

www.pathagar.com

দিয়েছিলো।

আমার নির্বাচনের এক মাসের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ আইএসআই'র প্রধান ব্রিগেডিয়ার ইমতিয়াজ এবং তার ডেপুটি মেজর আমির আমার পক্ষ পরিত্যাগ করার জন্য আমার সাংসদদের প্ররোচিত করতে শুরু করে। সাংসদদের তারা যেয়ে বলে, 'কেউ-ই তাকে চায় না। আমেরিকা তাকে চায় না, সেনাবাহিনী তাকে চায় না এমনকি সে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামীও তাকে পরিত্যাগ করবে।'

আফগানিস্তানে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি এবং ক্ষমতা ধ্বংস ও তাদের চূড়ান্ত পরিকল্পনা-জেহাদ সফল করার কাজকে অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু আমার হাতে সরকারি ক্ষমতা থাকায় তারা তা স্বাধীনভাবে করতে পারছিল না। স্বৈরাচার জিয়াউল হকের রাজনৈতিক উত্তরসূরি নওয়াজ শরিফকে প্রধানমন্ত্রী করার প্রতিশ্রুতি দেয় আইএসআই। ইতিমধ্যে তাকে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীও করা হয়– নওয়াজ আমার সরকারকে অস্বীকার করে, আমাকে শুধু রাজধানী ইসলামাবাদভিত্তিক প্রধানমন্ত্রী করে রাখার জন্যই তিনি তা করেছিলেন- রাজধানীর বাইরে দেশের অন্যান্য প্রদেশে আমার কোনো কর্তৃত্বই যাতে না থাকে।

আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানোর জন্য আমাকে একটি নতুন 'ইন্টিলিজেন্স কোর' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমার প্রধানমন্ত্রিত্ব অব্যাহত রাখার প্রস্তাব দেয় আইএসআই প্রধান। রাষ্ট্রের সকল শীর্ষ কর্মকর্তাদের পদোন্নতির পূর্বে আইএসআই কর্তৃক তাদের পরীক্ষা করানোর পরামর্শও দেয় আমাকে। আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করি। এবং তাকে বলি, 'জেনারেল জিয়া সোভিয়েত এবং ভারতের সঙ্গে দু'টি যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছেন, এবং এ জন্য গ্রাম পর্যায়ে নতুন সেনাবাহিনী গঠনের প্রয়োজনবোধ করেননি তিনি, আমারও তার প্রয়োজন হবে না'। গোয়েন্দা প্রধান বেশ জোর দিয়ে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'আইএসআই'র সম্প্রসারণ ছাড়া এবং একজন প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় না থাকা ছাড়া দেশের উগ্রবাদীদের মোকাবেলা ও সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। আমাকে বারংবার 'সরকারের মধ্যে আরেকটি সরকার' গঠনের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল যা পাকিস্তানের প্রতিটি বিষয় এবং পরবর্তী নির্বাচনকেও আমার স্বার্থের পক্ষেই নিয়ন্ত্রণ করবে। এ প্রস্তাবও আমি প্রত্যাখ্যান করি। যাই হোক, আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর আইএসআই গোলাম মোস্তফা জাতোইকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী করেছিল– এবং তিনি তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন।

জেনারেলদের রাজনৈতিক বিরোধিতা সত্ত্বেও আমি অনেক সেনা কর্মকর্তা এবং সৈন্যদের ব্যাপক সমর্থন অর্জন করি। ১৯৮৯ সালের ২৩ মার্চ যখন জেনারেল বেগ এবং আমি আমার প্রথম মার্চ-পাস্ট-প্যারেডে গেলে– সৈন্যদের পরিবারের সদস্যরা উষ্ণ আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাতে আমার গাড়ির সামনে ভিড় করে– তাদের ভিড়ে গাড়ি থামাতে বাধ্য হয় চালক। জেনারেল বেগ- যিনি সাধারণ মানুষের অপূর্ব ভালোবাসার সঙ্গে কখন ওই পরিচিত ছিলেন না– ঘাবড়ে যান এবং প্রশ্ন করেন, 'এসব কি হচ্ছে?' আমার সামরিক সচিব তাকে উত্তর দেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে দেখে সেনা পরিবারগুলো তাদের আনন্দ প্রকাশ করছেন।' বেগ খুশি হননি। জেনারেল এবং সেনাবাহিনীর কিছু অংশের মধ্যে দু'দশক ধরে চলমান বিরোধ থাকা সত্ত্বেও আফগান জেহাদে কলুষিত, পথভ্রষ্ট মুষ্টিমেয় সেনাকর্মকর্তা– যারা

আমারও বিরোধিতা করে আসছিল- বাধার মুখেও যে শত শত সৈন্য দেশের জন্য সাহসীকতা, সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন- তাদের আমি বাছাই ও সম্মানিত করি। পাকিস্তানে মহিলা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় ওআইসি (অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কান্ট্রিস) থেকে পাকিস্তানের সদস্যপদ বাতিলের প্রচেষ্টা আমি সফলভাবে রদ করি। আমি নির্বাচিত হওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশের ধর্মীয় চিন্তাবীদরা আমার বিরুদ্ধে ফতোয়া এবং আদেশ জারি করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। আমার জন্য দুর্ভাগ্যজনক যে, একজন সুপরিচিত সৌদি ধর্মীয় আলেম, অন্ধ হলেও প্রখ্যাত শেখ বাজ একটি ফতোয়া জারি করেন- একজন একটি মুসলমান জাতিকে একজন নারী নেতৃত্ব দেবে এটা অনৈসলামিক কাজ। যাই হোক, সৌভাগ্যবশত ইয়েমেন, সিরিয়া, মিসর এবং ইরাকের তুলনামূলক ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের সমর্থন আমাকে ওই বিপদ থেকে উদ্ধার করে।

১৯৮৯ সালে তখনও ওসামা বিন লাদেন আল-কায়েদা গঠন করেননি। আমার প্রথম মেয়াদের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে পার্লামেন্টে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে লাদেন যখন টাকা ঢালেন তখন প্রথম আমি তার নাম শুনি।

১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনী চলে যাওয়ার পরই লাদেন সৌদি আরব ফিরে যান। কিন্তু আইএসআই'র উপর আমি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করায়- মে মাসে আইএসআই'র আহ্বানে লাদেন আবারও আসেন। (আইএসআই'র সঙ্গে লাদেনের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল) আইএসআই লাদেনকে আমার গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে পাকিস্তানে একটি মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্যের আহ্বান জানায়। বিন লাদেন অনাস্থা প্রস্তাবের জন্য পার্লামেন্ট সদস্যদের সমর্থন কেনার জন্য দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মোটা অঙ্কের অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

আফগানিস্তানের যুদ্ধ থেমে যাওয়ার মুহূর্তে পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিন লাদেনের আকস্মিক হস্তক্ষেপ– বিন লাদেন এবং জেহাদ সমর্থকদের লক্ষ্য সম্পর্কে পূর্ব সঙ্কেত দিয়ে আসছিল যে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র থেকে সোভিয়েত দখলদারিত্ব উচ্ছেদই শুধু তাদের লক্ষ্য ছিল না বরং তা ছিল আরো সুদূরপ্রসারী। প্রকৃতপক্ষে তাদের লক্ষ্য ছিল ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে খিলাফাতের বিকৃত রূপ হিসেবে ধর্মীয় চরমপন্থিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

মোজাহিদরা তাদের একসময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে বিরূপ হয়ে উঠছিল– তাদের মধ্যে কোনোভাবে এই ধারণাটি বদ্ধমূল হয়ে উঠে যে তারা আমেরিকাকে পরাস্ত করতে পারবে– যদিও কাবুল দখল করা তাদের জন্য ছিল অনেক কঠিন কাজ, বিদেশী সাহায্য ছাড়া ছিল অসম্ভব বিষয়। তারপরও ওই ধারণা তাদের মধ্যে কাজ করে।

সেই সময়ই আমি একটি খবর পাই যে, আমের বাক্স নিয়ে একটি সৌদি এরোপ্লেন পাকিস্তানে অবতরণ করেছে। যেহেতু সৌদি আরবে খেজুর উৎপাদন হয়, আম না, সেহেতু বিষয়টি আমাদেরকে সন্দিহান করে তোলে। বেসামরিক গোয়েন্দারা সত্য উদঘাটন করে যে বাক্সগুলোতে আম নয় টাকা এসেছে। আমি ভেবেছিলাম আমার প্রতি সৌদি বাদশাহ ফাহাদের সমর্থন রয়েছে। যখন আমি তার সঙ্গে পূর্বে দেখা করেছি– তিনি আমার বাবার প্রশংসা করেছেন এবং আমার বাবাকে বাঁচানোর কতোরকম চেষ্টা করেছিলেন সে কথা

www.pathagar.com

বারংবার আমাকে বলেছেন। তিনি আমার বাবার হত্যাকে 'অবিচার' হিসেবে বিবেচনা করেন। এবং তিনি আমাকে বলেছেন– আমার বাবা ছিলেন তার ভাইয়ের মতো– কাজেই তিনি আমাকে নিজের মেয়ের মতোই দেখেন। কাজেই আমি আমার আইনমন্ত্রীকে সৌদি আরবে পাঠাই- এটি জানার জন্য যে, বাদশাহ্ কি তার মেয়ের উপরে রুষ্ঠ, যার কারণে তিনি পাকিস্তানে বিরোধীদের কাছে টাকা পাঠাচ্ছেন। বাদশাহ্ আমার প্রতিনিধিকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, টাকা পাঠানোর সঙ্গে সৌদি সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি জানান যে, আফগানিস্তানের জেহাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু লোক তাদের ব্যক্তিগত টাকা পাঠিয়েছে। বাদশাহর একজন উপদেষ্টা অর্থের যোগানদাতা হিসেবে ওসামা বিন লাদেনকে চিহ্নিত করেন।

আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসে যাই এবং নিজেই ফোনে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের (সিনিয়র) সঙ্গে কথা বলি। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আমি জানাই যে, মোজাহিদদের সমর্থনকারী কট্টরপন্থি সেনাবাহিনী-চরমপন্থি এবং বিদেশি টাকার সাহায্যে আমার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করছে। আমি তাকে এও জানাই যে পাকিস্তানে চরমপন্থিদের অর্থ যোগানদাতা হিসেবে ওসামা বিন লাদেন নামক একজন সৌদি ব্যবসায়ীর খোঁজ পেয়েছেন সৌদি বাদশাহ ফাহাদের উপদেষ্টা।

১৯৮৯ সালের ১ নভেম্বর আইএসআই এবং বিন লাদেনের সমর্থনপুষ্ট আইজেআই আমার বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনে তাতে বারো ভোটে আমি জয়ী হই। কিন্তু এর মধ্যদিয়ে একটি সংঘর্ষে সূচনা হয় এবং নিজেদের হীনস্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে আইএসআই ও বিদেশি চরমপন্থিদের মধ্যে একটি জোট সৃষ্টি হয় যা পরবর্তী কয়েকদশকে পাকিস্তান এবং পুরো বিশ্বে প্লেগের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

একবার সামরিক হেডকোয়ার্টার পরিদর্শনের সময় সেনা প্রধান আসলাম বেগ আমাকে সামরিক বিষয়ে অবহিত করেন। সে সময়ে তিনি আমাকে প্রস্তাব দেন যে, সামরিকবাহিনী যদি কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা করে সেক্ষেত্রে 'আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা' গ্রহণে সেনাবাহিনীকে অনুমতি প্রদান করা হোক। তিনি আরো বলেন যে, ইসলামাবাদ যদি আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ভারত অধিকৃত কাশ্মিরের রাজধানী শ্রীনগর অনায়াসে দখল করতে পারবে। কারণ শ্রীনগর দখল করতে পাক সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য একলক্ষ অভিজ্ঞ মোজাহিদ যোদ্ধা প্রস্তুত রয়েছে বলেও তিনি জানান। (১৯৯০ সালে ইরাক যখন কুয়েত দখল করে তখন ওসামা বিন লাদেন একই প্রস্তাব সৌদি বাদশাহ্ ফাহাদকে দেন। আমার মতো বাদশাহ্ ফাহাদ ওই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। যার ফলে সৌদি রাজপরিবারের সঙ্গে ওসামার প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।)

জেনারেল বেগ আমাকে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী, আপনি শুধু আদেশ করুন– আপনার লোক শ্রীনগর বিজয় করে আপনার মাথায় বিজয় গৌরবের মুকুট পরিয়ে দেবে।' আমার কাছে মনে হলো সেনাপ্রধানের বাস্তব বোধবুদ্ধি সমস্তই লোপ পেয়েছে। পাকিস্তান, আফগান, আরব এবং বিভিন্ন জঙ্গি গ্রুপের মধ্যে একটি শিথিল বন্ধনে গড়ে উঠেছিল

www.pathagar.com

আফগান মুজাহিদিন– যারা আফগান জেহাদ পরিচালনা করেছে– তারাই আবার কাশ্মিরে জেহাদ করতে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে। আমি এই পরিকল্পনা নাকোচ করে দেই এবং কাশ্মির সংগ্রামে বিদেশী যোদ্ধাদের অংশগ্রহণের ব্যাপারটিও প্রত্যাখ্যান করি।

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আফগান জেহাদে লড়াইকারী জেনারেল হামিদ গুল এবং অন্যান্যদের দ্বারা সেনাপ্রধান আসলাম বেগ দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এমন ধারণা নিয়ে আমি সেনা সদর দফতর থেকে ফিরে আসি। জেহাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ওইসব সেনাকর্মকর্তাদের ত্রাণকর্তা ও কর্তৃত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছিল- তারা এটা বুঝাতে পারেন না যে সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধুমাত্র মোজাহিদদের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে পরাজিত হয়নি- বরং শক্তিশালী মার্কিন স্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্র, আন্তর্জাতিক অর্থায়ন, কূটনীতি এবং রাজনীতির কাছে তারা নতী স্বীকার করেছে। আমি সেনাবাহিনীর কল্পিত বিজয়ের তোষামুদি গল্পে বিগলিত হওয়ার পাত্র নই। আমি জানি এ ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দেবে এবং এ বিষয়ে আমি খুবই সতর্কতার সাথে সেনাবাহিনীকে বুঝিয়ে দেই যে, আমার সরকার ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানোর পক্ষপাতি নয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় গণতান্ত্রিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ খর্ব করতে জেনারেল বেগ আরো একটি প্রয়াস চালান। এবার পাকিস্তানের সমরনীতি পরিবর্তনের প্রস্তাব দেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রিসভার প্রতিরক্ষা কমিটিতে ঝড়ো আলোচনা হয়। আমার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'যুদ্ধের ব্যাপারে দেশের রাজনীতিবিদরাই সিদ্ধান্ত নেবে কারণ তারাই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি।' এই কথায় সভাকক্ষে আকস্মিক নীরবতা নেমে আসে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দেশের রাজনীতিকদের অবজ্ঞা করে প্রকাশ্যেই সেনাবাহিনী এবং জেনারেলদের কুর্ণিশ করত। আমি সেনাপ্রধান জেনারেল বেগকে আমার অফিসে চায়ের আমন্ত্রণ জানাই। আমার বক্তব্যে তিনি কি রকমভাবে সংক্ষুব্ধ হবেন তা আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি আমার সহজাত বুদ্ধিতে বুঝেছিলাম যে, মন্ত্রিসভায় প্রতিরক্ষা কমিটির সদস্যরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে– সেটা সেনাপ্রধানের মনোপুতঃ নয় এবং তিনি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও আমার ধারণা মিথ্যে হয়নি।

জেনারেলরা বার বার সাংবিধানিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাজনৈতিক উপায়ে সরকারের কার্যক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা চালায়। এসবের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের হাতে সরকার ভেঙে দেওয়ার সাংবিধানিক ক্ষমতা অর্পণ যা নির্বাচিত সরকারের মাথার উপর গ্রীক পুরাণের ডেমক্লিসের তরবারীর মতো সব সময় ঝুলে থাকে। এসব কিছুর বাইরেও ছিল পাঞ্জাবে নওয়াজ শরীফের প্রকাশ্য বিদ্রোহ। কিন্তু এরপরও আমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থতার মিথ্যা প্রচারণা চালানোর নতুন কার্যক্রম শুরু করে– যেগুলো ছিল প্রতিহিংসামূলক এবং আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে আঘাত।

আমার বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ– আমার দেশপ্রেম, পাকিস্তানের প্রতি দায়বদ্ধতা অথবা ওয়াশিংটনের প্রতি আমার বাধ্যানুগত না হওয়ার মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং আমার চরিত্র এবং আমার পরিবারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে– সম্মিলিত প্রচারণা চালানো হয়- নির্বাচনে জয়ী হওয়ার আগে থেকেই এই প্রচারণা শুরু হয়।

'ব্যক্তিসম্মান বিনষ্ট করার রাজনীতি' বর্তমানে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার আর এই

www.pathagar.com

হাতিয়ারের আবিষ্কর্তা পাকিস্তানের আইএসআই। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের রাজনীতিতে এই অস্ত্রের প্রচলন শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই আইএসআই সুপরিকল্পিত এবং পদ্ধতিগত কর্মসূচির মাধ্যমে আমাকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করে এবং আমার সরকারকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে আখ্যায়িত করে। তাদের এই ষড়যন্ত্রের মূল্য লক্ষ্য ছিল আমার ব্যবসায়ী স্বামী। এমন কৌশল একজন পুরুষ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নেওয়া হয় না।

'ব্যক্তিসম্মান বিনষ্টের রাজনীতি' উগ্রপন্থিদের ব্যবহারোপযোগী একটি শক্তিশালী অস্ত্র। যদিও সেই সময়ে এইসব অপপ্রচারের কোনো কিছুই প্রমাণীত হয়নি এমনকি আমাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগও আনা হয়নি- তারপরও জনমনে একটি নেতিবাচক ধরণার সৃষ্টি হয়েছিল। পাকিস্তানের অডিটর জেনারেল তার রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, আমার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা এবং আমাকে সরকার থেকে উৎখাত করার জন্য অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় অর্থের ব্যবহার করা হয়– তা সত্ত্বেও, এই সমস্ত ইস্যুতে আমাকে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

বছরের পর বছর বিচার হয়রানি এবং দলীয় নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করেও শান্ত হয়নি পরবর্তী স্বৈরাচারী সরকারগুলো। তারা দেশে ও বিদেশে আমার সুনাম ধ্বংস করার সব ধরনের প্রচেষ্টা চালায়। আমার স্বামী এবং আমার বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি অভিযোগও আদালতে প্রমাণীত হয়নি। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে একটার পর একটা মামলা হতে থাকে। কোনো মামলায় এক আদালতে জামিন দিলেও অন্য আদালতে তা রদ করা হয়। প্রকারান্তরে আমার স্বামী এবং আমার বেশিরভাগ সময়ই পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করার পরিবর্তে দেশের বিভিন্ন আদালতে দায়ের করা মামলায় নিজেদেরকে বেকসুর প্রমাণ করা পিছনেই ব্যয় হতো। এবং আমাদের গণতন্ত্রের জন্য লড়াই থেকে নিবৃত্ত করতেই তারা এসব করে। রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার জন্য আমাদের উপর চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছিল। অন্যথায় আইনের কুটিল ফাঁদে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হুমকির দেয়া হয়। কারণ আমাদেরকে সরাতে পারলে– সেনাবাহিনীই একমাত্র শক্তি যারা জাতীয় সরকার গঠন করতে পারে। গোয়েন্দা সংস্থা এবং তাদের চরমপন্থি সহযোগীরা কেবল আমাকে ধ্বংস করার চেষ্টাই করছিল না– পাকিস্তানে গণতন্ত্রের শিকড় বিস্তারের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল এবং গণতন্ত্র তাদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তার সেই গণতন্ত্রের শিকড় উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছিল। কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেনাবাহিনীর জন্য সব সময়ই এমনকি আধুনিক যুগেও উদ্বেগের কারণ।

পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো সবসময়ই সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর কারণে শঙ্কিত– কারণ এই আইনের মাধ্যমে সেনাবাহিনী যে কোনো সময় একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। ১৯৮৫ সাল থেকে পাকিস্তানের প্রতিটি নির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী এই আইন দ্বারা বরখাস্ত হয়েছেন– জুনেজো, নওয়াজ এবং আমি প্রত্যেকেই– 'দুর্নীতি এবং অদক্ষতার' অভিযোগে অষ্টম সংশোধনীর আওতায় ক্ষমতাচ্যুত হই– অভিযোগের সাপেক্ষে কোনো তথ্য-প্রমাণের সুযোগ ছাড়াই। ১৯৯০ সালের ৬ আগস্ট আমার সরকারকে বাতিল ঘোষণা করা হয় (কুয়েতে ইরাকি আগ্রাসনের দু'দিন পূর্বে)। যুক্তরাষ্ট্রের এবিসি নিউজের উপস্থাপক পিটার জেনিং যথার্থভাবে এই ঘটনাকে 'সংবিধানিক পোশাকে সামরিক অভ্যুত্থান' বলে উল্লেখ করেন। একটি প্রজন্মেই

www.pathagar.com

দ্বিতীয়বারের মতো আমি দেখেছি সৈন্যরা আবারও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ঘিরে ফেলেছে- ঠিক তের বছর পূর্বে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমার বাবাকে ক্ষমতাচ্যুত করার সময় যেমন হয়েছিল।

১৯৯০ সালে পাকিস্তানের নির্বাচনী প্রক্রিয়া ছিল প্রহসনমূলক। বিনা অপরাধে পাকিস্তান পিপলস পার্টির শত শত নেতাকর্মীকে কারাবন্দি করা হয়। অনেককে নির্যাতন করা হয়। কিছু সদস্য নিখোঁজ হয়ে যান এবং অন্যান্যরা নিহত হন। মিডিয়ায় আমাদের কোনো সুযোগ ছিল না। নওয়াজ শরিফের নির্বাচনী প্রচারণায় কোটি কোটি রুপি ঢালা হয়। পিপিপি'র আঞ্চলিক নেতাকর্মীদের দল ত্যাগ করানোর জন্য আইএসআই তাদের হাতে প্রচুর অর্থ দেয়। আইএসআই প্রধান জেনারেল আসাদ দুররানি পরবর্তীতে আদালতে স্বীকার করেন যে, ১৯৯০ সালের নির্বাচনে আমার বিরুদ্ধে ৬ কোটি রুপি বন্টন করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সারা দেশে চারটি প্রদেশেই আমি ব্যাপক জনসমাগম এবং তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হই। আমার নির্বাচনী প্রচারণায় পাঞ্জাবের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আমার প্রতি তাদের দৃঢ় সমর্থন পেয়েছিলাম। ভোট দানে ভোটারদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ছিল আশাব্যাঞ্জক। আমাদের অনুমান ছিল- ১৯৮৮ সালে যে ৯২টি আসনে আমরা জয়ী হয়েছিলাম এবারও ততগুলো আসনেই জয়ী হব, হয়তো আসন সংখ্যা আরো কিছু বাড়বে। ভোটগ্রহণ শেষে আন্তুর্জঅতিক মিডিয়া আমাদের অসাধারণ বিজয় এবং ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী করে কিন্তু তাদের সেই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে প্রমাণীত হয়। কারণ এটা জেনারেলদের পরিকল্পনা ছিল না। অভ্যুত্থানকারীরা গণতন্ত্রীদের পুনর্বহাল অনুমোদন করে না। ১৯৯০ সালের নির্বাচন ঘোষণার মুহূর্ত থেকেই তারা নির্বাচনে কারচুপি শুরু করে।

সরকারি মিডিয়ায় আমাদের প্রচারণা নিষিদ্ধ করা হয়। আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারণার জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করা হয়, ভোটার তালিকায় কারচুপি করা হয়, পরিচয়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সমর্থকদের বঞ্চিত করা হয়, ভোট কেন্দ্রের স্থান পরিবর্তন করা হয়, আগে থেকেই ব্যালটবাক্স বোঝাই করা হয় এবং চূড়ান্ত ও শেষ কারচুপি হয় ভোট গণনায়। মার্কিন নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা প্রথম থেকেই নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম এবং কারচুপির বিষয়গুলোকে তাদের রিপোর্টে প্রাধান্য দিয়েছিল। কমনওয়েলথ এবং সার্কের নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা ভোটগ্রহণ এবং ভোট গণনায় কারচুপির রিপোর্ট করে। কোনো অবস্থাতেই আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের কেউই ওই নির্বাচন প্রক্রিয়াকে অনুমোদন বা বৈধতা দেয়নি।

১৯৯০ সালের ২৪ অক্টোবরে পাকিস্তানে ব্যাপক নির্বাচনী কারচুপির লজ্জাজনক ঘটনা বিশ্ব অবলোকন করে। পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল, দেশের চারটি প্রদেশেই যে দলের রয়েছে শক্তিশালী রাজনৈতিক ভিত্তি- পাকিস্তানের সেই জাতীয় রাজনৈতিক পার্টি পিপিপি'কে ন্যাশনাল এসেম্বিলিতে প্রধান বিরোধী দল করে রাখারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আইএসআই, আর তারই প্রকাশ অসামঞ্জস্য নির্বাচনী ফলাফলে- পিপিপি মাত্র ৪২টি আসনে জয় লাভ করে। বিদেশি পর্যবেক্ষকরা এই ফলাফলকে প্রতারণা হিসেবে উল্লেখ করেন এবং পরিসংখ্যানকারীরা একটি বিষয়ে একমত হন যে, আইএসআই সমর্থিত পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রাপ্ত মোট ভোটের সাত থেকে তের শতাংশই জাল ভোট- যা সংখ্যায় প্রায় পঁয়ষট্টি লক্ষ! সামরিক বাহিনী নওয়াজ শরিফকে সরকার গঠনের জন্য নিস্কণ্টক পথ তৈরি করে দিয়েছিল। সরকার গঠনের জন্য ন্যাশনাল এসেম্বিলির অন্যান্য দলগুলোর সঙ্গে কোনো

www.pathagar.com

ঐকমত্যে পৌঁছানোর ঝামেলাও পোহাতে হয়নি নওয়াজ শরিফকে। প্রহসনের নির্বাচনে নওয়াজ শরিফের পিএমএল (পাকিস্তান মুসলিম লীগ) ২০৭টি আসনের মধ্যে ১০৬টি আসনে জয় লাভ করে এবং দেশের চারটি প্রাদেশিক এসেম্বিলিতেও নিজেদের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। আমি বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হই।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ন্যাশনাল এসেম্বিলিতে বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে আমি নওয়াজ শরিফের সরকারের কার্যক্রমের প্রতি চ্যালেঞ্জ করতে থাকি। ব্রিটেনের মহান গণতান্ত্রিক সংসদীয় রীতি অনুসারে- বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে সরকারি কর্মকর্তা এমনকি প্রধানমন্ত্রীর কর্মকাণ্ডের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন এবং বিতর্ক করেছি– আমার সরকারের সময় প্রতিষ্ঠিত সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কার্যক্রমগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমি আমার ক্ষমতার যথাসাধ্য প্রয়োগ করেছি। এটা ছিল খুবই কঠিন কাজ। সামাজিক ক্ষেত্রে আমি যে সকল সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম– নতুন সরকার তার অনেকগুলোই বাতিল করে দেয়। সবক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ পুনর্বহাল করা হয়। আবারো ছাত্র সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয়। মিডিয়ায় বিরোধীদলের প্রচার-বিবৃতি বন্ধ করে দেওয়া হয়। নতুন বাজেটে সামাজিক সেক্টরের উপর গুরুত্ব এবং অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে অনুন্নয়ন খাতে ব্যয় করা হয়। বিশেষ করে শিক্ষাখাতে অর্থবরাদ্দ কর্তন করাটা ছিল খুবই দুঃখজনক। আমার শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত নারী স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসহ মেয়ে ও নারীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আইএসআই আমার বিরুদ্ধে তাদের ধারবাহিক আক্রমণ চালাতেই থাকে। হুমকি এবং মিথ্যা কুৎসা রটনার বহুমুখী প্রচারণা চলতে থাকে। এমনকি একটি বিমান হাইজ্যাকের ঘটনার সঙ্গে আমাকে জড়ানোর চেষ্টা চালানো হয়। গোয়েন্দা সংস্থার একটি চক্র রাওয়ালপিণ্ডির একটি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে ভাড়াটে হাইজ্যাকার সংগ্রহ করে। ভাড়াটে হাইজ্যাকারদের আল-জুলফিকার-এর সদস্যদের কাল্পনিক পরিচয় দেওয়া হয়। আমার ভাইয়ের সংগঠনের সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা এবং বিমান অপহরণে আমার ভাই এবং আমি দু'জনকেই জড়ানোর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই তাদের ওই পরিচয় দেওয়া হয়।

১৯৯১ সালের ২৬ মার্চ, সিঙ্গাপুর বিমানবন্দর থেকে একশ' ঊনত্রিশজন যাত্রীসহ একটি সিঙ্গাপুর এয়ার লাইনার অপহৃত হয়। তাদের ওই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় কারণ ওই দিন আমি লারকানায় গিয়েছিলাম এবং সেখানেই রাত্রী যাপন করেছিলাম। বিমান ছিনতাই হওয়ার সময় আমি যখন লারকানায় অবস্থান করছিলাম- ডেপুটি কমিশনার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি আমাকে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য বাড়ির কর্মচারীদের চাপ দেন, তিনি তাদের জানান, যে, বিমান ছিনতাইকারীরা সব যাত্রীদের মেরে ফেলার জন্য হুমকি দিচ্ছে- আমার নির্দেশ ছাড়া তারা থামবে না। এটা স্পষ্ট যে, হাইজ্যাকাররা আমার নির্দেশনায় চলছিল– এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করার জন্য পরিকল্পিতভাবেই এটা করা হয়েছিল।

সৌভাগ্যবশতঃ আমার নিরাপত্তারক্ষীরা আমাকে ঘুম থেকে জাগাতে অস্বীকার করে। লারকানার জেলা প্রশাসক যখন আমার নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে আমাকে জাগানোর অনুরোধ করছিল সেই সময় সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষ ছিনতাইকৃত বিমানে অভিযান চালিয়ে ছিনতাইকারীদের হত্যা করে। সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষ নিহত ছিনতাইকারীদের ছবি প্রকাশ করলে

www.pathagar.com

নিহতদের সত্যিকারের পারিবারিক সদস্যরা তাদের মৃতদেহ দাবি করে। তখন মিডিয়া জানতে পারে যে, ঘটনাটি ছিল ভুয়া পরিচয় দিয়ে অন্য কাউকে অপরাধী করার ষড়যন্ত্র এবং এই বিমান ছিনতাইয়ের সঙ্গে আল-জুলফিকারের কোনো সম্পর্কই নেই। এটা গোয়েন্দা সংস্থার কাজ এতে কোনো সন্দেহ ছিল না– কারণ আল-জুলফিকারের সদস্য কারা এবং তাদের নামও তারা জানতো। বিমান ছিনতাইয়ের ষড়যন্ত্রে তারা হাইজ্যাকারদের পাসপোর্ট এবং বিমানের টিকেটের ব্যবস্থা করেছিল।

এক বছর পরেই ১৯৯২ সালে আমার প্রাণনাশের হামলা চালানো হয়- এবার তাদের কূটবুদ্ধিতে কিছুটা ঘাটতি ছিল। আমি যখন লারকানা থেকে বাড়ি ফিরছিলাম তখন আমার গাড়ি লক্ষ্য করে একটি রকেট ছোঁড়া হয়। কিন্তু রকেটটি আমার গাড়ির পরিবর্তে আমার সাথের পুলিশ ভ্যানে আঘাত হানে। দুঃখজনক ওই হামলায় ছয়জন পুলিশকর্মী নিহত হন।

আমার পেশাগত জীবনে বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে যে নতুন অধ্যায় আমি শুরু করেছিলাম তার প্রথমদিকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্দিষ্ট করে বললে যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতা দিতে শুরু করি। পাকিস্তানকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠাদানকারীদের একজন হিসেবে আমার মতামত প্রকাশের একটি সুযোগ পাই আমি। সেই সঙ্গে প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় সাক্ষাৎকার, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত কংগ্রেসম্যান এবং সিনেটরদের সঙ্গে, ব্রিটেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গে তদুপরি বিদেশে বসবাসরত পাকিস্তানি কমিউনিটির যারা পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করছিল- তাদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। (আমি এখনও প্রায়শই ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় বক্তৃতা করি)।

আমার ধারণা, ন্যাশনাল এসেম্বিলিতে আমার ভূমিকা এবং বিদেশে আমার বক্তৃতা ও লেখালেখি পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পশ্চাদপসরণের প্রতি সকলের মনোযোগ পুনরায় আকৃষ্ট করতে সাহায্য করে। এসবের কারণে, ন্যাশনাল এসেম্বিলিতে নওয়াজ শরিফের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও ক্রমেই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন এবং যে সেনাবাহিনী তাকে প্রধানমন্ত্রী করেছিল তাদের সঙ্গেই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। একই সময়ে বিভিন্ন মহাদেশে বেশকিছু সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শুরু হয়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রকৃতপক্ষে ১৯৯০ সালে পাকিস্তানের নির্বাচনে নওয়াজ শরিফের সরকার গঠনের সময়েই বিশ্বে সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপ যুগপৎ শুরু হয়েছিল। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ইসলাম এবং পশ্চিমা মতবাদের মধ্যে সহিংস দ্বন্দ্বের অনুঘটকে পরিণত হয়- যদিও ২০০১ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে সন্ত্রাসী হামলার পূর্বে সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে তেমন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হতো না। ইসলাম এবং পশ্চিমা মতবাদের মধ্যে এই বিরোধকে 'মানবসভ্যতার দ্বন্দ্ব' হিসেবে আখ্যায়িত করেন হার্ভার্ডের স্যামুয়েল হান্টিংটন, ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের সূচনা হয় তখনই।

রাষ্ট্রীয় শাসনভার গ্রহণের শুরুতেই নওয়াজ শরিফ সাবেক আইএসআই প্রধান ব্রিগেডিয়ার ইমতিয়াজকে বেসামরিক ফেডারেল গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। ইমতিয়াজ আইজেআই রাজনৈতিক জোট গঠনের অন্যতম নেপথ্য প্রতিষ্ঠাতা

www.pathagar.com

ছিলেন। ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি এবং চার প্রাদেশিক এ্যাসেম্বলিতে নিজের শক্ত নিয়ন্ত্রণ রাখার পরিবর্তে নওয়াজ শরিফ নিজের ক্ষমতা সংহত করার পরিকল্পনা করেন এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য শক্তিশালী বিরোধিতার উৎসগুলোকে অপসারিত করতে থাকেন। নওয়াজ শরিফ তার প্রধান দুই রাজনৈতিক প্রতিবন্ধক- প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান এবং আমাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার দায়িত্ব দেন ইমতিয়াজকে।

নওয়াজ শরিফ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম মাস থেকেই প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খানের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। সেনাপ্রধান জেনারেল আসিফ নওয়াজের হৃৎক্রিয়া বন্ধ হয়ে আকস্মিক মৃত্যুতে তার উত্তরসূরি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং বিষয়টি জনসম্মুখে ছড়িয়ে পড়ে। নওয়াজ শরিফ এবং গোলাম ইসহাক খান উভয়েই টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে পরস্পরের বিরুদ্ধে আদেশ অমান্য করার অভিযোগ করেন। এই পাল্টা-পাল্টি অভিযোগের পরেই প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান নওয়াজ শরিফের সরকারকে বাতিল করে দেন। আবারও সাংবিধানিক অভ্যুত্থান নামক আইনের প্রয়োগ হয়। নওয়াজ শরিফের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়।

নওয়াজ শরিফের ক্ষমতাচ্যুতির পর পুনরায় নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ওই নির্বাচনী প্রচারণার সময় আমার বিরুদ্ধাচারী সেনাবাহিনীর চরমপন্থি সদস্যরা আবারও সক্রিয় হয়ে উঠে। ১৯৯৩ সালে আমাকে ক্ষমতায় আসাকে প্রতিহত করতে আরও সহজ-সরল পথ বেছে নেয়। বিরোধীদেরকে টাকা-পয়সা দিয়ে আমাকে ক্ষমতা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে আইএসআই সন্তুষ্ট ছিল না। এবার তারা আমাকে দৃশ্য থেকে চূড়ান্তভাবে মুছে ফেলার পরিকল্পনা করে। তাদের স্বপ্নের খিলাফত প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতাকে চিরতরে সরিয়ে ফেলতে তারা ছিল বদ্ধপরিকর। তাই ১৯৯৩ সালে আমাকে হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয় এবং একজন পাকিস্তানি ভাড়াটে খুনিকে নিয়োগ দেওয়া হয়। আফগান জেহাদের সময় আইএসআই'র সঙ্গে জড়িত ওই ভাড়াটে খুনির নাম ছিল রামজি ইউসেফ।

আমরা সবাই জানি যে, ওই বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারিতে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে প্রথম সন্ত্রাসী হামলায় ইউসেফ জড়িত ছিল। আল-কায়দা পরিচালিত ওই প্রথম আক্রমণে টুইন টাওয়ারের একটি টাওয়ারকে অন্য টাওয়ারটির উপর পতন ঘটানোর মাধ্যমে দশ হাজার আমেরিকানকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ফেব্রুয়ারির সন্ত্রাসী হামলার পর ইউসেফ যুক্তরাষ্ট্র থেকে পালিয়ে পাকিস্তানে ফিরে আসে। তার সাত মাস পর আমাকে হত্যার জন্য তাকে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৯৩ সালে নির্বাচনী প্রচারণার সময় ইউসেফ আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে দু'টো পৃথক হামলা চালায়।

সেপ্টেম্বর মাসে ইউসেফ তার অপর দুই সহযোগীকে নিয়ে আমার বাড়ির সামনের রাস্তায় রিমোট নিয়ন্ত্রিত একটি শক্তিশালী বোমা পেতে রাখে। গ্যারেজ থেকে আমার গাড়ি বেরিয়ে আসার সময় বোমাটি বিস্ফোরণ করার পরিকল্পনা করেছিল সে। রাস্তায় বোমা পাতার সময় টহল পুলিশের একটি ভ্যান সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, পুলিশ তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে সে সেখানে কি করছে। ইউসেফ পুলিশকে জবাবে বলে যে সে তার হারিয়ে যাওয়া চাবি খুঁজছে। তার আচরণ সন্দেহজনক মনে হওয়ায় পুলিশরা তাকে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে যেতে বলে। পরে ওই রাতেই ইউসেফ তার নিজ অস্ত্র খোলার

www.pathagar.com

সময় আহত হয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গিয়েছিল। হাসপাতালের লেজারে লিপিবদ্ধ তথ্যে জানা যায় ওই রাতেই, অজ্ঞাত কোনো কারণে তার হাতের একটি আঙুল কাটা পড়ে।

অদম্য রামজি ইউসেফ এবং তার সহযোগীরা- তার চাচা খালিদ শেখ মোহাম্মদ এবং তাদের নিয়োগ কর্তাদের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনায় আমাকে হত্যার জন্য পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠে। আমরা এখন জানি যে, খালিদ শেখ পরবর্তীতে আল-কায়েদার 'সিইও' হয়েছিল এবং এও ধারণা করা হয় যে খালিদ শেখ নিজ হাতে 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' পত্রিকার ব্যুরো চিফ ডেনিয়েল পার্লের শিরোচ্ছেদ করেছিল (বর্তমানে খালিদ শেখ আমেরিকান কারাগারে বন্দি)। তারা আবারও আমাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। কিন্তু তাদের এই পরিকল্পনা ছিল আরো জটিল– পরিকল্পনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল হত্যার অভিযোগ পিপিপি'র প্রতি নির্দেশ করা এবং দলের মধ্যে বিভেদ ও আত্মকলহ সৃষ্টি করা।

আল-কায়েদা এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যৌথভাবে দ্বিতীয় হামলার নীলনকশা তৈরি করে। এমনভাবে তারা পরিকল্পনা করে যাতে মনে হয় আমার ভাই-ই আমাকে হত্যার জন্য দায়ী। করাচির নিস্তার পার্কে আয়োজিত একটি বিশাল প্রচারণা সভায় আমার অংশগ্রহণ করার সময়। খালিদ শেখ ওই দিনই পেশোয়ার থেকে আল-কায়েদার বেশ কিছু অত্যাধুনিক অস্ত্র ট্রেন যোগে রামজি ইউসেফের কাছে পাঠিয়েছিল ওই র‍্যালিতে আমাকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু তাদের ওই পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়েছিল– হায়দারাবাদে ট্রেন বিলম্বিত হওয়ায় অস্ত্রগুলো সময়মতো হত্যাকারীদের নিকট পৌঁছেনি- র‍্যালি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অস্ত্রগুলো পৌঁছেনি।

১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রামজি ইউসেফ পাকিস্তানে গ্রেফতার হওয়ার পর সে ভেবেছিল আমাকে হত্যার চেষ্টা করার কারণেই পাকিস্তানি ফেডারেল ইনভেস্টিগেটিভ তাকে গ্রেফতার করেছে। ইউসেফ কর্তৃপক্ষকে বলে, 'তিনি আমাদের নিশানার মধ্যেই ছিলেন, কিন্তু সময়মতো অস্ত্র এসে পৌঁছায়নি।' আমার নির্দেশে তাকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

১৯৯৩ সালের জাতীয় নির্বাচনে পিপিপি ন্যাশনাল এসেম্বলিতে জয়ী হয় এবং পাঞ্জাব প্রাদেশিক এসেম্বিলিতে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে- যেখানে নওয়াজ শরিফ এবং চরমপন্থিরা যৌথভাবে আমার প্রথম সরকারকে আঘাত করেছিল। ফলে ১৯৯০ সালে আমার সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম ক্যু-এর মাত্র তিন বছর পরই পিপিপি পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ফিরে আসে। আমি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হই।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয়বারের মতো পাকিস্তানের জন্য কাজ করার অসাধারণ সুযোগ পেয়ে আমি– পাকিস্তানের খেটে খাওয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উন্নয়ন এবং বিপজ্জনক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে আমার প্রতিটি মুহূর্ত উৎসর্গ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই।

দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর পাকিস্তান যে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন ছিল সেগুলো নিয়ে ভাবি। আমার দেশ সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হওয়ার উপক্রম, করাচিতে একটি সামরিক অভিযান চলছিল এবং পাকিস্তান দেউলিয়াত্বের দ্বারপ্রান্তে

www.pathagar.com

উপনীত হয়েছিল। বহুমুখী জাতীয় সঙ্কটে জর্জরিত ছিল পাকিস্তান।

যত দ্রুত সম্ভব পাকিস্তানকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য আমি আবারও দ্রুতগতিতে এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি। প্রথম মাসেই আমার সরকার একটি উচ্চাভিলাষী সোশাল একশন প্রোগ্রাম (এসএপি)-এর পরিকল্পনা করে এবং তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে– এই কর্মসূচির লক্ষ্য- শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, সেনিটেশন, অবকাঠামো নির্মাণ এবং নারী অধিকারের মতো সামাজিক খাতে দ্রুত অগ্রগতি সাধন। এসএপি কর্মসূচি মুখ্যতঃ একটি পাবলিক-প্রাইভেট যৌথ অংশিদারীত্বমূলক কার্যক্রম, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংগঠনগুলো নজিরবিহীন পরিমাণে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং কর্মসূচিটি পাকিস্তানের সম্প্রসারণশীল প্রাইভেট সেক্টর কর্তৃক ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়।

আমার নতুন সরকারের প্রথম বছরেই আমরা পুরনো রেকর্ড ভঙ্গ করে বিশ বিলিয়ন ডলার বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সমর্থ হই। বিগত চল্লিশ বছরে পাকিস্তানে এটাই এক বছরের সর্বোচ্চ বিদেশি বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের আশি শতাংশই ছিল বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে- বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণের মাধ্যমে দুরন্ত গতিতে অর্থনীতি সচল করার আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের উদ্দেশ্যেই এই বিনিয়োগ করা হয়।

আমরা স্টক এক্সচেঞ্জ বিধিমালাকে আধুনিকায়ন করি এবং স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানকে কম্পিউটারাইজড করা হয়। বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রচণ্ডরকমের দরদাম করে এশিয়ার মধ্যে আমরা সর্বনিম্ন রেটে বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ নিশ্চিত করি এবং দেশে বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম হই।

সরকারি শিল্প-কারখানা ব্যক্তিমালিকানাধীনকরণ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি শুধুমাত্র সুদ নয় আমরা বড় অঙ্কের বৈদেশিক ঋণ ফেরত দেওয়া শুরু করি এবং দেশে বিদ্যমান সুদের হার হ্রাস করি। আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে উন্নত এবং আধুনিক বিশ্বের উপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানে আমরাই প্রথম শিল্প এবং জ্বালানী খাত ব্যক্তিমালিকানাধীনকরণ করেছিলাম। আমরা অভ্যন্তরীণ ঋণ কমানোর মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নেই। অনুন্নয়নমূলক খাতে আমরা তিন বিলিয়ন রুপি পর্যন্ত ব্যয় সঙ্কোচন করি- যা ছিল সেই সময়ের রাজস্ব আয়ের এক তৃতীয়াংশ। আমাদের এই কঠিন সিদ্ধান্তগুলো পরিণামে সুফল বয়ে এনেছিল। পাকিস্তান সমৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে।

পাকিস্তানে আমার নেতৃত্বে যে শক্তিশালী ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয় তাতে পাকিস্তানে বিনিয়োগের দায় সরকার গ্রহণ করে– আমি যখন এক্সিম ব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করি তিনি আমার এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেন এবং আনন্দ প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রণালয়ের একজন চ্যান্সেলর আমাকে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন কীভাবে আমরা রাজস্ব আয় দ্বিগুণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আমার প্রধানমন্ত্রিত্বের দ্বিতীয় মেয়াদে আমি আরো অনেক অধিক সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হই, পাকিস্তানের জাতীয় প্রবৃদ্ধি তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। কৃষিক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি শূন্য থেকে সাত-এ পৌঁছায়। বিনিয়োগের ফলে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়- যা পাকিস্তানের বেকার যুবকদের জন্য জরুরি ছিল। কম্পিউটার দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য আমরা সফটওয়্যার নির্মাণ নগরী প্রতিষ্ঠা করি। এই অঞ্চলে আমরাই প্রথম দেশ-

www.pathagar.com

ইসলামাবাদে কম্পিউটার নগরী নির্মাণের জন্য একটি কোম্পানিকে আমন্ত্রণ জানাই। (দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার সরকারের পতনের কারণে সফটওয়্যার নির্মাণ নগরী প্রতিষ্ঠার কাজ বিলম্বিত হয় এবং ভারত এই সুযোগ গ্রহণ করে ব্যাঙ্গালোরে সফটওয়্যার নগরীর কাজ শুরু করে।) অনুরূপভাবে ১৯৯৭ সালে আন্তর্জাতিক নগর প্রকল্পও বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু ২০০০ সালে আরব আমিরাতের দুবাইয়ে গৃহায়ন প্রকল্প শুরু হওয়ার পর ২০০৬ সালে ইসলামাবাদের সরকার গৃহায়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করে যা আমরা এগারো বছর পূর্বে পরিকল্পনা করেছিলাম।

জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং শিশুদের উন্নততর পরিচর্যা সম্পর্কে মহিলাদের শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে আমরা এক লক্ষ মহিলার বিশাল বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করি। যার ফলশ্রুতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যায় এবং শিশু মৃত্যুর হারও হ্রাস পায়।

আমরা যখন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তখন জীবনের আশ্চর্যতম অভিজ্ঞতা হয় আমার। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, থাইরয়েড সমস্যা এবং গলগন্ড রোগ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু ধর্মীয় দলগুলো (পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর বি-টিম হিসেবে পরিচিত) বিভ্রান্তিমূলক ভুল তথ্য প্রচার করতে শুরু করে। তারা মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ করলে মানুষ বন্ধ্যা হয়ে যাবে। একটি জাতি হিসেবে প্রত্যেক সাধারণ ইস্যুকে এমনকি আমাদের শিশুদের পুষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে রাজনীতিকরণের হীন চেষ্টায় আমি মর্মাহত হই।

মহিলাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ নির্মূল করার আন্তর্জাতিক চুক্তিতে আমার সরকার স্বাক্ষর করে। মুসলিম বিশ্বের নারীদের উৎসাহীত করার জন্য আমরা মুসলিম ওম্যানস অলিম্পিকের আয়োজন করি এবং আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের আদলে মুসলিম ওম্যান'স পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন গঠন করি। আমার সরকার মহিলাদের জন্য বিশেষ পুলিশ স্টেশন প্রতিষ্ঠা করে- যেখানে মহিলারা আস্থার সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ করতে পারত এবং আমরাই প্রথম দেশের হাইকোর্টগুলোতে মহিলা বিচারক নিয়োগ দেই। মহিলা বিচারককে প্রধান করে আমরা পারিবারিক আদালত চালু করি যেখানে শিশু অধিকার এবং পারিবারিক সমস্যা সংক্রান্ত বিচারের কাজ সম্পন্ন হতো।

আমরা নাটকীয়ভাবে আমাদের স্কুল নির্মাণ এবং আধুনিকায়নের কর্মসূচিকে তরান্বিত করি, ত্রিশ হাজার নতুন বেসরকারি স্কুল নির্মিত হয় এর ফলে আমাদের দু'টি মেয়াদে মোট আটচল্লিশ হাজার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শিশুদের স্বাক্ষরতা নিশ্চিত করার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে মা'দের শিক্ষিত করা- এই ধারণায় উজ্জীবিত হয়ে আমরা মহিলাদের উদ্দেশ্যে সংশোধনমূলক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করি।

আমার মেয়ে আসিফাকে পোলিও ড্রপ দেওয়ার জন্য যখন আমার ডাক্তার আমাকে পরামর্শ দিলেন- আমি তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম- পাকিস্তানে পোলিও আক্রান্ত শিশুর হার কত। পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করা প্রতি পাঁচজন শিশুর মধ্যে একজন পোলিও আক্রান্ত- এই তথ্য জানার পর আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। আমার সরকার পাকিস্তানের প্রতিটি শিশুকে পোলিও ড্রপ খাওয়ানোর জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবী কর্মসূচি শুরু করে। আমি নিজেই ওই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেই।

পাকিস্তান থেকে পোলিও নির্মূল হলো এবং পাকিস্তানে নাটকীয়ভাবে শিশু মৃত্যুহার

www.pathagar.com

কমে যায়। স্বাস্থ্যখাতে আমার সরকারের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন আমাকে স্বর্ণপদক প্রদান করে।

আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ভুবনে আমরা পাকিস্তানের অনুপ্রবেশ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ব্যবসা এবং স্কুলে প্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুত সম্প্রসারণ করি- এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতেও কম্পিউটার শিক্ষা চালু করি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় আমার শাসনামলেই পাকিস্তানের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। উন্নয়নশীল বৈশ্বিক অর্থনীতির মূলধারার সঙ্গে পাকিস্তানকে একীভূত করাই ছিল আমাদের সকল প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সাফল্যের জন্য আমি সবসময়ই গর্ববোধ করব- আমার দ্বিতীয় দফার সরকারের শাসনামলে পাকিস্তান বিশ্বের দশম বৃহত্তম পুঁজিবাজারে পরিনত হয়। আমার প্রথম দফা শাসনামলে আমি ব্যাংকিং সুযোগ-সুবিধা উন্মুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলাম এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে বিমান যোগাযোগ চালু করেছিলাম। দ্বিতীয় দফার শাসনামলে আমরা তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করি। বিকল্প বাণিজ্যিক রুট চালু করায় তারা আমার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ঘূর্ণীবায়ুর মতো দ্রুতগতিতে আমাদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছিল একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যও আমরা কার্যক্রম চালিয়ে যাই। পাকিস্তানের পারমাণবিক প্রকল্প এবং ১৯৯২ সালে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাকিস্তানকে সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রের তালিকায় লিপিবদ্ধ করার কারণে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়- এর ফলে পাকিস্তান সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। সারা বিশ্বে পাকিস্তানের সুনামকে এই লজ্জাজনক কালিমা কলঙ্কিত করেছিল।

১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্র সফরে আমরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সিরিজ বৈঠক করি এবং ইতিবাচক আলোচনা করি। ইয়ং, স্মার্ট এবং আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন ক্লিনটন। তিনি আমার বক্তব্যের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। উদাহরণ স্বরূপ, এফ-১৬ যুদ্ধ বিমান ক্রয়ের জন্য পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রকে মূল্য শোধ করে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র বিমান এবং অর্থ দু'টোই আটকে দেয়। পরবর্তীতে ক্লিনটন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো প্রায়শই একই রকমভাবে উপস্থাপন করতেন- ঠিক যেভাবে আমরা তাকে বলেছিলাম। 'পাকিস্তান হয় বিমান পাবে না হয় তার অর্থ ফেরত পাবে' এই প্রস্তাবে তিনি সম্মতি জানান। এবং তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেন যে মার্কিন কংগ্রেসে প্রস্তাবটি উত্থাপন করবেন। তিনি বলেন, 'হয় বিমান, না হয় টাকা– এটাই সহজ এবং ন্যায়সঙ্গত দাবি।'

১৯৯৩ সালের নির্বাচনে আমি জয়ী হওয়ার এক বছর পর করাচিতে সেনাবাহিনীর নৃশংস অভিযান বন্ধ করে দেই- আমার পূর্ববর্তী সরকার আমাদের বৃহৎ নগরীর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই অভিযান চালায়– যা ব্যর্থ হয়েছিল। সন্ত্রাসীদের ধরার কাজে সরকারকে সাহায্য করার জন্য আমি মানুষের সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

মানুষ শীঘ্রই এই আহ্বানে ইতিবাচক সাড়া দেয়। আমরা সন্ত্রাসীদের অবস্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট গোপন তথ্য পেতে শুরু করি- এর ফলে ঘেরাও এবং তল্লাশি অভিযান ছাড়াই আমরা সন্ত্রাসীদের ধরতে সফল হই। উত্তরাঞ্চলের এলাকাগুলোর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য পিপিপি সেখানে পিপলস কাউন্সিল গঠন করে ওই অঞ্চলের মানুষদের

www.pathagar.com

ভোটাধিকার প্রদান করে। আদিবাসী এলাকায় আমরা রাস্তাঘাট নির্মাণ শুরু করি। সেই সঙ্গে সেখানে ট্রাইবাল কাউন্সিল গঠন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন এবং এলাকার প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাবনার সম্ভাব্যতা যাচাই করতে থাকি।

কাশ্মিরের বিদ্রোহী আন্দোলন তখন অনেক কম ছিল। সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন থাকলেও ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের তীব্রতা ছিল না। আমি জানতাম, দক্ষিণ এশিয়ায় দারিদ্র্য, রোগ-ব্যধি এবং অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। কাশ্মির ইস্যুতে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও ভারত-পাকিস্তান সংলাপ চলছিল। সাইপ্রাস কমনওয়েলথ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিক্ষিত এবং আমি ভারত-পাকিস্তান সংলাপে দু'টি পৃথক এজেন্ডায় আলোচনা করতে সম্মত হই। আলোচনার প্রথম বিষয় কাশ্মির সমস্যা এবং দ্বিতীয় বিষয় ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক। প্রথম মেয়াদে আমার সরকার সার্ক শুল্ক চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। আমাদের বাণিজ্যমন্ত্রী ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়ানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করে।

কাশ্মিরিদের ঐক্যবদ্ধ দাবি প্রকাশ করার লক্ষ্যে সর্বদলীয় হুরিয়াত কনফারেন্স গঠন করা হয়। ১৯৯৪ সালে মরক্কো ওআইসি সম্মেলন চলাকালীন হুরিয়াত কনফারেন্সের একটি যোগাযোগ গ্রুপ গঠন করা হয়। ১৯৯৭ সালের অনুষ্ঠিতব্য ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলন পাকিস্তানে করার প্রস্তাব দেই আমি- ওআইসি নেতৃবর্গ আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে আমাকে গর্বিত করেন।

যাই হোক, চরমপন্থিরা থেমে ছিল না। ১৯৯৪ সালে তারা পাকিস্তানের মহান এসেম্বিলি ভবন পুড়িয়ে ফেলতে চেষ্টা করে এবং স্কুল ছাত্রছাত্রীদের বহন করা একটি বাস অপহরণ করে। তারা মিশরীয় দূতাবাসে বোমা বিস্ফোরণ করে। ১৯৯৫ সালে রামজি ইউসেফকে গ্রেফতার এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তথাকথিত মাদ্রাসায় জঙ্গি তৎপরতার ব্যাপক তথ্য জানা যায়। মাদ্রাসাগুলোতে জঙ্গিদের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক শিক্ষা দিয়ে উত্তেজিত করা হতো এবং প্যারা-মিলিটারিরা তরুণ জঙ্গিদের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিত। মাদ্রাসাগুলোর উপর আমরা সরকারি নজরদারি, নিয়ন্ত্রণ এবং বিধি-বিধান আরোপ করি, এবং মাদ্রাসার ছাত্রদের গণিত, বিজ্ঞান এবং সাহিত্য পড়ানোর ব্যবস্থা করি। মাদ্রাসাগুলোতে ছাত্রদের মগজ ধোলাই বন্ধ করতে বাধ্য করে সরকার। হিন্দু, খ্রিস্টান, ইহুদি, শিয়া এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের হত্যা করার জন্য মাদ্রাসার ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করা হতো। পেশোয়ারের ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় আমার আদেশ মানতে অস্বীকার করায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে চরমপন্থিরা বিচলিত হয় এবং তারা তাদের মাদ্রাসাগুলোর নিবন্ধন করাতে শুরু করে। আমরা দেখেছি যে, ওই মাদ্রাসাগুলোতে ছাব্বিশটি দেশের ছাত্র পড়ত।

ছোটবেলায় আমি দেখেছি– ইসলামের বিভিন্ন মাজহাব বা সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে গভীর সৌহার্দ্য এবং সহনশীলতা ছিল। কিন্তু জিয়ার ক্যু এবং আফগানিস্তানে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জিহাদের পর একটি নতুন, ভয়ঙ্কর এবং বিভেদ সৃষ্টিকারী বৈরিতা পল্লবিত হয়ে উঠে। জেনারেল জিয়া যে বিশেষ গোষ্ঠীকে উৎসাহিত এবং প্রতিষ্ঠিত করেছে তা হলো মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বৈরিতা এবং সন্ত্রাসের দ্বারা বহুত্ববাদী ধর্মীয় চেতনার শ্বাসরোধ। এই গোষ্ঠী প্রচার করত- ইসলামিক রাষ্ট্রে একজন

www.pathagar.com

মহিলা তার জীবনসঙ্গী বেছে নিতে পারে না। যদি কেউ তা করে তাহলে তার মা-বাবা'র কর্তব্য হচ্ছে তাকে হত্যা করা। উপরোক্ত, এই চরমপন্থিদের ধর্ম বিশ্বাসের শিক্ষা হলো- তাদের ইসলামিক ভাবধারা থেকে ভিন্ন মত পোষণকারীদের অবশ্যই হত্যা করতে হবে। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের জন্ম দেয়।

এই চরমপন্থি ইসলামিক চেতনা নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যেগুলো প্রকৃতিপক্ষে মগজধোলাই কেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই নয়- শক্তিশালী হয়ে উঠে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসাগুলো প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা যেখানে পবিত্র কোরান পাঠ শেখানো হয় এবং সেই সাথে গণিত, দর্শন, আইন এবং জ্যোতিষশাস্ত্র পড়ানো হয় তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। নতুন, উগ্রবাদী মাদ্রাসাগুলো মুজাহিদিনদের মধ্যে চরমপন্থি এবং আইএসআই কর্তৃক নির্মিত হয়- তারা শুধু পশ্চিমাদের বিরুদ্ধেই আক্রমণ করত না, অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রেও তারা আক্রমণ করছিল। মোল্লা ওমরের মতো ওসামা বিন লাদেনও এই বিশেষ মতবাদের অনুসারী ছিল এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্যদের পৃষ্ঠপোষক ছিল। পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য বহুত্ববাদী ধর্মীয় চেতনার নেতৃত্বদানকারীরা উগ্র মৌলবাদে শঙ্কিত হয়ে উঠে।

জেরুযালেম বিজয়ী মুসলিম বীর সালাহউদ্দীন (সালাদ্দিন নামেও পরিচিত) এবং অবিভক্ত ভারতে মুঘল সম্রাটরা ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের যে ঐতিহাসিক নিদর্শন রেখে গেছে সেগুলোকে পদদলিত করে চরমপন্থিরা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ধর্মীয় ছদ্মবেশ ধারণ করে।

এ ধরনের আন্তর্জাতিক ইসলামিক ধর্মীয় চরমপন্থি গ্রুপগুলো লন্ডনের ডরচেস্টার হোটেলের বাইরে কিংবা অন্য যে কোনো স্থানে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি সফরে যাই- সেখানে সমবেত হয়ে আমার বিরুদ্ধে স্লোগান দিত। একবার লন্ডনে এই চরমপন্থিরা স্লোগান করে আমাকে রাতে ঘুমোতে দেয়নি। তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ইংল্যান্ডেও বড় সংখ্যায় চরমপন্থিদের উপস্থিতি রয়েছে। যেহেতু চরমপন্থিরা পশ্চিমাদের উপর আঘাত হানার গোপন বাসনা লালন করে তাই দেশের বাইরেও আমি তাদের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকতাম। পরদিন আমি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজরকে বললাম- ইংল্যান্ডের মসজিদগুলোর ব্যাপারে তার খোঁজ-খবর করা উচিত- যেখানে ইমামরা মূলতঃ যারা আফগানিস্তান মুজাহেদিনদের সমর্থন করেছিলেন- তারা পাকিস্তানি অভিবাসী এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের ব্রিটিশ পাকিস্তানিদের মধ্যে উগ্রমৌলবাদ এবং সহিংসতা প্রচার করতে পারেন। আমার মনে পড়ে তিনি আমার কথায় বোকার মতো তাকিয়েছিলেন। পাকিস্তানে চরমপন্থিদের হুমকি আমার কাছে পরিচিত এবং প্রমাণিত কারণ আমাকে প্রতিদিনই সন্ত্রাসী এবং চরমপন্থি সমস্যা নিয়ে কাজ করতে হয়। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে তখনও বিষয়টি ছিল অজানা। কিন্তু শীঘ্রই এই অবস্থার পরিবর্তন হয়।

চরমপন্থিদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে আমাকে প্রতিবন্ধক মনে করা মোটেও অযৌক্তিক ছিল না। তারা আমার বিরোধিতা করত। কারণ পাকিস্তানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করাটা ছিল তাদের প্রত্যাশা এবং আবশ্যক। সে কারণেই চরমপন্থিরা রাষ্ট্রপরিচালনায় আমাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য এবং আমার সরকারকে দুই দুইবার অপসারণের জন্য তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ

www.pathagar.com

করে এবং তাদের সকল মেধা ও দক্ষতাকে ব্যবহার করেছিল। আমি মনেপ্রাণে একটি বিষয়ে নিশ্চিত যে, পাকিস্তানের সরকারের প্রকৃতির সাথে বড় আকারের সন্ত্রাসী হামলার কোনো না কোনো যোগসূত্র রয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো- পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকারের অবর্তমানেই চরমপন্থিরা বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ সন্ত্রাসী হামলাগুলো ঘটিয়েছে। সে সময় তারা নির্বিঘ্নে এবং নিশ্চিন্তে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই প্রেক্ষিতে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে (১৯৯৩ এবং ২০০১ সালে) দু'দফা হামলা, মুম্বাই বিস্ফোরণ, ভারতীয় পার্লামেন্টে আক্রমণ, আফ্রিকায় মার্কিন দূতাবাসে হামলা এবং ইয়েমেনে মার্কিন নৌবহর ইউএসএস কোল-এ হামলা প্রভৃতি সন্ত্রাসী তৎপরতা উল্লেখযোগ্য। আমার বিশ্বাস, ১৯৯৬ সালে আমার সরকার ক্ষমতাচ্যুত না হলে, তালেবানরা ওসামা বিন লাদেনকে আফগানিস্তানে ঘাঁটি গাড়তে দিতে সক্ষম হতো না এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের তরুণদের প্রকাশ্যে দলে ভিড়িয়ে তাদেরকে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিয়ে ১৯৯৮ সালে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারতো না।

আমি দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আবারও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্রিফিং-এর জন্য জেনারেল হেডকোয়ার্টারে আমন্ত্রিত হই। মিলিটারি অপারেশনের পরিচালক মেজর জেনারেল পারভেজ মোশাররফ (যিনি পরবর্তীতে সেনাপ্রধান হন এবং ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন) আমাকে ব্রিফিং দেন।

শুধু আমার একটি নির্দেশেই কিভাবে শ্রীনগর পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে আসবে– সে কথাই আমি আরও একবার শুনলাম মোশাররফের কাছ থেকে। আমার কাছে বিষয়টি নিকট অতীতের পুনরাবৃত্তি মনে হয়েছিল। মোশাররফ তার ব্রিফিং এই বলে শেষ করেন– যুদ্ধ বন্ধ হবে এবং ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মিরের রাজধানী শ্রীনগর পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, 'তারপর কি হবে?' তিনি আমার প্রশ্নে বিস্মিত হন এবং বলেন, 'শ্রীনগর পার্লামেন্টে আমরা পাকিস্তানের পতাকা উড়াব।' আমি জেনারেলকে জিজ্ঞেস করি, 'তারপর কি হবে?' 'আপনি জাতিসংঘে যাবেন এবং তাদেরকে বলবেন- 'শ্রীনগর পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীন।'

'তারপর কি?' আমি তাকে আবারও প্রশ্ন করি। জেনারেল মোশাররফ এ ধরনের জেরার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, 'এবং ... এবং আপনি তাদেরকে নতুন ভৌগোলিক বাস্তবতা বিবেচনা করে বিশ্বের মানচিত্র পরিবর্তন করতে বলবেন।' আমি সরাসরি জেনারেল মোশাররফের চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এবং আপনি জানেন কি জাতিসংঘ আমাকে কি বলবে?' সেনাপ্রধান নিশ্চুপ বসে থাকেন এবং রুমের মধ্যে বরফ জমাট নিস্তব্ধতা নেমে আসে। এবং আমি তাকে সুনির্দিষ্টভাবে জানালাম, 'তারা আমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব পাস করবে এবং একতরফাভাবে আমাদেরকে শ্রীনগর থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানাবে– আমাদের সব প্রচেষ্টা বিফলে যাবে– অপমানিত এবং একঘরা হওয়া ছাড়া আমরা কিছুই পাব না।' এরপর আমি তৎক্ষণাৎ মিটিং শেষ করি।

আমার সরকারকে উৎখাত করতে চরমপন্থিদের প্ররোচণায় ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিগেডিয়ার মুনতাসির একটি ক্যু-এর চেষ্টা চালায়। গ্রুপটি চোরাই পথে ইসলামাবাদে অস্ত্র নিয়ে আসছিল। একটি মিটিং চলাকালীন সময় জেনারেল হেডকোয়ার্টার দখল করে

www.pathagar.com

সব জেনারেলদের হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল তারা। পরিকল্পনার পরবর্তী অংশ ছিল- নিহত জেনারেলদের নামে ছল করে আমাকে জেনারেল হেডকোয়ার্টারে আমন্ত্রণ করবে এবং আমি সেখানে গেলে তারা আমাকেও হত্যা করবে।

জেনারেল হেডকোয়ার্টার (জিএইচকিউ) দখলের জন্য আনা অস্ত্রশস্ত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে ইসলামাবাদে নিয়ে আসার পথে পুলিশবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। অস্ত্রের সঙ্গে আটককৃত গ্রুপটি নিজেদেরকে কাশ্মিরী যোদ্ধা বলে দাবি করেছিল। কিন্তু নির্বাচিত সরকারের প্রতি অনুগত স্থানীয় পুলিশ বিষয়টি আইএসআই'র মাধ্যমে তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। আইএসআই'র আভ্যন্তরীণ বিষয়ক প্রধান গ্রুপটিকে গ্রেফতার করার আদেশ দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন।

সে সময় সেনাপ্রধান ছিলেন জেনারেল ওয়াহিদ কাকার। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে আমি তাকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আমার অফিসে আসতে বলি। তিনি আমাকে ওই ব্যর্থ ক্যু-এর পুরো পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী, আপনি একজন সৌভাগ্যবান মহিলা।'

ব্যর্থ ক্যু-এর সহকারি ষড়যন্ত্রকারী মেজর জেনারেল জহির-উল ইসলাম আব্বাসীর লেখা 'জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ'টি মনোযোগ দিয়ে পড়ি। ষড়যন্ত্রকারীরা ক্যু-পরবর্তী জাতির উদ্দেশ্যে তাদের বক্তব্য পূর্বাহ্নেই লিখে রেখেছিল।

ভাষণের শুরুতেই তাদের ক্যুকে 'ইসলামিক বিপ্লব' বলে উল্লেখ করে সকল মুসলমানকে বিপ্লবের পতকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। অতঃপর সে ঘোষণা করেছে– ইসলামিক বিশ্বের মধ্যে কোনো সীমান্তরেখা থাকবে না এবং যেহেতু আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান দু'টি দেশের মানুষ ইসলামের অনুসারী তাই আমরা একই জাতি কাজেই এই দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত প্রত্যাহার করা হবে। আমার কাছে তার এই বক্তব্য নতুন ভাষায় লেখা পুরনো কনফেডারেশনের ধারণা বলেই মনে হয়। আমি নিশ্চিত, উগ্র মৌলবাদীরা আফগানিস্তান হয়ে মধ্য এশিয়া এবং তুরস্ক ও চেচনিয়ার মধ্যদিয়ে ইউরোপে ইসলাম প্রচারের পরিকল্পনা করেছিল। এটা ছিল আল-কায়েদার খিলাফত প্রতিষ্ঠার নীলনকশা। জেনারেল ওয়াহিদ কাকার আমাকে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী, আমি সামরিক আদালতে এদের বিশ্বাসঘাতকতার বিচার করব এবং ফাঁসিতে ঝোলাব।' (জেনারেল মোশাররফের আমলে ওই ষড়যন্ত্রকারীদের ছেড়ে দেওয়া হয়।)

সেনাবাহিনীতে চরমপন্থিদের অনুপ্রবেশের বিষয়টি আমাকে বিচলিত করে, আমি জেনারেল কাকারকে ১৯৯৫ সালে তার রিটায়ারমেন্টের পরেও দায়িত্ব পালন করে যেতে অনুরোধ করি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য সেনাপ্রধান পদে মেয়াদ বাড়ানোর আমার প্রস্তাবে তিনি সম্মত হননি।

একজন সাবেক আইএসআই কর্মকর্তা মেজর আমির টিএনএসএম নামক একটি জঙ্গি সংগঠন তৈরি করেন এই সংগঠন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সক্রিয় ছিল। ১৯৯৬ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মালাকান্দে এই সংগঠনটি সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। ধর্মীয় মৌলবাদী জঙ্গিরা পুলিশ স্টেশনগুলো দখল করে নেয় এবং আমার দলের একজন পার্লামেন্ট সদস্যকে হত্যা করে। আমার সরকার জঙ্গিদের কৌশলের কাছে ভীত বা বশীভূত হয়নি। আমরা জঙ্গিদের গ্রেফতার করতে সফল হই এবং মালাকান্দে আইন-শৃঙ্খলা

www.pathagar.com

পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি। একটি সংবাদপত্রের প্রকাশিত খবরে জানা যায়- ওই বিদ্রোহের পালের গোঁদা- মওলানা লিয়াকত ২০০৬ সালের ৩০ অক্টোবরে বাজৌর সংঘর্ষে নিহত হয় এবং অপর সহযোগী তার কমরেডস ইন আর্মস পালিয়ে যায়। সন্ত্রাস দমনের জন্য আমাকে যখন শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছে- তখন তার জন্য যা কিছু করণীয় আমি তা করেছি কারণ আমার জনসমর্থন ছিল। এর ফলে আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী তৎপরতা হ্রাস পায়।

১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে 'আকাউড়া ড্যাম' উদ্বোধনের জন্য আমি বেলুচিস্তান যাই। সেখানকার মানুষের পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছিলাম তা পূরণ করার জন্য ওই ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছিল। একজন সিনিয়র সাংবাদিক আমাকে জানান- তাকে আর্মি হেডকোয়ার্টারে ডাকা হয়েছিল, সেখানে সাংবাদিককে সেনাবাহিনী জানায়- সেনাবাহিনী প্রধানমন্ত্রীকে (আমাকে) অপসারণ করতে যাচ্ছে।' এবং সেই সঙ্গে সাংবাদিককে আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতির খবর লিখতে বলা হয় এবং আমার দুর্নীতির বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগের একটি ফোল্ডার দেওয়া হয় তাকে। মার্চ মাসে সেনাবাহিনীর একজন মেজর আমাকে জানান যে, আমার সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে গোয়েন্দারা অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করার পুরোদস্তুর পরিকল্পনা করেছে। একমাস পর অপর একজন সেনা কর্মকর্তা আমাকে জানায়- একটি সংবিধানিক সঙ্কট সৃষ্টি করার জন্য গোয়েন্দারা সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে একটি সমঝোতার চেষ্টা করছেন। যার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে আমার সরকারকে অপসারণ করতে পারবে। আর তার বিনিময়ে প্রধান বিচারপতিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

আমার টিম এবং আমি চিহ্নিত কিছু সেনা কর্মকর্তাকে বদলীর জন্য সেনাপ্রধান জেনারেল কারামাতকে পরামর্শ দেই- কিন্তু তিনি তা করতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং আমি যখন মিলিটারি অপারেশনের ডিরেক্টর জেনারেল জেনারেল মাহমুদের ব্যাপারে অভিযোগ করি যিনি সক্রিয়ভাবে আমার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতেন– জেনারেল কারামাত তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে নিজেই স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণের মত জানালেন।

১৯৯৫ সালের শেষে সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থার নেতৃত্বে পরিবর্তন আসে- জেনারেল কাকার সেনাপ্রধানের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে এবং তার স্থলে আইএসআই থেকে জেনারেল জাভেদ আশরাফ বদলী হয়ে আসেন- তখনই আমার দ্বিতীয় দফার সরকারের উপর মৃত্যু পরোয়ানা জারি হয়।

জেনারেল কাকারের অবসর গ্রহণের ফলে সেনাবাহিনীর কট্টরপন্থিরা আমার সরকারকে উৎখাত করার জন্য প্রেসিডেন্টকে তাদের দলে টানার সুযোগ পায় এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্টের একজন আত্মীয় আমাকে জানিয়েছিল যে, সামরিক গোয়েন্দারা তাকে একটি বার্তা প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছে দিতে বলে। ওই বার্তায় আমার সরকারকে বাতিল করার জন্য প্রেসিডেন্টকে হুমকি দিয়ে বলা হয়, 'তিনি যদি সরকার ভেঙে না দেন তাহলে সেনাবাহিনী প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী দু'জনকেই অপসারণ করবে।'

সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করার সাংবিধানিক ক্ষমতা যদি প্রেসিডেন্টের পরিবর্তে আমার হাতে থাকত তাহলে বৈধ গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের দায়ে তাদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিতাম। কিন্তু গোয়েন্দা জেনারেলদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের মতো সৎ সাহস প্রেসিডেন্টের ছিল না।

বরং সেনাবাহিনীর সমর্থনে তিনি দশ বছর প্রেসিডেন্ট থাকবেন- এই প্রলোভনে বিশ্বাস করে তিনি নিজেই নিজেকে প্রতারিত করেছিলেন। সম্ভবত গোয়েন্দারা তাকে বাধ্য করেছিল। ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে সাবেক আইএসআই প্রধান জেনারেল হামিদ গুলও সেনাপ্রধানের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি জেনারেল জাহাঙ্গির কারামাতকে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করতে প্রস্তুত কিন্তু তার সন্দেহ সেনাপ্রধান প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত। যদি তা না-ই হয় তাহলে সেনাপ্রধান প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করার জন্য প্রেসিডেন্টকে বলতেন।'

প্রেসিডেন্টের আত্মীয়কে দেওয়া জেনারেল মাহমুদের বার্তা এবং সেনাপ্রধান সম্পর্কে জেনারেল গুলের মন্তব্য এই দু'টো বিষয় থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, একটি ভাওতাবাজীর খেলা চলছিল। আমার ধারণা- একদিকে তারা আমাকে বরখাস্তত করার জন্য প্রেসিডেন্টকে এই বলে হুমকি দিচ্ছিল যে তিনি যদি তা না করেন তাহলে সেনাবাহিনী তাকে অপসারণ করবে। অন্যদিকে সেনাপ্রধানকে হুমকি দেওয়া হয় তিনি যদি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অধিক বিশ্বস্ত থাকেন তাহলে প্রেসিডেন্ট তাকে অপসারণ করতে পারেন। সেই সময় সেনাপ্রধানের নিয়োগ এবং অপসারণের ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবে প্রেসিডেন্টের হাতে ছিল।

মোশাররফের ক্যু-এর পেছনে এমআই প্রধান জেনারেল মাহমুদ ছিলেন অন্যতম প্রধান পরিচালক এবং পরবর্তীতে তিনি আইএসআই প্রধান হন। ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার পর আন্তর্জাতিক চাপে তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন।

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা যখন ক্রমেই ঘনিয়ে উঠছিল- আমার পরিবারে আরো একবার দুঃখের পাহাড় ভেঙে পড়ে। আমার বাবা সামরিক স্বৈরাচারী জিয়া-উল-হকের হাতে নিহত হয়েছিল। আমার ভাই শাহ নাওয়াজ বিষক্রিয়ায় ফ্রান্সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল এবং সেই সময় ১৯৯৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর আমার পরিবার আরো একটি হত্যায় শোকে পাথর হয়ে পড়ে। আমার ভাই মুর্তাজা করাচিতে তার বাড়ির সামনে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। আমি যেন উম্মাদগ্রস্ত হয়ে পড়ি। কারণ বেশ কয়েক বছরের রাজনৈতিক বিভেদের পর আমরা সবেমাত্র নিজেদের ঐক্য সুদৃঢ় করেছিলাম এবং আমাদের পরিবার আবার একত্রিত হয়েছিল।

ভুট্টো পরিবারের পুরুষরা এখন মৃত। আমার বাবার পরিবারে এখন শুধু আমাদের মা নুসরাত, আমার বোন সনম এবং আমিই বেঁচে আছি। মুর্তাজার হত্যার পর আমার মা আলঝেইমারে আক্রান্ত হন- আক্ষরিক অর্থেই তিনি তার বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেন।

আমার সন্দেহ হয়েছিল- আমার সরকারকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্রের একটি অংশ ছিল মুর্তাজা হত্যাকাণ্ড।

মুর্তাজার মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পর আমি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে যাই। আমার মা'কেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, কারণ তাকে অসুস্থ্য অবস্থায় আমি রেখে যেতে পারিনি। সেই সময় আমরা পুরো পরিবার গভীর শোকে আচ্ছন্ন ছিলাম- নিউইয়র্কের ওই সফর আমার জন্য খুবই কষ্টকর এবং বেদনাদায়ক ছিল- আমার

www.pathagar.com

সরকারের অত্যাসন্ন বরখাস্তের গুজব ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল, আমার ভাই মৃত এবং আমার মা'য়ের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছিল- আমার কাঁধে যেন পুরো পৃথিবীর বোঝা চেপে বসেছিল। তা সত্ত্বেও আমি সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেই এবং পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোরালো বক্তব্য তুলে ধরি এবং সেই সঙ্গে পাকিস্তানে এবং কাশ্মিরে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ব দরবারে আহ্বান জানাই। আমার ভগ্নহৃদয়- বক্তৃতায় আমার কোনো আগ্রহ ছিল না।

নিউইয়র্ক থেকে আমরা ফিরে আসার পর জানতে পারি জেনারেল গুল ব্যক্তিগতভাবে আমার টেলিফোনে আড়ি পেতেছেন। ইসলামাবাদে প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি এবং বিরোধীদলের প্রতিনিধির মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি গোপন মিটিং-এর উপর রিপোর্ট চেয়ে প্রতিরক্ষা সচিবের কাছে আমি ফোন করেছিলাম। আমার ফোন শেষ হওয়ামাত্র জেনারেল গুল প্রতিরক্ষা সচিবকে ফোন করে বলে, 'প্রধানমন্ত্রী তাহলে জানতে চান-মিটিং-এ কি ঘটছে, হা-হা-হা।'

এর কয়েকদিন পর, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের রাজনৈতিক উত্তেজনার আড়ালে ১৯৯৬ সালের ৪ নভেম্বর, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের রাতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আমার সরকারকে বরখাস্ত করেন। আবারো 'দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার'-এর গতানুগতিক অভিযোগ এনে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর খড়্গ হানা হলো। আমাকে বরখাস্ত করে অপমান করেই তিনি খ্যান্ত হননি- এই অপমানকে যন্ত্রণাদায়ক এবং পীড়িত করার জন্য আমার ভাইয়ের হত্যার অভিযোগে আমার স্বামীকে গ্রেফতার করেন– একটি বিদ্বেষপূর্ণ, ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা অভিযোগ। (১৯৯৭ সালে সুপ্রিম কোর্টের একটি জুডিশিয়াল ট্রাইব্যুনাল আমার স্বামীকে ওই অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়।)

সেনাবাহিনীর কট্টরপন্থিরা ন্যাশনাল একাউন্টিবিলিটি ব্যুরো নামের একটি সংগঠন তৈরি করে। সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যারা জিয়ার আমল থেকে পিপিপি'র বিরোধিতা করে আসছিল তাদেরকে আমার পরিবার এবং দলের বিরুদ্ধে মিথ্যা, ষড়যন্ত্রমূলক মামলা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। দেশে সন্ত্রাসের পাগলা ঘোড়াকে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। আমার সরকারের সময়কার কর্মকর্তাদের রাতের আঁধারে গ্রেফতার করা হয়। রাত-দুপুরে বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বাড়ির লোকজনদের আতঙ্কিত এবং হয়রানী করে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

অধিকাংশ পাকিস্তানি নিশ্চিতভাবে জানতো যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু আমার স্বামীকে ষড়যন্ত্রকারীরা দুর্নীতি, অপহরণ থেকে শুরু করে হত্যার অভিযোগে মাকড়সার জালের মতো মামলার জালে আটকে ফেলে। যার ফলে, কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই তাকে পরবর্তী আট বছর কারারুদ্ধ থাকতে হয়।

আল্লাহ জানে, তার একটাই অপরাধ- তিনি আমার স্বামী।

আমার সরকারকে বাতিল ঘোষণা করার পর প্রেসিডেন্ট 'জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা কাউন্সিল' গঠনের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন- এটা স্মরণ করাও কষ্টদায়ক। এই কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে ক্ষমতার ভাগীদার করা হয়। প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, ক্যাবিনেট মন্ত্রী, সশস্ত্র বাহিনীর চেয়ারম্যান এবং তিন আর্মড সার্ভিসের প্রধানদের সমন্বয়ে জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠিত হয়।

www.pathagar.com

এই কাউন্সিল পাকিস্তানে সেনাবাহিনীকে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার বৈধতা দেয়- যার জন্য তারা দীর্ঘদিন যাবৎ চেষ্টা চালিয়ে আসছিল এবং আমি সবসময়ই তাতে বাধা দিয়েছি।

নওয়াজ শরিফের দল ব্যতীত পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দল পাকিস্তানের রাষ্ট্র পরিচালনায় সেনাবাহিনীর এ ধরনের সক্রিয় হস্তক্ষেপের কঠোর বিরোধিতা করে। পাকিস্তানের নতুন ব্যবস্থাপনার প্রিয়পাত্র ঢাকের কাঠি নওয়াজই একমাত্র রাজনৈতিক নেতা যিনি সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বাধীন কাউন্সিলকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তার এই সমর্থন ১৯৯৭ সালের নির্বাচনের পূর্ব নির্ধারিত ফলাফলের পূর্বাভাস প্রকাশ করেছিল।

আমার ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডও আমার সরকারকে পরিকল্পিতভাবে উচ্ছেদের একটি ইঙ্গিত ছিল- তাকে হত্যার কয়েকদিনের মধ্যেই অশুভ কালোছায়া হয়ে তালেবানরা কাবুলে ঢুকে পড়ে আফগান সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দখল করে এবং দেশটির মানুষের উপর তাদের একনায়কতান্ত্রিক জুলুম-নির্যাতন বিস্তার করে।

'স্ট্রেটিজিক ডেপথ'-এর ধারণা আবরো মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, আইএসআই'র কট্টরপন্থিরা তাদের তালেবানি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাধা- আমাকে অপসারণের পর আফগানিস্তানের উগ্রপন্থি তালেবান শরিকদের জন্য অন্যান্য সব প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে দেয়। পরবর্তী বছরগুলোতে তাদের এই তালেবানি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপক কার্যক্রম চলতে থাকে।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনী প্রক্রিয়া ১৯৯০ সালের চেয়েও বেশি অনিয়ম, দুর্নীতি এবং কারচুপিপূর্ণ ছিল। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আমার দলকে পার্লামেন্টের ২০৭টি আসনের মধ্যে মাত্র ১৮টিতে জয়ী করানো হয় এবং নওয়াজ শরিফের দলকে ১৩৭টি আসনে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। পুনর্বার আমি বিরোধী বেঞ্চে থেকে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মনস্থির করি।

যা হোক, নওয়াজ শরিফ শেষ পর্যন্ত সংবিধানের কুখ্যাত অষ্টম সংশোধনী অর্থাৎ পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার প্রেসিডেন্সিয়াল ক্ষমতা রদ করার সিদ্ধান্ত নেন। সংবিধানের এই কালো অধ্যায় যুগ যুগ ধরে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করে আসছিল। নওয়াজ শরিফের এই সংবিধান সংশোধনের সিদ্ধান্তকে সকল বিরোধিতার উর্ধ্বে গিয়ে পিপিপি সমর্থন দেয়। যদিও নওয়াজ শরিফ নিজেকে রক্ষা করার জন্যই এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা সত্ত্বেও সরকারের স্থিতিশীলতার স্বার্থেই পিপিপি এই আইন নির্মূল করতে সমর্থন জানায়।

কিন্তু নওয়াজ শরিফের অধিকাংশ সামাজিক এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল বিতর্কিত। পাকিস্তান উল্টো পথে চলছিল। নওয়াজ শরিফ তার 'ইসলামিকরণ' বিলকে সাংবিধানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এবং তিনি প্রকাশ্যে তালেবান ব্যবস্থার প্রশংসা করেন এবং পাকিস্তানকেও অনুরূপ ব্যবস্থায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। বিরোধীরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে যে, তিনি মোল্লা ওমরের মতো 'আমির-উল-মোমেনিন'- বিশ্বাসীদের রাজা হওয়ার চেষ্টা করছেন।

১৯৯৬ সালের ৪ নভেম্বর, আমার সরকার অপসারিত হওয়ার পর, আফগানিস্তানে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সরকার গঠনের জন্য জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধির সহযোগিতায় আমরা যে আফগান চুক্তি করেছিলাম এখন তালেবানরা তাতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি

www.pathagar.com

জানায়। ৭ নভেম্বর ওই চুক্তি স্বাক্ষর করার কথা ছিল কিন্তু সরকার পতনের কারণে তা নির্ধারিত তারিখে স্বাক্ষরিত হয়নি। নওয়াজের অধীনে তালেবানদের রঙ-রূপ বদলে যায়। তারা ইরানীয় কূটনীতিককে হত্যা করে এবং ১৯৯৮ সালে ওসামা বিন লাদেনকে আফগানিস্তান থেকে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অনুমতি দেয়। তালেবানরা আফগান জাতীয় সরকারের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ক্রীড়ানকে রূপান্তরিত হয়। আফগান ভূখণ্ড থেকে অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা পরিচালিত হতে থাকে।

বিরোধীদলের নেত্রী হিসেবে আমি পার্লামেন্টে এই মর্মে আহ্বান জানাই যে, আফগান তালেবান সরকার সুষ্ঠু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হোক। আমি এ বিষয়েও সতর্ক করি যে, 'স্ট্রেটিজিক ডেপ্‌থ' মতবাদ পাকিস্তানের জন্য 'স্ট্রেটিজিক থ্রেট' হয়ে দাঁড়াবে।

পাকিস্তানে ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও নওয়াজ শরিফ ধর্মের নামে দেশকে ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য আইনগত পন্থা খুঁজছিলেন। আমার পার্টি নওয়াজ শরিফকে নিরস্ত করতে সিনেটে তাদের পূর্ণ পার্লামেন্টারি শক্তি প্রয়োগ করে। আমি আবারো পাকিস্তানের গণতন্ত্র মুক্তির বার্তা বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠি।

আমার বিরুদ্ধে যখন গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয় তখন সৌভাগ্যবশতঃ আমি দেশের বাইরে বক্তৃতা করছিলাম। আমার ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি আরব আমিরাতের দুবাইয়ে চলে যাই- তখন থেকে এ পর্যন্ত আমরা নির্বাসিত জীবন যাপন করছি।

আমরা জানি যে, 'সূর্যের নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতি ঘুরেফিরেই একইভাবে বদলায়'। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এ কথা সত্য প্রমাণীত হয়েছে। শুধু জর্জ অরওয়েলের উপন্যাস 'নাইনটিন এইটি ফোর'-এর পাত্রপাত্রীর মতো বন্ধু, শরিক ও শত্রুর পরিবর্তন হয়েছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং আইএসআই'র সঙ্গে নওয়াজ শরিফের গাঁটছড়া বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারগিল যুদ্ধ নিয়ে সরকার এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে বাকযুদ্ধ শুরু হয়। কারগিল যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ের জন্য পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকে।

কারগিল যুদ্ধে ভারত-পাকিস্তান উভয়ই পারমাণবিক আক্রমণ চালানোর মতো ভয়ঙ্কর অবস্থানে উপনীত হয়েছিল। আর এই কারগিল যুদ্ধই পরিণামে নওয়াজ শরিফের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ডেকে এনেছিল। হিমালয় পর্বতমালার একটি কৌশলগত আউটপোস্ট কারগিল। সেখান থেকে কাশ্মির উপত্যকার একটি অংশের উপর সামরিক নজরদারী করা হয়। শীতকালে ওই এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়ে। বসন্তে আবার ভারত ও পাকিস্তানি সৈন্যরা কারগিলে নিজ নিজ অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু সেবার কাশ্মিরি মোজাহিদিনরা ভারতীয় সৈন্যদের অনুপস্থিতিতে তাদের সেনাচৌকি দখল করে নেয়, আর কারগিলযুদ্ধের সূত্রপাত সেখান থেকেই।

কারগিলযুদ্ধ যখন ব্যাপক ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল- নওয়াজ শরিফ তখন যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ওয়াশিংটন ছুটে যান সাহায্যের প্রত্যাশায়। সাহায্যের পরিবর্তে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের নিকট তিনি প্রকাশ্যে কঠোরভাবে তিরস্কৃত হন এবং কারগিল থেকে অবিলম্বে পাকিস্তানি সৈন্য প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন

www.pathagar.com

ক্লিনটন। কোনোরকম সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়াই নওয়াজ প্রশাসন তাড়াহুড়ো করে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। এর ফলে ভারতীয় সৈন্যরা তাদের বিজয় নিশ্চিত করে এবং অসংখ্য পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত আমার একজন বন্ধু আমাকে জানিয়েছিল যে, কারগিলযুদ্ধে ব্যাপক পাকিস্তানি সৈন্যের হতাহতের খবর ধামাচাপা দেওয়ার জন্য অধিকাংশ নিহত সৈন্যের মৃতদেহগুলো বরফের গুহায় লুকিয়ে রাখা হয় এবং অল্পসংখ্যক মৃতদেহ জনসম্মুখে আনা হয়।

প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ যখন দাবি করলেন যে, মোজাহিদিনদের ভারতীয় সেনা চৌকি দখল করার বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না এবং তাকে কিছু জানানো হয়নি- তখনই সেনাবাহিনীর সঙ্গে পারস্পরিক দোষারোপের খেলা শুরু হয়। জেনারেলরা পাল্টা বিবৃতি দেন যে, প্রধানমন্ত্রীকে সবকিছুই জানানো হয়েছে এবং এতে তার সমর্থনও ছিল। কারগিল অভিযানে নিহত পাকিস্তানি সৈন্যদের দায়-দায়িত্ব বহনের জন্য নওয়াজ শরিফের উপর চাপ দেওয়া হয় এবং তার সমর্থনেই সৈন্যরা কারগিল অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল- এই বিবৃতি দিতে তাকে বাধ্য করা হয়। প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাপ্রধান পারভেজ মোশাররফের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ সৃষ্টি হয়। তাদের বিরোধ রক্তপাতের পর্যায়ে পৌঁছাবে এবং যে কোনো একজন জয়ী হবে- এটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

১৯৯৯ সালের ১২ অক্টোবর বিদেশ সফর শেষে মোশাররফ যখন দেশে ফিরে আসছিলেন তখন নওয়াজ শরিফ তাকে বরখাস্ত করেন। নওয়াজ তার বিমানকে পাকিস্তানে অবতরণে বাধা দেন, যার ফলশ্রুতিতে সেনাবাহিনী করাচি বিমানবন্দর দখল করে মোশাররফের প্রাণ রক্ষা করে। মোশাররফের বিমানের জ্বালানি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল এবং যে কানো মুহূর্তে বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। মোশাররফ তৎক্ষণাৎ সামরিক শাসন জারি করেন, প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেফতার করে ন্যাশনাল এসেম্বিলি বিলোপ করেন। এবার সাংবিধানিক অজুহাতে কোনো ভণ্ডামি করা হয়নি- এটি ছিল গতানুগতিক প্রক্রিয়ার প্রকাশ্য সামরিক অভ্যুত্থান।

মোশাররফ গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিলেও তিনি তা করেননি। জেনারেল জিয়ার পদাঙ্কের হুবহু অনুকরণ করেন মোশাররফ। তিনিও ইসলামের নামে জনমত গঠনের সিদ্ধান্ত নেন এবং নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন। মোশাররফ, প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য গণভোট করেন। যদিও দেশি-বিদেশি সকল পর্যবেক্ষকরা একবাক্যে বলেন যে, গণভোটে অত্যন্ত অল্পসংখ্যক ভোটাররা অংশ নিয়েছে কিন্তু মোশাররফ ঘোষণা করেন ৭০ শতাংশ পাকিস্তানি গণভোটে ভোট দিয়েছেন এবং মোট ভোটের ৯৮ শতাংশ তার পক্ষে পড়েছে। মোশাররফের সরকার গণতন্ত্র অপেক্ষা অনেক বেশি আমলাতান্ত্রিক সরকার ছিল, কিন্তু আন্তর্জাতিক মহল ইসলামিক সন্ত্রাসের ক্রমবর্ধমান আতঙ্কে ভীত হয়ে একজন অন্ধকেই তাদের শরীক হিসেবে বেছে নেয়।

প্রহসনের গণভোটের ধারাবাহিকতায় ব্যাপক কারচুপির পার্লামেন্টারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে আমাকে বিরত রাখার জন্য বেশ কয়েকবার মোশাররফ আমাকে হুমকি দেন। কিন্তু পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ যারা সবসময় আমার পাশে দাঁড়িয়েছে তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি রাখতে আমি দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলাম। আমি স্বেচ্ছায় নির্বাচন থেকে সরে না দাঁড়ানোর কারণে আমাকে পার্লামেন্ট নির্বাচনে অবৈধভাবে অযোগ্য

www.pathagar.com

ঘোষণা করার জন্য একের পর এক অধ্যাদেশ জারি করা হয়। (২০০৬ সালে প্রকাশিত আত্মজীবনীতে মোশাররফ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, আমাকে পুনর্বার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পথরুদ্ধ করার জন্যই তিনি কিছু আইন করেন।) নির্বাচনে অংশগ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞাকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করি- ২০০২ সালের নির্বাচনের পরও ওই চ্যালেঞ্জ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

আমার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ আমার এবং আমার দলের পক্ষে থেকেছে। আমাদের পক্ষে বিপুলসংখ্যক ভোট পড়েছে। যা হোক, পিপিপি'র মনোনয়নে জয়লাভ করা কয়েকজন পার্লামেন্টিরিয়ান গোয়েন্দাদের চাপে এবং অর্থলোভে বিক্রি হয়ে যায়। হঠাৎ করেই তাদের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয় এবং তারা পুরস্কৃত হয়। তারা মন্ত্রিত্বপ্রাপ্ত হয়। আমার পার্টির শক্তি খর্ব হয়। আইএসআই প্রধান নির্বাচিত পার্লামেন্টেরিয়ানদের ইসলামাবাদে আইএসআই সদর দফতরে ডেকে পাঠান। আইএসআই প্রধান যখন তার চেয়ারে বসেন তখন তাদের মনোনীত প্রধানমন্ত্রী মি. জামালি তার পেছনে একটি চেয়ারে বসেন। জামালিকে ভোট দেওয়ার জন্য পার্লামেন্টেরিয়ানদের আদেশ দেওয়া হয়- এভাবেই তিনি বৈধ 'নির্বাচিত' প্রধানমন্ত্রী হলেন।

আমার স্বামী বিনা বিচারে ছয় বছর কারাবন্দি, তা সত্ত্বেও নির্বাচন থেকে আমাকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ানোর জন্য মোশাররফ যে দাবি করেন- তা প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্তে তিনি বিশেষভাবে অনড় ছিলেন। এটা আমার জন্য সত্যিই উল্লেখযোগ্য এবং গর্বের বিষয়। আমার স্বামী দু'বছরেরও বেশি সময় মোশাররফের কারাগারে অন্তরীণ এবং মুমূর্ষু প্রায়, কিন্তু আমরা দুর্বল হয়নি, তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করিনি।

পাকিস্তানে তিন দশকের মধ্যে ন্যাশনাল এসেম্বিলির কোনো নির্বাচনেই ইসলামিক দলগুলো ১৩ শতাংশের বেশি ভোট পায়নি। কিন্তু নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে সন্ত্রাসী হামলার এক বছর পরই ২০০২ সালের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের প্রাদেশিক এসেম্বিলির নিয়ন্ত্রণ উগ্রপন্থি ইসলামিক পার্টিগুলোর জোটের হাতে চলে যায়। এই জোটের নাম হয় এমএমএ (মুত্তাহিদা মজলিশে-ই-আমল)। তবে পাকিস্তানের বেশিরভাগ মানুষই একে 'মোল্লা-মিলিটারি এলায়েন্স' বলে উল্লেখ করে। জামাত-ই-ইসলাম, জামাত-উল উলামা-ই-ইসলাম, জামাতুল-উলামা-ই-ইপাকিস্তান এবং ইসলামিক আন্দোলন প্রভৃতি সংগঠনের সমন্বয়ে এই জোট গঠিত হয়। এই দলগুলো পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলোতে সব সময় অতি নগণ্য ভোট পেয়ে থাকলেও হঠাৎ করেই তারা দুটো প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এবং অবিশ্বাস্যরকমভাবে ন্যাশনাল এসেম্বিলিতি তারা ৬৩টি আসনে জয়লাভ করে।

তথাকথিত 'নির্বাচনী ফলাফল' ঘোষণার ধরণ লক্ষ্য করে এবং মোশাররফের প্রথম নির্বাচনী কারচুপিতে সূক্ষ্মতার অভাব দেখে আমি হতবাক না হয়ে পারিনি। নির্বাচন ফলাফল দেখে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, ইসলামিপন্থিদের খুশি করারই চেষ্টা করছিলেন মোশাররফ এবং পশ্চিমাদের প্রতি ভ্রান্ত ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। মোশাররফ মূলতঃ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন যে, পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র মৌলবাদীদের হস্তগত হওয়ার পথে তিনিই একমাত্র বাধা অর্থাৎ তিনি ব্যতীত আর কেউই পারমাণবিক অস্ত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে না।

www.pathagar.com

পাকিস্তানি চিন্তাবিদ হুসেইন হাক্কানি মোশাররফের এই অজুহাতের মোক্ষম জবাব দিয়েছিলেন তার লেখায়- রাজনৈতিক সরকারগুলোকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বিগত দশকগুলোর ইসলামপন্থিদের মাঠে নামানো হয়েছিলো আর এখন সামরিক জেনারেলরাও ক্ষমতার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরো বেশি আনুকূল্য ও সাহায্য পাওয়ার জন্য তাদেরই সৃষ্ট মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আরও অনেক কিছুই পুনর্বার সামরিক স্বৈরাচারের কবলে বিপর্যস্ত হয়।

১৯৯৫ সালে আমার শাসনামলে যখন রামজি ইউসেফ গ্রেফতার হয়- তার কাছে মার্কিন বাণিজ্যিক বিমান অপহরণ করে সেগুলোকে বিভিন্ন স্থাপনায় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার ধ্বংসাত্মক পরিকল্পিনার কথা জানা যায়। একই দিনে ব্যাপক সন্ত্রাসী হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে আল-কায়েদাও প্রশান্ত মহাসাগরের ওপার থেকে বেশকিছু বাণিজ্যিক জেট বিমান ছিনতাই করার পরিকল্পনা করেছিল। এটাই স্বাভাবিক- নতুন প্রজন্মের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীরা বাসে আত্মঘাতী বোমা হামলা কিংবা চিহ্নিত হত্যাকাণ্ডের মতো পুরনো ধাঁচের কৌশল ব্যবহার করবে না। এরা গণহত্যাকারী। যতটা ব্যাপকহারে সম্ভব রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটানোই তাদের কৌশল।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলায় আমি হতবাক এবং মর্মাহত হই, কিন্তু আল-কায়েদা এ ধরনের ব্যাপক হামলা চালানোর চেষ্টা করবে এ বিষয়ে চমকিত হইনি, তবে তারা সেটা করতে সফল হয়েছে এতে বিস্মিত হয়েছি। ধর্মকে রাজনীতিকায়নের সবচেয়ে নিকৃষ্ট উদাহরণ ছিল এই ঘটনা। আল-কায়েদা এবং তার শরিকরা ইসলামের মূল্যবোধকে এমনভাবে অপহরণ করেছে যেভাবে তারা মার্কিন বিমান ছিনতাই করেছে, লন্ডন এবং মাদ্রিদের ট্রেনে নিরীহ মানুষের উপর তারা যেভাবে বোমা হামলা চালিয়েছে। ১৯৮০-এর দশকে সামরিক স্বৈরশাসক রাজনীতি এবং ধর্মকে নিজেদের ক্ষমতার স্বার্থে ব্যবহার করেছে এবং বর্তমানে নতুন শতাব্দীতে আল-কায়েদা এই কৌশল ব্যবহার করছে।

নিরীহ মানুষ হত্যার ব্যাপারে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে কিন্তু এই সকল রাজনৈতিক চরমপন্থিরা সেই নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা করে না। তাদের এই তৎপরতা ধর্মীয় আদর্শ ভিত্তিক নয় বরং মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই তাদের লক্ষ্য যার মাধ্যমে তারা একচ্ছত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করে তাদের দীর্ঘদিনের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে চায়।

নিউইয়র্কের টুইনটাওয়ার ধ্বংসের দৃশ্য দেখে সেখানকার হাজার হাজার মানুষের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর ভাবনা আমাকে ব্যথিত করেছে- কোনো মৃত্যুই এরচেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে না। হার্ভার্ড এবং অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করায় যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনকে আমি আমার দ্বিতীয় জন্মভূমি হিসেবেই বিবেচনা করি। ২০০৫ সালের ৭ জুলাই লন্ডনে আরো একটি মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করি, পুনর্বার আমার হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হলো। এই সন্ত্রাসী ঘটনাগুলোর সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপারটি হলো- ইসলামের নামে এগুলো করা হয়েছে এবং প্রায়শই এই ঘটনাগুলোর সাথে আমার জন্মভূমি পাকিস্তানের

www.pathagar.com

সরাসরি সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়। বিশ্লেষকরা আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন, 'কেন পাকিস্তানের এই সম্পৃক্ততা?' 'প্রতিটি সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্রের পেছনে কেন চট করেই পাকিস্তানের নাম আসে?' পশ্চিমা এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত সন্ত্রাসী হামলা এবং ওই হামলা ষড়যন্ত্রের প্যাটার্নের যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তা উদ্বেগজনক। দুঃখজনক হলেও সন্ত্রাসী হামলার এই ধরণ আমার কাছে যৌক্তিক মনে হয়েছে, কারণ পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনাকে দেশটির সামরিক জান্তারা যেভাবে বিনষ্ট করেছে এবং পশ্চিমারা সামরিক স্বৈরশাসকদের তা করতে সুযোগ দিয়েছে– অন্তত যতদিন তারা পশ্চিমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণে সমর্থন জুগিয়েছে– কিন্তু পশ্চিমারা এই চর্চার পরিণামের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেনি।

স্বৈরশাসকদের সঙ্গে এই খেলার পরিণাম আবারো পাওয়া গেল কিন্তু এবারের বিপর্যয় ছিল অকল্পনীয়।

১৯৭০-এর শেষ থেকে পুরো '৮০-এর দশকে পশ্চিমারা সামরিক স্বৈরশাসক জিয়া-উল-হককে পরম যত্নে লালন-পালন করেছে- যতদিন পর্যন্ত জিয়া আফগানিস্তানে আইএসআইকে সিআইএ'র ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ দেয়। আইএসআই-সিআইএ মোজাহেদিনদের হাতে শুধু আধুনিক অস্ত্র এবং প্রযুক্তিই এনে দেয়নি। তারা আমার জন্মভূমিকে, একটি শান্তিপ্রিয় দেশকে কালাশনিকভ; হেরোইন সমৃদ্ধ এবং উগ্রপন্থি ইসলামিক সমাজে রূপান্তরিত করেছে। এবং পাকিস্তানের সম্পদ এবং ক্ষমতা সামাজিক সেক্টর থেকে অপসারিত হয়ে সেনাবাহিনীর হস্তগত হওয়ায় পাকিস্তানের সমাজাভ্যন্তরে যে অসন্তোষের আগুন সঞ্চারিত হচ্ছে, তার বহিঃপ্রকাশ এখনও ঘটেনি।

সরকার জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং সামাজিক সেবা প্রদান বর্জন করার ফলে মানুষ পরমুখাপেক্ষী হয়। যার অনিবার্য ফলস্বরূপ দেশের চারটি প্রদেশে দশ হাজারেরও বেশি রাজনৈতিক মাদ্রাসা গড়ে উঠে।

আজ চরমপন্থিরা, ইসলামের দোহাই দিয়ে তিনটি সংগঠনের ভিত প্রতিষ্ঠা করেছে। ধর্মভিত্তিক পার্টিগুলো রাজনৈতিক সমর্থন যোগাচ্ছে রাজনৈতিক মাদ্রাসাগুলোতে অন্যান্য ধর্ম এবং অন্যান্য ইসলামিক মাদ্রাসাগুলো সম্পর্কে ঘৃণা এবং অসহনশীলতার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এবং লস্কর-ই-তৈয়াবা, হরকত-উল ইসলামের মতো জঙ্গিগ্রুপগুলো নতুন জঙ্গি নিয়োগ দিচ্ছে এবং তাদেরকে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। কিছু সদস্য জঙ্গিবাদকে তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলেও বেশিরভাগ সদস্যরাই এই নিয়োগকে চাকরি হিসেবে গ্রহণ করে। (উদাহরণস্বরূপ, একজন আদিবাসী নেতা আমাকে বলেছিলেন যে, আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই তার সৈন্যদের মাসে সত্তুর ডলার করে দেন অথচ তালেবানরা তাদের 'সৈন্যদের মাসে একশ' ডলার বেতন দেয়।)

১৯৮৯ সালে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের পর পশ্চিমাদের সেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিত্যাগ এবং চরম উগ্রবাদী মোজাহিদিনদের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি বেশ কিছু রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় চরমপন্থি আন্দোলন পাকিস্তানে অব্যাহত থেকে যায়। তারা পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প। এবং তারা সামরিক স্বৈরশাসকের ছত্রছায়ায় শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে।

আমি গভীর দুঃখের সাথে প্রত্যক্ষ করি, জিয়ার ক্ষেত্রে আমেরিকা যে ভুল করেছিল-

www.pathagar.com

নতুন সামরিক স্বৈরশাসক পারভেজ মোশাররফের ক্ষেত্রেও তারা সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে। পাকিস্তানের গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জিয়ার সামরিক অভ্যুত্থানের দুই দশক পরেই আরেক সেনাপ্রধান আবারও একটি রাজনৈতিক সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান পরিচালনা করেন।

পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকের অনুসরণে পাকিস্তানের নতুন স্বৈরশাসক ও পশ্চিমাদের সঙ্গে ছলনামূলক আনুগত্য প্রদর্শন করতে থাকে, যুক্তরাষ্ট্র ঘোষিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও পাকিস্তানের সামরিক জান্তা কুটিল সমর্থন জানায়। সামরিক জান্তাদের কুটিল চক্রান্তে পাকিস্তানের আদিবাসী অঞ্চগুলোতে তালেবানরা পুনরায় সংগঠিত হতে থাকে এবং পার্শ্ববর্তী আফগানিস্তানে ন্যাটো সৈন্যদের হত্যায় তৎপর হয়। তারই প্রেক্ষিতে আমেরিকা এবং ব্রিটেন পাক সামরিক জান্তার প্রতি তাদের রাজনৈতিক সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়।

কিন্তু ততদিনে জঙ্গি গ্রুপগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। সে সময় যখনই কোনো জঙ্গি নেতা ধরা পড়ত– আন্তর্জাতিক দৃষ্টি অন্যদিকে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হতো। সামরিক স্বৈরশাসক বিরোধী নেতাদের উপর দমন-নীপিড়ন অব্যাহত রাখে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্যদের ব্যাপকহারে হত্যা করতে থাকে– সংবাদ মাধ্যমগুলোকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পুরোদমে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়।

সামরিক জান্তার মূল লক্ষ্য ছিল গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনা ব্যতীত সরকার গঠনে অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা যাতে না থাকে তা নিশ্চিত করা। আর সে কারণেই তারা পিপিপির বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে। সামরিক জান্তার সমর্থকদের মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির একটি উক্তি স্মরণ করা বাঞ্ছনীয়– 'যারা বাঘের পিঠে সাওয়ার হয় মনের দিক থেকে তারা সব সময়ই আতঙ্কিত থাকে।'

তুর্কি সেনাবাহিনীর পাকিস্তান সফরের সময় জেনারেল মোশাররফ যখন তুর্কি দোভাষীর মতো আচরণ করছিলেন তখনই তাকে আমি প্রথম দেখি। আমি তাকে আমার সামরিক সচিব করার বিষয়টি নাকচ করে দেই।

মুহাজির কাওমি মুভমেন্ট (এমকিউএম) নামে পরিচিত একটি সহিংস মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে মোশাররফের সম্পৃক্ততা ছিল– যদিও এই অভিযোগের কোনো প্রমাণ ছিল না– আমরা প্রাথমিকভাবে তার পদোন্নতিতে অস্বীকৃতি জানাই। এবং শেষবার তার সঙ্গে আমার মিটিং-এর বিষয়টি আমার মনে পড়ে– অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেই মিটিং– ১৯৯৬ সালের ওই মিটিং-এ মোশাররফ আমার কাছে কাশ্মির দখলের জন্য যুদ্ধের প্রস্তাব দিয়েছিল।

পিপিপিকে প্রতিহত করার এবং আমাকে পুনর্নির্বাচিত হওয়া থেকে বিরত রাখার মোশাররফের দৃঢ় সঙ্কল্প এবং মোহাবিষ্টতা দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে দেয় এবং রাজনৈতিক পার্টি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গণতান্ত্রিক অবকাঠামো ধ্বংস করে দেয়। উপরন্তু তার বাজটে সামাজিক সেক্টর অপেক্ষা সেনাবাহিনীকে অধিক প্রাধান্য দেয়া হয়। সামাজিক সেক্টরের বরাদ্দ সেনাবাহিনীতে স্থানান্তর করা হয় এর ফলে পাকিস্তানে দারিদ্র্যের সংখ্যা বেড়ে যায়– লাখ লাখ পাকিস্তানি দারিদ্র্য সীমার নিচে নতুন করে যুক্ত হয়।

জেনারেল মোশাররফের উপর বেশ কয়েকটি প্রাণনাশক হামলার ঘটনা সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত। যদি কামনাও কেউ করে তার উপর আর কোনো হামলা হবে না–

www.pathagar.com

তারপরও হুমকি থেকেই যায়। পাকিস্তানে স্থায়ী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার পরিণাম সুদূরপ্রসারী হবে এটাই স্বাভাবিক।

পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলের কিছু অংশে রাষ্ট্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়– এই অজুহাতে মোশাররফ প্রশাসন ওই অঞ্চলের দায়-দায়িত্ব বর্জন করে। বিন লাদেনকে ধরা যাচ্ছে না– এটা কোনো অবাক করা বিষয় নয়।

পাকিস্তানের ওই বিশাল অঞ্চলে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব– এমন ধারণা মূর্খতা এবং অজ্ঞতার শামিল। আমার প্রধানমন্ত্রীত্বের দুটি মেয়াদেই আমার সরকার ওই অঞ্চলগুলোতে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেছে। এখন মোশাররফ প্রশাসন ওই এলাকাতে সন্ত্রাসীদের রাজত্ব কায়েমের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। তার প্রশাসন ওইসব চরমপন্থিদের সাথে সহবাস করে যারা ইউরোপ-আমেরিকা ও পাকিস্তানে প্লেনে, ট্রেনে এবং বাসে নিরীহ নারী-শিশু এবং মানুষ হত্যার ষড়যন্ত্র করে। যদি একটি মহিলা প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের বর্জননীতি গ্রহণ করত তাহলে তাকে দুর্বল এবং অক্ষম বলে অভিযুক্ত করা হতো। কিন্তু এই জেনারেল কাপুরুষোচিতভাবেই এই বর্জনীতি গ্রহণ করে। যদিও এক্ষেত্রে একজন মহিলা শক্তিশালী পদক্ষেপ নিয়েছিল তথাপি পুরুষ এবং নারী নেতৃত্বের বিচারের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মোশাররফ লোক দেখানো আংশিক সমর্থন দেয়– ওয়াশিংটন ও লন্ডনের সুনজরে থাকার জন্য ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু। কিন্তু তার নীতিগুলো পশ্চিমাদের শত্রুদেরও শক্তি বৃদ্ধি ঘটায়। এবং বিপজ্জনক রাজনৈতিক মাদ্রাসাগুলো দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করে আর দেশের বাইরে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অথচ আমার শাসনামলে আমরা শক্ত হাতে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেছি এমনকি প্রয়োজনে তাদের নিরস্ত্রও করেছি, কিন্তু এখন পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসকের অধীনে তারা পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে এবং বিস্তার ঘটাচ্ছে।

আমার ধারণা, পৃথিবীতে জিয়া এবং মোশাররফরাই বিদেশিদের প্রতি অহেতুক ঘৃণা প্রদর্শনের উস্কানি দেয় এবং পাকিস্তানি ও পশ্চিমের পাকিস্তানি অভিবাসীরা পশ্চিমাদের ঘৃণার পাত্র এবং বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার– এমন মনোভাবকে উৎসাহিত করে। একটি কথা প্রায়শই বলা হয় যে, নির্বাচনেই প্রতিষ্ঠালাভ হয়। কিন্তু আমি কথাটাকে এভাবে বলি যে, অভ্যুত্থানেই প্রতিষ্ঠালাভ হয়। স্বাধীন মতামত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকারের কণ্ঠরোধের পাশাপাশি চরমপন্থা এবং অসমর্থনযোগ্য ইসলামের অপব্যাখ্যাকে উৎসাহিত করা এবং নিজেদের স্বার্থে তা ব্যবহারের অনিবার্য প্রভাব পড়েছিল– শুধু পাকিস্তানে নয় বরং পুরো বিশ্বে। কাজেই সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পৃক্ততার ব্যাপারে আমি আশ্চর্য হইনি। আমরা কেন বিস্মিত হব? কারণ সামরিক শাসকরা কয়েক যুগ ধরে উগ্রবাদকে পরিচর্যা করেছে উগ্রবাদীদের ক্ষমতায়ন করেছে এবং তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে আসছে।

কাজেই ২০০৭ সালে একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঝুঁকি নিয়ে আমি যখন পাকিস্তানে ফেরার প্রস্তুতি নেই– আমি পুরোপুরি সচেতনভাবেই ওই ঝুঁকি নেই– শুধু আমার নিজের জন্য এবং আমার দেশের জন্য নয় বরং গোটা বিশ্বের জন্য। আমি জানতাম আমাকে গ্রেফতার করা

www.pathagar.com

হতে পারে। ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে ম্যানিলায় ব্যানিগনো একুইনোকে হত্যার মতো বিমান থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও গুলি করে হত্যা করা হতে পারে। কেননা আমাকে হত্যা করার জন্য আল-কায়েদা বেশ কয়েকবার চেষ্টা চালিয়েছে। তাহলে কেন আমরা ধরে নেব না যে, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নির্বাসন থেকে আমি দেশে ফিরলে তারা আবারও আমাকে হত্যার চেষ্টা করবে? কেননা নির্বাচনকে তারা তীব্রভাবে ঘৃণা করে। তারপরও আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। এবং পাকিস্তানি জনগণের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা পূরণে তাদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য আমি সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলাম।

পাকিস্তানের সকল শিশুদের জন্য আমি এই ঝুঁকি নিয়েছি। আমার ব্যক্তিগত ক্ষমতার জন্য নয়– প্রতিটি নর-নারীর নিরাপদ, সম্মানজনক এবং স্বাধীন জীবন-যাপন করার অধিকারের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা এবং সম্মান জানাতেই আমার প্রত্যাবর্তন এবং বর্তমানের উগ্র মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসের নতুন হুমকির প্রেক্ষাপটে আমার দায়িত্ব এখন আরও বেশি। পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা শুধু পাকিস্তানিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং গোটা বিশ্বের জন্য তা গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র ধর্ম নিয়ে নোংরা রাজনীতি এবং উগ্র মৌলবাদের যুগে আমাদেরকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে যে, গণতান্ত্রিক সরকার সন্ত্রাসীদের শক্তিশালী করে না, তাদেরকে রক্ষা করে না এমনকি প্রশ্রয়ও দেয় না। সামরিক স্বৈরশাসকের রাহুমুক্ত গণতান্ত্রিক পাকিস্তান- ব্যাপক বিস্তৃত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে প্রশমিত করতে পারে।

তাই আমি পুনরায় গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য নির্বাসন থেকে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেই। গণতান্ত্রিক বিশ্বের প্রতি আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা– অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন করানোর জন্য জেনারেল মোশাররফের প্রতি তারা দাবি জানাবে। সকল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং দলগুলো যাতে স্বাধীনভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে, ভোট গ্রহণ এবং ভোট গণনা পর্যবেক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের সুযোগ দিতে হবে এবং নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি মোশাররফকে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। আমি জানি আমার এই দাবিগুলো আদর্শিক মনে হবে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা হয়তো বাস্তবসম্মতও নয়, কিন্তু নির্বাসনের এতগুলো বছরেও আমি আমার এই বিশ্বাস লালন করেছি। ন্যায়বিচার এবং ইতিহাসের ধারা গণতন্ত্রের দিকেই ধাবিত হবে।

কেন আমি আমার জীবনের অনিশ্চিত এবং ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল পথে ধাবিত হলাম– কিছু লোক তা বুঝবে না। আমার জন্য অসংখ্য মানুষ সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন, অনেক মানুষ জীবন দিয়েছেন, এবং অনেক মানুষ স্বাধীনতার জন্য আমাকে তাদের একমাত্র ভরসাস্থল মনে করেন। ড. মার্টিন লুথার কিং-এর একটি উক্তি আমার মনে পড়ে, 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেদিন আমরা নিশ্চুপ থাকি সেদিন থেকেই আমাদের জীবন নিঃশেষ হতে থাকে।' আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে আমি আমার নিয়তি পাকিস্তানের মানুষেরই হাতে সঁপে দিয়েছি।

www.pathagar.com

সাকস ফিফথ এভেনিউ থেকে কেনা পোষাক পরে চীনের সম্মানিত চেন আই (বামে)
ও চৌ এন লাই-এর সঙ্গে মীর, আমি, সনম ও শাহ নেওয়াজ।

'তুমি মনুষ্যজীব এবং তোমার অধিকার আছে' আমার বাবা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ
থেকে অব্যহতি নেয়ার পর এ কথা জোরের সঙ্গে বলে ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠা
করেন পাকিস্তান পিপলস পার্টি।

www.pathagar.com

আমি যখন র‍্যাডক্লিফ কলেজে গণতন্ত্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা নিচ্ছি তখন আমার বাবা পাকিস্তানে জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত প্রথম নেতা হতে সফল প্রচারণা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন।

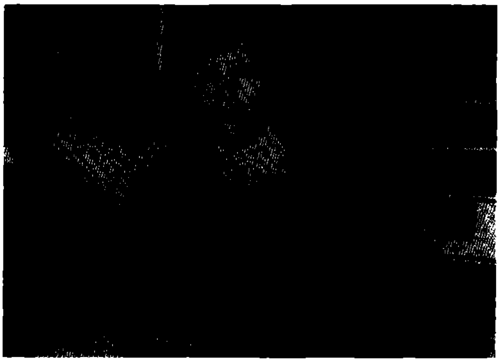

অক্সফোর্ড ইউনিয়ন ডিবেটিং সোসাইটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আট মাস পর আমার বাবা ক্ষমতাচ্যুত হন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাজনীতিবিদ প্রজন্ম : আমার দাদা স্যার শাহ্ নাওয়াজ খান ভুট্টো। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে সিন্ধুতে প্রথম রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন।

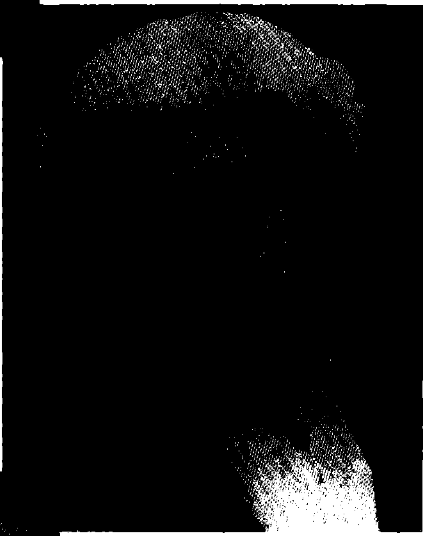

আমার বাবা জুলফিকার আলী ভুট্টো। বার্কলেতে রাজনীতি এবং অক্সফোর্ডে ক্রাইস্ট চার্চে আইন বিষয়ে লেখাপড়া করেন। এরপর করাচিতে আইনজীবী ও সরকারি মন্ত্রী হন।

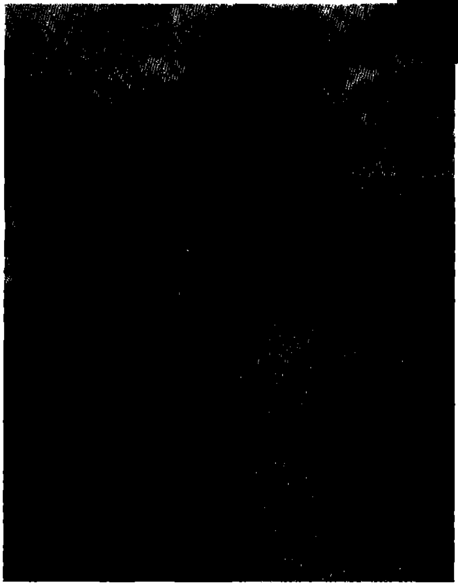

আমার ইরানী বংশোদ্ভুত মা নুসরাত। তিনি জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লাহোরে আমার বাবা যখন তার প্রহসনমূলক বিচারে আদালতে হাজির হচ্ছেন (ডানে)। আমি তখন জনগণের চেতনা জাগিয়ে রাখতে পাকিস্তানে ঘুরছি (মাঝে)। বাবার জীবন বাঁচাতে ইংল্যান্ডে আমার ভাই শাহ ও মীর (নিচে) আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযানে নেতৃত্ব দেয়। ১৯৭৯ সালের ৪ এপ্রিল আমার বাবাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

(বিপরিত পৃষ্ঠায়) ৬ষ্ঠ দফা আটক হওয়ার পর মুক্তি পেয়ে ট্রেনে লারকানায় আমার বাবার কবর দেখতে আসি। সেখানে জমায়েত সমর্থকরা শ্লোগান দেয়, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ। আমি তাদের বললাম, আমরা অবশ্যই আমাদের শোককে শক্তিতে পরিণত করব এবং নির্বাচনে জিয়াকে পরাজিত করবো।

www.pathagar.com

(বিপরিত পৃষ্ঠায়) রাষ্ট্রদ্রোহ : সামরিক অভ্যুত্থানের ১০ দিন পর মারীতে আটক থাকা আমার বাবাকে দেখতে যান জেনারেল জিয়া। জিয়াকে অপরাধী দেখালেও বিস্মিত হওয়ার কিছু ছিল না। শিগগিরই তিনি তার প্রতিশ্রুত নির্বাচন বাতিলের ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে জনগণকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করাতে নেমে আসে কষাঘাত।

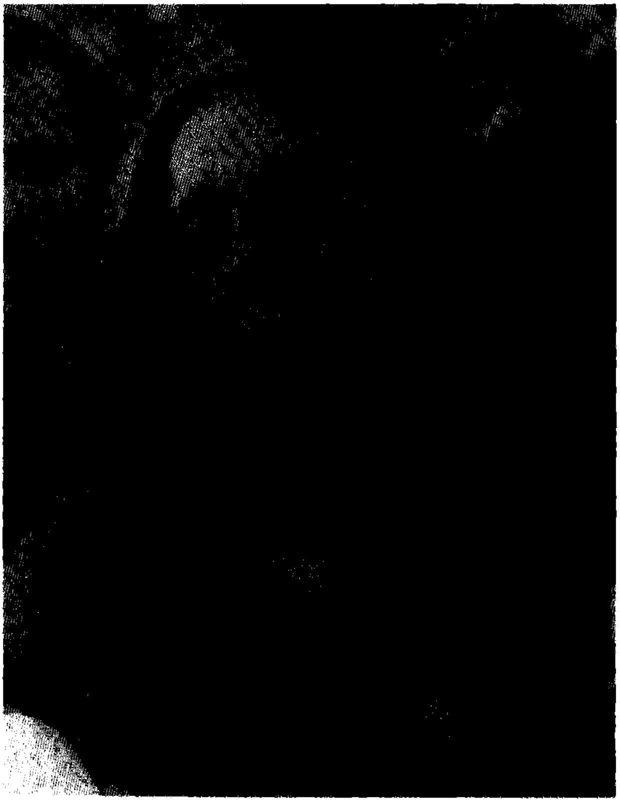

সামরিক আইনের চাবুক পড়ে বহু পিপিপি সমর্থকের ওপর। লাহোরে একটি ক্রিকেট ম্যাচে উপস্থিত হওয়ায় আমরা জিয়ার পুলিশের লাঠিপেটা ও টিয়ার গ্যাসের কবলে পড়ি। আমার মা মাথায় আঘাত পান এবং বারোটি সেলাই দিতে হয়। ওই দিন বিকেলে বাসায় আমি গ্রেফতার হই। আর আমার মা গ্রেফতার হয় হাসপাতালের বেডে।

www.pathagar.com

বাবার কবরের ওপর গোলাপের পাপড়ি ফেলার সময় মনে হয়েছিল যেন আমারই একটি অংশ মারা গেছে। করাচি ফেরার আগে আমাদের বাগানে শোকার্ত জনতা শোক জানায়। পাঁচ মাস পর জিয়া দ্বিতীয়বার নির্বাচন বাতিল করেন এবং আমার মা ও আমাকে ফের গ্রেফতার করেন।

www.pathagar.com

সেটা ছিলো ২০০৭-এর ২৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার। সূর্য মিলিয়ে যাচ্ছিলো তখন পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডির পশ্চিম দিগন্তে। সফল জনসভা শেষে সহাস্য বেনজীর ভুট্টো গাড়িতে ওঠেন, সানরুফ খুলে দাঁড়িয়ে যান ভক্ত-সমর্থকদের বিদায় জানাতে। চারপাশে প্রিয় নেত্রীর উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনিরত জনতা, তাদের দিকে প্রসন্ন হাত তোলা নেত্রী– এই সুখময় মুহূর্তটি ছিন্নভিন্ন করে দেয় আততায়ীর বুলেট ও বোমা, পলকের মধ্যে। প্রাণ উৎসর্গ করেন বেনজির, গণতন্ত্রকামী সাহসী নেত্রী। রাজপথে প্রাণ হারায় অসংখ্য নেতা-কর্মী সমর্থক। নৃশংস ওই হত্যাকাণ্ডে পুরো পাকিস্তান যতোটা কেঁপে ওঠে, ততোটাই কেঁপে ওঠে পুরো বিশ্বের বিবেক।

ক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ করে বিশ্বের রাষ্ট্র প্রধান ও রাজনৈতিক নেতাগণ। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ শ্রদ্ধা জানায় অকালপ্রয়াত এই নেত্রীর প্রতি, গভীর নিন্দা করে ওই নির্মম হত্যাকাণ্ডের। এই উপমহাদেশের জনগণ শুধু ক্ষুব্ধ ও ব্যথিতই হয়নি, তারা এই অঞ্চলের রাজনীতির নিয়তি ও নিরাপত্তার কথা ভেবে গভীর শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

বেনজির মুসলিম বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী, যিনি দু'বার ক্ষমতাসীন হন এবং দু'বারই অপসারিত হন মেয়াদ পূর্ণ হবার আগে। এমন এক রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান বেনজির, যে পরিবারের পিতা, পাকিস্তানের দক্ষ রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টো ক্ষমতাচ্যুত হন পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের হাতে, গ্রহণ করতে হয় তাঁকে ফাঁসির রজ্জু। মা নুসরাত ভুট্টোর সঙ্গে বেনজির কারারুদ্ধ থাকেন দীর্ঘদিন। ভাইদের অকাল মৃত্যু সহ্য করতে হয় তাঁকে। ষড়যন্ত্র, অবৈধ ক্ষমতা দখল, সামরিক শাসন– যে দেশের একটি সাধারণ বিষয়, সেখানে বেনজির লড়েছেন গণতন্ত্রের জন্য। কখনো জয়ী হয়েছেন, কখনো পরাজিত। দেখেছেন তিনি অনেক অন্ধকার, পর্দার আড়ালের বহু কিছু, আর তাঁর বলারও আছে তাই বহুকিছু। এ বইয়ে বেনজির শুধু জীবনকথা বলায় মনোযোগী ছিলেন না, বলেছেন তাঁর মাতৃভূমি পাকিস্তানের রাজনীতির অন্ধকার ও আলোর কথা, তুলে ধরেছেন ওই রাজনীতির স্বরূপ।

এক অনবদ্য কাহিনী– ভালবাসা, নাটকীয় উত্থান-পতন ও সাহসের

– *ইভেনিং স্ট্যান্ডার্ড*

সাহসী মহিলা এবং এক যোদ্ধা, নিজের কথা অকপটে সুন্দরভাবে বলা .....

– *ইনডিপেন্ডেন্ট*

সাহসী ও বিরল প্রজাতির এক নারীর কথা, এক শহীদ পরিবারের কথা এবং দেশের জন্য যুদ্ধরত এক সাহসী যোদ্ধার কথা– যে লড়াই করছে গণমানুষের স্বাধীনতা ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য।

– *সানডে টাইমস*

ISBN 984 802 058 6

সময়দিক